সোফির জগৎ

ইয়স্তাইন গার্ডার

অনুবাদ জি এইচ হাবীব

SOFIES VERDEN

Jostein Gaarder

নব্বই দশকের একটি *এলিস ইন-ওয়ান্ডারল্যান্ড*...। *সোফির জগৎ*-কে এর-ই মধ্যে দর্শনের তরফ থেকে স্টিফেন হকিং রচিত *আ ব্রিফ হিস্ট্রি অভ টাইম*-এর উত্তর বলে ধরে নেয়া হচ্ছে। এটি একটি চমৎকার, অপ্রতিরোধ্য বই।

ডেইলি টেলিগ্রাফ

অসাধারণ...। তিন হাজার বছরের চিন্তার ইতিহাসকে ইয়স্তাইন গোর্ডার চারশ' পৃষ্ঠায় সীমাবদ্ধ করেছেন; সহজ-সরল ভাষায় বর্ণনা করেছেন অত্যন্ত জটিল সব বিতর্কিত বিষয়কে, অথচ সেগুলোর গুরুত্ব ক্ষুণ্ণ হয়নি এতটুকু। ... *সোফির জগৎ* এক অসাধারণ কীর্তি।

সানডে টাইমস

দাম ছয়শত পঞ্চাশ টাকা

সোফি অ্যামুন্ডসেন। চৌদ্দ বছর বয়েসী এই নরওয়েজীয় কিশোরী একদিন বাসার ডাকবাক্সে উঁকি মেরে দেখতে পায় সেখানে কে যেন অবাক-করা দুটো চিঠি রেখে গেছে। চিঠি দুটোতে শুধু দুটো প্রশ্ন লেখা : "তুমি কে?" আর "পৃথিবীটা কোথা থেকে এলো?" অ্যালবার্টো নক্স নামের এক রহস্যময় দার্শনিকের লেখা আশ্চর্য চিরকুট দুটোর সেই কৌতূহল উস্কে দেয়া প্রশ্ন দু'খানি-ই সূত্রপাত করে প্রাক-সক্রেটিস যুগ থেকে সার্ত্রে পর্যন্ত পাশ্চাত্য দর্শনের রাজ্যে এক অসাধারণ অভিযাত্রার। পর পর বেশ কিছু অসাধারণ চিঠিতে আর তারপর সশরীরে, পোষা কুকুর হার্মেসকে সঙ্গে নিয়ে, অ্যালবার্টো নক্স সোফির কৌতূহলী মনের সামনে দিনের পর দিন একের পর এক তুলে ধরলেন সেইসব মৌলিক প্রশ্ন যার জবাব বিভিন্ন দার্শনিক আর চিন্তাশীল মানুষ খুঁজে ফিরছেন সভ্যতার ঊষালগ্ন থেকে।
কিন্তু সোফি যখন এই চোখধাঁধানো আর উত্তেজনায় ভরা আশ্চর্য জগতে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে শুরু করেছে, ঠিক তখনই সে আর অ্যালবার্টো এমন এক ষড়যন্ত্রের জালে নিজেদের বাঁধা পড়তে দেখে যে খোদ সেটাকেই এক যারপরনাই হতবুদ্ধিকর দর্শনগত প্রহেলিকা ছাড়া অন্য কিছু বলা সাজে না। উপন্যাসের ছলে *সোফির জগৎ* আসলে পাঠকের সামনে তুলে ধরেছে পাশ্চাত্য দর্শনের একটি সংক্ষিপ্ত কিন্তু প্রাঞ্জল ইতিহাস। তবে এখানে সোফি যেহেতু তার দর্শন শিক্ষককে নানান প্রশ্ন করছে, নিজের মেধা ও বুদ্ধি অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নিচ্ছে, আর সেই সঙ্গে পাঠককেও উদ্বুদ্ধ করছে সেই চিন্তা-ভাবনার খেলায় শামিল হতে, তাই বইটি শেষ পর্যন্ত হয়ে উঠেছে অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক এবং ভাবনাসঞ্চারী।
দর্শন সম্পর্কে ভীতিমূলক ধারণা অমূলক প্রমাণে *সোফির জগৎ* যে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে সে-কথা হয়ত আজ বলা যেতে পারে।
নরওয়েজীয় ভাষায় লেখা মূল বইটির এই বঙ্গানুবাদটি করা হয়েছে, লেখকের অনুমতিক্রমে, পলেট মোলারকৃত ইংরেজি অনুবাদ থেকে।

প্রচ্ছদ : সব্যসাচী হাজরা

ইয়স্তাইন গোর্ডার, জন্ম ১৯৫২ সালে। নরওয়ের বার্গেন শহরে দর্শনের শিক্ষক ছিলেন দীর্ঘদিন। এখন সর্বক্ষণের লেখক; নিবাস অসলো, স্ত্রী এবং দুই পুত্রসহ।

১৯৯৮ সালে *সোফির জগৎ*-কে অত্যন্ত সফলভাবে একটি মিউজিক্যালে রূপ দেয়া হয় এবং জার্মানিতে সেটার প্রথম পারফরমেন্সের সময় বিক্রি হয় বইটির লক্ষ লক্ষ কপি। পরে বইটি অবলম্বনে একটি চলচ্চিত্র-ও নির্মিত হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের নানান বিশ্ববিদ্যালয়ে *Sofies Verden*-এর অনুবাদ পাঠ্য; বাংলাদেশেও বইটির ইংরেজি এবং বাংলা অনুবাদ একই মর্যাদা লাভ করেছে।

অনুবাদক : জি এইচ হাবীব (গোলাম হোসেন হাবীব)-এর জন্ম ১৯৬৭ সালে, ঢাকায়। মিরপুরের শহীদ আবু তালেব বিদ্যানিকেতন (বর্তমানে, উচ্চ বিদ্যালয়) ও মির্জাপুর ক্যাডেট কলেজে মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক পড়াশোনা শেষে তিনি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি সাহিত্যে অধ্যয়ন করেন। তারপর বছর দুয়েক সাংবাদিকতা করে যোগ দেন অধ্যাপনায়। কর্মস্থল চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

আলোকচিত্র **ইন্টারনেট থেকে প্রাপ্ত**

ইয়স্তাইন গোর্ডার

সোফির জগৎ

অনুবাদ : জি এইচ হাবীব

ভাষান্তরের পক্ষে

১৪১৬

প্রথম সংহতি সংস্করণ

চৈত্র ১৪১৬ মার্চ ২০১০

প্রকাশক

ভাষান্তরের পক্ষে

সংহতি প্রকাশন

৩০৫, রোজ ভিউ প্লাজা, ৩য় তলা,

১৮৫ বীরউত্তম সি আর দত্ত রোড, হাতিরপুল, ধানমণ্ডি, ঢাকা ১২০৫

শো-রুম: ১০৯ কনকর্ড এম্পোরিয়াম, নিচতলা, কাটাবন, ঢাকা ১২০৫

প্রচ্ছদ

সব্যসাচী হাজরা

অক্ষর বিন্যাস

তৌহিদ

মুদ্রণ

রিকো প্রিন্টার্স, ৯ নীলক্ষেত, বাবুপুরা, ঢাকা ১২০৫

দাম

ছয়শত পঞ্চাশ টাকা বিদেশে ২০ ডলার

SOPHIR JAGOAT

Bangla Translation of SOPHIE'S WORLD by *Jostein Gaarder.*

Translated by G H Habib. Published by Samhati *Prokashan (Samhati Publications)*

on behalf of *Bhashantar.*

For information, address Samhati Publications, 305 *Rose View Plaza, 2nd Floor*

185 Biruttam C R Dutta Road, Dhanmondi, Dhaka *1205, Bangladesh.*

E-mail: samhatiprokashan@yahoo.com

Cover Design: Sabyasachi Hazra. *Price 650.00 Taka / US $ 20.00.*

ISBN 978-984-8882-07-8

অনুবাদকের উৎসর্গ

স্ত্রী

নাজমুন নাহার শার্মিন

প্রকাশনা প্রসঙ্গে

সোফির জগৎ প্রথম প্রকাশিত হয় ২০০২ খ্রিষ্টাব্দের এপ্রিলে। স্পষ্টতই, এখানে নরওয়েজীয় লেখক ইয়স্তাইন গোর্ডারের *Sofies Verden* উপন্যাসের পলেট মোলারকৃত ইংরেজি অনুবাদ *Sophie's World*-এর জি এইচ হাবীব রচিত বঙ্গানুবাদটির কথা বলা হচ্ছে। প্রকাশক সন্দেশ-এর সঙ্গে মূল নরওয়েজীয় বইটির প্রকাশনা সংস্থা H. Aschehoug & Co-এর চুক্তি শেষ হয়ে গেলে 'ভাষান্তর' বইটির বাংলা অনুবাদ স্বত্ব কিনে নেয়। বর্তমান সংস্করণটি 'ভাষান্তর'-এর পক্ষ থেকে 'সংহতি' প্রকাশন বের করছে। কাজেই একে একটি যৌথ প্রকাশনাও বলা যেতে পারে। আশা করছি, নতুন এই সংস্করণটি ক্রেতা-পাঠক এমনকি নিন্দক-নন্দিত হবে।

ফেব্রুয়ারি, ২০১০

জি এইচ হাবীব
স্বত্বাধিকারী
'ভাষান্তর'

সংহতি সংস্করণের ভূমিকা

সোফির জগৎ অথবা নিছক অনুবাদ সমাচার

অনুবাদকের এই প্রলাপ স্বচ্ছন্দে উপেক্ষা করে মূল
বইটিতে প্রবেশ করলে পাঠকের লাভ বৈ ক্ষতি নেই

বইটির নাম জনসমক্ষে উচারণ করার পর এখনো প্রায়ই আমার যে অভিজ্ঞতাটি হয় তা হচ্ছে, অনেকেই বলে ওঠেন 'ও আচ্ছা, সুফীবাদ সংক্রান্ত কোনো বই, তাই না?' বা, 'আচ্ছা, বইটা তাহলে সোফিস্টদের নিয়ে লেখা।' বইটির লেখক এরকম কোনো সমস্যায় পড়েন কিনা জানতে ইচ্ছে করে, যদিও জানি যে ১৯৯১ সালে প্রকাশিত হওয়ার পর অন্তত ৫৩টি ভাষায় অনূদিত বইটির লক্ষ লক্ষ কপি বিক্রি হয়েছে। বাংলা অনুবাদটির কত কপি এ-পর্যন্ত বিক্রি হয়েছে তা অবশ্য জানি না। জানা বারণ। সারা পৃথিবীতে নানান ধরনের কাণ্ড হয়েছে দর্শনের মতো আপাত নীরস বিষয় নিয়ে লেখা বইটি নিয়ে। নরওয়েতে বিক্রি হয়েছে ২৫০,০০০-এরও বেশি কপি, ডেনমার্কেও তাই। একটি মিউযিকাল-ও রচিত হয়েছে বইটি নিয়ে, জার্মানিতে। শুনেছি, জাপানে বইটি আদৃত হয়েছে সবচাইতে বেশি। আমেরিকার ফিনিক্স প্রকাশনা সংস্থা ১৯৯৭ সালে বের করেছে বইটির ৬৪ পৃষ্ঠার সংক্ষিপ্ত সংস্করণ, *Sophie's World: The Greek Philosophers*। বইটিকে ভিত্তি করে নির্মিত নরওয়েজীয় চলচ্চিত্রটি মুক্তি পায় ১৯৯৯ সালের ৬ আগস্ট। বাজেট ছিল ৭ কোটি নরওয়েজীয় ক্রোনার। এ-ধরনের আরো কিছু বই খুঁজে পাওয়া সম্ভব। ১৯৬১ সালে প্রকাশিত, জুলফেইফার অলংকৃত, নরটন জাস্টারের *The Phantom Tollbooth* সেরকমই একটি (আমি পড়ে উঠতে পারিনি এখনো অবশ্য)।

সে যাই হোক, *সোফির জগৎ*-এর নতুন এই সংস্করণটির 'মুখবন্ধ' বা তপন রায় চৌধুরীর ভাষায় 'মুখব্যাদান' রচনার অছিলায় অনুবাদ সম্পর্কে যদি মাধুকরির মাধ্যমে বা অন্য কোনোভাবে কিছু কথাবার্তার অবতারণা করি, পাঠক আশা করি কিছু মনে করবেন না; কানন দেবী-র সেই বিখ্যাত গানের মতো—যদি ভালো না লাগে তো সরাসরি চলে গেলেন মূল লেখায়। সময় যতটুকু নষ্ট হবে সেজন্য ক্ষমা চেয়ে নিই; তাতে যদি মন না ভরে তাহলে আপনি এরকম কোনো বাজে লেখা লিখে (যদি এতো বাজে লেখা লেখা আপনার দ্বারা সম্ভবপর হয় আর কি) আমাকে খবর দেবেন, আমি আপনার নষ্ট হওয়া সময়টুকুর সমপরিমাণ অন্তত, বা, আপনি চাইলে, তারও কিছু বেশি সময় নষ্ট করে আসবো লেখাটি পড়ে। এর চাইতে ন্যায্য ব্যবস্থা আমার মাথায় আসছে

না। আপনাদের এলে, জানাবেন দয়া করে।

সারা বিশ্ব জুড়ে *সোফির জগৎ* এতো বহুল অনূদিত এবং পঠিত কেন? একথা সত্যি, আমজনতার সঙ্গে দশর্নের সম্পর্ক খুব একটা প্রীতিকর নয়। তারপরেও বইটির এমন জনপ্রিয়তার কারণ কী? ব্যাপারটি কি এই যে, দর্শনের প্রতি মানুষের যে ভীতি রয়েছে তা দূর হয়েছে ওই 'উপন্যাস' নামক সুমিষ্ট প্রলেপের কারণে? বিশেষত যখন জানা গেছে, দর্শনের এই ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে সদ্য টিনএজ বয়েসে পৌঁছানো এক বালিকার কাছে? অর্থাৎ, তাঁরা, ছোট-বড় সবাই, পূর্বানুমানের ভিত্তিতে বুঝতে পেরেছে এ-গ্রন্থে দর্শন পরিবেশিত হবে যতদূর সম্ভব লঘু চালে, যাতে তা কিশোরী-কিশোরের বোধগম্যতার ভেতরে থাকে। বিশেষ করে যখন গল্প এগিয়েছে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই, সংলাপের মাধ্যমে; তাতে বিষয়গুলোর প্রতি আরো বেশি নৈকট্য অনুভব করেছেন পাঠকবর্গ। চতুর্দশবর্ষীয়া বালিকার নামটি, সোফি, সেটিও কম কৌতূহলোদ্দীপক এবং ইঙ্গিতবাহী নয়। সোফিয়া বা সোফি মানে জ্ঞান। এবং প্লেটো তাঁর গুরু সক্রেটিসের অনুসরণে ফিলসফি বা দর্শন মানে বুঝতেন ফিলো-সোফিয়া বা জ্ঞান-এর প্রতি ভালোবাসা। শব্দটির নানান রূপভেদ পাওয়া যায় নানান ভাষায়। সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ফ্যান্টাসি এবং রহস্য—যেখানে প্রয়োগ করা হয়েছে 'সিমুলেটেড রিয়ালিটি' এবং 'গল্পের মধ্যে গল্প'-র মতো অত্যন্ত আকষর্ণীয় দুটো উপাদান। তাছাড়া, *সোফির জগৎ*-এ আছে মেটাফিকশন-এর উপাদান, যেখানে গল্পের ভেতরেই সেই গল্প নিয়ে লেখক সচেতনভাবে নানান প্রশ্ন বা মন্তব্য করেন, ফলে পাঠকের কাছে কাহিনীটি হয়ে ওঠে আরো আকর্ষণীয়। তো, আর কী চাই, একটি বই জম্পেশ হতে? তবে, আমার ব্যক্তিগত মত হচ্ছে, বইটির বিষয়বস্তুর গভীরে ভালোভাবে ঢুকতে হলে দর্শন সম্পর্কে পাঠকের খানিকটা পূর্বপ্রস্তুতি প্রয়োজন। তাহলে, রসাস্বাদনে বেশ সুবিধে হবে।

তবে, অনেকের কাছে, বিশেষ করে পরিণত পাঠকের কাছে মনে হতে পারে, এই দুইয়ের 'আগ্রাসনে' বইটির ঘোষিত মূল বিষয়বস্তু—দর্শনের ইতিহাস কথন বা বর্ণন—বাধাগ্রস্ত হয়েছে। তাঁরা এমনকি এ-ও মনে করতে পারেন যে দর্শন নিজেই এতো রহস্যজালে ঘেরা যে তার ইতিকথা শোনাতে গিয়ে বিষয়টির ওপর বাড়তি রহস্যারোপ গোলাপ ফুলের পাঁপড়ির সৌন্দর্যবর্ধনে তার ওপর রঙের প্রলেপ দানেরই নামান্তর। তবে এর বিরুদ্ধমতাবলম্বী যে নেই তা নয়, নইলে বইটি এমন বহুল অনূদিত, বিক্রিত ও পঠিত হয় কিভাবে? এ-প্রসঙ্গে অনেকেরই হয়ত মনে পড়বে বিজ্ঞানী স্টিফেন হকিং রচিত *আ ব্রীফ হিস্ট্রী অব টাইম*-এর মারমার কাটকাট বিক্রির কথা। অনেকেই দাবি করেন, যত পাঠক বইটি কিনেছেন তাঁদের একটি বড় অংশ বইটি পুরোপুরি পাঠ করেননি, বা করলেও, তাঁদের উল্লেখযোগ্য অংশ অনেক কিছুই বোঝেননি। তবে *সোফির জগৎ*-কে দর্শনের তরফ থেকে হকিং-এর বইটির জবাব বলে বলা হচ্ছে বলেও শুনেছি।

যদিও বইটিতে দাবি করা হয়েছে এটি দর্শনের ইতিহাসভিত্তিক একটি উপন্যাস, কিন্তু এখানে পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিকথাই বলা হয়েছে, ভারতীয় (বৈদিক বা অবৈদিক) কিংবা চৈনিক (কনফুসীয় বা তাও) দর্শনের নামমাত্র উল্লেখ ছাড়া কিছুই নেই। এটি অবশ্যই কোনো নতুন ঘটনা নয়। পশ্চিমদেশীয় অনেক বিখ্যাত গ্রন্থই একই দোষে দুষ্ট। তবে সেজন্য মন খারাপ করে লাভ কি! প্রাচ্য দর্শন সম্পর্কিত বই পত্র-ও তো

নেহাত কম নেই, যদিও হয়ত সেগুলো *সোফির জগৎ*-এর মতো নয়।

বিগত দিনের চাইতে বর্তমান বা ভবিষ্যতের দিনগুলোর হীনতর অবস্থার কথা নিরাশাবাদীরা বলে থাকেন। তারই মোক্ষম প্রমাণ হিসাবে তাঁরা *সোফির জগৎ*-এর উদাহরণ দিতেই পারেন। বলতে পারেন, একসময় বাংলা ভাষায় অনূদিত হয়েছে দর্শন বা ইতিহাস-এর মূল পাঠ বা টেক্সট দুয়েকটি উদাহরণ, প্লেটোর *সংলাপ*, *রিপাবলিক* (সরদার ফজলুল করিম), *জরাথুস্ত্র বললেন* (মহীউদ্দিন), *মুকাদ্দিমা* (গোলাম সামদানী কোরেশী)। আর এখন *সোফির জগৎ*, যা কিনা নিখাদ দর্শন তো নয়ই, দর্শন বিষয়ক উপন্যাস (এটি উপন্যাস হয়েছে কি না সেই বিচারে যাবো না, কারণ উপন্যাস কী তা বলা আর উপন্যাস কী নয় তা বলা প্রায় সমান বিড়ম্বনাদায়ক)। এ-প্রসঙ্গে শুধু দুটো কথা বলবো। এক, সেই সুবর্ণ যুগেও দর্শনের ইতিহাস বিষয়ক বই অনূদিত হয়েছে আবুল ফজলের অনুবাদে *দর্শনের ইতিকথা* (উইল ডুরান্ট-এর *আ স্টোরি অভ ফিলসফি*)। আর, দুই, *সোফির জগৎ*-এর মাধ্যমে পাঠক যদি বিভিন্ন দার্শনিকের মূল লেখা পাঠে বা অনুবাদে উদ্বুদ্ধ হন, তাতে ক্ষতি তো নেই; হ্যাঁ, তবে, আশংকার কথা হলো (যেকথা *সোফির জগৎ*-এর প্রথম সংস্করণের ভূমিকাতেও উল্লেখ করেছি), ইন্সট্যান্ট সব-কুছ্-এর এই জমানায় পাঠক, অনুবাদক মায় লেখক অব্দি না ইন্সট্যান্ট ফিলসফি-র রেসিপি হিসেবে *সোফির জগৎ*-কে বেছে নিয়ে তাতেই মশগুল হয়ে থাকেন। বালাই ষাট! কামনা করি, ফিরে আসুক, যোগ্য লোকের হাতে, কেবল দর্শন-ই নয়, জ্ঞানরাজ্যের আরো নানান বিষয় অনুবাদের সেই কাল এই বাংলাদেশে, নতুন প্রাণশক্তি নিয়ে।

কিন্তু আসবে কি? কখন আসে সেসব সময়? আসার কোনো পূর্বশর্ত বা পরিবেশ প্রতিবেশ থাকে কি? তেল আবিব বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতি গবেষণার প্রফেসর ইমেরিটাস, 'পলিসিস্টেম' (সমাজের ভেতরের সাহিত্যবিষয়ক এবং সাহিত্যবহির্ভূত লেখার পরস্পর সম্পর্কিত সামগ্রিক নেটওয়ার্ক) তত্ত্বের জগদ্বিখ্যাত প্রবক্তা, ভাষাবিদ ইতামার ইভেন-যোহার (Itamar Even-Zohar, ১৯৩৯) তিনটি সামাজিক অবস্থাকে চিহ্নিত করেছেন যখন অনুবাদ মুখ্য ভূমিকায় অবস্থান করে প্রথমত, যখন একটি সাহিত্য 'নবীন', বা তার প্রতিষ্ঠালগ্নে রয়েছে; দ্বিতীয়ত, যখন কোনো সাহিত্য প্রান্তিক বা দুর্বল বা এই উভয় অবস্থানে রয়েছে; এবং তৃতীয়ত, যখন তা কোনো সংকট বা ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে। সুশীল পাঠক, আমরা এখন কোন পর্যায়ে আছি বলে আপনার মনে হয়? পণ্ডিত ইতামার-এর পর্যবেক্ষণ সত্য বলে মানলে, আমার তো ধারণা, প্রমথ চৌধুরীর ভাষা ধার করে বলতে হয়, 'এখন তর্জমার যুগ'; তবে, অন্য ভাষা থেকে বাংলায় যতোটা, বাংলা ভাষা থেকে অন্য ভাষায় (পড়ুন, ইংরেজিতে) তার চাইতে কম নয়।

নানান বিষয়ের বই, নানান ভাষার বই। জানি, অনুবাদকে অনেকে হেয় জ্ঞান তো করেনই (তাঁদের কাতারে সাধারণ পাঠক তো রয়েছেনই, এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়ের বড় বড় ডিগ্রিধারী সাহিত্যের অধ্যাপক পর্যন্ত আছেন), সেই সঙ্গে বলে বেড়ান, বাংলা ভাষা এখনো বিজ্ঞান, দর্শন ইত্যাদি 'কঠিন' বিষয়ের অনুবাদ, আলোচনার মতো সাবালক হয়ে ওঠেনি।

প্রথমত, তাঁদের কাছে আমার প্রশ্ন, সাবালক কি এমনি এমনি হয়ে উঠবে, ঘটোৎকচের মতো? তারপর তাঁরা বা আমরা তা নিয়ে কাজ করবো আর বাহাদুরি নেবো? যে-ইংরেজি ভাষার আজ এতো দোর্দণ্ড প্রতাপ তার অবস্থা-ও কি ওই হিড়িম্বা-ভীম-নন্দনের মতোই ছিল প্রথম থেকে? কোন অবস্থায় ছিল তা নিয়ে আলোকপাত করার আগে অনুবাদ সম্পর্কে অক্টাভিও পাস-এর একটি মন্তব্য, পাঠক মার্জনা করবেন, ইংরেজিতেই, তুলে দিচ্ছি

> Every text is unique and, at the same time, it is the translation of another text. No text is entirely original because language itself, in its essence, is already a translation: firstly, of the non-verbal world and secondly, since every sign and every phrase is the translation of another sign and another phrase. However, this argument can be turned around without losing its validity: all texts are original because every translation is distinctive. Every translation, up to a certain point, is an invention and as such it constitutes a unique text.
> Octavio Paz, *Traducción: literatura y literalidad* (Barcelona: Tusquets Editor, 1971), p. 9.

যাই হোক, সেই ঘটোৎকচ প্রসঙ্গে ফিরে যাই। চার্লস বার্বার নামধারী জনৈক ইংরেজ ভদ্রলোক তাঁর 'দি ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ ইন দি এইজ অভ্ শেক্সপীয়র' রচনায় বলছেন, এই মহাকবির জন্মের সময় (১৫৬৪ খ্রি.) ইংরেজি ভাষার পরিচিতি, সম্মান এবং ব্যবহার মোটেই উল্লেখযোগ্য ছিল না ইংল্যান্ড এবং দক্ষিণ স্কটল্যান্ড মিলিয়ে লাখ চল্লিশেক লোক কথা বলত ইংরেজি ভাষায়। ব্রিটেনের বাইরে খুব কম লোকেরই জানা ছিল ভাষাটির কথা, এবং যাদের জানা ছিল তাদেরও খুব একটা শ্রদ্ধা-ভক্তি ছিল না ভাষাটির প্রতি। যা ছিল লাতিনের জন্য। ফরাসী, ইতালীয়, হিস্পানি, ধ্রুপদী লাতিন আর গ্রীকের তুলনায় ইংরেজির অবস্থা সম্পর্কে বার্বার লিখছেন "Compared to these languages it was said to be deficient in vocabulary, and to be 'barbarous' (usually meaning 'unexpressive, lacking in eloquence')"। আর তাই, লেখক-বিজ্ঞানী সবার পছন্দ ছিল লাতিন; এমনকি ১৬৮৯ খ্রিষ্টাব্দে নিউটন গতিসূত্র বিষয়ক যে মহাগ্রন্থ রচনা করেন সেটারও ভাষা ছিল লাতিন।

ইংরেজির বদলে লাতিন ব্যবহারের পক্ষে যে-সমস্ত যুক্তি প্রয়োগ করা হতো তা যেন হুবহু বাংলার বদলে ইংরেজি ব্যবহারের সাফাইয়ের মতো। চার্লস বার্বারের কথাগুলো সরাসরি তুলে দেয়ার লোভ সংবরণ করতে পারছি না (সত্যি বলতে কি, পারলে আমি পুরো রচনাটিই উদ্ধৃত করতাম, বা অনুবাদ করে দিতাম)

> There were various arguments against the use of English. Learning would decay, because there would be no incentive to learn classical languages. It was dangerous to let knowledge fall into the hands of the vulgar. English was unsuitable for scholarly works because it lacked the necessary technical

> vocabulary. English was a 'rude' or 'barbarous' language, lacking expressiveness. It was unsuitable and changing, unlike classical Greek or Latin, which were 'fixed' It was not commonly understood outside Britain, whereas Latin was an international language.

ইংরেজির শব্দভাণ্ডার নগণ্য, ফলে ভাষাটির প্রকাশক্ষমতা বেশ সীমিত; সে-কারণে, একে 'বর্বর' ভাষা হিসেবে গণ্য করা হচ্ছে। ভাবা যায়! লাতিনের শব্দ ভাণ্ডার বিপুল। ইংল্যান্ডের বাইরে ইংরেজি ভাষা ব্যবহারকারীর সংখ্যা নিতান্তই অল্প, অথচ লাতিন আন্তর্জাতিক ভাষা; তাছাড়া, ইংরেজি আমজনতার ভাষা, সে-ভাষায় জ্ঞান চর্চা করলে জ্ঞানরাজ্যে তারা ভুল-ভাল করবে, এসব জ্ঞানের কৌলীন্য বরবাদ করবে, তা কেন সহ্য হবে সমাজের তথাকথিত অভিজাত শ্রেণীর মানুষের!

ইংরেজি ব্যবহারের পক্ষে ছিলেন যাঁরা, যুক্তি ছিল তাঁদেরও, যেমন আছে বাংলার গুণগ্রাহীদের। ইংরেজি সাধারণ লোকের ভাষা, ফলে সে-ভাষায় সাহিত্য বা জ্ঞানকাণ্ডের নানান বিষয়ে লেখালেখি হলে তা পাঠকের কাছে সহজবোধ্য হবে, দূর পথে, লাতিন হয়ে তা জানতে হবে না। অন্য ভাষা শেখার সময় বেঁচে যাবে। যাঁরা শিক্ষাকে জনসাধারণের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে চান তাঁদের অশুভ কোনো উদ্দেশ্য না থেকে পারে না। গ্রীক-লাতিন ভাষাও লোকের মাতৃভাষা ছিল, এবং রোমানরা বিজ্ঞান ও দর্শন বিষয়ক লেখা লাতিনেই রচনা করেছে, গ্রীক ভাষায় নয়। লাতিন আন্তর্জাতিক ভাষা ঠিক, কিন্তু এটা তো মায়ের ভাষা। হতে পারে সে-ভাষার প্রকাশক্ষমতা, শব্দভাণ্ডার দুর্বল। কিন্তু চর্চা না করলে সে-দুর্বলতা কাটবে কি? 'হাঁটিতে শেখে না কেহ না খেয়ে আছাড়' এ-কথাটি তো স্মরণে রাখতে হবে। শব্দ যদি কম থাকে, বইপত্র যদি অপ্রতুল হয়ে থাকে তো তা বাড়াতে হবে। উন্নতমানের গ্রন্থ ইংরেজি ভাষায় রচিত হলে সেটা আর মোটেই বর্বর ভাষা থাকবে না।

তো, তারা কেবল এসব যুক্তি দেখিয়েই বসে থাকলেন না। কাজ শুরু হলো। বার্বার লিখছেন

> The process of de-Latinization began with the making of translations of standard Latin works; next came English imitations of these, often heavily dependent on their sources; and finally there were fully original English works.This process is seen in many branches of science and of the liberal arts. It is also seen in the development of academic drama in England: performances of classical plays in Latinin schools and universities were followed by translations (especially of Terence and of Seneca) and by English plays in imitation of these.

প্রথমত, কেবলই মানসম্পন্ন লাতিন রচনা থেকে অনুবাদ। তারপর অনুকরণ, ভাবানুবাদ। অতঃপর মৌলিক রচনা। সুশীল পাঠক, আপনার দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করি উদ্ধৃতিটির অন্তিম বাক্যের প্রতি। লক্ষ করুন, বিভিন্ন বিদ্যালয়-

বিশ্ববিদ্যালয় এক্ষেত্রে একটি বিরাট ভূমিকা পালন করেছিল। ধান ভানতে শিবের গীতের মতো মনে হওয়ার ঝুঁকি মাথায় নিয়েই বলি, আমাদের দেশেও সর্বোচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো নানান জ্ঞানকাণ্ডের বাংলা টেক্সট তৈরির ব্যাপারে এক বিশাল ভূমিকা রাখতে পারতো যদি শিক্ষকদের পদোন্নতির অন্যতম শর্ত হিসেবে গবেষণা-পত্র রচনার পাশাপাশি অনুবাদকেও অন্তর্ভুক্ত করা যেতো, এবং প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষা শিক্ষা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করে সেখানে একটি অনুবাদ অনুষদ/কেন্দ্র খোলা হতো, যা বিদেশের অনেক বিশ্ববিদ্যালয়েই আছে।

সে যাই হোক, কিন্তু শব্দভাণ্ডারের দৈন্য? সেটা কিভাবে ঘোচানো হলো? বার্বার বলছেন, ১৫৫০ থেকে ১৬৫০ এই একশো বছরে ইংরজি শব্দভাণ্ডার বিপুলভাবে সমৃদ্ধ হয়েছে। কিভাবে? প্রথমত, দেদার ধার নিয়ে, লাতিন থেকে। এসব শব্দের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ বিজ্ঞান, চিকিৎসাশাস্ত্র, ধর্ম এবং লিবারাল আর্টস থেকে এলেও, বেশ কিছু শব্দই এসেছে আটপৌরে শব্দভাণ্ডার থেকে, যেমন, *relebant, relegation* এবং *invidious*। অসংখ্য শব্দ ঋণ নেয়া হয়েছে তা হচ্ছে ফরাসী, যদিও লাতিন থেকে যতো নেয়া হয়েছে সে-তুলনায় অনেক কম। ইতালীয়, হিস্পানী এবং ওলন্দাজ থেকেও শব্দ সরাসরি ধার করা হয়েছে, কিন্তু তার সংখ্যা নগণ্য।

তবে যতো শব্দ সরাসরি ধার নেয়া হয়েছে বিভিন্ন ভাষা থেকে, তার চাইতে অনেক বেশি তৈরি করা হয়েছে শব্দ-তৈরির নিয়ম অনুযায়ী। সবচেয়ে বেশি করা হয়েছে প্রচলিত উপসর্গ, বিভক্তি ইত্যাদি যোগ করে। এবিষয়ে বিস্তারিত লেখার উপযুক্ত স্থান এটি নয়, শুধু একটি উদাহরণ দেয়া যাক। চতুর্দশ শতকেই ফরাসী থেকে ধার করে আনা হয়েছিল 'comfortable' শব্দটি। সেটার সঙ্গে স্থানীয় উপসর্গ 'un' যোগ করে ১৫৯২ খ্রিষ্টাব্দে তৈরি করা হলো 'uncomfortable' শব্দটি। সেই সঙ্গে বাইরে থেকে আনা যে-কোনো বিশেষণ-এর সঙ্গে স্থানীয় বিভক্তি '-ly' জুড়ে দিয়ে তৈরি করা হলো ক্রিয়া-বিশেষণ বা adverb। উদ্ভাবিত এরকম এন্তার নতুন শব্দ Oxford English Dictionary (O.E.D.)-তে লিপিবদ্ধ করা আছে, আর সব ধরনের রচনাতেই এ-ধরনের শব্দের নিদর্শন পাওয়া যাবে গদ্য ও পদ্য বা কাব্য, দর্শন, ধর্মতত্ত্ব, রোমান, নাটক ইত্যাদি। এসব অনেক শব্দেরই প্রথম ব্যবহারের প্রমাণ মিলবে সুপরিচিত সাহিত্যকর্মে, যার মধ্যে স্যার ফিলিপ সিডনি-র *আর্কেডিয়া* (১৫৮৬) উল্লেখযোগ্য। তবে, প্রথম পুরস্কারটি কিন্তু শেক্সপীয়রের। O.E.D. সাক্ষ্য দিচ্ছে, কবিবর 'un-' দিয়ে শুরু হওয়া ১৬৪টি শব্দ প্রথমবারের মতো ব্যবহারের কৃতিত্বের অধিকারী। তাঁর সমস্ত লেখক জীবন জুড়েই চলেছে এই শব্দ তৈরির খেলা; তাঁর প্রতিটি নাটক অথবা গুরুত্বপূর্ণ কবিতায় অন্তত একটি নব্য-শব্দ জায়গা করে নিয়েছে।

তো, এরপর নতুন শব্দ এসেছে দুটো প্রচলিত শব্দ একসঙ্গে জুড়ে দিয়ে, বা মিশ্রণের (কম্পাউন্ডিং) মাধ্যমে যৌগিক শব্দ তৈরি করে। আর সবশেষে, একটি পদকে অন্য পদ হিসেবে ব্যবহার করে, ইংরেজিতে যাকে বলে conversion বা zero-morpheme derivation, তার মাধ্যমে। যেমন, শেক্সপীয়র ফরাসী থেকে ত্রয়োদশ শতকে ধার করা বিশেষ্য 'uncle' নিয়ে সেটাকে এক স্থানে ক্রিয়া হিসেবে ব্যবহার করেছেন 'Grace me no grace, nor uncle me no uncle' (Richard II)। তবে

এই শব্দ তৈরির প্রক্রিয়া যে সমালোচনা বা বিতর্কের উর্ধ্বে ছিল তা নয়, কিন্তু তাতে কাজটি বন্ধ হয়নি।

দেখা গেল, শেক্সপীয়র ধরাধাম থেকে বিদায় নেবার সময় ইংরেজির অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে তা তাঁর আগমনকালীন অবস্থা থেকে পুরোপুরি ভিন্ন। এই প্রয়াসটা বাংলার ক্ষেত্রে কোথায়? আর সেই প্রয়াসে অংশগ্রহণ না করে কিভাবে বাংলাভাষাকে গালমন্দ করার হক জন্মায় কারোর, তা অন্তত আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে বুঝতে পারি না।

দ্বিতীয়ত, তাঁদেরকে একটু মেহনত করে শ্রী যোগেশচন্দ্র বাগল রচিত 'বাংলা অনুবাদ সাহিত্য ১৮০১-১৮৬১' শীর্ষক নাতিদীর্ঘ রচনাটি পড়তে অনুরোধ করবো। ওই কাল পরিসরে সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, ধর্ম, চিকিৎসাশাস্ত্র, কত বিচিত্র বিষয়ে অনুবাদের মহোৎসব ঘটেছিল তার একটা ধারণা পাবেন তাঁরা। লেখাটি কোথায় পাওয়া যাবে? প্রথমে লেখক এটি পাঠ করেছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে, ১৯৬৮ সালের ১২, ১৩ ও ১৪ই মার্চ, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্মারক বক্তৃতা হিসেবে। পরে লেখাটি *এক্ষণ* পত্রিকার ৬ষ্ঠ বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত হয় ১৩৭৫ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন-চৈত্র মাসে। সম্প্রতি, *এক্ষণ* পত্রিকায় প্রকাশিত যাবতীয় লেখা থেকে বাছাই করা রচনার একটি সংকলন বেরিয়েছে দু-খণ্ডে, কোলকাতা থেকে। তারই প্রথম খণ্ডে ৩৯৯ থেকে ৪২১ পৃষ্ঠায় ছাপা হয়েছে লেখাটি আবার।

বাংলা অনুবাদের এই দুর্দিনে মনে পড়ছে এক রাজার কথা। রাজা আলফ্রেড (৮৪৯-৮৯৯ খ্রিষ্টাব্দ)। মহামতি আলফ্রেড। 'গ্রেট' উপাধিপ্রাপ্ত একমাত্র ইংরেজ নৃপতি। ইংরেজি ভাষার দৈন্যদশা ঘুচাতে যিনি হাতে নিয়েছিলেন এক অনুবাদ প্রকল্প। অনেককেই সেই কাজে নিয়োগ তো করেছিলেনই, নিজেও লাতিন থেকে অ্যাংলো-স্যাক্সন ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন কয়েকটি বই। তার মধ্যে সবচাইতে উল্লেখযোগ্য, দর্শন বিষয়ক একটি বিখ্যাত গ্রন্থ; *Anicius Manlius Severinus Boëthius* বা সাধারণভাবে বোয়েথিয়াস (জ. ৪৮০-মৃ. ৫২৪/৫২৫ খ্রি.) নামে পরিচিত রোমান দার্শনিকের *Consolation of Philosophy*; মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত দার্শনিক যেখানে কারাগারে বসে লিখে রেখে গেছেন ভাগ্য, মৃত্যু এবং অন্যান্য প্রসঙ্গ নিয়ে তাঁর চিন্তাভাবনা। (মাত্র সেদিন জানলাম, রাণী প্রথম এলিজাবেথ-ও নাকি অনুবাদ করেছিলেন বইটি)। এছাড়াও রয়েছে পোপ প্রথম গ্রেগরি-র প্যাস্টরাল কেয়ার, এবং অরোসিয়াস-এর *সেভন বুকস অভ্ হিস্ট্রি এগেন্সট দ্য পেগানস*। মনে পড়ছে, ইসলামী স্বর্ণযুগে অনুবাদ আন্দোলনের সূতিকাগার, বাগদাদের 'বায়েত আল হিকমা' বা 'জ্ঞানগৃহের' কথা। খলিফা হারুন অর রশিদ এবং তাঁর পুত্র আল মামুনের আমন্ত্রণে যেখানে সারা বিশ্ব থেকে হাজির হয়েছিলেন বীজগণিত-এর জনক আল খারিযমি-র মতো বিখ্যাত পণ্ডিতেরা, অনূদিত হয়েছিল পারসিক, সিরিয়াক, গ্রীক এবং সংস্কৃত ভাষা থেকে আরবিতে বিভিন্ন বিষয়ের অসংখ্য বই, গ্রন্থাগারে-ও সংগৃহীত হয়েছিল অযুত গ্রন্থ। এর বিপরীতে কী চিত্র এখানে? আমাদের দেশে হবে...?

অথচ কোনো জাতির সাহিত্যের ইতিহাস অথবা সাধারণ ইতিহাস রচনার সময় সে-ভাষায় অনূদিত সাহিত্যের ইতিহাস-ও অন্তর্ভুক্ত থাকা উচিত। ইতামার বলছেন

It is necessary to include translated literature in the polysystem.

> This is rarely done, but no observer of the history of any literature can avoid recognizing as an important fact the impact of translations and their role in the synchrony and diachrony of a certain literature.

এবার অনুবাদ পদ্ধতি নিয়ে দুটো কথা। অন্যদের কথা জানি না ঠিক, কিন্তু আমার মধ্যে একটা গোঁ কাজ করে অনুবাদ করার সময়; যে-কারণে, আমার ধারণা, অনুবাদ অনেক সময় আড়ষ্ট বা আক্ষরিক মনে হয়। অনুবাদকে যতোই অ-সৃজনশীল কাজ বলা হোক না কেন, যে-কোনো সৃজনশীল কাজের মতো এটাতে-ও কিছু চ্যালেঞ্জ আছে। একজন লেখকের রচনাকে অন্য ভাষায় প্রকাশ করার সময় যখন কোনো বাক্য 'উদ্দিষ্ট ভাষা'য় (ইঙ্গ শব্দবন্ধ বা ফ্রেয 'টারগেট ল্যাঙ্গুয়েজ'-এর কেজো বাংলা হলো এটা, পাঠক?) আমদানি করতে গিয়ে বোঝা যায় সেটাকে বাগে আনা যাচ্ছে না তখন একটা রোখ চেপে যায় মাথায়, মূল বাক্যটিকে আস্ত রেখেই বাংলা ভাষায় সেটার স্থানান্তর করার জন্য। না পারা গেলে একটা ব্যর্থতাবোধ কাজ করে। আর তখন জোর করতে গেলেই ঘটে ছন্দপতন। অনুবাদ অ-পাঠ যোগ্য হওয়ার এটাই যে সবচাইতে বড় কারণ তা নয়। তবে একটি বড় কারণ তো বটেই, অন্তত আমার ক্ষেত্রে। প্রশ্ন উঠতে পারে, বাক্যগুলো ভাঙলে অসুবিধা কোথায়? অসুবিধা এখানে যে, আমার বিবেচনায়, তখন মূল রচয়িতার শৈলীটির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হারিয়ে যায়। তবে অবশ্যই, যখন দেখা যায় বাক্যের দৈর্ঘ্য অক্ষুণ্ন রাখতে গেলে বাংলা ভাষার (পড়ুন, উদ্দিষ্ট ভাষার) মৌলিক বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে গুরুতর সংঘাত অনিবার্য হয়ে ওঠে তখন বাক্যভঙ্গ ছাড়া গত্যন্তর থাকে না।

আসলে, অনুবাদক হওয়াই যখন কপালে ছিল, মধ্যযুগে জন্মালেই ভালো করতাম (অন্তত উমবের্তো একো-র *দ্য নেইম অভ্ দ্য রোয* উপন্যাসটি বুঝতে এবং সেটার অনাড়ষ্ট, ঝরঝরে অনুবাদ করতে সুবিধে হতো খুব)। কারণ তখন ছিল অ্যাডাপ্টেশনের যুগ। ('সেবা প্রকাশনী' কি আমাদের সেই যুগেই ফিরিয়ে নিয়ে গিয়েছে? পাঠক, ভুল বুঝবেন না। আমি সেবা-ভক্ত, অনুবাদের হাতেখড়ি-ও সেবায়।) মধ্যযুগে অনুবাদকদের মুক্তকচ্ছ, স্বাধীন অবস্থার নমুনা দিতে একটা রাশভারী কিতাবের একটি সুলিখিত প্রবন্ধ থেকে উদ্ধৃতি দিই (এরকম কোটেশন না দিলে পাঠক আমার পঠন-পাঠন সম্পর্কে খুব একটা উচ্চ ধারণা পোষণ করবেন না বলে ঘোর আশংকা হচ্ছে)

> Medieval translation, however, was a very different undertaking from modern academic translation. It is more akin towhat we might call "adaptation," a free rendering of an earlier text that concentrate more on what it says than how it says it—more on *matière* or san (to use Chrétien'sterms) than on form. When Chrétien set out to translate a story from Ovid's *Metamorphoses*, as he apparently did in the case of Philomela, he sought to convey not so much the words or the Latin poetic form as the meaning, or import, or—as he would put it—the *san*

of the original. He did not hesitate to add anachronistic touches to make the text more comprehensible and enjoyable to his courtly patrons, or even to include entire developments that were not in Ovid. Yet I venture to say he still considered his work a "translation" of the Latin original. Similarly, modern "literary" translators such as Ezra Pound, Stuart Merrill, or Kenneth Rexroth seek not so much to reproduce the exact words or images or poetic patterns of the originals they translate as to convey the mood, or feeling, or tone of the original.

(Chrétien de Troyes দ্বাদশ শতকের ফরাসী কবি। রাজা আর্থার বিষয়ক তাঁর রচনাসমগ্র মধ্যযুগীয় সাহিত্যের সেরাগুলোর অন্যতম। আর *Yvain, le Chevalier au Lione* বা *Yvain, the Knight of the Lion* রোমান-এ ব্যবহৃত তাঁর বর্ণনা-কাঠামো আধুনিক উপন্যাসের দিকে একটি পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত।

matière: যে মূল বস্তু দিয়ে কোনো কিছু তৈরি)

(*Translation Theory and Practice in the Middle Ages* edited by Jeanette Beer; Western Michigan University; 1997)

কিন্তু মধ্যযুগে জন্মাইনি বলেই কি পরাধীনতা মেনে নিতে হবে! ১৯৯৫ সালে 'রাউটেলেজ' থেকে বের হওয়া *দ্য ট্রান্সলেটর'স ইনভিযিবিলিটি: আ হিস্ট্রি অভ্ ট্রান্সলেশন* বইটির লেখক লরেন্স ভেনুটি বলছেন, অন্তত ইঙ্গ-মার্কিন সংস্কৃতিতে বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের শুরু পর্যন্ত অন্তত অনুবাদ এবং অনুবাদকদের হাল-হকিকত দেখলে সেটিই তাঁদের নিয়তি বলে ধরে নেয়া বিচিত্র কিছু নয়। (www.forvo.com, যারা দাবি করে তারা পৃথিবীর যাবতীয় শব্দের উচ্চারণ বাতলে দিতে পারে, তাদের বরাত দিয়ে জানাচ্ছি খটমটে Routledge বানানের ব্রিটিশ প্রকাশনা সংস্থাটির নামের উচ্চারণ এটাই) অনুবাদক প্রায়ই চেষ্টা করতেন তাঁর কাজে নিজেকে পুরোপুরি আড়াল করে রাখতে। অনুবাদটি যতদূর সম্ভব স্বচ্ছন্দ করার দিকেই তাঁদের মনোযোগ নিবদ্ধ থাকত সবচাইতে বেশি, যাতে সেটিকে অনুবাদ বলে মনে না হয়, মনে হয় মূল গ্রন্থ-ই। ভেবে দেখলে বিষয়টি একটু আশ্চর্য বলেই মনে হয় না কি? খাবেন আমসত্ত্ব, কিন্তু আপনার মনোবাঞ্ছা হচ্ছে সেটিকে হতে হবে আমের মতো। ভেনুটি বলছেন, সমালোচক বা গ্রন্থালোচক কোনো অনুবাদ গ্রন্থের আলোচনায় সেটার মানোত্তীর্ণ হওয়ার সবচাইতে বড় মাপকাঠি হিসেবে যা বিবেচনা করেন তা হচ্ছে অনুবাদটির স্বচ্ছন্দ বা চলতি বাংলায় ঝরঝরে হওয়া। পাঠকের-ও তাই অভিমত, আর তার ফলে অনুবাদকের-ও। বইটির লেখক লরেন্স ভেনুটি-র অবশ্য ভিন্ন মত তাঁর কথা হচ্ছে, যে-কথা বেশ বিতর্কের জন্ম দিয়েছিল, অনুবাদের 'স্বচ্ছন্দকরণ' বা 'domestication' এর বদলে দরকার 'অনুবাদের অপরিচিতকরণ' বা 'foreignizing translation' এবং 'অপব্যবহারমূলক বিশ্বস্ততা' বা 'abusive fidelity'। এরা কী বস্তু? অনুবাদবিদ্যা বা ট্রান্সলেশন স্টাডিয-এর এক দিকপাল এডুইন জেন্টযলার-এর *কন্টেম্পোরারি ট্রান্সলেশন থিয়োরিয* বই থেকে দুটো বাক্য তুলে দিচ্ছি

By foreignizing he (Lawrence Venuti) means any translation

> strategy that resists domestication, fluency, and transparency. By abusive fidelity he means much the same thing: translator seeks to reproduce those very features of the foreign text that 'abuse' or resist the prevailing forms and values in the receiving culture, thereby allowing the translator to be faithful to aspects of the source text, but still participate in effecting cultural change in the target language.

অপরিচিতকরণ, তো বোঝা গেল, কার কাছে অপরিচিত হিসেবে তুলে ধরা? পাঠকের কাছে। উদাহরণ? আমার বোধ-বুদ্ধি অনুযায়ী একটা দিচ্ছি। লাতিন আমেরিকায় 'সিয়েস্তা' বলে একটা কথা প্রচলিত আছে। যার মানে হলো, দুপুরের খাওয়ার পর খানিকটা সময়ের জন্যে দেয়া ঘুম। এখন অনুবাদের সময় হুবহু 'সিয়েস্তা' শব্দটি ব্যবহার করার অর্থ অনুবাদক অপরিচিতকরণ পদ্ধতি অবলম্বন করলেন। যদি তিনি আমাদের পরিচিত 'ভাতঘুম' বা 'দিবানিদ্রা' শব্দ ব্যবহার করেন, তাহলে, তা হবে, ডমেস্টিকেশন—স্বচ্ছন্দকরণ। অপরিচিতকরণের ফলে মূল টেক্সট-এর প্রতি বিশ্বস্ত যেমন থাকা যাচ্ছে, তেমনি উদ্দিষ্ট ভাষার বিদ্যমান সংস্কৃতির মূল্যবোধ এবং কাঠামোতে খানিকটা পরিবর্তন আনা যাচ্ছে। বলাই বাহুল্য, অনেকেই এই পদ্ধতির বিরোধিতা করেছেন কারণ অনুবাদে এই পদ্ধতির অনুসরণ পাঠকের জন্যে বেশ অসুবিধাজনক, অস্বস্তিকর।

প্রসঙ্গত মনে পড়ল অনুবাদের আরেক পদ্ধতির কথা আগে মূল রচনাটি পুরো না পড়ে পড়তে পড়তে অনুবাদ করে চলা। গ্রহণযোগ্য মনে হচ্ছে না তো? বাংলাদেশের অনুবাদকদের মধ্যে এটি নাকি খুব চালু পদ্ধতি। তাদের জন্য শিখণ্ডী হিসেবে অন্তত একজন অনুবাদকের নাম বলতে পারি যিনি কখনো-সখনো এ-পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন। নিরীহ ভদ্রলোকটির নাম গ্রেগরি রাবাসা।

বেছে বেছে 'কঠিন' বই অনুবাদ করি বলে পাঠকমহলে আমার কুখ্যাতি আছে। 'কঠিন' বই রচনার বা অনুবাদ করার একটি সুবিধের দিক হলো, মানুষ বেশি ঘাঁটাতে ভয় পায়। এ-প্রসঙ্গে কেন যেন উলঙ্গ রাজার গল্পটি মনে পড়ল। কোথাও কি এই দুয়ের মধ্যে, মানে বলতে চাইছি, কঠিন কিতাব রচনা বা তরজমা, আর কেবল জ্ঞানী বা ভালো বা সুরুচিসম্পন্ন মানুষই রাজার অনিন্দ্যসুন্দর পোশাকটি দেখতে পাবে, এই ফতোয়া জারির মধ্যে কোনো সু-সম্পর্ক বা সৌহার্দ্য আছে? আমার তা মনে হয় না। পাঠক, আপনার?

১লা ফেব্রুয়ারি, ২০১০ — জি এইচ হাবীব

ভূমিকা

ইংরেজিতে যাকে ফিলসফি বলা হয়, বাংলায় আমরা সেটাকে বলি দর্শন, বা আরও একটু বিশদ করে, দর্শনশাস্ত্র। এর বিষয়বস্তু যদি নিছক দেখা বা দৃষ্টিপাতের ব্যাপার হতো তাহলে তা মানুষের সাধারণ জ্ঞানের আওতার খুব কাছাকাছি এসে যেত। আসলে দর্শন কেবল দৃকপাতের বা অবলোকনের ব্যাপার নয়। সাদামাটা দেখা নয়। যদি বলি মনঃসংযোগে দেখা তবে প্রশ্ন উঠবে চোখ তো দেহের অংশ, মন আবার কী? দেহ-মনের সম্পর্ক কী? যা দেখি সত্যিই কি তার কোনো অস্তিত্ব আছে, নাকি সকলই মায়া, 'অলীক ছায়া'? যে-বিশ্বপ্রকৃতি আমরা দৃশ্যমান বলে ভাবছি সেটা আছে কেন? এর উদ্দেশ্য কী? এটা এলোই বা কোথা থেকে? এর কি কোনো শুরু বা শেষ আছে? প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক কী? এ-সম্পর্ক কী ধরনের হওয়া উচিত? এটা ঠিক করবে কে? জীবনের কোনো মানে আছে? কীভাবে জীবনযাপন করা উচিত? জানা ব্যাপারটা আসলে কী? সবকিছু কি জানা যায়? কীভাবে জ্ঞানলাভ করলে তা বিশ্বাসযোগ্য হয়? জানার সঙ্গে বিশ্বাসের সম্পর্ক কী? কোনো অতীন্দ্রিয় সত্তায় বিশ্বাস করাটা কি জ্ঞানের পূর্বশর্ত? সত্য কী? সত্যের কি বিভিন্ন স্তর থাকতে পারে? যদি থাকে তাহলে পরম সত্য কী?

এ-ধরনের হাজারো প্রশ্ন আমাদের কালের অনেকের মনে আসতে পারে। অতীতেও এসেছিল। সকলের মনে নয়, কেবল অল্পসংখ্যক লোকের মনে, কারণ বেশিরভাগ লোকেরই সময় উজাড় হতো বাঁচার লড়াই করতে। দৈনন্দিন জীবনযাত্রার সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্পর্কযুক্ত এ-প্রশ্নগুলো নিয়ে ভাবার কোনো অবকাশ তাদের ছিল না। আর যাদের ছিল তাদের অল্পসংখ্যকই এগুলোর প্রতি আগ্রহী ও উৎসুক ছিল, এ-সব বোঝার চেষ্টা করত। বলা যায়, এই ঔৎসুক্য বা বিস্ময়াহত হওয়া থেকে বোঝার চেষ্টা এবং তা থেকে দার্শনিক চিন্তার শুরু। শুরু ঠিকই, কিন্তু একই সঙ্গে সব প্রশ্ন নিয়ে নয়, কিংবা কোনো বিশেষ যুগে একই প্রশ্নের উত্তর একই রকমের ছিল না, জানার পদ্ধতিও ছিল বিভিন্ন। সেই শুরু থেকে দার্শনিক প্রশ্নের উত্থাপন ও সমাধান খোঁজার চেষ্টার আজো বিরাম নেই। জ্ঞান-বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে দর্শন-জিজ্ঞাসার ক্ষেত্র যেমন সংকুচিত হয়েছে, অন্যদিকে নতুন নতুন দার্শনিক প্রশ্নের উদ্ভবও হয়েছে। নীতিশাস্ত্র, রাজনীতিবিজ্ঞান, মনস্তত্ত্ব, প্রকৃতিবিজ্ঞান এসবের উদ্ভব ও বিকাশ দার্শনিক চিন্তা থেকেই; এর ফলে দর্শনশাস্ত্রের ধ্রুপদী এলাকা সংকুচিত হয়েছে; কিন্তু এটা দর্শনের সাফল্যের স্বাক্ষর, ব্যর্থতার নিদর্শন নয়। কারণ দর্শনচিন্তা নতুন উদ্যমে কেন্দ্রীভূত হয়েছে সেই এলাকার দিকে যা এখনো জানা বা অসম্পূর্ণভাবে জানা। সব জানা হয়ে

গেলে কি তাহলে দর্শনশাস্ত্র বিলুপ্ত হয়ে যাবে? কেউ কেউ তা মনে করেন বটে; কিন্তু এমন সময় কি আসবে যখন সব কিছুই জানা হয়ে যাবে? এ প্রশ্নের উত্তরও অজানা। তাছাড়া, যা জানা সম্ভব তা জানা হয়ে গেলেও জানা বিষয়গুলোকে সমন্বিত ও সুসংহত করার কাজে দর্শনের যে মূল ভূমিকা তা থাকবে। ভালো-মন্দ, সৎ-অসৎ, শৃঙ্খলা-বিশৃঙ্খলা, দয়া-নিষ্ঠুরতা, স্বাধীনতা-অধীনতা, এসব প্রশ্নের উত্তর তো প্রকৃতিবিজ্ঞান থেকে আসবে না। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আছে ঠিকই, কিন্তু কেন আছে তা জানার জন্য দার্শনিকদেরই মাথা ঘামাতে হবে; বিজ্ঞানের পদ্ধতিতে এ প্রশ্নের উত্তর মেলার সুযোগ নেই।

দর্শনশাস্ত্র যে-প্রশ্নগুলোকে ঘিরে সেগুলো যে জটিল তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এবং এতসব গোলমেলে প্রশ্ন নিয়ে মাথা না ঘামালেও আমাদের জীবনযাপনের গতানুগতিক আরাম-আয়েশের তেমন কোনো ব্যাঘাত ঘটে না। তবু এটা স্বীকার করতেই হয় যে আমাদের অনেকের মধ্যেই বিস্মিত হওয়ার ক্ষমতা আছে, দার্শনিকের ঔৎসুক্য আছে, চিন্তার বিকাশের ইতিহাস জানার ইচ্ছে আছে, অথচ দর্শনের বিশেষজ্ঞসুলভ জ্ঞানলাভের ইচ্ছা বা প্রয়োজন কোনোটাই নেই। এই সমস্যার প্রথাগত সমাধান হচ্ছে এমন গ্রন্থ রচনা করা যা সাধারণ পাঠককে এসব বিষয়ের সারাৎসার পরিবেশন করবে। এদেরকে সাধারণত লোকপ্রিয় বা পপুলার গ্রন্থ বলা হয়। সংশ্লিষ্ট বিষয়ের কোনো কোনো বিশেষজ্ঞ এগুলো পছন্দ না করলেও (অতিসরলীকরণের যুক্তিতে), এদের অবদান অনস্বীকার্য। এ ধরনের বই দর্শনশাস্ত্রের জন্যেও আছে; উইল ডুরান্টের *দ্য স্টোরি অব ফিলসফি* এর একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ হতে পারে। কিন্তু এখানে আমাদের আলোচ্য বইটি একেবারে ভিন্ন ধরনের। বইটির নাম *সোফির জগৎ*। লেখক নরওয়ের লোক ইয়স্তাইন গোর্ডার। অনেকদিন দর্শনশাস্ত্র পড়িয়েছেন এবং কাজটা যে তিনি খুবই সার্থকভাবে সম্পন্ন করছেন তা বইটা পড়লে সহজেই বোঝা যায়।

বইটির বিষয়, লেখকের কথায়, দর্শনের ইতিহাস। এই ইতিহাস পরিবেশনের যে আঙ্গিক বা পদ্ধতি তিনি ব্যবহার করেছেন তা অনেকটা উপন্যাসের মতো, কিছুটা রহস্যোপন্যাসের মতোও বলা যায়। এটি যদি উপন্যাস হয়ে থাকে, তবে এর দুই প্রধান চরিত্র—সোফি অ্যামুন্ডসেন ও অ্যালবার্টো নক্স। সোফি কিশোরী স্কুলছাত্রী এবং অ্যালবার্টো দার্শনিক। দার্শনিক প্রথমে নিজের পরিচয় গোপন রেখে সোফির ডাকবাক্সে চিঠি রেখে যেতেন। সে চিঠিতে থাকত একাধিক প্রশ্ন যেমন—কে তুমি? পৃথিবীটা কোত্থেকে এলো? প্রথমে সোফি এসব প্রশ্ন পেয়ে হকচকিয়ে যেত। প্রশ্নগুলোর যে আরও কোনো গুরুত্ব আছে তা সোফির কখনো মনে হয়নি। চিঠির পর চিঠিতে আসে কয়েকটি সরল অথচ আলোড়নকারী প্রশ্ন আর সোফি ভেবে অস্থির হয়; অনেক সময় আগামাথা কিছুই বুঝতে পারে না; কোনো সময় বিভিন্ন সম্ভাব্য উত্তর উঁকিঝুঁকি দেয় তার মাথায়; চাপা উত্তেজনা সৃষ্টি হয় মনের মধ্যে, যার প্রভাব পড়ে সোফির প্রাত্যহিক আচরণে। কিন্তু উত্তেজনার অবসান ঘটিয়ে পরে চিঠি আসে প্রশ্নের জবাব নিয়ে; সেইসঙ্গে আসে নতুন চিঠি, অনিবার্যভাবে নতুন উত্তেজনা। এভাবে চলতে থাকে দর্শনের পাঠ। একবার চিঠির বদলে আসে ভিডিও টেপ, তাতে দার্শনিকের সংলাপসহ থাকে দার্শনিক ভাব বিকাশের প্রাচীন পাদপীঠ প্রাচীন গ্রীসের অ্যাক্রোপলিস প্রসঙ্গ।

সোফির মনোযোগ সংরক্ষণের আরও নানাবিধ কৌশল লেখক খুবই সফলভাবে প্রয়োগ করেছেন বইটিতে।

দার্শনিক ভাবনা-চিন্তার ক্রমবিকাশের বিবরণ ও ব্যাখ্যান-এর কালব্যাপ্তিতে খুব বেশি আপস করেননি লেখক। প্রাথমিক গ্রিক দার্শনিক চিন্তার সময় থেকে আধুনিককাল। বস্তুগত জগতের ব্যাখ্যা থেকে শুরু করে গ্রিক দর্শনভাবনা কীভাবে ক্রমে মানুষের প্রতি নিবদ্ধ হলো, বিশেষ করে সোফিস্ট ও সক্রেটিসের আমলে, তা সহজবোধ্য উদাহরণসহ সোফিকে বোঝানোর চেষ্টা দেখতে পাই বইয়ের শুরুতে। এরই সূত্র ধরে এসেছে প্রাচীনকালের দুই দিকপাল দার্শনিক, প্লেটো ও এরিস্টটলের কথা, যাতে একদিকে রয়েছে যেমন বাস্তবতার অধিবিদ্যা সংক্রান্ত সমস্যাগুলো, তেমনি অন্যদিকে রয়েছে মানুষের জ্ঞান, আচরণ ও বিশ্বব্যবস্থায় মানুষের স্থান সম্পর্কিত সমস্যাসমূহ। এরিস্টটল-পরবর্তী যে দৃশ্যপট আলেকজান্দ্রিয়া, এথেন্স ও রোমকে আশ্রয় করে তাতে ব্যাখ্যা করা হয়েছে এপিকিউরিয়ান ও স্টোয়িক দার্শনিকদের চিন্তার কথা। এখানে মূল প্রশ্ন যুক্তিসিদ্ধ আচরণের উদ্দেশ্য কী? এপিকিউরিয়ানদের জন্য এর উত্তর সুখের সন্ধান, স্টোয়িকদের জন্য সদগুণাশ্রয়ী জীবনযাপন। গ্রিক দর্শন প্রাচ্যের ধর্মমতসমূহের সংস্পর্শে আসার পর যে ধর্মতাত্ত্বিক আন্দোলন আলেকজান্দ্রিয়ায় দেখা দেয় এবং যার পরিণতিতে নব্যপ্লেটোনিজম (সংক্ষেপে, ঈশ্বরই সমস্ত সত্তার উৎস ও লক্ষ্য), তা-ও সোফিকে বোঝানো হয়েছে।

এভাবে, কোথাও সংক্ষেপে কোথাও বিশদভাবে মধ্যযুগের দর্শন, রেনেসাঁ ও বারোক যুগের সঙ্গে সোফির সম্যক পরিচয় ঘটিয়ে দার্শনিক তাকে নিয়ে আসেন আধুনিক দর্শনের জন্মদাতা বলে খ্যাত দেকার্তের আলোচনায়। দেকার্ত দার্শনিক অনুসন্ধানের যে পদ্ধতি গ্রহণ করার ওপর জোর দিয়েছিলেন তা বুঝতে স্বভাবতই সোফির অসুবিধা হয়েছিল; কিন্তু দার্শনিক খুব সহজে উপমা দিয়ে ব্যাখ্যা করার ফলে সোফি এই উক্তির মর্মকথা উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছে। দেকার্তের পর আলোচনা স্বাভাবিকভাবেই গড়িয়ে যায় স্পিনোজার দিকে এবং দেকার্ত ও স্পিনোজার মধ্যকার মতের মিল ও অমিল দুটিই ব্যাখ্যা করেন শিক্ষক-দার্শনিক।

জ্ঞানের উৎস, বৈধতা ও সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে জন লকের আলোচনার পর হিউম, বার্কলে হয়ে আলোচনা কেন্দ্রীভূত হয় কান্টের ওপর। মানবমনের যে জ্ঞানার্জনের ক্ষমতা আছে এ বিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করে আধুনিক দর্শনের যাত্রা শুরু হয়েছিল বটে, কিন্তু ক্রমে যুক্তির মাধ্যমেই যুক্তির কর্তৃত্ব সিংহাসনচ্যুত হবার উপক্রম হয়। কান্ট-এর অনুসন্ধানও সে যুগের সমসাময়িক নানান দার্শনিক ধারা সম্পর্কে, বিশেষ করে সর্বব্যাপী (universal) জ্ঞানের সম্ভাব্যতা, উৎস ও সীমাবদ্ধতা নিয়ে পরবর্তী আলোচনা বেশ দীর্ঘ; কারণ এর পরিসর হেগেল-মার্কস-ফ্রয়েড হয়ে একেবারে Big Bang পর্যন্ত।

বইটির বিশিষ্টতা সম্পর্কে কয়েকটি বিষয় উল্লেখযোগ্য। প্রথমত, এখানে দর্শন আলোচনার পদ্ধতি নাটকের সংলাপের মতো যেমন নয়, তেমনি একেবারে উপন্যাসের চরিত্রচিত্রণের মতো-ও নয়, যদিও শেষোক্ত উপাদানের প্রাধান্যই বেশি। যেহেতু আলোচনার ক্যানভাস খুব বড় তাই দু'ধরনের সরলীকরণের আশ্রয় নিতে হয়েছে লেখককে। এক, অনেক দার্শনিকের ধারণা সবিস্তারে আলোচনা সম্ভব হয়নি। দুই,

কোনো বিশেষ দার্শনিকের চিন্তাধারার সকলদিক (যেমন, নীতিশাস্ত্র, জ্ঞানতত্ত্ব, অধিবিদ্যা, জ্ঞান, বিশ্বাস ও ধর্মসংক্রান্ত বক্তব্য) সমান গুরুত্ব পায়নি। এই দুটো বিষয়ই লেখকের তুলনামূলক গুরুত্ববিচারের ওপর নির্ভরশীল; এবং এ বিচারের যথার্থতা নিয়ে ভিন্নমত থাকতেই পারে। তাছাড়া, একজন কিশোরীকে দর্শন শিক্ষা দিতে গিয়ে দার্শনিককে কোথাও কোথাও অতিকথন ও সরলীকরণের আশ্রয় নিতে হয়েছে। এটাই স্বাভাবিক এবং বিশেষজ্ঞরা যা-ই ভাবুন, এতে সাধারণ পাঠক-পাঠিকার কোনো ক্ষতি হবে বলে মনে হয় না। তৃতীয়ত বইটি মূলত পাশ্চাত্য দর্শনের ও অংশত পাশ্চাত্য ইতিহাস; তাই দর্শনের ইতিহাস হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ অর্থেই অসম্পূর্ণ। উদাহরণস্বরূপ, এতে চীনা ও ভারতীয় সংস্কৃতির উল্লেখ নেই বললেই চলে। সক্রেটিসের আলোচনা প্রসঙ্গে লাও-জে, কনফুসিয়াস, বুদ্ধ বা শংকরের নাম স্বাভাবিকভাবেই আসতে পারত। তবে মনে রাখা দরকার, দর্শনের ইতিহাস লিখতে গিয়ে আরও অনেক পাশ্চাত্য লেখকই এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছেন। সবশেষে মনে রাখতে হবে, বইটি ইংরেজি অনুবাদ থেকে বাংলায় ভাষান্তর এবং মূল বইটি নরওয়েজীয় ভাষায় লেখা। অনেক বিমূর্ত ধারণার বাংলা প্রতিশব্দ বের করতে অনুবাদককে যথেষ্ট সংগ্রাম করতে হয়েছে, তা সত্ত্বেও কোথাও কোথাও যে অস্পষ্টতা রয়েছে তার উৎস প্রধানত দার্শনিক তত্ত্বের জটিলতা। তারপরেও, অনুবাদ সহজ, সরল ও সাবলীল হয়েছে।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস বইটি বাংলাভাষী পাঠক-পাঠিকারা আগ্রহভরে, সম্ভবত তন্ময়তাসহ, পড়বেন এবং পড়ে উপকৃত হবেন।

৪ঠা ফেব্রুয়ারি, ২০০২

অধ্যাপক ড. হরেন্দ্রকান্তি দে
অর্থনীতি বিভাগ
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

অনুবাদকের নিবেদন

স্বীকার করতে কুণ্ঠা নেই, ছাত্রজীবনে অন্য অনেকের মতোই আমার মনেও পূর্ব-সংস্কারবশত দর্শন সম্পর্কে খানিকটা ভীতি কাজ করতো। বক্তব্যটি আরও যথাযথ হবে যদি বলি, দর্শনকে একটি সশ্রদ্ধ ভীতিপূর্ণ দৃষ্টিতে দেখতেই অভ্যস্ত ছিলাম তখন। ইংরেজি সাহিত্যপাঠে দর্শন অত্যন্ত সহায়ক ভূমিকা রাখবে, শিক্ষকদের এই উপদেশও সেই অমূলক ভীতি দূর করতে পারেনি। (তার ফলও ফলল, পরীক্ষার ফলে।)

এই ভীতি কাটতে থাকে তথাকথিত সেই ছাত্রত্বের অবসান ঘটার পর! বিশেষত, ১৯৯৩ সালে, স্বনামধন্য নীলক্ষেত থেকে চল্লিশ টাকায় ডাবলিউ টি স্টেস-রচিত *এ ক্রিটিকাল হিস্ট্রি অভ গ্রিক ফিলসফি*-র একটি পুরনো কপি এবং ঢাকা নিউ মার্কেটের একটি অভিজাত (?) বই বিপণি থেকে বার্ট্রান্ড রাসেল-এর *হিস্ট্রি অভ ওয়েস্টার্ন ফিলসফি* কেনার পর। অত্যন্ত সহজ-সরল ভাষায় রচিত স্টেস-এর বইটিই মূলত আমাকে উৎসাহী করে তোলে বিষয়টি সম্পর্কে। বাংলা ভাষায় রচিত দর্শনবিষয়ক গ্রন্থ সম্পর্কে আগ্রহ গড়ে ওঠে আরও প্রায় তিন বছর পর দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের *সত্যের সন্ধানে মানুষ* পাওয়ার পর। (দুর্ভাগ্যবশত, এই গ্রন্থটির খোঁজ আমি আমার তথাকথিত ছাত্রজীবনে পাইনি।) তাঁরই সম্পাদিত এবং তিনিসহ আরও পাঁচজন লেখক রচিত আট খণ্ডের *গ্লোবাল ফিলসফি ফর এভরিম্যান* হাতে পাই আরও এক বছর পর। বইটির নামই সেটার সবচেয়ে বড় পরিচয়। এখানে মানুষের দার্শনিক অনুসন্ধানের ইতিবৃত্ত সহজবোধ্য ভাষায় সবার জন্য তুলে ধরা হয়েছে। আমাকে এই সেটটির খোঁজ দেন এবং কিনতে প্রায় বাধ্য করেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক, শ্রদ্ধাভাজন, অসাধারণ গ্রন্থপ্রেমী ও সঙ্গীতরসিক, সুহৃদ জনাব গোলাম মুস্তাফা। এ প্রসঙ্গে বলতে হয় শাহবাগ আজিজ সুপার মার্কেট-এর 'বইপত্র'-সংশ্লিষ্ট শ্রদ্ধেয় জনাব কাজী আরিফের কথাও।

দর্শনশাস্ত্র বিষয়ক যেসব বই আমাকে বিষয়টি সম্পর্কে উৎসাহী করেছে সেগুলোর মধ্যে অন্তত আরও দুটোর কথা উল্লেখ না করলেই নয়। এ-দুটোই লোকপ্রিয় গ্রন্থ। একটি হচ্ছে জন ফারম্যান-এর *A Phenomenally Phrank History of Philosophy* (Frank' শব্দটি লেখক ইচ্ছে করেই, অর্থপূর্ণভাবে 'ভুল' বানানে লিখেছেন।) অন্যটি একটি চটি বই *ব্লাফ ইয়োর ওয়ে ইন ফিলসফি*; লেখক জিম হ্যানকিন্সন। তবে এই দ্বিতীয়টি আসলে বিভিন্ন বিষয়ের ওপর লেখা কিছু চটি বইয়েরই একটি সিরিজের অন্তর্ভুক্ত। এখানে এমন একটি অভিনব ভান করা হচ্ছে যেন লেখক পল্লবগ্রাহিতায় উৎসাহী পাঠককে একটি বিষয় সম্পর্কে ভাসাভাসা কিন্তু একবারেই মূলগত অথবা সাধারণ একটা ধারণা দিয়ে তাকে সাহায্য করতে চান যাতে সেই পাঠক লোকসমক্ষে

নিজেকে ঐ বিষয়ে একজন জ্ঞানী বা যথেষ্ট ওয়াকিবহাল ব্যক্তি হিসেবে প্রতিপন্ন করতে পারেন। কিন্তু সুলিখিত এই বইগুলো সংশ্লিষ্ট বিষয়ের এক ধরনের প্রবেশিকা গ্রন্থ হিসেবেই রচিত বলে আমার ধারণা। অন্যদিকে প্রথমটিতে লেখক দর্শনশাস্ত্রের—বলা ভালো পাশ্চাত্য দর্শনশাস্ত্রের—সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বর্ণনা করেছেন, আমার বিবেচনায়, বেশ দক্ষতার সঙ্গে তবে আসলেই বিস্ময়কর রকমের খোলাখুলিভাবে, যা অনেকের কাছে উপভোগ্য মনে হলেও সংবেদনশীল পাঠক (নারী-পুরুষ উভয়েই) খানিকটা আহত বোধ করতে পারেন। ফারম্যান সঙ্গত কারণেই বলেছেন যে তাঁর বইটি দর্শনের একটি 'Phenomenally Phrank History'।

তবে এসব লোকপ্রিয় গ্রন্থপাঠের আমার দৃষ্টিতে একটি বিপজ্জনক দিক সম্পর্কে পাঠককে (সেই সঙ্গে নিজেকেও) সতর্ক করে দেয়া জরুরি বলে মনে করি। স্বল্পায়তন একটি বা দুটি গ্রন্থে একটি বিষয়ের সারাৎসার পেয়ে যাওয়ায় সে-বিষয়ের গভীরে যাওয়ার ইচ্ছেটি উবে যেতে পারে, বা বিষয়টি সম্পর্কে 'জেনে ফেলার' একটি বোধ মনের গহনে বাসা বাঁধতে পারে। অথচ একটি বিষয় সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানলাভের জন্য এ ধরনের গ্রন্থ কেবল ভূমিকাস্বরূপই কাজ করতে পারে, কারণ, অত্যন্ত সহজেই বোঝা যায় যে, আমরা কোনো বিশেষ দার্শনিকের বা লেখকের লেখা না পড়ে তাঁর কাজের ওপর লেখা আরেকজনের লেখা পড়ছি, অর্থাৎ পরের মুখে ঝাল খাচ্ছি।

সে যা-ই হোক, এরই মাঝে, ১৯৯৬ সালে, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের প্রভাষক আরিফা হাফিজ-এর হাতে একদিন আবিষ্কার করি *সোফি'জ ওয়ার্ল্ড*। বইটি নেড়েচেড়ে দেখে এবং কিছুদিন পর কিনে পড়ে একরকম মুগ্ধই হয়ে যাই। মুগ্ধ হওয়ার পেছনে যথেষ্ট কারণ ছিল বৈকি।

প্রথমত, বইটি উপন্যাসের ছলে লেখা। পাঠকের দরবারে দর্শনশাস্ত্র উপস্থাপন করার আঙ্গিকগত দিক দিয়ে এটাকে একটি অভিনব এবং দুঃসাহসী প্রচেষ্টা বলেই মনে হয়েছে আমার কাছে। (দর্শন বিষয়ক অন্যান্য লোকপ্রিয় গ্রন্থের কোনোটি এভাবে আগে লেখা হয়েছে বলে আমার জানা নেই।) অবশ্য, নরওয়েজীয় ভাষায় লেখা মূল বইটির (Sofies verden, ১৯৯১) ইংরেজি অনুবাদে এটাকে দর্শনের ইতিহাস বিষয়ক উপন্যাস বলে দাবি করা হলেও আসলে এখানে বিধৃত হয়েছে পাশ্চাত্য দর্শনেরই ইতিহাস।

দ্বিতীয়ত, এই উপন্যাসের অন্যতম প্রধান চরিত্র সোফি—যার কাছে দর্শনশাস্ত্রের একটি মোটা দাগের ইতিহাস তুলে ধরা হয়েছে—সে একজন চৌদ্দ বছর বয়েসী কিশোরী। অর্থাৎ লেখককে যতদূর সম্ভব সহজ-সরল এবং প্রাঞ্জল ভাষায় তাঁর বিষয়বস্তুকে উপস্থাপন করতে হয়েছে। তাই, মনে হলো, বিষয়টি বুঝতে আমার মতো বেয়াকুফেরও হয়ত সুবিধা হবে। আর আমার পেশা যেহেতু ইংরেজি সাহিত্য পড়ানো, ফলে আমি এক সময় যা থেকে (নিজের দোষে) বঞ্চিত হয়েছি, আমার ছাত্রছাত্রীরা হয়ত তা পাবে। তাছাড়া, রিচার্ড বাখ্ তো বলেছেনই যে, যার যেটা শেখা সবচেয়ে বেশি দরকার সে সেটাই সবচেয়ে ভালো শেখাতে পারে।

তৃতীয়ত, বইটি মূলত দর্শনের ইতিহাস হলেও আকর্ষণীয়তার স্বার্থে লেখক তাতে শুধু উপন্যাসের আঙ্গিক দিয়েই ক্ষান্ত হননি এর সঙ্গে যুক্ত করেছেন একটি অসাধারণ রহস্যের বাতাবরণ। যদিও সেজন্যে, অন্তত আমার ধারণা, *সোফির জগৎ*-কে প্রচলিত

অর্থে একটি রহস্যোপন্যাস বলা যাবে না মোটেই। লেখকের অবলম্বন করা পদ্ধতি—গল্পের ভেতর গল্প—আগেও অনেক লেখক ব্যবহার করেছেন, কিন্তু আমার ধারণা, এক্ষেত্রেও গার্ডার এক অসাধারণ অভিনবত্বের পরিচয় দিয়েছেন। পাছে পাঠকের রসভঙ্গ হয় সেজন্য সে-বিষয়ে এরচেয়ে বেশি কিছু বলা গেল না।

অবশ্য মুগ্ধতা কাটিয়ে ওঠার পর বইটির সীমাবদ্ধতা যে চোখে পড়েনি তা নয়। এবং তারই দুয়েকটি বিষয় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ড. হরেন্দ্রকান্তি দে আমার অনুবাদের ভূমিকায় উল্লেখ করেছেন। সেইসঙ্গে অবশ্য তিনি মন্তব্য করেছেন যে সেসব সীমাবদ্ধতা বইটির রসাস্বাদনে ও দর্শনশাস্ত্র বিষয়ে কৌতূহলী হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে সাধারণ পাঠকের জন্য বাধা হয়ে দাঁড়াবে না। আমি তাঁর সঙ্গে একমত।

যোগ্যতর কেউ বইটির অনুবাদ করলে বাংলাভাষী পাঠক অনেক অনেক বেশি উপকৃত হতেন সে-কথা অসংকোচে স্বীকার করছি। কথাটা ভুল হলো, আসলে বলা উচিত 'যোগ্য কেউ বইটি অনুবাদ করলে..., কারণ, এ ধরনের বই অনুবাদের যোগ্যতা আমার নেই বলেই আমি মনে করি। (কোন ধরনের বইয়ের অনুবাদের যোগ্যতা আছে সেটাও একটি সঙ্গত প্রশ্ন অবশ্য)। সেক্ষেত্রে এই কৈফিয়ত দেবার দায়ভারও *আমার* ওপরই বর্তায় যে কাজটি আমি কেন করেছি। নিতান্তই ভালোবাসার টানে, অনুবাদের প্রতি, দর্শনের প্রতি, আমার ছাত্রছাত্রীদের প্রতি, বাংলাভাষী পাঠকের প্রতি, এবং সর্বোপরি, বাংলাভাষার প্রতি। এত বড় দাবি যদি কারো কাছে নিতান্তই ঔদ্ধত্যপূর্ণ এবং অশোভন বলে মনে হয়, আমি তাঁর বা তাঁদের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী।

এবার ভিন্ন প্রসঙ্গ। দর্শনশাস্ত্র সম্পর্কিত যে-কোনো বইয়ের বঙ্গানুবাদের বেলায় পরিভাষা সংক্রান্ত একটি সমস্যার সম্মুখীন হওয়া প্রায় অবশ্যম্ভাবী। এক্ষেত্রে আমার প্রধান অবলম্বন ছিল বাংলা একাডেমী-র *দর্শন পরিভাষা কোষ* এবং সরদার ফজলুল করিম রচিত *দর্শন-কোষ*। এছাড়া বিভিন্ন দার্শনিক, বিজ্ঞানী ও লেখকের নামের ক্ষেত্রে মোটামুটি প্রচলিত বানান-ই অনুসরণ করেছি। আর অনুবাদের ক্ষেত্রে লেখকের (নাকি ইংরেজি অনুবাদক পলেট মোলার-এর?) রচনারীতির প্রতি একটি বিশেষ পর্যায় পর্যন্ত থাকতে চেষ্টা করেছি; চেষ্টা করেছি, বাংলায় দর্শনপাঠের ক্ষেত্রে পাঠক সাধারণের মনে যে একটি বাড়তি 'আতংক' রয়েছে তা যেন এই অনুবাদপাঠের সময় তাঁদেরকে স্পর্শ করতে না পারে। সাফল্য-ব্যর্থতা বিচারের ভার পাঠকের ওপর।

এই অনুবাদকর্মটির সঙ্গে অনেকেরই সহযোগিতা জড়িয়ে আছে। ইংরেজি গ্রন্থটি পড়ে আমি যখন সেটার ভাষান্তরের কথা ভাবছি, তখন বইটির বিষয়বস্তুর কথা শুনে বন্ধু, বিশিষ্ট কবি, অনুবাদক রাজু আলাউদ্দিন দৈনিক *বাংলাবাজার পত্রিকা*-য় তাঁর সম্পাদিত ছোটদের পাতা 'হৈ চৈ'-এ সেটা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশের এক দুঃসাহসী প্রস্তাব দেন। আমি তখন গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেস-এর *ওয়ান হান্ড্রেড ইয়ার্স অভ্ সলিচিউড* অনুবাদে রত থাকার পরেও এই অভাবিত সুযোগটি হাতছাড়া করতে মন চাইল না। বিশেষ করে, 'হৈ চৈ'-এর জন্য সপ্তাহে মাত্র এক পাতা বরাদ্দ থাকায় রাজু যখন অভয় দিয়ে বললেন অনুবাদটি ছোট ছোট কিস্তিতে প্রকাশিত হবে তখন মনে নানান সংশয় থাকা সত্ত্বেও প্রস্তাবটি লুফে নিলাম। ১৯৯৭ সালে বেশ কয়েকটি কিস্তিতে *সোফির বিশ্ব* (তখন এই নামটিই আমি ঠিক করেছিলাম) সেই ছোটদের পাতায় প্রকাশিত হলো (তবে সব মিলিয়ে

দুই অধ্যায়ের বেশি নয় সম্ভবত)। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে, রাজু আলাউদ্দিন *বাংলাবাজার* ছেড়ে পত্রিকান্তরে চলে যাওয়ায় (বর্তমানে তিনি মেক্সিকো প্রবাসী) সোফির বিশ্ব থমকে যায়। *ওয়ান হান্ড্রেড ইয়ার্স অভ্ সলিচিউড*-এর বঙ্গানুবাদ *নিঃসঙ্গতার একশ বছর* প্রকাশিত হওয়ার পর যখন আবার *সোফির জগৎ*-এ ফিরে গেছি এমন সময় একদিন চট্টগ্রামেই পরিচয় ঘটে রেজাউল করিম সুমন এবং নাসিরুল ইসলাম জুয়েল নামের দুই সদালাপী বিদ্যোৎসাহী তরুণ লেখক ও সংস্কৃতিসেবীর সঙ্গে। (এঁদের মধ্যে প্রথমজন—তিনি চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত লিটল ম্যাগাজিন *নির্মাণ*-এর সম্পাদকও বটে—নির্ঘণ্ট তৈরির এবং তা যথাসম্ভব নির্ভুল করার অত্যন্ত দায়িত্বপূর্ণ, কঠোর শ্রম ও দীর্ঘ সময় সাপেক্ষ একটি কাজে স্বেচ্ছাপ্রণোদিতভাবে আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করেছেন।) এক পর্যায়ে তাঁরা তাঁদের প্রকাশিতব্য শিল্প ও সাহিত্য বিষয়ক পত্রিকা *উত্তরমেঘ*-এর জন্য একটি গল্পের অনুবাদ দিতে অনুরোধ করেন। আমি তখন *সোফির জগৎ* অনুবাদ নিয়ে ব্যস্ত থাকায় বিনীতভাবে আমার অপারগতা প্রকাশ করে কথাচ্ছলে বইটির কথা বললে তাঁরা সেটা ধারাবাহিকভাবে ছাপার প্রস্তাব দেন। *সোফির জগৎ*-এর প্রথম চারটি অধ্যায় অতএব নাসিরুল ইসলাম জুয়েল সম্পাদিত *উত্তরমেঘ*-এর প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত হয় গত বছর ডিসেম্বরের মাঝামাঝি। পত্রিকার কিছু কপি কিছুদিনের মধ্যেই ঢাকায় পৌঁছালে লেখক বন্ধু অরূপ রাহী শাহবাগের আজিজ সুপার মার্কেটে *সোফির জগৎ*-এর অনুবাদের তথা *উত্তরমেঘ*-এর কথা সোৎসাহে জানাতে থাকেন জনে জনে।

দর্শন-কোষ বইটি আমার ব্যক্তিগত সংগ্রহে ছিল না; সে-কথা চট্টগ্রাম সিটি কলেজের ইংরেজি বিভাগের প্রভাষক, *প্লেটো: দর্শন ও রাষ্ট্রচিন্তা* এবং *অস্তিত্ববাদের স্রষ্টা সোরেন কিয়ের্কেগার্ড* নামক দুটি সুলিখিত বইয়ের রচয়িতা বন্ধু এবং অগ্রজপ্রতীম গোলাম ফারুক তাঁর কপিটি আমাকে ব্যবহার করতে দেন, সেই সঙ্গে উপহারস্বরূপ দেন *নিউ টেস্টামেন্ট*-এর অনুবাদ *নূতন নিয়ম*; এই দুটি গ্রন্থই *সোফির জগৎ* অনুবাদে আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করেছে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক (বর্তমান উচ্চশিক্ষার্থে আমেরিকা প্রবাসী) এ. কে. এম. খায়রুল ইসলাম এই অনুবাদকর্মের ব্যাপারে আমাকে প্রচুর উৎসাহ যুগিয়েছেন। চট্টগ্রামের একটি খ্যাতনামা ইংরেজি ভাষা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 'ইএলসি'-র অন্যতম পরিচালক জনাব দেবপ্রসাদ চক্রবর্তী এবং কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের অর্থনীতি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক বন্ধুবর শওকত আলম আমাকে বিভিন্ন সময়ে নানান কারিগরী সহায়তা প্রদান করেছেন।

আমার শিক্ষক, *কমলপুরাণ ও তিন পুরুষের রাজনীতি* খ্যাত, রফিক কায়সার (মির্জাপুর ক্যাডেট কলেজের বর্তমান অধ্যক্ষ) তাঁর এক অখ্যাত ছাত্রের অনুবাদ কর্ম (*নিঃসঙ্গতার একশ বছর*) কেবল পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পাঠ করেই নয় অনেককেই সেটি কিনে পড়তে উদ্বুদ্ধ করে আমাকে বিস্ময়াভিভূত করেছেন। আমার কাজের প্রতি তাঁর সেই উৎসাহ *সোফির জগৎ* অনুবাদে অসীম চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করেছে।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক নিলুফার সুলতানা আমাকে এই অনুবাদকর্মে যে সস্নেহ উৎসাহ যুগিয়েছেন সে-কথা ভুলবার নয়।

একই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অর্থনীতি বিভাগের শ্রদ্ধাভাজন অধ্যাপক ড. হরেন্দ্রকান্তি দে আমার মতো অভাজনের অনুবাদ কর্মের একটি সংক্ষিপ্ত কিন্তু সারগর্ভ ভূমিকা লিখে

দিয়েছেন তাঁর অমূল্য সময় ব্যয় করে। তাঁর মতো বিদ্যানুরাগী, পণ্ডিত, রসবোধ সম্পন্ন, প্রচারবিমুখ—ফলে স্বভাবতই সাধারণ্যে অপরিচিত—মানুষ অনুবাদটি পাঠ করে সেটার নানান ত্রুটি-বিচ্যুতি ও সে-সবের সম্ভাব্য প্রতিকারের বিষয়ে আমাকে অমূল্য পরামর্শ দিয়েছেন। তারপরেও যে-সব ভুল রয়ে গেল তার দায়ভার সম্পূর্ণই আমার সে-কথা উল্লেখ বাহুল্য মাত্র।

বইটি অনুবাদের এবং প্রকাশের অনুমতি পাওয়ার ব্যাপারে নরওয়ের বিশিষ্ট লেখক ও সুরস্রষ্টা সেতিল বিয়োর্নেস্তা এবং বাংলাদেশকে নিয়ে রচিত তাঁর উপন্যাস *দয়ার (NADE)* অনুবাদক ইন্ডিপেন্ডেন্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক জনাব আনিস পারভেজের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

প্রকাশক ও সুহৃদ জনাব লুৎফর রহমান চৌধুরী আমার মতো অক্ষম অনুবাদকের ওপর নির্ভর করে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এই অবাণিজ্যিক অনুবাদ প্রকাশের দুঃসাহস দেখিয়েছেন। পেশাগত কাজের পাশাপাশি *নিঃসঙ্গতার একশ বছর* এবং *সোফির জগৎ* অনুবাদে আমি ব্যস্ত থাকায় এই বেঘোর পরবাসে (?) সাংসারিক নানান দায়িত্ব সম্পাদনের গুরুভার আমার স্ত্রী নাজমুন্নাহার লাভলি প্রায় একাই বহন করেছে, ফলে তাকে ভীষণ কায়িক ও মানসিক কষ্ট স্বীকার করতে হয়েছে। এছাড়া, পিতা-মাতার জ্যেষ্ঠ সন্তান হওয়ার পরেও আমি এ সময় তাঁদের প্রতি কোনো কর্তব্যই পালন করতে পারিনি। কর্তব্যকর্মে অবহেলা ঘটেছে আমার প্রতি স্নেহশীল শ্বশুর, সাংবাদিক ও মুক্তিযোদ্ধা বিরলপ্রজ ত্যাগীপুরুষ জনাব তোজাম্মল আলী এবং মমতাময়ী শাশুড়ি বেগম রেবা আলীর প্রতিও। এই অপরাধের ক্ষমা নেই জেনেও আমি তাঁদের সবার কাছে ক্ষমাপ্রার্থী। বলতে হয় আমার দুই শিশু সন্তান অনিন্দ্য ও মীম-এর প্রতি পিতা হিসেবে আমার কর্তব্যে অবহেলার কথাও। এই দুই অনুবাদকর্মে জি এইচ হাবীব জড়িত না হলে তারা তাদের বাবার যত্ন ও মনোযোগ আরও বেশি করে পেত, তাদের অনেক আবদার তাদের বাবা মেটাতে সক্ষম হতো। তারাও কি আমাকে ক্ষমা করবে? তারা কি প্রশ্ন করবে, এ-সাহিত্যকর্মের মূল্য কী?

উল্লিখিত সবার কাছে আমি যারপরনাই কৃতজ্ঞ। আমার মতো 'অকৃতী অধম'-এর প্রতি তাঁদের অকৃপণ ভালোবাসা, প্রশ্রয় ও সহায়তা ছাড়া এই অনুবাদকর্ম সম্পাদন অসাধ্য ছিল। এ-ঋণ অপরিশোধ্য।

পরিশেষে, কিছু গুরুতর মুদ্রণ প্রমাদের কথা বলতেই হচ্ছে। মুদ্রণপ্রমাদ এড়ানো যথাসাধ্য চেষ্টা সত্ত্বেও আরও ছোটখাটো ভুল হয়তো রয়ে গেল; আশা করি পরবর্তী সংস্করণে সেগুলো দূর করা সম্ভব হবে। অন্যান্য ভ্রান্তি নিরসনও সহজ হবে পাঠকের সুচিন্তিত ও গঠনমূলক মতামত ও পরামর্শ পেলে। এ ব্যাপারে আমি তাঁদের সাহায্য কামনা করছি। এই মামুলি অনুবাদও যদি দর্শনের প্রতি তাঁদের আগ্রহ সৃষ্টিতে বা বৃদ্ধিতে এতটুকু অবদান রাখে তাহলে কৃতার্থ বোধ করবো।

জি এইচ হাবীব
বহদ্দারহাট, চট্টগ্রাম

ফেব্রুয়ারি, ২০০২

তিন হাজার বছরে যে কাজে লাগাতে পারে না
তার জীবন অর্থহীন

— গ্যেটে

সূচিপত্র

কৃতজ্ঞতা

সিরি ডানেভিগ-এর সহায়তা ও উৎসাহ ছাড়া এ-গ্রন্থরচনা সম্ভব হতো না। পাণ্ডুলিপি পাঠ ও গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্যের জন্যে মাইকেল ইমস্-কেও ধন্যবাদ, সেই সঙ্গে ধন্যবাদ ট্রিভ বার্গ এরিকসেন-কে তাঁর দীর্ঘদিনের তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ ও বুদ্ধিদীপ্ত সহযোগিতার জন্যে।

ই. গো.

ন ন্দ ন কা ন ন

ছয়ে

...কোনো এক পর্যায়ে কোনো একটা কিছু নিশ্চয়ই শূন্য থেকে সৃষ্টি হয়েছিল...

স্কুল থেকে বাসায় ফিরছে সোফি অ্যামুন্ডসেন। প্রথমে, খানিকটা পথ, জোয়ানার সঙ্গে হাঁটছিল সে। রোবট নিয়ে কথা বলছিল ওরা। জোয়ানার ধারণা, মানব-মস্তিষ্ক উন্নত একটা কম্পিউটারের মতো। সোফি ঠিক সায় দিতে পারছিল না ওর কথায়। মানুষ নিশ্চয়ই স্রেফ এক টুকরো হার্ডওয়্যার নয়?

সুপারমার্কেট পর্যন্ত এসে দু'জন যার যার পথ ধরল। এলোমেলোভাবে ছড়িয়ে পড়া একটা শহরতলির প্রান্তে থাকে সোফি, জোয়ানার বাসা থেকে স্কুলের দূরত্বের দ্বিগুণ দূরত্বে। ওর বাগানের পরে আর কোনো বাড়ি নেই। আর তাতে করে মনে হয় ওর বাসা যেন পৃথিবীর একেবারে শেষ প্রান্তে। এখান থেকেই বনের শুরু।

মোড় ঘুরে ক্লোভার ক্লোজে পড়ল সোফি। রাস্তাটার শেষ মাথাটা হঠাৎ বেঁকে গেছে। উইকেন্ড ছাড়া লোকজন খুব একটা যায় না ওদিকে।

মে মাস শুরু হয়েছে মাত্র। ড্যাফোডিলের ঘন ঝাড়গুলো ফলের গাছগুলোকে ঘিরে আছে কিছু কিছু বাগানে। বার্চ গাছে এরই মধ্যে দেখা দিয়েছে হালকা সবুজ পাতা।

বছরের এই সময়টাতে সবকিছু যে কীভাবে এক সঙ্গে প্রাণ পেয়ে ওঠে তা সত্যি আশ্চর্যের! উষ্ণতা পেলেই আর তুষারের শেষ চিহ্ন অদৃশ্য হয়ে যেতেই প্রাণহীন মাটির ভেতর থেকে সবুজ গাছপালার এই দঙ্গল লকলকিয়ে ওঠে কেন?

বাগানের গেটটা খুলে চিঠির বাক্সে উঁকি দিল সোফি। সাধারণত বেশ কিছু সাদামাটা চিঠিপত্র আর কয়েকটা বড়সড় খাম থাকে তার মায়ের জন্যে, সেগুলো সে রান্নাঘরের টেবিলে ডাঁই করে ফেলে রেখে তার কামরায় উঠে যায় হোমওয়ার্ক শুরু করতে।

মাঝে মধ্যে কিছু চিঠি আসে তার বাবার কাছে, ব্যাংক থেকে। কিন্তু তাই বলে ভাববার কোনো কারণ নেই যে তার বাবা আর দশজন বাবার মতো সাধারণ কোনো লোক। একটা বড় অয়েল ট্যাংকারের ক্যাপ্টেন তিনি, বছরের বেশির ভাগ সময় বাড়ির বাইরেই কাটান। অল্প যে ক'টা হপ্তা তিনি একটানা বাড়িতে থাকেন, সোফি আর তার মায়ের জন্য বাড়িটাকে সুন্দর ও আরামদায়ক করার কাজেই ব্যয় করেন সময়টা। কিন্তু যখন সমুদ্রে থাকেন, তখন তাঁকে যেন খুব দূরের মানুষ বলে মনে হয়। চিঠির বাক্সে মাত্র একটা চিঠি এবং সেটা সোফির জন্যে। সাদা খামটার ওপর লেখা 'সোফি

অ্যামুন্ডসেন, ৩ ক্লোভার ক্লোজ।' ব্যাস, এই। কে পাঠিয়েছে তা লেখা নেই। এমনকি কোনো ডাকটিকেটও নেই খামটার ওপর।

গেটটা বন্ধ করে দিয়ে খামটা খুলল সোফি। মাত্র এক টুকরো কাগজ সেটার ভেতর, খামের চেয়ে কোনোভাবেই বড় হবে না সেটা। তাতে লেখা *কে তুমি?*

কেবল এই দুটো শব্দ আর কিছু না, হাতে লেখা, শেষে একটা বড় প্রশ্নবোধক চিহ্ন। আবার তাকাল সোফি খামটার দিকে। চিঠিটা যে তার কাছেই লেখা তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু কে রাখতে পারে ওটা চিঠির বাক্সে?

দ্রুত লাল বাড়িটার ভেতর ঢুকে পড়ে সোফি। সে দরজা বন্ধ করার আগেই তার বেড়াল শিয়ার্কান বরাবরের মতো ঝোপের ভেতর থেকে বেরিয়ে, সামনের সিঁড়িতে লাফ দিয়ে পড়ে চট করে ঢুকে পড়ল ভেতরে।

মনমেজাজ খারাপ থাকলে সোফির মা বাড়িটাকে বলেন 'মিনেজারি'; মিনেজারি হচ্ছে পশুপাখির একটা সংগ্রহ। সোফির একটা মিনেজারি আছে এবং সেটা নিয়ে সে বেশ সন্তুষ্টও বটে। তিনটে গোল্ডফিশ নিয়ে শুরু হয়েছিল সংগ্রহটা—গোল্ডটপ, রেড রাইডিংহুড আর ব্ল্যাকজ্যাক। এরপর সে পায় স্মিট আর স্মিউল নামের দুটো বাজারিগার[১], তারপর কচ্ছপ গোবিন্দ আর সব শেষে মার্মালেড বেড়াল শিয়ার্কান। সোফির মা শেষ বিকেলের আগে কাজ থেকে বাড়ি ফেরেন না আর জাহাজে চেপে সারা দুনিয়া ঘুরে বেড়ানোর কাজে তার বাবা বড্ড বেশি বাড়ির বাইরে থাকেন বলে ক্ষতিপূরণ হিসেবে তাকে দেয়া হয়েছে এই জন্তুগুলো।

স্কুল ব্যাগটা মেঝেতে ছুঁড়ে ফেলল সোফি, তারপর শিয়ার্কানের জন্য বের করল এক বাটি বেড়ালের খাবার। এরপর সে রান্নাঘরের একটা টুলের ওপর বসে পড়ল রহস্যময় চিঠিটা হাতে নিয়ে।

কে তুমি?

সোফির কোনো ধারণা নেই। অবশ্যই সে সোফি অ্যামুন্ডসেন, কিন্তু কে সে? ব্যাপারটা সে আসলে ভেবে দেখেনি, অন্তত এখন পর্যন্ত।

তাকে একটা অন্য নাম দেয়া হলে কী হতো? ধরা যাক, অ্যানি নুটসেন। সে কি তখন অন্য একজন হয়ে যেত?

হঠাৎ তার মনে পড়ল বাবা আসলে তার নাম রাখতে চেয়েছিল লিলেমোর। সোফি ভাবতে চেষ্টা করল লিলেমোর অ্যামুন্ডসেন হিসেবে হাত মেলাচ্ছে আর নিজের পরিচয় দিচ্ছে সে, কিন্তু ব্যাপারটা একেবারেই এগোল না। আরেকটি মেয়ে নিজের পরিচয় দিয়ে যেতে থাকল।

হঠাৎ লাফিয়ে উঠল সে, গোসলখানায় ঢুকে পড়ল অদ্ভুত চিঠিটা হাতে নিয়ে। আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়াল, তারপর তাকাল তার নিজের চোখের দিকে।

'আমি সোফি অ্যামুন্ডসেন,' বলল সে।

---

১. Budgeriger. টিয়া পাখির মতো দেখতে, প্রধানত উজ্জ্বল সবুজ রঙের অস্ট্রেলীয় পাখি—অনুবাদক।

আয়নার মেয়েটা একটু মুখ বাঁকানো ছাড়া আর কোনো প্রতিক্রিয়া দেখাল না। সোফি যা করে, সে-ও ঠিক তাই করে। সোফি তার প্রতিচ্ছবিকে হারানোর জন্য খুব ত্বরিত গতিতে নড়ে উঠল একবার, কিন্তু অন্য মেয়েটা ঠিক তার মতোই দ্রুত।

'তুমি কে?' জিজ্ঞেস করল সোফি।

এ-প্রশ্নেরও কোনো জবাব পেল না সে, তবে ক্ষণিকের জন্য তার বুঝতে অসুবিধে হলো প্রশ্নটা সে করেছে নাকি তার প্রতিবিম্ব।

সোফি আয়নার ভেতরের নাকটার ওপর তার তর্জনী চেপে ধরে বলল, 'তুমি হচ্ছো আমি।'

কথাটায় কোনো সাড়া না পেয়ে বাক্যটা সে ঘুরিয়ে বলল এবার, 'আমি হচ্ছি তুমি।'

নিজের চেহারা নিয়ে মাঝে মাঝে অসন্তুষ্টিতে ভোগে সোফি। তাকে অনেকবারই বলা হয়েছে যে তার চোখ দুটো সুন্দর, পটলচেরা, কিন্তু সেটা সম্ভবত এই কারণে বলা যে তার নাকটা খুব ছোট আর মুখটা বেশ একটু বড়। আর তার কান দুটো চোখের খুব কাছাকাছি। সবচেয়ে বাজে ব্যাপার হচ্ছে তার সোজা চুল, যা দিয়ে কোনো কিছু করা অসম্ভব। মাঝে মাঝে, ক্লদ দেবুসি-র[২] কোনো গান শোনার পর, বাবা তার চুলে হাত বুলিয়ে তাকে 'শনের চুলের মেয়ে' বলে ডাকতেন। তিনি তা বলতেই পারেন, তাঁকে তো আর সোজা চুল দিয়ে জীবনযাপন করার সাজা দেয়া হয়নি। মুস (mousse) কিংবা স্টাইলিং জেল, কোনো কিছুই একবিন্দু পরিবর্তন আনতে পারেনি সোফির চুলে। মাঝে মধ্যে নিজেকে সোফির এতো কুৎসিত লাগে যে তার মনে হয় সে কোনো ত্রুটি নিয়ে জন্মেছিল কিনা। তার মা তো প্রায়ই বলেন ওর জন্মের সময় তাকে কী ভীষণ কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে। কিন্তু কার চেহারা কেমন হবে সেটা কি এর ওপরই নির্ভর করে?

ব্যাপারটা কি খুব উদ্ভট নয় যে সে জানে না সে কে? আর এটাও কি খুব যৌক্তিক যে সে দেখতে কেমন হবে সে-ব্যাপারে তার নিজের কোনো মতামত নেয়া হয়নি? তার চেহারাটা তার ওপর স্রেফ চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। সে তার বন্ধু-বান্ধব পছন্দ করে নিতে পেরেছে, কিন্তু নিশ্চয়ই নিজেকে বেছে নেয়নি।

মানুষ আসলে কী?

আয়নার মেয়েটার দিকে ফের মুখ তুলে তাকাল সোফি।

'আমি বরং ওপরে গিয়ে আমার বায়োলজি হোমওয়ার্ক করি,' প্রায় কৈফিয়তের সুরে বলল সোফি। হল ঘরে বেরিয়ে আসার পর সে ভাবল, না, তারচেয়ে বরং বাগানে যাই।

'কিটি, কিটি, কিটি!'

বেড়ালটাকে তাড়িয়ে বাইরে বাড়ির দোরগোড়ার সিঁড়ির ধাপে নিয়ে এলো সোফি, তারপর বন্ধ করে দিল দরজাটা।

রহস্যময় চিঠিটা হাতে নিয়ে সোফি যখন নুড়ি-বিছানো পথে দাঁড়িয়ে আছে, খুবই অদ্ভুত এক চিন্তা এসে ভর করল তার ওপর। নিজেকে তার মনে হলো একটা পুতুলের মতো, একটা জাদুদণ্ড বুলিয়ে যার মধ্যে প্রাণের সঞ্চার করা হয়েছে। ঠিক এই মুহূর্তে সে যে

---

২. Claude Debussy, ১৮৬২-১৯১৮, ফরাসি সুরস্রষ্টা—অনুবাদক।

পৃথিবীর বুকে চমৎকার এক অভিযানে ঘুরে বেড়াচ্ছে সেটা কি সত্যিই এক অসাধারণ ব্যাপার নয়!

হালকা চালে লাফিয়ে নুড়ি-বিছানো পথটা আড়াআড়িভাবে পেরিয়ে গিয়ে শিয়ার্কান ঢুকে পড়ল একদঙ্গল লাল-কিশমিশ ঝোপের ভেতর। কী প্রাণবন্ত একটা বেড়াল, ওর মসৃণ শরীরের সাদা জুলফি থেকে পাকানো লেজের ডগা পর্যন্ত শক্তির স্ফুরণ পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠেছে। এই বাগানে এখন এই বেড়ালটাও আছে, কিন্তু সোফি যেমন নিজেকে নিয়ে ভাবছে, শিয়ার্কান তো মোটেই করছে না।

বেঁচে থাকা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা শুরু করতেই সোফি উপলব্ধি করতে থাকে চিরদিন সে বেঁচে থাকবে না। সে ভাবল, আমি এখন এ-পৃথিবীতে আছি, কিন্তু একদিন চলে যাবো।

মৃত্যুর পরে কি কোনো জীবন আছে? বেড়ালটা ভাগ্যবান, এই প্রশ্নটা নিয়েও একবিন্দু মাথাব্যথা নেই ওর।

সোফির দাদি মারা গেছেন বেশি দিন হয়নি। ছয় মাসেরও বেশি সময় ধরে প্রতিদিনই তাঁর কথা মনে হয়েছে সোফির। এটা খুবই বাজে ব্যাপার যে জীবন ফুরিয়ে যায়!

নুড়ি-বিছানো পথের ওপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে থাকে সোফি। বেঁচে থাকা নিয়ে আরও বেশি করে ভাববার চেষ্টা করে, যাতে সে যে একদিন বেঁচে থাকবে না এ-কথাটা ভুলে যেতে পারে সে। কিন্তু তা সম্ভব হলো না। যখনই সে এ-মুহূর্তে বেঁচে থাকার বিষয়টাতে মনোযোগ দিল, সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুর চিন্তাও এসে পড়ল তার মনের মধ্যে। উল্টোভাবেও ঠিক একই ব্যাপার ঘটল; একদিন যে সে মারা যাবে এই ব্যাপারে একটা তীব্র অনুভূতি মনের মধ্যে সৃষ্টি করার মাধ্যমেই কেবল সে উপলব্ধি করতে পারল বেঁচে থাকাটা কী অসাধারণ রকমের ভালো একটা জিনিস। ব্যাপারটা যেন একটা মুদ্রার দুটো পিঠ আর, মুদ্রাটা সে বারে বারে উল্টে দিচ্ছে। সেটার একটা পিঠ যতই আরও বড় আর স্পষ্ট হয়ে উঠছে, অপর পিঠটাও হয়ে উঠছে তত বড় আর ততই স্পষ্ট।

সে ভাবল, একদিন যে মারা যেতেই হবে সেটা উপলব্ধি না করে কারো পক্ষে বেঁচে থাকার ব্যাপারটা বুঝে ওঠা সম্ভব নয়। কিন্তু এ-কথাটাও ঠিক যে, বেঁচে থাকাটা যে কী অসম্ভব রকমের আশ্চর্যের একটা ব্যাপার সেটা না ভেবে এটা উপলব্ধি করা অসম্ভব যে আমাদেরকে একদিন মরতে হবে। সোফির মনে পড়ল দাদি অনেকটা এ-ধরনেরই একটা কথা বলেছিলেন যেদিন ডাক্তার তাঁকে প্রথম বললেন যে তিনি অসুস্থ। দাদী বলেছিলেন, 'ঠিক এই মুহূর্তটির আগে আমি বুঝতে পারিনি জীবন কত সমৃদ্ধ।'

ব্যাপারটা কী দুঃখজনক যে অসুস্থ হওয়ার পরেই কেবল বেশিরভাগ লোক বুঝতে পারে বেঁচে থাকাটা কত বড় একটা উপহার। আর নয়ত তাদেরকে একটা রহস্যময় চিঠি পেতে হয় ডাকবাক্সের ভেতর!

এখন বোধহয় তার গিয়ে দেখা উচিত আর কোনো চিঠি এলো কিনা। গেটের কাছে ছুটে গিয়ে সবুজ ডাকবাক্সের ভেতর তাকাল সোফি। সেখানে ঠিক প্রথমটার মতোই আরেকটা সাদা খাম দেখে চমকে গেল সে। কিন্তু সোফি নিশ্চিত প্রথম চিঠিটা যখন সে নিয়েছিল তখন বাক্সটা খালি ছিল! এ-খামটার ওপরেও তার নাম লেখা। মুখ

ছিঁড়ে খামটা খুলল সে, তারপর ভেতর থেকে বের করল সেই প্রথমটার আকারের একটা চিঠি।

তাতে লেখা

পৃথিবীটা কোথা থেকে এলো?

আমি জানি না, ভাবল সোফি। নিশ্চয়ই কেউ-ই আসলে জানে না সেটা। কিন্তু তারপরেও, সোফির কাছে মনে হলো এটা একটা সঙ্গত প্রশ্ন। জীবনে এই প্রথমবারের মতো সে উপলব্ধি করল যে পৃথিবীটা কোথা থেকে এলো এ-ব্যাপারে অন্তত প্রশ্ন না করে পৃথিবীতে বেঁচে থাকাটা ঠিক নয়। রহস্যময় চিঠি দুটো সোফির মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছে। সে ঠিক করল গুহায় গিয়ে বসবে।

গুহাটা সোফির খুবই গোপনীয় একটা লুকানোর জায়গা। সে যখন খুবই রেগে থাকে, খুবই কষ্টে থাকে, কিংবা খুবই খুশিতে থাকে তখন ওখানে যায় সে। আজ স্রেফ হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছে সে।

অনেকগুলো ফ্লাওয়ার বেড, ফলের ঝাড়, নানান ধরনের ফলের গাছ, একটা গ্লাইডার আর ছোট্ট একটা কুঞ্জ এ-সব নিয়ে বড়ো একটা বাগান লাল বাড়িটাকে ঘিরে আছে; জন্মের কয়েক সপ্তাহের মধ্যে ওঁদের প্রথম সন্তান মারা গেলে দাদা এই কুঞ্জটা তৈরি করে দিয়েছিলেন দাদিকে। বাচ্চাটার নাম ছিল মেরি। ওর কবরের ফলকে লেখা আছে; 'ছোট্ট মেরি এসেছিল মোদের কাছে, শুভেচ্ছা জানিয়ে আমাদের সে আবার চলে গেছে।'

র‍্যাস্‌প্‌বেরি ঝাড়গুলোর পেছনে, বাগানের এক কোনায় ঘন একটা ঝোপ আছে, ফুল বা বেরি কোনো কিছুই জন্মায় না ওখানে। আসলে ওটা একটা পুরনো বেড়া, একসময় জঙ্গলের সীমানা নির্দেশ করত, কিন্তু গত বিশ বছরে ওটা কেউ ছেঁটে-টেটে দেয়নি বলে ওটা এখন জট পাকানো দুর্গম পিণ্ড হয়ে দাঁড়িয়েছে। দাদি প্রায়ই বলতেন, যুদ্ধের সময় মুরগিগুলো যখন বাগানের মধ্যেই অবাধে ঘোরাফেরা করত তখন ওই ঝোপটার কারণেই শেয়ালের পক্ষে মুরগি চুরি করা কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সোফি ছাড়া আর সবার কাছেই ওটা বাগানের অন্য কোনার খরগোশের খোপগুলোর মতোই অদরকারি হয়ে পড়েছিল। তবে সেটা কেবল এই কারণে যে তারা সোফির গোপন রহস্যটা জানতে পারেনি।

সোফির স্মরণ নেই ঝোপটার গায়ের ছোট্ট ফোঁকরটার কথা সে কখনো মনে করতে পারত না কিনা। ওটার ভেতর দিয়ে হামাগুড়ি দিলে ঝোপের ভেতরে একটা গহ্বরের মধ্যে এসে পড়ে সে। জায়গাটা ছোট্ট একটা বাড়ির মতো। ও জানে, কেউই তাকে খুঁজে পাবে না এখানে।

খাম দুটো দু'হাতে আঁকড়ে ধরে বাগানের মধ্যে দিয়ে দৌড় দেয় সোফি, উবু হয়ে বসে চার হাত-পায়ে, তারপর পোকার মতো ঢুকে পড়ে বেড়ার ভেতর দিয়ে। গুহাটা এতো উঁচু যে ও প্রায় সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে, কিন্তু আজ সে দুমড়ে যাওয়া কিছু শেকড়ের একটা স্তূপের ওপর বসে পড়ল। এখান থেকে লতা-পাতার ক্ষুদে ক্ষুদে ছিদ্রের ভেতর দিয়ে বাইরে তাকাতে পারছিল সে। ছিদ্রগুলো কোনোটিই যদিও ছোট্ট একটা

পয়সার চেয়ে বড় নয়, তবুও গোটা বাগানটা দিব্যি দেখতে পাচ্ছে সে। ছোটবেলায় মা-বাবা ওকে যখন গাছ-গাছালির মধ্যে খুঁজে বেড়াতেন, ও দেখে খুব মজা পেত।

এই বাগানটাকে সোফি সব সময়ই তার একান্ত নিজের জগৎ বলে ভেবে এসেছে। বাইবেলের নন্দনকাননের কথা শুনলেই সে ভাবত যে বসে বসে সে তার ছোট্ট স্বর্গটা নিরীক্ষণ করছে।

পৃথিবীটা কোথা থেকে এলো?

বিন্দুমাত্র ধারণা নেই ওর এ-ব্যাপারে। সোফি কেবল জানে পৃথিবীটা মহাশূন্যের একটা ছোট্ট গ্রহ। কিন্তু এই মহাশূন্যটাই বা এলো কোথা থেকে?

এমনও হতে পারে যে মহাশূন্যটা সবসময়ই ছিল; সেক্ষেত্রে তাকেও আর বার করতে হবে না সেটা কোথা থেকে এলো। কিন্তু তার মনের ভেতরের কোনো একটা কিছু এ-ধারণার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে বসল। যা কিছু বর্তমান রয়েছে সে-সবের নিশ্চয়ই একটা শুরু ছিল? কাজেই মহাশূন্যও নিশ্চয়ই কোনো এক সময়ে অন্য কিছু থেকে সৃষ্টি হয়েছিল।

কিন্তু মহাশূন্য যদি অন্য কোনো কিছু থেকে সৃষ্টি হয়ে থাকে তাহলে সেই অন্য কিছুও নিশ্চয়ই কিছু একটা থেকে সৃষ্টি হয়েছিল। সোফির মনে হলো প্রশ্নটা সে কেবল দীর্ঘ-ই করে যাচ্ছে। কোনো এক পর্যায়ে কোনো একটা কিছু নিশ্চয়ই শূন্য থেকে সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু সেটা কি সম্ভব? সেটা কি ওই ব্যাপারটির মতোই অবাস্তব নয় যে আগাগোড়াই পৃথিবীর অস্তিত্ব ছিল? ওরা স্কুলে শিখেছে পৃথিবী ঈশ্বরের সৃষ্টি। নিজেকে সোফি এই বলে সান্ত্বনা দিতে চাইল যে এটাই সম্ভবত পুরো সমস্যাটার সবচেয়ে ভালো সমাধান। কিন্তু তারপরই আবার চিন্তায় পেয়ে বসল তাকে। ঈশ্বর যে মহাশূন্য সৃষ্টি করেছেন এটা সে মেনে নিতে পারে। কিন্তু ঈশ্বরের নিজের বেলা? তিনি কি নিজেই নিজেকে শূন্য থেকে সৃষ্টি করেছেন? তার মনের গভীর থেকে আবার কে যেন প্রতিবাদ করে উঠল। সব ধরনের জিনিস ঈশ্বর তৈরি করতে পারলেও নিজেকে অন্তত তিনি তৈরি করতে পারতেন না যদি না সে-কাজটা করার আগে নিজেকে তৈরি করার জন্য তার একটা 'সত্তা' থাকত। কাজেই বাকি থাকে কেবল একটাই মাত্র সম্ভাবনা ঈশ্বর সবসময়ই ছিলেন। কিন্তু ধারণাটা যে সে এরই মধ্যে বাতিল করে দিয়েছে! অস্তিত্বশীল সব কিছুরই একটা শুরু থাকতেই হবে।

উহ্, অসহ্য!

আবার খুলল সে খাম দুটো।

কে তুমি?

পৃথিবীটা কোথা থেকে এলো?

কী বিরক্তিকর দুটো প্রশ্ন! তাছাড়া আরও একটা ব্যাপার, এই চিঠি দুটোই বা কোথা থেকে এলো? এ-ব্যাপারটাও প্রায় একই রকম রহস্যময়।

তার রোজকার অস্তিত্ব থেকে বাইরে ছুঁড়ে ফেলে কে সোফিকে দাঁড় করিয়ে দিল মহাবিশ্বের বিশাল ধাঁধাগুলোর সামনে?

তৃতীয়বারের মতো ডাকবাক্সের কাছে ফিরে গেল সোফি। ডাকপিয়ন মাত্র কিছুক্ষণ আগে দিয়ে গেছে আজকের ডাক। বাক্সের ভেতর হাতড়ে জাংক মেইলের

একটা বড়োসড়ো তাড়া, কিছু সাময়িকপত্র আর তার মায়ের কাছে আসা গোটা দুয়েক চিঠি বের করল সোফি। গ্রীষ্মমণ্ডলীয় এক সমুদ্র-সৈকতের ছবিঅলা একটা পোস্টকার্ডও ছিল ওখানে। কার্ডটা ওল্টাল সে। সেটার গায়ে নরওয়ের একটা ডাকটিকেট আর জাতিসংঘ বাহিনীর একটা পোস্টমার্ক। বাবার কাছ থেকে আসেনি তো চিঠিটা? কিন্তু তিনি তো রয়েছেন একেবারেই ভিন্ন একটা জায়গায়, তাই না? তাছাড়া হাতের লেখাটাও তাঁর নয়।

পোস্টকার্ডটা কার নামে এসেছে তাই দেখে সোফির নাড়ির গতি বেড়ে গেল খানিকটা 'হিল্ডা মোলার ন্যাগ, প্রযত্নে সোফি অ্যামুন্ডসেন, ৩ ক্লোভার ক্লোজ...।' ঠিকানার বাকি অংশে কোনো ভুল নেই। কার্ডটাতে লেখা

> প্রিয় হিল্ডা, শুভ ১৫শ জন্মদিন। আশা করি তুই বুঝতে পারবি, আমি তোকে এমন একটা উপহার দিতে চাই যা তোকে বড় হয়ে উঠতে সাহায্য করবে। সোফির প্রযত্নে কার্ডটা পাঠানোর জন্য দুঃখিত। কিন্তু এটাই ছিল সবচেয়ে সহজ পথ। বাবার শুভেচ্ছা রইল।

এক ছুটে বাড়ির ভেতরে, রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকল সোফি। তার মনের মধ্যে ঝড় বইছে। কে এই হিল্ডা যার জন্মদিন ওর নিজের জন্মদিনের ঠিক এক মাস আগে?

টেলিফোনের বইটা বের করল সোফি। মোলার নামে অনেক লোক আছে ওখানে, ন্যাগ নামেও আছে বেশ কয়েকজন। কিন্তু গোটা ডিরেক্টরিতে মোলার ন্যাগ নামে কেউ নেই।

রহস্যময় কার্ডটা আরও একবার খুঁটিয়ে দেখল সোফি। মোটেই জাল মনে হচ্ছে না ওটাকে: একটা ডাকটিকেট আর পোস্টমার্ক আছে খামটার গায়ে।

জন্মদিনের একটা কার্ড একজন বাবা সোফির নামে পাঠাবেন কেন, যখন সেটা নিশ্চিতভাবেই অন্য জায়গায় যাওয়ার কথা? এ আবার কেমনতর বাবা যিনি তাঁর নিজের মেয়েকে ধোঁকা দেন তার জন্মদিনের কার্ডটা ইচ্ছে করে ভুল ঠিকানায় পাঠিয়ে? এটা কী করে 'সবচেয়ে সহজ পথ' হয়? আর সবচেয়ে বড় কথা, সে কী করে খুঁজে পাবে হিল্ডা নামের এই মেয়েটিকে?

কাজেই সোফিকে এখন আরেকটা সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাতে হচ্ছে। সে তার চিন্তা-ভাবনাগুলোকে গুছিয়ে নেয়ার চেষ্টা করল

আজ বিকেলে, মাত্র দুই ঘণ্টার মধ্যে, তিনটে সমস্যা উপহার দেয়া হয়েছে তাকে। প্রথম সমস্যা হচ্ছে কে তার চিঠির বাক্সে দুটো সাদা খাম রেখেছে। এই খামগুলোর মধ্যে কঠিন যে-প্রশ্নগুলো আছে সেটা দ্বিতীয় সমস্যা। আর তৃতীয়টি হচ্ছে, এই হিল্ডা মোলার ন্যাগ কে হতে পারে আর তার জন্মদিনের কার্ড সোফির নামে পাঠানো হলো কেন। সে নিশ্চিত, এই তিনটে সমস্যার মধ্যে একটা যোগাযোগ আছে, তার কারণ, আজকের আগ পর্যন্ত সে নিতান্তই সাদামাটা একটা জীবন কাটিয়েছে।

টপ হ্যাট

৫১০৪

...ভালো দার্শনিক হওয়ার জন্য একমাত্র যে-জিনিসটি আমাদের প্রয়োজন তা হলো বিস্মিত হওয়ার ক্ষমতা।...

সোফি নিশ্চিত অজ্ঞাত পরিচয় পত্রলেখকের কাছ থেকে আবার চিঠি আসবে। আপাতত এ-ব্যাপারে কাউকে কিছু বলবে না বলে ঠিক করল সে।

স্কুলে শিক্ষকদের কথায় মনোযোগ দেয়া সমস্যা হয়ে দাঁড়াল সোফির জন্যে। ওর মনে হলো তাঁরা কেবল গুরুত্বহীন ব্যাপার নিয়ে কথা বলে যাচ্ছেন। মানুষ কী বা পৃথিবী কী এবং সেটা কীভাবে সৃষ্টি হলো সে-ব্যাপারে তারা কিছু বলেন না কেন?

এই প্রথমবারের মতো সে এ-ব্যাপারে সচেতন হলো যে স্কুলে, কিংবা বলা চলে সব জায়গাতেই, লোকজন কেবল তুচ্ছ বিষয়েই মাথা ঘামাচ্ছে। অথচ এরচেয়ে গুরুতর অনেক সমস্যা রয়েছে যেগুলোর সমাধান হওয়া দরকার।

কারো কি এ-সব প্রশ্নের উত্তর জানা আছে? সোফির কাছে মনে হলো 'ইরেগিউলার ভার্ব' মুখস্ত করার চেয়ে এ-সব প্রশ্ন নিয়ে মাথা ঘামানোটা অনেক বেশি জরুরি।

শেষ ক্লাসের পরে ঘণ্টা পড়তেই সে এতো দ্রুত স্কুল থেকে বেরিয়ে এলো যে দৌড়ে ওর নাগাল ধরতে হলো জোয়ানাকে। কিছুক্ষণ পর জোয়ানা জিজ্ঞেস করল, 'আজকে সন্ধ্যায় কার্ড খেলবি?'

সোফি কাঁধ ঝাঁকাল।

'কার্ড খেলার ব্যাপারে আমার আর উৎসাহ নেই'

অবাক দেখাল জোয়ানাকে।

'নেই? তাহলে চল, ব্যাডমিন্টন খেলি।'

ফুটপাতের দিকে দৃষ্টি নামাল সোফি, তারপর মুখ তুলে তাকাল বন্ধুর দিকে।

'ব্যাডমিন্টনের ব্যাপারেও আমার আর আগ্রহ নেই।'

'ফাজলামি করছিস তুই।'

জোয়ানার গলায় ঝাঁঝ, টের পেল সোফি।

'তোর বলতে অসুবিধে আছে হঠাৎ কী এত জরুরি হয়ে গেল?'

সোফি ঘাড় নাড়ল শুধু। 'ব্যাপারটা ব্যাপারটা একটু গোপনীয়'

'হুঁ বুঝেছি! তুই প্রেমে পড়েছিস।'

কিছুক্ষণ কোনো কথা না বলে হাঁটল মেয়ে দুটো। ওরা ফুটবল মাঠের কাছে পৌঁছাতে জোয়ানা বলে উঠল, 'আমি মাঠটার ওপর দিয়ে যাবো।'

মাঠের উপর দিয়ে! জোয়ানার অবশ্য ওদিক দিয়েই সবচেয়ে তাড়াতাড়ি হয়, কিন্তু বাসায় মেহমান থাকলে বা দাঁতের ডাক্তারের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট থাকলে তবেই সে ও-পথটা ব্যবহার করে।

ওর সঙ্গে দুর্ব্যবহার করার জন্য খারাপ লাগল সোফির। কিন্তু আর কী-ই বা সে বলতে পারত? ও কি বলতে পারত যে সে কে আর পৃথিবীটা কোথা থেকে এলো, এই নিয়ে হঠাৎ করেই সে এত ব্যস্ত হয়ে পড়েছে যে ব্যাডমিন্টন খেলার কোনো সময়-ই নেই তার? জোয়ানা কি ব্যাপারটা বুঝতে পারত?

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আর এক হিসেবে, সবচেয়ে স্বাভাবিক প্রশ্ন নিয়ে চিন্তিত হওয়াটা এত কঠিন ব্যাপার কেন?

সোফি টের পেল, ডাক বাক্সটা খোলার সময় তার হৃদস্পন্দন বেড়ে গেছে। প্রথমে, তার মায়ের কাছে ব্যাংক থেকে আসা একটা চিঠি আর কিছু বাদামি রঙের খাম পেল সে। যত্তসব! সোফি দেখতে এসেছে অজ্ঞাত প্রেরকের কাছ থেকে কোনো চিঠি এসেছে কিনা।

গেটটা বন্ধ করার সময় সে খেয়াল করল একটা বড় খামের ওপর তার নাম লেখা আছে। সেটা উল্টে সে দেখল ওটার ওপর লেখা রয়েছে: 'দর্শন বিষয়ক কোর্স। যত্নের সঙ্গে ব্যবহার করুন।'

নুড়ি-বিছানো পথ ধরে ছুট লাগাল সোফি, স্কুল ব্যাগটা ছুঁড়ে ফেলল সিঁড়ির উপর। ডোরম্যাটের নিচ দিয়ে অন্য চিঠিগুলো গুঁজে দিয়ে দৌড়ে পেছনের বাগানে চলে এসে গুহার ভেতর আশ্রয় নিল সে। বড় চিঠিটা খোলার এটাই একমাত্র স্থান।

শিয়ার্কান-ও ওর পিছু নিল লাফাতে লাফাতে এবং সোফিকে ব্যাপারটা মেনে নিতে হলো। সে জানে, বেড়ালটা নাছোড়বান্দা।

দেখা গেল, খামটার ভেতরে একটা পেপার ক্লিপ দিয়ে আটকান টাইপ করা তিনটে পৃষ্ঠা আছে। সোফি পড়তে শুরু করল।

দর্শন কী?

প্রিয় সোফি,

অনেক লোকেরই অনেক হবি থাকে। কেউ কেউ পুরনো মুদ্রা (কয়েন) বা বিদেশি ডাকটিকেট সংগ্রহ করে, কেউ সেলাই করে, অন্যরা আবার তাদের অবসরের বেশির ভাগ সময় ব্যয় করে বিশেষ কোনো খেলার পেছনে।

অনেক মানুষ আছে যারা পড়তে ভালোবাসে। তবে পড়ার রুচি একেক জনের একেক রকম। কেউ শুধু খবরের কাগজ বা কমিক্স পড়ে, কেউ ভালোবাসে উপন্যাস পড়তে, আবার অন্যরা পছন্দ করে জ্যোতির্বিদ্যা, বন-জঙ্গল আর জন্তু-জানোয়ার বা প্রযুক্তিগত আবিষ্কারের ওপর লেখা বই-পত্র।

ঘোড়া বা দামি পাথরের ব্যাপারে আমার উৎসাহ থাকলেই আমি আশা করতে পারি না যে প্রত্যেকেই ও-সব বিষয়ে আমারই মতো উৎসাহী হবে। আমি হয়ত খেলাধুলা বিষয়ক সমস্ত অনুষ্ঠান টিভিতে দেখতে খুবই আনন্দ পাই, কিন্তু সেই সঙ্গে আমাকে এ-ব্যাপারটা মেনে নিতে হবে যে অন্যদের কাছে খেলাধুলা জিনিসটা রীতিমত একঘেঁয়ে একটা বিষয়।

এমন কিছু কি নেই যা সবাইকেই আকর্ষণ করে? এমন কিছু কি নেই যা সবাইকে উদ্বিগ্ন করে, তা তাদের পরিচয় যা-ই হোক না কেন বা তারা পৃথিবীর যেখানেই থাকুক না কেন? হ্যাঁ, প্রিয় সোফি, কিছু কিছু প্রশ্ন বা প্রসঙ্গ আছে যে-ব্যাপারে সবারই আসলে আগ্রহ বোধ করার কথা। ঠিক এইসব প্রশ্ন নিয়েই এই কোর্স ।

জীবনের সবচেয়ে জরুরি জিনিসটি কী? যে-মানুষটি অনাহারের দ্বারপ্রান্তে বাস করে তাকে যদি প্রশ্নটি করা হয় সেক্ষেত্রে উত্তরটি হবে, খাদ্য। শীতে মরণাপন্ন লোকটিকে জিজ্ঞেস করলে জবাব আসবে, উষ্ণতা। এই একই প্রশ্ন যদি এমন কোনো মানুষকে করা যায় যে নিঃসঙ্গ বোধ করছে আর ভাবছে সে সবার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন, তাহলে সম্ভবত উত্তরটি হবে, অন্য মানুষের সাহচর্য।

কিন্তু এ-সব মৌলিক চাহিদার সমাধান যখন হয়ে যাবে, তখনো কি এমন কিছু রয়ে যাবে যা প্রত্যেকেরই দরকার? দার্শনিকরা সে-রকমই মনে করেন। তাঁরা বিশ্বাস করেন মানুষ কেবল অন্ননির্ভর নয়। এ-কথা অস্বীকার করার যো নেই যে সবারই খাদ্য দরকার এবং সবাই ভালোবাসা ও আদর-যত্ন চায়। কিন্তু এসবের বাইরেও কিছু রয়েছে যা সবারই দরকার আর তা হচ্ছে এটা জানা যে আমরা কে এবং আমরা কেন পৃথিবীতে রয়েছি।

আমরা কেন পৃথিবীতে রয়েছি তা জানার ব্যাপারে উৎসাহী হওয়াটা ডাকটিকেট সংগ্রহের মতো কোনো 'খেয়ালি' বিষয় নয়। যাঁরা এ-প্রশ্ন করছেন তাঁরা এমন এক বিতর্কে অংশ নিচ্ছেন যে-বিতর্ক মানুষ এই গ্রহে বসবাস শুরু করার পর থেকেই চলে আসছে।

সর্বশেষ অলিম্পিকে সবচেয়ে বেশি সোনার পদক কে পেয়েছে এই প্রশ্নের চেয়ে অনেক বড় আর গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হচ্ছে এই মহাবিশ্ব, পৃথিবী এবং জীবন কী করে সৃষ্টি হলো।

দর্শনের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সবচেয়ে ভালো উপায় হচ্ছে দর্শনবিষয়ক কয়েকটি প্রশ্ন করা

পৃথিবী কী করে সৃষ্টি হয়েছে? যা ঘটে তার পেছনে কি কোনো ইচ্ছা বা অর্থ রয়েছে? মৃত্যুর পরে কি জীবন আসে? কী করে এ-সব প্রশ্নের জবাব দেব আমরা? আর সবচেয়ে যেটা জরুরি, কীভাবে জীবনযাপন করা উচিত আমাদের ? অনাদি কাল ধরে এ-সব প্রশ্ন করে আসছে মানুষ। মানুষ কী এবং পৃথিবীটা কোথা থেকে এসেছে, এই প্রশ্ন দুটি নিয়ে মাথা ঘামায়নি এমন কোনো সংস্কৃতির কথা জানা যায় না।

আসলে কিন্তু খুব বেশি দার্শনিক প্রশ্ন করার নেই। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলোর কয়েকটি আমরা এরই মধ্যে করে ফেলেছি। কিন্তু ইতিহাস আমাদেরকে প্রতিটি

প্রশ্নেরই ভিন্ন ভিন্ন অনেকগুলো উত্তর উপহার দিয়েছে। কাজেই বোঝাই যাচ্ছে, দার্শনিক প্রশ্ন করা সোজা, সেগুলোর উত্তর দেয়াই কঠিন।

এমনকি আজও প্রত্যেককেই এই প্রশ্নগুলোর নিজস্ব উত্তর নিজেকেই খুঁজে বের করে নিতে হয়। ঈশ্বর আছেন কিনা বা মৃত্যুর পরে জীবন আছে কিনা তা বিশ্বকোষের পাতা উল্টে জানা যাবে না। বিশ্বকোষ আমাদের এ-কথাও বলবে না কীভাবে আমাদের জীবনযাপন করা উচিত। অবশ্য লোকজন কী বিশ্বাস করত সে-কথা পড়লে জীবন সম্পর্কে আমাদের নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলার ব্যাপারে সাহায্য হতে পারে।

দার্শনিকের সত্যানুসন্ধান অনেকটা গোয়েন্দা-গল্পের মতোন। কেউ ভাবছে খুনটা করেছে অ্যান্ডারসন, অন্যেরা ভাবছে, না, এটা নিলসেন বা জেনসেনেরই কাজ। পুলিশ কখনো-সখনো সত্যিকারের কোনো অপরাধের সমাধান করে বটে। কিন্তু এমন ঘটনা ঘটাও সম্ভব যে, কোথাও না কোথাও একটা সমাধান থাকা সত্ত্বেও তারা হয়ত ব্যাপারটার কোনো কিনারাই করতে পারল না। কাজেই কোনো প্রশ্নের উত্তর দেয়া কঠিন হলেও সে-প্রশ্নের হয়ত একটা এবং মাত্র একটাই উত্তর থাকে। হয় মৃত্যুর পরে কোনো ধরনের অস্তিত্ব রয়েছে, নয়ত নেই।

শতাব্দী-প্রাচীন বহু ধাঁধা বিজ্ঞানের কল্যাণে খোলাসা হয়ে গেছে। চাঁদের অন্ধকার দিকটা দেখতে কেমন সেটা অনেক দিন রহস্যে ঘেরা ছিল। এটা এমন একটা ব্যাপার যার সমাধান আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে হওয়ার নয়, তাই যার যার কল্পনার হাতেই ছেড়ে দেয়া হয়েছিল সেটাকে। কিন্তু আজ আমরা জানি চাঁদের অন্ধকার দিকটা দেখতে ঠিক কেমন এবং আজকাল আর কেউ এ-কথা 'বিশ্বাস' করে না যে 'চাঁদের মানুষ' বলে কিছু আছে বা সেটা সবুজ পনিরে তৈরি।

দু'হাজার বছর আগের এক গ্রিক দার্শনিক বিশ্বাস করতেন দর্শনের জন্ম মানুষের বিস্মিত হওয়ার ক্ষমতার মধ্যে। বেঁচে থাকাটা এতো আশ্চর্য বলে বোধ হয়েছিল মানুষের কাছে যে আপনা থেকেই দার্শনিক প্রশ্নগুলো জেগে উঠেছিল তাদের মনে।

ব্যাপারটা অনেকটা একটা জাদুর খেলা দেখার মতোন, আমরা ঠিক বুঝতে পারি না কাজটা কীভাবে করা হলো। কাজেই আমরা জিজ্ঞেস করি জাদুকর কী করে কয়েকটা সাদা সিল্কের স্কার্ফকে একটা জ্যান্ত খরগোশে রূপান্তরিত করতে পারেন?

একজন জাদুকর যখন হঠাৎ করে একটা খরগোশ বের করে আনেন একটা টুপির ভেতর থেকে—যে-টুপিটা কিনা একটু আগেই খালি হিসেবে দেখানো হয়েছে—তখন যেমন সবাই অবাক হয়ে যায়, অনেক মানুষই ঠিক সে-রকম অবিশ্বাস নিয়ে পৃথিবীর বুকে জীবনযাপন করে।

খরগোশের বেলায় আমরা জানি যে জাদুকর আমাদের ধোঁকা দিয়েছেন। আমরা কেবল জানতে চাইবো কাজটা কীভাবে করা হলো। কিন্তু পৃথিবীর বেলায় ব্যাপারটা একটু ভিন্ন। আমরা জানি পৃথিবীটা মোটেই হাত সাফাই আর ধোঁকার বিষয় নয়, তার কারণ আমরা এই পৃথিবীরই বাসিন্দা, আমরা এরই অংশ। আসলে আমরা *হচ্ছি* টুপির ভেতর থেকে টেনে বের করা সাদা সেই খরগোশ। সাদা খরগোশ আর আমাদের মধ্যে একমাত্র পার্থক্য হচ্ছে খরগোশটা উপলব্ধি করে না যে সে একটা জাদুর খেলায় অংশ নিচ্ছে। আমরা করি। আমরা অনুভব করি রহস্যময় একটা কিছুর আমরা অংশ এবং

আমরা জানতে চাইব এগুলো সব কীভাবে কাজ করে।

পুনশ্চ সাদা খরগোশটার ক্ষেত্রে সেটাকে গোটা মহাবিশ্বের সঙ্গে তুলনা করাই সঙ্গত হবে। আমরা যারা এখানে বাস করি তারা হচ্ছি খরগোশের গায়ের রোমের গভীরে বাস করা আণুবীক্ষণিক পোকামাকড়। কিন্তু দার্শনিকরা সব সময় চেষ্টা করে যাচ্ছেন সেই মিহি রোম বেয়ে উপরে উঠে সরাসরি জাদুকরের চোখে চোখ রাখতে।

তুমি কি এখনো পড়ছ, সোফি? টু বি কন্টিনিউড...

সোফি একেবারে অবসন্ন হয়ে পড়ে। এখনো পড়ছ? সে তো এমনকি মনেও করতে পারছে না পড়ার সময় সে শ্বাস নেবার ফুসরত পেয়েছিল কিনা।

কে নিয়ে এসেছিল চিঠিটা? হিল্ডা মোলার ন্যাগকে যে জন্মদিনের কার্ড পাঠিয়েছে সে নিশ্চয়ই নয়, তার কারণ কার্ডটাতে স্ট্যাম্প আর পোস্টমার্ক দুটোই আছে। বাদামি রঙের খামটা, ঠিক সাদা দুটো খামের মতোই, হাতে করে এনে রাখা হয়েছিল ডাকবাক্সে।

সোফি ঘড়ি দেখে। তিনটে বাজতে পনের মিনিট বাকি। কাজ থেকে বাসায় ফিরতে এখনো দু'ঘন্টারও বেশি সময় লাগবে তার মায়ের।

হামাগুড়ি দিয়ে আবার বাগানে বেরিয়ে আসে সোফি। ছুটে চলে যায় ডাকবাক্সের কাছে। হতে পারে আরেকটা চিঠি এসেছে।

নিজের নাম লেখা আরেকটা বাদামি রঙের খাম পায় সে ওখানে। এবারে সে চারদিকটায় ভালো করে নজর বুলায়, কিন্তু কাউকে দেখা যায় না। দৌড়ে বনের প্রান্তে চলে যায় সোফি, তাকায় রাস্তাটার দিকে।

কেউ নেই ওখানে। হঠাৎ তার মনে হয় বনের বেশ ভেতরে ডাল ভাঙার একটা শব্দ হলো। কিন্তু পুরোপুরি নিশ্চিত হতে পারে না সে আর তাছাড়া, পালিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে যে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, তাকে তাড়া করার কোনো মানেই হয় না।

বাড়িতে এসে ঢোকে সোফি। দৌড়ে চলে যায় সে ওপরতলায় নিজের ঘরে। সুন্দর সুন্দর পাথরভর্তি বড়সড় বিস্কিটের টিনটা নেয়। পাথরগুলো খালি করে ফেলে সে মেঝের ওপর, তারপর বড় খাম দুটো ভরে রাখে টিনের ভেতর। এরপর তাড়াতাড়ি শিয়ার্কানের জন্য কিছু খাবার বের করে রাখে সে।

'কিটি, কিটি, কিটি।'

গুহায় ফিরে দ্বিতীয় বাদামি খামটার মুখ খোলে সে, বের করে আনে নতুন টাইপ করা পৃষ্ঠাগুলো। শুরু করে পড়তে।

একটি অদ্ভুত প্রাণী

আবারো শুভেচ্ছা। বুঝতেই পারছ, দর্শনবিষয়ক এই ছোট্ট কোর্সটি সুবিধেজনক কলেবরে হাজির হবে। এবারে আরও কিছু প্রাথমিক কথাবার্তা

ভালো দার্শনিক হওয়ার জন্য একমাত্র যে-জিনিসটি আমাদের প্রয়োজন তা হলো

বিস্মিত হওয়ার ক্ষমতা—এ-কথা কি আমি বলেছি? যদি না বলে থাকি তাহলে এখন বলছি ভালো দার্শনিক হওয়ার জন্য একমাত্র যে-জিনিসটি আমাদের প্রয়োজন তা হলো বিস্মিত হওয়ার ক্ষমতা।

শিশুদের এই ক্ষমতাটি আছে। তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। মাতৃগর্ভে অল্প ক'টা মাস কাটিয়ে তারা একেবারে নতুন এক বাস্তবতার মধ্যে এসে পড়ে। কিন্তু তারা যখন বড় হয় তখন এই বিস্মিত হওয়ার ক্ষমতাটি যেন নষ্ট হয়ে যায়। কেন এমনটা হয়? তুমি কি জানো?

একটি সদ্যোজাত শিশু যদি কথা বলতে পারত তাহলে হয়ত যে অসাধারণ বিশ্বে সে এসে পড়েছে সেই বিশ্ব সম্পর্কে কিছু কথা জানাতে পারত। কীভাবে সে চারদিকে তাকায় আর যা কিছু দেখে সেদিকেই কীভাবে কৌতূহলের সঙ্গে হাত বাড়িয়ে দেয় সে তা তো আমরা প্রায়ই দেখে থাকি।

ধীরে ধীরে যখন তার শব্দ সঞ্চয় হতে থাকে তখন সে কুকুর দেখলেই মুখ তুলে বলে ওঠে,'ভেউ-ভেউ!' ভেউ-ভেউ। তার স্ট্রলারের ভেতর বসে সে লাফিয়ে ওঠে হাত নাচিয়ে, 'ভেউ-ভেউ!' বাচ্চাটির এই অতি-উৎসাহে ক্লান্তি বোধ করি আমরা, অর্থাৎ তারা যাদের বয়স আর জ্ঞানগম্যি বেশি। 'ঠিক আছে, ঠিক আছে, বাবা, ওটা একটা ভেউ,' নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে আমরা বলি তাকে। 'এবার চুপটি করে বসে থাকো।'

আমরা মুগ্ধ হই না। কারণ, আগেই কুকুর দেখেছি আমরা।

অসংখ্যবার এই পরমানন্দপূর্ণ কাণ্ড করার পর তবেই হয়ত সে কুকুর দেখলেই আর অমন পাগল হয়ে উঠবে না। নির্লিপ্তভাবে পাশ কাটিয়ে চলে যাবে। হাতি বা জলহস্তী দেখলেও অস্থির হবে না। কিন্তু শিশুটি ভালো করে কথা শেখার অনেক আগেই এবং দার্শনিকভাবে চিন্তা করতে শেখার অনেক আগেই পৃথিবীটা একটা অভ্যাসে পরিণত হবে তার।

আমার মতো যদি জানতে চাও তাহলে বলব, ব্যাপারটা রীতিমত দুঃখজনক।

প্রিয় সোফি, পৃথিবীর ব্যাপারে অতি অভ্যস্ততার কারণে এর সঠিক গুরুত্ব উপলব্ধি করতে যারা অক্ষম হয়ে পড়ে তুমিও যাতে তাদের মতো না হও সেটাই আমার চিন্তার বিষয়। কাজেই স্রেফ সে-ব্যাপারটা একটু যাচাই করে নিতে কোর্সটা শুরু করার আগে আমরা মনে মনে কয়েকটা পরীক্ষা করব

মনে কর, একদিন তুমি বেড়াতে গিয়েছ। হঠাৎ করে তোমার সামনেই, পথের ওপর একটা মহাকাশযান দেখতে পেলে তুমি। মঙ্গল গ্রহের এক ক্ষুদে প্রাণী মহাকাশযানটা বেয়ে মাটিতে নেমে এসে সোজা তোমার দিকে মুখ তুলে তাকাল...

কী ভাববে তুমি? কিছু মনে করো না, এটা তেমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয়। কিন্তু কখনো কি তোমার মনে হয়েছে যে তুমি নিজেই মঙ্গল গ্রহের এক প্রাণী?

হঠাৎ করে একটি ভিনগ্রহের প্রাণীর মুখোমুখি হওয়ার সে-রকম কোনো সম্ভাবনাই তোমার নেই। আমরা এমনকি জানিও না যে অন্য গ্রহে প্রাণের অস্তিত্ব রয়েছে কি না। তবে একদিন কিন্তু তুমি হঠাৎ করে নিজের মুখোমুখি হয়ে যেতে পারো আর তখন হয়ত তুমি থমকে দাঁড়াবে এবং সম্পূর্ণ এক নতুন আলোতে নিজেকে দেখবে। বনের মধ্যে ঠিক এভাবেই একবার হেঁটে বেড়ানোর সময়।

তখন তুমি ভাববে, আমি এক আশ্চর্য সত্তা। আমি একটি রহস্যময় প্রাণী।

তোমার মনে হবে তুমি জাদুর ঘোর-লাগা প্রশান্তিভরা এক ঘুম থেকে জেগে উঠছো। তুমি জিগ্যেস করবে, কে আমি? তুমি জানো যে মহাবিশ্বের একটি গ্রহের ওপর তুমি টলমল পায়ে হেঁটে যাচ্ছো। কিন্তু মহাবিশ্ব নামক জিনিসটি কী?

এভাবে তুমি যদি নিজেকে নিজে আবিষ্কার কর তাহলে বলা যাবে এই কিছুক্ষণ আগে আমরা মঙ্গল গ্রহের যে-প্রাণীটির কথা বললাম সে-রকমই রহস্যময় কিছু আবিষ্কার করবে তুমি। তুমি কেবল মহাশূন্য থেকে আসা একটি প্রাণীকে দেখবে না; তোমার মনের গহীন ভেতরে তুমি অনুভব করবে যে তুমি নিজেই একটি অসাধারণ প্রাণী। তুমি কি আমার কথা বুঝতে পারছ, সোফি? চলো, মনে মনে আরেকটা পরীক্ষা করা যাক।

একদিন সকালে মা, বাবা আর দু'তিন বছর বয়েসী ছোট টমাস মিলে রান্নাঘরে বসে সকালের নাশতা করছে। খানিক পর মা টেবিল ছেড়ে সিংকের কাছে গেলেন আর বাবা—হ্যাঁ, বাবা—সিলিং-এর নিচে ভেসে বেড়াতে লাগলেন টমাসের চোখের সামনে। তো, এ-অবস্থায় টমাস কী বলবে বলে মনে হয় তোমার? হয়ত সে বাবার দিকে আঙুল উঁচিয়ে বলে উঠবে, 'বাবা উড়ছে!' টমাস অবশ্যই অবাক হবে, কিন্তু সে তো সে প্রায়ই হচ্ছে। বাবা এতোসব অবাক কাণ্ডকারখানা ঘটান সারাদিন যে নাশতার টেবিলের ওপর দিয়ে এই মামুলি ওড়াওড়ির ব্যাপারটা আলাদাভাবে নজরে পড়ে না টমাসের। প্রতিদিন একটা মজার যন্ত্র দিয়ে বাবা শেভ করেন। কখনো কখনো উঠে যান ছাদে টিভির এরিয়েলটা ঘোরাতে, বা কখনো হয়ত গাড়ির হুডের নিচে মাথা গলিয়ে দেন আর যখন সেটা বের করে আনেন, দেখা যায়, তার সারা মুখে কালি।

তো, এবার মা-র পালা। টমাসের কথা শুনতে পেয়ে ঝট করে ঘুরে দাঁড়িয়েছেন তিনি। রান্নাঘরের টেবিলটার ওপর বাবা দিব্যি ভেসে বেড়াচ্ছেন, এই দৃশ্যটা দেখে মা-র কী প্রতিক্রিয়া হবে বলে মনে হয় তোমার, সোফি?

জ্যামের বয়ামটা তার হাত থেকে খসে পড়ে গেল আর সেই সঙ্গে তিনি ভয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন। বাবা ভালোয় ভালোয় তার চেয়ারে ফিরে এলে এমনকি খানিকটা চিকিৎসারও দরকার হতে পারে মা-মণির। (এতোদিনে বাবার ভালোভাবে টেবিল ম্যানার্স শেখা উচিত ছিল, নাকি বলো!) সে যাই হোক, এখন বলো, টমাস আর মা একই ঘটনায় এমন ভিন্ন দু'ধরনের আচরণ কেন করল?

এটা আসলে *অভ্যাসের* ব্যাপার। (খেয়াল করো!) মা জানেন যে মানুষ উড়তে পারে না। টমাস সেটা জানে না। এখনো সে ঠিক নিশ্চিতভাবে জানে না এই পৃথিবীতে মানুষ কী করতে পারে বা পারে না।

কিন্তু খোদ পৃথিবীর ব্যাপারটা কী, সোফি? *পৃথিবীটা* যা করে, তোমার কি ধারণা তা সেটা করতে পারে? পৃথিবীটাও কিন্তু মহাশূন্যে ভেসে বেড়াচ্ছে।

দুঃখজনক ব্যাপার হলো, আমরা যে শুধু মাধ্যাকর্ষণ শক্তির ব্যাপারটাতেই অভ্যস্ত হয়ে যাই তা নয়। নিমেষের মধ্যে গোটা পৃথিবীর ব্যাপারেই অভ্যস্ত হয়ে পড়ি আমরা। মনে হয় যেন বড় হয়ে ওঠার প্রক্রিয়াটি চলার সময় আমরা বিস্মিত হওয়ার ক্ষমতাটি হারিয়ে ফেলি। আর তাতে করে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা কিছু হারিয়ে ফেলি—আর সেই

হারিয়ে ফেলা জিনিসটিই ফের খুঁজে বের করার চেষ্টা করেন দার্শনিকেরা। কারণ, আমাদের ভেতরে কোথাও থেকে কিছু একটা বলে ওঠে যে, জীবন এক বিশাল রহস্য। আর ঠিক এই ব্যাপারটিই আমরা উপলব্ধি করেছিলাম অনেক আগে, যখন এই কথাটি আমরা ভাবতে শিখিনি।

আরো সঠিকভাবে বলতে গেলে দার্শনিক প্রশ্নগুলো আমাদের সবাইকেই ভাবিত করলেও আরও সবাই কিন্তু দার্শনিক হই না। নানান কারণে বেশিরভাগ লোকই প্রাত্যহিক কর্মকাণ্ডে এমনই বাঁধা পড়ে যায় যে বিশ্ব সম্পর্কে তাদের বিস্ময় এসবের আড়ালে চলে যায়। (তারা হামাগুড়ি দিয়ে সেই খরগোশটার রোমের গহীন ভেতরে ঢুকে পড়ে, গুটিসুটি মেরে থাকে আয়েশের সঙ্গে আর তারপর ওখানেই কাটিয়ে দেয় সারাটা জীবন।)

বাচ্চাদের কাছে এই বিশ্ব আর তার সমস্ত কিছুই নতুন; এমন একটা কিছু যা দেখে বিস্ময় জাগে। বড়োদের কাছে ব্যাপারটা সে-রকম নয়। বিশ্বটাকে বড়োরা একটা স্বাভাবিক ঘটনা বলেই ধরে নেয়।

ঠিক এই জায়গাটাতেই দার্শনিকেরা এক বিরাট ব্যতিক্রম। একজন দার্শনিক কখনোই এই বিশ্বের ব্যাপারে ঠিক পুরোপুরি অভ্যস্ত হয়ে পড়েন না। তিনি পুরুষ বা নারী যা-ই হোন না কেন, তাঁর কাছে বিশ্বটা খানিকটা অযৌক্তিক বলে ঠেকতে থাকে— মনে হতে থাকে হতবুদ্ধিকর, এমনকি হেঁয়ালিভরা। দার্শনিক আর ছোট্ট শিশুদের মধ্যে তাই একটা গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় খুব মিল। তুমি বলতে পারো যে, সারা জীবন একজন দার্শনিক একটা শিশুর মতোই স্পর্শকাতর রয়ে যান। কাজেই এখন তোমাকে অবশ্যই বেছে নিতে হবে, সোফি। তুমি কি সেই বালিকা যে এখনো জীবন সম্পর্কে বীতস্পৃহ হয়ে পড়েনি? নাকি তুমি এক দার্শনিক যে প্রতিজ্ঞা করবে সে কখনোই তা হবে না?

নিজেকে একটি বালিকা বা একজন দার্শনিক হিসেবে স্বীকৃতি না দিয়ে তুমি যদি স্রেফ মাথা ঝাঁকাও, তাহলে বুঝতে হবে এই বিশ্বের ব্যাপারে তুমি এরই মধ্যেই অভ্যস্ত হয়ে পড়েছ। সাবধান! তুমি কিন্তু পাতলা বরফের স্তরের ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছ। আর সেই কারণেই দর্শনের ওপর এই কোর্সটি তোমাকে দেয়া হচ্ছে, যাতে তোমার কোনো বিপদ না ঘটে। উদাসীন আর নিস্পৃহ মানুষের সারিতে অন্যরা ভিড়লেও তোমাকে ভিড়তে দেবো না আমি। আমি চাই তুমি একটি অনুসন্ধানী মনের অধিকারী হও।

পুরো কোর্সটিই বিনামূল্যে দেয়া হচ্ছে তোমাকে, কাজেই যদি এটা সম্পূর্ণ না করো তাহলে কোনো টাকা ফেরত পাচ্ছো না তুমি। কোর্সটা মাঝপথে ছেড়ে দেবার ব্যাপারে তোমার পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে। সেক্ষেত্রে ডাকবাক্সে তুমি অবশ্যই একটি মেসেজ রেখে দেবে। জ্যান্ত একটা ব্যাঙ হলে খুব ভালো হয়। কিংবা অন্তত সবুজ রঙের কোনো কিছু, নইলে ডাকপিয়ন আবার ভয় পেয়ে যেতে পারে।

তো, সংক্ষেপে ব্যাপারটা হচ্ছে: একটা টপ হ্যাটের ভেতর থেকে সাদা একটা খরগোশ বের করা হয়েছে। খরগোশটা যেহেতু বিশাল বড় তাই খেলাটা খেলতে বেশ কয়েক বিলিয়ন বছর লেগেছে। খরগোশটার মিহি-মসৃণ রোমের ডগায় জন্ম নিয়েছে সমস্ত মানুষ আর সেখানে বসে তারা ভাবছে কী করে অসম্ভব চাতুর্যপূর্ণ এই কাজটি

সম্ভব হলো। কিন্তু তাদের বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তারা সেই রোমের আরও গভীরে ঢুকে যেতে থাকে। তারপর সেখানেই থাকে তারা। এমন চমৎকারভাবে থিতু হয়ে যায় যে কখনোই আর সেই পলকা রোম বেয়ে ওপরে ওঠার ঝুঁকি নেয় না। দার্শনিকেরাই কেবল ভাষা ও অস্তিত্বের দূরতম প্রদেশে পৌঁছানোর বিপজ্জনক অভিযানে নেমে পড়েন। তাঁদের কেউ কেউ পিছু হটে যান। কিন্তু বাকিরা মরিয়া হয়ে লেগে থাকেন আর চেঁচাতে থাকেন আরামদায়ক কোমলতার গভীরে বাসরত লোকজনের উদ্দেশ্যে, যারা তাদের উদরপূর্তি করছে মজাদার খাবার-দাবার আর পানীয় দিয়ে।

দার্শনিকরা চেঁচিয়ে বলে ওঠেন, 'ভদ্রমহিলা এবং ভদ্রমহোদয়গণ, আমরা মহাশূন্যে ভেসে বেড়াচ্ছি!' কিন্তু নিচের লোকজনের তাতে বয়েই গেল।

তারা বরং বলে ওঠে, 'যত্তসব আপদ!' তারপর ফিরে যায় নিজেদের গালগল্পে : 'মাখনটা একটু এগিয়ে দেবে, দয়া করে? শেয়ারবাজার আজ কতটা চাঙ্গা হলো? টমেটোর দর কত এখন? শুনেছো, প্রিন্সেস ডায়ানা নাকি আবার মা হচ্ছেন?'

সেদিন বিকেলবেলা যখন সোফির মা পরে বাড়ি ফিরলেন, সোফির অবস্থা তখন আসলেই শোচনীয়। রহস্যময় দার্শনিকের পাঠানো চিঠিগুলো টিনের যে-কৌটোর মধ্যে আছে সেটা খুব নিরাপদে গুহার মধ্যে লুকিয়ে রাখা হয়েছে। সোফি হোমওয়ার্ক শুরু করার চেষ্টা করছে, কিন্তু খানিক আগেই পড়া জিনিসগুলো নিয়ে চিন্তা করা ছাড়া আর কিছুই করতে পারেনি সে।

এর আগে কোনো কিছু নিয়ে এত মাথা ঘামায়নি সে! এখন আর সে ছোট্ট খুকিটি নেই ঠিকই, কিন্তু তাই বলে সে-অর্থে বড়-ও হয়নি সে। সোফি উপলব্ধি করল, মহাবিশ্বের টপ হ্যাটটার ভেতর থেকে যে-খরগোশটাকে বের করে আনা হয়েছিল সেটার আরামদায়ক রোম বেয়ে এরই মধ্যে সে গুঁড়ি মেরে নিচে নামতে শুরু করেছিল। কিন্তু দার্শনিক লোকটি তাকে থামিয়ে দিয়েছেন। উনি—তিনি কি পুরুষ না নারী?—তার ঘাড়ের পেছনে ধরে টেনে তাকে ফের তুলে এনেছেন রোমের ডগায়, যেখানে ছোটবেলায় সে খেলে বেড়িয়েছে। আর সেখান থেকে মিহি-মসৃণ রোমের সবচেয়ে ওপরের ডগা থেকে যেন প্রথমবারের মতো আবার জগৎটাকে দেখছে সে।

দার্শনিক তাকে বাঁচিয়েছেন। কোনো সন্দেহ নেই এ-ব্যাপারে। নিত্যদিনের পরিচিত জীবনযাত্রার নানান তুচ্ছতার হাত থেকে বাঁচিয়েছেন তাকে অজ্ঞাতপরিচয় লোকটি।

পাঁচটার সময় মা বাসায় ফিরতে সোফি তাঁকে লিভিংরুমে টেনে এনে একটা আর্মচেয়ারে বসিয়ে দিল ধাক্কা দিয়ে। তারপর সে শুরু করল, 'মা , তোমার কি মনে হয় না বেঁচে থাকাটা একটা আশ্চর্য ব্যাপার?'

সোফির মা এতই অবাক হলেন যে প্রথমে কোনো জবাবই দিলেন না। তিনি বাড়ি ফিরতে ফিরতে তাঁর মেয়ে সচরাচর তার হোমওয়ার্ক নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

তিনি বললেন, 'তা হয় অবশ্য—কখনো, কখনো।'

'কখনো, কখনো? বুঝলাম, কিন্তু তোমার কি মনে হয় না, বিশ্বটা যে আদৌ *টিকে আছে* সেটাই একটা আশ্চর্য ব্যাপার? '

'দ্যাখ, সোফি, এ-সব কথাবার্তা বন্ধ কর।'

'কেন? তাহলে কি তোমার ধারণা পৃথিবীটা বেশ সহজ আর স্বাভাবিক অবস্থাতেই আছে?'

'আছেই তো, তাই না? কম-বেশি স্বাভাবিকই তো আছে।'

সোফি দেখলো দার্শনিক লোকটার কথাই ঠিক। বড়রা পৃথিবীটাকে বিনা তর্কেই মেনে নিয়েছে। তাদের নীরস অস্তিত্বের মোহমুগ্ধ ঘুমের মধ্যে নিজেদেরকে পুরোপুরি সমর্পিত হতে দিয়েছে তারা।

'এই বিশ্বের ব্যাপারে তুমি এতোটাই অভ্যস্ত হয়ে পড়েছো যে কিছুই আর অবাক করে না তোমাকে।'

'এ-সব কী বলছিস তুই?'

'আমি বলছি তুমি সবকিছুর ব্যাপারেই অভ্যস্ত হয়ে গেছো। অন্য কথায় বলতে গেলে, একেবারে ভোঁতা হয়ে গেছো।'

'আমার সঙ্গে কেউ এভাবে কথা বলুক আমি তা চাই না, সোফি!'

'ঠিক আছে, ব্যাপারটা আমি ঘুরিয়ে বলছি। মহাবিশ্বের টপ হ্যাটের ভেতর থেকে সে সাদা খরগোশটা এই মুহূর্তে বের করে আনা হচ্ছে সেটার রোমের অনেক গভীরে তুমি আরাম করে বসে আছো। এক মিনিটের মধ্যেই তুমি চুলোয় আলুগুলো চড়িয়ে দেবে। তারপর খবরের কাগজটা পড়বে আর তারপর, আধঘন্টার একটা ঘুম দিয়ে উঠে টিভিতে খবর দেখতে বসে যাবে।'

উদ্বেগের একটা ছায়া নেমে এলো সোফির মায়ের মুখে। আসলেই তিনি রান্নাঘরে গিয়েছিলেন, আলুগুলো চুলোয় চড়িয়ে দিয়ে খানিক পর বসার ঘরে ফিরে এসেছেন। তো, এবার তিনিই সোফিকে *ঠেলে* একটা আর্মচেয়ারে বসিয়ে দিলেন।

বললেন, 'একটা ব্যাপারে তোর সঙ্গে কথা বলতেই হচ্ছে আমাকে।' তাঁর গলা শুনেই সোফি বুঝে গেল জরুরি কোনো বিষয়ে কথা বলবেন মা।

'তুই ড্রাগ-ট্রাগ নিতে শুরু করিসনি তো, মা?'

সোফি প্রায় হেসে উঠতে যাচ্ছিল, কিন্তু কেন প্রশ্নটা করা হচ্ছে সে বুঝতে পারল। সে বলল, 'তুমি কি পাগল হলে? প্রশ্নটা করে *আরও বোকা*-ই সাজলে!'

ড্রাগ বা খরগোশ নিয়ে সেদিন সন্ধ্যায় আর কোনো কথা হলো না।

পু রা ণ

চার

...শুভ ও অশুভ শক্তির মধ্যে এক বিপজ্জনক ভারসাম্য...

পরদিন সকালে কোনো চিঠি এলো না সোফির জন্যে। শেষ না হতে চাওয়া দিনটার পুরোটা সময় জুড়ে একঘেঁয়েমিতে হাঁপিয়ে উঠল সে। ক্লাস-ব্রেকগুলোর সময় খেয়াল রাখল জোয়ানার সঙ্গে যেন একটু ভালো ব্যবহার করা হয়। বাড়ি ফেরার পথে দু'জনের মধ্যে আলাপ হলো বনটা যথেষ্ট রকম শুকনো হয়ে উঠলেই ক্যাম্পিং-এ যাওয়া নিয়ে।

অনন্তকাল মনে হওয়া সময়টার পর আরেকবার ডাকবাক্সের কাছে গিয়ে দাঁড়াল সে। প্রথমে খুলল মেক্সিকোর পোস্টমার্ক দেয়া একটা চিঠি। ওর বাবা পাঠিয়েছেন। বাড়ি ফেরার জন্য কেমন উন্মুখ হয়ে আছেন আর কেমন করে চিফ অফিসারকে প্রথমবারের মতো দাবায় হারাতে পেরেছেন তাই লিখেছেন তিনি। আরও লিখেছেন, শীতের ছুটির শেষে যে একগাদা বই সঙ্গে নিয়েছিলেন তা প্রায় শেষ করে এনেছেন। আর তারপরেই, সোফির নাম লেখা বাদামি রঙের একটা খাম !

স্কুল ব্যাগ আর বাকি চিঠিগুলো বাড়িতে রেখে নিজের আস্তানার দিকে ছুট লাগাল সোফি। টাইপ করা নতুন পৃষ্ঠাগুলো বের করে নিয়ে শুরু করল পড়তে

পৌরাণিক বিশ্বচিত্র

এই যে, সোফি! অনেক কাজ পড়ে রয়েছে আমাদের । কাজেই দেরি না করে শুরু করে দিচ্ছি আমরা।

দর্শন বলতে আমরা চিন্তার একেবারে সেই নতুন পদ্ধতিটির কথা বুঝি যার উদ্ভব হয়েছিল খ্রিস্টের জন্মের প্রায় ছ'শ বছর আগে। সেই সময়ের আগ পর্যন্ত লোকজন তাদের সমস্ত প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পেত বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে। এই ধর্মীয় ব্যাখ্যাগুলো পুরাণ-এর রূপ ধরে এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মের কাছে পৌঁছেছে। আর পুরাণ হলো বিভিন্ন দেব-দেবীর গল্প, যে-গল্পগুলো ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করে যে, যে-জীবনকে আমরা দেখি তা এমন কেন।

দার্শনিক প্রশ্নের অযুত পৌরাণিক ব্যাখ্যা শত সহস্র বছর ধরে পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে। গ্রিসের দার্শনিকেরা প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে এ-সব ব্যাখ্যায় আর

বিশ্বাস করা যায় না।

প্রথমদিককার দার্শনিকদের চিন্তা-ভাবনা কেমন ছিল তা বুঝতে হলে আমাদেরকে বুঝতে হবে বিশ্বের একটি পৌরাণিক চিত্র মনের মধ্যে থাকার অর্থ কী। উদাহরণ হিসেবে আমরা কয়েকটি নর্ডিক[৩] পুরাণের কথা বলতে পারি। (তেলে মাথায় তেল দিয়ে তো আর লাভ নেই।)

তুমি হয়ত থর আর তার হাতুড়ির কথা শুনে থাকবে। নরওয়েতে খ্রিস্টধর্ম আসার আগে লোকে বিশ্বাস করত দুই ছাগলে টানা একটি রথে চড়ে আকাশের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত আসা-যাওয়া করেন থর। তিনি হাতুড়ি দোলালে বজ্র আর বিদ্যুচ্চমকের সৃষ্টি হয়। নরওয়েজীয় ভাষায় 'বজ্র'—'Thordon'—মানে হলো থরের গর্জন। সুইডিশ ভাষায় 'বজ্র' বোঝাতে ব্যবহৃত হয় 'åska' শব্দটি, যার মূল 'ås-aka', এবং অর্থ হলো স্বর্গের ওপর দিয়ে 'ঈশ্বরের ভ্রমণ'।

বজ্র আর বিদ্যুতের সঙ্গে বৃষ্টিও থাকে আর এই বৃষ্টি ভাইকিং চাষীদের জন্য ছিল খুব জরুরি। কাজেই থরকে পূজা করা হতো উর্বরতার দেবতা হিসেবে।

সুতরাং বৃষ্টির পৌরাণিক ব্যাখ্যাটি ছিল এই যে থর তার হাতুড়ি দোলাচ্ছেন। আর বৃষ্টি হলেই শস্য গজিয়ে উঠত আর ক্ষেত ভরে ফেলত।

ক্ষেতে কীভাবে উদ্ভিদ জন্মায় আর তা থেকে ফসল ফলে সেটা কেউই বুঝত না। কিন্তু এর সঙ্গে যে বৃষ্টির সম্পর্ক আছে সেটা যেন কী করে পরিষ্কার বুঝে যেত সবাই। আর সবাই যেহেতু বিশ্বাস করত থরের সঙ্গে বৃষ্টির একটা যোগাযোগ আছে তাই নরওয়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দেবতাদের অন্যতম ছিলেন থর।

থরকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করার আরেকটা কারণ ছিল, এমন একটা কারণ যার সঙ্গে একটা সম্পর্ক রয়েছে সমগ্র বিশ্ব পরিস্থিতির।

ভাইকিংরা বিশ্বাস করত যে পৃথিবীর যে-অংশে মানুষ বাস করে সে-অংশটি এমন একটি দ্বীপ যার ওপর বাইরের শত্রুর আক্রমণের সার্বক্ষণিক হুমকি রয়েছে। এই অংশটিকে বলত তারা মিডগার্ড, যার অর্থ মাঝখানের রাজ্য। মিডগার্ডের ভেতরেই আসগার্ড রাজ্য, দেবতাদের বাসস্থান।

মিডগার্ডের বাইরে উটগার্ড রাজ্য, বিশ্বাসঘাতক দৈত্যদের বাসস্থান; বিশ্বকে শাস্তি দিতে আর ধ্বংস করতে এই দৈত্যরা সব ধরনের ধূর্ততার আশ্রয় নিত। এ-ধরনের দুষ্ট দানবদের সাধারণত 'নৈরাজ্যের শক্তি' বলা হয়। দেখা গেছে, শুধু নরওয়ের পুরাণেই নয়, সব সংস্কৃতিতেই শুভ আর অশুভ শক্তির মধ্যে একটা বিপজ্জনক ভারসাম্য বজায় থাকে।

মিডগার্ড ধ্বংস করার অনেক উপায়ের একটি হলো উর্বরতার দেবী ফ্রেইয়াকে অপহরণ করা। এ-কাজটি করা গেলে ক্ষেতে কিছুই ফলবে না, মেয়েদেরও আর সন্তান হবে না। কাজেই এই দৈত্যদের বাধা দেয়া খুব জরুরি হয়ে পড়ে।

দৈত্যদের সঙ্গে যুদ্ধে থর একটি প্রধান চরিত্র। বৃষ্টি নামানো ছাড়াও তাঁর হাতুড়ি অন্য কিছু কাজ করতে পারত; নৈরাজ্যের বিপজ্জনক শক্তিগুলোর বিরুদ্ধে যুদ্ধে ওটা

---

৩. নর্ডিক দেশ বলতে বোঝায় ডেনমার্ক, নরওয়ে, সুইডেন এবং আইস্যান্ডকে—অনুবাদক।

ছিল একটা প্রধান অস্ত্র। সেই অস্ত্রটি তাঁকে প্রায় সীমাহীন শক্তির অধিকারী করে তুলেছিল। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, এটা ছুঁড়ে তিনি দৈত্যগুলোকে হত্যা করতে পারতেন। অস্ত্রটা হারিয়ে ফেলা নিয়ে তাকে চিন্তা করতে হতো না, তার কারণ বুমেরাঙের মতো অস্ত্রটা সব সময় তাঁর কাছে ফিরে আসত।

প্রকৃতির ভারসাম্য কীভাবে বজায় থাকত আর শুভ ও অশুভের মধ্যে কেন সব সময় যুদ্ধ চলত এটা তার একটা *পৌরাণিক* ব্যাখ্যা এবং দার্শনিকেরা *ঠিক* এ-ধরনের ব্যাখ্যাই বাতিল করে দিলেন।

কিন্তু এটা কেবল একটা কিছু ব্যাখ্যার ব্যাপার ছিল না।

খরা আর প্লেগের মতোন বিপর্যয় আসন্ন হলে মানুষ স্রেফ হাত-পা গুটিয়ে এই আশায় বসে থাকত না যে দেবতারা এ-সবের প্রতিকার করে দেবেন। অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধে তাদের নিজেদেরই উদ্যোগ নিতে হতো। এ-কাজটা তারা করত বিভিন্ন ধরনের ধর্মীয় অনুষ্ঠান বা আচার-এর মাধ্যমে।

নরওয়ের ইতিহাসের সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ ধর্মীয় অনুষ্ঠান ছিল *নৈবেদ্যদান*। কোনো দেবতার উদ্দেশ্যে কোনো নৈবেদ্য দেয়ার মানে ছিল সেই দেবতার শক্তি বৃদ্ধি করা। যেমন ধরো, মানুষকে দেবতাদের উদ্দেশ্যে এই কারণে নৈবেদ্য দিতে হতো যেন তাঁরা নৈরাজ্যের শক্তিগুলোকে জয় করার ক্ষমতা অর্জন করেন। কাজটা তারা করত দেবতাদের উদ্দেশ্যে কোনো জন্তু বলি দিয়ে। থরের উদ্দেশ্যে সাধারণত কোনো ছাগল বলি দেয়া হতো। ওদিন-এর (Odin) উদ্দেশ্যে কখনো কখনো নরবলির মাধ্যমে নৈবেদ্য দেয়া হতো।

নর্ডিক দেশগুলোর সবচেয়ে পুরনো পুরাণটি পাওয়া যাবে এডিক[৪] কবিতা 'থ্রীম-এর গাথা'-য়। সেই গাথা অনুযায়ী, একদিন থর ঘুম থেকে উঠে দেখতে পান তাঁর হাতুড়িটা চুরি হয়ে গেছে। এ-ঘটনায় তিনি এতটাই রেগে গেলেন যে তার হাত দুটো কাঁপতে লাগল, দাড়ি নড়তে শুরু করল। তখন তিনি তাঁর অনুচর লোকিকে সঙ্গে নিয়ে ফ্রেইয়ার কাছে গেলেন তার ডানা দুটো ধার নিতে, যাতে করে, যারা তাঁর হাতুড়িটা চুরি করেছে লোকি তাদের তত্ত্ব-তালাশ করতে পারে দৈত্যদের দেশ জোটুনহেইমে গিয়ে।

জোটুনহেইমে দৈত্যদের রাজা থ্রীমের সঙ্গে দেখা হলো লোকির আর তাকে দেখেই দৈত্যরাজ বড় গলায় বলতে লাগল হাতুড়িটা সে মাটির সাত লীগ[৫] গভীরে লুকিয়ে রেখেছে। সে এ-ও বলল যে ফ্রেইয়াকে তার বৌ হিসেবে তার হাতে তুলে দেয়া না হলে দেবতারা হাতুড়িটা ফেরত পাবে না।

---

৪. এডা (Edda) হচ্ছে প্রাচীন আইসল্যান্ডীয় সাহিত্যের দুটো সংগ্রহের নাম; এই এডাকেই প্রাচীন স্কান্ডিনেভীয় পুরাণের প্রধান উৎস হিসেবে গণ্য করা হয়। সংগ্রহ দুটোর নাম হচ্ছে 'গদ্য এডা' যা সম্পাদনা করেছিলেন স্নরি স্টুরলুসন নামের একজন আইসল্যান্ডীয় পাদ্রী ও সাহিত্যিক, আনুমানিক ১২৩০ খ্রিস্টাব্দে, এবং 'কাব্য এডা'—নবম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে রচিত কিছু কবিতার একটি সংগ্রহ; নরওয়ের কিছু অজ্ঞাতনামা কবির এই রচনাগুলো ১৬৪৩ খ্রিস্টাব্দে আবিষ্কৃত হয়—অনুবাদক।

৫. প্রায় একুশ মাইল—অনুবাদক।

অবস্থাটা তুমি বুঝতে পারছ নিশ্চয়ই, সোফি? হঠাৎ করেই দেবতারা দেখতে পেলেন তাঁরা পুরোপুরি একটা পণবন্দি ধরনের ঘটনায় জড়িয়ে পড়েছেন। দেবতাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিরক্ষামূলক অস্ত্রটি জবরদখল করে ফেলেছে দৈত্যরা। এটা তো কোনো অবস্থাতেই মেনে নেয়া যায় না। থরের হাতুড়ি যতক্ষণ দৈত্যগুলোর কব্জায় থাকবে, ততক্ষণ দেবতা আর মানুষদের পৃথিবী তারাই নিয়ন্ত্রণ করবে। হাতুড়ির বদলে তারা ফ্রেইয়াকে দাবি করছে। কিন্তু এটাও ঠিক একই রকম অসম্ভব একটা ব্যাপার। যিনি সব ধরনের জীবন রক্ষা করেন সেই উর্বরতার দেবীকে যদি দেবতাদের ত্যাগ করতেই হয় তাহলে তো মাঠ থেকে সব ঘাস উধাও হয়ে যাবে, মরে যাবে দেবতা আর মানুষ সবাই। একটা অচলাবস্থার চূড়ান্ত আর কী।

পুরাণের ভাষ্য অনুযায়ী, লোকি এরপর আসগার্ডে ফিরে এসে ফ্রেইয়াকে বিয়ের পোশাক-আশাক পরে নিতে বলল, কারণ দৈত্যরাজকে বিয়ে করতে হবে তাঁর (হায় কপাল!)। ফ্রেইয়া তো সে-কথা শুনে মহা খাপ্পা; একটা দৈত্যকে বিয়ে করতে রাজি হলে লোকে বলবে না যে তিনি পুরুষ মানুষের জন্য পাগল?

দেবতা হেইমদালের মাথায় তখন একটা বুদ্ধি আসে। খোদ থরকে কনে সাজার পরামর্শ দেন তিনি। তাঁর চুলটা উঁচু করে বেঁধে নিলে আর পোশাকের নিচে দুটো পাথর রাখলে তাকে ঠিক মেয়েমানুষের মতোই দেখাবে। বোঝাই যায়, থর খুব একটা খুশি হলেন না পরামর্শটা শুনে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি বুঝতে পারলেন যে একমাত্র এভাবেই তিনি তাঁর হাতুড়িটা ফেরত পেতে পারেন।

কাজেই শেষমেষ থর নিজেকে কনে সাজানোর অনুমতি দিলেন। তাঁর সখী হিসেবে থাকবে লোকি।

হাল আমলের ভাষায় বলতে গেলে, থর আর লোকি হলো দেবতাদের 'সন্ত্রাসবিরোধী বাহিনী'। তাঁদের লক্ষ্য হচ্ছে নারীর ছদ্মবেশে দৈত্যদের ডেরায় ফাটল ধরানো আর থরের হাতুড়িটা উদ্ধার করা।

দেবতারা জোটুনহেইমে পৌছাতে দৈত্যরা বিয়ের ভোজ তৈরিতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু ভোজের সময় বর বাবাজী—অর্থাৎ থর—একাই গোটা একটা ষাঁড় আর আটটা স্যামন মাছ সাবড়ে দিলেন। সেই সঙ্গে উদরস্থ করলেন তিন ব্যারেল বিয়ারও। থ্রীম তো একেবারে তাজ্জব। 'কমাভোদের' আসল পরিচয় বেরিয়ে যায় আর কী। কিন্তু লোকি চটপট এই বলে ব্যাপারটা সামলে নিল যে জোটুনহেইমে আসার জন্য ফ্রেইয়া এমনই উদগ্রীব ছিলেন যে এক হপ্তা তিনি কিছুই মুখে তোলেননি।

কনেকে চুমো খেতে ঘোমটা তুলতেই থ্রীম আঁৎকে উঠে দেখতে পায় সে থরের জ্বলন্ত চোখ দুটোর দিকে তাকিয়ে আছে। এবারো লোকি-ই এই বলে পরিস্থিতি সামাল দিল যে কনে বিয়ের চিন্তায় এতোই উত্তেজিত হয়ে ছিলেন যে এক হপ্তা তাঁর ঘুমই হয়নি। তো, থ্রীম এবার হুকুম দিল হাতুড়িটা আনার জন্যে, বিয়ের অনুষ্ঠানের সময় সেটা কনের কোলের ওপর থাকবে।

হাতুড়িটা তাঁকে দেয়া হতেই থর একটা অট্টহাসি হেসে উঠলেন। প্রথমে তিনি সেটা দিয়ে থ্রীমকে হত্যা করলেন, তারপর নিকেশ করলেন সমস্ত দৈত্য আর তাদের আত্মীয়-স্বজনদের। আর এভাবেই ভয়ংকর পণবন্দি ঘটনাটার একটা সুখের

পরিসমাপ্তি ঘটল। থর—দেবতাদের ব্যাটম্যান বা জেমস বন্ড—আবারো পরাজিত করলেন দুষ্ট শক্তিকে।

নিছক পুরাণের ব্যাপারটার এখানেই ইতি টানছি, সোফি। কিন্তু এর পেছনের আসল মানেটা কী ? স্রেফ বিনোদনের জন্য এটা তৈরি করা হয়নি। পুরাণ সেই সঙ্গে কিছু একটা *ব্যাখ্যা* করারও চেষ্টা করে। একটা সম্ভাব্য ব্যাখ্যা এখানে দেয়া হলো

খরার সময় লোকে বৃষ্টি না হওয়ার একটা কারণ বের করার চেষ্টা করত। তারা ভাবত, দৈত্যরা থরের হাতুড়ি চুরি করে নিল না তো?

হয়ত পুরাণটা বছরের পরিবর্তনশীল ঋতুগুলোকে ব্যাখ্যা করারই একটা চেষ্টা শীতে যে প্রকৃতি মরে যায় তার কারণ হচ্ছে হাতুড়িটা তখন জোটুনহেইমে। কিন্তু বসন্তে তিনি সেটা আবার জিতে নিয়ে আসতে সক্ষম হন। অর্থাৎ, পুরাণ চেষ্টা করত লোকে যা বুঝতে পারত না তার একটা ব্যাখ্যা তাদেরকে দেবার।

কিন্তু পুরাণ যে কেবল একটা ব্যাখ্যাই ছিল তা কিন্তু নয়। লোকে সেই পুরাণের সঙ্গে সম্পর্কিত ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানগুলোও পালন করত। পুরাণের ঘটনাগুলোকে নাটকে রূপ দেবার সময় খরা বা ফসলহানির সময় লোকের প্রতিক্রিয়া কী হতো তা আমরা কল্পনা করে নিতে পারি। হয়ত গ্রামের একটা লোক কনে সাজত—বুকে পাথরের স্তন লাগিয়ে—দৈত্যদের কাছ থেকে হাতুড়িটা আবার চুরি করে নিয়ে আসার জন্যে। এই কাজটির মাধ্যমে লোকে আসলে তাদের মাঠে যাতে ফসল ফলে সেজন্য বৃষ্টি ঝরানোর একটা পদক্ষেপ নিত। পৃথিবীর অন্যান্য অংশেও এ-রকম অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে যে লোকে ঋতু সংক্রান্ত পুরাণগুলোকে নাট্যরূপ দিচ্ছে যাতে প্রাকৃতিক প্রক্রিয়াগুলোকে ত্বরান্বিত করা যায়।

এতোক্ষণ আমরা নর্স পুরাণের দিকে সংক্ষিপ্ত দৃষ্টিপাত করলাম মাত্র। কিন্তু থর আর ওদিন, ফ্রেইর আর ফ্রেইয়া, হোডার ও বল্ডার এবং আরও অসংখ্য দেবতা নিয়ে অনেক পুরাণ রয়েছে। এ-ধরনের পৌরাণিক ধারণা সারা বিশ্ব জুড়ে প্রসার লাভ করেছিল। দার্শনিকেরা এসে সেগুলোর অঙ্গবিচ্যুতি ঘটাতে শুরু করলেন।

গ্রিসে প্রথমদিককার দর্শন যখন বিকশিত হচ্ছিল তখন কিন্তু সেখানে পৌরাণিক বিশ্বচিত্র-ও বর্তমান ছিল। গ্রিক দেবতাদের গল্প প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে চলে আসছিল। গ্রিসের অসংখ্য দেব-দেবীর মধ্যে অল্প কয়েকজনের নাম বলছি তোমাকে, এঁরা হলেন জিউস ও অ্যাপোলো, হেরা ও অ্যাথেনা, ডায়োনিসাস ও অ্যাসক্লেপিয়াস, হেরাক্লেস ও হেফাস্টাস।

গ্রিক পুরাণের বেশিরভাগই হোমার আর হেসিওড লিখে ফেলেছিলেন ৭০০ খ্রিস্ট পূর্বাব্দের দিকে। এটা একটা পুরোপুরি নতুন পরিস্থিতির সৃষ্টি করল। পুরাণের লিখিত রূপ পাওয়া যাওয়াতে তা নিয়ে আলোচনা করা সম্ভব হলো।

একেবারে গোড়ার দিককার দার্শনিকেরা এই কারণে হোমারের পুরাণের সমালোচনা করেছিলেন যে তাঁর দেব-দেবীদের সঙ্গে মানুষের মিল খুব বেশি এবং তারা মানুষের মতোই অহংসম্পন্ন ও বিশ্বাসঘাতক। এই প্রথমবারে মতো এ-কথা বলা গেল যে পুরাণ মানুষেরই মতামত ছাড়া কিছু নয়।

এই দৃষ্টিভঙ্গির একজন প্রবক্তা হলেন জেনোফেনেস, যাঁর জন্ম প্রায় ৫৭০ খ্রিস্ট

পূর্বাব্দে। তিনি বললেন, মানুষ ঈশ্বরকে তার নিজের প্রতিরূপ হিসেবে সৃষ্টি করেছে। তারা বিশ্বাস করে দেবতারা জন্মগ্রহণ করে এবং তাদের আমাদের মতোই দেহ, কাপড়চোপড় এবং ভাষা রয়েছে। ইথিওপিয়রা বিশ্বাস করে দেবতারা কালো এবং চ্যাপ্টা নাকবিশিষ্ট। থ্রেসিয়দের বিশ্বাস দেবতারা নীল চোখ আর সুন্দর চুলের অধিকারী। ষাঁড়, ঘোড়া আর সিংহরা যদি আঁকতে পারত তাহলে তাদের দেবতারাও ষাঁড়, ঘোড়া আর সিংহের মতোই হতো!

সেই সময়ে গ্রিকরা গ্রিস এবং গ্রিসের উপনিবেশ দক্ষিণ ইতালি ও এশিয়া মাইনরে বেশ কিছু নগর-রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে, সেখানে সমস্ত কায়িক পরিশ্রম করত দাসরা, তাতে করে নাগরিকেরা তাদের সময় ব্যয় করতে পারত রাজনীতি আর সংস্কৃতি নিয়ে।

এই নাগরিক পরিবেশে লোকে পুরোপুরি নতুনভাবে চিন্তা করতে শুরু করল। সমাজ কীভাবে বিন্যস্ত হবে তা নিয়ে পুরোপুরি নিজ দায়িত্বে একজন লোক প্রশ্ন তুলতে পারতো। আর এভাবে একজন ব্যক্তি প্রাচীন পুরাণের সাহায্য না নিয়েই জিজ্ঞেস করতে পারতো নানান সব দার্শনিক প্রশ্ন।

একে আমরা বলি পৌরাণিক ধরনের চিন্তাধারা থেকে অভিজ্ঞতা ও প্রজ্ঞাভিত্তিক চিন্তাধারার বিকাশ। প্রথমদিককার গ্রিক দার্শনিকদের উদ্দেশ্য ছিল প্রাকৃতিক প্রক্রিয়াগুলোর *প্রাকৃতিক* ব্যাখ্যা খুঁজে বের করা, অতিপ্রাকৃত ব্যাখ্যা নয়।

* * *

গুহা থেকে বেরিয়ে এসে বিশাল বাগানটায় ঘুরে বেড়াতে লাগল সোফি। স্কুলে, বিশেষ করে বিজ্ঞান ক্লাসে সে যা শিখেছে তা ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করল।

প্রকৃতি সম্পর্কে আদৌ কিছু না শিখে যদি সে এ-বাগানে বড় হয়ে থাকে তাহলে বসন্তকাল সম্পর্কে তার অনুভূতি কী হবে?

হঠাৎ করে একদিন কেন বৃষ্টি পড়তে শুরু করল তার একটা ব্যাখ্যা আবিষ্কার করার চেষ্টা করবে নাকি সে? তুষারগুলো কোথায় গেল বা সকালে সূর্য কেন উঠল তার একটা কাল্পনিক ব্যাখ্যা দাঁড় করানোর চেষ্টা করে দেখবে সে?

হ্যাঁ, আলবৎ করবে সে। গল্পটা বানাতে শুরু করল সে

দুষ্ট মুরিয়াট সুন্দরী রাজকন্যা সিকিতাকে ঠাণ্ডা একটা কারাগৃহে বন্দি করে রেখেছিল বলে শীত পৃথিবীকে তার বরফশীতল মুঠোয় ধরে রাখে। কিন্তু একদিন সকালে সাহসী রাজপুত্র ব্র্যাভাটো এসে উদ্ধার করে রাজকন্যাকে। সিকিতা এত খুশি হয় যে অন্ধকার কারাকক্ষে রচনা করা একটা গান গাইতে গাইতে নাচতে শুরু করে তৃণভূমির ওপর। ধরণী এবং গাছেরা সে-গান শুনে এতই অভিভূত হয়ে যায় যে সমস্ত তুষার পরিণত হয় অশ্রুতে। কিন্তু তখনই সূর্য বেরিয়ে এসে সব অশ্রু শুকিয়ে ফেলে। পাখিরা সিকিতার গানটা অনুকরণ করে এবং সুন্দরী রাজকন্যা যখন তার সোনালী চুলের গুচ্ছ মেলে দেয় তখন কয়েকটি অলকচূর্ণ মাটিতে পড়ে রূপান্তরিত হয় মাঠের লিলি ফুলে...

নিজের সুন্দর গল্পটা বেশ পছন্দ হলো সোফির। পরিবর্তনশীল ঋতুগুলোর

ব্যাপারে অন্য আর কোনো ব্যাখ্যা যদি তার মনে না-ও থাকে তাহলে শেষ পর্যন্ত সে যে তার নিজের গল্পটাকেই বিশ্বাস করবে এ-ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে গেল সে।

সোফি উপলব্ধি করল প্রাকৃতিক প্রক্রিয়াগুলো ব্যাখ্যা করার একটা প্রয়োজনীয়তা মানুষ সব সময়ই অনুভব করেছে। হতে পারে, এ-ধরনের ব্যাখ্যা ছাড়া তারা বাঁচতেই পারতো না। আর তারা এ-সব পুরাণ এমন সময় তৈরি করেছিল যখন বিজ্ঞান নামের কোনো কিছুই ছিল না।

প্র কৃ তি বা দী দা র্শ নি ক বৃ ন্দ

...শূন্য থেকে কিছুই সৃষ্টি হতে পারে না...

সেদিন বিকেলে সোফির মা যখন কাজ থেকে ফিরে এলেন, সে তখন তার গ্লাইডারে বসে এই দর্শনবিষয়ক কোর্স আর হিল্ডা মোলার ন্যাগের মধ্যকার সম্ভাব্য যোগসূত্র খুঁজে বের করার চেষ্টা করছে। ভাবছে, নিজের বাবার কাছ থেকে জন্মদিনের কার্ড আর পাওয়া হচ্ছে না হিল্ডা মোলার ন্যাগের।

বাগানের অন্য প্রান্ত থেকে ওর মা ডাকলেন, 'সোফি! একটা চিঠি এসেছে তোর।'

শ্বাস বন্ধ হয়ে এলো সোফির। একটু আগেই ডাক বাক্স খালি করে সব চিঠি নিয়ে এসেছে সে। কাজেই চিঠিটা নিশ্চয়ই সেই দার্শনিকেরই হবে। মাকে এখন সে কী বলবে?

'চিঠিটায় কোনো ডাকটিকেট নেই। মনে হয়, লাভ লেটার।'

হাত বাড়িয়ে চিঠিটা নেয় সোফি।

'খুলবি না?'

একটা অজুহাত দাঁড় করাতে হবে।

'কখনো শুনেছো, মা ঘাড়ের ওপর দাঁড়িয়ে আছে এই অবস্থায় কেউ প্রেমপত্র খুলেছে?'

মা ভাবুক সে ওটা একটা প্রেমপত্র। ব্যাপারটা যদিও অস্বস্তিকর, তারপরেও, মা যদি দেখেন ওর সঙ্গে লুকোচুরি খেলছে এমন একজন পুরোপুরি অচেনা লোকের সঙ্গে সে একটা করেসপন্ডেন্স কোর্স করছে সেক্ষেত্রে ব্যাপারটা এর চাইতে খারাপ হবে।

আগের সেই ছোট্ট খামগুলোর মতোই এটা। ওপরের তলায় নিজের ঘরে পৌঁছে তিনটে নতুন প্রশ্ন পেল সোফি

> এমন কোনো মৌলিক পদার্থ কি আছে যা দিয়ে বাকি সব কিছু তৈরি হয়েছে?
>
> পানি কি মদে পরিণত হতে পারে?
>
> মাটি আর পানি কী করে একটা জীবন্ত ব্যাঙ তৈরি করে?

প্রশ্নগুলো সোফির কাছে নিতান্তই অর্থহীন মনে হলেও সারা সন্ধ্যা ওই প্রশ্নগুলোই

ঘুরপাক খেতে লাগল তার মাথার ভেতর। পরদিনও স্কুলে বসে ঐ প্রশ্নগুলোর কথাই ভাবতে লাগল সে, বাজিয়ে দেখতে থাকল প্রত্যেকটাকে।

এমন কোনো 'মৌলিক পদার্থ' কি আছে যা দিয়ে বাকি সব কিছু তৈরি হয়েছে?

সে-রকম কোনো কিছু যদি থেকেই থাকে তাহলে সেটা হঠাৎ কী করে একটা ফুল বা হাতি হয়ে যাবে? পানি মদে পরিণত হতে পারে কিনা এই প্রশ্নের বেলাতেও ওই একই আপত্তি খাটে। যিশু কী করে পানিকে মদে পরিণত করেছিলেন সেই রূপক কাহিনী সোফির জানা আছে, কিন্তু গল্পটাকে সে কখনোই আক্ষরিক অর্থে নেয়নি। আর যিশু যদি সত্যি সত্যি-ই পানিকে মদে পরিণত করে থাকেন সেক্ষেত্রে সেটা সম্ভব হয়েছিল এই কারণে যে ওটা ছিল একটা অলৌকিক ব্যাপার, যা স্বাভাবিক অবস্থায় করা যেতে পারে না। সোফি জানে, শুধু মদই না, অন্যান্য জীবন্ত প্রাণীতেও প্রচুর পরিমাণে পানি আছে। কিন্তু শসার ভেতর পানির পরিমাণ ৯৫ ভাগ হলেও সেটার মধ্যে নিশ্চয়ই অন্য জিনিসও আছে, কারণ শসা শসা-ই, পানি নয়।

এরপর রয়েছে সেই ব্যাঙের প্রশ্নটা। ব্যাঙের ব্যাপারে ওর দর্শন শিক্ষকের একটা অদ্ভুত বাতিক আছে দেখা যাচ্ছে।

সোফি হয়ত এটা মেনে নেবে যে ব্যাঙ মাটি আর পানি দিয়ে তৈরি, তবে সেক্ষেত্রে মাটি নিশ্চয়ই একাধিক বস্তুর সৃষ্টি। মাটি যদি ভিন্ন ভিন্ন নানান জিনিস দিয়ে তৈরি হয়ে থাকে তাহলে এটা খুবই সম্ভব যে মাটি আর পানি একসঙ্গে মিলে ব্যাঙ সৃষ্টি করেছে। অবশ্য, মাটি আর পানি যদি ব্যাঙের ডিম আর ব্যাঙাচির স্তরের ভেতর দিয়ে গিয়ে থাকে তবেই সেটা সম্ভব। কারণ, ব্যাঙ তো আর স্রেফ একটা বাঁধাকপির পিণ্ড থেকে তৈরি হতে পারে না, তা সেটাতে যতই পানি ঢালা হোক না কেন।

স্কুল থেকে বাড়ি ফিরে সোফি দেখল মোটাসোটা একটা খাম অপেক্ষা করছে তার জন্যে। অন্যান্য দিনের মতো গুহার মধ্যে গা-ঢাকা দিল সে।

দার্শনিকের প্রকল্প

আবার শুরু করছি আমরা! সাদা খরগোশ ইত্যাদির কাসুন্দি বাদ দিয়ে আজ আমরা সরাসরি আগের পাঠে চলে যাবো।

প্রাচীন গ্রিকদের থেকে শুরু করে একেবারে আমাদের আজকের সময় পর্যন্ত লোকজন যেভাবে দর্শন নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করেছে তারই একটা খুবই মোটা দাগের ছবি তুলে ধরছি আমি। তবে বিষয়গুলোকে আমরা সঠিক ক্রম অনুযায়ী বেছে নেবো।

দার্শনিকদের মধ্যে কেউ কেউ যেহেতু আমাদের থেকে ভিন্ন সময়ে—একেবারেই ভিন্ন সংস্কৃতিতে—জীবনযাপন করেছেন, তাই প্রত্যেক দার্শনিকের প্রকল্প (project) কী ছিল সেটা বিচার করে দেখাটা খারাপ হবে বলে মনে করি না। প্রকল্প বলতে আমি বোঝাতে চাইছি এক একজন বিশেষ দার্শনিক ঠিক কোন বিষয়টি জানার জন্য উৎসুক সেটা অবশ্যই আমাদের বোঝার চেষ্টা করতে হবে। একজন দার্শনিক হয়ত জানতে চান গাছপালা এবং জীবজন্তু কীভাবে এলো। অন্য আরেকজন হয়ত জানতে চান

ঈশ্বরের অস্তিত্ব আছে কিনা বা মানুষের আত্মা অমর কিনা।

বিশেষ একজন দার্শনিকের প্রকল্প কী সেটা একবার বুঝতে পারা গেলে তাঁর চিন্তার সূত্র অনুসরণ করা অপেক্ষাকৃত সহজ হয়, তার কারণ কোনো দার্শনিকই দর্শনশাস্ত্রের পুরোটা নিয়ে ভাবিত হন না।

দার্শনিকের চিন্তার সূত্র বলতে পুরুষ দার্শনিকই বুঝিয়েছি তার কারণ এটা এক অর্থে পুরুষদেরও গল্প। অতীতকালের নারীদেরকে নারী এবং চিন্তাশীল মানুষ এই দুই দিক থেকেই অবদমিত করে রাখা হয়েছিল, যা খুবই দুঃখজনক, কারণ এর ফলে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অভিজ্ঞতার একটি বিরাট অংশই হারিয়ে গেছে। এই শতাব্দীর আগে পর্যন্ত নারীরা দর্শনের ইতিহাসে সত্যিকারের কোনো অবদান রাখতে পারেননি।

তোমাকে কোনো হোমওয়ার্ক... মানে অংকের জটিল কোনো প্রশ্ন বা সে-ধরনের কিছু দেয়ার ইচ্ছে আমার নেই আর ইংরেজি ভার্ব কনজুগেট করার ব্যাপারেও আমার বিন্দুমাত্র উৎসাহ নেই। তবে মাঝে মাঝে আমি ছোট খাটো দু-একটা অ্যাসাইনমেন্ট দেবো তোমাকে।

এ-সব শর্ত মানতে যদি তোমার কোনো আপত্তি না থাকে তাহলে আমরা শুরু করব।

প্রকৃতিবাদী দার্শনিকবৃন্দ

একেবারে গোড়ার দিককার গ্রিক দার্শনিকদের কখনো কখনো *প্রকৃতিবাদী দার্শনিক* বলা হয়ে থাকে, কারণ তাঁরা মূলত প্রাকৃতিক জগৎ আর সেটার ক্রিয়া-কর্ম নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করেছেন।

প্রত্যেকটি জিনিস কোথা থেকে এলো সে-প্রশ্ন আমরা এরই মধ্যে করে ফেলেছি। ইদানিং অনেকেই মনে করছেন কোনো এক সময় কোনো একটা কিছু নিশ্চয়ই একেবারে শূন্য থেকে সৃষ্টি হয়েছিল। গ্রিকদের মধ্যে এই ধারণাটি খুব একটা বিস্তার লাভ করেনি। কোনো না কোনো কারণে তারা ধরেই নিয়েছিল যে 'কিছু একটা' সব সময়ই ছিল।

কাজেই, শূন্য থেকে কী করে সব জিনিস সৃষ্টি হতে পারে সেটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ছিল না। পানি থেকে কী করে জ্যান্ত মাছ সৃষ্টি হচ্ছে বা প্রাণহীন মাটি থেকে কী করে বিরাট বিরাট গাছ আর রং-বেরং-এর অসাধারণ সব ফুলের জন্ম হচ্ছে সে-সব নিয়েই বরং মাথা ঘামাতো গ্রিকরা। মায়ের গর্ভ থেকে কী করে শিশুর জন্ম হয় তা নিয়ে-ও যে ভাবতো সে-কথাতো বলাই বাহুল্য।

দার্শনিকেরা সচক্ষেই দেখতে পেতেন যে প্রকৃতিতে নানান রূপান্তর ঘটছে। কিন্তু এ-সব রূপান্তর কীভাবে ঘটতে পারে?

এই যেমন ধরো, একটি প্রাণহীন বস্তু থেকে সজীব একটা কিছু কীভাবে সৃষ্টি হচ্ছে? একেবারে গোড়ার দিককার দার্শনিকেরা সবাই বিশ্বাস করতেন যে সব ধরনের পরিবর্তনের মূলে কোনো একটা মৌলিক বস্তু থাকতেই হবে। তবে কী করে যে তাঁরা

এই ধারণায় পৌঁছেছিলেন সে-কথা বলা শক্ত। আমরা কেবল এটুকু জানি একটা ধারণা বিকশিত হচ্ছিল যে প্রকৃতির সমস্ত পরিবর্তনের গুপ্ত কারণটি অবশ্যই একটি মৌলিক বস্তু। কিছু একটা নিশ্চয়ই রয়েছে যা থেকে সমস্ত কিছুর সৃষ্টি হচ্ছে এবং যার কাছে সব কিছু ফিরে যায়।

আমাদের কাছে সবচেয়ে আকর্ষণীয় বিষয় আসলে কিন্তু এটা নয় যে প্রাচীনতম এই দার্শনিকেরা কোন সমাধানে পৌঁছেছিলেন, বরং এটা যে তাঁরা কী কী প্রশ্ন করেছিলেন এবং কোন ধরনের উত্তর খুঁজছিলেন। তাঁরা কী চিন্তা করেছিলেন সেটার চাইতে তাঁরা কোন পদ্ধতিতে চিন্তা করেছিলেন সে-ব্যাপারেই বরং আমরা বেশি উৎসাহী।

আমরা জানি যে, প্রাকৃতিক জগতে তারা যে-সমস্ত পরিবর্তন লক্ষ করতেন সে-সম্পর্কেই বিভিন্ন প্রশ্ন উত্থাপন করতেন তাঁরা। প্রকৃতি যে-সব নিয়ম-কানুন মেনে চলে সে-সব নিয়ম-কানুনের খোঁজ করছিলেন তাঁরা। প্রাচীন পুরাণের সাহায্য ছাড়াই বুঝতে চেষ্টা করছিলেন তাঁদের চারপাশে কী ঘটে চলেছে। আর সবচেয়ে যেটা গুরুত্বপূর্ণ, খোদ প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করে তাঁরা বুঝতে চেয়েছিলেন আসল প্রক্রিয়াগুলো। দেবতাদের গপ্পো ফেঁদে বজ্র আর বিদ্যুৎ বা শীত ও বসন্তের ব্যাখ্যা দেয়া থেকে একেবারেই ভিন্ন ব্যাপার ছিল এটা ।

অর্থাৎ, ধর্ম থেকে ধীরে ধীরে নিজেকে মুক্ত করে নিচ্ছিল দর্শন। আমরা বলতে পারি, সবার আগে প্রকৃতিবাদী দার্শনিকেরাই বৈজ্ঞানিক বিচারের দিকে পা বাড়িয়েছিলেন আর তার ফলে হয়ে উঠছিলেন পরবর্তীকালে যা বিজ্ঞান নামে চিহ্নিত হবে তারই পথিকৃৎ।

প্রকৃতিবাদী দার্শনিকেরা যা বলে বা লিখে রেখে গেছেন তার খণ্ডাংশই মাত্র টিকে আছে। অল্প যেটুকু আমরা জানি সেটুকু পাওয়া যায় অ্যারিস্টটলের লেখায়, যিনি সেই সব দার্শনিকের দুশো বছর পর পৃথিবীতে বাস করে গেছেন। তাঁরা যে-সব সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন কেবল সেগুলোর কথাই উল্লেখ করেছেন তিনি। কাজেই, ঠিক কোন পথ অনুসরণ করে তাঁরা সে-সব সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন সে-কথা সব সময় জানা যায় না। তবে আমরা যেটুকু জানি তা দিয়ে এটুকু অন্তত প্রমাণ করা যায় যে প্রাচীনতম দার্শনিকদের প্রকল্পের বিবেচ্য বিষয় ছিল একটি মৌলিক, গঠনকারী উপাদান আর প্রকৃতিতে ঘটা নানান পরিবর্তন।

মিলেটাস-এর তিন দার্শনিক

আমরা যে-সব দার্শনিকের কথা জানি তাঁদের মধ্যে সর্ব প্রথম হচ্ছেন থেলিস (Thales); তাঁর বাড়ি ছিল এশিয়া মাইনরের এক গ্রিক উপনিবেশ মিলেটাস-এ। বহু দেশ ভ্রমণ করেছিলেন তিনি, তার মধ্যে মিশরও আছে; বলা হয়, সেখানে তিনি একটি পিরামিডের উচ্চতা নির্ণয় করেছিলেন আর তা তিনি করেছিলেন ঠিক এমন একটি সময়ে সেটার ছায়ার দৈর্ঘ্য মেপে যখন তাঁর নিজের ছায়ার দৈর্ঘ্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল তাঁর

উচ্চতার সমান। আরও বলা হয়, ৫৮৫ খ্রিস্ট পূর্বাব্দে তিনি নাকি একটি সূর্যগ্রহণ সম্পর্কে সঠিক ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন।

থেলিস মনে করতেন, পানিই সবকিছুর উৎস। এ-কথা দিয়ে তিনি ঠিক কী বোঝাতে চেয়েছিলেন আমরা জানি না, তবে তিনি হয়ত বিশ্বাস করতেন যে পানি থেকেই সমস্ত প্রাণের সৃষ্টি হয়েছিল আর সমস্ত প্রাণই ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়ার পর পানিতে ফিরে যায়।

নীল নদের বদ্বীপ অঞ্চল থেকে বন্যার পানি সরে গেলে কীভাবে শস্য জন্মাতে শুরু করত সেটা নিশ্চয়ই তিনি খেয়াল করে থাকবেন মিশর-ভ্রমণের সময়। হয়ত তিনি এটাও খেয়াল করেছিলেন যে, যেখানেই বৃষ্টি শুরু হোক না কেন সঙ্গে সঙ্গে সেখানে ব্যাঙ আর নানান পোকা-মাকড় এসে হাজির হয়।

এটা খুবই সম্ভব যে পানি কী করে বরফে পরিণত হয় বা বাষ্পে আর তারপর ফের পানিতে, সেটা নিয়ে থেলিস মাথা ঘামিয়েছিলেন।

এটাও ধারণা করা হয় যে থেলিস বলেছিলেন, 'সব জিনিসই নানান দেবতাতে পরিপূর্ণ।' এ-কথার মাধ্যমে তিনি ঠিক কী বুঝিয়েছিলেন আমরা সেটা অনুমান করতে পারি কেবল। ফুল ও শস্য থেকে শুরু করে পোকামাকড় ও তেলাপোকা এসবের প্রতিটি জিনিসেরই উৎস যে কী করে কালো মাটি হতে পারে সেটা পর্যবেক্ষণ করার পর তিনি সম্ভবত কল্পনা করে নিয়েছিলেন যে মাটি প্রাণের অদৃশ্য সব ক্ষুদে ক্ষুদে জীবাণুতে পরিপূর্ণ। তবে একটা কথা ঠিক, তিনি কিন্তু হোমারের দেবতাদের কথা বোঝাচ্ছিলেন না মোটেও।

এরপর যে-দার্শনিকের কথা আমরা শুনতে পাই তিনি *অ্যানাক্সিম্যান্ডার* (Anaximander); থেলিস যে-সময়ে মিলেটাসে বাস করতেন সে-সময়ে তিনিও সেখানেরই বাসিন্দা ছিলেন। তিনি মনে করতেন আমাদের বিশ্ব হচ্ছে সেই সব অগুনতি বিশ্বেরই একটি বিশ্ব যে-সব বিশ্ব, তার ভাষায়, 'অসীমেই' উদ্ভব হয়ে ফের অসীমে মিলিয়ে যায়। অসীম বলতে তিনি কী বুঝিয়েছিলেন সেটা নির্ণয় করা অবশ্য খুব সহজ নয়, তবে এ-ব্যাপারটি স্পষ্ট বলেই মনে হয় যে থেলিস যেভাবে একটি জানা বস্তুর কথা ভেবেছিলেন সে-রকম কোনো বস্তুর কথা তিনি ভাবেননি। হয়ত তিনি এটাই বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, যে-জিনিসটি সব কিছুর উৎস সেটাকে অবশ্যই সৃষ্ট জিনিসগুলো থেকে ভিন্ন হতে হবে। সৃষ্ট সমস্ত জিনিসই যেহেতু সসীম তাই যা সৃষ্টির আগে এবং পরে আসে তা অবশ্যই 'অসীম'। একটা কথা বেশ বোঝা যায় যে এই মৌলিক বস্তুটি আর যাই হোক, পানির মতো সাধারণ কিছু নয়।

মিলেটাসের তৃতীয় দার্শনিক হলেন *অ্যানাক্সিমেনিস* (Anaximenes, আনু. ৫৭০-৫২৬ খ্রি. পূ.)। তিনি মনে করতেন সব কিছুর উৎস নিশ্চয়ই 'বাতাস' কিংবা 'বাষ্প'। থেলিসের পানি-তত্ত্বের কথা নিশ্চয়ই জানা ছিল তাঁর। কিন্তু কথা হচ্ছে সেই পানি কোথা থেকে আসে? অ্যানাক্সিমেনিস মনে করতেন পানি হলো ঘনীভূত বাতাস। আমরা দেখতে পাই, যখন বৃষ্টি হয় তখন বাতাস থেকে পানি নিংড়ে নেয়া হয়। পানিকে আরও বেশি নিংড়ানো হলে সেটা মাটি হয়ে যায়, এমনই ভাবতেন তিনি। গলনশীল বরফ থেকে কীভাবে মাটি আর বালু নিংড়ে বের করা হয় সেটা হয়ত তিনি

দেখে থাকবেন। তিনি আরও মনে করতেন, আগুন হচ্ছে পরিশুদ্ধ বাতাস। আর তাই, অ্যানাক্সিমেনিসের মতে বাতাস হচ্ছে মাটি, পানি আর আগুনের উৎস।

মাটি থেকে উৎপন্ন ফসল আর পানির মধ্যে সম্পর্ক খুব দূরের কিছু নয়। অ্যানাক্সিমেনিস হয়ত ভেবেছিলেন প্রাণের সৃষ্টির জন্য মাটি, বাতাস এবং আগুন সবই দরকার, কিন্তু সব কিছুরই উৎস হচ্ছে বাতাস বা বাষ্প। কাজেই থেলিসের মতো তাঁরও মনে হয়েছিল যে সমস্ত প্রাকৃতিক পরিবর্তনের পেছনে নিশ্চয়ই একটি বস্তু রয়েছে।

শূন্য থেকে কিছুই সৃষ্টি হতে পারে না

মিলেটাসের এই তিন দার্শনিকই সমস্ত কিছুর উৎস হিসেবে একটি মৌলিক বস্তুর অস্তিত্বে বিশ্বাস করতেন। কিন্তু একটি জিনিস হঠাৎ কী করে অন্য একটি জিনিসে পরিবর্তিত হতে পারে? এটাকে আমরা বলতে পারি *পরিবর্তনের সমস্যা*।

৫০০ খ্রিস্ট পূর্বাব্দের দিকে দক্ষিণ ইতালিতে অবস্থিত গ্রিক উপনিবেশ ইলিয়া-য় একদল দার্শনিক বাস করতেন। ইলিয়াটিক নামে পরিচিত এই দার্শনিকেরা এই প্রশ্নটির ব্যাপারে উৎসাহী ছিলেন।

এঁদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিলেন পার্মেনিদেস (Parmenides আনু. ৫৪০-৪৮০ খ্রি. পূ.)। তিনি মনে করতেন যে-সব জিনিস আছে তা বরাবরই ছিল। গ্রিকদের কাছে এই ধারণাটি অপরিচিত ছিল না। এ-ব্যাপারটা তারা একরকম ধরেই নিয়েছিল যে জগতে যে-সব জিনিস রয়েছে সেগুলো চিরস্থায়ী। পার্মেনিদেস মনে করতেন, শূন্য থেকে কিছুই সৃষ্টি হতে পারে না। আর ঠিক একইভাবে, যে-জিনিসটি আছে সেটি হঠাৎ করে অস্তিত্বহীন হয়ে পড়তে পারে না।

তবে পার্মেনিদেস এই ধারণাটিকে আরও এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি মনে করতেন, পরিবর্তন বলে আসলে কিছু নেই। কোনো কিছুই সেটা যা তা ছাড়া অন্য কিছু হতে পারে না।

অবশ্য পার্মেনিদেস এ-কথা ঠিকই উপলব্ধি করেছিলেন যে প্রকৃতি নিয়ত পরিবর্তনশীল। তিনি তাঁর ইন্দ্রিয় দিয়ে প্রত্যক্ষ করেছিলেন যে সব কিছু বদলে যায়। কিন্তু তাঁর প্রজ্ঞা তাঁকে যা বলছিল তার সঙ্গে তিনি এটাকে মেলাতে পারেননি। কিন্তু তাঁর ইন্দ্রিয় আর প্রজ্ঞার মধ্যে থেকে যে-কোনো একটির ওপর ভরসা রাখতে যখন তিনি বাধ্য হলেন তখন তিনি প্রজ্ঞাকেই বেছে নিলেন।

'না দেখলে বিশ্বাস নেই', এই কথাটির সঙ্গে নিশ্চয়ই পরিচিত তুমি। কিন্তু পার্মেনিদেস এমনকি সব কিছু দেখেও তা বিশ্বাস করতে রাজি হননি। তিনি মনে করতেন আমাদের ইন্দ্রিয়গুলো জগতের একটি ত্রুটিপূর্ণ চিত্র তুলে ধরে আমাদের সামনে, এমন এক চিত্র যার সঙ্গে আমাদের প্রজ্ঞা একমত হয় না। দার্শনিক হিসেবে, সব ধরনের প্রত্যক্ষণ সম্পর্কিত বিভ্রমের কথা সবাইকে জানানো নিজের কর্তব্য বলে মনে করতেন তিনি।

মানব প্রজ্ঞার ওপর এই অটল আস্থাকে বলা হয় *বুদ্ধিবাদ* (rationalism)। তিনিই বুদ্ধিবাদী যিনি মনে করেন মানব প্রজ্ঞাই জগৎ সম্পর্কে জ্ঞানলাভের প্রাথমিক উৎস।

সব কিছুই বয়ে চলে

হেরাক্লিটাস (Heraclitus আনু. ৫৪০-৪৮০ খ্রি. পূ.) নামে পার্মেনিদেস-এর সমসাময়িক এক দার্শনিক ছিলেন। এশিয়া মাইনরের এফিসাস-এর বাসিন্দা ছিলেন তিনি। তিনি মনে করতেন সার্বক্ষণিক পরিবর্তন প্রকৃতির সবচেয়ে মৌলিক বৈশিষ্ট্য। আমরা সম্ভবত বলতে পারি যে তিনি যা কিছু প্রত্যক্ষ করতেন সে-সবের ওপর তার পার্মেনিদেসের চেয়ে বেশি আস্থা বা বিশ্বাস ছিল।

হেরাক্লিটাস বলতেন, 'সব কিছুই বয়ে চলে'। প্রতিটি জিনিসই নিয়ত পরিবর্তনশীল এবং গতিশীল, কোনো কিছুই স্থির নয়। কাজেই আমরা 'একই নদীতে দু'বার নামতে পারি না।' দ্বিতীয়বার যখন আমি নদীতে নামি তখন আমি বা নদী কেউ-ই আর আগের মতো নেই।

হেরাক্লিটাস দেখিয়েছিলেন যে বৈপরীত্যই এ-জগৎকে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ করে তুলেছে। কখনোই অসুখে না পড়লে সুস্থ থাকা কী আমরা তা বুঝতাম না। ক্ষুধা কী তা না জানলে পেট ভরা থাকার মজা টের পেতাম না আমরা। কখনো কোনো যুদ্ধ না হলে শান্তির মর্যাদা বুঝতে পারতাম না আমরা। শীতকাল না থাকলে বসন্ত কখনো দেখতে পেতাম না আমরা।

হেরাক্লিটাস বিশ্বাস করতেন বস্তুর ক্রম বিন্যাসে ভালো আর মন্দ এই দুইয়েরই যার যার অপরিহার্য স্থান রয়েছে। বিপরীতের এই নিত্য আন্তঃসম্পর্ক না থাকলে জগতের অস্তিত্ব থাকতো না।

তিনি বলেছিলেন, 'দিন আর রাত, শীত আর গ্রীষ্ম, যুদ্ধ আর শান্তি, ক্ষুধা আর পরিতৃপ্তি-ই হচ্ছে ঈশ্বর।' ঈশ্বর শব্দটি ব্যবহার করলেও, স্পষ্টতই তিনি তা দিয়ে পুরাণের দেবতাদের কথা বোঝাননি। হেরাক্লিটাসের কাছে ঈশ্বর বা দেবতা ছিল এমন একটা কিছু যা সমস্ত জগৎকে জড়িয়ে রয়েছে। প্রকৃত পক্ষে, প্রকৃতির নিয়ত রূপান্তর আর পরিবর্তনের ভেতরই সবচেয়ে ভালোভাবে পাওয়া যায় ঈশ্বরকে।

ঈশ্বর কথাটির বদলে হেরাক্লিটাস প্রায়ই গ্রীক শব্দ *লোগোস* (logos) ব্যবহার করেছেন, যার অর্থ প্রজ্ঞা। আমরা মানুষেরা হয়ত সব সময় একই রকম চিন্তা-ভাবনা করি না বা সবারই হয়ত একই মাত্রার প্রজ্ঞা নেই, কিন্তু, হেরাক্লিটাস বিশ্বাস করতেন যে, নিশ্চয়ই কোনো এক ধরনের বৈশ্বিক প্রজ্ঞা রয়েছে যার নির্দেশনা অনুযায়ীই প্রকৃতির সব কিছু ঘটে।

এই 'বৈশ্বিক প্রজ্ঞা' বা 'বৈশ্বিক আইন' এমন একটি বস্তু যা আমাদের সবার মধ্যেই বিদ্যমান এবং এর দ্বারাই আমরা চালিত হই। কিন্তু তারপরেও, বেশিরভাগ মানুষই তাদের নিজস্ব প্রজ্ঞা নিয়েই জীবনযাপন করে বলে মনে করতেন হেরাক্লিটাস। এমনিতে অবশ্য তিনি তাঁর চারপাশের সাধারণ মানুষকে ঘৃণাই করতেন। তিনি

বলতেন, 'বেশিরভাগ মানুষের মতামতই শিশুর খেলনার মতো মামুলি।'

অর্থাৎ গোটা পৃথিবীর নিয়ত পরিবর্তন এবং বৈপরীত্যের মধ্যে হেরাক্লিটাস একটি সত্তা (Entity) বা একত্ব-র দেখা পেয়েছিলেন। এই 'কিছু', যা সব কিছুর উৎস, তাকেই তিনি বলেছিলেন ঈশ্বর বা *লোগোস*।

চারটি মৌলিক উপাদান

একদিক দিয়ে দেখতে গেলে পার্মেনিদেস আর হেরাক্লিটাস ছিলেন একে অন্যের সম্পূর্ণ বিপরীত। পার্মেনিদেস-এর প্রজ্ঞা বুঝিয়ে দিয়েছিল যে কোনো কিছুরই পরিবর্তন হতে পারে না। হেরাক্লিটাস-এর *ইন্দ্রিয়গত প্রত্যক্ষণ*-ও (sense perception) ঠিক একইভাবে বুঝিয়ে দিয়েছিল যে প্রকৃতি নিয়ত পরিবর্তনশীল। দু'জনের মধ্যে কার কথা ঠিক? আমরা কি প্রজ্ঞাকেই মাতব্বরি ফলাতে দেবো, নাকি ভরসা রাখবো আমাদের ইন্দ্রিয়গুলোর ওপর?

পার্মেনিদেস আর হেরাক্লিটাস দু'জনেই দুটো করে কথা বলেছেন

পার্মেনিদেস বলছেন

ক) কোনো কিছুরই পরিবর্তন হতে পারে না এবং তাই আমাদের ইন্দ্রিয়গত প্রত্যক্ষণ অবশ্যই নির্ভরযোগ্য নয়।

অন্যদিকে, হেরাক্লিটাস বলছেন

ক) সব কিছুই বদলে যায় ('সব কিছুই বয়ে চলে') এবং

খ) আমাদের ইন্দ্রিয়গত প্রত্যক্ষণ নির্ভরযোগ্য।

এর চেয়ে মতপার্থক্য দার্শনিকদের মধ্যে আর কী হতে পারে? কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, কার কথা ঠিক? নিজেদেরকে তাঁরা যে জটিলতার মধ্যে জড়িয়েছিলেন তা থেকে বেরোবার পথ দেখালেন সিসিলির *এম্পিডক্লেস* (Empedocles, আনু. ৪৯০-৪৩০ খ্রি. পূ.)।

তিনি মনে করতেন এঁদের দু'জনেরই একটি বক্তব্য ঠিক, অন্যটি ভুল।

এম্পিডক্লেস দেখলেন যে তাঁদের মধ্যে মতবিরোধের আসল কারণটি হচ্ছে দুই দার্শনিকই *মাত্র* একটি মৌলিক পদার্থ বা বস্তুর উপস্থিতির কথা ধরে নিয়েছিলেন। এটা সত্যি হলে প্রজ্ঞার আজ্ঞা আর 'আমরা আমাদের চোখ দিয়ে যা দেখি', এই দুইয়ের মধ্যকার দূরত্বমোচন সম্ভব হতো না।

পানি অবশ্যই মাছ বা প্রজাপতি হয়ে যেতে পারে না। সত্যি বলতে কী, পানির পরিবর্তন হতে পারে না। বিশুদ্ধ পানি বিশুদ্ধ পানিই থেকে যাবে। কাজেই পার্মেনিদেস একটা কথা ঠিকই বলেছিলেন যে 'কোনো কিছুই বদলায় না'।

কিন্তু ঠিক একই সঙ্গে এম্পিডক্লেস হেরাক্লিটাসের সঙ্গে একমত প্রকাশ করে বলেছিলেন আমাদের ইন্দ্রিয়গুলোর দেয়া প্রমাণ আমাদের বিশ্বাস করতেই হবে। আমরা যা দেখি তা আমাদের অবশ্যই বিশ্বাস করতে হবে আর আমরা যা দেখি তা ঠিক এই যে, প্রকৃতি বদলে যায়।

এম্পিডক্লেস এই সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছেছিলেন যে আসলে একটি মাত্র 'মৌলিক' পদার্থের ধারণাটি পরিত্যাজ্য। পানি বা বাতাস *একা একা* একটা গোলাপ ঝাড় বা প্রজাপতি হয়ে যেতে পারে না। প্রকৃতির উৎস সম্ভবত কেবল একটি উপাদান হতে পারে না।

এম্পিডক্লেস বিশ্বাস করতেন যে মোটের ওপর প্রকৃতি চারটি মৌলিক উপাদান বা তাঁর কথায় 'মূল' (root) দিয়ে তৈরি। এই চারটি মূল হচ্ছে *মাটি*, *বাতাস*, *আগুন* আর *পানি*।

সমস্ত প্রাকৃতিক প্রক্রিয়াই ঘটে এই চারটি মৌলিক উপাদানের সংযোজন আর বিয়োজনের ফলে। কারণ সব জিনিস-ই মাটি, বাতাস, আগুন আর পানির একটি মিশ্রণ, যদিও একেক বস্তুতে এগুলোর অনুপাত একেক রকম। সাদা চোখেই পরিবর্তনগুলো লক্ষ করি আমরা। কিন্তু মাটি আর বাতাস, আগুন আর পানি অক্ষত-ই থেকে যায় সব সময়ের জন্যে, যে-সব যৌগের অংশ হিসেবে এগুলো থাকে সে-সব যৌগ এই চারটি উপাদানকে ছুঁতেও পারে না। কাজেই এ-কথা বলা ঠিক নয় যে 'সব কিছুই' বদলে যায়। আসলে কিছুই বদলায় না। যা ঘটে তা হচ্ছে সেই চারটে মৌলিক উপাদান এক হয়, আলাদা হয়, তারপর আবার এক হয়।

ব্যাপারটাকে আমরা চিত্রাংকনের সঙ্গে তুলনা করতে পারি। কোনো চিত্রকরের যদি কেবল একটিই রঙ, যেমন ধরো লাল থাকে তাহলে তার পক্ষে সবুজ গাছ আঁকা সম্ভব হবে না। কিন্তু তাঁর কাছে যদি হলুদ, লাল, নীল আর কালো রঙ থাকে তাহলে তিনি সেগুলো বিভিন্ন অনুপাতে মিশিয়ে শয়ে শয়ে বিভিন্ন রঙ তৈরি করতে পারবেন।

রান্নাঘর থেকে একটা উদাহরণ দিয়েও ব্যাপারটা বোঝানো যেতে পারে। আমার কাছে যদি কেবল ময়দা থাকে তাহলে একটা কেক বানাতে রীতিমত জাদুকর হতে হবে আমাকে। কিন্তু আমার কাছে ডিম, ময়দা, দুধ আর চিনি থাকলে আমি যত ইচ্ছা তত রকমের কেক বানাতে পারবো।

প্রকৃতির মূল হিসেবে এম্পিডক্লেস যে মাটি, বাতাস, আগুন আর পানিকে চিহ্নিত করেছিলেন সেটা কিন্তু একদম শুধু শুধু নয়। তাঁর পূর্ববর্তী দার্শনিকেরাও এটা দেখাতে চেষ্টা করেছিলেন যে মৌলিক বস্তুকে পানি, বাতাস বা আগুন হতে হবে। থেলিস এবং অ্যানাক্সিমেনিস মন্তব্য করেছিলেন যে পানি আর বাতাস দুই-ই প্রাকৃতিক জগতের অত্যন্ত অপরিহার্য উপাদান। গ্রিকরা বিশ্বাস করত, আগুনও একটি অপরিহার্য উপাদান। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, সমস্ত জীবন্ত জিনিসের ক্ষেত্রে সূর্যের ভূমিকা কী তা লক্ষ করেছিল তারা। তাছাড়া, তারা আরও জানতো যে জীব-জন্তু এবং মানুষ সবার শরীরেরই তাপমাত্রা রয়েছে।

এম্পিডক্লেস হয়ত এক টুকরো কাঠ জ্বলতে দেখেছিলেন। কিছু একটা বিলীন হয়ে গেল। আমরা সেটার চটচট্ টুপটাপ আওয়াজ শুনতে পেলাম। ওটা 'পানি'। কিছু একটা ধোঁয়া হয়ে ওপরে উঠে যাচ্ছে। ওটা হলো 'বাতাস'। 'আগুন' আমরা দেখতে পাই। আগুন নিভে যাওয়ার পরে কিছু একটা থেকে যায়। সেটা হচ্ছে ছাই বা 'মাটি'।

প্রকৃতির রূপান্তরকে চারটে 'মূল'-এর সংযোজন ও বিয়োজন হিসেবে এম্পিডক্লেসের ব্যাখ্যার পরেও এমন একটা কিছু রয়ে গেল যা ব্যাখ্যা করার দরকার

ছিল। নতুন জীবন যাতে তৈরি হতে পারে সেজন্য কোন জিনিসটি এই মৌলিক উপাদানগুলোকে সংযুক্ত হতে বাধ্য করে? কোন জিনিসটি এই 'মিশ্রণ'-টিকে, যেমন ধরো একটি ফুলকে, আবার বিলীন করে দেয়?

এম্পিডক্লেস বিশ্বাস করতেন দুটো ভিন্ন শক্তি প্রকৃতিতে ক্রিয়াশীল। এই শক্তি দুটোকে তিনি বলেছেন *প্রেম* (love) ও *বিবাদ* (strife)। প্রেম বিভিন্ন বস্তুকে একসঙ্গে বাঁধে, বিবাদ সেগুলোকে পৃথক করে।

'সারবস্তু' (substance) আর 'শক্তি'-র মধ্যেও পার্থক্য নির্ণয় করেছেন তিনি। এই বিষয়টি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এমনকি আজো বিজ্ঞানীরা *মৌলিক উপাদানসমূহ* আর *প্রাকৃতিক শক্তিগুলোকে* ভিন্নভাবে দেখেন। আধুনিক বিজ্ঞান বিশ্বাস করে যে, সব প্রাকৃতিক প্রক্রিয়াকেই ভিন্ন ভিন্ন মৌলিক উপাদান আর বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তির মধ্যকার পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া হিসেবে ব্যাখ্যা করা যায়।

আমরা যখন কিছু প্রত্যক্ষ করি তখন কী ঘটে? এম্পিডক্লেস এই প্রশ্ন-ও করেছেন। এই যেমন একটি ফুল, সেটাকে আমি কীভাবে দেখি? ঠিক কী ঘটে? ব্যাপারটা কি তুমি কখনো চিন্তা করে দেখেছো, সোফি?

এম্পিডক্লেস বিশ্বাস করতেন প্রকৃতির অন্যান্য জিনিসের মতো চোখও মাটি, বাতাস, আগুন আর পানি দিয়ে তৈরি। কাজেই আমার চোখের 'মাটি' দেখে আমার চারপাশের মাটিকে, 'বাতাস' প্রত্যক্ষ করে যা কিছু বাতাস তাই, 'আগুন' প্রত্যক্ষ করে যা কিছু আগুন তাই আর 'পানি' যা কিছু পানি তাই। আমার চোখে যদি এই চারটি বস্তুর কোনো একটি না থাকতো তাহলে আমি প্রকৃতির সবকিছু দেখতে পেতাম না।

সবকিছুতেই সবকিছুর কিছু কিছু

অ্যানাক্সাগোরাস (Anaxagoras, ৫০০-৪২৮ খ্রি.পূ.) হলেন আরেক দার্শনিক যিনি এ-কথা বিশ্বাস করতে পারেননি যে একটি বিশেষ মৌলিক বস্তু, যেমন পানি, পৃথিবীতে আমরা যা কিছু দেখি তার সব কিছুতে রূপান্তরিত হতে পারে। এ-কথাও তিনি মেনে নিতে পারেননি যে মাটি, বাতাস, আগুন ও পানি পরিণত হতে পারে রক্ত আর হাড়ে।

অ্যানাক্সাগোরাস বিশ্বাস করতেন প্রকৃতি চোখের অগোচর অতি ক্ষুদ্র অসংখ্য কণা দিয়ে তৈরি। তাছাড়া, প্রতিটি জিনিসকেই আরও ছোট ছোট অংশে ভেঙে ফেলা যায়, কিন্তু এমনকি সবচেয়ে ক্ষুদ্র অংশের ভেতরেও অন্য সব জিনিসের অংশবিশেষ থেকে যায়। তিনি মনে করতেন ত্বক এবং হাড় যদি অন্য কিছুর রূপান্তর না হয়ে থাকে তাহলে যে-দুধ আমরা পান করি, যে-খাবার আমরা খাই তার ভেতরেও ত্বক আর হাড় থাকবে।

বর্তমান সময়ের দু'একটা উদাহরণ হয়ত অ্যানাক্সাগোরাসের চিন্তার সূত্র ধরতে সাহায্য করবে আমাদের। আধুনিক লেজার প্রযুক্তি তৈরি করতে পারে তথাকথিত হলোগ্রাম। ধরা যাক এ-সবের কোনো একটি হলোগ্রামে একটি গাড়ির চিত্র আঁকা হলো। এখন যদি হলোগ্রামটি খণ্ড-বিখণ্ড করে ফেলা হয় তাহলে হলোগ্রামটির যে-

অংশে কেবল গাড়ির বাম্পারটি দেখা যাচ্ছে সে-অংশেও পুরো গাড়িটির ছবি দেখতে পাবো আমরা। তার কারণ, প্রতিটি ছোট অংশেই পুরো বস্তুটি থাকে।

এক অর্থে আমাদের শরীরও একইভাবে তৈরি। আমার আঙুল থেকে চামড়ার একটা কোষ খসে পড়লে সেটার কেন্দ্রে যে শুধু আমার চামড়ার বৈশিষ্ট্যই পাওয়া যাবে তা নয়, ঐ একই কোষ বলে দেবে আমার চোখ কোন ধরনের, আমার চুলের রঙ কী, আমার আঙুলের সংখ্যা আর ধরন, ইত্যাদি আরও অনেক কিছু। মানবদেহের প্রতিটি কোষেই অন্যান্য কোষের একটা ব্লু প্রিন্ট রয়েছে। কাজেই প্রতিটি কোষের মধ্যেই 'সবকিছুর কিছু কিছু' রয়েছে। ক্ষুদ্র অংশের ভেতরেই রয়েছে সমগ্রটি।

এই যে-সব ছোট ছোট কণার ভেতর সবকিছুরই কিছু কিছু বিদ্যমান রয়েছে অ্যানাক্সোগোরাস তার নাম দিয়েছেন *বীজ* (seed)।

একটা কথা মনে রেখো যে, এম্পিডক্লেস মনে করতেন 'প্রেম'-ই মৌলিক উপাদানগুলোকে এক সঙ্গে জড়ো করে সম্পূর্ণ বস্তু তৈরি করে। অ্যানাক্সাগোরাস 'ক্রম'-কেও (order) এক ধরনের শক্তি বলে ভাবতেন যা জীব-জন্তু ও মানুষ, ফুল ও গাছ তৈরি করে। এই শক্তিকে তিনি বলেছেন মন বা বুদ্ধিমত্তা (nous)।

আরেকটি কারণেও অ্যানাক্সাগোরাস মনোযোগের দাবিদার আর তা হচ্ছে, এথেন্সের দার্শনিক হিসেবে তাঁর কথাই প্রথম শুনতে পাই আমরা। এশিয়া মাইনরের লোক ছিলেন তিনি, কিন্তু চল্লিশ বছর বয়েসে এথেন্সে চলে যান। পরে তাঁর বিরুদ্ধে নাস্তিকতার অভিযোগ আনা হয় এবং তিনি শহরটি ত্যাগ করতে বাধ্য হন। তিনি যে-সব কথা বলেছিলেন তার মধ্যে একটি হচ্ছে সূর্য কোনো দেবতা নয়, বরং একটি লোহিত-তপ্ত পাথর, যা কিনা গোটা পেলোপনেসিয় উপদ্বীপের চেয়েও ঢের বড়।

জ্যোতির্বিদ্যা সম্পর্কেও বরাবরই বেশ উৎসাহ ছিল অ্যানাক্সাগোরাসের। তিনি বিশ্বাস করতেন পৃথিবী যে-সব বস্তু দিয়ে তৈরি গ্রহ-নক্ষত্র-ও তাই দিয়ে তৈরি। একটি উল্কা-খণ্ড পর্যবেক্ষণ করে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন তিনি। এর থেকে তিনি এই সিদ্ধান্তে-ও উপনীত হন যে অন্য গ্রহেও মানুষের অস্তিত্ব থাকতে পারে। তিনি আরও উল্লেখ করেছিলেন যে, চাঁদের নিজস্ব কোনো আলো নেই, সেটার আলো আসে পৃথিবী থেকে। ভেবেচিন্তে সূর্য গ্রহণেরও একটা ব্যাখ্যা দাঁড় করিয়েছিলেন তিনি।

পুনশ্চ   তোমার মনোযোগের জন্য ধন্যবাদ, সোফি। এটা খুবই স্বাভাবিক যে হয়ত বেশ কয়েকবার না পড়লে এই অধ্যায়টি ভালোভাবে বুঝতে পারবে না তুমি, তবে কথা হচ্ছে, বুঝতে গেলে একটু কষ্ট করতেই হয় সব সময়। তুমি নিশ্চয়ই এমন কোনো বন্ধুকে পছন্দ করবে না যে কোনো কষ্ট না করেই সব কিছুতেই ভালো করে।

মৌলিক পদার্থ আর প্রকৃতিতে রূপান্তরের প্রশ্নের সবচেয়ে ভালো সমাধানের জন্য আগামীকালের জন্য অপেক্ষা করতেই হচ্ছে। তখন তোমার সঙ্গে দেখা হবে ডেমোক্রিটাসের। আজ আর নয়!

ঘন ঝাড়ের ভেতর ছোট্ট একটা ফুটো দিয়ে বাইরে বাগানের দিকে তাকিয়ে রইল সোফি তার গুহায় বসে। এতো কিছু পড়ার পর নিজের চিন্তা-ভাবনা গুছিয়ে নিতে বাধ্য হলো সে।

এ-কথাটি দিনের আলোর মতো পরিষ্কার যে, নির্জলা পানি বরফ বা বাষ্প ছাড়া অন্য কিছুতে বদলে যেতে পারে না। পানি এমনকি তরমুজও হতে পারে না, কারণ এমনকি তরমুজের ভেতরেও স্রেফ পানি ছাড়া অন্য বস্তু থাকে। তবে এ-ব্যাপারটা সম্পর্কে সে যে এতো নিশ্চিত সে তো কেবল এই জন্য যে এটাই তাকে শেখানো হয়েছে। যেমন ধরা যাক, বরফ যে পানি ছাড়া অন্য কিছু নয় সে-ব্যাপারে সে কি এতো নিশ্চিত হতে পারতো যদি না সেটা তাকে শেখানো হতো? অন্তত পানি কীভাবে জমে বরফ হয়ে যায় আর তারপর আবার গলে যায় সেটা তাকে খুব ভালো করে লক্ষ করার সুযোগ দেয়া উচিত ছিল।

অন্যদের কাছ থেকে সে কী শিখেছে সে-কথা না ভেবে সোফি আবার নিজের কাণ্ডজ্ঞান ব্যবহার করার চেষ্টা করল।

কোনো ধরনের পরিবর্তনের কথা স্বীকার করতে রাজি ছিলেন না পার্মেনিদেস। সোফি যতই এ-নিয়ে ভাবল ততোই তার ধারণা দৃঢ়মূল হলো যে এক অর্থে ঠিকই বলেছিলেন তিনি। পার্মেনিদেসের বুদ্ধিমত্তা এ-কথা স্বীকার করতে চায়নি যে 'কোনো কিছু' হঠাৎ করে 'সম্পূর্ণ ভিন্ন একটা কিছুতে' বদলে যেতে পারে। এভাবে সবার মুখের ওপর কথাটা বলতে নিশ্চয়ই বেশ সাহসের দরকার হয়েছিল তাঁর, কারণ এ-কথা বলার অর্থ লোকে নিজেদের চোখে যে-সব প্রাকৃতিক পরিবর্তন দেখছে সেগুলোকে অস্বীকার করা। অনেকেই নিশ্চয়ই হাসাহাসি করেছিল তাঁর কথা শুনে।

আর এম্পিডক্লেস-ও যথেষ্ট স্মার্ট লোক ছিলেন বটে, নইলে কি আর এ-কথা প্রমাণ করতে পারে যে জগৎ একাধিক মৌলিক পদার্থ দিয়ে তৈরি? সে-কারণেই কোনো কিছুর পরিবর্তন না হওয়ার পরেও প্রকৃতির সমস্ত রূপান্তর সম্ভবপর হয়।

প্রাচীন গ্রিক দার্শনিক স্রেফ যুক্তি-বুদ্ধি প্রয়োগ করেই ব্যাপারটা বের করে ফেলেছিলেন। আলবৎ তিনি প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। কিন্তু এখনকার বিজ্ঞানীরা যেভাবে রাসায়নিক বিশ্লেষণ করেন তা করার মতো যন্ত্রপাতি নিশ্চয়ই তাঁর কাছে ছিল না।

সোফি ঠিক নিশ্চিত নয় সব কিছুরই উৎস যে মাটি, বাতাস, আগুন আর পানি, এই কথাটা সে বিশ্বাস করে কিনা। কিন্তু কথা হচ্ছে তাতে কী আসে যায়? নীতিগতভাবে এম্পিডক্লেস ঠিকই বলেছিলেন। আমরা নিজেদের চোখ দিয়ে আমাদের চারপাশে যে-সব পরিবর্তন দেখি সেগুলোকে আমাদের যুক্তিবোধ নষ্ট না করে স্বীকার করে নেবার একমাত্র উপায় হচ্ছে একাধিক মৌলিক পদার্থের অস্তিত্বের কথা মেনে নেয়া।

দর্শনের প্রতি সোফির ভালোবাসা দ্বিগুণ বেড়ে গেল, কারণ স্কুলে সে যা কিছু শিখেছে সে-সব স্মরণ না করে স্রেফ কাণ্ডজ্ঞান ব্যবহার করেই ধারণাগুলো বুঝতে কোনো অসুবিধে হচ্ছিল না তার। সে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছুল যে, দর্শন শেখার কোনো বিষয় নয়; তবে সম্ভবত দার্শনিকভাবে *চিন্তা করাটা* শেখা যেতে পারে।

ডে মো ক্রি টা স

ছয়

...পৃথিবীর সবচেয়ে অসাধারণ খেলনা...

অজ্ঞাত দার্শনিকের কাছ থেকে আসা টাইপ-করা সব ক'টা পৃষ্ঠা বিস্কিটের টিনের ভেতর আবার রেখে দিল সোফি। হামাগুড়ি দিয়ে গুহা থেকে বেরিয়ে এলো সে, কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল বাগানের ওপর দৃষ্টি ছড়িয়ে দিয়ে। গতকাল কী ঘটেছে সে-কথা ভাবল সে। আজ সকালে নাশতার সময় সেই 'প্রেমপত্র' নিয়ে তাকে আবারো খোঁচা দিয়েছেন মা। সেই একই ঘটনা যাতে আবারো ঘটতে না পারে সেজন্য ডাকবাক্সের দিকে তাড়াতাড়ি পা চালাল সে। পর পর দু'দিন প্রেমপত্র পাওয়াটা দ্বিগুণ অস্বস্তিকর একটা ব্যাপার হবে।

আরেকটা ছোট্ট, সাদা খাম রয়েছে ওখানে! চিঠিগুলো আসার মধ্যে একটা নিয়ম আবিষ্কার করতে শুরু করল সোফি প্রত্যেক দিন বিকেলে বড় একটা বাদামি খাম পাবে সে। সে যখন সেটার লেখা পড়তে ব্যস্ত, তখন দার্শনিক চুপিসারে ডাকবাক্সের কাছে আসবেন আরেকটা ছোট্ট সাদা খাম নিয়ে।

তো, সোফি এবার আবিষ্কার করতে পারবে ভদ্রলোকটি কে। অবশ্য উনি কি পুরুষ-ই? ডাকবাক্সটা বেশ ভালোভাবে দেখা যাচ্ছে তার ঘর থেকে। জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেই রহস্যময় দার্শনিককে দেখতে পাবে সে। সাদা খামগুলো তো আর স্রেফ বাতাসে ভর করে আসে না!

পরের দিন সতর্ক নজর রাখবে বলে ঠিক করে সোফি। কাল শুক্রবার, সারাটা উইকেন্ড হাতে থাকবে তার।

নিজের ঘরে উঠে গিয়ে খামটা খুলল সোফি। আজ একটাই প্রশ্ন শুধু, কিন্তু সেটা আগের তিনটের চেয়েও অবাক-করা

লেগো কেন পৃথিবীর সবচেয়ে অসাধারণ খেলনা?

প্রথম কথা, সোফি ঠিক নিশ্চিত নয় লেগো পৃথিবীর সবচেয়ে অসাধারণ খেলনা কিনা। ছোট ছোট সেই সব প্লাস্টিকের ব্লক দিয়ে সে খেলা করেছে তা সে বহু বছর হতে চলল। তাছাড়া, লেগোর সঙ্গে দর্শনের সম্ভাব্য কী সম্পর্ক থাকতে পারে তা সে প্রাণপণ

চেষ্টাতেও বের করতে পারল না।

কিন্তু ছাত্রী হিসেবে সে দায়িত্ববান। তার ক্লজেটের সবচেয়ে ওপরের তাক হাতড়ে সব আকার আর আকৃতির এক বাক্সভর্তি লেগো ব্লক খুঁজে পেল সে।

বহুদিন পর আবার সে ওগুলো দিয়ে জিনিস-পত্র তৈরি করতে লাগল। কাজ করতে করতে ব্লকগুলো সম্পর্কে কিছু কথা উঁকি দিতে থাকল তার মনের ভেতর।

সে ভাবল, ব্লকগুলো জোড়া দেয়া সহজ। যদিও সবগুলোই আলাদা, কিন্তু তারপরেও ওগুলো একটা আরেকটার সঙ্গে লেগে যায়। তাছাড়া ব্লকগুলো ভাঙে না। তার এমনকি মনেও পড়ে না কখনো সে কোনো ভাঙা লেগো ব্লক দেখেছে কিনা। বহু বছর আগে সেদিন কেনা হয়েছিল সেদিন যেমন উজ্জ্বল আর নতুন ছিল সবগুলো, আজো তেমনি আছে সেগুলো। লেগো ব্লকগুলোর সবচেয়ে ভালো ব্যাপারটা হলো ওগুলো দিয়ে যে-কোনো জিনিস তৈরি করা যায়। তারপর ব্লকগুলো আলাদা করে নতুন একটা কিছু তৈরি করা যায় আবার।

একটা খেলনার কাছে এর চেয়ে বেশি আর কী চাইতে পারে মানুষ? সোফি এই সিদ্ধান্তে এলো যে লেগো আসলেই পৃথিবীর সবচেয়ে অসাধারণ খেলনা। কিন্তু এর সঙ্গে দর্শনের কী সম্পর্ক থাকতে পারে সেটা তার মাথায় এলো না।

বড়সড় একটা পুতুলের বাড়ি বানানো প্রায় শেষ করে এনেছে সে। স্বীকার করতে রীতিমত কষ্ট হলেও এ-কথা ঠিক যে এমন মজা সে বহু বছর পায়নি। বড় হলে লোকে খেলাধুলা ছেড়ে দেয় কেন?

তার মা ঘরে ফিরে যখন দেখলেন সোফি কী করছে তখন তিনি বলে উঠলেন, 'কী মজা! তুই যে এখনো খেলাধুলো ছেড়ে দেবার মতো বড় হোসনি তাই দেখে কী যে খুশি লাগছে আমার!'

'খেলছি না আমি!' অবজ্ঞা মেশানো ক্রোধের সঙ্গে প্রত্যুত্তর করল সোফি। 'খুবই জটিল একটা দার্শনিক পরীক্ষা করছি আমি!'

গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন তার মা। সম্ভবত তিনি সাদা খরগোশ আর টপ হ্যাটটার কথা ভাবলেন।

পরদিন সোফি যখন স্কুল থেকে বাড়ি ফিরল, একটা বাদামি খামে তার জন্য অপেক্ষা করছিল আরও বেশ ক'টা পাতা। ওপরে তার নিজের ঘরে সেগুলো নিয়ে গেল সে। পড়ার জন্য তর সইছিল না তার, কিন্তু সেই সঙ্গে ডাকবাক্সের দিকেও একটা চোখ রাখতে হচ্ছিল তাকে।

পরমাণু-তত্ত্ব

আবার হাজির হলাম, সোফি। আজ তুমি জানতে পারবে মহান প্রকৃতিবাদী দার্শনিকদের শেষ জন সম্পর্কে। তাঁর নাম *ডেমোক্রিটাস* (Democritus, আনু. ৪৬০-৩৭০ খি. পূ.) এবং তিনি ছিলেন উত্তর ঈজিয়ান উপকূলের ছোট্ট শহর অ্যাবডেরার লোক।

তুমি যদি লেগো ব্লক সম্পর্কিত প্রশ্নের ঠিক ঠিক জবাব দিতে পেরে থাকো তাহলে

এই দার্শনিকের প্রকল্প কী ছিল সে-কথা বুঝতে তোমার মোটেই অসুবিধে হওয়ার কথা নয়।

ডেমোক্রিটাস তাঁর পূর্বসূরীদের সঙ্গে এই মর্মে একমত প্রকাশ করেছিলেন যে প্রকৃতির পরিবর্তনগুলো এ-জন্য ঘটে না যে কোনো কিছু আসলেই 'বদলে যায়'। কাজেই তিনি অনুমান করলেন যে সবকিছুই ক্ষুদে ক্ষুদে অদৃশ্য ব্লক দিয়ে তৈরি আর এই ব্লকগুলোর প্রত্যেকটিই শাশ্বত ও অপরিবর্তনীয়। ক্ষুদ্রতম এই এককগুলোকে ডেমোক্রিটাস বললেন *পরমাণু* (atom)। 'অ্যা-টম' শব্দের অর্থ 'যা আর কাটা যায় না।' এই বিষয়টি প্রমাণ করা ডেমোক্রিটাসের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে, যে-সব গঠনকারী অংশ দিয়ে বাকি প্রত্যেকটি জিনিস তৈরি হয়েছে সেগুলোকে অন্তহীনভাবে বিভক্ত করা যায় না। তা করা গেলে সেগুলোকে ব্লক হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না। পরমাণুকে যদি অন্তহীনভাবে ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর অংশে বিভক্ত করা যেতো তাহলে প্রকৃতি নিরন্তরভাবে পাতলা হতে থাকা সুরুয়ার মতো গলে যেতে থাকতো।

তাছাড়া, প্রকৃতির ব্লকগুলোকে শাশ্বত-ও হতে হবে, কারণ শূন্য থেকে কিছুই সৃষ্টি হতে পারে না। এই প্রসঙ্গে তিনি পার্মেনিদেস আর ইলিয়াটিকদের কথা স্বীকার করলেন। এছাড়াও, তিনি মনে করতেন সব পরমাণুই দৃঢ় ও নিরেট। তবে সেগুলো সব একই রকম হতে পারে না। তার কারণ, সেক্ষেত্রে সেগুলো পরস্পরের সঙ্গে জোড়া লেগে কী করে পপি ফুল আর জলপাই গাছ থেকে ছাগলের চামড়া আর মানুষের রোম পর্যন্ত সব কিছু তৈরি হতে পারে তার সন্তোষজনক ব্যাখ্যা কিন্তু এতো কিছুর পরেও পাওয়া যায় না।

ডেমোক্রিটাস মনে করতেন প্রকৃতি অসীম সংখ্যক এবং বিচিত্র ধরনের পরমাণু দিয়ে তৈরি। কোনোটা গোলাকার ও মসৃণ, অন্যগুলো অসমান ও অমসৃণ। আর পরমাণুগুলো যেহেতু এতো ভিন্ন রকমের ঠিক সেই কারণেই সেগুলো জোড়া লেগে ভিন্ন ভিন্ন সব ধরনের জিনিস তৈরি হতে পারে। তবে সংখ্যা আর আকৃতিতে সেগুলো যতই অসীম হোক না কেন, পরমাণুগুলোর সবই শাশ্বত ও অপরিবর্তনীয়।

কোনো জিনিস, এই যেমন কোনো গাছ বা প্রাণী, মরে বিলীন হয়ে গেলে সেটার পরমাণুগুলো বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে এবং তখন সেগুলোকে নতুন জিনিস তৈরিতে ব্যবহার করা যেতে পারে। পরমাণুরা মহাশূন্যেই ঘুরে বেড়ায়, কিন্তু সেগুলোর 'আংটা' আর 'কাঁটা' থাকায় পরমাণুগুলো একসঙ্গে জোড়া লেগে সে-সব জিনিস তৈরি করতে পারে যে-সব জিনিস আমরা আমাদের চারপাশে দেখতে পাই।

কাজেই লেগো ব-ক দিয়ে আমি কী বলতে চেয়েছি সেটা তুমি বুঝতে পেরেছো। ওগুলোর কম-বেশি সেই সব বৈশিষ্ট্যই রয়েছে ডেমোক্রিটাস যেগুলো পরমাণুর আছে বলে বলেছেন। আর সেই কারণেই ওগুলো দিয়ে জিনিস তৈরি করা এতো মজা। প্রথমত এবং প্রধানত ওগুলো অদৃশ্য। তাছাড়াও, পরমাণুর রয়েছে বিভিন্ন আকার ও আকৃতি। ওগুলো নিরেট এবং অপ্রবেশ্য। তাছাড়াও ওগুলোর রয়েছে 'আংটা' আর 'কাঁটা', যে-কারণে ওগুলো সংযুক্ত হয়ে হেন কোনো আকার-আকৃতি নেই যা তৈরি করতে পারে না। এই সংযোগগুলো পরে আবার খুলে ফেলা যেতে পারে যাতে একই ব্লকগুলো দিয়ে নতুন জিনিস তৈরি করা যায়।

ব্লকগুলো যে বারে বারে ব্যবহার করা যায় সেটাই লেগোকে এতো জনপ্রিয় করেছে। প্রত্যেকটি লেগো ব্লকই আজ কোনো ট্রাকের অংশ তো কাল একটা দুর্গের অংশ হতে পারে। আমরা এও বলতে পারি যে লেগো ব্লকগুলো 'শাশ্বত'। আজকের ছেলেমেয়েরা ঠিক সেই সব লেগো ব্লক নিয়েই খেলা করতে পারে যেগুলো দিয়ে তাদের বাবা-মারা খেলেছিলেন ছোটবেলায়।

কাদা দিয়েও নানান আকার তৈরি করতে পারি আমরা, কিন্তু কাদা বারে বারে ব্যবহার করা যায় না, কারণ সেটা ক্ষুদ্র থেকে আরও ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করে ফেলা যায়। এই ক্ষুদে টুকরোগুলোকে আবারো জোড়া দিয়ে নতুন কিছু তৈরি করা যায় না।

আজ আমরা প্রমাণ করতে পারি যে ডেমোক্রিটাসের পরমাণু-তত্ত্ব মোটামুটি সঠিক-ই ছিল। প্রকৃতি আসলেই বিভিন্ন 'পরমাণু' দিয়ে তৈরি, যে-পরমাণুগলো একবার যুক্ত তারপর আবার বিযুক্ত হতে পারে। আমার নাকের ডগার একটা কোষের একটা হাইড্রোজের পরমাণু কোনো এক সময় একটা হাতির শুঁড়ের অংশ ছিল। আমার হৃৎপিণ্ডের পেশির একটা কার্বন পরমাণু কোনো একসময় ঠাঁই নিয়েছিল একটা ডায়নোসরের লেজে।

অবশ্য, আমাদের কালে বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছেন যে 'পরমাণুকেও আরও ছোট 'মৌলিক কণা'-য় বিভক্ত করে ফেলা যায়। এই মৌলিক কণাগুলোকে আমরা বলি প্রোটন, নিউট্রন আর ইলেকট্রন। কোনো একদিন এগুলোকেও হয়ত আরও ছোট কণায় ভেঙে ফেলা যাবে। তবে পদার্থবিদরা এই বিষয়ে একমত যে এই ভেঙে ফেলার একটা সীমা থাকতেই হবে। ক্ষুদ্রতম একটা অংশ থাকতেই হবে যা দিয়ে প্রকৃতি তৈরি হয়েছে।

আধুনিক ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহারের সৌভাগ্য ডেমোক্রিটাসের হয়নি। তাঁর একমাত্র উপযুক্ত সরঞ্জাম ছিল তাঁর মন। তবে প্রজ্ঞা আসলে তার জন্য বাছাবাছির সে-অর্থে কোনো উপায় রাখেনি। কোনো কিছুই বদলে যেতে পারে না, শূন্য থেকে কিছুই সৃষ্টি হতে পারে না আর কোনো কিছুই কখনো পুরোপুরি হারিয়ে যায় না, একবার যদি এই বিষয়গুলোকে স্বীকার করে নেয়া যায় তাহলে প্রকৃতি *অবশ্যই* ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কিছু ব্লক দিয়ে তৈরি যেগুলো যুক্ত আবার বিযুক্ত হতে পারে।

প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ায় বাগড়া দিতে পারে এমন কোনো 'শক্তি' বা 'আত্মা'-য় ডেমোক্রিটাস বিশ্বাস করতেন না। একমাত্র যার অস্তিত্ব রয়েছে বলে তিনি বিশ্বাস করতেন তা হলো পরমাণু আর শূন্যস্থান। তিনি যেহেতু বস্তুগত জিনিস ছাড়া অন্য কিছুতে বিশ্বাস করতেন না, আমরা তাঁকে বলি *বস্তুবাদী*।

ডেমোক্রিটাসের বক্তব্য অনুযায়ী, পরমাণুর গতিবিধির পেছনে কোনো সচেতন 'পরিকল্পনা' নেই। প্রকৃতিতে সবকিছুই ঘটে পুরোপুরি যান্ত্রিকভাবে। তার মানে এই নয় যে সে-সব এলোপাথাড়িভাবে ঘটে, কারণ সবকিছুই অপরিহার্যতার অবশ্যম্ভাবী নিয়ম মেনে চলে। যা কিছু ঘটে তার প্রত্যেকটিরই একটি প্রাকৃতিক কারণ রয়েছে, এমন একটি কারণ যা খোদ সেই জিনিসটির মধ্যেই নিহিত রয়েছে। ডেমোক্রিটাস একবার বলেছিলেন যে পারস্যের রাজা হওয়ার বদলে তিনি বরং প্রকৃতির একটি নতুন কারণ আবিষ্কার করবেন।

ডেমোক্রিটাস বিশ্বাস করতেন, পরমাণু-তত্ত্বের সাহায্যে আমাদের *ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষণ*-

ও ব্যাখ্যা করা যায়। শূন্যে পরমাণুর চলাচলের কারণেই আমরা কোনো জিনিসকে দেখতে পাই। আমি যে চাঁদকে দেখি তার কারণ তখন 'চাঁদের পরমাণু' আমার চোখের ভেতর প্রবেশ করে।

তাহলে 'আত্মা'র ব্যাপারটা কী? সেটি নিশ্চয়ই পরমাণু বা কোনো বস্তুগত জিনিস দিয়ে তৈরি হতে পারে না? আসলে কিন্তু পারে। ডেমোক্রিটাস বিশ্বাস করতেন আত্মা বিশেষ কিছু গোলাকার, মসৃণ, 'আত্মা পরমাণু' দিয়ে তৈরি। কোনো মানুষ মারা গেলে আত্মা পরমাণুগুলো চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে আর তারপর সেগুলো আবার নতুন একটি আত্মার গঠনের অংশ হতে পারে।

তার অর্থ, মানুষ অমর আত্মার অধিকারী নয় এবং বর্তমান কালের অনেকেরই একই মত। ডেমোক্রিটাসের মতো তাঁরাও মনে করেন 'আত্মা'-র সম্পর্ক মস্তিষ্কের সঙ্গে এবং মস্তিষ্ক বিলীন হয়ে যাওয়ার পর আমাদের কোনো ধরনের সচেতনতা থাকতে পারে না।

ডেমোক্রিটাসের পরমাণু-তত্ত্ব গ্রিক প্রকৃতিবাদী দর্শনের ইতি টেনে দিল কিছু দিনের জন্যে। আকার যেহেতু আসে আর যায়, তাই প্রকৃতির সবকিছুই যে 'বয়ে চলে' এ-ব্যাপারে তিনি হেরাক্লিটাসের সঙ্গে একমত প্রকাশ করলেন। কিন্তু বয়ে চলা প্রত্যেকটি বস্তুর পেছনেই রয়েছে কিছু শাশ্বত আর অপরিবর্তনীয় জিনিস যার পরিবর্তন হয় না। ডেমোক্রিটাস এদের নাম দিয়েছেন পরমাণু।

পড়ার সময় সোফি বেশ কয়েকবার জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়েছে রহস্যময় পত্রলেখক ডাকবাক্সের কাছে আসে কিনা তা দেখার জন্যে। এখন সে কেবল রাস্তার দিকে তাকিয়ে রইল, যা পড়ল তা নিয়ে ভাবছে।

তার মনে হলো ডেমোক্রিটাসের ধারণাগুলো কত সহজ-সরল অথচ কত অসাধারণ। 'মৌলিক সারবস্তু' আর 'রূপান্তর' সমস্যার আসল সমাধান আবিষ্কার করেছিলেন তিনি। সমস্যাটা এতোটাই জটিল ছিল যে দার্শনিকেরা প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে গোলকধাঁধায় ঘুরপাক খেয়েছেন এবং শেষ পর্যন্ত ডেমোক্রিটাস কারও সাহায্য না নিয়েই সেটির সমাধান বের করেছেন তাঁর কাণ্ডজ্ঞান ব্যবহার করে।

সোফি না হেসে পারল না। প্রকৃতি যে অপরিবর্তনীয় ক্ষুদে ক্ষুদে জিনিস দিয়ে তৈরি সে-কথা সত্যি হতেই হবে। সেই সঙ্গে হেরাক্লিটাস-ও একেবারে ঠিক বলেছেন যে প্রকৃতির সব আকারই 'বয়ে চলে'। কারণ প্রত্যেকেই মারা যায়, এমনকি একটা পর্বতমালাও ধীরে ধীরে বিলীন হয়ে যায়। কথা হচ্ছে পর্বতমালাটা ক্ষুদে ক্ষুদে অদৃশ্য এমন কিছু অংশ দিয়ে তৈরি যা কখনো বিভক্ত হয় না।

একই সঙ্গে ডেমোক্রিটাস কিছু নতুন প্রশ্ন-ও তুলেছেন। এই যেমন, তিনি বলেছিলেন সবকিছুই যান্ত্রিকভাবে ঘটে। জীবনে আধ্যাত্মিক কোনো কিছুর অস্তিত্ব তিনি স্বীকার করেননি, এম্পিডক্লেস এবং অ্যানাক্সাগোরাস যা করেছিলেন। ডেমোক্রিটাস আরও বিশ্বাস করতেন মানুষ অমর আত্মার অধিকারী নয়।

সোফি কি এ-ব্যাপারে নিশ্চিত?

সে জানে না। তবে, দর্শন কোর্সটা সে তো কেবলই শুরু করেছে।

নি য় তি

'ভবিষ্যদ্বক্তা' এমন একটা জিনিস আগে ভাগে দেখে নিতে চাইছে যা আগে ভাগে দেখে নেয়া আদৌ সম্ভব নয়...

ডেমোক্রিটাস সম্পর্কে পড়ার সময় ডাকবাক্সের দিকে চোখ রাখছিল সোফি। কিন্তু তারপরেও সে বাগানের গেট পর্যন্ত একবার একটু হেঁটে আসবে বলে ঠিক করল।

সদর দরজাটা খুলতেই সামনের সিঁড়ির ধাপের ওপর ছোট্ট একটা সাদা খাম পড়ে থাকতে দেখল সে। আর অবশ্যই তাতে সোফি অ্যামুন্ডসেনের নাম লেখা।

তাহলে ভদ্রলোক তাকে ফাঁকি দিয়েছেন! এতোদিনের মধ্যে আজই যখন সে এমন সতর্ক পাহারা রেখেছিল ডাকবাক্সটার ওপর ঠিক সেদিনই রহস্যময় লোকটা ভিন্ন দিক থেকে চুপিসারে এসে চিঠিটা সিঁড়ির ধাপে রেখে আবার বনের ভেতর হারিয়ে গেছেন। যত্তসব!

উনি কী করে জানলেন যে সোফি আজ ডাকবাক্স পাহারা দিচ্ছিল? তিনি কি তাকে জানালার কাছে দেখেছেন? সে যাই হোক, তার মা আসার আগেই যে চিঠিটা পাওয়া গেছে তাতেই খুশি সোফি।

নিজের ঘরে ফিরে গিয়ে চিঠিটা খুলল সোফি। সাদা খামটার কিনারার দিকটা খানিকটা ভেজা আর সেখানে দুটো ফুটো রয়েছে। কেন? বেশ কিছুদিন হলো বৃষ্টি হয়নি।

ছোট্ট চিঠিটায় লেখা

তুমি কি নিয়তিতে বিশ্বাস করো?
অসুস্থতা কি দেবতাদের দেয়া শাস্তি?
কোন শক্তি ইতিহাসের গতিপথ নিয়ন্ত্রণ করে?

সে কি নিয়তিতে বিশ্বাস করে? সে আদৌ নিশ্চিত নয়। তবে অনেক লোককে সে চেনে যারা করে। ওদের ক্লাসে একটা মেয়ে আছে যে ম্যাগাজিনে হরস্কোপ পড়ে। তবে জ্যোতির্বিদ্যায় বিশ্বাস করলে তারা সম্ভবত নিয়তিতেও বিশ্বাস করে, কারণ জ্যোতির্বিদরা দাবি করে থাকেন যে নক্ষত্রের অবস্থান পৃথিবীর মানুষের জীবনকে প্রভাবিত করে।

কেউ যদি বিশ্বাস করে যে তার পথের ওপর দিয়ে একটা কালো বেড়াল চলে যাওয়ার অর্থ মন্দ ভাগ্য, তাহলে তো সে নিয়তিতে বিশ্বাস করে, তাই না? বিষয়টা নিয়ে আরও চিন্তা করতে নিয়তিবাদের আরও অনেক উদাহরণ মনে এলো তার। এই যেমন, অনেকেই দুর্ভাগ্য এড়ানোর জন্য কাঠ ছুঁয়ে কথা বলে কেন? ১৩ তারিখ শুক্রবার অশুভ দিন কেন? সোফি শুনেছে অনেক হোটেলে ১৩ নম্বর কামরা নেই। এ-সব হয়েছে তার কারণ অনেক মানুষই কুসংস্কারাচ্ছন্ন।

'কুসংস্কারাচ্ছন্ন'। কী অদ্ভুত একটা শব্দ। খ্রিস্টধর্ম বা ইসলামের অনুসারী হলে তাকে বলে 'বিশ্বাস'। কিন্তু জ্যোতির্বিদ্যা বা ১৩ তারিখ শুক্রবারে বিশ্বাস করা কুসংস্কার! অন্যের বিশ্বাসকে কুসংস্কার বলার অধিকার কি কারও আছে?

অবশ্য একটা ব্যাপারে সোফি নিশ্চিত। ডেমোক্রিটাস নিয়তিতে বিশ্বাস করতেন না। তিনি ছিলেন বস্তুবাদী। তিনি শুধু পরমাণু আর শূন্য স্থানে বিশ্বাস করতেন।

চিঠির বাকি প্রশ্নগুলোর কথা ভাববার চেষ্টা করল সোফি।

'অসুস্থতা কি দেবতাদের দেয়া শাস্তি?' আজকাল নিশ্চয়ই সে-কথা কেউ আর বিশ্বাস করে না। কিন্তু তার মনে পড়ল যে অনেকেই এ-কথা বিশ্বাস করে যে আরোগ্যলাভের জন্য প্রার্থনা করলে কাজ হয়, তার মানে নিশ্চয়ই তারা বিশ্বাস করে যে মানুষের স্বাস্থ্যের ওপর ঈশ্বরের খানিকটা কর্তৃত্ব আছে।

শেষ প্রশ্নটার উত্তর আরও কঠিন। ইতিহাসের গতিপথ কীভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় তা নিয়ে সোফি খুব একটা ভাবেনি কোনোদিন। লোকেই তা করে নিশ্চয়ই? ঈশ্বর বা নিয়তি করলে তো মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা বলে কিছু থাকত না।

স্বাধীন ইচ্ছা প্রসঙ্গে আরেকটা কথা মনে হলো সোফির। রহস্যময় দার্শনিক যে তার সঙ্গে ইঁদুর-বেড়াল খেলছেন সেটি সে সহ্য করবে কেন? *ভদ্রলোককে* কি সে একটা চিঠি লিখতে পারে না? তিনি, তা তিনি পুরুষই হন বা নারী, খুব সম্ভবত রাতে অথবা কাল সকালে আরেকটা বড় খাম ডাকবাক্সে রেখে যাবেন। তখন যাতে তাঁর জন্য একটা চিঠি তৈরি থাকে সোফি সে-ব্যবস্থা করবে।

তক্ষুণি লিখতে বসে গেল সোফি। যাকে সে কোনোদিন দেখেনি তার কাছে চিঠি লেখা কঠিন। সে এমনকি এটাও জানে না তিনি পুরুষ না নারী। বৃদ্ধ না তরুণ। আবার এমনও হতে পারে যে রহস্যময় দার্শনিক তার চেনা কেউ।

সে লিখল

> পরম শ্রদ্ধেয় দার্শনিক, দর্শনের ওপর আপনার মহৎ করেসপন্ডেন্স কোর্সটি আমাদের এখানে সবার অত্যন্ত প্রশংসা কুড়িয়েছে। তবে আপনার পরিচয় জানতে না পেরে আমরা অস্বস্তি বোধ করছি। তাই আমাদের অনুরোধ আপনি যেন আপনার পুরো নাম লেখেন। তার বিনিময়ে, আপনি যদি এসে আমাদের সঙ্গে কফি খেতে চান তাহলে আমরা আপনাকে আমাদের আতিথেয়তা প্রদানের ইচ্ছা রাখি, তবে সেটি মা যখন বাড়ি থাকেন তখন হলে ভালো হয়। তিনি সোম থেকে শুক্রবার সকাল ৭:৩০ থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত অফিসে থাকেন। এই দিনগুলোতে আমি স্কুলে থাকি, তবে দুপুর

২:৩০-এর মধ্যেই বাড়ি ফিরে আসি, বৃহস্পতিবার ছাড়া। ভালো কথা,
আমি চমৎকার কফিও বানাতে পারি।
আপনাকে আগাম ধন্যবাদ জানিয়ে রাখছি,
আপনার মনোযোগী ছাত্রী
সোফি অ্যামুন্ডসেন (বয়স ১৪)

পৃষ্ঠার শেষে সে লিখল *আরএসভিপি*[৬]।

সোফির মনে হলো চিঠিটা বড্ড বেশি আনুষ্ঠানিক হয়ে গেছে। তবে মুখাবয়বহীন কোনো মানুষের কাছে চিঠি লেখার সময় শব্দ চয়ন করা কঠিন। গোলাপী একটা খামের ভেতর চিঠিটা রেখে ঠিকানা হিসেবে লিখল 'প্রতি, দার্শনিক'।

সমস্যা হলো এমন একটা জায়গায় ওটা রাখা যাতে তার মা দেখতে না পান চিঠিটা। ডাকবাক্সে ওটা রাখার আগে ওকে ওর মা বাড়ি ফেরা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। তাছাড়া, পরদিন সকালে পত্রিকা এসে পৌঁছাবার আগেই ডাকবাক্সটা দেখার কথাও মনে রাখতে হবে। আজ সন্ধ্যায় বা রাতের বেলা যদি কোনো চিঠি না আসে তাহলে গোলাপী খামটা ফেরত নিয়ে আসতে হবে তাকে।

ব্যাপারটা এতো জটিল হতে হবে কেন?

সেদিন যদিও শুক্রবার কিন্তু সন্ধ্যার সময় আগেভাগেই নিজের ঘরে উঠে গেল সোফি। পিৎসা আর টিভিতে একটা থ্রিলারের লোভ দেখালেন তার মা, কিন্তু সোফি বলল সে ক্লান্ত, বিছানায় শুয়ে শুয়ে পড়তে চায়। মা যখন বসে বসে টিভি দেখছেন সোফি তখন গোলাপী খামটা নিয়ে চুপি চুপি গিয়ে হাজির হলো ডাকবাক্সের কাছে।

তার মা নিশ্চিতভাবেই বেশ চিন্তায় পড়ে গেছেন। সেই সাদা খরগোশ আর টপ হ্যাটের ব্যাপারটার পর থেকে ভিন্ন সুরে কথা বলছেন তিনি সোফির সঙ্গে। মায়ের চিন্তার কারণ হওয়াটা মোটেই পছন্দ নয় সোফির, কিন্তু তারপরেও নিজের ঘরে উঠে গিয়ে ডাকবাক্সটার ওপর তাকে নজর রাখতে হলো।

রাত এগারোটার দিকে তার মা যখন ওপরে এলেন সোফি তখন জানালার পাশে বসে রাস্তাটার দিকে তাকিয়ে আছে।

'এখনো তুই ডাকবাক্সের দিকে তাকিয়ে বসে আছিস!' বলে উঠলেন তিনি।

'যেদিকে ইচ্ছে সেদিকেই তাকিয়ে থাকতে পারি আমি।'

'আমার কিন্তু সত্যিই মনে হচ্ছে প্রেমে পড়েছিস তুই, সোফি। কিন্তু সে যদি তোকে আরেকটা চিঠি দেয় নিশ্চয়ই সেটি সে মাঝ রাতে নিয়ে আসবে না।'

যত্তসব! প্রেম-ভালোবাসা নিয়ে এ-সব প্যানপ্যানানির কথা একদম পছন্দ হলো না সোফির। তবে মাকে তার বিশ্বাস করতে দিতে হবে যে কথাটা সত্যি।

'খরগোশ আর টপ হ্যাটের কথা কি সে-ই বলেছিল তোকে?' সোফির মা জিজ্ঞেস করলেন।

---

৬. অনুগ্রহ করে উত্তর দেবেন। ফরাসি ভাষায় répondez sil vous plait—অনুবাদক।

ওপর-নিচ মাথা ঝাঁকাল সোফি।

'ও ড্রাগ-ট্রাগ নেয় না তো, সোফি?'

মায়ের জন্য এবার সত্যি সত্যি খারাপ লাগল সোফির। তাঁকে সে এভাবে উৎকণ্ঠায় থাকতে দিতে পারেন না, যদিও কারও মাথায় খানিকটা উদ্ভট চিন্তা-ভাবনা থাকলেই তাকে ক্ষ্যাপাটে বলে ধরে নেয়াটা মায়ের নিতান্তই পাগলামি ছাড়া কিছু নয়। বড়রা মাঝে মাঝেই নির্বোধের মতো আচরণ করে।

সোফি বলল, 'মা, আমি তোমাকে প্রথম আর শেষবারের মতো কথা দিচ্ছি ও-ধরনের জিনিস আমি কখনোই নেবো না...আর ও-ও নেয় না। তবে দর্শনের ব্যাপারে খুব উৎসাহ ওর।'

'তোর চেয়ে বয়সে বড় বুঝি সে?'

সোফি মাথা নাড়ল।

'তোর সমান বয়স?'

সোফি মাথা ঝাঁকাল।

'ইয়ে, আমি ঠিক জানি, ছেলেটা নিশ্চয়ই খুব মিষ্টি, মা। কিন্তু আমার মনে হয় এখন তোর ঘুমানোর চেষ্টা করা উচিত।'

কিন্তু সোফি জানালার পাশেই বসে থাকল, মনে হলো যেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে। শেষ পর্যন্ত সে আর তার চোখ খুলে রাখতে পারছিল না। রাত তখন ঠিক একটা। সে যখন বিছানায় উঠতে যাবে এই সময় হঠাৎ বনের ভেতর থেকে উদয় হওয়া একটা ছায়া নজরে পড়ল তার।

বাইরে যদিও প্রায় অন্ধকার, সে বুঝতে পারল আকৃতিটা একটা মনুষ্যদেহের। লোকটি একজন পুরুষ আর তাকে দেখতে একবারেই বুড়ো মানুষের মতো লাগল সোফির কাছে। সোফির বয়সের সমান হওয়ার প্রশ্নই আসে না! বেরে[৭] ধরনের একটা টুপি পরে আছে লোকটি।

সোফি হলফ করে বলতে পারবে লোকটি বাড়িটার দিকে এক নজর তাকাল, তবে সোফির ঘরের বাতি জ্বলছিল না। সোজা ডাকবাক্সের কাছে হেঁটে গেল লোকটা, তারপর বড়সড় একটা খাম ছেড়ে দিল সেটির ভেতর। খামটা ফেলার সময় সোফির চিঠিটা নজরে পড়ল তার। ডাকবাক্সের ভেতর হাত ঢুকিয়ে দিয়ে সেটি তুলে নিল সে। পর মুহূর্তেই দ্রুত পা চালিয়ে আবার হাঁটতে শুরু করল বনের উদ্দেশ্যে। বনের পথ ধরে দ্রুত হাঁটতে লাগল সে, তারপর একসময় অদৃশ্য হয়ে গেল।

সোফি বুঝতে পারল তার বুকটা ধক ধক করছে। প্রথমেই তার যে-প্রতিক্রিয়াটা হলো তা হচ্ছে পাজামা পরেই লোকটাকে অনুসরণ করার ইচ্ছে জাগল, কিন্তু মাঝরাত্তিরে একজন অচেনা লোকের পেছন পেছন দৌড়ে যেতে সাহস হলো না তার। তবে বাইরে তাকে যেতে হবে, খামটা নিয়ে আসার জন্য। দুয়েক মিনিট পর পা টিপে টিপে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলো সে, সদর দরজাটা খুলল আস্তে আস্তে, তারপর ছুট দিল

---

৭. Beret—গরম বা সূতি কাপড়ের চ্যাপ্টা এবং কিনারাবিহীন এক ধরনের টুপি। স্পেন এবং ফ্রান্সের কোনো কোনো কৃষক সম্প্রদায় এবং খেলোয়াড় ও সৈনিকেরা পরে—অনুবাদক।

ডাকবাক্সের দিকে। চোখের পলকে তার ঘরে ফিরে এলো সে খামটা হাতে নিয়ে। দম বন্ধ করে নিজের বিছানায় গিয়ে বসল সে। কয়েক মিনিট কেটে গেলে পর, সারা বাড়ি যখন তখনো সুনসান, চিঠিটা খুলে পড়তে শুরু করল সে।

সে জানে এটা তার চিঠির উত্তর নয়। সেটি আগামীকালের আগে আসবে না।

নিয়তি

আরও একবার শুভ সকাল জানাচ্ছি তোমাকে, প্রিয় সোফি আমার। পাছে তোমার মনে এ-ধরনের কোনো ইচ্ছে জাগে সেজন্য আগেই তোমাকে পরিষ্কার বলে রাখছি যে কখনো আমার সুলুক-সন্ধান করতে যেয়ো না। একদিন দেখা হবে আমাদের, কিন্তু আমি-ই সিদ্ধান্ত নেবো সেটি কখন এবং কোথায় হবে। আর এটাই শেষ কথা। তুমি নিশ্চয়ই আমার কথা অমান্য করবে না, তাই না?

যাই হোক, দর্শনে ফেরা যাক। আমরা দেখেছি কীভাবে তাঁরা প্রকৃতির পরিবর্তনগুলোর প্রাকৃতিক কারণ বের করার চেষ্টা করেছিলেন। এর আগে এ-বিষয়গুলো ব্যাখ্যা করা হয়েছিল পুরাণের সাহায্যে।

অন্যান্য পরিসর থেকেও কুসংস্কার দূর করা দরকার ছিল। রোগ-বালাই আর স্বাস্থ্য সংক্রান্ত ব্যাপারে এগুলোকে সক্রিয় দেখতে পাই আমরা। এই দুই ক্ষেত্রেই নিয়তিবাদ-এ (fatalism) প্রবল বিশ্বাসী ছিল গ্রিকরা।

যা কিছু ঘটে তার সবই পূর্ব নির্দিষ্ট, এই বিশ্বাসই হলো নিয়তিবাদ। গোটা পৃথিবী জুড়েই এই বিশ্বাস দেখতে পাই আমরা, শুধু যে সমগ্র ইতিহাসব্যাপী তাই নয়, আমাদের নিজেদের কালেও। প্রাচীন আইসল্যান্ডীয় সাগা *এডা*-য় আমাদের এই নর্ডিকদেশগুলোতে 'লাগননাডান' বা নিয়তিতে একটা প্রবল বিশ্বাস লক্ষ করি আমরা।

প্রাচীন গ্রিস বা পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলেও আমরা এই বিশ্বাস দেখি যে লোকে এক ধরনের ওরাকল[৮] (oracle)-এর মাধ্যমে তাদের নিয়তি জানতে পারে। অন্য কথায় বলতে গেলে বিশ্বাসটি এই যে, কোনো মানুষ বা দেশের নিয়তির কথা বিভিন্ন উপায়ে আগে থেকেই জানা যেতে পারে।

এখনো এ-ধরনের অনেক মানুষ রয়েছে যারা মনে করে তারা তাসের মধ্যে ভাগ্য দেখতে পায়, হাতের রেখা পড়তে পারে বা নক্ষত্র দেখে তোমার ভবিষ্যৎ বলতে পারে।

এর-ই একটা বিশেষ নরওয়েজীয় সংস্করণ হচ্ছে কফি কাপের মধ্যে লোকের ভাগ্য দেখা। খালি কফি কাপে সাধারণত কফিগুঁড়োর কিছু অবশেষে থেকে যায়। এই অবশেষ একটা নকশা বা ছাঁচের সৃষ্টি করতে পারে, অন্তত আমরা যদি আমাদের কল্পনার লাগাম ছেড়ে দেই তখন। যদি সেই অবশেষ একটা গাড়ির মতো দেখায় তাহলে হয়ত তার অর্থ এই যে, যে-লোকটি সেই কফি খেয়েছে সে একটা লং ড্রাইভে

---

৮. দৈববাণী বা প্রত্যাদেশ প্রকাশের মাধ্যম বা স্থান—অনুবাদক

যাচ্ছে।

কাজেই 'ভবিষ্যদ্বক্তা' এমন একটা জিনিস আগে ভাগে দেখে নিতে চাইছে যা আগে ভাগে দেখে নেয়া আদৌ সম্ভব নয়। সব ধরনের ভবিষ্যদ্বাণীরই বৈশিষ্ট্য এই। আর যেহেতু তারা যা 'দেখে' তা খুবই অস্পষ্ট, তাই ভবিষ্যদ্বক্তার দাবি খণ্ডন করা কঠিন।

তারাদের দিকে তাকালে মিটমিট করা কিছু বিন্দুর একটা যথার্থ বিশৃঙ্খলা দেখতে পাই আমরা। তারপরেও, বিভিন্ন সময় জুড়ে আমরা সেইসব মানুষ দেখতে পাই যারা বিশ্বাস করে গেছে যে তারারা পৃথিবীতে আমাদের জীবন সম্পর্কে কিছু কথা বলতে পারে। এমনকি আজও কিছু রাজনৈতিক নেতা রয়েছেন যাঁরা কোনো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে জ্যোতির্বিদের পরামর্শের জন্য ছোটেন।

দেলফির ওরাকল

প্রাচীন গ্রিকরা বিশ্বাস করত দেলফির বিখ্যাত ওরাকলের কাছ থেকে তারা তাদের নিয়তি সম্পর্কে জানতে পারবে। সেই ওরাকলের অধিষ্ঠাতা দেবতা অ্যাপোলো তাঁর যাজিকা পিথিয়ার মাধ্যমে কথা বলতেন। যাজিকা মাটির ওপরের এক ফাটলের ওপর বসতেন আর সেটির ভেতর থেকে সম্মোহক বাষ্প বের হয়ে পিথিয়াকে ভাবসমাধির মধ্যে নিয়ে যেতো। সেটিই তাকে সাহায্য করতো অ্যাপোলোর মুখপাত্রী হিসেবে কাজ করতে।

দেলফিতে আসার পর লোকজনকে তাদের প্রশ্ন যাজকদের কাছে উপস্থিত করতে হতো, তারা তখন সেই প্রশ্ন পিথিয়ার কাছে পৌঁছে দিতেন। তাঁর উত্তর সচরাচর এতোই দুর্বোধ্য বা দ্ব্যর্থবোধক হতো যে যাজকদের সেগুলো ব্যাখ্যা করে বলে দিতে হতো লোকজনকে। এভাবে লোকে অ্যাপোলোর বিজ্ঞতা থেকে ফল লাভ করতো, এই বিশ্বাস থেকে যে তিনি সব কিছুই জানেন, এমনকি ভবিষ্যৎ-ও।

এমন অনেক রাষ্ট্রপ্রধান ছিলেন যাঁরা দেলফির ওরাকলের সঙ্গে পরামর্শ ছাড়া যুদ্ধ ঘোষণা বা কোনো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতেন না। অ্যাপোলোর যাজকরা এভাবেই মোটামুটি কূটনীতিক বা পরামর্শদাতার ভূমিকা পালন করতেন। অভিজ্ঞ এই ব্যক্তিদের কাছে জনসাধারণ এবং দেশের নাড়ি-নক্ষত্রের খবর থাকত।

দেলফির মন্দিরের প্রবেশমুখে একটি বিখ্যাত কথা উৎকীর্ণ ছিল নিজেকে জানো! কথাটা দেলফিতে আগত লোকজনকে এই বিষয়টি স্মরণ করিয়ে দিত যে মানুষ যেন কখনোই নিজেকে মরণশীল প্রাণীর চেয়ে বেশিকিছু না ভাবে এবং কোনো মানুষ-ই তার নিয়তি এড়াতে পারে না।

গ্রিকদের মধ্যে এমন সব লোকের অনেক গল্প প্রচলিত ছিল যারা কোনোভাবেই তাদের নিয়তিকে এড়াতে পারেনি। কালক্রমে বেশকিছু নাটক—ট্র্যাজেডি—রচিত হয় এ-সব 'ট্র্যাজিক' লোককে নিয়ে। সেগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাতটি হচ্ছে রাজা ঈডিপাসের ট্র্যাজেডি।

কিন্তু নিয়তি শুধু ব্যক্তির জীবনকেই নিয়ন্ত্রণ করে না। গ্রিকরা বিশ্বাস করত, এমনকি বিশ্ব ইতিহাসকেও নিয়তিই নিয়ন্ত্রণ করে এবং দেবতাদের হস্তক্ষেপে যুদ্ধের গতি-প্রকৃতি বদলে যেতে পারে। আজও এমন কিছু মানুষ আছে যারা মনে করে ঈশ্বর বা কোনো রহস্যময় শক্তি ইতিহাসের গতিপথ নিয়ন্ত্রণ করছে।

কিন্তু গ্রিক দার্শনিকেরা যখন প্রাকৃতিক প্রক্রিয়াগুলোর প্রাকৃতিক ব্যাখ্যা বের করার চেষ্টা করছিলেন ঠিক সেই সময়ই প্রথম ইতিহাসবিদেরা ইতিহাসের গতিপথের প্রাকৃতিক ব্যাখ্যার সন্ধান করছিলেন। দেবতাদের হস্তক্ষেপ এখন থেকে আর যুদ্ধে কোনো দেশের পরাজয়ের গ্রহণযোগ্য কারণ বলে বিবেচিত হচ্ছিল না তাঁদের কাছে। সবচেয়ে বিখ্যাত ঐতিহাসিক ছিলেন *হেরোডটাস* (Herodotus, ৪৮৪-৪২৪ খ্রি. পূ.) ও *থুসিডাইডিস* (Thucydides, ৪৬০-৪০০ খ্রি.পূ.)।

গ্রিকরা আরও বিশ্বাস করত যে অসুস্থতাকে স্বর্গীয় হস্তক্ষেপ বলে ধরে নেয়া যেতে পারে। অন্য কথায় বলতে গেলে, মানুষকে দেবতারা আবার সুস্থ করে তুলতে পারেন যদি তাঁদেরকে যথাযথ নৈবেদ্য দেয়া হয়।

শুধু যে গ্রিকরাই এই ধারণা পোষণ করত তা কিন্তু নয়। আধুনিক চিকিৎসাশাস্ত্রের উদ্ভবের আগে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য দৃষ্টিভঙ্গি ছিল এই যে অতিপ্রাকৃত কারণেই অসুখ-বিসুখ হয়। 'ইনফ্লুয়েঞ্জা' শব্দের প্রকৃত অর্থ গ্রহ-নক্ষত্রের অশুভ প্রভাব।

এমনকি আজও অনেক মানুষই মনে করে যে কিছু কিছু রোগ—এই যেমন এইডস—ঈশ্বরের শাস্তিস্বরূপ। অনেকে এ-ও বিশ্বাস করে যে অতিপ্রাকৃত কারণে রোগী সেরে উঠতে পারে।

গ্রিক দর্শনের নতুন অভিযাত্রার সময়েই একটি গ্রিক চিকিৎসাশাস্ত্রের উদ্ভব ঘটল যা অসুস্থতা ও সুস্থতার প্রাকৃতিক কারণ নির্ণয় করার চেষ্টা করল। বলা হয়ে থাকে গ্রিক চিকিৎসাশাস্ত্রের স্থপতি হলেন *হিপোক্রেটিস* (Hippocrates), তাঁর জন্ম কস্ দ্বীপে, ৪৬০ খ্রিস্ট পূর্বাব্দের দিকে।

হিপোক্রেটিসীয় চিকিৎসাশাস্ত্রমতে অসুস্থতার বিরুদ্ধে সবচেয়ে কার্যকর নিরাপত্তা-ব্যবস্থা হলো পরিমিতি এবং একটি স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন পদ্ধতি। স্বাস্থ্য একটি প্রাকৃতিক অবস্থা। যখন কোনো ধরনের অসুস্থতা ঘটে তখন তা এটাই নির্দেশ করে যে শারীরিক এবং মানসিক ভারসাম্যহীনতার ফলে প্রকৃতি তার নির্দিষ্ট গতিপথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে।

পরিমিতি, সুসামঞ্জস্যতা আর 'সুস্থ দেহে সুস্থ মন', এই তিনের মাধ্যমেই প্রত্যেকে সুস্বাস্থ্য লাভ করতে পারে।

'মেডিকেল এথিকস্' নিয়ে ইদানীং অনেক কথা শোনা যায়, যার অর্থ এই যে একজন চিকিৎসক অবশ্যই কিছু নৈতিক নিয়ম মেনে চিকিৎসা করবেন। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, একজন চিকিৎসক একজন সুস্থ ব্যক্তিকে মাদকদ্রব্য ব্যবহারের ব্যবস্থাপত্র দিতে পারেন না।

চিকিৎসক অবশ্যই পেশাগত গোপনীয়তা বজায় রাখবেন, যার অর্থ রোগী তার

অসুস্থতা সম্পর্কে তাঁকে যে-সব কথা বলেছে তিনি তার কোনো কিছু প্রকাশ করবেন না। এ-সব ধারণার মূলে রয়েছেন হিপোক্রেটিস। তাঁর ছাত্রদের নিচের এই শপথ নিতে হতো

> আমার ক্ষমতা এবং বিবেচনাবোধ অনুযায়ী আমি সেই পদ্ধতি বা পথ্যব্যবস্থাই অনুসরণ করিব যাহা আমার রোগীর মঙ্গলসাধন করিবে বলিয়া আমি মনে করি এবং সেই সঙ্গে যাহা কিছু ধ্বংসাত্মক ও কুফলদায়ক তাহা হইতে বিরত থাকিব। কাহাকেও আমি কোনো প্রাণঘাতী ঔষধ বা পরামর্শ প্রদান করিব না এবং একই প্রকারে, কোনো রমণীকে গর্ভনাশক কোনো কিছু দিব না। রোগীর উপকারার্থেই আমি তাহার গৃহে প্রবেশ করিব এবং স্বেচ্ছাপ্রণোদিতভাবে কোনো প্রকার অমঙ্গলকর ও দুর্নীতিমূলক কাজ করা হইতে বিরত থাকিব, তাহা ছাড়া, দাস কিংবা অ-দাস, স্ত্রী অথবা পুরুষকে অসচ্চরিত্রতামূলক কার্যে লিপ্ত করিব না। আমার চিকিৎসাকর্ম সম্পৃক্ত অপ্রকাশযোগ্য যাহা কিছু আমি দেখিব বা শ্রবণ করিব তাহা আমি গোপন রাখিব। আমি যেন ততদিন-ই আমার জীবন উপভোগ এবং সর্বকালে সর্বজনশ্রদ্ধেয় আমার শাস্ত্র পালন করিতে পারি যতদিন এই শপথ আমার দ্বারা অক্ষুণ্ন থাকে, কিন্তু কখনও তাহা ভঙ্গ করিলে ইহার বিপরীত-ই যেন আমার ভাগ্যে ঘটে।

চমকে ঘুম থেকে উঠল সোফি শনিবার সকালে। ওটা কি কোনো স্বপ্ন, না আসলেই দার্শনিককে দেখেছে সে?

এক হাত দিয়ে বিছানার নিচটা পরখ করে দেখল সে। হ্যাঁ, রাতে আসা চিঠিটা ওখানেই আছে। নিছকই স্বপ্ন ছিল না ওটা।

আলবৎ দেখেছে সে দার্শনিককে! তাছাড়া, সে নিজের চোখে দেখেছে তাঁকে তার চিঠিটা নিতে!

হামাগুড়ি দিয়ে মেঝেতে নেমে বিছানার নিচ থেকে সবকটা টাইপ-করা পৃষ্ঠা বের করল সে। কিন্তু ওটা কী? দেয়ালের ঠিক পাশেই লাল কিছু একটা দেখা যাচ্ছে। স্কার্ফ নাকি?

বিছানার নিচে ঢুকে পড়ল সোফি, টেনে বের করল লাল স্কার্ফটা। একটা ব্যাপার নিশ্চিত, ওটা তার নয়।

আরও ভালো করে স্কার্ফটা পরীক্ষা করে দেখল সে এবং সেটির সেলাইয়ের ধারে হিল্ডা লেখা দেখে তার মুখ হাঁ হয়ে গেল।

হিল্ডা! কিন্তু কে এই হিল্ডা ? এভাবে তাদের দু'জনের পথ বারবার একসঙ্গে মিশে যাচ্ছে কীভাবে?

স ক্রে টি স

৫৩৩

...যে জানে যে সে কিছুই জানে না সে-ই সবচেয়ে জ্ঞানী...

একটা সামার ড্রেস পরে দ্রুত রান্নাঘরে নেমে এলো সোফি। সেখানে টেবিলটার পাশে দাঁড়িয়ে আছেন তার মা। সোফি ঠিক করে রেশমি স্কার্ফটা নিয়ে কোনো কথা বলবে না সে।

'তুমি কি খবরের কাগজটা নিয়ে এসেছিলে?' সোফি জিজ্ঞেস করে।

'আমাকে একটু এনে দিবি তুই?'

এক ছুটে দরজা দিয়ে বেরিয়ে যায় সোফি, নুড়ি-বিছানো পথ ধরে পৌঁছে যায় ডাকবাক্সের কাছে।

শুধুই খবরের কাগজটা। এতো তাড়াতাড়ি জবাব আশা করতে পারে না সে, তার মনে হলো। খবরের কাগজের সামনের পাতায় লেবাননে নরওয়েজীয় জাতিসংঘ বাহিনী সম্পর্কে কিছু একটা পড়ল সে।

জাতিসংঘ বাহিনী... হিল্ডার বাবার কাছ থেকে আসা কার্ডগুলোতে এই পোস্ট মার্ক-ই ছিল না? ডাকটিকিটটা অবশ্য নরওয়ের। হতে পারে জাতিসংঘ বাহিনীর নরওয়েজীয় সৈন্যদের নিজস্ব একটা ডাকঘর আছে ওখানে।

'খবরের কাগজের ব্যাপারে তুই বেশ আগ্রহী হয়ে উঠেছিস?' সোফি রান্নাঘরে ফিরে আসতে শুকনো কণ্ঠে বললেন তার মা।

ভাগ্য ভালো তিনি নাশতার সময় বা পরে ডাকবাক্স এবং চিঠিপত্র নিয়ে আর কিছু বললেন না। তিনি কেনাকাটা করতে বেরোলে পর সোফি নিয়তি নিয়ে লেখা তার চিঠিটা সঙ্গে করে গুহায় চলে গেল।

দার্শনিকের কাছ থেকে আসা অন্যান্য চিঠি রাখা বিস্কিটের টিনটার পাশে ছোট্ট একটা সাদা খাম দেখে অবাক হলো সে। সোফি নিশ্চিত খামটা সে রাখেনি ওখানে।

এটারও প্রান্তের দিকটা ভেজা। তাছাড়া এটার গায়েও ঠিক কালকে পাওয়া খামটার মতোই দুটো গভীর গর্ত রয়েছে।

দার্শনিক কি এসেছিলেন এখানে? তিনি কি তার লুকানোর গোপন জায়গাটার কথা জানেন? খামটা ভেজা কেন?

এতো সব প্রশ্ন তার মাথাটা ঘুরিয়ে দিল। চিঠিটা খুলে নোটটা পড়ল সে

প্রিয় সোফি, প্রবল আগ্রহ নিয়ে তোমার চিঠিটা পড়লাম, খানিকটা দুঃখ-ও

যে হলো না তা নয়। দুর্ভাগ্যক্রমে, আমন্ত্রণের ব্যাপারে তোমাকে হতাশ করতেই হচ্ছে। দেখা আমাদের হবে একদিন, তবে 'ক্যাপ্টেনের বাঁকে' আমার সশরীরে আসতে এখনো সম্ভবত বেশ কিছু দিন দেরি হবে।

সেই সঙ্গে একটা কথা যোগ করতে হচ্ছে যে এখন থেকে আমার পক্ষে আর নিজে গিয়ে চিঠি দিয়ে আসা সম্ভব হবে না। পরিণামে ব্যাপারটা বড্ড বেশি ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়বে। ভবিষ্যতে আমার ক্ষুদে বার্তাবাহক গিয়ে চিঠি দিয়ে আসবে। তাছাড়া সেগুলো সরাসরি বাগানের গোপন জায়গাতে দিয়ে আসা হবে।

দরকার মনে করলে যে-কোনো সময় যোগাযোগ করতে পারো তুমি আমার সঙ্গে। যখনই করো, একটা গোলাপী খামে একটা বিস্কিট বা এক মুঠো চিনি-ও ভরে দিও। বার্তাবাহক ওটা পেলে সোজা আমার কাছে নিয়ে আসবে।

পুনশ্চ   কোনো তরুণীর কফির আমন্ত্রণ ফিরিয়ে দেয়াটা শোভন নয়, তবে মাঝে মধ্যে তা করতে হয় প্রয়োজনের খাতিরে।

পুনঃ পুনশ্চ   কোথাও যদি একটা লাল রেশমি স্কার্ফ পাও, দয়া করে সেটি যত্ন করে রেখো। মাঝে মাঝে মানুষের ব্যক্তিগত জিনিসপত্র অদল-বদল হয়ে যায়। বিশেষ করে স্কুলে এবং এ-ধরনের জায়গায় আর এটা দর্শনের একটা স্কুল তো বটেই।

তোমার, অ্যালবার্টো নক্স

সোফির বয়স প্রায় পনেরো বছর আর তার এই তরুণ জীবনে এ-অবধি সে বেশ কিছু চিঠি পেয়েছে, বিশেষ করে বড় দিন আর জন্মদিনে। কিন্তু এই চিঠিটার মতো এতো অদ্ভুত চিঠি সে কোনোদিন পায়নি।

কোনো ডাকটিকিট নেই এটার গায়ে। এমনকি, এটা কোনো ডাকবাক্সেও ফেলা হয়নি। পুরনো বেড়ার মধ্যে সোফির একান্ত গোপন লুকানোর জায়গাতে সরাসরি নিয়ে আসা হয়েছে চিঠিটা। তাছাড়া, বসন্তের এই শুকনো আবহাওয়াতে চিঠিটা যে ভেজা অবস্থায় পাওয়া গেছে সেটিও খুব রহস্যজনক।

অবশ্য সবচেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার হচ্ছে রেশমি স্কার্ফটা। দার্শনিকের নিশ্চয়ই আরেকজন ছাত্রী আছে। ঠিক তাই। আর এই ছাত্রীটি লাল একটা রেশমি স্কার্ফ হারিয়ে ফেলেছে। ঠিক। কিন্তু সেটি সে সোফির বিছানায় হারাল কী করে?

আর তাছাড়া, অ্যালবার্টো নক্স...এটা আবার কী ধরনের নাম?

একটা ব্যাপার নিশ্চিত—দার্শনিক আর হিল্ডা মোলার ন্যাগের মধ্যকার সম্পর্ক। কিন্তু হিল্ডার নিজের বাবা তাঁদের ঠিকানা গুলিয়ে ফেলছেন, এটা একবারেই বোঝা যাচ্ছে না।

হিল্ডা আর তার নিজের মধ্যে সম্ভাব্য কী সম্পর্ক থাকতে পারে বসে বসে সে-কথা ভাবতে লাগল সোফি অনেকক্ষণ ধরে। শেষমেশ হাল ছেড়ে দিল সে। দার্শনিক লিখেছেন একদিন ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হবে তার। হয়ত হিল্ডার সঙ্গেও দেখা হবে তার।

চিঠিটা ওল্টাল সে। এবার সে দেখল ওটার উল্টো দিকেও কিছু কথা লেখা

রয়েছে

স্বাভাবিক শালীনতা বলে কি কিছু আছে?
যে জানে যে সে কিছুই জানে না সে-ই সবচেয়ে জ্ঞানী...
সত্যিকারের উপলব্ধি ভেতর থেকেই আসে।
যে জানে কোন কাজটি সঠিক সে ঠিক কাজটিই করবে।

সোফি জানে সাদা খামে ছোট ছোট বাক্য আসে তাকে পরের বড় খামটার জন্য প্রস্তুত করার জন্য এবং সে-খামটা খানিক পরেই এসে পৌঁছবে। হঠাৎই একটা বুদ্ধি এলো সোফির মাথায়। 'বার্তাবাহক' যদি একটা বাদামি খাম দিতে গুহায় আসে তাহলে তো সে স্রেফ এখানেই বসে থাকতে পারে লোকটার জন্য। সে কি পুরুষ না স্ত্রীলোক? তা সেই পুরুষ বা স্ত্রীলোকটি তাকে দার্শনিক সম্পর্কে আরও কিছু জানাতে পারে কিনা তা দেখার জন্য সে আলবৎ বসে থাকবে। চিঠিতে বলা হয়েছে 'বার্তাবাহক' ছোট্ট। তাহলে সে কি কোনো শিশু?

'স্বাভাবিক শালীনতা বলে কি কিছু আছে?'

সোফি জানে 'শালীনতা' লজ্জাশীলতা শব্দটারই সেকেলে রূপ, এই যেমন নগ্ন অবস্থায় কেউ দেখে ফেলবার লজ্জা। কিন্তু এ-ব্যাপারে অস্বস্তি বোধ করাটা কি আসলেই স্বাভাবিক? কোনো কিছু যদি স্বাভাবিকই হয় তাহলে তো তা সবার জন্যেই একই হওয়ার কথা। পৃথিবীর অনেক জায়গাতেই, নগ্ন থাকাটা একেবারে স্বাভাবিক একটা ব্যাপার। তার মানে, নিশ্চয়ই সমাজ-ই ঠিক করে আমরা কী করতে পারি আর পারি না। দাদির যখন তরুণ বয়স তখন নিশ্চয়ই লোকে টপলেস হয়ে সানবাথ করতে পারতো না। কিন্তু এখন বেশির ভাগ লোকই এটাকে 'স্বাভাবিক' বলেই মনে করে, যদিও অনেক দেশেই কাজটা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। সোফি ভাবল, এটা কি দর্শন?

পরের বাক্যটা হলো 'যে জানে যে সে কিছুই জানে না সে-ই সবচেয়ে জ্ঞানী।'

কার চেয়ে বেশি জ্ঞানী? দার্শনিক যদি এ-কথা বুঝিয়ে থাকেন যে, যে-মানুষটি উপলব্ধি করে যে সে জগতের সবকিছু জানে না সে অন্য একজন যে সামান্য কিছু জানার পরেও অনেক কিছু জানে বলে মনে করে তারচেয়ে বেশি জ্ঞানী তাহলে সে-কথার সঙ্গে একমত হওয়া এমন কোনো কঠিন বিষয় নয়। ব্যাপারটা সোফি আগে ভেবে দেখেনি কখনো। কিন্তু এখন যতই ভাবল ততই পরিষ্কারভাবে সে উপলব্ধি করল যে কেউ যদি জানে সে কী জানে না তাহলে সেটিও এক ধরনের জ্ঞানই হলো। ওর জ্ঞানামতে সবচেয়ে নির্বোধের মতো কাজ হলো কোনো ব্যাপারে কোনো কিছুই না জেনে সে-ব্যাপারেই জানার ভান করা।

পরের বাক্যটা ভেতর থেকে প্রকৃত অন্তর্দৃষ্টি আসার বিষয়ে। কিন্তু লোকের মাথায় জ্ঞান তো আসে বাইরে থেকেই, তাই না? অন্য দিকে আবার সোফির এমন সব ঘটনার কথা মনে পড়ল যখন তার মা বা স্কুলে তার শিক্ষকরা তাকে এমন কিছু শেখাতে চেয়েছেন যা শেখার মতো উৎসাহ ছিল না তার। সত্যিই যখন কোনো কিছু সে শিখেছে সেটি হয়েছে এইজন্য যে তখন কোনো না কোনোভাবে সে নিজে তাতে অংশ নিয়েছে। তারপরেও, মাঝে মধ্যেই, হঠাৎ করে সে এমন কিছু বুঝে ফেলে যে-ব্যাপারে আগে

একবারেই অন্ধকারে ছিল সে। সম্ভবত 'অন্তর্দৃষ্টি' বলতে লোকে এটাকেই বুঝিয়ে থাকে।

এ-পর্যন্ত ভালোই এগিয়েছে সে। সোফির মনে হলো প্রথম তিনটে প্রশ্ন সে মোটামুটি ভালোভাবে সামাল দিয়েছে। কিন্তু এর পরের বক্তব্যটা এতোই অদ্ভুত যে না হেসে পারল না সে 'যে জানে কোন কাজটি সঠিক সে ঠিক কাজটিই করবে।'

এর মানে কি এই যে একজন ব্যাংক ডাকাত অন্য কোনো ভালো কাজের কথা না জানার কারণেই ব্যাংক ডাকাতি করে? সোফির তা মনে হয় না।

বরং তার মনে হলো যে, বাচ্চা এবং বড়রা খারাপ কাজ করার পর যে অনুশোচনা করে তার কারণ ঠিক এই যে তারা তাদের শ্রেয়তর বিবেচনার বিরুদ্ধে গিয়েই কাজগুলো করেছিল।

সে যখন এসব ভাবছে বসে বসে, তার কানে এলো বনের একেবারে ধারের বেড়ার ওপাশে শুকনো ঝোপঝাড়ের ভেতর খসখস একটা আওয়াজ হচ্ছে। সেই বার্তাবাহক নাকি? হৃদস্পন্দন বেড়ে গেল সোফির। শব্দটা শুনে মনে হচ্ছে কোনো জন্তু আসছে বুঝি হাঁপাতে হাঁপাতে।

আর ঠিক সেই মুহূর্তেই একটা ল্যাব্রাডর এসে ঢুকল গুহার ভেতর।

সেটির মুখে বড়সড় একটা বাদামি খাম, সোফির পায়ের কাছে সেটি ফেলল কুকুরটা। ব্যাপারটা এতো তাড়াতাড়ি ঘটে গেল যে কিছু করারই সুযোগ পেল না সোফি। এক সেকেন্ড পর দেখা গেল হাতে বাদামি খামটা নিয়ে বসে পড়েছে সে, ওদিকে সোনালী ল্যাব্রাডরটা এক ছুটে হারিয়ে গেছে বনের ভেতর।

সবকিছু ঘটে যাওয়ার পরেই কেবল প্রতিক্রিয়া দেখা গেল সোফির মধ্যে। কাঁদতে শুরু করল সে।

কিছুক্ষণ ওভাবেই বসে রইল সে, সময় সম্পর্কে কোনো বোধই রইল না।

তারপর হঠাৎ করে মুখ তুলে তাকাল সে।

তাহলে এই হচ্ছে সেই বিখ্যাত বার্তাবাহক! স্বস্তির একটা নিঃশ্বাস ফেলল সোফি। এ-জন্যই সাদা খামগুলোর প্রান্তের দিকটা ভেজা থাকত, ফুটো থাকত গায়ে। ব্যাপারটা তার মাথায় এলো না কেন? দার্শনিককে সে চিঠি লিখলে খামের ভেতর বিস্কিটটা বা চিনির ডেলা রাখার ব্যাপারটা বোঝা যাচ্ছে এখন।

যতটা চালাক সে হয়ে উঠতে চায় ততটা চালাক হয়ত সব সময় সে হয়ে উঠতে পারে না। কিন্তু বার্তাবাহক যে একটা ট্রেইন্ড কুকুর হবে সে-কথা কে ভেবেছিল! কম করে বললে বলতে হয়, ব্যাপারটা একটু অদ্ভুত! অ্যালবার্টো নক্সের খোঁজখবর নেয়ার জন্য বার্তাবাহককে জোর করার কথা এখন সে ভুলে যেতে পারে।

বড় খামটা খুলে পড়তে শুরু করল সোফি।

এথেন্সের দর্শন

প্রিয় সোফি, এই লেখা যখন তুমি পড়বে তার আগেই হয়ত হার্মেসের সঙ্গে পরিচয় হয়ে গিয়ে থাকবে তোমার। ঘটনাক্রমে যদি তা না হয়ে থাকে সেজন্য বলে রাখছি

হার্মেস একটা কুকুর। তবে ঘাবড়াবার কিছু নেই। ও খুব শান্তশিষ্ট, তাছাড়া, অনেক মানুষের চেয়েই বেশি বুদ্ধি রাখে। ও যতটা চালাক তার চেয়ে চালাক বলে নিজেকে জাহির করার চেষ্টা হার্মেস করে না কখনোই।

আরেকটা বিষয় হয়ত লক্ষ করে থাকবে তুমি, ওর নামটা কিন্তু সাধারণ কোনো নাম নয়।

গ্রিক পুরাণ অনুযায়ী *হার্মেস* হচ্ছেন দেবতাদের বার্তাবাহক। তিনি অবশ্যি সমুদ্রচারীদেরও দেবতা ছিলেন, কিন্তু তা নিয়ে আমাদের মাথা না ঘামালেও চলবে, অন্তত উপস্থিত সময়ের জন্য। এর থেকে ঢের গুরুত্বপূর্ণ কথাটা হলো হার্মেসের নাম থেকেই 'হার্মেটিক' (hermetic) কথাটা এসেছে, যার অর্থ গুপ্ত বা অগম্য—হার্মেস যেভাবে তোমাকে আর আমাকে পরস্পরের কাছ থেকে আড়াল করে রাখার ব্যাপারে ভূমিকা রাখছে সেদিক থেকে বিবেচনা করলে নামটা যে উপযুক্ত নয় তা বলা যাবে না।

তো, এই হলো গিয়ে বার্তাবাহকের পরিচয়। স্বভাবতই, নাম ধরে ডাকলে ও সাড়া দেয়, তাছাড়া, মোটের ওপর বেশ ভদ্র ও।

যাই হোক, দর্শন প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক। এরই মধ্যে আমরা কোর্সের প্রথম অংশটা শেষ করে ফেলেছি। মানে, প্রকৃতিবাদী দার্শনিক আর পৌরাণিক বিশ্ব থেকে তাঁদের যুগান্তকারী বিচ্ছেদের কথা বলছি। এবার আমরা তিন জন মহান ধ্রুপদী দার্শনিক সক্রেটিস, প্লেটো আর অ্যারিস্টটলের কাছে যাবো। এই তিন জনের প্রত্যেকেই যাঁর যাঁর নিজের মতো করে সমস্ত ইউরোপীয় সভ্যতাকে প্রভাবিত করেছেন।

প্রকৃতিবাদী দার্শনিকদের সক্রেটিস-পূর্ব দার্শনিকও বলা হয় তার কারণ তাঁরা সক্রেটিসের আগে জন্মেছিলেন। ডেমোক্রিটাস যদিও সক্রেটিসের মৃত্যুর কয়েক বছর পরে মারা যান কিন্তু তাঁর সমস্ত ধারণাই সক্রেটিস-পূর্ব দার্শনিকদের প্রকৃতিবাদী দর্শনের অন্তর্ভুক্ত। সক্রেটিস একটি নতুন যুগের প্রতিনিধি, ভৌগোলিকভাবে যেমন, কালগতভাবেও তাই। এথেন্সের মহান দার্শনিকদের মধ্যে তিনিই প্রথম জন্মেছিলেন সেখানে। তিনি এবং তাঁর দুই উত্তরসূরি এই এথেন্সেই জন্মগ্রহণ করেন, এথেন্সেই অতিবাহিত করেন তাঁদের কর্মজীবন। তোমার মনে পড়তে পারে, অ্যানাক্সাগোরাস কিছুদিন এথেন্সে কাটিয়েছিলেন, কিন্তু সূর্যকে একটা লোহিত-তপ্ত পাথর বলে অভিহিত করায় তাঁকে সেখান থেকে তাড়িয়ে দেয়া হয়। (সক্রেটিসের বরাতেও এরচেয়ে ভালো কিছু জোটেনি!)

সক্রেটিসের সময় থেকেই এথেন্স গ্রিক সংস্কৃতির কেন্দ্রস্থল। তাছাড়া খোদ দর্শনগত প্রকল্পের চরিত্র বদলের দিকেও আমাদের নজর রাখা জরুরি যে তা প্রকৃতিবাদী দর্শন থেকে সক্রেটিসের দিকে এগোচ্ছে। তবে সক্রেটিসের সঙ্গে সাক্ষাতের আগে চলো তথাকথিত সোফিস্টদের কথা শোনা যাক একটু। সক্রেটিসের সময় ওঁরাই নিয়ন্ত্রণ করতেন এথেনীয় দৃশ্যপট।

যবনিকা উঠছে সোফি! ধারণার ইতিহাস বহু অঙ্কে বিভক্ত একটি নাটকের মতো।

কেন্দ্রস্থিত মানুষ

মোটামুটি খ্রিস্টপূর্ব ৪৫০ অব্দের পর এথেন্সই ছিল গ্রিক বিশ্বের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র। এই সময় থেকেই এক নতুন দিকে মোড় নেয় দর্শন।

প্রকৃতিনির্ভর দার্শনিকেরা মূলত প্রাকৃতিক জগতের স্বরূপ খোঁজায় ব্যস্ত ছিলেন। তার ফলে বিজ্ঞানের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করেন তাঁরা। তো, এথেন্সে এবার মনোযোগটা পড়ল ব্যক্তি মানুষের ওপর, সমাজে ব্যক্তিমানুষের অবস্থানের ওপর। ধীরে ধীরে উদ্ভব হলো গণতন্ত্রের, সঙ্গে এলো গণ-পরিষদ আর আইন আদালত।

গণতন্ত্র যাতে কার্যকর হতে পারে সেজন্য আসলে জনগণকে যথেষ্ট শিক্ষিত হতে হয়, যাতে করে তারা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে পারে। আমরা আমাদের সময়ে দেখেছি কীভাবে একটি অপরিণত গণতন্ত্রের গণজাগরণের দরকার হয়। এথেনীয়দের জন্য সর্বপ্রথমেই দরকার হয়েছিল বাগ্মিতাবিদ্যা অর্থাৎ বক্তব্যকে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার বিদ্যা শেখার।

গ্রিসের উপনিবেশ থেকে ভ্রাম্যমাণ একদল শিক্ষক এবং দার্শনিক এথেন্সে চলে এসেছিলেন। নিজেদেরকে তাঁরা *সোফিস্ট* (Sophist) বলতেন। 'সোফিস্ট' শব্দটার মানে হচ্ছে জ্ঞানী এবং ওয়াকিবহাল মানুষ। এথেন্সে এই সোফিস্টরা নাগরিকদেরকে অর্থের বিনিময়ে শিক্ষা দিয়ে জীবিকা নির্বাহ করতেন।

প্রকৃতিবাদী দার্শনিকদের সঙ্গে একটি জায়গায় চরিত্রগত মিল ছিল সোফিস্টদের তাঁরাও ছিলেন সনাতন পুরাণের সমালোচক। তবে সেই সঙ্গে তাঁরা দর্শনগত চিন্তা-ভাবনাকে অসার বলে বাতিলও করে দিতেন। তাঁরা বলতেন দর্শনগত প্রশ্নের উত্তর হয়ত খুঁজলে পাওয়া সম্ভব, কিন্তু মানুষ প্রকৃতি এবং মহাবিশ্ব সংক্রান্ত ধাঁধাগুলোর জবাব কোনোদিন জানতে পারবে না। দর্শনের পরিভাষায় এ-ধরনের দৃষ্টিভঙ্গির নাম *সংশয়বাদ* (skepticism)।

প্রকৃতির সব হেঁয়ালির জবাব না হয় না-ই দেয়া গেল, কিন্তু একটা কথা আমরা জানি যে কী করে সবার সঙ্গে বাস করতে হয় সেটি মানুষকে শিখতে হয়। তো, মানুষ এবং সমাজে মানুষের অবস্থানকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হলো সোফিস্টদের চিন্তা-ভাবনা।

প্রোটাগোরাস (Protagoras, ৪৮৫-৪১০ খ্রি.পূ.) নামের এক *সোফিস্ট* বলেছিলেন, 'মানুষই সব কিছু বিচারের মাপকাঠি।' তিনি আসলে বলতে চেয়েছিলেন যে একটি জিনিস ন্যায় না অন্যায়, ভালো না মন্দ তা সব সময়ই মানুষের প্রয়োজনের নিরিখে বিচার করতে হবে। গ্রিসের দেবতাদের অস্তিত্বে তিনি বিশ্বাসী কিনা এই প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেছিলেন, 'প্রশ্নটা জটিল, কিন্তু জীবনটা ছোট।' যিনি স্পষ্টভাবে বলতে পারেন না ঈশ্বর বা দেবতার অস্তিত্ব আছে কি নেই তাঁকে বলা হয় *অজ্ঞাবাদী* (agnostic)।

সাধারণত নানান জায়গায় ঘুরে বেড়াতেন সোফিস্টরা, ফলে বিভিন্ন ধরনের সরকার নজরে পড়েছিল তাঁদের। নগর-রাষ্ট্রগুলোতে চিরাচরিত রীতিনীতি আর স্থানীয় আইন-কানুনের নানান রকমফের প্রচলিত ছিল। তাতে করে, এ-সবের কোনগুলো

স্বাভাবিক আর কোনগুলো *সামাজিকভাবে আরোপিত* এই নিয়ে প্রশ্ন তোলেন সোফিস্টরা। এবং তার ফলে তাঁরা এথেন্স নগর-রাষ্ট্রে সামাজিক সমালোচনা (social criticism)-র পথ সুগম করেন।

এই যেমন তাঁরা এ-কথা বলতে পারতেন যে স্বাভাবিক শালীনতা সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। কারণ 'শালীন' হওয়া যদি স্বাভাবিক হয়ে থাকে তাহলে নিশ্চয়ই এই গুণটি নিয়েই আমাদের জন্ম হয়েছে। অর্থাৎ এটা আমাদের সহজাত। কিন্তু সোফি, সত্যি কি এটা সহজাত না সামাজিকভাবে আরোপিত? যিনি সারা পৃথিবী ভ্রমণ করেছেন তাঁর কাছে উত্তরটা খুব সহজ। নিজেকে নগ্নভাবে মানুষের সামনে হাজির করাটা স্বাভাবিক-ও নয়, সহজাত-ও নয়। লাজুক হওয়া বা না হওয়া পুরোটাই মুখ্যত এবং প্রধানত একটা সামাজিক প্রথা।

বুঝতেই পারছো যে ভ্রাম্যমাণ সোফিস্টরা এই কথা বলে এথেন্সে একেবারে তুলকালাম কাণ্ড বাধিয়ে দিয়েছিলেন যে কোনটি ন্যায় আর কোনটি অন্যায় এ-ব্যাপারে কোনো পরম মানদণ্ড নেই।

অন্যদিকে সক্রেটিস দেখাতে চেয়েছিলেন যে কিছু কিছু রীতিনীতি আছে যেগুলো পরম এবং বিশ্বজনীনভাবে প্রযোজ্য।

সক্রেটিস কে ছিলেন?

সমস্ত দর্শনের ইতিহাসে সক্রেটিস-ই (Socrates, ৪৭০-৩৯৯ খ্রি. পূ.) সম্ভবত সবচেয়ে রহস্যময় ব্যক্তি। একটি বাক্য-ও লেখেননি তিনি। তারপরেও, ইউরোপীয় চিন্তা-ভাবনার ক্ষেত্রে তাঁর চেয়ে বড় প্রভাব আর কেউ ফেলতে পারেননি। তাঁর মৃত্যুর ঘটনাও এর জন্য কম দায়ী নয়।

আমরা জানি, তাঁর জন্ম এথেন্সে এবং তিনি তাঁর জীবনের বেশিরভাগ সময়ই শহরের নানান চত্বরে চত্বরে আর বাজারে বাজারে ঘুরে বেড়িয়েছেন সেখানকার লোকজনের সঙ্গে কথা বলে বলে। তিনি বলতেন, 'গ্রামের গাছগুলো আমাকে কিছুই শেখাতে পারবে না।' মাঝে মাঝে তিনি চিন্তায় বিভোর হয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা একঠায় দাঁড়িয়ে থাকতেন।

তাঁর জীবদ্দশাতেও লোকজন তাঁকে একটু রহস্যময়, একটু ক্ষ্যাপাটে বলেই জানতো আর তাঁর মৃত্যুর পরপরই বিভিন্ন মত ও পথের দার্শনিকেরা তাঁকে তাঁরা যে যে দার্শনিক মতবাদে বিশ্বাসী সেই মতবাদের জনক বলে ঘোষণা করলেন। সক্রেটিস যেহেতু খুবই রহস্যময় এবং দ্ব্যর্থবোধক চরিত্রের অধিকারী ছিলেন, সেজন্যই এতো বিভিন্ন মত ও পথের অনুসারীরা তাঁকে তাঁদের লোক বলে দাবি করেছিলেন।

একটা কথা আমরা খুব ভালো করে জানি যে দেখতে তিনি মোটেই সুদর্শন ছিলেন না। তাঁর পেটটা ছিল ঘটির মতো, চোখ দুটো যেন বেরিয়ে আসতে চাইতো কোটর ছেড়ে, নাকটা ছিল চ্যাপ্টা, কিন্তু তাঁর ভেতরটা, অর্থাৎ মনটা ছিল নিতান্তই নির্মল। তাঁর সম্পর্কে আরও বলা হয় যে, অতীত বর্তমান কোনো কালেই তাঁর মতো কাউকে খুঁজে

পাওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু তারপরেও তাঁর দর্শনসংক্রান্ত ক্রিয়াকর্মের জন্য তাঁকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছিল।

সক্রেটিসের জীবন সম্পর্কে যা কিছু জানা যায় তা মূলত তাঁর অন্যতম শিষ্য প্লেটোর রচনা থেকে, সেই শিষ্য যিনি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিকদের অন্যতম বলে বিবেচিত। প্লেটো বেশ কিছু *ডায়ালগ*, বা দর্শনসংক্রান্ত আলাপ আলোচনা নাটকের সংলাপের মতো করে লিখে রেখে গেছেন। সেখানে সক্রেটিসকে তিনি তাঁর প্রধান চরিত্র এবং মুখপাত্র হিসেবে ব্যবহার করেছেন।

প্লেটো যেহেতু তাঁর নিজের দর্শন সক্রেটিসের মুখে বসাচ্ছেন তাই আমরা ঠিক নিশ্চিত হতে পারি না সক্রেটিস যে-সব কথা আওড়াচ্ছেন সে-সব কথা তিনি আদৌ বলেছিলেন কিনা। কাজেই সক্রেটিসের শিক্ষা আর প্লেটোর দর্শনের মধ্যে ফারাক বের করা খুব মুশকিল। যে-সব ঐতিহাসিক ব্যক্তি লিখিত কিছু রেখে যাননি তাঁদের বেলাতেও ঠিক এই সমস্যা দেখা দেয়। এর সবচেয়ে বড় উদাহরণ অবশ্যই যিশু। ম্যাথু এবং লুক যে-সব কথা তাঁর বলে প্রচার করেছেন 'ইতিহাসের' যিশু সে-সব সত্যিই বলেছিলেন কিনা সে-ব্যাপারে আমাদের নিশ্চিত হওয়ার জো নেই। ঠিক একইভাবে, ইতিহাসের সক্রেটিস ঠিক কী কী বলেছিলেন সেটি চিরকাল রহস্যের চাদরেই মোড়া থাকবে।

তবে সক্রেটিস 'আসলেই' কে ছিলেন সে-কথাটা কিন্তু তত গুরুত্বপূর্ণ নয়। প্লেটোর আঁকা সক্রেটিসের ছবি-ই গত প্রায় ২,৫০০ বছর ধরে পশ্চিমা জগতে চিন্তাবিদদের প্রেরণা যুগিয়েছে, উৎসাহ দিয়েছে।

কথোপকথনের কলাকৌশল

সক্রেটিসের কৌশলের মূল ব্যাপারটা ছিল এই যে তিনি যে লোকজনকে কিছু শেখাতে চাইছেন সেটি তাদের বুঝতে দিতেন না। উল্টো, যাদের সঙ্গে তিনি কথা বলতেন তাদের তিনি এমন একটা ধারণা দিতেন যে আসলে তিনি তাদের কাছ থেকে শিখতে চাইছেন। কাজেই, চিরাচরিত এক স্কুল শিক্ষকের মতো লেকচার দেয়ার বদলে তিনি তাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় মত্ত হতেন।

স্পষ্টতই, তিনি যদি কেবল অন্যের কথা শুনেই যেতেন তাহলে আর বিখ্যাত দার্শনিক হতে পারতেন না এবং মৃত্যুদণ্ডেও দণ্ডিত হতেন না। বরং তিনি শুধু প্রশ্ন করে যেতেন, বিশেষ কোনো একটা আলোচনার সূত্রপাত ঘটাতে, যেন তিনি বিষয়টা সম্পর্কে কিছুই জানেন না। আলোচনার এক পর্যায়ে তিনি তাঁর প্রতিপক্ষকে তার যুক্তির দুর্বলতা বা অসারতা বুঝিয়ে দিতেন আর তখন কোণঠাসা হয়ে পড়ে তারা উপলব্ধি করতে সক্ষম হতো কোনটি ন্যায় আর কোনটি অন্যায়।

সক্রেটিসের মা ছিলেন ধাত্রী এবং সক্রেটিস প্রায়ই বলতেন যে তাঁর কৌশলটা হলো একজন ধাত্রীর কৌশল। ধাত্রী নিজে বাচ্চার জন্ম দেন না, জন্মের সময় তিনি থাকেন প্রসবে সাহায্য করার জন্যে। ঠিক একইভাবে, সক্রেটিস নিজের কাজটাকে

দেখতেন সঠিক অন্তর্দৃষ্টি 'প্রসব' করানোর ব্যাপারে লোকজনকে সাহায্য করার কাজ হিসেবে। কারণ, সত্যিকারের উপলব্ধি নিশ্চয়ই ভেতর থেকেই আসবে। এটা অন্য কেউ দিতে পারবে না। আর যে-উপলব্ধি ভেতর থেকে আসে কেবল সেটিই আমাদেরকে সত্যিকারের অন্তর্দৃষ্টির কাছে নিয়ে যেতে পারে।

আরও স্পষ্টভাবে বলছি : জন্ম দিতে পারা বা প্রসব করতে পারা একটা প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য। ঠিক একইভাবে, দর্শনগত সত্যগুলো প্রত্যেকেই বুঝতে পারে স্রেফ যদি তারা তাদের সহজাত যুক্তি ব্যবহার করে। সহজাত যুক্তি ব্যবহার করার অর্থ হচ্ছে নিজের মনের গভীরে পৌঁছে সেখানে যা আছে তা ব্যবহার করা।

নিজে অজ্ঞ সেজে সক্রেটিস লোকজনকে তাদের কাণ্ডজ্ঞান ব্যবহার করতে বাধ্য করতেন। সক্রেটিস অজ্ঞতার ভান করতেন বা তিনি প্রকৃতপক্ষে যতটা অজ্ঞ তারচেয়ে বেশি অজ্ঞ বলে নিজেকে উপস্থাপন করতেন। এটাকেই আমরা বলি সক্রেটিক আয়রনি। এটাই তাঁকে অনবরত লোকজনের চিন্তা-ভাবনার দুর্বলতা দেখিয়ে দিতে সাহায্য করতো। কাজটা তিনি এমনকি নগর-চত্বরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে করতেও ইতস্তত করতেন না। কাজেই সক্রেটিসের মুখোমুখি হওয়ার মানে মাঝে মাঝে হয়ে দাঁড়াত জনসমক্ষে নির্বোধ প্রতিপন্ন হওয়া।

কাজেই, এটাই খুব স্বাভাবিক যে যতই দিন যেতে লাগল ততই আরও বেশি লোক ক্ষেপে যেতে থাকল তাঁর ওপর, বিশেষ করে সেই সব লোক সমাজে যাদের একটা সম্মানজনক অবস্থান ছিল। একটা কথা তিনি প্রায়ই বলতেন বলে প্রচলিত আছে আর তা হলো, 'এথেন্স একটা আলসে ঘোড়া আর আমি হলাম গিয়ে সেই মাছি যে ওটাকে স্বাভাবিক জীবনে নিয়ে আসার চেষ্টা করছে।'

(এ-ধরনের মাছির সঙ্গে আমরা কেমন ব্যবহার করি, সোফি?)

একটি স্বর্গীয় কণ্ঠ

সক্রেটিস তাঁর আশপাশের মানুষকে যন্ত্রণা দেবার জন্য খোঁচাতেন না। তাঁর ভেতরের কিছু একটা তাঁকে এ-কাজে বাধ্য করতো। তিনি প্রায়ই বলতেন তাঁর ভেতর একটা 'স্বর্গীয় কণ্ঠ' রয়েছে। এই যেমন ধরো, মানুষকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করার মতো কোনো কাজে কোনোরকম ভূমিকা রাখার বিরোধী ছিলেন তিনি। নিজের রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে চাইতেন না তিনি। শেষ পর্যন্ত এজন্যই তাঁকে জীবন দিতে হয়েছিল।

'নতুন দেবদেবীর প্রচলন এবং যুব সমাজকে বিপথগামী করার' অভিযোগ আনা হয় তাঁর বিরুদ্ধে ৩৯৯ খ্রিস্ট পূর্বাব্দে, সেই সঙ্গে এই অভিযোগও আনা হয় যে প্রচলিত দেবতাদের প্রতি তাঁর আস্থা নেই। পাঁচশ ব্যক্তির একটি জুরি খুবই সামান্য সংখ্যাধিক্যের জোরে তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করে।

এটা ধরে নেয়ার যথেষ্ট কারণ রয়েছে যে তিনি ক্ষমাপ্রার্থনা করতে পারতেন। অন্তত এথেন্স ত্যাগ করে চলে যাওয়ার অঙ্গীকার করে তিনি নিজের জীবন বাঁচাতে

পারতেন। কিন্তু তা করলে তিনি আর সক্রেটিস হতেন না। জীবনের চেয়ে তিনি তাঁর বিবেক এবং সত্যকে বেশি মূল্য দিয়েছেন। জুরিকে তিনি এ-কথা দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন যে রাষ্ট্রের সর্বোত্তম মঙ্গলের জন্যেই কেবল কাজ করেছেন তিনি। তারপরেও তাঁকে হেমলক পানের শাস্তি দেয়া হলো। এর কিছু সময় পরেই তিনি তাঁর প্রিয়জনদের সামনে বিষ পান করে মারা গেলেন।

কেন সোফি? কেন মরতে হয়েছিল সক্রেটিসকে? ২,৪০০ বছর ধরে এই প্রশ্ন করে যাচ্ছে মানুষ। অবশ্য ইতিহাসে তিনিই একমাত্র মানুষ নন যিনি নানান তিক্ত অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে গিয়ে শেষ পর্যন্ত নিজের বিশ্বাসের কারণে মৃত্যুবরণ করেছেন।

ইতোমধ্যেই আমি যিশুর কথা বলেছি তোমাকে। আর সত্যি বলতে কী, যিশু এবং সক্রেটিসের জীবনে আশ্চর্য রকমের মিল দেখতে পাওয়া যায়।

যিশু এবং সক্রেটিস দু'জনেই ছিলেন রহস্যময় চরিত্রের অধিকারী, এমনকি তাঁদের সমসাময়িক লোকজনের কাছেও রহস্যময় ছিলেন তাঁরা। এঁদের কেউই তাঁদের মতবাদ বা উপদেশ লিখে রেখে যাননি। কাজেই শিষ্যরা তাঁদের সম্পর্কে যে-চিত্র তুলে ধরেছেন তার ওপরই নির্ভর করতে বাধ্য হয়েছি আমরা। তবে আমরা একটা কথা জানি যে এঁরা দু'জনেই ছিলেন কথোপকথনের কৌশলে সিদ্ধহস্ত। তাঁরা দু'জনেই এমন বিশেষ এক আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে কথা বলতেন যে শ্রোতাদেরকে তা একই সঙ্গে মুগ্ধ এবং বিরক্ত করতো। আর সবচেয়ে যেটা গুরুত্বপূর্ণ, তাঁরা দু'জনেই বিশ্বাস করতেন যে তাঁরা তাদের চেয়ে বৃহত্তর কোনো কিছুর হয়ে কথা বলছেন। সমাজের শক্তিকে তাঁরা চ্যালেঞ্জ করতেন সব ধরনের অন্যায়-অবিচার আর দুর্নীতির সমালোচনা করার মধ্য দিয়ে। শেষ পর্যন্ত, কৃতকর্মের জন্য তাঁদেরকে জীবন দিতে হয়েছিল।

যিশু এবং সক্রেটিসের বিচারের মধ্যেও প্রচুর মিল রয়েছে। তাঁরা দু'জনেই যে ক্ষমা ভিক্ষা করে প্রাণে বেঁচে যেতে পারতেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু তাঁরা দু'জনেই এ-কথা উপলব্ধি করেছিলেন যে তাঁদের একটি ব্রত আছে এবং সেই ব্রত ব্যর্থ হয়ে যাবে যদি তাঁরা কষ্টকর শেষ মুহূর্তটিতে তাঁদের বিশ্বাসে স্থির থাকতে না পারেন। এবং এ-রকম সাহসিকতার সঙ্গে মৃত্যুর মুখোমুখি হওয়ার ফলে বিরাট একটি অনুগত গোষ্ঠীর সৃষ্টি হয় তাঁদের, এমনকি তাঁদের মৃত্যুর পরেও।

এ-কথা আমি বলতে চাই না যে যিশু এবং সক্রেটিস ঠিক একই রকম ছিলেন। আমি কেবল এই বিষয়টির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছি যে তাঁদের দু'জনেরই একটি বক্তব্য ছিল যে-বক্তব্য তাঁদের ব্যক্তিগত সাহসের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে ছিল।

এথেন্সের এক জোকার

সোফি, সক্রেটিস সম্পর্কে আলোচনা কিন্তু এখনো শেষ হয়নি আমাদের। আমরা তাঁর কাজের পদ্ধতি নিয়ে আলাপ করেছি। কিন্তু তাঁর দর্শনগত প্রকল্প কী ছিল?

সোফিস্টদের সমসাময়িক ছিলেন সক্রেটিস। তাঁদের মতো তিনিও প্রাকৃতিক

শক্তিগুলোর চেয়ে মানুষ এবং সমাজে মানুষের অবস্থান নিয়েই বেশি চিন্তা-ভাবনা করেছেন। ঠিক যেমন এক রোমান দার্শনিক সিসেরো কয়েকশত বছর পরে তাঁর সম্পর্কে এই মন্তব্য করেছিলেন যে, সক্রেটিস 'দর্শনকে আকাশ থেকে মাটিতে টেনে নামিয়ে শহরে শহরে প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছিলেন, পরিচিত করিয়ে দিয়েছিলেন বাড়ি বাড়ি এবং দর্শনকে বাধ্য করেছিলেন জীবন, নীতি, ভালো এবং মন্দ নিয়ে সুলুক-সন্ধান করতে।'

তবে একটা বিশেষ দিক দিয়ে সোফিস্টদের সঙ্গে একটা পার্থক্য ছিল সক্রেটিসের। নিজেকে তিনি একজন 'সোফিস্ট' অর্থাৎ শিক্ষিত বা জ্ঞানী ব্যক্তি বলে ভাবতেন না, সোফিস্টদের মতো তিনি পয়সার বিনিময়ে শিক্ষা দিতেন না। না, সক্রেটিস নিজেকে দার্শনিক বলতেন এবং বলতেন শব্দটির সত্যিকার অর্থে। 'দার্শনিক' শব্দের অর্থ 'এমন একজন ব্যক্তি যিনি বিজ্ঞতাকে ভালোবাসেন।'

তোমার কোনো অসুবিধে হচ্ছে না তো, সোফি? তার কারণ একজন সোফিস্ট এবং একজন দার্শনিকের মধ্যকার তফাৎটা ভাল করে বুঝতে পারাটা আমাদের কোর্সের বাকি অংশের জন্য খুব জরুরি। সোফিস্টরা তাঁদের কমবেশি চুলচেরা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের বিনিময়ে অর্থগ্রহণ করতেন আর এ-ধরনের সোফিস্টরা স্মরণাতীতকাল থেকেই এসেছেন আবার চলেও গেছেন। আমি সেই সব স্কুল শিক্ষক এবং নিজের মতে অটল সবজান্তার কথা বলছি যারা তাদের স্বল্প জ্ঞান নিয়েই সন্তুষ্ট বা যারা কোনো একটা বিষয় সম্পর্কে বিন্দুমাত্র না জেনেই সে-সম্পর্কে সব জানে বলে বড়াই করে বেড়ায়। সম্ভবত তুমি তোমার এই অল্প বয়সেই এরকম কিছু সোফিস্টের দেখা পেয়েছ। একজন খাঁটি দার্শনিক, বুঝলে সোফি, একেবারে ভিন্ন প্রজাতির মাছ, সত্যি বলতে কী, একেবারে বিপরীত। একজন দার্শনিক জানেন যে আসলে তিনি খুব অল্পই জানেন। সেজন্যেই তিনি অনবরত চেষ্টা করে যান সত্যিকারের অন্তর্দৃষ্টি লাভ করার জন্য। সক্রেটিস ছিলেন এ-ধরনের বিরল লোকদের একজন। তিনি জানতেন যে জীবন এবং জগৎ সম্পর্কে তিনি কিছুই জানেন না। আর এর পরেই আসছে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারটি; তিনি যে এতো অল্প জানতেন এই ব্যাপারটি তাঁকে কষ্ট দিত।

কাজেই একজন দার্শনিক হলেন সেই ব্যক্তি যিনি জানেন যে এমন অনেক কিছু আছে যা তিনি বোঝেন না এবং এই না বোঝার কারণে কষ্ট পান। এদিক দিয়ে দেখতে গেলে তিনি তাদের চেয়ে ঢের জ্ঞানী যারা কোনো একটা কিছু সম্পর্কে কিছু না জেনেই তা জানে বলে বড়াই করে বেড়ায়। আগেই বলেছি, 'যে জানে যে সে কিছুই জানে না সে-ই সবচেয়ে জ্ঞানী।' আর সক্রেটিস নিজে বলতেন, 'আমি কেবল একটা কথাই জানি আর সেটি হলো আমি কিছুই জানি না।'

এই কথাটি মনে রেখো, তার কারণ এমন একটি স্বীকারোক্তি এমনকি দার্শনিকদের মধ্যেও বিরল। তাছাড়া, এ-কথাটা জনসমক্ষে বলা এতোই বিপজ্জনক যে এর জন্য তোমার প্রাণ চলে যেতে পারে। সবচেয়ে বিধ্বংসী বা ক্ষতিকারক লোকজন তারাই যারা প্রশ্ন করে; উত্তর দেয়াটা ঠিক ততটা বিপজ্জনক নয়। হাজারটা উত্তরের চেয়েও একটা প্রশ্ন অনেক বেশি বিস্ফোরক হতে পারে।

রাজার নতুন জামার গল্পটা মনে আছে নিশ্চয়ই? রাজার গায়ে সুতোটি পর্যন্ত না থাকার পরেও কেউ-ই সে-কথা বলতে সাহস পায়নি। হঠাৎ একটি শিশু বলে উঠল,

'রাজার গায়ে তো দেখছি কোনো কাপড়ই নেই!' সেই শিশুটি কিন্তু খুব সাহসী, সোফি। ঠিক সক্রেটিসের মতো, যিনি লোকজনকে এ-কথা বলার সাহস করতেন যে মানুষের জানার পরিধি কতই না ছোট। শিশু আর দার্শনিকের মধ্যে মিলের ব্যাপারে আমরা এরই মধ্যে আলোকপাত করেছি।

মোদ্দা কথা মানবজাতির সামনে এমন কিছু কঠিন প্রশ্ন রয়েছে যার কোনো সন্তোষজনক উত্তর আমাদের জানা নেই। কাজেই দুটো সম্ভাবনা তখন সামনে এসে দাঁড়ায় : হয় আমরা যা জানার তা জানি বলে ভান করে নিজেদের এবং বাকি পৃথিবীকে বোকা বানাতে পারি আর নয়ত মূল বিষয়গুলো সম্পর্কে একেবারে চোখ বুঁজে থেকে সামনে এগোনোর কথা ভুলে যেতে পারি। এ-ব্যাপারে মানবজাতি দু'ভাগে বিভক্ত। সাধারণভাবে বললে মানুষ হয় একেবারে নিশ্চিত আর নয় পুরোপুরি উদাসীন। (এই দুই প্রজাতিই খরগোশের রোমের গহীন ভেতরে হামাগুড়ি দিয়ে বেড়াচ্ছে।)

ব্যাপারটা অনেকটা এক তাড়া তাসকে দু'ভাগে ভাগ করার মতো, সোফি। একদিকে তুমি কালো তাসগুলোকে রাখছো, অন্যদিকে রাখছো লাল তাসগুলো। কিন্তু মাঝে মধ্যেই মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে একটা জোকার বা ভাঁড়, যে কিনা হরতনও নয় চিড়িতনও নয়, রুহিতনও নয় ইশ্‌কাবনও নয়। সক্রেটিস ছিলেন এথেন্সের জোকার। তিনি নিশ্চিতও ছিলেন না, উদাসীনও ছিলেন না। তিনি কেবল এই জিনিসটিই জানতেন যে তিনি কিছুই জানতেন না—আর এই ব্যাপারটি তাঁকে কষ্ট দিত। কাজেই তিনি হয়ে উঠলেন একজন দার্শনিক—এমন একজন মানুষ যিনি হাল ছাড়েন না, বরং ক্লান্তিহীনভাবে তাঁর সত্যানুসন্ধান চালিয়ে যান।

দেলফি-র ওরাকলকে এক এথেন্সবাসী নাকি জিজ্ঞেস করেছিল এথেন্সের সবচেয়ে জ্ঞানী ব্যক্তি কে। ওরাকল জবাব দিয়েছিল যে, মানুষের মধ্যে সক্রেটিসই সবচেয়ে জ্ঞানী। কথাটা সক্রেটিসের কানে যাওয়ার পর তিনি হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছিলেন বললেও কম বলা হয়। (সোফি, তিনি নিশ্চয়ই খুব একচোট হেসেছিলেন!) যাই হোক, এরপর তিনি সোজা সেই লোকটির কাছে গেলেন যাঁকে তিনি এবং অন্য অনেকেও খুব জ্ঞানী বলে জানত। কিন্তু যখন দেখা গেল লোকটি সক্রেটিসকে তাঁর প্রশ্নের সন্তোষজনক জবাব দিতে পারছেন না তখন সক্রেটিস উপলব্ধি করলেন যে ওরাকলের কথাই সত্যি।

সক্রেটিস বুঝেছিলেন যে আমাদের জ্ঞান-গম্যির একটা মজবুত ভিত্তি তৈরি করা প্রয়োজন। তিনি বিশ্বাস করতেন এই ভিত্তি রয়েছে মানুষের বিচারশক্তির ভেতর। মানুষের বিচারশক্তির ওপর তার এই অটল আস্থার কারণে তাঁকে নিশ্চিতভাবে একজন বুদ্ধিবাদী বলা যেতে পারে।

সঠিক অন্তর্দৃষ্টি থেকে সঠিক কর্ম

আগেই বলেছি, সক্রেটিস দাবি করতেন তাঁর ভেতরের একটি স্বর্গীয় কণ্ঠস্বর তাঁকে পরিচালিত করে আর এই 'বিবেক'ই তাঁকে বলে দেয় কোনটি ঠিক, কোনটি বেঠিক। তিনি বলতেন, 'যে জানে কোনটি ভালো সে ভালো কাজটিই করবে।'

এই কথাটি দিয়ে তিনি বোঝাতে চাইতেন যে সঠিক অন্তর্দৃষ্টি মানুষকে সঠিক কাজের দিকে নিয়ে যায়। আর যিনি ঠিক কাজটি করেন কেবল তিনিই পুণ্যবান মানুষ হতে পারেন। আমরা যখন অন্যায় কাজ করি তখন সেটি এই জন্য করি যে কোনটি ন্যায় তা আমরা জানি না। সেজন্যই, অনবরত শিখে যাওয়াটা এতো জরুরি। ন্যায় এবং অন্যায়ের স্পষ্ট ও বিশ্বজনীনভাবে প্রযোজ্য সংজ্ঞা খুঁজে পেতে চেয়েছিলেন সক্রেটিস। তিনি বিশ্বাস করতেন ন্যায় এবং অন্যায়ের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করার ক্ষমতা নিহিত রয়েছে মানুষের বিচারশক্তির ভেতর, সমাজের মধ্যে নয়; সোফিস্টরা এ-কথা বিশ্বাস করতেন না।

এই শেষ অংশটা তোমার কাছে খানিকটা দুর্বোধ্য ঠেকতে পারে, সোফি। কাজেই ব্যাপারটা এভাবে বলছি আমি সক্রেটিস মনে করতেন যে নিজের শুভবুদ্ধির বিরুদ্ধে গিয়ে মানুষ সম্ভবত সুখী হতে পারবে না। আর যে জানে কীভাবে সুখী হতে হয় সে তার শুভবুদ্ধি অনুযায়ীই কাজ করবে। কাজেই যে জানে কোনটি ন্যায় বা সঠিক সে ঠিক কাজটিই করবে। কারণ, শখ করে কেন লোকে অসুখী হতে চাইবে?

তোমার কী মনে হয়, সোফি? যে-সব কাজ অন্যায় বলে তুমি মনে মনে জানো সে-সব কাজ যদি তুমি অনবরত করো তাহলে কি তুমি একটি সুখী জীবনযাপন করতে পারবে? এমন অনেক মানুষ আছে যারা মিথ্যে কথা বলে, অন্যকে ঠকায়, পরনিন্দা করে। তারা কি এ-ব্যাপারে সচেতন যে কাজগুলো ঠিক বা সঙ্গত নয়? তোমার কি মনে হয় এই লোকগুলো সুখী?

সক্রেটিস তা মনে করতেন না।

চিঠিটা পড়া শেষ হতে সোফি তাড়াতাড়ি সেটি বিস্কিটের টিনের ভেতর রেখে হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে এলো বাগানে। তার মা কেনাকাটা সেরে ফিরে আসার আগেই ঘরে ঢুকে পড়তে চাইছিল, যাতে সে এতক্ষণ কোথায় ছিল এই প্রশ্নটা এড়ানো যায়। তাছাড়া সে কথা দিয়েছিল বাসন-কোসন ধুয়ে রাখবে।

সিংকটা সে পানি দিয়ে সবে ভরিয়েছে মাত্র এই সময় দুটো ঢাউস শপিং ব্যাগ হাতে টলমল পায়ে ভেতরে ঢুকলেন তার মা। সম্ভবত সেজন্যই তিনি বলে উঠলেন, 'ইদানীং তুই বড় ব্যস্ত দেখছি, সোফি।'

সোফি ঠিক বুঝল না কেন মা কথাটা বললেন; কিন্তু উত্তরটা টুপ করে তার মুখ থেকে বেরিয়ে গেল 'সক্রেটিসও তাই ছিলেন।'

'সক্রেটিস?'

বড় বড় চোখ করে সোফির দিকে তাকালেন তার মা।

সোফি চিন্তিত স্বরে বলে চলল, 'ব্যাপারটা খুব দুঃখজনক যে সে-কারণে তাঁকে মরতে হয়েছিল।'

'মাই গুডনেস। সোফি! আমার যে কী করা উচিত কিছুই বুঝতে পারছি না!'

'সক্রেটিসও পারেননি। তিনি কেবল এই কথাটাই জানতেন যে তিনি কিছুই জানতেন না। কিন্তু তারপরেও, তিনি ছিলেন এথেন্সের সবচেয়ে বুদ্ধিমান মানুষ।'

সোফির মা'র মুখ দিয়ে কোনো কথা সরলো না।

অবশেষে তিনি বললেন, 'এ-সব কি তুই স্কুলে শিখেছিস?'

প্রবলভাবে মাথা নাড়ল সোফি।

'ওখানে আমরা কিছুই শিখি না। স্কুল-টিচার আর দার্শনিকদের মধ্যে তফাৎ হচ্ছে স্কুল-টিচাররা মনে করেন তাঁরা মেলা কিছু জানেন আর সেগুলোই তাঁরা আমাদের গলার ভেতর দিয়ে ঢুকিয়ে দিতে চেষ্টা করেন। দার্শনিকেরা তাঁদের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে সমস্যার সমাধান বের করার চেষ্টা করেন।'

'ফের সেই সাদা খরগোশের কথা! তোর সেই বয়ফ্রেন্ডটা কে, তা তোকে সত্যি করে বলতেই হবে আমাকে। নইলে আমি মনে করবো ছেলেটা একটু ক্ষ্যাপাটে।'

বাসন-কোসনগুলোর দিকে পিঠ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে সোফি বাসন মোছার কাপড়টা তাক করল মায়েক দিকে।

'সে ক্ষ্যাপাটে নয়। তবে সে অন্যদের ক্ষ্যাপাতে চায়—ক্ষেপিয়ে বের করে আনতে চায় তাদেরকে গর্ত থেকে।'

'যথেষ্ট হয়েছে! আমার মনে হচ্ছে ছেলেটার কথাবার্তা একটু খাপছাড়া ধরনের।'

'সে খাপছাড়াও নয়, আবার শান্ত-সুবোধও নয়,' সোফি জবাব দিল। 'তবে সে নিখাদ জ্ঞানের খোঁজে ব্যস্ত। একটা খাঁটি জোকার আর প্যাকেটের অন্য সব তাসের মধ্যে আসল পার্থক্য এটাই।'

'কী বললি তুই, 'জোকার'?'

ওপর নিচে মাথা ঝাঁকাল সোফি। 'তুমি কি কখনো ভেবে দেখেছো এক প্যাকেট তাসের মধ্যে মেলা হার্ট আর ডায়মন্ড আছে? আছে অনেকগুলো স্পেড আর ক্লাব। কিন্তু জোকার আছে মাত্র একটাই।'

'ঈশ্বর! কীভাবে মুখে মুখে কথা বলছিস তুই, সোফি!'

'কীভাবে তুমি আমাকে বাধ্য করছ!'

তার মা মুদির দোকান থেকে আনা জিনিসপত্র এরই মধ্যে সরিয়ে রেখেছিলেন। তিনি এবার খবরের কাগজটা নিয়ে বসার ঘরে চলে গেলেন। সোফির মনে হলো দরজাটা তিনি স্বাভাবিকের চাইতে একটু বেশি জোরেই বন্ধ করলেন।

বাসন-কোসন ধোওয়া শেষ হতে ওপরের তলায় নিজের ঘরে চলে এলো সোফি। লাল রেশমি স্কার্ফটা সে লেগো ব্লকগুলোর সঙ্গে ক্লজেটের সবচেয়ে ওপরের তাকেই রেখেছিল। ওটা নামিয়ে এনে ভালো করে পরীক্ষা করল সে।

হিল্ডা...

এ থে ন্স

৫১০২

...সেই ধ্বংসস্তূপের মধ্যে বেশ কিছু উঁচু দালানকোঠা দাঁড়িয়ে গেল...

সেদিন সন্ধ্যার পরপরই সোফির মা তার এক বন্ধুর বাসায় বেড়াতে গেলেন। তিনি বাড়ির বাইরে যেতেই সোফি বাগানে নেমে এসে তার ডেরায় গিয়ে হাজির হলো। সেখানে বিস্কিটের বড় টিনটার পাশে মোটাসোটা একটা প্যাকেট দেখতে পেল সে। মুখটা ছিঁড়ে সেটি খুলল সোফি। বের হলো একটা ভিডিও ক্যাসেট।

দৌড়ে বাড়িতে ফিরে এলো সোফি। ভিডিও টেপ! দার্শনিক ভদ্রলোক কী করে জানলেন ওদের বাসায় ভিসিআর আছে? আর ক্যাসেটটাই বা কীসের ?

রেকর্ডারে ক্যাসেটটা ঢোকাল সোফি। ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা একটা শহরের ছবি ফুটে উঠল টিভি স্ক্রিনে। অ্যাক্রোপলিসের ওপর ক্যামেরা জুম করতেই সোফি বুঝতে পারল শহরটা নিশ্চয়ই এথেন্স। এখানকার প্রাচীন ধ্বংসাবশেষের ছবি প্রায়ই চোখে পড়েছে তার।

শটটা লাইভ। গ্রীষ্মকালীন পোশাক পরা ট্যুরিস্টরা কাঁধে ক্যামেরা ঝুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে সেই ধ্বংসাবশেষের মধ্যে। এদের মধ্যে একজনকে দেখে মনে হলো সে একটা নোটিশ নিয়ে ঘুরছে। ওই তো আবার দেখা গেল নোটিশটা। 'হিল্ডা' লেখা না ওটাতে?

দু'এক মিনিট পর মধ্যবয়স্ক এক পুরুষের ক্লোজ-আপ ছবি দেখা গেল। দেখতে লোকটি ছোটখাটো, মুখে কালো, সুন্দর করে ছাঁটা দাড়ি, মাথায় একটা নীল বেরে টুপি। সরাসরি ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে তিনি বলে উঠলেন 'এথেন্সে তোমাকে স্বাগতম, সোফি। সম্ভবত তুমি অনুমান করতে পারছ, আমি অ্যালবার্টো নক্স। যদি না পেরে থাকো তাহলে আমাকে ফের বলতে হচ্ছে যে পেল্লায় খরগোশটাকে মহাবিশ্বের টপ হ্যাটের ভেতর থেকে এখনো টেনে বের করা হচ্ছে।

'আমরা দাঁড়িয়ে আছি অ্যাক্রোপলিসে। শব্দটার অর্থ 'দুর্গ', বা আরও ঠিক করে বললে, 'পাহাড়ের ওপরের শহর।' মানুষ সেই প্রস্তর যুগ থেকে বাস করে আসছে এখানে। তার কারণ অবশ্যই শহরটার অসাধারণ অবস্থান। উঁচু এই মালভূমিটিকে লুটেরাদের হাত থেকে রক্ষা করাটা সহজ ছিল। সেই সঙ্গে, অ্যাক্রোপলিস থেকে নিচে ভূমধ্যসাগরের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পোতাশ্রয়ের চমৎকার একটি দৃশ্যও দেখতে পাওয়া যেতো। মালভূমির নিচে সমভূমিতে যখন গোড়ার দিককার এথেন্সের বিস্তার হচ্ছে

অ্যাক্রোপলিস তখন একটি দুর্গ এবং পবিত্র মন্দির হিসেবে ব্যবহৃত হতো।... পঞ্চম খ্রিস্ট পূর্বাব্দে পারসিকদের সঙ্গে এক প্রবল যুদ্ধ শুরু হয় এবং ৪৮০-তে পারস্যদেশের রাজা জেরেক্সেস এথেন্সে লুটতরাজ চালিয়ে অ্যাক্রোপলিসের সমস্ত পুরনো কাঠের বাড়িঘর পুড়িয়ে দেন। এক বছর পর পারসিকরা পরাজয় স্বীকার করে নেয় আর তখন থেকেই এথেন্সের স্বর্ণযুগের শুরু। নতুন করে তৈরি করা হয় অ্যাক্রোপলিস, আগের যে-কোনো সময়ের চেয়ে গৌরবান্বিত আর জাঁকজমকপূর্ণভাবে এবং এবার পুরোপুরি একটি পবিত্র মন্দির হিসেবে।

'এই সেই সময় যখন সক্রেটিস এথেন্সবাসীদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে রাস্তা বা নগর-চত্বরের ভেতর দিয়ে হেঁটে বেড়াতেন। কাজেই অ্যাক্রোপলিসের পুনর্জন্মের দৃশ্য তিনি হয়ত দেখে থাকবেন, দেখে থাকবেন আমাদের চারপাশের এইসব গৌরবদীপ্ত দালান-কোঠা নির্মাণের দৃশ্য। আর সে কী এক নির্মাণস্থলই না ছিল জায়গাটা। আমার পেছনে তুমি দেখতে পাচ্ছো সবচেয়ে বড় মন্দির 'পার্থেনন' (Parthenon), যার অর্থ 'কুমারীর বাসভবন'। এথেন্সের অধিষ্ঠাত্রী দেবী এথেনার সম্মানে তৈরি করা হয়েছিল মন্দিরটি। মার্বেল পাথরের বিশাল কাঠামোতে একটিও সরলরেখা নেই; চারটি পাশের সব কাঠই খানিকটা বাঁকা করে তৈরি করা হয়েছে যাতে ভবনটিকে অপেক্ষাকৃত কম ভারি বলে বোধ হয়। ভবনটির আকৃতি বিশাল হলেও দেখতে সেটিকে ততটা গুরুভার মনে হয় না। অন্য কথায়, ভবনটির দিকে তাকালে দৃষ্টিবিভ্রম ঘটে। স্তম্ভগুলো ভেতরের দিকে ঝুঁকে আছে খানিকটা আর সেগুলোকে যদি ওপরের দিকে বাড়তে দেয়া হতো তাহলে সেগুলো মন্দিরের ১৫০০ মিটার উঁচুতে একটি বিন্দুতে মিলিত হয়ে একটি পিরামিড তৈরি করত। মন্দিরটিতে এথেনার একটি বারো মিটার উঁচু মূর্তি ছাড়া আর কিছুই ছিল না। সাদা মার্বেল পাথরগুলো এখানে নিয়ে আসা হয়েছিল ষোল কিলোমিটার দূরবর্তী একটি পাহাড় থেকে আর সেই পাথরগুলোকে সে-সময়ে নানান রঙে রাঙান হয়েছিল।'

সোফির বুকটা ভীষণ ধড়ফড় করছিল। সত্যিই কি সেই দার্শনিক তার সঙ্গে কথা বলছেন? অন্ধকারে কেবল তাঁর মুখের একটা পাশ দেখেছিল সে একবার। তিনিই কি সেই মানুষ যিনি এখন এথেন্সের অ্যাক্রোপলিসে দাঁড়িয়ে আছেন?

এবার তিনি মন্দিরের দৈর্ঘ্য বরাবর হাঁটতে শুরু করলেন, ক্যামেরা তাঁকে অনুসরণ করল। চত্বরের একেবারে প্রান্ত পর্যন্ত হেঁটে গেলেন তিনি, তারপর সামনের ভূ-দৃশ্যের দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন। ক্যামেরা একটি পুরনো থিয়েটারের ওপর ফোকাস করল। থিয়েটারটা অ্যাক্রোপলিস মালভূমির ঠিক নিচেই।

বেরে পরা মানুষটি বলে চললেন, 'এবার তুমি দেখতে পাচ্ছো ডায়োনিসাস থিয়েটার। এটাই সম্ভবত ইউরোপের সবচেয়ে পুরনো থিয়েটার। সক্রেটিসের সময় এখানেই ইস্কিলাস আর ইউরিপিদিসের বিখ্যাত ট্র্যাজেডিগুলো অভিনীত হতো। হতভাগ্য রাজা ঈডিপাসের কথা তোমাকে আগেই বলেছি। তাঁর জীবন নিয়ে লেখা সফোক্লিসের ট্র্যাজিডিটি এখানেই প্রথম অভিনীত হয়েছিল। অবশ্য এখানে কমেডিও অভিনীত হতো। আর কমেডির সেরা লেখক ছিলেন অ্যারিস্টোফেনিস; সক্রেটিসকে এথেন্সের ভাঁড় হিসেবে দেখিয়ে একটি আক্রোশপূর্ণ কমেডি রচনা করেছিলেন তিনি।

ঠিক পেছনেই তুমি যে পাথুরে দেয়াল দেখতে পাচ্ছো সেটিকে অভিনেতারা ব্যাকড্রপ বা পশ্চাদপট হিসেবে ব্যবহার করতেন। এটাকে বলা হতো স্কিনি (skene) আর এই শব্দটিই সীন (scene) বা 'দৃশ্য' শব্দটির উৎস। ঘটনাক্রমে 'থিয়েটার' শব্দটি এসেছে একটি প্রাচীন গ্রিক শব্দ থেকে যার অর্থ 'দেখা'। তবে আমাদেরকে দার্শনিকদের কাছে ফিরে যেতে হচ্ছে, সোফি। আমরা পার্থেননের চারপাশটা একটু ঘুরে ফিরে দেখবো, হাঁটবো গোটা প্রবেশপথটা ধরে ...

ছোট্ট মানুষটি বিশাল মন্দিরটি ঘুরেফিরে দেখতে লাগলেন, ডান দিকের কয়েকটি ছোট ছোট মন্দির পেরিয়ে এলেন। এরপর তিনি কয়েকটি উঁচু স্তম্ভের মাঝখানের একটা সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামতে লাগলেন। অ্যাক্রোপলিসের পাদদেশে নেমে এসে ছোট্ট একটা পাহাড়ের ওপর গিয়ে দাঁড়ালেন তিনি, তারপর অঙ্গুলি নির্দেশ করলেন এথেন্সের দিকে। 'যে-পাহাড়ের ওপর আমি এখন দাঁড়িয়ে আছি তার নাম অ্যারিওপেগস (Areopagos)। এখানেই এথেন্সের হাইকোর্ট হত্যা মামলার বিচার করত। বেশ কয়েকশ' বছর পর যিশু শিষ্য সেন্ট পল এখানে দাঁড়িয়ে এথেন্সবাসীদের উদ্দেশে যিশু এবং খ্রিস্টধর্ম সম্পর্কে বক্তব্য রেখেছিলেন। তিনি কী বলেছিলেন তা আমরা পরে এক সময় আলোচনা করবো। নিচেই বাম দিকে তুমি যা দেখছ তা হচ্ছে এথেন্সের পুরনো নগর-চত্বর অ্যাগোরা-র ধ্বংসাবশেষ। কামার এবং ধাতুকর্মকারদের দেবতা হেফাস্টাসের বিরাট মন্দিরটি বাদ দিলে মার্বেল পাথরের কয়েকটা বড় বড় টুকরোই কেবল সংরক্ষিত আছে এখন। এবার চলো, নিচে নামা যাক

এরপরই তাঁকে দেখা গেল প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ-এর মধ্যে। খোলা আকাশের নিচে অনেক উঁচুতে—সোফির স্ক্রিনের একেবারে ওপরে—মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে এথেনার মন্দির, অ্যাক্রোপলিসের ওপরে। তার দর্শন শিক্ষক মার্বেল পাথরের একটা বড়সড় টুকরোর ওপর বসে পড়েছেন। ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে তিনি বলে উঠলেন 'আমরা এখন বসে আছি এথেন্সের প্রাচীন অ্যাগোরা-য়। খুবই দুঃখজনক দৃশ্য, তাই না? মানে, আমি আজকের কথা বলছি। কিন্তু একদিন এখানে ছিল দুর্দান্ত সব মন্দির, আদালত, অন্যান্য সরকারি অফিস, দোকানপাট, একটি কনসার্ট হল আর এমনকি একটা শরীরচর্চা কেন্দ্র। এর সবকিছুই ছিল চত্বরটাকে ঘিরে, একটি বিশাল খোলা জায়গাকে কেন্দ্র করে...। গোটা ইউরোপীয় সভ্যতার ভিত্তি রচিত হয়েছিল এই সাধারণ এলাকাটিতে।

'রাজনীতি ও গণতন্ত্র, অর্থনীতি ও ইতিহাস, জীববিজ্ঞান ও পদার্থবিজ্ঞান, গণিতশাস্ত্র ও যুক্তিবিদ্যা, ঈশ্বরতত্ত্ব ও দর্শন, নীতিবিদ্যা এবং মনোবিজ্ঞান, তত্ত্ব ও পদ্ধতি, আইডিয়া ও শৃঙ্খলা, ইত্যাদি শব্দ এই ছোট্ট জনগোষ্ঠীর কাছ থেকেই পাওয়া আর সেই জনগোষ্ঠীর দৈনন্দিন জীবন আবর্তিত হতো এই চত্বরকে ঘিরে। এখানেই সক্রেটিস তাঁর জীবনের অনেকটা সময় কাটিয়েছেন লোকজনের সঙ্গে কথা বলে। হয়তো তিনি জলপাই তেলের পাত্র নিয়ে হেঁটে যেতে থাকা কোনো দাসের পথ আটকে হতভাগ্য লোকটাকে দর্শনের কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলেন, কারণ সক্রেটিস মনে করতেন একজন দাস আর একজন সম্ভ্রান্ত মানুষ একই পরিমাণ কাণ্ডজ্ঞানের অধিকারী। কখনো আবার হয়তো তিনি কোনো নাগরিকের সঙ্গে তুমুল বিবাদে জড়িয়ে পড়তেন,

অথবা নিম্ন স্বরে তাঁর তরুণ ছাত্র প্লেটোর সঙ্গে সেরে নিতেন কোনো আলাপ। কথাটা ভাবতে কী অসাধারণই না লাগে। আমরা এখনো সক্রেটিস বা প্লেটোর দর্শনের কথা বলি, কিন্তু সত্যিকার অর্থে প্লেটো বা সক্রেটিস হওয়া একেবারে ভিন্ন ব্যাপার।'

সোফির কাছে সত্যিই মনে হলো যে ব্যাপারটা নিয়ে চিন্তা করতে অসাধারণ লাগছে। কিন্তু বাগানে তার নিজের গোপন ডেরায় একটা রহস্যময় কুকুরের নিয়ে আসা ভিডিওতে দার্শনিক ভদ্রলোক যেভাবে তার সঙ্গে কথা বলছেন সেটিও ঠিক একই রকমের অসাধারণ একটি ব্যাপার বলে মনে হলো তার কাছে।

মার্বেল পাথরের যে-টুকরোর ওপর দার্শনিক বসে ছিলেন সেটি ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। তারপর শান্তভাবে বললেন, 'আমি আসলে এখানেই শেষ করতে চেয়েছিলাম সোফি। আমি চেয়েছিলাম যেন তুমি এথেন্সের অ্যাক্রোপলিস আর অ্যাগোরার প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ দেখ। কিন্তু আমি এখনো ঠিক নিশ্চিত নই যে একসময় এই এলাকাটা কতটা অসাধারণ ছিল সেটি তুমি বুঝতে পেরেছো কিনা...কাজেই আরেকটু আগে বাড়ার লোভটা সামলাতে পারছি না। ব্যাপারটা যদিও একটু খাপছাড়া, কিন্তু আমি জানি এটা যে শুধু তোমার আর আমার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে সে ব্যাপারে আমি তোমার ওপর ভরসা রাখতে পারি। তাছাড়া, দৃশ্যটা কয়েক মুহূর্তের শুধু, তার বেশি দরকার হবে না...'

আর কোনো কথা বললেন না তিনি, তবে ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে ওখানেই দাঁড়িয়ে রইলেন বেশ কিছুক্ষণ। আর তাঁর অপেক্ষার মুহূর্তটিতে সেই ধ্বংসস্তূপের মধ্যে বেশ কিছু উঁচু দালানকোঠা দাঁড়িয়ে গেল। যেন কোনো জাদুবলে পুরনো ভবনগুলো সব দাঁড়িয়ে পড়েছে আবার। দিগন্তের ওপর এখনো অ্যাক্রোপলিস দেখতে পাচ্ছে সোফি, কিন্তু সেটি আর নিচের চত্বরের সবকটা দালান এখন ঝকঝকে নতুন হয়ে গেছে। সেগুলো এখন সোনায় মোড়া আর জমকালো রঙে ছোপানো।

রঙচঙে পোশাক পরা লোকজন চত্বরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কারও কারও সঙ্গে তরবারি, কারও কারও মাথায় মাটির পাত্র, আবার এদের একজনের বাহুর নিচে এক রোল প্যাপিরাস।

হঠাৎ করেই সোফি তার দর্শন শিক্ষককে চিনতে পারল। মাথায় তাঁর এখনো নীল বেরে-টা থাকলেও এখন তিনি বাকি সবার মতোই হলুদ একটা টিউনিক পরে আছেন। সোফির দিকে এগিয়ে এসে ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে তিনি বলে উঠলেন;

'এইবার ভালো হয়েছে। আমরা এখন প্রাচীন এথেন্সে দাঁড়িয়ে রয়েছি, সোফি। আমি চেয়েছিলাম তুমি নিজেই এখানে চলে আসো। যাই হোক, আমরা এখন রয়েছি ৪২০ খ্রিস্ট পূর্বাব্দে, সক্রেটিসের মৃত্যুর মাত্র তিন বছর আগে। আশা করছি এই বিশেষ ভ্রমণপর্বটি তুমি উপভোগ করবে, কারণ একটা ভিডিও ক্যামেরা জোগাড় করাটা সহজ কাজ ছিল না

মাথা ঝিমঝিম করতে লাগল সোফির। অদ্ভুত এই লোকটি হঠাৎ করে কীভাবে ২,৪০০ বছর আগেকার এথেন্সে গিয়ে হাজির হলেন? কীভাবে একেবারে ভিন্ন যুগের একটি ভিডিও ফিল্ম দেখছে সে? প্রাচীনকালে তো কোনো ভিডিও ছিল না...তাহলে কি এটা কোনো মুভি?

কিন্তু মার্বেল পাথরের দালানকোঠাগুলোকে তো একেবারে বাস্তব বলে মনে হচ্ছে। স্রেফ একটা ফিল্মের জন্য যদি ওরা এথেন্সের প্রাচীন নগর-চত্বর আর অ্যাক্রোপলিসকে নতুন করে তৈরি করে থাকে তাহলে তো সেটের জন্য কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা খরচা হয়েছে। স্রেফ সোফিকে এথেন্স সম্পর্কে জ্ঞান দান করবার জন্য খরচটা বড্ড বাড়াবাড়ি রকমের হয়ে গেছে।

বেরে-পরা মানুষটি আবার তাকালেন সোফির দিকে।

'ওই ওখানে কলোনেডের নিচে দু'জন লোককে দেখতে পাচ্ছো?'

কোঁচকানো টিউনিক পরা একজন বয়স্ক লোক। তার মুখে অযত্নচর্চিত লম্বা দাড়ি, নাকটা থ্যাবড়া, চোখ দুটো তুরপুনের মতো, গাল দুটো ফোলা ফোলা। তাঁর পাশেই দাঁড়িয়ে আছে সুদর্শন এক যুবক।

'এঁরা হচ্ছেন সক্রেটিস আর তাঁর তরুণ ছাত্র প্লেটো। এক্ষুণি তোমার সঙ্গে আলাপ হবে তাঁদের।'

দার্শনিক এগিয়ে গেলেন তাঁদের দিকে, মাথা থেকে বেরে-টা খুলে নিলেন, তারপর কী যেন বললেন সোফি তা বুঝতে পারল না। নিশ্চয়ই গ্রিক ভাষায় কথা বলেছেন তিনি। এরপর ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে তিনি বলে উঠলেন। 'আমি ওঁদেরকে বলেছি তুমি নরওয়ের একটি মেয়ে, ওঁদের সঙ্গে পরিচিত হতে পারলে খুব খুশি হবে। কাজেই প্লেটো এবার তোমাকে কয়েকটা প্রশ্ন দেবেন সেগুলো নিয়ে চিন্তা করবার জন্য। অবশ্য কাজটা খুব তাড়াতাড়ি করতে হবে, রক্ষীরা আমাদেরকে দেখে ফেলবার আগেই।' তরুণ লোকটি এগিয়ে এসে ক্যামেরার দিকে তাকাতে সোফি অনুভব করল তার নিজের কপালের দু'পাশে দপ্ দপ্ করছে।

'এথেন্সে তোমাকে স্বাগত জানাচ্ছি, সোফি,' শান্ত কণ্ঠে বললেন তিনি। তাঁর গলায় বিশেষ একটা টান রয়েছে। 'আমার নাম প্লেটো, আমি তোমাকে চারটে কাজ দিচ্ছি। প্রথমে ভেবে বের করো একজন রুটিওয়ালা কী করে একেবারে একই রকম দেখতে পঞ্চাশটা বিস্কিট তৈরি করে। এরপর ভেবে দেখতে পারো সব ঘোড়াই কেন একই রকম। এরপর তোমাকে বলতে হবে মানুষের আত্মা অমর কিনা। আর সবশেষে তোমাকে বলতে হবে পুরুষ এবং নারী একই রকমের সুবুদ্ধিসম্পন্ন কিনা। পারবে আশা করি।'

এরপরই টিভি-পর্দার ছবিটা নেই হয়ে গেল। সোফি টেপটা বারবার সামনে পিছে নিয়ে চালিয়ে দেখল কিন্তু সেই দৃশ্যটা আর খুঁজে পেল না।

পুরো ব্যাপারটা ভালো করে ভেবে দেখার চেষ্টা করল সোফি। কিন্তু একটা বিষয় নিয়ে ভাববার চেষ্টা করতেই সেটির পিছু পিছু আরেকটা ভাবনা এসে হাজির হলো, অথচ প্রথম বিষয়টা নিয়েই তখনো পুরোপুরি ভেবে উঠতে পারেনি সে।

গোড়া থেকেই সে বুঝতে পেরেছিল তার দর্শন শিক্ষক একটু খেয়ালি ধরনের। কিন্তু তাঁর শিক্ষাদানের পদ্ধতি প্রাকৃতিক নিয়ম-কানুনের পরোয়া করছে না দেখে সোফির মনে হলো তিনি একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলছেন।

সত্যিই কি সে সক্রেটিস আর প্লেটোকে টিভির পর্দায় দেখেছে? নিশ্চয়ই নয়, সেটি সম্ভব নয়। কিন্তু ওটা যে কার্টুনও ছিল না সেটিও তো সত্যি।

ভিডিও রেকর্ডারের ভেতর থেকে ক্যাসেটটা বের করে নিল সে। তারপর সিঁড়ি বেয়ে দৌড়ে উঠে গেল নিজের ঘরে। লেগো ব্লকগুলোর সঙ্গে সবচেয়ে ওপরের তাকেই রেখে দিল সে ওটা। তারপর ক্লান্ত-শ্রান্ত অবস্থায় বিছানার কোলে আশ্রয় নিল এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঘুমিয়ে পড়ল। ঘণ্টা কয়েক পর তার মা এসে ঢুকলেন ঘরটায়। আস্তে করে সোফির গায়ে ঠেলা দিয়ে তিনি বললেন :

'কী ব্যাপার, সোফি?'

'উঁম্?'

'কাপড়-চোপড় না বদলেই ঘুমিয়ে পড়েছিস যে?'

নিদ্রাজড়িত চোখে পিটপিট করে তাকাল সোফি।

প্লেটো

ছাত্রে

...আত্মার রাজ্যে ফিরে যাওয়ার বাসনা...

পরদিন সকালে চমকে ঘুম থেকে জেগে উঠল সোফি। ঘড়ির দিকে তাকাল। পাঁচটার একটু বেশি বাজে, কিন্তু ঘুম পুরোপুরি টুটে যাওয়াতে সে উঠে বসল বিছানার ওপর। তার গায়ে এই পোশাক কেন? তারপরই মনে পড়ে গেল সব।

একটা টুলের ওপর দাঁড়িয়ে ক্লজেটের সবচেয়ে ওপরের তাকটার দিকে তাকাল সে। হ্যাঁ, ওই তো, পেছন দিকেই রয়েছে ভিডিও ক্যাসেটটা। ব্যাপারটা তাহলে স্বপ্ন নয়। অন্তত, পুরোটা নয়।

কিন্তু সে নিশ্চয়ই প্লেটো আর সক্রেটিসকে সত্যি সত্যি দেখেনি। যাকগে, ব্যাপারটা নিয়ে আর কিছু ভাবার মতো শক্তি পাচ্ছিল না সে। হয়তো তার মায়ের কথাই ঠিক, হয়তো ইদানীং তার আচার-ব্যবহার একটু খাপছাড়াই হয়ে পড়েছে।

সে যাই হোক, এখন তো আবার ঘুমানো চলে না। সম্ভবত তার এখন গুহাটায় গিয়ে দেখে আসা উচিত কুকুরটা কোনো চিঠি রেখে গিয়েছে কিনা। পা টিপে টিপে নিচে নেমে এলো সোফি, এক জোড়া জগিং শ্যু পরে নিল, তারপর বেরিয়ে পড়ল।

বাগানে সবকিছু ছিমছাম, পরিষ্কার। পাখিরা এতো কলরব করছে যে সোফি না হেসে পারল না। ঘাসের ওপরে স্ফটিকের ফোঁটার মতো ঝকমক করছে শিশির। জগতের অবিশ্বাস্য বিস্ময় আরও একবার চমকে দিল সোফিকে।

পুরনো বেড়ার ভেতর দিকটাও বেশ ভেজা ভেজা। দার্শনিকের কাছ থেকে আসা নতুন কোনো চিঠি দেখতে পেল না সোফি, তারপরেও মোটাসোটা একটা শেকড় মুছে নিয়ে সেটির ওপর বসে পড়ল সে।

তার মনে পড়ে গেল ভিডিওর প্লেটো তাকে কয়েকটা প্রশ্ন দিয়েছেন উত্তর বের করার জন্য। প্রথমটা হলো একজন রুটিওয়ালা কী করে একই রকম দেখতে পঞ্চাশটা বিস্কিট তৈরি করে। খুব মনোযোগ দিয়ে চিন্তা করতে হলো সোফিকে, কারণ প্রশ্নটা সহজ নয়। তার মা মাঝে মধ্যে বেশকিছু বিস্কিট তৈরি করেছেন, কিন্তু সেগুলো দেখতে হুবহু একই রকম হয়নি। কিন্তু তিনি তো আর প্যাস্ট্রি কুক হিসেবে পটু নন; মাঝে মধ্যে রান্নাঘরটা দেখলে মনে হতো যেন সেখানে কোনো বোমা পড়েছে। এমন কি বেকারি থেকে তারা যে বিস্কিট কেনে সেগুলো-ও তো সব দেখতে হুবহু একইরকম হয় না কখনো। রুটিওয়ালা তার নিজের হাতে প্রত্যেকটা বিস্কিট আলাদা আলাদাভাবে তৈরি করে।

এরপরই সন্তুষ্টির একটা হাসি খেলে গেল সোফির মুখে। তার মনে পড়ে গেল একবার সে আর তার বাবা কেনাকাটা করতে গিয়েছিল আর তার মা তখন বাড়িতে ব্যস্ত ছিলেন বড়দিনের বিস্কিট তৈরিতে। তারা বাড়িতে ফিরে দেখেছিল রান্নাঘরের টেবিলের ওপর বেশকিছু জিঞ্জারব্রেড মানুষ[৯] বিছানো রয়েছে। সবগুলো নিখুঁত না হলেও এক হিসেবে দেখতে সেগুলো এক রকমই ছিল। কী করে হলো সেটি? নিশ্চয়ই তার মা সবকটার জন্য একই ছাঁচ ব্যবহার করেছিলেন।

ঘটনাটার কথা মনে করতে পেরে সোফি এতোটাই খুশি হয়ে গেল যে সে ধরেই নিল যে প্রথম প্রশ্নটার জবাব দেয়া হয়ে গেছে। যদি কোনো রুটিওয়ালা হুবহু একই রকমের দেখতে পঞ্চাশটা বিস্কিট তৈরি করে তাহলে ধরে নিতে হবে যে সে নিশ্চয়ই সবগুলোর জন্য একই ছাঁচ ব্যবহার করেছে। তাছাড়া আর কী!

তো, ভিডিও-র প্লেটো এরপর জিজ্ঞেস করেছিলেন ঘোড়াগুলো সব একই রকমের কেন। কিন্তু তা তো নয় একদম। বরং সোফির কাছে মনে হলো দু'জন মানুষ যেমন একরকম নয় তেমনি ঘোড়াগুলোও সব একেকটা একেকরকম।

সে প্রায় হাল ছেড়েই দিতে বসেছিল, এমন সময় বিস্কিট সম্পর্কে সে যা ভেবেছিল সে-কথা মনে পড়ে গেল তার। কোনোটাই সব দিক দিয়ে আরেকটার মতোন নয়। কোনোটা হয়ত অন্যগুলোর চেয়ে বেশি পুরু, কোনোটা ভাঙা। কিন্তু তারপরেও সবাই-ই বলবে যে বিস্কিটগুলো—এক হিসেবে—'হুবহু একই রকমের।'

প্লেটো সম্ভবত আসলে যা জানতে চেয়েছিলেন তা হলো একটা ঘোড়া কেন সব সময় ঘোড়া-ই; অন্য কিছু—এই যেমন, ঘোড়া আর শুয়োরের সংকর—কেন নয়। তার কারণ, ঘোড়াগুলোর মধ্যে কিছু ভালুকের মতো বাদামি আবার কিছু কিছু ভেড়ার মতো সাদা হলেও সব ঘোড়ার মধ্যেই একটা মিল রয়েছে। এই যেমন, আজ পর্যন্ত ছয় বা আট পা-অলা কোনো ঘোড়া দেখেনি সোফি।

তাই বলে প্লেটো নিশ্চয়ই এ-কথা বিশ্বাস করতেন না যে একই ছাঁচ থেকে বানানোর কারণেই ঘোড়াগুলো সব একই রকম হয়েছে?

এরপর সত্যিই একটা খুব কঠিন প্রশ্ন করেছেন প্লেটো মানুষের আত্মা কি অমর? সোফির মনে হলো এই প্রশ্নের উত্তর দেয়ার যোগ্যতা তার নেই। সে কেবল এটুকুই জানে যে, মৃতদেহগুলোকে হয় পুড়িয়ে ফেলা হয় আর নয়ত কবর দেয়া হয়, কাজেই তাদের ভবিষ্যৎ বলে আর কিছু থাকে না। মানুষের আত্মা অমর হলে ধরে নিতে হয় মানুষ দুটো আলাদা অংশ দিয়ে তৈরি একটা দেহ, যেটা বেশ কিছু বছর পার হলে পর ক্ষয়ে যায়, জীর্ণ হয়ে যায় আর একটি আত্মা, যা কিনা দেহের যা কিছু হোক না কেন মোটামুটি স্বাধীনভাবে কাজ চালিয়ে যায়। সোফির দাদি একবার বলেছিলেন যে তিনি মনে করেন তার দেহটাই কেবল বুড়ো হয়েছে। ভেতরে তিনি সব সময় আগের সেই তরুণীই রয়ে গেছেন।

'তরুণী'-র চিন্তাটা সোফিকে শেষ প্রশ্নে নিয়ে এলো। নারী আর পুরুষ কি একই রকম সুবুদ্ধিসম্পন্ন? সোফি ঠিক নিশ্চিত নয় এ-ব্যাপারে। ব্যাপারটা নির্ভর করছে প্লেটো সুবুদ্ধিসম্পন্ন বলতে কী বুঝিয়েছেন তার ওপরে।

---

৯. আদার রস মেশানো বিস্কিট। দেখতে মানুষের মতো। অনুবাদক

সক্রেটিস সম্পর্কে বলা দার্শনিকের কিছু কিছু কথা মনে পড়ল সোফির। সক্রেটিস দেখিয়ে দিয়েছেন যে নিজের বিচার-বুদ্ধি ব্যবহার করলেই সবার পক্ষে দর্শনগত সত্যগুলো বোঝা সম্ভব। তিনি আরও বলেছেন, যে-কোনো অভিজাতবংশীয় লোকের যে স্বাভাবিক বিচার-বুদ্ধি আছে একজন দাসেরও তাই আছে। সোফি নিশ্চিত তিনি এ-কথাও বলতেন যে নারীর বিচার-বুদ্ধিও পুরুষের মতোই।

সে যখন বসে বসে এ-সব ভাবছে, বেড়ার গায়ে খস্‌খস্ একটা আওয়াজ শোনা গেল, সেই সঙ্গে মনে হলো কী একটা যেন হাঁপাচ্ছে আর বাষ্পীয় ইঞ্জিনের মতো শব্দ করছে। পর মুহূর্তেই সোনালি ল্যাব্রাডরটা সুড়ুৎ করে ঢুকে পড়ল গুহার মধ্যে। মুখে তার বড়সড় একটা খাম।

সোফি চেঁচিয়ে উঠল, 'হার্মেস! ফেলো ওটা! ফেলো ওটা!'

সোফির কোলের ওপর খামটা ফেলে দিল কুকুরটা, সেটির মাথায় হাত বুলিয়ে দেবার জন্য হাত বাড়িয়ে দিল সোফি।

'গুড বয়, হার্মেস।' বলল সোফি।

নিজের গায়ে হাত বুলাতে দেবার জন্য শুয়ে পড়ল কুকুরটা। কিন্তু একটু পরেই উঠে দাঁড়াল সেটি তারপর বেড়ার যেখান দিয়ে ঢুকেছিল সেখান দিয়েই বেরিয়ে গেল ঠেলেঠুলে জায়গা করে নিয়ে। বাদামি খামটা নিয়ে সোফি অনুসরণ করল সেটিকে। ঘন ঝোপ ঠেলে একটু পরেই বাগানের বাইরে এসে দাঁড়াল সে।

হার্মেস অবশ্য এরই মধ্যে বনের প্রান্তের দিকে ছুট দিয়েছে, সোফি কয়েক পা দৌড়ে গেল সেটির পেছন পেছন। বার দুই ঘুরে দাঁড়িয়ে ঘেউ ঘেউ করে উঠল কুকুরটা। কিন্তু সোফি দমবার পাত্রী নয়।

এইবার সে দার্শনিককে খুঁজে বার করবেই, সেজন্য যদি তাকে এথেন্স পর্যন্ত-ও দৌড়ে যেতে হয় তো সে রাজি আছে।

গতি বাড়িয়ে দিল কুকুরটা, তারপর হঠাৎ করেই দিক পরিবর্তন করে সরু একটা পথ ধরে ছুটতে লাগল। সোফিও তাড়া করল সেটিকে, কিন্তু কিছুক্ষণ পর কুকুরটা ঘুরে দাঁড়িয়ে মুখোমুখি হলো তার। ডাকতে শুরু করল পাহারাদার কুকুরের মতো। তারপরেও হাল না ছেড়ে বরং এই সুযোগে তাদের মধ্যকার দূরত্বটা কমিয়ে আনল সোফি। ঘুরে দাঁড়াল হার্মেস, তারপর ছুট দিল তীরবেগে। সোফি বুঝে গেল তার পক্ষে কুকুরটার নাগাল ধরা সম্ভব নয়।মনে হলো যেন অনন্তকাল ধরে দাঁড়িয়ে রইল সোফি, শুনতে পাচ্ছে কুকুরটার পায়ের আওয়াজ ক্রমেই দূরে চলে যাচ্ছে। একসময় আর শোনা গেল না শব্দটা।

বনের মধ্যে একটা ফাঁকা জায়গায় গাছের একটা গুঁড়ির ওপর বসে পড়ল সোফি। তার হাতে তখনো সেই বাদামি খামটা। সে ওটা খুলে ফেলল, বের করে নিল টাইপ করা পাতা কটি, তারপর শুরু করল পড়তে :

প্লেটোর একাডেমী

একসঙ্গে আমরা সুন্দর যে-সময়টুকু কাটালাম সেজন্য ধন্যবাদ তোমাকে, সোফি।

বুঝতেই পারছ, আমি এথেন্সে কাটানো আমাদের সময়ের কথা বলছি। নিজেকে অন্তত প্রকাশ তো করেছি আমি। আর যেহেতু প্লেটোর সঙ্গেও আমি পরিচয় করিয়ে দিয়েছি তোমাকে সুতরাং এখন আর কথা না বাড়িয়ে কাজ শুরু করতে পারি আমরা।

সক্রেটিস যখন হেমলক পান করেন *প্লেটো*-র (Plato, ৪২৮-৩৪৭ খ্রি.পূ.) বয়স তখন উনত্রিশ। তার বেশ আগে থেকেই তিনি সক্রেটিসের ছাত্র; এবং তাঁর শিক্ষকের বিচারের পুরো প্রক্রিয়াটি তিনি খুব মন দিয়ে পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। এথেন্স যে তার সবচেয়ে মহৎ নাগরিককে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করতে পারে এই ব্যাপারটি তাঁর ওপর একটি গভীর দাগ কেটেছিল বললেও কম বলা হয়। এই ঘটনাটিই তাঁর সামগ্রিক দার্শনিক প্রচেষ্টার রূপরেখা তৈরি করে দিয়েছিল।

প্লেটোর কাছে সক্রেটিসের মৃত্যুর ঘটনাটি ছিল বাস্তবের সমাজ এবং *খাঁটি* বা *আদর্শ সমাজের* মধ্যকার দ্বন্দ্বের একটি উজ্জ্বল উদাহরণ। দার্শনিক হিসেবে প্লেটো প্রথম যে-কাজটি করেছিলেন তা হলো সক্রেটিস বিশাল জুরি বোর্ডের উদ্দেশে যে আবেদন রেখেছিলেন তার বর্ণনা সম্বলিত *অ্যাপলজি* (কৈফিয়ত) প্রকাশ করা।

তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে যে সক্রেটিস কিছুই লিখে রেখে যাননি, যদিও সক্রেটিস-পূর্ববর্তী অনেকে তাঁদের বক্তব্য লিখে রেখে গিয়েছিলেন। সমস্যা হচ্ছে, তাঁরা যা লিখেছিলেন তার প্রায় কিছুই পাওয়া যায়নি। তবে প্লেটোর বেলায় এ-কথা বিশ্বাস করার কারণ রয়েছে যে তাঁর মূল কাজগুলো সবই সংরক্ষণ করা হয়েছিল। (সক্রেটিসের *অ্যাপলজি* ছাড়াও তিনি *এপিসল* নামে চিঠিপত্রের একটি সংকলন আর প্রায় পাঁচটি দর্শনগত *ডায়লগ* রচনা করেছিলেন।) আজ যে আমরা তাঁর এই রচনাগুলো পাচ্ছি তার পেছনে কিংবদন্তির গ্রিক ব্যক্তিত্ব অ্যাকাডেমাসের নামে এথেন্স থেকে সামান্য দূরে এক তরুবীথির মধ্যে স্থাপিত প্লেটোর দর্শনের স্কুলটির ভূমিকাও কম নয়। তো, সেই স্কুলটি পরিচিত ছিল একাডেমি নামে। (এরপর থেকে সারা পৃথিবী জুড়ে হাজার হাজার একাডেমি স্থাপিত হয়েছে। এখনো আমরা 'একাডেমিকস্' এবং 'একাডেমিক বিষয়', এই কথাগুলো ব্যবহার করি।)

প্লেটোর একাডেমিতে যে-সব বিষয় শেখানো হতো তা হলো দর্শন, গণিত এবং জিমনাস্টিক্স বা ব্যায়াম। অবশ্য 'শেখানো' শব্দটি এক্ষেত্রে কতটা প্রযোজ্য তা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে। প্লেটোর একাডেমিতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল প্রাণবন্ত আলাপ-আলোচনা বা কথোপকথন। কাজেই প্লেটোর রচনাগুলো যে সংলাপের ধরনে লেখা সেটি নেহাত কোনো আকস্মিক ব্যাপার নয়।

শাশ্বত সত্য, শাশ্বত সুন্দর এবং শাশ্বত মঙ্গলজনক

এই কোর্সের গোড়ার দিকে আমি বলেছিলাম যে বিশেষ একজন দার্শনিকের মূল আলোচ্য বিষয় কী সেদিকে নজর দেয়াটা জরুরি। কাজেই এখন আমার প্রশ্ন প্লেটো কোন কোন সমস্যার দিকে নজর দিয়েছিলেন?

সংক্ষেপে বলতে গেলে, আমরা দেখতে পাবো যে এই জগৎ সংসারে যা কিছু

শাশ্বত বা অপরিবর্তনীয় এবং যা কিছু 'বয়ে চলে' এই দুইয়ের মধ্যকার সম্পর্কই ছিল প্লেটোর চিন্তার কেন্দ্রবিন্দু। (ঠিক সেই প্রাক-সক্রেটিস দার্শনিকদের মতো।) আমরা দেখেছি সোফিস্টরা আর সক্রেটিস কীভাবে প্রকৃতিবাদী দর্শন থেকে মানুষ এবং সমাজের দিকে নজর ফিরিয়েছিলেন। তারপরেও, এক অর্থে, এমনকি সক্রেটিস এবং সোফিস্টরাও শাশ্বত বা অপরিবর্তনীয়তা এবং 'পরিবর্তনশীলতার' মধ্যকার সম্পর্ক নিয়ে চিন্তিত ছিলেন। মানুষের নৈতিকতা এবং সমাজের আদর্শ বা গুণাবলীর সঙ্গে বিষয়টি কতটা সংশ্লিষ্ট সেটিই ছিল তাঁদের চিন্তার কেন্দ্রবিন্দু। অত্যন্ত সংক্ষেপে বলতে গেলে, সোফিস্টরা মনে করতেন ন্যায়-অন্যায়ের ধারণা একেক নগর-রাষ্ট্র এবং একেক প্রজন্মে একেক রকম। কাজেই ন্যায়-অন্যায় এমন একটি বিষয় যা 'বয়ে চলে'। সক্রেটিস এই ব্যাপারটি একেবারেই মেনে নিতে পারেননি। কোনটি ন্যায় কোনটি অন্যায় সে-বিষয়ে শাশ্বত এবং পরম নীতির অস্তিত্বে বিশ্বাসী ছিলেন তিনি। মানুষের প্রজ্ঞা আসলে যেহেতু শাশ্বত এবং অপরিবর্তনীয়, তাই কাণ্ডজ্ঞান ব্যবহার করে আমাদের পক্ষে এ-সমস্ত অপরিবর্তনশীল আদর্শে পৌঁছানো সম্ভব।

বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না তো, সোফি? এরপর এলেন প্লেটো। প্রকৃতিতে শাশ্বত জিনিস কী, পরিবর্তনশীল জিনিসই বা কী আর সেই সঙ্গে নৈতিকতার দিক দিয়ে সমাজে শাশ্বত ব্যাপার কী, এই দুটোই তাঁর চিন্তা-ভাবনার বিষয়। প্লেটোর কাছে এই দুটো সমস্যাই ছিল এক। তিনি এমন একটি 'বাস্তবতাকে' ধরতে চাইছিলেন যা শাশ্বত এবং অপরিবর্তনীয়।

আর খোলাখুলিভাবে বলতে গেলে, দার্শনিকদের দরকার আমাদের এ-জন্যই। একজন সুন্দরী-শ্রেষ্ঠ নির্বাচন করতে বা টমেটোর বাজারদর ঠিক করার জন্য তাঁদের দরকার নেই আমাদের। (তাঁরা যে প্রায়-ই অ-জনপ্রিয় হন তার কারণ এটাই।) দার্শনিকেরা প্রায়-ই অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক বা দৈনন্দিন বিষয়গুলোকে উপেক্ষা করে যা কিছু শাশ্বত 'সত্য', শাশ্বত 'সুন্দর' এবং শাশ্বত 'মঙ্গলজনক' তার দিকে জনসাধারণের মনোযোগ ফেরাবার চেষ্টা করেন।

তো, এভাবে আমরা অন্তত প্লেটোর দর্শনের মূল বিষয়ের একটা আভাস পেতে শুরু করেছি। তবে তাড়াহুড়ো না করে, ধীরে সুস্থে, একবারে একটি বিষয় নিয়ে এগোনোই ভালো হবে। অসাধারণ একটি মনকে বোঝার চেষ্টা করছি আমরা, এমন একটি মন যা পরবর্তীকালের ইউরোপীয় দর্শনের ওপর গভীর প্রভাব রেখে যাবে।

ভাব-জগৎ

এম্পিডক্লেস এবং ডেমোক্রিটাস দু'জনেই এই বিষয়টির দিকে লোকের মনোযোগ আকর্ষণ করেছিলেন যে প্রাকৃতিক জগতে প্রতিটি জিনিসই 'বয়ে চললেও' 'এমন কিছুর' অস্তিত্ব নিশ্চয়ই রয়েছে কখনোই যার কোনো পরিবর্তন হয় না (সেই 'চারটে মূল' বা 'পরমাণু')। প্লেটো-ও এই বক্তব্যের সঙ্গে একমত ছিলেন, তবে একেবারে ভিন্ন এক অর্থে।

প্লেটো বিশ্বাস করতেন, প্রকৃতিতে স্পর্শযোগ্য বা বাস্তব প্রতিটি জিনিসই 'বয়ে চলে'। কাজেই এমন কোনো 'বস্তু' নেই যার ক্ষয় নেই। 'বস্তু জগতের' প্রতিটি জিনিস এমন কোনো না কোনো বস্তু দিয়ে তৈরি যা ক্ষয়যোগ্য, তবে প্রতিটি জিনিসই তৈরি করা হয়েছে একটি চিরন্তন 'ছাঁচ' বা 'আকার'-কে অনুকরণ করে যা শাশ্বত এবং অপরিবর্তনীয়।

বুঝতে পেরেছো কথাটা? উঁহু, বোঝোনি।

ঘোড়াগুলো সব একইরকম কেন, সোফি? সম্ভবত তোমার ধারণা, ঘোড়াগুলো আদপেই সব একরকম নয়। তবে একটা কথা তুমি নিশ্চয়ই স্বীকার করবে যে প্রতিটি ঘোড়ারই এমন কিছু আছে যা সব ঘোড়ার ভেতরেই বিদ্যমান, এমন একটা কিছু যা দেখে সেগুলোকে ঘোড়া বলে চিনতে আমাদের কোনো কষ্টই হয় না। স্বভাবতই একটা ঘোড়া চিরকাল একরকম থাকে না। সেটি বুড়ো আর খোঁড়া হয়ে যেতে পারে এবং এক সময় সেটি মারা যাবে। কিন্তু ঘোড়ার 'আকার' চিরন্তন বা শাশ্বত এবং অপরিবর্তনীয়।

যা শাশ্বত এবং অপরিবর্তনীয় প্লেটোর বিচারে তা ভৌত 'মৌলিক সারবস্তু' (physical basic substance) নয়, কিন্তু এম্পিডক্লেস এবং ডেমোক্রিটাস সেটিই মনে করতেন। প্লেটোর ধারণা, সবকিছুই তৈরি করা হয়েছে প্রকৃতিগত দিক দিয়ে আধ্যাত্মিক ও বিমূর্ত কিছু শাশ্বত এবং অপরিবর্তনীয় নকশার আদলে।

ব্যাপারটা এভাবে বলা যাক সক্রেটিস-পূর্ব দার্শনিকেরা প্রাকৃতিক পরিবর্তনের একটি মোটামুটি চমৎকার ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন, সেজন্য তাঁদেরকে আগে থেকেই ধরে নিতে হয়নি যে সবকিছুরই আসলে 'পরিবর্তন' ঘটে। তাঁরা ভাবতেন, প্রাকৃতিক পরিক্রমার ভেতরেই শাশ্বত এবং অপরিবর্তনীয় কিছু ক্ষুদ্রতম উপাদান রয়েছে যার বিনাশ নেই। তা না হয় বোঝা গেল, সোফি। কিন্তু এই 'ক্ষুদ্রতম উপাদানগুলো,' যেগুলো দিয়ে একসময় একটি ঘোড়া তৈরি হয়েছিল, সেগুলোই কী করে চারশ'-পাঁচশ' বছর পরে হঠাৎ কোনো এক পাকচক্রে একসঙ্গে জড়ো হয়ে সম্পূর্ণ নতুন একটা ঘোড়ায় রূপ নেয় বা কোনো হাতি বা কুমির বনে যায়—তার কোনো যৌক্তিক ব্যাখ্যা তাঁরা দিয়ে যাননি। প্লেটোর যুক্তি ছিল এই যে, ডেমোক্রিটাসের পরমাণুগুলো কখনোই একসঙ্গে জড়ো হয়ে কোনো জীবজন্তুতে পরিণত হয় না। এই সূত্র ধরেই তাঁর দর্শনগত চিন্তা-ভাবনার যাত্রা শুরু।

তুমি যদি এরই মধ্যে বুঝে ফেলে থাকো আমি কী বলতে যাচ্ছি তাহলে এই অনুচ্ছেদটা তুমি বাদ দিয়ে পরেরটাতে চলে যেতে পারো। কিন্তু তারপরেও, তুমি বুঝতে পারোনি ধরে নিয়ে আমি বিষয়টা খোলাসা করে বলছি ধরা যাক, তোমার এক বাক্স লেগো রয়েছে আর তাই দিয়ে তুমি একটি ঘোড়া তৈরি করলে। তো, এরপর তুমি লেগোগুলো খুলে ফেলে ব্লকগুলো আবার বাক্সের মধ্যে রেখে দিলে। তো, এখন নিশ্চয়ই আশা করতে পারো না যে স্রেফ বাক্সটা ঝাঁকিয়েই তুমি একটা ঘোড়া তৈরি করে ফেলবে? লেগো ব্লকগুলো কী করে একে অন্যকে চিনে নিয়ে নিজেরাই একটা নতুন ঘোড়া তৈরি করে ফেলবে আবার? না, সোফি, ঘোড়াটাকে আবার তৈরি করতে হবে তোমায়। আর তুমি যে কাজটা করতে পারবে তার কারণ হলো ঘোড়া দেখতে কেমন তার একটা ছবি তোমার মনে আঁকা আছে। লেগো ব্লক দিয়ে তৈরি ঘোড়াটা

এমন একটা মডেল বা আদর্শ রূপ থেকে তৈরি করা হয়েছে যে মডেলটি যে-কোনো ঘোড়ার বেলাতেই একই থাকে।

সেই হুবহু একই রকমের বিস্কিটের বেলায় কী ঘটেছিল? ধরা যাক, তুমি এইমাত্র মহাকাশ থেকে পড়েছো এবং জীবনে কোনো রুটিওয়ালা দেখোনি। হঠাৎ তোমার চোখে পড়ে গেল একটা দারুণ লোভনীয় রুটির দোকান আর সেখানেই তুমি দেখতে পেলে, একটা তাকের ওপর, হুবহু একই রকমের দেখতে পঞ্চাশটা জিঞ্জারব্রেড মানুষ। আন্দাজ করা যায়, তোমার মনে প্রশ্ন জাগবে ওগুলো একই রকমের হলো কী করে। এমন অবশ্য হতে পারে যে, ওগুলোর কোনো একটার হয়ত একটা হাত নেই, আরেকটার হয়ত মাথার সামান্য অংশ খোয়া গেছে, তৃতীয়টার পেটটা হয়ত হাস্যকরভাবে খানিকটা ফুলে আছে। কিন্তু তারপরেও, মন দিয়ে চিন্তা করে দেখলে তুমি এই সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছবে যে জিঞ্জারব্রেড মানুষগুলোর প্রতিটিরই একটা 'সাধারণ' বৈশিষ্ট্য রয়েছে। ওগুলোর একটিও যদি নিখুঁত না হয় তারপরেও কিন্তু এই সন্দেহ তোমার মনে নিশ্চয়ই উঁকি দিয়ে যাবে যে, ওগুলোর উৎস একই। তুমি বুঝতে পারবে যে, সবকটা বিস্কিটই একই ছাঁচ দিয়ে গড়া। আর তার চেয়েও বড় ব্যাপার কী জানো সোফি, এবার তোমার একটা অদম্য ইচ্ছে জাগবে ছাঁচটা দেখার। কারণ, স্পষ্টতই, ছাঁচটা নিশ্চয়ই একেবারে নিখুঁত হবে—সেই সঙ্গে, আরেক অর্থে, নিশ্চয়ই আরও সুন্দর হবে, সেই খুঁতবিশিষ্ট অনুকৃতিগুলোর তুলনায়।

যদি তুমি নিজে থেকেই এই সমস্যাটির সমাধানে পৌঁছে গিয়ে থাকো সেক্ষেত্রে প্লেটো যেভাবে সেই দর্শনগত সমাধানে পৌঁছেছিলেন তুমিও ঠিক সেভাবেই সেখানে পৌঁছেছ।

বেশিরভাগ দার্শনিকের মতোই, তিনিও 'মহাশূন্য থেকে পড়েছিলেন'। (খরগোশটার একটা মিহি রোমের একেবারে ডগার ওপর দাঁড়িয়ে ছিলেন তিনি।) সমস্ত প্রাকৃতিক ব্যাপার-স্যাপার কী করে এমন এক হতে পারে তাই দেখে অবাক বনে গিয়েছিলেন তিনি এবং শেষে এই সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছেছেন যে এমনটি না হয়ে উপায় ছিল না; তার কারণ, আমরা আমাদের চারপাশে যা-কিছু দেখি তার সবগুলোর 'নেপথ্যেই' সীমিত সংখ্যক কিছু আকার রয়েছে। প্লেটো এই আকারগুলোর নাম দিয়েছিলেন ভাব (idea)। প্রতিটি ঘোড়া, শুয়োর কিংবা মানুষের নেপথ্যেই রয়েছে একটি করে 'ভাব ঘোড়া', 'ভাব শুয়োর' এবং 'ভাব মানুষ' (ঠিক একইভাবে, আমরা যে রুটির দোকানের কথা বললাম সেখানেও থাকতে পারে জিঞ্জারব্রেড মানুষ, জিঞ্জারব্রেড ঘোড়া এবং জিঞ্জারব্রেড শুয়োর। কারণ, প্রতিটি সম্ভ্রান্ত রুটির দোকানেই একাধিক ছাঁচ রয়েছে। তবে প্রত্যেক ধরনের জিঞ্জারব্রেড বিস্কিটের জন্য একটি ছাঁচই যথেষ্ট।)

প্লেটো এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন যে 'বস্তুজগতের' নেপথ্যে নিশ্চয়ই একটি বাস্তবতা রয়েছে। এই বাস্তবতাকে তিনি বলেছিলেন 'ভাব-জগৎ'; এই জগতে রয়েছে প্রকৃতিতে আমরা যে-সব ব্যাপার-স্যাপার দেখি সেগুলোর নেপথ্যের শাশ্বত এবং অপরিবর্তনীয় 'নকশা'। এই অসাধারণ দৃষ্টিভঙ্গিটি প্লেটোর ভাবতত্ত্ব (theory of ideas) নামে পরিচিত।

প্রকৃত জ্ঞান

প্রিয় সোফি, আমি নিশ্চিত, আমার কথা বুঝতে তোমার অসুবিধা হচ্ছে না। কিন্তু তুমি হয়ত ভাবছো প্লেটো এ-সব গুরুত্বের সঙ্গে বলেছিলেন কিনা। এ-ধরনের আকার সম্পূর্ণ ভিন্ন এক বাস্তবতায় আসলেই রয়েছে বলে তিনি কি সত্যিই বিশ্বাস করতেন?

ব্যাপারটা হয়ত তিনি সারা জীবন আক্ষরিক অর্থে বিশ্বাস করতেন না কিন্তু তাঁর লেখা কিছু সংলাপে বিষয়টা তিনি ঠিক এভাবেই বোঝাতে চেয়েছেন। চলো, তাঁর চিন্তার সূত্রটি অনুসরণ করা যাক।

আমরা দেখেছি যে, একজন দার্শনিক এমন একটা কিছু পেতে চান যা শাশ্বত এবং অপরিবর্তনীয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, বিশেষ একটা সাবানের ফেনার অস্তিত্ব নিয়ে একটি দার্শনিক প্রবন্ধ লেখার কোনো অর্থই হয় না। তার কারণ অংশত এই যে, কেউ সেটিকে ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করার আগেই ওটা ফেটে যাবে এবং অংশত এই কারণেও যে কেউ যা কখনো দেখেনি আর যার অস্তিত্ব মাত্র পাঁচ সেকেন্ডের, এমন একটি বিষয়ের ওপর লেখা দার্শনিক প্রবন্ধের পাঠক খুঁজে পাওয়া সত্যিই কঠিন।

প্লেটো বিশ্বাস করতেন যে, প্রকৃতিতে আমরা যা কিছু দেখি, যা কিছু স্পর্শযোগ্য তার সবই সাবানের একটি ফেনার সঙ্গে তুলনীয়, কারণ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের সবকিছুই ক্ষণস্থায়ী। এই যেমন আমরা জানি যে, প্রতিটি মানুষ আর প্রতিটি জীব-জন্তুই মারা যাবে, বিলীন হয়ে যাবে, তা সে আজ হোক আর কাল-ই হোক। এমনকি মার্বেল পাথরের একটা বড়সড় টুকরোরও পরিবর্তন ঘটে, বিলুপ্তি ঘটে। (অ্যাক্রোপলিসও ধ্বংসস্তূপে পরিণত হচ্ছে, সোফি। ব্যাপারটা লজ্জাজনক ঠিকই, কিন্তু এটাই হচ্ছে বাস্তবতা।) প্লেটোর বক্তব্য হচ্ছে, যা অবিরত পরিবর্তিত হচ্ছে তার সম্পর্কে প্রকৃত জ্ঞানলাভ সম্ভব নয়। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতে যা কিছু আছে, স্পর্শযোগ্য জিনিস, সে-সম্পর্কে আমরা কেবল আমাদের মতামতই ব্যক্ত করতে পারি। আর, যে-সব বিষয় আমরা আমাদের প্রজ্ঞা দিয়ে বুঝতে পারি, কেবল সে-সব বিষয়েই প্রকৃত জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব আমাদের পক্ষে।

ঠিক আছে, সোফি, আরও সহজ করে বুঝিয়ে বলছি একটা জিঞ্জারব্রেড বিস্কিটের ক্ষেত্রে এমনটা হতেই পারে যে বিস্কিট তৈরির এতোসব ঝকমারির ধকলে সেটি এমনভাবে বদলে গেল যে ওটাকে বিস্কিট বলে চেনাই গেল না। কিন্তু ডজন ডজন মোটামুটি ভাল জিঞ্জারব্রেড বিস্কিট দেখার পর বিস্কিটের ছাঁচটা কেমন হতে পারে সে-সম্পর্কে আমি একরকম নিশ্চিত-ই হয়ে যাবো। কখনোই না দেখার পরেও আমি অনুমান করে নিতে পারবো। আমাদের ইন্দ্রিয়গুলোর ওপর আমরা যেহেতু সব সময় ভরসা করতে পারি না তাই আসল ছাঁচটা দেখলেও যে খুব বেশি সুবিধে হতো সে-কথা জোর দিয়ে বলা মুশকিল। ব্যক্তিভেদে দৃষ্টিশক্তির পার্থক্য হতে পারে। অথচ অন্যদিকে, আমরা আমাদের প্রজ্ঞার ওপর ভরসা রাখতে পারি কারণ সবার ক্ষেত্রেই তা একই রকম।

তুমি যদি আরও তিরিশ ছাত্রছাত্রীর সঙ্গে কোনো ক্লাসে বসে থাকো আর শিক্ষক

এসে জিজ্ঞেস করেন রঙধনুর কোন রঙটি সবচেয়ে সুন্দর, সেক্ষেত্রে তিনি সম্ভবত বিভিন্ন রকমের উত্তর পাবেন। কিন্তু ৩ কে ৮ দিয়ে গুণ করলে কত হয় জিজ্ঞেস করলে, আশা করা যায়, গোটা ক্লাসই একই উত্তর দেবে। কারণ, এবার কথা বলছে প্রজ্ঞা এবং প্রজ্ঞা এক হিসেবে 'সে-রকমই ভাবছি' বা 'মনে হচ্ছে'-র পুরোপুরি বিপরীত। প্রজ্ঞাকে আমরা ঠিক এই জন্য শাশ্বত এবং সার্বজনীন বলতে পারি যে তা কেবল শাশ্বত এবং সার্বজনীন অবস্থার কথাই বলে।

অঙ্কশাস্ত্র প্লেটোর মনে খুব দাগ কেটেছিল তার কারণ গাণিতিক অবস্থার কখনো পরিবর্তন হয় না। কাজেই যে-বিষয় সম্পর্কে আমরা প্রকৃত জ্ঞান অর্জন করতে পারি গাণিতিক অবস্থাগুলো তাই। তবে এক্ষেত্রে উদাহরণ হলে ভাল হয় আমাদের।

ধরো, বনের মধ্যে গোল একটা পাইন ফল পেলে তুমি। হয়ত তুমি বললে তোমার মতে সেটি পুরোপুরি গোল, ওদিকে জোয়ানার জোর দাবি ওটার একটা পাশ খানিকটা চ্যাপ্টা। (তো, এরপর কি আর তর্ক শুরু না হয়ে পারে?) কিন্তু চোখে যা দেখা যায় সে সম্পর্কে তো কোনো প্রকৃত জ্ঞানলাভ সম্ভব নয়। অথচ কোনোরকম সন্দেহের অবকাশ না রেখেই তুমি বলতে পারবে যে একটি বৃত্তের সবকটা কোণের যোগফল ৩৬০ ডিগ্রি। এক্ষেত্রে অবশ্য তুমি বলছ একটি আদর্শ বৃত্তের কথা, যার অস্তিত্ব হয়ত এই পার্থিব জগতে নেই, যদিও মনের চোখে তুমি সেটি দিব্যি দেখতে পাবে। (এক্ষেত্রে তুমি জিঞ্জারব্রেড বিস্কিটের লুকানো ছাঁচটা নিয়ে কাজ করছো, রান্নাঘরের টেবিলের ওপরের বিশেষ কোনো বিস্কিট নিয়ে নয়।)

ছোট্ট করে বলতে গেলে, আমরা আমাদের ইন্দ্রিয়গুলো দিয়ে যে-সব বস্তুর অস্তিত্ব টের পাই সেগুলো সম্পর্কে আমরা কেবল ত্রুটিপূর্ণ ধারণাই পাই। কিন্তু যে-সব বিষয় আমরা আমাদের প্রজ্ঞা দিয়ে বুঝতে পারি, কেবল সে-সব বিষয় সম্পর্কেই প্রকৃত জ্ঞানলাভ করা সম্ভব আমাদের পক্ষে। ত্রিভুজের তিন কোণের সমষ্টি ১৮০ ডিগ্রিই থাকবে অনন্ত কাল। ঠিক একইভাবে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের সমস্ত ঘোড়ার একটা পা ভেঙে গেলেও 'ভাব' ঘোড়া চার পায়েই হাঁটবে।

অমর আত্মা

আগেই ব্যাখ্যা করেছি, প্লেটো বিশ্বাস করতেন বাস্তবতা দুটো ক্ষেত্রে বিভক্ত।

> একটি ক্ষেত্র হচ্ছে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ, যে-জগৎ সম্পর্কে আমরা কেবল আপাত বা অসম্পূর্ণ জ্ঞানই পেতে পারি আমাদের (আপাত বা অসম্পূর্ণ) পঞ্চেন্দ্রিয়ের সাহায্যে। এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতে 'সবকিছুই বয়ে চলে', কিছুই স্থায়ী নয়। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতে কোনো কিছুই অস্তিমান নয়। এখানে যা কিছু তার সবই আসে কিছু হওয়ার জন্য এবং তারপর তারা চলে যায়।
>
> অন্য ক্ষেত্রটি হলো ভাব-জগৎ, সে-জগৎ সম্পর্কে আমরা প্রকৃত জ্ঞান লাভ করতে পারি আমাদের প্রজ্ঞা ব্যবহার করে। এই ভাব-জগৎ ইন্দ্রিয়

দিয়ে উপলব্ধি করা বা বোঝা যায় না, কিন্তু এই ভাব (কিংবা আকার) শাশ্বত এবং অপরিবর্তনীয়।

প্লেটোর বক্তব্য অনুযায়ী, মানুষ দ্বৈত সত্তা বিশিষ্ট প্রাণী। আমাদের একটি দেহ আছে যা 'বয়ে চলে' এবং যা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের সঙ্গে অচ্ছেদ্য বাঁধনে বাঁধা আর সেই সঙ্গে যা জগতের অন্য সমস্ত কিছুর মতোই—এই যেমন ধরো, সাবানের ফেনা—একই নিয়তির অধীন। আমাদের সবকটি ইন্দ্রিয়ই আমাদের দেহ-নির্ভর, ফলে সেগুলোর ওপর ভরসা করা যায় না। কিন্তু আমাদের একটি আত্মা-ও রয়েছে যা অমর আর এই আত্মাটিই হলো প্রজ্ঞার রাজ্য এবং আত্মা যেহেতু অশরীরী, সেটি ভাব-জগতে ঘুরে বেড়াতে পারে সে-জগৎটাকে ভালো করে পর্যবেক্ষণ করার জন্য।

কিন্তু সেটিই সব নয়, সোফি। সেটিই সব নয়!

প্লেটো আরও বিশ্বাস করতেন যে, দেহের ভেতর বাসা বাঁধবার আগে থেকেই আত্মার অস্তিত্ব ছিল। (বিস্কিটের ছাঁচগুলোর সঙ্গে আলমারির একটা তাকের ওপরই ছিল সেটি।) কিন্তু একটি মানব দেহে আত্মাটি জেগে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই সেটি সমস্ত নিখুঁত ভাবের কথা ভুলে গেছে। তখন ঘটতে শুরু করে আরেকটি ঘটনা। সত্যি বলতে কী, শুরু হয় এক বিস্ময়কর প্রক্রিয়া। মানুষটি যখন প্রাকৃতিক জগতে নানান ধরনের আকার আবিষ্কার করতে থাকে, একটা আবছা স্মৃতি তার আত্মাকে অস্থির করে তোলে। আত্মা একটা ঘোড়া দেখতে পায়, কিন্তু যে-ঘোড়াটা সে দেখে সেটি নিখুঁত ঘোড়া নয়। (একটা জিঞ্জারব্রেড ঘোড়া!) কিন্তু সেটি একনজর দেখেই আত্মার ভেতরে নিখুঁত 'ঘোড়া'টার একটা আবছা স্মৃতি জেগে উঠতে দেরি হয় না, যে ঘোড়াটিকে আত্মা দেখেছিল একবার ভাব-জগতে আর এতে করেই আত্মাটি তার প্রকৃত রাজ্যে ফিরে যাওয়ার একটা প্রবল আকুলতা অনুভব করে। প্লেটো এই প্রবল আকুলতার নাম দিয়েছেন ইরস (eros), যার অর্থ ভালোবাসা। তো, আত্মাটি তখন 'তার সত্যিকারের উৎসে ফিরে যাওয়ার একটি তীব্র ইচ্ছা' অনুভব করে। এরপর থেকে দেহ এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য গোটা জগৎকেই আত্মা ত্রুটিযুক্ত এবং মামুলি হিসেবে দেখতে থাকে। আত্মা এক তীব্র আকুলতা অনুভব করে ভালোবাসার ডানায় ভর করে ভাব-জগতে তার নিজের আবাসে ফিরে যাওয়ার জন্য। দেহের শেকল থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য আঁকুপাঁকু করতে থাকে সে।

এইখানে চট করে একটা জরুরি কথা বলে রাখি যে প্লেটো কিন্তু বলছেন একটি আদর্শ জীবনধারা সম্পর্কে, কারণ সব মানুষ তো আর তাদের আত্মাকে মুক্ত করে দেবে না যাতে সেটি ভাব-জগতে ফিরে যাওয়ার জন্য তার যাত্রা শুরু করতে পারে। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের যে-প্রতিফলন আমরা দেখতে পাই, বেশিরভাগ লোক তাই নিয়েই জীবন কাটিয়ে দেয়। তারা একটা ঘোড়া দেখে, তারপর আরেকটা ঘোড়া দেখে। কিন্তু প্রতিটি ঘোড়া যে-ঘোড়ার দুর্বল অনুকরণ সেটিকে তারা দেখতে পায় না। (তারা হুড়মুড় করে রান্নাঘরে ঢুকে পেট পুরে জিঞ্জারব্রেড বিস্কিট খেয়ে নেয়, ওগুলো কোত্থেকে এলো তা নিয়ে বিন্দুমাত্র মাথা না ঘামিয়েই।) প্লেটো আসলে যা বলছেন তা দার্শনিকদের বেলায় প্রযোজ্য। তাঁর দর্শনকে দর্শনচর্চার বর্ণনা হিসেবেও দেখা যেতে পারে।

কোনো ছায়া দেখলেই তুমি নিশ্চয়ই এ-কথা ভাবো যে সেই ছায়ার পেছনে একটা কায়া আছে যার কারণে ছায়াটি পড়ছে। হয়ত তুমি কোনো একটি জন্তুর ছায়া দেখলে, দেখে ভাবলে ছায়াটি ঘোড়ার বোধহয়, কিন্তু তুমি নিশ্চিত নও। কাজেই তুমি নিশ্চয়ই ঘুরে দাঁড়াবে আর তখনই দেখতে পারে ঘোড়াটিকে এবং সেটি নিশ্চয়ই সেই আবছা 'ঘোড়ার-ছায়াটার' চেয়ে যারপরনাই সুন্দর হবে দেখতে, সেটির কাঠামোর রেখাগুলোও ছায়াটার চেয়ে অনেক বেশি স্পষ্ট এবং নিখুঁত হবে। ঠিক একইভাবে প্লেটোও বিশ্বাস করতেন যে প্রাকৃতিক সমস্ত কিছুই শাশ্বত আকার কিংবা বা ভাব-এর ছায়া ছাড়া কিছু নয়। কিন্তু বেশিরভাগ মানুষই ছায়ার মধ্যকার জীবন নিয়েই খুশিমনে থাকে। ছায়াটা কীসের তা নিয়ে মাথা ঘামায় না তারা। তারা মনে করে ওখানে ছায়া ছাড়া আর কিছুই নেই; এ-কথা তারা উপলব্ধি করে না যে ওগুলো আসলে ছায়া, আসল বস্তু নয়। ফলে তারা তাদের আত্মার অমরত্ব নিয়ে কোনো মাথাই ঘামায় না।

গুহার অন্ধকারের বাইরে

এই ব্যাপারটিই বিশদ করে বোঝাবার জন্য একটা পুরাণের সাহায্য নিয়েছেন প্লেটো। এটাকে বলা হয় গুহা-পুরাণ। আমি নিজের ভাষায় গল্পটা বলছি তোমাকে।

মনে করো কিছু লোক মাটির নিচের একটি গুহায় বাস করে। গুহার প্রবেশপথের দিকে পেছন ফিরে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় তারা এমনভাবে বসা যে গুহার পেছনের দেয়ালটাই শুধু দেখতে পায় তারা। তাদের পেছনে রয়েছে একটা উঁচু দেয়াল আর সেই দেয়ালের পেছন দিয়ে মানুষের মতো কিছু প্রাণী আসা-যাওয়া করে দেয়ালটার ওপরে নানান ধরনের মূর্তি উঁচু করে ধরা অবস্থায়। এ-সব মূর্তির পেছনে একটা অগ্নিকুণ্ড থাকায় গুহার পেছনের দেয়ালে এই মূর্তিগুলোর কাঁপা কাঁপা ছায়া পড়ে। কাজেই গুহার বাসিন্দারা এই ছায়াবাজিই দেখতে পায় কেবল। জন্ম থেকেই এই অবস্থায় বসে আছে তারা, কাজেই তারা মনে করে এই ছায়াগুলো ছাড়া জগতে আর কিছুই নেই।

এবার কল্পনা করো, এই গুহাবাসীদের মধ্যে একজন কোনোরকমে বাঁধন থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিতে সক্ষম হলো। প্রথমেই সে নিজেকে যে-প্রশ্নটি জিজ্ঞেস করে তা হলো গুহার দেয়ালে এই ছায়াগুলো কোত্থেকে এলো। তো, ঘুরে দাঁড়িয়ে সে দেয়ালের ওপরে তুলে ধরা মূর্তিগুলো দেখার পর কী ঘটবে বলে মনে হয় তোমার? প্রথমেই, প্রখর সূর্যের আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে যাবে তার। মূর্তিগুলোর স্পষ্টতা দেখেও তার চোখ ধাঁধিয়ে যাবে, কারণ এতোদিন সে কেবল সেগুলোর ছায়াই দেখে এসেছে। সে যদি দেয়ালের ওপরে উঠে অগ্নিকুণ্ডটার পাশ দিয়ে বাইরের পৃথিবীতে চলে আসতে পারে তাহলে তো তার চোখ ধাঁধাবে আরও। কিন্তু চোখ দুটো রগড়ে নিয়ে সামনে তাকালে প্রতিটি জিনিসের সৌন্দর্য দেখে সে হতবাক হয়ে যাবে। প্রথমবারের মতো সে দেখতে পারে নানান রং এবং স্পষ্ট কিছু আকৃতি। দেখতে পাবে আসল জীবজন্তু ও ফুল; গুহার ছায়াগুলো ছিল এগুলোরই দুর্বল প্রতিচ্ছবি। এবারও সে ভাববে এ-সব

জীবজন্তু ও ফুল কোথেকে এলো। এরপর সে হয়ত দেখতে পাবে আকাশের সূর্যটাকে, উপলব্ধি করবে যে এই জিনিসটিই এ-সব ফুল এবং জীবজন্তুকে প্রাণ দিয়েছে, ঠিক যেমন অগ্নিকুণ্ড দৃশ্যমান করে তুলেছিল ছায়াগুলোকে।

নিজের এই সদ্য-পাওয়া স্বাধীনতায় উৎফুল্ল হয়ে উচ্ছল গুহাবাসীটি এরপর তিড়িং বিড়িং নাচতে নাচতে গ্রামের পথে উধাও হয়ে যেতে পারতো, কিন্তু তার বদলে তার মনে পড়ে যায় এখনো গুহায় রয়ে যাওয়া তার সঙ্গীদের কথা। ফিরে যায় সে। সেখানে পৌঁছে সে গুহাবাসীদের বোঝাবার চেষ্টা করে যে গুহার ছায়াগুলো বাস্তব জিনিসের কাঁপা কাঁপা প্রতিচ্ছবি ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু তারা তাকে বিশ্বাস করে না। গুহার দেয়ালটার দিকে ইঙ্গিত করে তারা বলে তারা যা দেখছে সেগুলো ছাড়া অন্য কোনো কিছুরই অস্তিত্ব নেই। শেষে তারা সবাই মিলে মেরে ফেলে লোকটাকে।

গুহা-পুরাণের সাহায্যে প্লেটো আসলে ছায়াময় প্রতিচ্ছবির দিক থেকে সমস্ত প্রাকৃতিক ঘটনার নেপথ্যে অবস্থিত প্রকৃত ভাবের দিকে দার্শনিকের যাত্রাপথটিকেই বোঝাতে চেয়েছেন। সম্ভবত তিনি সক্রেটিসের কথাও ভাবছিলেন, যাঁকে 'গুহাবাসীরা' এই কারণে খুন করেছিল যে তিনি তাদের চিরায়ত ধ্যান-ধারণায় নাড়া দিয়েছিলেন এবং প্রকৃত অন্তর্দৃষ্টির পথটি দেখাতে চেয়েছিলেন। গুহা-পুরাণটি সক্রেটিসের সাহস এবং তার নৈতিক দায়িত্ববোধকেই ফুটিয়ে তুলেছে।

গুহার অন্ধকার আর গুহার বাইরের জগতের মধ্যে যে সম্পর্ক, তা প্রাকৃতিক জগতের আকার এবং ভাব-জগতের মধ্যকার সম্পর্কের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ, এটাই প্লেটোর বক্তব্য। তার মানে এই নয় যে তিনি বলতে চান প্রাকৃতিক জগৎ অন্ধকার এবং নিরস, তবে ভাব-এর স্পষ্টতার সঙ্গে তুলনায় তা অন্ধকার এবং নিরস। চমৎকার একটা ভূ-দৃশ্য বা ল্যান্ডস্কেপের ছবি নিশ্চয়ই অন্ধকারাচ্ছন্ন এবং নিরস নয়? কিন্তু সেটিতো কেবলই ছবি, তাই নয় কি?

দর্শনগত অবস্থা

গুহা-পুরাণটির উল্লেখ পাওয়া যাবে *রিপাবলিক* নামে প্লেটোর এক সংলাপে। এই সংলাপে প্লেটো একটি 'আদর্শ রাষ্ট্রের' ছবি তুলে ধরেছেন, অর্থাৎ তিনি একটি কাল্পনিক, আদর্শ বা আমরা যাকে 'ইউটোপিয়ান' বলি সে-রকম একটি রাষ্ট্রের কথা বলেছেন। সংক্ষেপে, আমরা বলতে পারি, প্লেটো বিশ্বাস করতেন দার্শনিকেরাই রাষ্ট্র পরিচালনা করবেন। মানবদেহের গঠনের ওপর ভিত্তি করে তিনি এ-ব্যাপারে তাঁর ব্যাখ্যা দাঁড় করিয়েছেন।

প্লেটোর মতে, মানবদেহ তিনটি অংশ দিয়ে তৈরি মাথা, বুক আর পেট। এই তিনটি অংশের প্রতিটির জন্য মানবাত্মার মধ্যে একটি করে বিভাগ রয়েছে। প্রজ্ঞা মাথার অন্তর্গত, ইচ্ছা রয়েছে বুকে আর ক্ষুধা পড়েছে পেটের ভাগে। আত্মার এই তিনটি বিভাগের প্রতিটির রয়েছে আলাদা আলাদা আদর্শ বা 'গুণ'। প্রজ্ঞার লক্ষ্য বিজ্ঞতা-র (wisdom) দিকে, ইচ্ছার লক্ষ্য সাহসের দিকে আর ক্ষুধার ক্ষেত্রে সেটিকে

দমিয়ে রাখাটাই *প্রথম* কাজ, যাতে 'মিতাচার'-এর (temperance) চর্চা করা যায়। দেহের এই তিনটি অংশ যখন একটি একক সত্তা হিসেবে কাজ করে, কেবল তখনই একটি সুসামঞ্জস্য বা 'গুণী' ব্যক্তিকে দেখতে পাই আমরা। স্কুলে পড়ার সময় একটি শিশুকে প্রথমে অবশ্যই তার ক্ষুধাকে নিয়ন্ত্রণে রাখার কৌশল শিখতে হবে, তারপরে তাকে অর্জন করতে হবে সাহস এবং শেষ পর্যন্ত প্রজ্ঞা এগিয়ে যাবে বিজ্ঞতার দিকে।

তো, প্লেটো এবারে ঠিক তিনভাগে বিভক্ত মানবদেহের মতোই একটি রাষ্ট্রের কথা কল্পনা করলেন। দেহের যেমন রয়েছে মাথা, বুক আর পেট, তেমনি রাষ্ট্রের থাকবে কিছু শাসক, সাহায্যকারী এবং শ্রমিক (এই, যেমন, কৃষক)। প্লেটো এখানে স্পষ্টতই গ্রিসের চিকিৎসাবিজ্ঞানকে তার মডেল হিসেবে ব্যবহার করছেন। একজন স্বাস্থ্যবান এবং সুসামঞ্জস্যপূর্ণ মানুষ যেমন ভারসাম্য ও মিতাচারের চর্চা করেন, ঠিক তেমনি একটি সুন্দর রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য হলো সেই রাষ্ট্রের প্রত্যেকেই সামগ্রিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তার নিজের অবস্থান সম্পর্কে ওয়াকিবহাল বা সচেতন।

প্লেটোর দর্শনের প্রতিটি অংশের মতো তার রাজনৈতিক দর্শনেরও বৈশিষ্ট্য *বুদ্ধিবাদ* (rationalism)। একটি সুন্দর রাষ্ট্র তখনই গঠিত হতে পারে যখন তা প্রজ্ঞার সাহায্যে পরিচালিত হয়। এবং মাথা যেমন দেহকে শাসন করে তেমনি সমাজকেও শাসন করবে দার্শনিকেরা।

এবার তাহলে দেখা যাক মানুষের এবং রাষ্ট্রের তিনটি অংশের মধ্যকার সম্পর্ক একটি সহজ চিত্রের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা যায় কিনা।

দেহ	আত্মা	গুণ	রাষ্ট্র
মাথা	প্রজ্ঞা	বিজ্ঞতা	শাসক
বুক	ইচ্ছা	সাহস	সাহায্যকারী
পেট	ক্ষুধা	মিতাচার	শ্রমিক

হিন্দুদের বর্ণপ্রথার সঙ্গে প্লেটোর আদর্শ রাষ্ট্রের বেশ মিল রয়েছে। বর্ণপ্রথা অনুসারে, সবার মঙ্গলের জন্য প্রত্যেকের জন্য একটি কাজ নির্দিষ্ট করা আছে। আসলে প্লেটোর সময়ের অনেক আগে থেকেই হিন্দু বর্ণপ্রথা এই একইভাবে তিনভাগে বিভক্ত এবং এই তিনটে বর্ণ হচ্ছে সহায়ক শ্রেণী (পুরুত শ্রেণী), যোদ্ধা শ্রেণী এবং শ্রমিক শ্রেণী। এখনকার যুগে আমরা হয়ত প্লেটোর এই রাষ্ট্রকে টোটালিটারিয়ান বা একনায়কতন্ত্রী বলব। কিন্তু এই ব্যাপারটি লক্ষণীয় যে তিনি বিশ্বাস করতেন যে নারীরা ঠিক পুরুষদের মতো দক্ষতার সঙ্গেই শাসন করতে সক্ষম এবং সেটি স্রেফ এই সরল কারণে যে শাসকরা তাঁদের প্রজ্ঞা-র বলেই শাসন করেন। তিনি জোর দিয়ে বলেছেন যে প্রজ্ঞা প্রয়োগ করার ক্ষমতার দিক দিয়ে নারী এবং পুরুষের মধ্যে কোনো তফাৎ নেই, তবে শর্ত হচ্ছে তাদেরকে একই ধরনের প্রশিক্ষণ দিতে হবে আর সেই সঙ্গে সন্তান লালন-পালন ও ঘর-বাড়ি দেখাশোনার কাজ থেকে অব্যাহতি দিতে হবে। প্লেটোর আদর্শ রাষ্ট্রে শাসক এবং যোদ্ধাদেরকে পারিবারিক জীবনযাপন করার বা ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকারী হওয়ার এক্তিয়ার দেয়া হয়নি। আর সন্তান লালন-

পালনের কাজকে এতোই গুরুত্বের সঙ্গে দেখা হয়েছে যে ব্যক্তির হাতে ছেড়ে না দিয়ে দায়িত্বটি রাষ্ট্রের হাতেই ন্যস্ত করা হয়েছে। (প্লেটোই প্রথম দার্শনিক যিনি রাষ্ট্র পরিচালিত নার্সারি স্কুল এবং সার্বক্ষণিক শিক্ষার পক্ষে মত ব্যক্ত করেছেন।)

বেশকিছু রাজনৈতিক অঘটনের পর প্লেটো লিখলেন তাঁর *আইন* নামের গ্রন্থটি। আর বইটিতে তিনি দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রের মর্যাদা দিলেন 'সাংবিধানিক রাষ্ট্র'কে। এবার তিনি ব্যক্তিগত সম্পত্তি এবং পারিবারিক বন্ধন এই দুয়েরই প্রবর্তন করলেন। এতে করে নারী স্বাধীনতা খানিকটা ক্ষুণ্ন হলো। অবশ্য তিনি এ-কথাও বললেন যে, যে-রাষ্ট্র নারী জাতিকে শিক্ষা দেয় না, প্রশিক্ষণ দেয় না, সে-রাষ্ট্র হচ্ছে সেই মানুষটির মতো যে কেবল তার ডান হাতটিকেই নানান কাজ করার উপযুক্ত করে গড়ে তোলে।

মোটের ওপর আমরা এ-কথা বলতে পারি যে প্লেটো যে-যুগে বাস করে গেছেন সে-যুগের বিবেচনায় নারীর প্রতি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ইতিবাচক। *সিম্পোজিয়াম* নামের তাঁর সংলাপে একজন নারীকে, কিংবদন্তিসম এক যাজিকা *দিওতিমা*-কে (Diotima), তিনি বিরল সম্মানে ভূষিত করেছেন। প্লেটোর বক্তব্য অনুযায়ী, সক্রেটিস তাঁর দার্শনিক অন্তর্দৃষ্টি লাভ করেছেন এই নারীরই কাছ থেকে।

তো, সোফি, এই হচ্ছেন প্লেটো। তাঁর অবাক করা তত্ত্বগুলো দু'হাজারেরও বেশি সময় ধরে আলোচিত হয়েছে, সমালোচিত হয়েছে। আর এ-কাজটি যিনি সর্বপ্রথম করেছিলেন তিনি তাঁরই একাডেমির একজন ছাত্র। নাম তাঁর অ্যারিস্টটল এবং তিনিই এথেন্সের তৃতীয় মহান দার্শনিক।

আজ এ-পর্যন্তই!

* * *

সোফি যখন প্লেটো সম্পর্কে পড়ছিল, পূর্বদিকে বনের ওপর তখন সূর্য উঠে গেছে। সে যখন ওই জায়গাটা পড়ছিল কী করে এক লোক গুহা থেকে বেরিয়ে বাইরের চোখ ধাঁধানো আলোয় এসে চোখ পিটপিট করছিল, সূর্যটা তখন দিগন্তের ওপরে উঠে উঁকি দিচ্ছিল।

ব্যাপারটা যেন অনেকটা এ-রকম যে সে নিজেই মাটির নিচের একটা গুহা থেকে বাইরে এসে দাঁড়িয়েছিল। সোফি উপলব্ধি করল প্লেটো সম্পর্কে পড়ার পর প্রকৃতির ব্যাপারে তার দৃষ্টিভঙ্গি পুরোপুরি পাল্টে গেছে। যেন কালার বর্ণান্ধ সে আগে। কিছু ছায়া দেখতো, কিন্তু কোনো স্পষ্ট ভাব কখনো দেখেনি।

সোফি ঠিক নিশ্চিত নয় শাশ্বত নকশা (patterns) সম্পর্কে প্লেটো যা যা বলেছেন তার সবই সঠিক কিনা, কিন্তু তারপরেও তার মনে হলো জগতের সমস্ত কিছুই যে ভাব-জগতের আকারগুলোর ত্রুটিপূর্ণ অনুকৃতি, এই চিন্তাটি খুবই চমৎকার। কারণ, সব ফুল, গাছ, মানুষ আর জীবজন্তুই কি 'অসম্পূর্ণ' নয়?

তার চারপাশের সবকিছুই এতো সুন্দর আর জীবন্ত বলে মনে হচ্ছে যে ব্যাপারটা বিশ্বাস করতে চোখ দুটো রগড়ে নিতে হলো তাকে। কিন্তু সে যা দেখছে তার কিছুই টিকবে না, থাকবে না। তারপরেও একশ বছরের মধ্যেই সেই একই ফুল একই জীব-

জন্তু ফের এসে হাজির হবে এখানে। প্রতিটি ফুল, প্রতিটি জীবজন্তু পৃথিবীর বুক থেকে মুছে যাওয়ার পরেও এমন একটা কিছু রয়ে যাবে যার মনে থাকবে এগুলো সব দেখতে কেমন ছিল।

বাইরের দিকে তাকাল সোফি। হঠাৎ একটা কাঠবিড়ালী একটা পাইন গাছের কাণ্ড বেয়ে দৌড়ে উঠে গেল। কয়েকবার পাক খেল সেটি কাণ্ডটাকে ঘিরে, তারপর হারিয়ে গেল ডালপালার আড়ালে।

'আগেও তোকে দেখেছি আমি,' ভাবল সোফি। এটা সে ঠিকই বুঝতে পারল যে, হয়ত ঠিক এই কাঠবিড়ালীটিকেই সে দেখেনি আগে। কিন্তু সে ঠিক একই 'আকার' দেখেছে। কারণ তার মনে হলো প্লেটো সম্ভবত ঠিকই বলেছেন। হয়ত সে সত্যিই শাশ্বত 'কাঠবেড়ালী' দেখেছে ভাব-জগতে, তার আত্মা একটি মানবদেহে বাসা বাঁধার আগে।

এমন কি সত্যিই হতে পারে যে এই জীবনের আগে তার একটা জীবন ছিল? আগেও একবার জীবনধারণ করেছে সে? ঘুরে বেড়ানোর মতো একটা দেহ পাওয়ার আগে তার আত্মার কি সত্যিই কোনো অস্তিত্ব ছিল? আর এটাও কি আসলেই সত্যি যে নিজের ভেতরে সে একটা ছোট সোনার পিণ্ড বয়ে নিয়ে বেড়ায়—একটা মানিক, যার কোনো ক্ষয় হয় না সময়ের সঙ্গে সঙ্গে, একটা আত্মা, যা তার নিজের দেহ বুড়ো হয়ে মরে যাওয়ার পরেও বেঁচে থাকবে?

মেজরের কেবিন

ছয়

...দুই চোখ দিয়েই চোখ টিপল মেয়েটি...

সোয়া সাতটা বাজে। এখনই তড়িঘড়ি করে বাসায় যাওয়ার কোনো দরকার নেই। রোববার সোফির মা সব সময়ই একটু আয়েশ করেন, কাজেই সম্ভবত তিনি আরও ঘণ্টা দুয়েক ঘুমোবেন।

বনের ভেতর খানিকটা এগিয়ে গিয়ে অ্যালবার্টো নক্সকে একটু খোঁজার চেষ্টা করলে কেমন হয়? তাছাড়া, কুকুরটা তার উদ্দেশ্যে অমন বদমেজাজীর মতো ঘেউ ঘেউ করে উঠছিল কেন?

উঠে পড়ল সোফি, তারপর হার্মেস যেদিকে গিয়েছিল সেদিকেই পা বাড়াল। প্লেটোর ওপর লেখা পৃষ্ঠাগুলো ভরে-রাখা বাদামি খামটা হাতে তার। পথটা যেখানে দু'ভাগ হয়ে গেছে সেখানে এসে অপেক্ষাকৃত চওড়াটি বেছে নিল সে।

চারদিকে পাখিরা কিচিরমিচির করছে গাছে, আকাশে, ঝোপে, ঝাড়ে। তারা যথারীতি তাদের সকালের কাজে নেমে পড়েছে। রোববারের সঙ্গে সপ্তাহের অন্যান্য দিনের তফাৎ তাদের জানা নেই। এ-সব করতে কে শিখিয়েছে পাখিগুলোকে? ওদের প্রত্যেকের ভেতরেই কি ছোট্ট একটা কম্পিউটার আছে, তাতে প্রোগ্রাম করা আছে কী কী করতে হবে না হবে?

ছোট্ট একটা পাহাড়ের ওপর উঠে গেছে পথটা, তারপর খাড়াভাবে নেমে গেছে উঁচু উঁচু পাইন গাছের ভেতর দিয়ে। বনটা এদিকে এতো ঘন যে গাছের ভেতর দিয়ে কয়েক গজের বেশি দেখতে পাচ্ছে না সে।

হঠাৎ পাইন গাছের কাণ্ডগুলোর ভেতর দিয়ে চকচকে কিছু একটা নজরে পড়ল তার। নিশ্চয়ই কোনো লেক ওটা। পথটা অন্য দিকে বেঁকে গেছে, কিন্তু সোফি গাছগুলোর ভেতর দিয়েই এগিয়ে চলল। তার পা দুটো তাকে যেদিকে নিয়ে গেল ঠিক সেদিকেই চলতে থাকল সে, কেন তা ঠিক না বুঝেই।

একটা ফুটবল মাঠের চেয়ে বড় হবে না লেকটা। সেটির অপর পাড়ে ছোট্ট একটা ফাঁকা জায়গায় রুপোলি বার্চ গাছ বেষ্টিত লাল রঙ-করা একটা কেবিন চোখে পড়ল তার। হালকা ধোঁয়ার একটা রেখা চিমনি দিয়ে বেরুচ্ছে দেখা গেল।

পানির কিনারায় নেমে এলো সোফি। বেশ কিছু জায়গা কাদাটে হয়ে আছে অনেকটা, কিন্তু তারপরই একটা দাঁড়-টানা নৌকো দেখতে পেল সে। নৌকোটার

অর্ধেকটা ডাঙায় টেনে তোলা। এক জোড়া বৈঠাও আছে নৌকোয়।

চারদিকে তাকাল সোফি। জুতো না ভিজিয়ে লেকটা ঘুরে লাল কেবিনটায় যাওয়া কোনোভাবেই সম্ভব হবে না তার পক্ষে। কাজেই দৃঢ় পায়ে নৌকোটার দিকে এগিয়ে গেল সে, তারপর ঠেলে পানিতে নামাল সেটিকে। চড়ে বসল নৌকোয়, দাঁড় বাঁধার নির্দিষ্ট জায়গায় বসালো দাঁড় দুটোকে, তারপর দাঁড় বেয়ে চলল আড়াআড়ি পথ ধরে। কিছুক্ষণের মধ্যেই উল্টো দিকের তীরে এসে ঠেকল নৌকোটা। নৌকো থেকে নেমে সেটিকে ডাঙায় তোলার চেষ্টা করল সে। উল্টো দিকের তীরটার চেয়ে এই তীরটা বেশি খাড়া।

কেবিনটার দিকে পা বাড়ানোর আগে একবার মাত্র ঘাড় ফিরে তাকাল সোফি।

নিজের সাহস দেখে নিজেই অবাক হয়ে গেল সোফি। কী করে এমন কাজ করার সাহস হলো তার? সে জানে না। যেন 'কিছু একটা' বাধ্য করেছে তাকে কাজটা করতে। দরজার কাছে গিয়ে টোকা দিল সোফি। অপেক্ষা করল একটু, কিন্তু সাড়া দিল না কেউ। সাবধানে হাতলটা ঘোরানোর চেষ্টা করতেই খুলে গেল দরজাটা।

'শুনছেন!' বলে উঠল সে। 'বাড়িতে কেউ আছেন?'

ভেতরে ঢুকে পড়ল সে, নিজেকে আবিষ্কার করল বসবার ঘরে : দরজাটা বন্ধ করে দেয়ার সাহস হলো না তার।

নিশ্চয়ই কেউ ছিল এখানে। পুরনো স্টোভটাতে চড়চড় করে কাঠ পোড়ার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে সে। এই একটু আগেও কেউ ছিল এখানে।

একটা বড়সড় খাবার টেবিলের ওপর একটা টাইপরাইটার, কিছু বই, দুটো পেন্সিল আর এক তাড়া কাগজ পড়ে আছে। একটা জানলার পাশে অপেক্ষাকৃত ছোট একটা টেবিল আর দুটো চেয়ার রয়েছে, জানালা থেকে দিব্যি দেখা যাচ্ছে লেকটা। ঘরে তেমন আর কোনো আসবাবপত্র নেই, যদিও একটা দেয়ালের পুরোটাই ঢাকা পড়ে গেছে সার বেঁধে রাখা বুক শেলফে এবং সেগুলো বইয়ে ঠাসা। সাদা একটা চেস্ট অভ্ ড্রয়ার্স-এর ওপরে ভারি পেতলে বাঁধানো বড় একটা আয়না ঝুলছে। দেখেই বোঝা যায় বেশ পুরনো ওটা।

একটি দেয়াল থেকে দুটো ছবি ঝুলছে। তার মধ্যে একটা তেলচিত্র, তাতে দেখা যাচ্ছে একটা সাদা বাড়ি, বাড়িটা একটা উপসাগর আর একটা বোট হাউসের কাছ থেকে সামান্য দূরেই দাঁড়িয়ে আছে। বাড়ি আর বোটহাউসের মাঝখানে আপেল গাছসহ ঢালু একটা বাগান, ঘন কয়েকটা ঝোপ আর কিছু পাথর। বার্চ গাছের একটা ঘন বেড়া মালার মতো ঘিরে আছে বাগানটাকে। তেলচিত্রটার নাম লেখা রয়েছে 'বিয়ার্কলে'।

তেলচিত্রটার পাশেই একজন পুরুষ মানুষের প্রতিকৃতি ঝুলছে, মানুষটি একটি চেয়ারে বসে আছে একটা জানালার পাশে। তার কোলে একটি বই। এই চিত্রের পটভূমিতেও গাছ এবং পাথরসহ একটি ছোট্ট উপসাগর দেখা যাচ্ছে। চিত্রটি দেখে মনে হয় এটি আঁকা হয়েছে বেশ কয়েকশ বছর আগে। এই ছবিটির নাম 'বার্কলে'। চিত্রকরের নাম লেখা রয়েছে সিমবার্ট।

বার্কলে এবং বিয়ার্কলে। কী অদ্ভুত!

সোফি তার তদন্ত চালিয়ে গেল। বসার ঘরের দরজা দিয়ে ছোট্ট একটা রান্নাঘরে যাওয়া যায়। কেউ একজন কয়েক পদ খাবার তৈরি করে রেখে গেছে। একটা তোয়ালের ওপর কিছু প্লেট আর গ্লাস স্তূপাকারে রাখা। সেগুলোর কোনো কোনোটাতে এখনো চকচক করছে সাবান পানির কিছু ফোঁটা। মেঝেতে পড়ে আছে একটা টিনের গামলা, তাতে কিছু ভুক্তাবশেষ। এখানে যে-ই থাকুক তার একটা পোষা প্রাণী আছে, কুকুর, নয় বেড়াল।

বসার ঘরে ফিরে এলো সোফি। আরেকটা দরজা দিয়ে ছোট্ট একটা শোবার ঘরে যাওয়া যায়। সেখানে বিছানার পাশে মেঝেতে দুটো কম্বলের পুরু বান্ডিল। কম্বল দুটোর ওপর কিছু সোনালি পশম আবিষ্কার করল সোফি। এই তো পাওয়া গেছে প্রমাণ। এইবার সোফি জেনে গেছে এই কেবিনের বাসিন্দারা হচ্ছে অ্যালবার্টো নক্স আর হার্মেস।

বসার ঘরে ফিরে আয়নাটার সামনে এসে দাঁড়াল সোফি। কাচটা সে-রকম দামি নয়, তাছাড়া সেটির গায়ে নানান আঁচড়ের ছড়াছড়ি। ফলে তার প্রতিচ্ছবিটি ঝাপসা দেখাচ্ছে। বাড়িতে গোসলখানায় সে যেমনটি করে থাকে, এখানেও সে নিজেকে ভেংচাতে লাগল। তার প্রতিচ্ছবিটিও, খুব স্বাভাবিকভাবেই, ঠিক তাই করতে থাকল।

কিন্তু হঠাৎ করেই একটা গা ছমছম করা ব্যাপার ঘটে গেল। স্রেফ একবার, সেকেন্ডের ভগ্নাংশের মধ্যে সোফি স্পষ্ট দেখতে পেল আয়নার মেয়েটি দুই চোখ বন্ধ করেই চোখ টিপল। চমকে পিছিয়ে এলো সোফি। সে নিজেই যদি ওভাবে চোখ টিপে থাকে তাহলে সে কী করে *দেখতে পেল* যে আয়নার মেয়েটিও চোখ টিপছে? তাছাড়া শুধু তাই নয়, মনে হলো যেন মেয়েটা সোফিকে এই কথা বলার জন্যই চোখ টিপেছে যে 'আমি তোমাকে দেখতে পাচ্ছি, সোফি। এখানেই আছি আমি, আয়নার অন্য দিকে।'

সোফি অনুভব করল তার বুক ধড়ফড় করছে আর ঠিক এই সময়েই সে শুনতে পেল দূরে একটা কুকুর ডেকে উঠল। হার্মেস! এক্ষুণি এখান থেকে বেরিয়ে পড়তে হচ্ছে তাকে। তখনই তার নজর চলে গেল আয়নার নিচে চেস্ট অভ্ ড্রয়ার্স-এর ওপর রাখা একটা সবুজ ওয়ালেটের দিকে। তাতে একশো আর পঞ্চাশ ক্রাউনের একটা করে নোট আর স্কুলের একটা পরিচয়পত্র। পরিচয়পত্রে উজ্জ্বলবর্ণ চুলের একটি মেয়ের ছবি রয়েছে। ছবির নিচে লেখা রয়েছে মেয়েটির নাম হিল্ডা মোলার ন্যাগ...

কেঁপে উঠল সোফি। আবার কুকুরের ডাক শুনতে পেল সে। এই মুহূর্তে বেরিয়ে পড়তে হবে তাকে।

সে যখন টেবিলের পাশ দিয়ে তাড়াহুড়ো করে বেরিয়ে আসছে তখন হঠাৎ করেই বই আর কাগজের স্তূপের মাঝখানটায় সাদা একটা খাম নজরে পড়ল তার। খামটার গায়ে একটাই মাত্র শব্দ লেখা সোফি।

সে কী করছে তা সে নিজেই বুঝে ওঠার আগে ছোঁ মেরে খামটা নিয়ে সেটি প্লেটো সম্পর্কে লেখা কাগজগুলো রাখা খামটার ভেতর ভরে ফেলল সোফি। তারপরেই এক ছুটে দরজা দিয়ে বেরিয়ে এসে সশব্দে বন্ধ করে দিল সেটি।

কুকুরের ডাকটা ক্রমেই কাছে এগিয়ে আসছে। কিন্তু সবচেয়ে যেটা খারাপ

ব্যাপার তা হলো নৌকোটা হাওয়া। অবশ্য দু'এক সেকেন্ড পরেই সেটিকে দেখতে পেল সে, লেকের মাঝ বরাবর ভেসে চলে গেছে সেটি। একটা বৈঠা ভাসছে সেটির পাশে। আর এর সবই ঘটেছে যে-কারণে তা হলো নৌকোটা সে টেনে ডাঙায় পুরোপুরি তুলে রাখতে পারেনি তখন। কুকুরের ডাকটা বেশ কাছে চলে এসেছে এখন, তাছাড়া লেকের অপর পাড়ে গাছের ফাঁক দিয়ে কীসের যেন নড়াচড়া দেখা যাচ্ছে।

আর ইতস্তত করল না সে। বাদামি খামটা হাতে নিয়ে তীর বেগে ঢুকে পড়ল কেবিনের পেছনের ঝোপ-ঝাড়ের ভেতর। একটু পরেই তাকে জলাময় অঞ্চলের ভেতর দিয়ে হাঁটা শুরু করতে হলো, বেশ কয়েকবার গোড়ালির বেশ খানিকটা ওপর পর্যন্ত ডুবে গেল তার পা। কিন্তু পা না চালিয়ে উপায় ছিল না তার। যে করেই হোক বাড়ি পৌছুতে হবে তাকে। একসময় একটা পথের ওপর হোঁচট খেয়ে পড়ল সে। এই পথ ধরেই কি এসেছিল সে? গায়ের কাপড় নিংড়ে পানি ঝরাবার জন্য থামল সে। আর তারপরই কাঁদতে শুরু করল সোফি।

এমন নির্বোধের মতো একটা কাজ সে কী করে করল? এর মধ্যে সবচেয়ে বাজে ব্যাপার হচ্ছে সেই নৌকোটা। একটা বৈঠা অসহায়ের মতো পাশে ভেসে থাকা অবস্থায় নৌকোটার সেই ছবিটা মন থেকে সরাতে পারছিল না সে। পুরো ব্যাপারটাই এতো অস্বস্তিকর, এতো লজ্জাজনক

দর্শন শিক্ষক নিশ্চয়ই এতক্ষণে লেকটার কাছে পৌছে গেছেন। বাড়ি ফেরার জন্য নৌকোটা দরকার হবে তাঁর। নিজেকে সোফির প্রায় অপরাধীর মতো মনে হলো। তবে কাজটা সে ইচ্ছে করে করেনি।

খামটা! ওটা বোধহয় আরও খারাপ হয়েছে। কেন সে নিতে গেল ওটা? সেটি অবশ্য এ-জন্য যে তার নাম লেখা ছিল তাতে, কাজেই এক অর্থে ওটা তারই। কিন্তু তারপরেও নিজেকে কেমন চোরের মতো মনে হলো সোফির। সে-ই যে ওখানে গিয়েছিল তার প্রমাণ রেখে এসেছে সে।

খামটার ভেতর থেকে চিরকুটটা বের করে আনল সোফি। তাতে লেখা

কোনটা আগে এসেছে—মুরগি না 'ভাব' মুরগি?
আমরা কি সহজাত 'ভাব' নিয়ে জন্মগ্রহণ করি?
একটি গাছ, প্রাণী আর মানুষের মধ্যে তফাৎ কী?
বৃষ্টি হয় কেন?
একটি সুন্দর জীবনযাপন করার জন্য কী প্রয়োজন?

এ-সব প্রশ্ন নিয়ে চিন্তা করার মতো অবস্থা সোফির এখন নেই যদিও, কিন্তু সে ধারণা করল এগুলোর সঙ্গে পরবর্তী দার্শনিকের একটা সম্পর্ক রয়েছে। অ্যারিস্টটল নাম না তাঁর?

শেষ পর্যন্ত সে যখন বনের ভেতর দিয়ে এতোটা পথ দৌড়ে এসে বেড়াটা দেখতে পেল তখন তার মনে হলো সে যেন জাহাজডুবির পর সাঁতরে তীরে এসে পৌছেছে। উল্টো দিক দিয়ে বেড়াটাকে হাস্যকর বলে মনে হলো।

হামাগুড়ি দিয়ে গুহায় ঢোকার আগে ঘড়ির দিকে চোখ যায়নি তার। সাড়ে দশটা বাজে। অন্যান্য কাগজের সঙ্গে বড় খামটা বিস্কিটের টিনের ভেতর রেখে দিল সে, তারপর নতুন প্রশ্নগুলো লেখা চিরকুটটা ঢুকিয়ে রাখল তার টাইটস্-এর ভেতর।

সে যখন বাড়িতে ঢুকল তার মা তখন টেলিফোনে কথা বলছেন। সোফিকে দেখতে পেয়ে তাড়াতাড়ি ফোনটা রেখে দিলেন তিনি।

'কোথায় গিয়েছিলি তুই?'

'আমি...আমি একটু হাঁটতে গিয়েছিলাম...বনের মধ্যে,' আমতা আমতা করে বলল সে।

'তা তো দেখতেই পাচ্ছি।'

চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল সোফি, তার কাপড় থেকে ফোঁটায় ফোঁটায় পড়তে থাকা পানির দিকে তাকিয়ে থাকল।

'জোয়ানাকে ফোন করছিলাম...'

'জোয়ানা?'

তা মা কিছু শুকনো কাপড় এনে দিলেন তাকে। কোনো রকমে দার্শনিকের চিরকুটটা লুকোতে সক্ষম হলো সোফি। এরপর তারা দু'জনে রান্নাঘরে গিয়ে বসল। তার মা গরম চকোলেট ড্রিংক বানালেন খানিকটা।

'তুই কি ওঁর সঙ্গেই ছিলি?' খানিক পর জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

'ওঁর সঙ্গে?'

তার দর্শন শিক্ষক ছাড়া অন্য কারও কথা মাথায় এলো না সোফির।

'ওঁর সঙ্গে, হ্যাঁ, ওঁর সঙ্গে তোর সেই খরগোশটা!'

মাথা ঝাঁকাল সোফি।

'দু'জনে এক সঙ্গে হলে কী করিস তোরা, সোফি? তোর গা এমন ভেজা ছিল কেন?'

গম্ভীর মুখে টেবিলে বসে রইল সোফি। বেচারি মা, এখন তাকে এ-সব নিয়ে চিন্তা করতে হচ্ছে।

আবার মাথা ঝাঁকাল সে। তারপরই আরও অনেক প্রশ্ন বৃষ্টির মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল তার ওপর।

'এবার আমি সত্যি কথাটা জানতে চাই। তুই কি সারা রাতই বাইরে ছিলি? জামা-কাপড় না বদলেই বিছানায় গিয়েছিলি কেন তুই? আমি ঘুমোতে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই নিশ্চয়ই চুপিচুপি বেরিয়ে পড়েছিলি তুই? তোর বয়স মাত্র চোদ্দ, সোফি। আমি জানতে চাই কার সঙ্গে দেখা করছিস তুই!'

কাঁদতে শুরু করল সোফি। তারপর মুখ খুলল সে। তখনো তার ভয় কাটেনি আর কেউ যখন ভয় পায় তখন সে কথা বলে।

সোফি বলল বেশ সকালে ঘুম ভেঙে গিয়েছিল তার এবং সে বনের মধ্যে হাঁটতে গিয়েছিল। সোফি তার মাকে কেবিন, নৌকো এবং সেই রহস্যময় আয়নার কথা বলল। কিন্তু গোপন করেসপন্ডেন্স কোর্স সম্পর্কে সে তাকে কিছুই বলল না। সবুজ

ওয়ালেটটা সম্পর্কেও না। সে ঠিক জানে না কেন, কিন্তু হিল্ডার ব্যাপারটা সে চেপে রাখাটাই শ্রেয় বলে মনে করল।

তার মা দু'হাতে তাকে বেড় দিয়ে ধরলেন এবং সোফি বুঝতে পারল তিনি তার কথা বিশ্বাস করেছেন ।

'আমার কোনো বয় ফ্রেন্ড নেই,' সশব্দে শ্বাস নিয়ে সোফি বলল। 'কথাটা আমি বলেছিলাম স্রেফ এজন্য যে তুমি সেই সাদা খরগোশটা নিয়ে ভীষণ আপসেট হয়ে পড়েছিলে।'

'কিন্তু তুই সেই মেজরের কেবিন পর্যন্ত গিয়েছিলি...' তা মা চিন্তিত ভঙ্গিতে বললেন।

'মেজরের কেবিন?' বড় বড় চোখ করে মায়ের দিকে তাকাল সোফি।

'বনের সেই ছোট্ট কেবিনটাকে মেজরের কেবিন-ই বলা হয়, তার কারণ কয়েক বছর আগে আর্মির এক মেজর ওখানে কিছু দিনের জন্য ছিলেন। আমার ধারণা লোকটা একটু খেয়ালি, একটু ক্ষ্যাপাটে ধরনের ছিল। কিন্তু ও কিছু না। কিন্তু তারপর থেকে কেবিনটা খালিই পড়ে আছে।'

'না তা নয়। ওখানে এক দার্শনিক থাকেন এখন।'

'আহ্, থামতো। আবার আকাশ কুসুম ভাবতে শুরু করিস না।'

যা ঘটে গেল তা নিয়ে ভাবতে লাগল সোফি নিজের ঘরে বসে। তার মাথাটা হৈ হট্টগোলে ভরা একটা সার্কাসের মতো গম গম করতে লাগল গদাইলস্করী সব হাতি, হাস্যকর সব ক্লাউন, দুর্দান্ত সাহসী দড়াবাজ আর শেখানো-পড়ানো বানরগুলো সমেত। কিন্তু একটা ছবিই বারবার, অবিরামভাবে ফিরে আসতে থাকল তার মনে। একটা দাঁড় নিয়ে ছোট্ট একটা নৌকো বনের ভেতর একটা লেকের মধ্যে ভেসে বেড়াচ্ছে আর, বাড়ি পৌঁছনোর জন্য একজনের সেই নৌকোটা দরকার হচ্ছে।

এটুকু সে নিশ্চিতভাবেই বুঝতে পারল যে দর্শন শিক্ষক তার কোনো ক্ষতি করতে চাননি এবং সে যে তাঁর কেবিনে গিয়েছিল সেটি জানতে পারলে তিনি তাকে ক্ষমা করে দেবেন। কিন্তু সে একটা চুক্তি ভঙ্গ করেছে। দর্শনের এই কোর্সটার জন্য সোফির কাছ থেকে তিনি তাহলে এই উপহারই পেলেন। কী করে সে এর ক্ষতি পূরণ করবে?

সে তার গোলাপী নোটপেপার নিয়ে লিখতে বসে গেল :

> প্রিয় দার্শনিক, রোববার ভোরবেলা আমিই আপনার কেবিনে গিয়েছিলাম। আপনার সঙ্গে দেখা করার এবং দর্শনগত সমস্যার ব্যাপারে আলাপ করার ভীষণ ইচ্ছে হয়েছিল আমার। আপাতত আমি যদিও প্লেটোর ভক্ত বনে গেছি কিন্তু তিনি অন্য এক বাস্তবতায় অস্তিত্বশীল যে-সব ভাব বা নকশার ছবির কথা বলেছেন সে-সব ঠিক কিনা তা নিয়ে আমি নিশ্চিত নই। জিনিসগুলো যে আমাদের আত্মার মধ্যেই আছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু আমার ধারণা, অন্তত এই মুহূর্তের জন্য, সেটি একটা ভিন্ন ব্যাপার। সেই সঙ্গে অবশ্য আমাকে এ-কথাও স্বীকার করতে হচ্ছে যে আত্মার অমরত্বের ব্যাপারেও আমি পুরোপুরি নিঃসন্দেহ নই। ব্যক্তিগতভাবে আমার

আগেকার জীবনগুলোর কোনো স্মৃতিই আমার মধ্যে নেই। তবে আপনি যদি আমাকে এ-কথা বিশ্বাস করাতে পারেন যে আমার মৃতা দাদির আত্মা সুখে আছে তাহলে আমি খুবই কৃতজ্ঞ থাকবো।

আসলে দর্শনগত কোনো সমস্যা নিয়ে আলাপ করার জন্য আমি আপনাকে এই চিঠি লিখতে বসিনি। আমি স্রেফ এ-কথা বলতে চেয়েছি যে অবাধ্য হওয়ার জন্য আমি দুঃখিত। নৌকোটাকে আমি পুরোপুরি ডাঙায় তুলতে চেয়েছিলাম, কিন্তু স্পষ্টতই, তা আমার শক্তিতে কুলোয়নি। বড়সড় কোনো ঢেউয়ের কারণেও নৌকোটার এভাবে সরে যাওয়াটা বিচিত্র নয়।

আশা করছি, পা না ভিজিয়েই আপনি বাড়ি ফিরতে পেরেছিলেন। যদি না পেরে থাকেন তাহলে এ-কথা শুনে সম্ভবত আপনি খানিকটা সান্ত্বনা পাবেন যে আমিও ভিজে গিয়েছিলাম এবং সম্ভবত ভীষণ ঠাণ্ডা লাগবে আমার। কিন্তু সেজন্য আমিই দায়ী থাকবো।

কেবিনের কিছুই আমি স্পর্শ করিনি, তবে আমি দুঃখিত যে টেবিলের ওপর রাখা খামটা নেয়ার লোভ আমি সংবরণ করতে পারিনি। আমি যে কিছু চুরি করতে চেয়েছিলাম এবং সেজন্যেই ওটা নিয়েছি তা নয়, আসলে আমার নাম ওটার গায়ে লেখা ছিল বলে সেই তালগোল পাকানো পরিস্থিতিতে আমার মনে হয়েছিল ওটা বুঝি আমারই। আমি সত্যিই আন্তরিকভাবে দুঃখিত, সেই সঙ্গে কথা দিচ্ছি আর কখনো আপনাকে হতাশ করবো না।

পুনশ্চ এই মুহূর্ত থেকেই নতুন প্রশ্নগুলো নিয়ে ভালোভাবে চিন্তা শুরু করবো আমি।

পুনঃ পুনশ্চ সাদা চেস্ট অভ্ ড্রয়ার্সের ওপরের পেতলের ফ্রেমের আয়নাটা কি সাধারণ কোনো আয়না না জাদুর আয়না? কথাটা আমি জিজ্ঞেস করছি এই কারণে যে আমি আমার প্রতিবিম্বকে একই সঙ্গে দুই চোখ দিয়ে টিপতে দেখায় অভ্যস্ত নই।

শ্রদ্ধান্তে, আপনার একান্তই আগ্রহী ছাত্রী, সোফি।

খামে পোরার আগে চিঠিটা আগাগোড়া দু'বার পড়ে নিল সোফি। তার মনে হলো, এটা আগেরটার চেয়ে কম আনুষ্ঠানিক হয়েছে। নিচতলায়, রান্নাঘরে এক মুঠো চিনি আনতে যাওয়ার আগে আজকের দিনের প্রশ্নগুলো লেখা চিরকুটটার দিকে নজর দিল সে।

'কোনটা আগে এসেছে—মুরগি না 'ভাব' মুরগি?'

প্রশ্নটা মুরগি আর ডিম সংক্রান্ত সেই প্রাচীন ধাঁধাটার মতোই চালাকিপূর্ণ। মুরগি ছাড়া মুরগির ডিম হতে পারে না, আবার ডিম ছাড়া মুরগি হতে পারে না। মুরগি না মুরগির ভাব আগে এসেছে সেটি বের করা কি এতই কঠিন? প্লেটো কী বলতে চেয়েছেন সেটি সোফি বুঝতে পারল। তিনি বলতে চেয়েছেন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতে মুরগি আসার অনেক আগেই ভাব-জগতে মুরগির ভাবের অস্তিত্ব ছিল। প্লেটোর বক্তব্য অনুসারে, একটা দেহে বাসা বাঁধবার আগেই আত্মা মুরগির 'ভাব' 'দেখে নিয়েছিল'। কিন্তু সোফির কি মনে হয় না যে প্লেটো ঠিক এই জায়গাতেই ভুল করেছেন? যে-

মানুষটি কোনোদিন কোনো জীবন্ত মুরগি বা মুরগির ছবি দেখেনি তার কী করে মুরগি সম্পর্কে 'ভাব' থাকবে? এই প্রশ্নটিই তাকে পরের প্রশ্নে নিয়ে এলো

আমরা কি সহজাত 'ভাব' নিয়ে জন্মগ্রহণ করি? নিতান্তই অসম্ভব, ভাবল সোফি। নানান ভাব-এ সমৃদ্ধ সদ্যোজাত শিশুর কথা অনেক কষ্ট করেও কল্পনা করতে পারল না সে। তাই বলে অবশ্য এ-ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া মুশকিল, কারণ, স্পষ্টতই শিশুটির মুখে সে-মুহূর্তে কোনো ভাষা না থাকার মানেই নিশ্চিতভাবে তা এই নয় যে তার মাথায় কোনো ভাব-ও নেই। তবে এ-কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে এই পৃথিবীতে কোনো কিছু সম্পর্কে কোনো ধারণা পেতে হলে সেটিকে আগে দেখতে হয় আমাদের।

'একটি গাছ, প্রাণী এবং মানুষের মধ্যে তফাৎ কোথায়?' পরিষ্কার কিছু তফাৎ তো মুহূর্তের মধ্যেই ধরা পড়ল সোফির কাছে।

উদাহরণস্বরূপ, একটা গাছের খুব জটিল কোনো আবেগপ্রবণ জীবন আছে বলে সে মনে করে না। কে কবে একটা ভগ্নহৃদয় ব্লুবেল ফুলের কথা শুনেছে? গাছ বড় হয়, পুষ্টি গ্রহণ করে, বীজ তৈরি করে যাতে তা থেকে আবার আরেকটি গাছ জন্ম নিতে পারে। গাছের ব্যাপারে এই তো হলো গিয়ে সারকথা। সোফি এই সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছল যে গাছের বেলায় যে-কথা খাটে, প্রাণী এবং মানুষের বেলাতেও সেই একই কথা খাটে। অবশ্য প্রাণীদের অন্যান্য গুণও রয়েছে। যেমন, তারা চলাফেরা করতে পারে। (গোলাপ ফুল আবার কবে ম্যারাথন রেসে অংশ নিয়েছে?) অবশ্য জীবজন্তু আর মানুষের মধ্যে আরও কোনো পার্থক্য বের করা একটু কষ্টকর। মানুষ চিন্তা-ভাবনা করতে পারে, কিন্তু জীবজন্তুরাও কি তা পারে না? সোফি নিশ্চিত, তার শিয়ার্কেন চিন্তা করতে পারে। অন্ততপক্ষে বেড়ালটা যে বেশ হিসেবি তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু ওটা কি কোনো দর্শনগত প্রশ্ন নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করতে পারে? একটা বেড়াল কি একটা গাছ, প্রাণী আর মানুষের মধ্যকার তফাৎ নিয়ে চিন্তা করতে পারে? সে-সম্ভাবনা খুবই কম। হতে পারে একটা বেড়াল সুখী বা অসুখী, কিন্তু সেটি কি ঈশ্বরের অস্তিত্ব বা তার নিজের আত্মা অমর কিনা তা নিয়ে চিন্তা করতে পারে? সে-ব্যাপারে ঘোর সন্দেহের অবকাশ আছে বলে মনে হলো সোফির। কিন্তু এখানে একই প্রশ্ন তোলা হয়েছে শিশু এবং সহজাত ভাব নিয়ে। এ-বিষয়ে একটা বেড়ালের সঙ্গে আলোচনা করা আর একটি শিশুর সঙ্গে কথা বলা ঠিক একই রকমের সমস্যার সৃষ্টি করবে।

'বৃষ্টি কেন হয়?' সোফি কাঁধ ঝাকাল। বৃষ্টি সম্ভবত এই কারণে হয় যে সমুদ্রের পানি বাষ্প হয়ে উড়ে যায় আর মেঘ ঘন হয়ে বৃষ্টির ফোঁটায় পরিণত হয়। এটা কি সে থার্ড গ্রেডেই শেখেনি? অবশ্য লোকে এ-কথাও বলতে পারে যে গাছপালা আর জীব-জন্তু যাতে বড় হতে পারে সেজন্যই বৃষ্টি হয়। কিন্তু সেটি কি সত্যি? বৃষ্টির কি আসলেই কোনো উদ্দেশ্য থাকে? শেষ প্রশ্নটা নিশ্চিতভাবেই এই উদ্দেশ্য নিয়ে 'একটি সুন্দর জীবন যাপন করার জন্য কী প্রয়োজন?'

এই কোর্সের বেশ গোড়ার দিকেই দার্শনিক এ-বিষয়ে কিছু কথা লিখেছিলেন। খাদ্য, উষ্ণতা, ভালোবাসা আর যত্ন সবারই দরকার। যে-কোনো অবস্থাতেই এই মৌলিক জিনিসগুলো একটি সুন্দর জীবনের প্রাথমিক শর্ত। তো, এরপর দার্শনিক মন্তব্য করেছিলেন যে, সেই সঙ্গে দর্শনগত কিছু প্রশ্নের উত্তর জানা থাকাটাও মানুষের

জন্য জরুরি। পছন্দমতো একটা চাকরি বা বৃত্তি পাওয়াটাও সম্ভবত বেশ জরুরি। এই যেমন, কেউ যদি রাজপথের যানবাহন, লোকজন ইত্যাদি অপছন্দ করে তাহলে সে ট্যাক্সিচালক হিসেবে খুব সুখী বোধ করবে না। আবার কেউ যদি হোমওয়ার্ক করতে পছন্দ না করে তাহলে শিক্ষক হতে চাওয়াটা নিশ্চয়ই তেমন ভালো কাজ হবে না। জীব-জন্তু সোফির খুব পছন্দ, সে পশু-চিকিৎসক হতে চায়। তবে সে যাই হোক, একটি সুন্দর জীবন যাপন করার জন্য লটারিতে লাখ টাকা জেতাটা জরুরি বলে সে মনে করে না।

তার উল্টোটা হলেই সম্ভবত ভালো। সেই যে একটা প্রবাদ আছে না অলস হাতে শয়তান-ই কাজ যুগিয়ে দেয়।

সোফির মা দুপুরের সময় বিশাল এক ভোজের আয়োজন করে তাকে নিচে ডাকার আগ পর্যন্ত সে তার নিজের ঘরেই থাকল। গরুর পেছনের মাংসের স্টেক আর বেক্‌ড পটেটো তৈরি করেছেন তিনি। তাছাড়া ডেজার্ট হিসেবে আছে ক্লাউডবেরি আর ক্রিম।

রাজ্যের সব বিষয় নিয়ে কথা হলো দু'জনের। সোফির মা জানতে চাইলেন সে তার পঞ্চদশ জন্মদিন কীভাবে পালন করতে চায়। আর মাত্র কয়েক হপ্তা পরেই জন্মদিন।

সোফি কাঁধ ঝাঁকাল; যেন বলতে চাইল, কী দরকার!

'তুমি কি কাউকে দাওয়াত দেবে? না, মানে বলতে চাইছি, তুই কি চাস না একটা পার্টি হোক?'

'হয়ত।'

'মার্থা আর অ্যান মেরিকে বলতে পারি আমরা...হেলেনকেও। তাছাড়া জোয়ানাও আছে। জেরেমিকেও ডাকা যেতে পারে। তবে সেটি তুই ঠিক করবি। আমার নিজের এই জন্মদিনটার কথা আমার ভীষণ স্পষ্টভাবে মনে আছে, বুঝলি। মনে হয় এই সেদিন বুঝি। মনে হয়েছিল একেবারে বড় হয়ে গেছি আমি। ব্যাপারটা অদ্ভুত না, সোফি? আমার মনে হয় সেদিনের পর থেকে আমার কোনো পরিবর্তনই হয়নি।'

'হয়নি-ই তো। কিছুই বদলায় না। তুমি স্রেফ বড় হয়েছো, তোমার বয়স বেড়েছে...'

'হুম্...এটা কিন্তু বড়দের মতো কথা বললি। আমার তো ধারণা ব্যাপারটা খুব তাড়াতাড়ি ঘটেছে।'

অ্যা রি স্ট ট ল

৬১৩৫

...এক অতি খুঁতখুঁতে এবং সতর্ক বিন্যাসকারী যিনি আমাদের ধারণাগুলোকে পরিষ্কার করতে চেয়েছেন...

সোফির মা যখন বিকেলে দিবানিদ্রা দিচ্ছেন, সে তখন নিজের গুহায় চলে এলো। গোলাপী খামটার ভেতরে এক মুঠো চিনি রেখে সেটির বাইরে 'প্রতি, অ্যালবার্টো' লিখে দিয়েছে সে।

নতুন কোনো চিঠি আসেনি, কিন্তু খানিক পরেই সোফি কুকুরটার এগিয়ে আসার শব্দ শুনতে পেল।

'হার্মেস!' ডেকে উঠল সোফি। আর ঠিক তার পর মুহূর্তেই কুকুরটা বড়সড় একটা বাদামি খাম মুখে নিয়ে বেড়ার ভেতর দিয়ে পথ করে গুহার ভেতর এসে ঢুকল।

'গুড বয়!' সোফি হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরল কুকুরটাকে, সিন্দুঘোটকের মতো ঘোঁৎঘোঁৎ করছে সেটি, শ্বাস নিচ্ছে জোরে জোরে। চিনির ডেলাসহ গোলাপি খামটা নিয়ে সেটি কুকুরটার মুখে ধরিয়ে দিল সোফি। বুকে ভর দিয়ে বেড়ার ভেতর দিয়ে পথ করে আবার বনের দিকে চলে গেল কুকুরটা।

বেশ একটা উত্তেজনা নিয়ে বড় খামটা খুলল সোফি, সেটিতে কেবিন আর নৌকো সম্বন্ধে কিছু লেখা আছে কিনা সে-কথা ভাবতে ভাবতে।

দেখা গেল, বরাবরের মতোই টাইপ করা কিছু পৃষ্ঠা একটা পেপারক্লিপ দিয়ে আটকান আছে খামটার মধ্যে। তবে সেই সঙ্গে ভেতরে আলাদা একটা কাগজও রয়েছে। তাতে লেখা

প্রিয় মিস গোয়েন্দা, কিংবা, আরও সঠিকভাবে বললে, মিস সিঁদেল চোর, কেসটা এরই মধ্যে পুলিশের হাতে ন্যস্ত করা হয়েছে।

এমনি-ই বললাম। না, আমি রাগ করিনি। দর্শনের ধাঁধাগুলোর উত্তর বের করার জন্যেও যদি তুমি একই রকম কৌতূহলী হও তাহলে বলবো তোমার সেই অ্যাডভেঞ্চারটি সত্যিই বেশ সম্ভাবনাময় ছিল। তবে আমাকে এখন একটু ঝামেলা করে অন্য কোথাও সরে যেতে হবে। তারপরেও, আমার ধারণা, ব্যাপারটার জন্য আমিই দায়ী। আমার জানা উচিত ছিল যে

তুমি সেইসব মানুষের দলে যারা সবসময় কোনো কিছুর শেষ না দেখে সন্তুষ্ট হয় না।

শুভেচ্ছা, অ্যালবার্টো

হাঁফ ছেড়ে বাঁচল সোফি। উনি তাহলে রাগ করেননি। কিন্তু তাঁকে ওখান থেকে অন্যখানে সরে যেতে হবে কেন?

কাগজগুলো নিয়ে সে দৌড়ে উঠে এলো তার ঘরে। তার মা যখন ঘুম থেকে উঠবেন তখন বাড়িতে থাকাটাই বিচক্ষণের কাজ হবে। বিছানায় আয়েস করে শুয়ে অ্যারিস্টটল সম্পর্কে পড়তে শুরু করল সে।

দার্শনিক এবং বৈজ্ঞানিক

প্রিয় সোফি, প্লেটোর ভাবতত্ত্ব সম্পর্কে পড়ার পর তুমি সম্ভবত বেশ আশ্চর্য হয়ে গেছো। কিন্তু এই দলে তুমি একা নও! ব্যাপারটা তুমি পুরোপুরি ধরতে পেরেছো কিনা বা তোমার কোনো সমালোচনামূলক মন্তব্য ছিল কিনা জানি না। কিন্তু যদি থেকে থাকে তাহলে জেনো, একই রকমের সমালোচনা অ্যারিস্টটল-ও (Aristotle, খ্রিস্ট পূর্ব ৩৮৪-৩২২) করে গেছেন। প্রায় বিশ বছর তিনি প্লেটোর একাডেমির একজন ছাত্র ছিলেন।

অ্যারিস্টটল এথেন্সে জন্মগ্রহণ করেননি। তিনি জন্মেছিলেন মেসিডোনিয়ায় এবং প্লেটোর বয়স যখন ৬১ তখন তাঁর একাডেমিতে এসেছিলেন তিনি। অ্যারিস্টটলের বাবা ছিলেন একজন সম্মানিত চিকিৎসক, কাজেই তিনি বিজ্ঞানীও বটে। এই পারিপার্শ্বিক অবস্থা থেকেই অনুমান করা যায় অ্যারিস্টটলের দর্শনের মূল বিষয় কী ছিল। প্রকৃতি পর্যবেক্ষণেই সবচেয়ে বেশি উৎসাহী ছিলেন তিনি। তিনি কেবল গ্রিসের শেষ মহান দার্শনিকই ছিলেন না, ছিলেন ইউরোপের প্রথম মহান জীববিজ্ঞানী।

আরও বেশ খানিকটা এগিয়ে গিয়ে এ-কথা বলা যায় যে শাশ্বত আকার বা 'ভাব' নিয়ে প্লেটো এতোটাই মগ্ন ছিলেন যে প্রকৃতিতে যে-সব পরিবর্তন ঘটে সেদিকে নজর দেয়ার কোনো অবসরই পাননি তিনি বলতে গেলে। অন্যদিকে অ্যারিস্টটল ব্যস্ত থেকেছেন ঠিক এই সব পরিবর্তন নিয়েই, বা যাকে আমরা এখন বলি প্রাকৃতিক ঘটনাবলী তাই নিয়ে।

আরও দুঃসাহসী হয়ে বলা যায় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে থেকেছেন প্লেটো, চারদিকে আমরা যা দেখি সেগুলোর দিকে চোখ তুলে তাকাননি। (গুহা থেকে পালিয়ে গিয়ে শাশ্বত ভাব-জগতে বিচরণ করতে চেয়েছেন তিনি!) অ্যারিস্টটল করেছেন এর ঠিক উল্টো কাজটি। চার হাত পায়ে হামাগুড়ি দিয়ে পর্যবেক্ষণ করে গেছেন ব্যাঙ, মাছ, বায়ু-পরাগী ফুল অ্যানিমন আর পপিফুল।

প্লেটো যেখানে তাঁর প্রজ্ঞা ব্যবহার করেছেন অ্যারিস্টটল সেখানে সেই সঙ্গে তাঁর ইন্দ্রিয়গুলোকেও কাজে লাগিয়েছেন।

দু'জনের মধ্যে বিস্তর ফারাক লক্ষ করি আমরা, তাঁদের লেখার মধ্যে সে-ফারাক

আরও বেশি বৈ কম নয়। প্লেটো ছিলেন কবি এবং পুরাণবিদ। অ্যারিস্টটলের লেখাগুলো বিশ্বকোষের লেখাগুলোর মতো নিরস কিন্তু যথাযথ। অন্যদিকে, তিনি যা লিখেছেন তা লিখেছেন একেবারে সাম্প্রতিক ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণের ওপর ভিত্তি করে।

প্রাচীনকালের নথিপত্র ঘেঁটে দেখা যায়, তিনি সম্ভবত ১৭০টি বই লিখেছিলেন। তার মধ্যে ৪৭টি সংরক্ষণ করা গেছে। এগুলো অবশ্য সম্পূর্ণ বই নয়; এগুলোর বেশির ভাগই লেকচার নোট। তাঁর সময়েও দর্শন ছিল মূলত একটি মৌখিক বা বাচনিক কর্মকাণ্ড।

ইউরোপীয় সংস্কৃতিতে অ্যারিস্টটলের গুরুত্বের আরও একটি বড় কারণ হচ্ছে বিজ্ঞানীরা আজ যে-সব পরিভাষা ব্যবহার করেন সেগুলোও তাঁরই অবদান। তিনি ছিলেন এক মহান বিন্যাসকারী যিনি নানান বিজ্ঞানের ভিত্তি স্থাপন এবং সেগুলোর শ্রেণী বিন্যাস করেছিলেন।

অ্যারিস্টটল যেহেতু সব ধরনের বিজ্ঞানের ওপরই লিখেছেন, আমি কেবল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটির ব্যাপারে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখবো। প্লেটো সম্পর্কে অনেক কথা বলেছি আমি তোমাকে, এখন তাহলে শোনো তাঁর ভাবতত্ত্বকে অ্যারিস্টটল কীভাবে নাকচ করলেন। তারপর আমরা নজর দেবো অ্যারিস্টটল কীভাবে নিজের প্রকৃতিবাদী দর্শন রচনা করলেন সেদিকে, কারণ তাঁর আগের প্রকৃতিবাদী দার্শনিকেরা যা কিছু বলে গেছেন সে-সবের সার-সংক্ষেপ তৈরি করেছেন অ্যারিস্টটল-ই। আমরা দেখবো কী করে তিনি আমাদের ধারণাগুলোর শ্রেণী বিন্যাস করেছেন এবং যুক্তিবিদ্যাকে (Logic) একটি বিজ্ঞান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। আর সবশেষে আমি বলব মানুষ এবং সমাজ সম্পর্কে অ্যারিস্টটলের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে কিছু কথা।

সহজাত ভাব বলতে কিছু নেই

প্লেটো তাঁর আগের দার্শনিকদের মতোই সমস্ত পরিবর্তনের মাঝে শাশ্বত এবং অপরিবর্তনীয়ের সন্ধান করেছেন। এই অনুসন্ধানের ফলস্বরূপ তিনি পেয়েছিলেন নিখুঁত ভাবগুলোকে যা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের চেয়ে উন্নত শ্রেণীর। প্লেটো আরও বিশ্বাস করতেন যে প্রকৃতির সমস্ত কিছুর চেয়ে ভাব বেশি বাস্তবতাসম্পন্ন। 'ভাব' ঘোড়া প্রথমে এসেছে, তারপর এসেছে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের সমস্ত ঘোড়া, সেই গুহার দেয়ালের ছায়াগুলোর মতো নাচতে নাচতে। সমস্ত মুরগি আর ডিমের আগে এসেছে 'ভাব' মুরগি।

অ্যারিস্টটলের কাছে মনে হলো প্লেটো পুরো ব্যাপারটাই একেবারে উল্টে দিয়েছেন। তিনি তাঁর শিক্ষকের সঙ্গে এ-বিষয়ে একমত হলেন যে ঘোড়া 'বয়ে চলে' এবং কোনো ঘোড়া-ই চিরকাল বাঁচে না। তিনি আরো স্বীকার করলেন যে ঘোড়ার প্রকৃত আকার শাশ্বত এবং অপরিবর্তনীয়। কিন্তু 'ভাব' ঘোড়া স্রেফ একটা ধারণা মাত্র, যে-ধারণা আমরা মানুষেরা বেশ কিছু ঘোড়া দেখার পর তৈরি করেছি। অ্যারিস্টটলের ধারণা অনুযায়ী, 'ভাব' বা 'আকার' ঘোড়া তৈরি হয়েছে ঘোড়ার বৈশিষ্ট্যগুলোর সমন্বয়ে আর এর ওপর ভিত্তি করেই আজ আমরা যেটাকে অশ্ব 'প্রজাতি' বলি তার সংজ্ঞা

নির্মিত হয়েছে।

আরও সঠিকভাবে বলতে গেলে 'আকার' ঘোড়া দিয়ে অ্যারিস্টটল সেটিকেই বুঝিয়েছেন যা সব ঘোড়ারই বৈশিষ্ট্য। আর, এখানে কিন্তু জিঞ্জারব্রেড ছাঁচটার উপমা খাটবে না, কারণ, একটি বিশেষ জিঞ্জারব্রেড বিস্কিটের ওপর ছাঁচটার অস্তিত্ব নির্ভর করে না। অ্যারিস্টটল এমন কোনো ছাঁচ বা আকারের অস্তিত্বে বিশ্বাস করতেন না যেগুলো প্রাকৃতিক জগতের বাইরের কোনো জগতে তাদের নিজেদের তাকের ওপর শুয়ে থাকে। উল্টো বরং, অ্যারিস্টটলের বিবেচনায় 'আকার' রয়েছে *বস্তুর* মধ্যেই, কারণ এই আকারগুলোই এ-সব জিনিসের বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

কাজেই অ্যারিস্টটল প্লেটোর সঙ্গে এই বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করলেন যে 'ভাব' মুরগি আসল মুরগির আগে এসেছে। অ্যারিস্টটল যাকে 'ভাব' মুরগি বলেছেন তা মুরগির কিছু নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য হিসেবে প্রতিটি মুরগির মধ্যেই বিদ্যমান, এই যেমন, মুরগি ডিম পাড়ে। কাজেই বাস্তবের মুরগি আর 'ভাব' মুরগি দেহ ও আত্মার মতোই অবিচ্ছেদ্য।

আর এটাই আসলে প্লেটোর ভাবতত্ত্ব সম্পর্কে অ্যারিস্টটলের সমালোচনার সার কথা। চিন্তার জগতে এটি যে একটি অত্যন্ত নাটকীয় একটি বাঁক সে-কথা উপেক্ষা করলে কিন্তু চলবে না। প্লেটোর তত্ত্বে সর্বোচ্চ স্তরের বাস্তবতা হলো তাই যা আমরা আমাদের প্রজ্ঞা দিয়ে ভাবি। ঠিক একইভাবে অ্যারিস্টটলের কাছে সর্বোচ্চ স্তরের বাস্তবতা হলো সেটি যা আমরা আমাদের ইন্দ্রিয়গুলোর সাহায্যে প্রত্যক্ষ করি। প্লেটো মনে করতেন প্রাকৃতিক জগতে আমরা যে-সব জিনিস দেখতে পাই সেগুলো ভাব জগতের সর্বোচ্চ স্তরের বাস্তবতায় অর্থাৎ মানব আত্মায় থাকা জিনিসগুলোর প্রতিবিম্ব ছাড়া কিছু নয়। অ্যারিস্টটল এর বিপরীতটিই বিশ্বাস করতেন মানব আত্মায় যে-সব জিনিস বর্তমান সেগুলো স্রেফ প্রকৃতির নানান বস্তুর প্রতিবিম্ব ছাড়া কিছু নয়। কাজেই প্রকৃতি-ই হচ্ছে বাস্তব জগৎ। অ্যারিস্টটলের মতে, প্লেটো একটি পৌরাণিক বিশ্বের ছবিতে বন্দি হয়ে পড়েছিলেন, যেখানে মানব-কল্পনাকেই ভুল করে বাস্তব জগৎ বলে মনে করা হতো।

অ্যারিস্টটল এই বলে মন্তব্য করেছিলেন যে চেতনায় এমন কোনো কিছু নেই যা পঞ্চেন্দ্রিয় প্রথমে প্রত্যক্ষ করেনি। প্লেটো হলে বলতেন প্রাকৃতিক জগতে এমন কিছু নেই যা প্রথমে ভাব-জগতে ছিল না। অ্যারিস্টটল মনে করতেন এভাবে প্লেটো আসলে 'জিনিসপত্রের সংখ্যা দ্বিগুণ করে ফেলেছিলেন'। একটি ঘোড়াকে তিনি ব্যাখ্যা করতেন 'ভাব' ঘোড়া দিয়ে। কিন্তু সোফি, এটা কী রকম ব্যাখ্যা হলো? 'ভাব ঘোড়াটা কোথা থেকে এলো, আমার প্রশ্ন সেটিই। তাহলে কি একটা তৃতীয় ঘোড়াও থাকতে হয় না, 'ভাব' ঘোড়াটা যার অনুকরণ মাত্র?

অ্যারিস্টটল মনে করতেন আমরা যা দেখেছি এবং শুনেছি সে-সবের মধ্য দিয়েই আমাদের সমস্ত ভাবনা-চিন্তা এবং ধারণা আমাদের চেতনায় প্রবেশ করেছে। কিন্তু সেই সঙ্গে আমাদের রয়েছে প্রজ্ঞার একটি সহজাত শক্তি। প্লেটো যেমনটি মনে করতেন সে-রকম কোনো সহজাত ভাব বা ধারণা আমাদের নেই ঠিকই, কিন্তু ইন্দ্রিয়গত সমস্ত অভিজ্ঞতাকে নানান বিষয় ও শ্রেণী অনুযায়ী বিন্যস্ত করার একটা সহজাত শক্তি আমাদের সবারই আছে। এভাবেই 'পাথর', 'গাছ', 'জীব-জন্তু', এবং 'মানুষ' সংক্রান্ত ধারণার জন্ম হয়। একইভাবে জন্ম হয় 'ঘোড়া', 'গলদা চিংড়ি' আর

'ক্যানারি' সংক্রান্ত ধারণাও।

অ্যারিস্টটল মনে করতেন মানুষ সহজাত প্রজ্ঞার অধিকারী। অন্যদিকে, অ্যারিস্টটল এটাও মনে করতেন যে, প্রজ্ঞাই মানুষের সবচেয়ে চোখে পড়ার মতো বৈশিষ্ট্য। কিন্তু কিছু প্রত্যক্ষ করার আগ পর্যন্ত আমাদের প্রজ্ঞা পুরোপুরি অসার। কাজেই মানুষের কোনো সহজাত 'ভাব' নেই।

জিনিসের আকার সেটির বিশেষ বৈশিষ্ট্য

প্লেটোর ভাবতত্ত্বের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে অ্যারিস্টটল এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে বিভিন্ন পৃথক পৃথক জিনিস দিয়েই বাস্তবতা তৈরি হয় আর এ-সব বিভিন্ন জিনিসই 'আকার' এবং 'সারবস্তু'-র (substance) ঐক্য রক্ষা করে। 'সারবস্তু' হলো একটি জিনিস যা দিয়ে তৈরি তাই, অন্যদিকে 'আকার' হচ্ছে প্রতিটি জিনিসের নির্দিষ্ট সব বৈশিষ্ট্য।

একটি মুরগি হয়ত তোমার সামনে ডানা ঝাপটাচ্ছে, সোফি। মুরগিটা যে ডানা ঝাপটায়, কক্ কক্ করে ডাকে, ডিম পাড়ে, ঠিক এগুলোই মুরগির 'আকার'। কাজেই একটি মুরগির আকার বলতে আমরা এর প্রজাতিটির নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যগুলোর কথা বা অন্য কথায় এটা কী করে তাই বুঝিয়ে থাকি। মুরগিটা যখন মারা যায়, কক্ কক্ করে আর ডাকে না, তখন সেটির 'আকার'-ও বিলুপ্ত হয়। যা থাকে তা হচ্ছে (দুঃখের বিষয় সোফি) স্রেফ মুরগিটার 'সারবস্তু', কিন্তু তখন আর ওটা মুরগি থাকে না।

আগেই বলেছি, সোফি, অ্যারিস্টটল চিন্তিত ছিলেন প্রকৃতিতে ঘটা সমস্ত পরিবর্তন নিয়ে। 'সারবস্তু'-র মধ্যে সব সময়ই একটি নির্দিষ্ট 'আকার'কে পরিণতি দানের সম্ভাবনা থাকে। আমরা বলতে পারি যে, 'সারবস্তু' সব সময় চেষ্টা করে একটি সহজাত সম্ভাবনা অর্জন করার। অ্যারিস্টটলের মতে প্রকৃতির প্রতিটি পরিবর্তনই হলো 'সম্ভাবনা' থেকে 'বাস্তবতায়' সারবস্তুর রূপান্তর।

ঠিক আছে, বুঝিয়ে বলছি, সোফি। এই মজার গল্পটা তোমাকে সাহায্য করতে পারে কিনা দেখো। গ্র্যানিট পাথরের একটা বিশাল টুকরো নিয়ে কাজ করছেন একজন ভাস্কর। আকারহীন পাথরের টুকরোটাকে প্রতিদিন কেটে চলেছেন তিনি। একদিন একটি ছোট্ট ছেলে এসে তাঁকে জিজ্ঞেস করে, 'কী খুঁজছ তুমি ওটার ভেতর?' 'অপেক্ষা করলেই দেখতে পাবে,' ভাস্কর জবাব দেন। কিছুদিন পর ফিরে আসে ছোট্ট বালকটি, ততদিনে ভাস্কর গ্র্যানিট পাথরের টুকরো কেটে চমৎকার একটি ঘোড়ার ভাস্কর্য তৈরি করে ফেলেছেন। অবাক হয়ে সেটির দিকে তাকিয়ে থাকে বালকটি, তারপর ভাস্করের দিকে ঘুরে শুধোয়, 'কী করে জানতে তুমি যে ঘোড়াটা ছিল এখানে?

সত্যি-ই তো, তিনি কী করে জানলেন! এক অর্থে, গ্র্যানিট পাথরের টুকরোটির মধ্যে ভাস্কর ঘোড়ার আকার সত্যিই দেখতে পেয়েছিলেন তার কারণ একটি ঘোড়ার আকৃতিতে গঠিত হওয়ার সম্ভাবনা গ্র্যানিট পাথরের বিশেষ সেই টুকরোটির মধ্যে ছিল। একইভাবে, অ্যারিস্টটল মনে করতেন যে প্রকৃতির প্রতিটি জিনিসেরই একটি বিশেষ

'আকার' ধারণ করার বা অর্জন করার সম্ভাবনা রয়েছে।

সেই মুরগি আর ডিমের প্রসঙ্গে ফিরে যাওয়া যাক। মুরগির ডিমের সম্ভাবনা রয়েছে মুরগি হওয়ার। এ-কথার অর্থ এই নয় যে পৃথিবীতে যত মুরগির ডিম আছে তার সবগুলোই মুরগি হয়, ভাজা ডিম সেদ্ধ ডিম ইত্যাদি হিসেবে সে-সবের অনেকগুলোই সকালে নাশতার টেবিলে চলে যায়, তাদের সম্ভাবনার বাস্তবায়ন না ঘটিয়েই। তবে এ-কথা পানির মতো স্পষ্ট যে মুরগির ডিম হাঁস হতে পারে না। সেই সম্ভাবনা একটি মুরগির ডিমের নেই। কাজেই, একটি জিনিসের 'আকার' যেমন সেটির সম্ভাবনার কথা বলে, তেমনি সেটির সীমাবদ্ধতার কথাও বলে।

অ্যারিস্টটল যখন বিভিন্ন জিনিসের 'সারবস্তু' এবং 'আকারের' কথা বলেন, তখন তিনি কেবল জীবন্ত সত্তার কথা বোঝান না। মুরগির 'আকার' যে-রকম কক্ কক্ করে ডাকা, ডানা ঝাপটানো আর ডিম পাড়া, ঠিক সে-রকম পাথরের 'আকার' হচ্ছে মাটিতে পড়ে যাওয়া। মুরগি যেমন কক্ কক্ না করে থাকতে পারে না, পাথরও তেমনি মাটিতে না পড়ে থাকতে পারে না। তুমি অবশ্য একটা পাথর তুলে নিয়ে অনেক উঁচুতে ছুঁড়ে দিতে পারো, কিন্তু পাথরের স্বভাব যেহেতু মাটিতে পড়া কাজেই তুমি সেটিকে চাঁদে পাঠিয়ে দিতে পারবে না। (এই পরীক্ষাটা করার সময় অবশ্য সাবধানে থাকতে হবে তোমাকে, প্রতিশোধ নেয়ার জন্য পাথরটা সংক্ষিপ্ততম পথ ধরে পৃথিবীতে ফিরে আসতে পারে।)

অন্তিম কারণ

আকার সম্পন্ন সমস্ত সপ্রাণ ও প্রাণহীন জিনিসের কথা ছেড়ে (যে-আকার সে-সব জিনিসের) সম্ভাব্য 'কাজ' (এর কথা বলে) অন্য প্রসঙ্গে যাওয়ার আগে আরেকটা কথা আমাকে বলতেই হচ্ছে যে প্রকৃতিতে কার্য-কারণ (causality) সম্পর্কে একটি অসাধারণ দৃষ্টিভঙ্গি ছিল অ্যারিস্টটলের।

আজ আমরা যখন কোনো কিছুর 'কারণ' (cause) নিয়ে কথা বলি তখন আমরা আসলে এটাই বুঝিয়ে থাকি যে ব্যাপারটা *কীভাবে* ঘটল। জানলার কাচটা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে তার কারণ পিটার সেটি লক্ষ করে একটা ঢিল ছুঁড়েছিল; এক পাটি জুতো তৈরি হয়েছে তার কারণ চর্মকার কয়েক টুকরো চামড়া সেলাই করে এক সঙ্গে জুড়ে দিয়েছেন। কিন্তু অ্যারিস্টটল মনে করতেন পৃথিবীতে বিভিন্ন ধরনের কারণ আছে। সব মিলিয়ে চার ধরনের কারণের কথা বলেছেন তিনি। এ-সব কারণের মধ্যে তিনি 'অন্তিম কারণ' (final cause) বলতে কী বুঝিয়েছেন সেটি বোঝা জরুরি।

জানলার কাচ ভাঙার ঘটনার ক্ষেত্রে এ-কথা জিজ্ঞেস করা খুবই যুক্তিসঙ্গত যে পিটার পাথরটা ছুঁড়েছিল কেন। প্রশ্নটা করে আমরা আসলে জানতে চাইছি, তার উদ্দেশ্য কী ছিল। এ-ব্যাপারে কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না যে জুতো তৈরির ব্যাপারেও উদ্দেশ্য-র একটা ভূমিকা ছিল। কিন্তু প্রকৃতির নিখাদ প্রাণহীন প্রক্রিয়া বা ঘটনাবলীর মধ্যে অ্যারিস্টটল একই ধরনের একটি 'উদ্দেশ্য' নিহিত রয়েছে বলে

ভেবেছেন। একটা উদাহরণ দিচ্ছি তোমায়

বৃষ্টি কেন হয়, সোফি? স্কুলে তুমি জেনে থাকবে যে বৃষ্টি হয় তার কারণ মেঘের জলীয় বাষ্প ঠাণ্ডা এবং ঘনীভূত হয়ে বৃষ্টির ফোঁটায় পরিণত হলে সেগুলো মাধ্যাকর্ষণ শক্তির টানে মাটিতে এসে পড়ে। এ-ব্যাপারে অ্যারিস্টটলও হয়ত দ্বিমত পোষণ করতেন না। কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি এ-কথাটাও জুড়ে দিতেন যে এ-পর্যন্ত তুমি কারণগুলোর মধ্যে তিনটের কথা বলেছো। 'বস্তুগত কারণ' (material cause) হচ্ছে এই যে বাতাস যখন ঠাণ্ডা হয়েছিল ঠিক সেই মুহূর্তে জলীয় বাষ্প উপস্থিত ছিল। 'কুশলী কারণ' (efficient cause) হলো জলীয় বাষ্প ঠাণ্ডা হয়েছে এবং 'আকারগত কারণ' (formal cause) এই যে পানির 'আকার' বা স্বভাব হচ্ছে মাটিতে পড়া। কিন্তু এখানে এসে তুমি থেমে গেলে অ্যারিস্টটল এই কথাটা যোগ করতেন যে বৃষ্টি পড়ে তার কারণ বড় হওয়ার জন্য গাছপালা এবং জীব-জন্তুর পানি দরকার। এটাকেই তিনি বলেছেন 'অন্তিম কারণ'। বৃষ্টির ফোঁটাগুলোকে অ্যারিস্টটল একটি 'উদ্দেশ্য' বরাদ্দ করেছেন।

পুরো ব্যাপারটা উল্টে দিয়ে আমরা এ-কথা বলতে পারি যে গাছপালা বড় হয় তার কারণ তারা জলীয় বাষ্প পায়। তফাৎটা তুমি নিশ্চয়ই ধরতে পারছো, সোফি, তাই না? অ্যারিস্টটল বিশ্বাস করতেন প্রকৃতির প্রতিটি জিনিসের পেছনে একটা উদ্দেশ্য আছে। বৃষ্টি হয়, যাতে গাছপালা বড় হতে পারে। কমলা এবং আঙুর জন্মে, যাতে লোকে তা খেতে পারে।

বর্তমান যুগের বৈজ্ঞানিক কারণ অনুসন্ধানের পদ্ধতি এটা নয়। আমরা বলি যে মানুষ এবং জীব-জন্তুর জীবন-ধারণের জন্য খাদ্য এবং পানি দুটো প্রয়োজনীয় শর্ত। এই শর্ত দুটো পূরণ না হলে আমাদের অস্তিত্ব থাকতো না। কিন্তু তাই বলে আমাদের খাদ্য হওয়াটা পানি কিংবা কমলা লেবুর 'উদ্দেশ্য' নয়।

এই কার্য-কারণ প্রসঙ্গে তাহলে কি অ্যারিস্টটল ভুল করলেন? কিন্তু তড়িঘড়ি করে সে-সিদ্ধান্তে যাওয়া উচিত হবে না। বহু মানুষই এ-কথা বিশ্বাস করে যে পৃথিবীটা যেমন ঠিক তেমন করেই ঈশ্বর এটাকে তৈরি করেছেন যাতে তাঁর সমস্ত প্রাণী এখানে বাস করতে পারে। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখলে স্বাভাবিকভাবেই এ-কথা দাবি করা যেতে পারে যে নদীতে পানি আছে কারণ, বেঁচে থাকার জন্য জীব-জন্তু এবং মানুষের পানি প্রয়োজন। কিন্তু এটাতো *'ঈশ্বরের'* কথা হয়ে গেল। আমাদের কল্যাণের ব্যাপারে বৃষ্টির ফোঁটা বা নদীর পানির কোনো উৎসাহ বা স্বার্থ নেই।

যুক্তিবিদ্যা (Logic)

জগতের নানান জিনিসের মধ্যে আমরা কীভাবে পার্থক্য নির্ণয় করি সে-ব্যাপারে অ্যারিস্টটলের ব্যাখ্যায় 'আকার' এবং 'সারবস্তু'-র মধ্যে তফাৎটির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে।

আমরা যখন বিভিন্ন জিনিসের পার্থক্য বিচার করি তখন আসলে আমরা

সেগুলোকে নানান দল বা শ্রেণীতে বিন্যস্ত করি। প্রথমে একটা ঘোড়া দেখি আমি, তারপর আরেকটা দেখি, তারপর আরেকটা। ঘোড়াগুলো সব যদিও হুবহু এক রকম নয়, কিন্তু সবকটিরই একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য আছে আর এই সাধারণ বৈশিষ্ট্যটিই ঘোড়ার 'আকার'। অন্যদিকে যে-জিনিসটি স্বাতন্ত্র্যসূচক বা বিশেষ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত তা ঘোড়ার 'সারবস্তু'-র অন্তর্ভুক্ত।

তো, এভাবেই আমরা প্রত্যেকটি জিনিস একেকটি খোপে রাখতে শুরু করি। গরুগুলোকে রাখি গোয়ালে, ঘোড়াগুলোকে আস্তাবলে, শুয়োরগুলোকে শুয়োরের খোঁয়াড়ে আর মুরগিগুলোকে মুরগির খোপে। সোফি অ্যামুন্ডসেন যখন তার ঘর গোছায় তখনো ঠিক এই ব্যাপার ঘটে। বইগুলোকে সে রাখে বইয়ের তাকে, স্কুলের বইগুলো স্কুলের ব্যাগে আর ম্যাগাজিনগুলোকে ড্রয়ারে। তারপর সে তার কাপড় চোপড় সুন্দর করে ভাঁজ করে রেখে দেয় ক্লজেটে—এক তাকে অন্তর্বাস, আরেকটাতে সোয়েটারগুলো আর মোজাগুলোকে রাখে সেগুলোর জন্য নির্দিষ্ট একটি ড্রয়ারে। খেয়াল করে দেখো, ঠিক একই ব্যাপার আমরা আমাদের মনের মধ্যেও করি। পাথরের তৈরি জিনিস, উলের তৈরি জিনিস, রাবারের তৈরি জিনিস, এ-সব সহজেই চিনে ফেলি আমরা। বুঝতে পারি বা আলাদা করে চিনতে পারি জীবন্ত বা মৃত জিনিসগুলো, চিনে নিই সবজি, জন্তু বা মানুষ।

বুঝতে পারছো নিশ্চয়ই সোফি? প্রকৃতির 'ঘরের' সবকিছু গুছিয়ে ফেলতে চেয়েছিলেন অ্যারিস্টটল। তিনি দেখতে চেয়েছিলেন যে প্রকৃতির সবকিছুই বিভিন্ন শ্রেণী বা উপশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। (হার্মেস একটি জীবন্ত প্রাণী, আরও নির্দিষ্ট করে বললে একটি স্তন্যপায়ী প্রাণী, আরও নির্দিষ্ট করে বললে একটি কুকুর, আরও নির্দিষ্ট করে বললে একটি ল্যাব্রাডর, আরও নির্দিষ্ট করে বললে একটি মদ্দা ল্যাব্রাডর।)

নিজের ঘরে গিয়ে মেঝে থেকে একটা কিছু, যে-কোনো কিছু, তুলে নাও, সোফি। সেটি যা-ই হোক না কেন, দেখতে পাবে যে তুমি যা ধরে আছো সেটি উচ্চতর একটি শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। যেদিন তুমি এমন কিছু দেখতে পাবে যা তুমি কোনো শ্রেণীতে ফেলতে পারছো না সেদিন কিন্তু তুমি একটা ধাক্কা খাবে। উদাহরণস্বরূপ, একদিন যদি তুমি ছোট্ট একটা না-জানি-কী আবিষ্কার করো এবং বলতে না পারো সেটি প্রাণী, না সবজি না খনিজ, তাহলে কিন্তু আমার মনে হয় না ওটা ধরার সাহস তোমার হবে।

প্রাণী, সবজি আর খনিজের কথা বলতে গিয়ে একটা পার্টি গেম এর কথা মনে পড়ে গেল আমার, এই খেলাটায় চোরকে ঘরের বাইরে পাঠিয়ে দেয়া হয় এবং সে যখন ফিরে আসে তখন তাকে বলতে হয় ঘরের বাকি সবাই কী চিন্তা করছে। সবাই আসলে ঠিক করেছে তারা ফ্লাফি নামের বেড়ালটার কথা ভাববে, বেড়ালটা এখন পাশের বাড়ির বাগানে আছে। ঘরের মধ্যে এসে চোর অনুমান করতে শুরু করে। তার উত্তরে অন্যরা 'হ্যাঁ' অথবা 'না' দিয়ে জবাব দেবে। সে যদি অ্যারিস্টটলের একজন ভালো অনুসারী হয়ে থাকে—তাহলে অবশ্য সে আর চোর থাকবে না—তাহলে খেলাটা অনেকটা এ-রকম হবে বলে ধরে নেয়া যায়

এটা কি নিরেট কোনো কিছু? (হ্যাঁ!) খনিজ? (না!) এটার কি প্রাণ আছে? (হ্যাঁ।) সবজি? (না!) জন্তু? (হ্যাঁ!) এটা কি একটা পাখি? (না!) কোনো স্তন্যপায়ী প্রাণী?

(হ্যাঁ!) এটা কি পুরোটাই একটা প্রাণী? (হ্যাঁ!) এটা কি একটা বেড়াল? (হ্যাঁ!) এটা কি ফ্লাফি? (হ্যাঁ অ্যা সমস্বরে হাসি...)

তো, এই খেলাটা আসলে অ্যারিস্টটলই আবিষ্কার করেছিলেন। প্লেটোকে আমরা দেবো লুকোচুরি খেলা আবিষ্কারের কৃতিত্ব। আর ডেমোক্রিটাসকে তো এরই মধ্যে লেগো আবিষ্কারক হিসেবে ঘোষণাই করা হয়ে গেছে।

অ্যারিস্টটল ছিলেন একজন অতি খুঁতখুঁতে বিন্যাসকারী যিনি আমাদের সব ধারণাকে পরিষ্কার করতে চেয়েছিলেন। সত্যি বলতে কী, তিনিই *যুক্তিবিদ্যা*-র স্রষ্টা। কিছু কার্যকর সিদ্ধান্ত বা প্রমাণের ওপর নির্ভর করে বেশ কিছু সূত্র দাঁড় করিয়ে গেছেন তিনি। একটা উদাহরণ দিলেই পরিষ্কার হয়ে যাবে। প্রথমে যদি আমি প্রমাণ করতে পারি যে 'সমস্ত জীবন্ত প্রাণীই মরণশীল' (প্রথম সূত্র) এবং তারপর প্রমাণ করতে পারি যে 'হার্মেস একটি জীবন্ত প্রাণী' (দ্বিতীয় সূত্র), তাহলে আমি অনায়াসে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারি যে 'হার্মেস মরণশীল।'

এই উদাহরণ থেকে এটা পরিষ্কার যে অ্যারিস্টটলের যুক্তিবিদ্যা বিভিন্ন রাশি বা পদ (term)-এর মধ্যকার সম্পর্কের ওপর ভিত্তি করে স্থাপিত হয়েছে, এই ক্ষেত্রে 'জীবন্ত প্রাণী' এবং 'মরণশীল'। যদিও আমাদেরকে স্বীকার করতে হবে যে ওপরের সিদ্ধান্তটা ১০০ শতাংশ সত্য, কিন্তু সেই সঙ্গে এ-কথাটাও আমরা যোগ করতে পারি যে এটা মোটেই নতুন কিছু জানাচ্ছে না আমাদের। (হার্মেস একটি 'কুকুর' আর সব কুকুরই 'জীবন্ত প্রাণী', যা কিনা মরণশীল, এভারেস্ট পর্বতের পাথরের মতো নয়।) অবশ্যই আমরা সেটি জানতাম, সোফি। কিন্তু বিভিন্ন জিনিসের শ্রেণীর মধ্যকার সম্পর্ক সব সময় এতো স্পষ্ট নয়। মাঝে মধ্যেই আমাদের ধারণাগুলোকে পরিষ্কার করে নেয়ার দরকার হতে পারে।

উদাহরণস্বরূপ প্রশ্ন করা যেতে পারে, ছোট ছোট ইঁদুরের বাচ্চা কি মেষশাবক এবং শুয়োর শাবকের মতোই স্তন্যপান করে? ইঁদুর নিশ্চয়ই ডিম পাড়ে না (নাকি দেখেছি আমরা কখনো কোনো ইঁদুরের ডিম?)। কাজেই বোঝা গেল তারা শুয়োর এবং ভেড়ার মতো জীবন্ত বাচ্চা প্রসব করে। কিন্তু আমরা তাদেরই জন্তু বলি যারা জীবন্ত স্তন্যপায়ী শাবক প্রসব করে—আর স্তন্যপায়ী হচ্ছে সেই ধরনের জন্তু যারা তাদের মায়ের দুধ খায়। এই তো আমরা জায়গামতো পৌঁছে গেছি। উত্তরটা আমাদের ভেতরেই ছিল কিন্তু সেটি আমাদের চিন্তা করে বের করতে হলো। কিছুক্ষণের জন্য আমরা ভুলে গিয়েছিলাম যে ইঁদুরেরা তাদের মায়ের স্তন্য পান করে। ভুলে যাওয়ার কারণ সম্ভবত এই যে আমরা কখনো কোনো বাচ্চা ইঁদুরকে স্তন্যপান করতে দেখিনি, তার কারণটা স্রেফ এই যে ইঁদুরেরা মানুষের উপস্থিতিতে বাচ্চাকে স্তন্য দিতে লজ্জা পায়।

প্রকৃতির স্কেল

অ্যারিস্টটল এই 'গোছগাছ' করতে গিয়ে প্রথমেই দেখিয়েছেন যে প্রাকৃতিক জগতের জিনিসগুলোকে দুটো প্রধান শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। এক দিকে রয়েছে পাথর, পানির

ফোঁটা বা মাটির ডেলার মতো *প্রাণহীন* জিনিস। এ-সব জিনিসের মধ্যে পরিবর্তনের কোনো সম্ভাবনা নেই। অ্যারিস্টটলের মত অনুযায়ী, প্রাণহীন জিনিস বাইরের প্রভাব ছাড়া পরিবর্তিত হতে পারে না। কেবল *জীবন্ত জিনিসগুলো*-রই পরিবর্তনের সম্ভাবনা রয়েছে।

'জীবন্ত জিনিসগুলোকে' অ্যারিস্টটল দুটো ভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করেছেন। তার একটিতে আছে *উদ্ভিদ*, অন্যটিতে প্রাণী। আর সবশেষে, এই 'প্রাণী'গুলোকে আবার দুটো উপশ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে, *জন্তু* এবং *মানুষ*।

এ-কথা তোমাকে স্বীকার করতে হবে যে অ্যারিস্টটলের এই শ্রেণীগুলো স্পষ্ট এবং সরল। প্রাণহীন এবং জীবন্ত জিনিসগুলোর মধ্যে বিশেষ একটা পার্থক্য রয়েছে, উদাহরণস্বরূপ, একটা গোলাপ ফুল আর একটা পাথরের কথা বলা যেতে পারে; ঠিক একইভাবে, একটি উদ্ভিদ এবং একটি পশুর মধ্যেও বিশেষ পার্থক্য রয়েছে, যেমন একটি গোলাপ এবং একটি ঘোড়া। আমি এ-ও বলবো যে ঘোড়া এবং মানুষের মধ্যেও যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, এই পার্থক্যটা ঠিক কী? বলতে পারো আমাকে?

দুর্ভাগ্যবশত, উত্তরটা লিখে সেটি এক মুঠো চিনির সঙ্গে একটা খামের মধ্যে তোমার পুরে দেয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করার সময় নেই আমার, কাজেই জবাবটা আমি নিজেই দিচ্ছি। অ্যারিস্টটল যখন প্রাকৃতিক জিনিসগুলোকে শ্রেণীবিন্যাস করেন তখন তাঁর মাপকাঠি বা মানদণ্ড হলো সেই জিনিসটির বৈশিষ্ট্যসমূহ, বা আরও সঠিকভাবে বললে সেটি কী করতে পারে বা করে।

যেসব জিনিসের প্রাণ আছে (যেমন উদ্ভিদ, জীব-জন্তু, মানুষ) তারা পুষ্টিগ্রহণ করতে পারে, বেড়ে উঠতে পারে এবং নিজেদের সংখ্যাবৃদ্ধি করতে পারে। সমস্ত জীবন্ত প্রাণী (জীব-জন্তু এবং মানুষ) আরও একটি বাড়তি গুণের অধিকারী আর সেটি হলো তারা তাদের চারপাশের জগৎ প্রত্যক্ষ করতে পারে অর্থাৎ সেটি সম্পর্কে সচেতন হতে পারে এবং ঘুরে ফিরে বেড়াতে পারে। তাছাড়া, সব মানুষের চিন্তা-ভাবনা করার ক্ষমতা রয়েছে, বা অন্যভাবে বললে, তারা তাদের উপলব্ধিকে বিভিন্ন দল এবং শ্রেণীতে বিন্যস্ত করতে পারে।

কাজেই বোঝা যাচ্ছে, প্রাকৃতিক জগতে আসলে সে-রকম কোনো স্পষ্ট বিভাজন রেখা বা সীমানা নেই। সামান্য ঝোপঝাড় থেকে আরও জটিল গাছপালা, ছোট ছোট জন্তু-জানোয়ার থেকে শুরু করে আরও বড় বড় জটিল ধরনের প্রাণীর দিকে একটা পর্যায়ক্রমিক রূপান্তর লক্ষ করি আমরা। এই 'স্কেলের একেবারে ওপরে রয়েছে মানুষ, অ্যারিস্টটলের মতে যারা প্রকৃতির পুরো জীবনটি উপভোগ করে। মানুষ গাছপালার মতোই জন্মায় এবং পুষ্টিগ্রহণ করে, তার কিছু বিশেষ বিশেষ আবেগ-অনুভূতি থাকে, জীব-জন্তুর মতো সে চলাফেরা করে বেড়াতে পারে, কিন্তু সেই সঙ্গে মানুষ হিসেবে আবার তার একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে আর সেটি হলো যুক্তিসঙ্গতভাবে চিন্তা করার ক্ষমতা।

সুতরাং বলা যায়, মানুষের মধ্যে ঐশ্বরিক প্রজ্ঞার একটি স্ফুলিঙ্গ রয়েছে, সোফি। হ্যাঁ, 'ঐশ্বরিক' কথাটা আমি সচেতনভাবেই বলেছি। কারণ, কিছুক্ষণ পরপরই

অ্যারিস্টটল আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছেন যে ঈশ্বর নামের একজন অবশ্যই আছেন যিনি প্রাকৃতিক জগতের সমস্ত কার্যক্রম শুরু করেছেন। কাজেই প্রকৃতির 'স্কেল'-এ সবচেয়ে ওপরেই ঈশ্বরের স্থান।

অ্যারিস্টটল মনে করতেন গ্রহ এবং নক্ষত্রের গতিই পৃথিবীর যাবতীয় গতি বা ক্রিয়া-কর্ম নিয়ন্ত্রণ করে। কিন্তু একটা কিছু নিশ্চয়ই আছে যা আবার এ-সব গ্রহ-নক্ষত্রের গতি নিয়ন্ত্রণ করে। এই 'একটা কিছু'কেই অ্যারিস্টটল বলেছেন 'আদি চালক' (first mover) বা 'ঈশ্বর'। 'আদি চালক' নিজে কিন্তু স্থির, কিন্তু এটাই গ্রহ-নক্ষত্রের তথা প্রকৃতির সমস্ত গতির 'আকারগত কারণ' (formal cause)।

নীতিবিদ্যা

আবার মানুষের প্রসঙ্গে যাওয়া যাক, সোফি। অ্যারিস্টটলের মতে, মানুষের 'আকার' আত্মা দিয়ে গঠিত, যে-আত্মার রয়েছে একটি উদ্ভিদ-সদৃশ অংশ, একটি প্রাণী-অংশ আর একটি বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন (rational) অংশ। তো, এবার তাঁর প্রশ্ন আমরা কীভাবে জীবনযাপন করবো? একটি সুন্দর জীবনযাপন করার জন্য কী প্রয়োজন? আবার তাঁরই উত্তর মানুষ তার সমস্ত সামর্থ্য এবং যোগ্যতার পূর্ণ ব্যবহার করেই কেবল সুখী হতে পারে।

অ্যারিস্টটল মনে করতেন সুখ তিন ধরনের। প্রথম ধরনের সুখ হচ্ছে আনন্দ এবং উপভোগের জীবন। দ্বিতীয় রকমের সুখ হচ্ছে মুক্ত এবং দায়িত্ববান নাগরিকের জীবন আর তৃতীয় ধরনের সুখ হচ্ছে একজন চিন্তাবিদ ও দার্শনিকের জীবন।

কেউ যদি সুখ এবং পরিপূর্ণতা পেতে চায় তাহলে, অ্যারিস্টটলের মতে, তার জীবনে একই সঙ্গে এই তিন ধরনের সুখই থাকতে হবে। তাঁর কাছে কোনো ধরনের ভারসাম্যহীনতার প্রশ্রয় নেই। তিনি যদি এখন জীবিত থাকতেন তাহলে হয়ত বলতেন যে যে-লোক শুধু তার শরীরটির উন্নতিসাধন করে সে ঠিক তার মতোই ভারসাম্যহীন যে কেবল তার মাথাকেই ব্যবহার করে। পুরোপুরি একপেশে এই দুই ধরনের জীবনই বিকৃত জীবন।

মানবসম্পর্কের বেলাতেও একই কথা খাটে। আর এখানে অ্যারিস্টটল 'মধ্য পন্থাই শ্রেষ্ঠ পন্থা' (golden mean), এই নীতির সমর্থক। আমরা যেন ভীরু-ও না হই, দুঃসাহসীও না হই, বরং হই যেন সাহসী (সাহস খুব কম থাকাই ভীরুতা, খুব বেশি থাকাটা দুঃসাহসিকতা), কৃপণও না হই আবার অপব্যয়ীও না হই, বরং উদার হই (যথেষ্ট উদার না হওয়াই কৃপণতা, আবার বেশি উদার হওয়া অপব্যয়িতা)। খাওয়া-দাওয়ার বেলাতেও একই কথা প্রযোজ্য। খুব কম খাওয়াটাও বিপজ্জনক, বেশি খাওয়াটাও তাই। প্লেটো এবং অ্যারিস্টটল দু'জনের নীতিশাস্ত্রই গ্রিসের চিকিৎসাশাস্ত্রের প্রতিধ্বনিস্বরূপ কেবল সুষমতা এবং মিতাচার অভ্যাস করার মাধ্যমেই আমি একটি সুখী বা 'সুসামঞ্জস্যপূর্ণ' জীবন লাভ করবো।

রাজনীতি

চরমপন্থার চর্চা যে কাম্য নয় সে-কথা অ্যারিস্টটল সমাজের প্রতি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিতেও প্রকাশ করেছেন। তাঁর কথা হচ্ছে মানুষ স্বভাবতই একটি 'রাজনৈতিক প্রাণী'। তিনি দাবি করেছেন, আমাদের চারপাশের সমাজ ছাড়া আমরা সত্যিকার অর্থে মানুষ নই। তিনি মন্তব্য করেছেন যে খাদ্য, আন্তরিকতা, বিয়ে এবং সন্তান-লালন পালন, আমাদের এ-সব প্রাথমিক চাহিদা পূরণ করে পরিবার এবং গ্রাম। তবে মানব সম্পর্কের চূড়ান্ত রূপ পাওয়া যাবে কেবল রাষ্ট্রের মধ্যে।

এই সূত্র ধরেই প্রশ্ন আসে রাষ্ট্র কীভাবে গঠিত হবে? (প্লেটোর 'দার্শনিক রাষ্ট্র'-র কথা মনে আছে তোমার নিশ্চয়ই?) অ্যারিস্টটল তিনটি ভালো শাসনব্যবস্থার কথা বলে গেছেন। প্রথমটি হচ্ছে *রাজতন্ত্র* (monarchy/kingship), যার অর্থ রাষ্ট্রের মাথা থাকবে একজনই। এ-ধরনের শাসনব্যবস্থা কেবল ততক্ষণই ভালো থাকতে পারে যতক্ষণ তা 'স্বৈরতন্ত্র'-তে পরিণত না হয়, অর্থাৎ এমন একটি অবস্থায় রূপ না নেয় যেখানে একজন শাসক তার নিজের স্বার্থ পূরণের জন্য রাষ্ট্র পরিচালনা করে। আরেকটি ভালো শাসনব্যবস্থা হলো *অভিজাততন্ত্র* (aristocracy), যেখানে একটি বড় বা ছোট শাসকগোষ্ঠী রাষ্ট্র পরিচালনা করে। এই শাসনব্যবস্থাকে খেয়াল রাখতে হয় যেন তা 'গোষ্ঠীতন্ত্র' (oligarchy) বা মুষ্টিমেয় কিছু লোকের শাসনব্যবস্থায় পরিণত না হয়। এই গোষ্ঠীতন্ত্রের একটি উদাহরণ হলো জানটা বা হুনটা (junta) বা সামরিক শাসকচক্র। তৃতীয় ভালো শাসনব্যবস্থাকে অ্যারিস্টটল বলেছেন পলিটি (polity), যার অর্থ গণতন্ত্র। কিন্তু এই শাসনব্যবস্থারও নেতিবাচক দিক আছে। এটি খুব তাড়াতাড়ি জনতার শাসনে পরিণত হতে পারে। (খোদ স্বৈরতন্ত্রী হিটলার যদি জার্মানির রাষ্ট্রপ্রধান না-ও হতেন, তারপরেও তার অধীনস্থ নাৎসিরাই ভয়ঙ্কর এক জনতার শাসন কায়েম করতে পারত।)

নারীর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি

সবশেষে নজর দেয়া যাক নারীর প্রতি অ্যারিস্টটলের দৃষ্টিভঙ্গির দিকে। দুর্ভাগ্যক্রমে তা প্লেটোর মতো ইতিবাচক ছিল না। অ্যারিস্টটল বরং এ-কথা বিশ্বাস করতেই আগ্রহী ছিলেন যে নারীরা এক অর্থে অসম্পূর্ণ মানুষ। নারী হচ্ছে অসমাপ্ত পুরুষ। অ্যারিস্টটলের মতে, বংশবৃদ্ধির ক্ষেত্রে নারী নিষ্ক্রিয় এবং গ্রহীতা, অন্যদিকে পুরুষ সক্রিয় এবং সৃজনশীল, কারণ, শিশু কেবল পুরুষের বৈশিষ্ট্য লাভ করে। তিনি বিশ্বাস করতেন যে শিশুর সমস্ত বৈশিষ্ট্যই নিহিত থাকে পুরুষের শুক্রাণুর ভেতর। নারী হচ্ছে মাটি, তা বীজ গ্রহণ করে এবং সেই বীজ থেকেই চারা গজায়, অন্যদিকে পুরুষ হচ্ছে 'বীজ বপনকারী'। অথবা, অ্যারিস্টটলের ভাষায় বললে, পুরুষ দেয় 'আকার' এবং নারী প্রদান করে 'সারবস্তু'। অন্য সব দিক দিয়ে এতো বুদ্ধিমান এবং বিচক্ষণ একজন মানুষ যে নর-নারীর সম্পর্কের ব্যাপারে এমন ভুল করতে পারেন তা একই সঙ্গে

আশ্চর্যজনক এবং অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। কিন্তু এ-থেকে দুটো জিনিস প্রমাণিত হয়; প্রথমত, অ্যারিস্টটলের সম্ভবত নারী এবং শিশুর জীবনধারা সম্পর্কে খুব বেশি বাস্তব অভিজ্ঞতা ছিল না; দ্বিতীয়ত, দর্শন এবং বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে পুরুষকে একচ্ছত্র আধিপত্য দেয়া হলে কী প্রমাদ ঘটতে পারে সেটিও সহজে অনুমান করা যায়।

নর-নারী সম্পর্কে অ্যারিস্টটলের ভ্রান্তিপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি আরও বেশি মারাত্মক হয়ে দাঁড়িয়েছিল তার কারণ তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিরই একচ্ছত্র আধিপত্য ছিল পুরো মধ্যযুগ ধরে, প্লেটোর নয়। এভাবেই গির্জা নারী সম্পর্কে এমন একটি দৃষ্টিভঙ্গি লাভ করে যা বাইবেলের সঙ্গে আদৌ সঙ্গতিপূর্ণ নয়। যীশু নিশ্চয়ই নারীবিদ্বেষী ছিলেন না।

আজ এ-পর্যন্তই। তবে আবার কথা হবে আমাদের।

অ্যারিস্টটলের ওপর লেখা অনুচ্ছেদটা বার দেড়েক পড়া হয়ে যাওয়ার পর সেটিকে বাদামি খামের মধ্যে পুরে শূন্যের দিকে তাকিয়ে বসে রইল, সোফি। তার চারপাশের অগোছালো অবস্থা সম্পর্কে হঠাৎই সচেতন হয়ে উঠল সে। বইপত্তর আর রিং বাইন্ডারগুলো মেঝেতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। মোজা, সোয়েটার, টাইট্‌স্ আর জিন্সের প্যান্টের অর্ধেকটাই বেরিয়ে আছে ক্লজেট থেকে। রাইটিং ডেস্কটার সামনে যে-চেয়ারটি সেটির ওপর স্তূপ হয়ে আছে ময়লা জামা-কাপড়।

সবকিছু গোছগাছ করে ফেলবার ভীষণ একটা তাড়া অনুভব করল সোফি। প্রথমেই সে ক্লজেট থেকে সব কাপড়-চোপড় বের করে এনে মেঝেতে রাখল। একেবারে গোড়া থেকেই শুরু করা ভালো। তো, এরপর সে তার কাপড়-চোপড় খুব সুন্দরভাবে ভাঁজ করে সেগুলো তাকের ওপর সাজিয়ে রাখতে শুরু করল। সাতটা তাক রয়েছে ক্লজেটে। একটা অন্তর্বাসের জন্য, একটা মোজা আর টাইট্‌স্-এর জন্য আর একটি জিন্সের প্যান্টের জন্য। প্রত্যেকটা তাক ধীরে ধীরে ভরে ফেলল সে। কোথায় কোনটা রাখতে হবে সে-ব্যাপারে কোনো চিন্তা করতে হলো না তাকে। নিচের তাকটাতে রাখা প্লাস্টিকের একটা ব্যাগে চলে গেল ময়লা কাপড়-চোপড়গুলো। তবে একটা জিনিস নিয়ে আসলেই সমস্যায় পড়তে হলো তাকে আর সেটি হচ্ছে হাঁটু পর্যন্ত লম্বা সাদা একটা মোজা। সমস্যাটা হচ্ছে জোড়ার দ্বিতীয়টা পাওয়া যাচ্ছে না। তারচেয়ে বড় কথা, মোজাটা সোফির-ই নয় আদৌ।

ভালো করে ওটা পরীক্ষা করে দেখল সোফি। মালিককে শনাক্ত করার মতো কিছুই পেল না সে, কিন্তু একজনের ব্যাপারে প্রবল সন্দেহ হলো তার। সবচেয়ে ওপরের তাকটায়, যেখানে লেগো, ভিডিও ক্যাসেট আর লাল স্কার্ফটা আছে সেখানে ওটা ছুঁড়ে দিল সে।

এরপর মেঝের দিকে নজর দিল সে। বই-পত্তর, রিং-বাইন্ডার, ম্যাগাজিন আর পোস্টার, এগুলো সব আলাদা করে ফেলল সে, দর্শনের শিক্ষক অ্যারিস্টটলের ওপর লেখা চ্যাপ্টারে যেভাবে বর্ণনা দিয়েছেন ঠিক সেভাবে। খালি একটা রিং বাইন্ডার আর একটা হোল পাঞ্চ খুঁজে বার করল সে, পাতাগুলোতে ফুটো করল, তারপর রিং বাইন্ডারে সেগুলো আটকে রাখল। এটাও ঠাঁই পেল সবচেয়ে ওপরের তাকটায়। পরে কোনো একসময় গুহা থেকে বিস্কিটের টিনটা এনে রাখতে হবে তাকে।

এখন থেকে পরিপাটিভাবে সাজানো থাকবে জিনিসগুলো। আর সেটি যে কেবল তার ঘরের বেলাতেই প্রযোজ্য তা নয়। অ্যারিস্টটল সম্পর্কে পড়ার পর সে বুঝতে পেরেছে তার ধ্যান-ধারণাগুলোকে সুন্দরভাবে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখাটাও সমান জরুরি একটা কাজ। সবচেয়ে ওপরের তাকটায় যে-সব জিনিস আছে সে-ধরনের জিনিসের জন্যেই তাকটা বরাদ্দ রেখেছে সে। ঘরের এই একটা জায়গার ওপরই কেবল এখনো তার কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই।

প্রায় দু'ঘন্টা কোনো সাড়াশব্দ নেই তার মায়ের। নিচে নেমে এলো সোফি। তাঁকে ঘুম থেকে জাগানোর আগে সে তার পোষা প্রাণীগুলোকে খাবার খাওয়াবে বলে ঠিক করল।

রান্নাঘরে গিয়ে গোল্ডফিশের গামলাটার ওপর ঝুঁকে পড়ল সে। একটা মাছ কালো, একটা কমলা আর একটা লাল-সাদা। এই জন্যই সে এগুলোর নাম দিয়েছে ব্ল্যাক জ্যাক, গোল্ডটপ আর রেড রাইডিংহুড।

পানিতে মাছের খাবার ছড়িয়ে দিতে দিতে সে বলল

'তোরা পড়েছিস প্রকৃতির জীবন্ত প্রাণীগুলোর মধ্যে, তোরা খাদ্য আর পুষ্টি নিতে পারিস, বড় হতে পারিস, আবার নিজেদের বংশবৃদ্ধি করতে পারিস। আরও ঠিকমতো বললে, তোরা আসলে জীব-জগতের মধ্যে পড়েছিস। অর্থাৎ তোরা এদিক-সেদিক ঘুরে বেড়াতে পারিস, জগৎটার দিকে চোখ মেলে তাকাতে পারিস। সংক্ষেপে বললে, তোরা হচ্ছিস মাছ, তোরা তোদের কানকো দিয়ে শ্বাস-প্রশ্বাসের কাজ চালাস, 'জীবনদায়ী' পানির মধ্যে সাঁতার কেটে ঘুরে ফিরে বেড়াতে পারিস।'

মাছের খাবারের কৌটোটার ঢাকনা বন্ধ করে দিল সোফি। প্রকৃতির স্কেলে যেভাবে সে গোল্ডফিশকে রাখল তাতে বেশ সন্তুষ্ট হলো সে নিজেই। বিশেষ করে সে খুশি হলো 'জীবনদায়ী পানি' কথাটার জন্য। তো, এবার বাজারিগার দুটোর পালা।

খানিকটা বার্ডসিড ওদের খাওয়ার কাপটায় ঢেলে দিয়ে সোফি বলে উঠল 'প্রিয় স্মিট আর স্মিউল, তোরা দুই ছোট্ট সোনামণি বাজারিগার হয়েছিস তার কারণ ছোট্ট দুটো সুন্দর বাজারিগারের ডিম থেকে জন্মেছিস তোরা আর এই ডিমগুলোর বাজারিগার হওয়ার সম্ভাবনা ছিল বলেই বরাতজোরে তোরা কর্কশ গলা কাকাতুয়া হোসনি।'

এরপর সোফি গেল বড় বাথরুমটায়, সেখানে বড়সড় একটা বাক্সের মধ্যে শুয়ে আছে কুঁড়ে কচ্ছপটা। সোফির মা গোসল করার সময় প্রায়ই এই বলে চেঁচিয়ে ওঠেন যে একদিন ওটাকে মেরে ফেলবেন তিনি। কিন্তু এ-পর্যন্ত সেটি একটি অসার হুমকি বলেই প্রমাণিত হয়েছে। একটা জ্যামের জার থেকে সোফি একটা লেটুস পাতা ছিঁড়ে নিয়ে বাক্সের মধ্যে রেখে দিল।

'গোবিন্দ সোনা,' সে বলল, 'তুই হয়ত তীরবেগে ছুটতে পারিস না, কিন্তু আমরা যে বিশাল জগৎটাতে বাস করি তার একটা ছোট্ট অংশকে তুই ঠিকই দেখতে, শুনতে আর বুঝতে পারিস। তবে একটা কথা জেনে তুই সন্তুষ্ট থাকতে পারিস যে তুই ছাড়াও আরও অনেকেই আছে যারা তাদের নিজেদের সীমা অতিক্রম করতে পারে না।'

শিয়ার্কান নিশ্চয়ই ইঁদুর ধরতে বেরিয়েছে, শত হলেও সেটিই বেড়ালের স্বভাব। সোফি তার মায়ের ঘরে যাওয়ার জন্য বসার ঘরটা পেরিয়ে এলো। কফি টেবিলের

ওপর ফুলদানিতে এক গোছা ড্যাফোডিল রাখা। মনে হলো যেন, সোফি যাওয়ার সময় হলুদ ফুলগুলো ঝুঁকে তাকে কুর্নিশ করল। মুহূর্তের জন্য থেমে দাঁড়িয়ে সেগুলোর মসৃণ চুড়োয় আলতো করে আঙুল রাখল সে। বলল, 'প্রকৃতির জীবন্ত অংশে তোরাও আছিস। সত্যি বলতে কী, যে-ফুলদানিটায় তোরা আছিস সেটির চেয়ে অনেক ভাগ্যবান তোরা। তবে দুর্ভাগ্যবশত সে-কথা উপলব্ধি করার মতো ক্ষমতা তোদের নেই।'

এরপর সোফি পা টিপে টিপে ঢুকল গিয়ে তার মায়ের শোবার ঘরে। তার মা যদিও গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন, তারপরেও তাঁর কপালে একটা হাত রাখল সোফি।

সে বলল, 'তুমিই হচ্ছো সবচেয়ে সৌভাগ্যবানদের মধ্যে একজন। কারণ মাঠের লিলি ফুলগুলোর মতো তুমি কেবল জীবন্তই নও। এবং শিয়ার্কান আর গোবিন্দ-র মতো তুমি কেবল একটি জীবন্ত প্রাণীই নও। তুমি একজন মানুষ, ফলে তোমার রয়েছে চিন্তা-ভাবনা করার শক্তি।'

'কী ঘোড়ার ডিম বলছিস এ-সব, সোফি '

তার মা অন্যান্য দিনের চাইতে আগে উঠে পড়েছেন।

'আমি শুধু এটাই বলছিলাম যে তোমাকে দেখতে একেবারে একটা কুঁড়ে কচ্ছপের মতো লাগছে। যাই হোক, তোমার অবগতির জন্য জানাচ্ছি, আমি আমার ঘরটা একেবারে দার্শনিক পুঙ্খানুপুঙ্খতায় গুছিয়ে ফেলেছি।'

সোফির মা মাথা তুললেন।

'এক্ষুণি আসছি আমি,' বললেন তিনি। 'তুই একটু কফির পানিটা চাপিয়ে দিবি?'

তাকে যা বলা হলো তাই করল সোফি, একটু পরেই দেখা গেল দু'জনে কফি জ্যুস আর চকোলেট সামনে নিয়ে রান্নাঘরে বসে পড়েছে।

হঠাৎ করেই সোফি জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কি কখনো ভেবে দেখেছো, মা, আমরা কেন বেঁচে আছি?'

'ফের শুরু করলি?'

'করলাম, তার কারণ এখন আমি উত্তরটা জানি। এই গ্রহে লোকজন বেঁচে থাকে যাতে তারা ঘুরে ঘুরে প্রত্যেকটা জিনিসের একটা করে নাম দিতে পারে।'

'তাই বুঝি? সে কথা তো মনে হয়নি কখনো।'

'সেক্ষেত্রে তোমার মধ্যে বড়সড় একটা সমস্যা রয়েছে, কারণ মানুষ হচ্ছে চিন্তাশীল প্রাণী। যদি চিন্তা-ভাবনা না করো তাহলে বলতে হবে তুমি ঠিক মানুষ নও।'

'সোফি!'

'একবার ভাবো তো, শুধু যদি শাক-সবজি আর জীব-জন্তু থাকত তাহলে কী হতো? 'বিড়াল' আর 'কুকুর' বা 'লিলি ফুল' আর 'গুজবেরি'-র মধ্যে তফাৎ কী সেটি বলে দেবার মতো কেউ থাকতো না। শাক-সবজি আর জীব-জন্তুও জীবন্ত, কিন্তু আমরাই হচ্ছি একমাত্র প্রাণী যারা প্রকৃতিকে নানান দল আর শ্রেণীতে ভাগ করতে পারি।'

'তোর মতো এমন অদ্ভুত মেয়ে আমি আর একটাও দেখিনি,' সোফির মা বললেন।

'আমিও তাই মনে করি, প্রত্যেকেই কম-বেশি অদ্ভুত। আমি একজন ব্যক্তি,

কাজেই আমি কম-বেশি অদ্ভুত। তোমার মেয়ে আছে সাকুল্যে একটি, কাজেই আমি সবচেয়ে অদ্ভুত।'

'আমি আসলে বলতে চেয়েছি যে তোর এ-সব নতুন নতুন কথা শুনে ভয়ে আমার হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে আসছে।'

'তার মানে তুমি খুব সহজেই ভয় পাও।'

পরে, সেদিনই বিকেলবেলা সোফি তার গুহায় গেল। তার মায়ের নজর এড়িয়েই বিস্কিটের টিনটা চুপিচুপি নিজের ঘরে পাচার করে দিতে সক্ষম হলো সে।

প্রথমে সে সবকটা পাতা ঠিকমতো সাজাল। তারপর সেগুলোর গায়ে ছিদ্র করে রেখে দিল রিং বাইন্ডারে, অ্যারিস্টটলের ওপর লেখা চ্যাপ্টার আগে। সবশেষে প্রতি পৃষ্ঠার ওপরের ডান কোনায় নম্বর বসাল সে। সব মিলিয়ে পঞ্চাশ পৃষ্ঠা হয়েছে। সোফি দর্শনের ওপর তার নিজের বই সংকলনে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। বইটা তার লেখা নয় ঠিকই, তবে বিশেষভাবে তার জন্যই লেখা।

সোমবারের হোমওয়ার্ক করার আর সময় রইল না তার হাতে। সম্ভবত 'ধর্মীয় জ্ঞান'-এর ওপর একটা পরীক্ষা দিতে হবে তাদের, তবে তার শিক্ষক সব সময়ই বলেন যে তিনি ব্যক্তিগত কমিটমেন্ট আর মূল্যবোধকে গুরুত্ব দেন। সোফির মনে হলো এই দুক্ষেত্রেই খানিকটা ভিত্তি তৈরি হয়েছে তার মধ্যে।

হে লে নি জ ম

৩৩৫

...আগুনের একটা স্ফুলিঙ্গ...

দর্শন শিক্ষক যদিও তাঁর চিঠিগুলো সেই পুরনো বেড়ার ওখানে পাঠাতে শুরু করেছেন তারপরেও সোমবার সকালবেলা সোফি নেহাত অভ্যাসবশেই উঁকি দিল ডাকবাক্সটায়।

সেটি খালি দেখে অবাক হলো না সোফি। ক্লোভার ক্লোজ ধরে হাঁটতে শুরু করল সে।

হঠাৎ করে, ফুটপাতের ওপর একটা ছবি পড়ে থাকতে দেখল সে। একটা সাদা জিপ আর ইউএন লেখা নীল একটা পতাকার ছবি। ওটা জাতিসংঘের পতাকা না?

ছবিটা উল্টে সোফি দেখতে পেল ওটা একটা সাধারণ পোস্টকার্ড। প্রতি, 'হিল্ডা মোলার ন্যাগ, প্রযত্নে সোফি অ্যামুন্ডসেন ' পোস্টকার্ডটার ওপর একটা নরওয়েজীয় ডাকটিকিট আর 'ইউএন ব্যাটালিয়ন' শুক্রবার জুন ১৫, ১৯৯০ পোস্টমার্ক দেয়া আছে।

১৫ জুন! সেটি তো সোফির জন্মদিন!

কার্ডটাতে লেখা

প্রিয় হিল্ডা, আন্দাজ করছি এখনো তুই তোর জন্মদিন পালন করে চলেছিস। নাকি তার পরের দিনের সকাল এখন? সে যাই হোক, তাতে তোর উপহারের কোনো তারতম্য হচ্ছে না। এক অর্থে, ওটা সারা জীবনই তোর কাজে লাগবে। তবে আমি তোকে আরও একবার তোর জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানাতে চাই। এখন হয়ত তুই বুঝতে পারছিস কেন আমি সোফির কাছে কার্ডগুলো পাঠাই। আমি জানি ওগুলো সে ঠিকই তোর কাছে পৌঁছে দেবে।

পুনশ্চ : মা বলল তুই তোর ওয়ালেটটা হারিয়ে ফেলেছিস। ঠিক আছে, কথা দিচ্ছি, তোর হারানো ১৫০ ক্রাউন আমি-ই দিয়ে দেবো। গ্রীষ্মের ছুটির আগে স্কুলের আরেকটা পরিচয়পত্র পেতে বোধকরি তোর অসুবিধা হবে না। ভালোবাসা নিস, বাবা।

নিজের জায়গায় একেবারে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সোফি। আগের কার্ডটায় কত তারিখের পোস্টমার্ক ছিল? তার যেন মনে হলো বীচ-এর সেই পোস্টকার্ডটাতেও জুন

মাসের পোস্টমার্ক ছিল, যদিও জুন আসতে তখনো এক মাস দেরি। আসলে সে ঠিকমতো খেয়াল করেনি।

ঘড়ির দিকে একবার তাকাল সে, তারপর ছুটে চলে এলো নিজের ঘরে। হিল্ডাকে পাঠানো প্রথম পোস্টকার্ডটা লাল রেশমি স্কার্ফের নিচে পেল সে। ঠিক। এটাতেও জুন ১৫-রই পোস্টমার্ক দেয়া! যে-দিনটা সোফির জন্মদিন এবং তার গ্রীষ্মের ছুটির আগের দিন।

জোয়ানার সঙ্গে সুপারমার্কেটে দেখা করার জন্য ছোটার সময় ঝড় বয়ে যাচ্ছিল তার মনে।

কে এই হিল্ডা? তার বাবা কী করে এটা ধরেই নিলেন যে সোফি তাকে খুঁজে পাবে? সে যাই হোক, কার্ডগুলো সরাসরি নিজের মেয়ের কাছে না পাঠিয়ে সোফির কাছে পাঠিয়ে তিনি কোনো কাজের কাজ করেননি। এর কারণ নিশ্চয়ই এই নয় যে তিনি তাঁর মেয়ের ঠিকানা জানেন না। এটা কি কোনো প্র্যাকটিকাল জোক? নাকি পুরোপুরি অপরিচিত একজনকে একই সঙ্গে গোয়েন্দা আর ডাকপিয়নের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে দিয়ে তিনি তাঁর মেয়েকে একটা সারপ্রাইজ দিতে চান? সেই জন্যই কি এক মাসের একটা সুযোগ দেয়া হচ্ছে তাকে? এবং তার মেয়েকে জন্মদিনের উপহার হিসেবে একটি নতুন বন্ধু দেবার জন্য তিনি কি তাকে এক ধরনের মধ্যস্থতাকারী হিসেবে ব্যবহার করছেন? সে কি এমন একটা উপহার হতে পারে যা 'সারাজীবন টিকবে'?

এই জোকারটি যদি সত্যিই লেবাননে থেকে থাকে তাহলে সে কী করে তার ঠিকানা জোগাড় করল? হতে পারে, নিয়তিতে বিশ্বাস করা ততটা নির্বোধের কাজ নয়। তারপরেও, হুট করে কোনো সিদ্ধান্তে আসা উচিত হবে না; এর সব কিছুরই খুব স্বাভাবিক একটা ব্যাখ্যা থাকলেও থাকতে পারে। কিন্তু হিল্ডা থাকে লিলেস্যান্ড-এ, তার ওয়ালেট অ্যালবার্টো নক্স পেলেন কী করে? লিলেস্যান্ড-তো কয়েক শো মাইল দূরে। তাছাড়া, সোফি এই পোস্টকার্ডটা তার পথের ওপর পেল কেন? ডাকপিয়ন যখন সোফির ডাকবাক্সের দিকে যাচ্ছিল তখন কি সেটি তার থলে থেকে পড়ে গিয়েছিল? তাই যদি হয় তাহলে অন্য কোনোটা না হয়ে বিশেষ এই পোস্টকার্ডটা কেন?

'তুই কি বদ্ধ পাগল হয়েছিস?' শেষ পর্যন্ত যখন সোফি সুপার মার্কেটে পৌঁছল, সব শুনে একেবারে ফেটে পড়ল জোয়ানা।

'দুঃখিত!'

স্কুল শিক্ষকের মতো ভীষণ একটা ভ্রূকুটি করল জোয়ানা সোফির দিকে তাকিয়ে।

'তুই বরং বিশ্বাসযোগ্য একটা ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা কর।'

'এর সঙ্গে জাতিসংঘের একটা সম্পর্ক আছে,' সোফি বলল। 'লেবাননে একটা শত্রুদল আমাকে আটকে রেখেছিল।'

'বটে তুই আসলে প্রেমে পড়েছিস।'

যদ্দুর সম্ভব জোরে ছুটে স্কুলে পৌঁছে গেল দু'জন।

ধর্মীয় জ্ঞান সম্পর্কিত যে-পরীক্ষাটার জন্য সোফি প্রস্তুতি নেবার সুযোগ পায়নি সেটি হলো তৃতীয় পিরিয়ডে। কাগজটায় লেখা

জীবন এবং সহিষ্ণুতার দর্শন

১। যে-সব বিষয় সম্পর্কে আমরা জানতে পারি তার একটা তালিকা তৈরি কর। তারপর সে-সব বিষয়ের একটা তালিকা তৈরি কর যে-সব বিষয়ে আমরা কেবল বিশ্বাস-ই করতে পারি।

২। একজন মানুষের জীবনদর্শন তৈরিতে যে-সব বিষয় অবদান রাখে সেগুলো উল্লেখ কর।

৩। বিবেক বলতে কী বোঝায়? তুমি কি মনে করো সবার বিবেক একই রকম?

৪। মূল্যের অগ্রাধিকার (priority of values) বলতে কী বোঝায়?

লেখা শুরু করার আগে বসে বসে বেশ কিছুক্ষণ ভাবল সোফি। অ্যালবার্টো নক্স-এর কাছ থেকে শেখা কোনো কিছু এখানে ব্যবহার করা যায় না? তাই-ই করতে হবে তাকে, তার কারণ বেশ কিছুদিন হলো 'ধর্মীয় জ্ঞান'-এর বইটা খোলা হয়নি তার। লিখতে শুরু করার পর শব্দগুলো আপনা আপনিই বেরিয়ে আসতে লাগল তার কলম থেকে।

সে লিখল, আমরা জানি চাঁদ পনির দিয়ে তৈরি নয় এবং চাঁদের অন্ধকার পৃষ্ঠে বড় বড় গর্ত রয়েছে, এটাও জানি যে সক্রেটিস এবং যীশু দু'জনকেই মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছিল, আরও জানি যে প্রত্যেককেই মরতে হবে, আগে হোক আর পরে হোক, সেই সঙ্গে এ-ও জানি যে অ্যাক্রোপলিসের বিশাল মন্দিরগুলো পঞ্চম খ্রিস্ট পূর্বাব্দে পার্সিয়ান যুদ্ধের পর তৈরি করা হয়েছিল আর প্রাচীন গ্রিসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ওরাকলটি ছিল দেলফির ওরাকল। যে-সব জিনিস আমরা কেবল বিশ্বাস করতে পারি সে-সবের উদাহরণ দিতে গিয়ে সোফি লিখল অন্য গ্রহগুলোয় প্রাণ থাকা না থাকা, ঈশ্বরের অস্তিত্ব আছে কি নেই, মৃত্যুর পর জীবন আছে কি নেই এবং যিশু কি ঈশ্বরের পুত্র ছিলেন নাকি ছিলেন নিতান্তই একজন জ্ঞানী মানুষ, এ-সবের কথা। তালিকাটা শেষ করে সে লিখল 'পৃথিবী'টা কোথা থেকে এলো সেটি আমরা নিশ্চয়ই জানি না। তবে মহাবিশ্বটাকে একটা টপ হ্যাটের ভেতর থেকে বের করা বিশাল একটা খরগোশের সঙ্গে তুলনা করা চলে। দার্শনিকেরা চেষ্টা করেন খরগোশের গায়ের একটা সূক্ষ্ম রোম বেয়ে ওপরে উঠে সরাসরি মহান জাদুকরের চোখের দিকে তাকাতে। অবশ্য, সে-কাজে তারা কোনোদিন সফল হবেন কিনা সে-প্রশ্নটা থেকেই যাচ্ছে। তারা যদি একে অন্যের পিঠের ওপর চড়ে বসতেন তাহলে তাঁরা খরগোশের রোমটাকেও ছাড়িয়ে যেতেন এবং তখন, আমার বিশ্বাস, তাঁরা একদিন সফল হলেও হতে পারতেন।

পুনশ্চ বাইবেল-এ এমন একটা জিনিসের কথা বলা হয়েছে যেটা সেই খরগোশটার সূক্ষ্ম একটা রোমের মতো হতে পারতো। সেই রোমটার নাম টাওয়ার অভ্ ব্যাবেল বা ব্যাবেলের টাওয়ার। কিন্তু সেটিকে ধ্বংস করে ফেলা হয়েছিল, তার কারণ জাদুকরটি চাননি যে ক্ষুদে ক্ষুদে মানব পোকাগুলো ওটা বেয়ে তাঁর সদ্য তৈরি করা সাদা খরগোশটার অতো উঁচুতে উঠে যাক।'

সোফি এরপর গেল পরের প্রশ্নে 'একজন মানুষের জীবনদর্শন তৈরিতে যে-সব

বিষয় অবদান রাখে সেগুলো উল্লেখ কর।' লালন-পালন এবং পরিবেশ এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। প্লেটোর সময়কার মানুষ আর এখনকার মানুষের জীবনদর্শনের মধ্যে তফাৎ রয়েছে, তার কারণ তারা একটি ভিন্ন সময়ে ভিন্ন পরিবেশে জীবন যাপন করেছে। আরেকটি বিষয় হলো মানুষ যে-সমস্ত অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে নিজেকে নিয়ে যায় সেটি। কাণ্ডজ্ঞান অবশ্য পরিবেশের ওপর নির্ভর করে না। সবারই তা থাকে। এক হিসেবে পরিবেশ আর সামাজিক অবস্থাকে প্লেটোর গুহায় বিরাজমান অবস্থার সঙ্গে তুলনা করা যায়। বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে ব্যক্তিমানুষ অন্ধকার থেকে নিজেকে বের করে নিয়ে আসার চেষ্টা করতে পারে। কিন্তু সে-কাজ করতে ব্যক্তিগত সাহসেরও প্রয়োজন। সমাজে বিরাজমান পরিস্থিতি থেকে নিজের বুদ্ধিবলে মুক্তিলাভ করা মানুষের এক উজ্জ্বল উদাহরণ হলেন সক্রেটিস। শেষে সে লিখল 'হাল আমলে নানান দেশ এবং সংস্কৃতির মানুষের মধ্যে মেলামেশা বেড়েই চলেছে। একই অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিংয়ে হয়ত খ্রিস্টান, মুসলিম এবং বৌদ্ধরা বাস করছে। এক্ষেত্রে সব মানুষ একই জিনিসে বিশ্বাসী নয় কেন সে-কথা জিজ্ঞেস করার চেয়ে একে অন্যের বিশ্বাসকে মেনে নেয়াটাই বেশি জরুরি।'

খারাপ না, ভাবল সোফি। সে তার দর্শন শিক্ষকের কাছ থেকে যা শিখেছে তার অনেক কিছুই সে এখানে ব্যবহার করতে পেরেছে বলে মনে হলো তার। সেই সঙ্গে তার নিজের কাণ্ডজ্ঞান আর এখানে-ওখানে সে যা পড়েছে বা শুনেছে সে-সবের খানিকটাও সে এটার সঙ্গে জুড়ে দিতে পারে সহজে।

তৃতীয় প্রশ্নের দিকে মন দিল সে: 'বিবেক বলতে কী বোঝায়? তুমি কি মনে করো সবার বিবেক একই রকম?' এ-ই ব্যাপারটা নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে ক্লাসে। সোফি লিখল 'বিবেক হচ্ছে ন্যায়-অন্যায়ের ব্যাপারে মানুষের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করার ক্ষমতা। আমার ব্যক্তিগত মতামত হচ্ছে প্রত্যেকেরই এই ক্ষমতা রয়েছে, কাজেই অন্য কথায় বলতে গেলে, বিবেক একটি সহজাত বা জন্মগত বিষয়। সক্রেটিসও, আমার ধারণা, একই মত প্রকাশ করতেন। তবে বিবেকের নির্দেশ ব্যক্তিভেদে একেবারে ভিন্ন রকম হতে পারে। এক্ষেত্রে অনেকেরই সোফিস্টদের কথা মনে হতে পারে। তাঁরা মনে করতেন, কারও ন্যায়-অন্যায় বোধ নির্ভর করে মূলত সে কোন পরিবেশে বড় হয়েছে তার ওপর। অন্যদিকে সক্রেটিস মনে করতেন সবার বিবেকই একই রকম বা সমান। সম্ভবত দুটো দৃষ্টিভঙ্গি-ই সঠিক। যদিও সবাই হয়ত নগ্ন অবস্থায় জনসমক্ষে যেতে সংকোচ বোধ করবে না, কিন্তু কারও সঙ্গে নীচ ব্যবহার করার পর বেশিরভাগ মানুষই বিবেকের দংশনে ভুগবে। তারপরেও এ-কথাটা স্মরণ রাখতেই হবে যে বিবেক থাকা আর তা ব্যবহার করার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। মাঝে মধ্যে কিছু লোকের কাজ দেখে মনে হয় তারা বুঝি বিবেকবর্জিত, কিন্তু আমি বিশ্বাস করি তাদের মধ্যেও, মনের গভীরে কোথাও, এক ধরনের বিবেক আছে। ঠিক যেমন কখনো কখনো মনে হয় কোনো কোনো মানুষের কোনো বোধশক্তিই নেই আর তার কারণটা স্রেফ এই যে তারা সেটিকে ব্যবহার করছে না। পুনশ্চ কাণ্ডজ্ঞান এবং বিবেক, এই দুটো জিনিসকেই পেশির সঙ্গে তুলনা করা চলে। কেউ যদি তার কোনো পেশি ব্যবহার না করে তাহলে সেটা দিন দিন দুর্বল থেকে দুর্বলতর হয়ে পড়ে।'

আর মাত্র একটা প্রশ্ন বাকি 'মূল্যের অগ্রাধিকার বলতে কী বোঝায়?' এই ব্যাপারটা নিয়েও সম্প্রতি অনেক আলোচনা করেছে তারা। একটি গাড়ি চালিয়ে খুব দ্রুত এক স্থান থেকে অন্য স্থানে চলে যাওয়াটা এক অর্থে খুবই মূল্যবান হতে পারে। কিন্তু এই গাড়ি চালনার ফল গিয়ে যদি দাঁড়ায় বৃক্ষশূন্যতা এবং প্রাকৃতিক পরিবেশের দূষণ তাহলেই এসে যায় মূল্য বিচারের প্রসঙ্গ। সতর্ক বিবেচনার পর সোফির মনে হলো সে এই সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছেছে যে সমৃদ্ধ বনরাজি আর নিষ্কলুষ পরিবেশ তাড়াতাড়ি কাজ করার চেয়েও বেশি মূল্যবান। আরও অনেক উদাহরণ তুলে ধরল সে। সবশেষে সে লিখল 'ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি ইংরেজি ব্যাকরণের চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় হচ্ছে দর্শন। কাজেই, টাইম টেবিল থেকে ইংরেজি পড়াগুলো খানিকটা ছেঁটে দিয়ে সে-জায়গায় দর্শন অন্তর্ভুক্ত করা মূল্যের অগ্রাধিকার নিরূপণ করার ক্ষেত্রে বিচক্ষণ একটি কাজ বলেই গণ্য হবে।'

শেষ ব্রেক এর সময় সোফির শিক্ষক তাকে এক পাশে ডেকে নিলেন।

'তোমার 'ধর্ম' পরীক্ষার খাতাটা এরই মধ্যে পড়ে ফেলেছি আমি,' তিনি বললেন। 'খাতাগুলোর প্রায় ওপরের দিকেই ছিল ওটা।'

'আশা করি চিন্তার খানিকটা খোরাক পেয়েছেন ওটায়।'

'ঠিক এই ব্যাপারটা নিয়েই কথা বলতে চাই আমি তোমার সঙ্গে। অনেক দিক থেকেই লেখাটা বেশ পরিণত বলে মনে হয়েছে আমার কাছে। বেশ অবাক করার মতোই পরিণত। আর নিজের থেকে লেখা। কিন্তু তুমি কি তোমার হোমওয়ার্ক করেছিলে, সোফি?'

একটু অস্থিরতা দেখা গেল সোফির মধ্যে।

'ইয়ে, দেখুন, আপনি বলেছিলেন লেখার মধ্যে নিজস্ব একটা দৃষ্টিভঙ্গি থাকা জরুরি।'

'হ্যাঁ, তা বলেছিলাম...কিন্তু তার একটা সীমা আছে।'

সোফি সরাসরি তার শিক্ষকের চোখের দিকে তাকাল। তার মনে হলো সম্প্রতি তার যে-সমস্ত অভিজ্ঞতা হয়েছে তাতে সে নিজেকে এটুকু করার এক্তিয়ার দিতে পারে।

'আমি দর্শন পড়া শুরু করেছি,' সে বলল। 'ব্যক্তিগত মতামত তৈরির ক্ষেত্রে দর্শন একজন মানুষকে চমৎকার একটা ক্ষেত্র উপহার দিতে পারে।'

'কিন্তু তাতে তোমার খাতা গ্রেডিং করার ব্যাপারে আমার সুবিধে হচ্ছে না। হয় সেটি ডি হবে নয়ত এ।'

'সেটি কি এইজন্য যে আমি হয় একেবারে ঠিক বলেছি নয়ত পুরোপুরি ভুল? আপনি কি তাই বলতে চান?'

'ঠিক আছে এ-ই হলো,' শিক্ষক বললেন। 'কিন্তু এরপর হোমওয়ার্ক করতে ভুলো না!'

বিকালে স্কুল থেকে বাড়ি ফিরে স্কুলব্যাগটা সিঁড়ির ধাপে ছুঁড়ে দিয়ে দৌড়ে গুহায় চলে এলো সোফি। গ্রন্থিল শেকড়গুলোর ওপর বাদামি একটা খাম পড়ে আছে। খামটার প্রান্তের দিকটা বেশ শুকনো, তার অর্থ হার্মেস নিশ্চয়ই বেশ আগেই ওটা ফেলে রেখে গেছে।

খামটা নিয়ে সামনের দরজা দিয়ে বাড়ির ভেতরে ঢুকে পড়ল সে। জন্তুগুলোকে

খাবার দিল তারপর দোতলায় তার নিজের ঘরে চলে এলো। বিছানায় শুয়ে অ্যালবার্টোর চিঠিটা খুলে পড়তে শুরু করল সে :

হেলেনিজম

এই যে, সোফি! আবার এক সঙ্গে হলাম আমরা! প্রকৃতিবাদী দার্শনিকবৃন্দ, সক্রেটিস, প্লেটো আর অ্যারিস্টটল সম্পর্কে পড়ার পর তুমি এখন ইউরোপীয় দর্শনের ভিত্তিমূলের সঙ্গে পরিচিত হয়ে গেছ। কাজেই এবার থেকে আমরা ভূমিকামূলক সেই প্রশ্নগুলো বাদ দেবো, যে-সব প্রশ্ন আগে একটা সাদা খামে পেতে তুমি। আমার ধারণা স্কুলেরও অনেক কাজ আর পরীক্ষা রয়েছে তোমার।

তো, এবার তোমাকে বলব আমি চতুর্থ খ্রিস্ট পূর্বাব্দের শেষের দিকে অ্যারিস্টটল থেকে ৪০০ খ্রিস্টাব্দের দিকে মধ্যযুগের শুরু পর্যন্ত লম্বা সময়টার কথা। এই সময়টার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং রহস্যময় বিষয় ছিল খ্রিস্টধর্ম।

অ্যারিস্টটল মারা যান ৩২২ খ্রিস্ট পূর্বাব্দে, এথেন্স তখন আগেকার সেই প্রভাব প্রতিপত্তি খুইয়ে বসেছে। আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট-এর (৩৫৬-৩২৩ খ্রি. পূ.) সামরিক বিজয়গুলোর ফলে যে রাজনৈতিক পালাবদল ঘটেছিল সেটিও এর জন্য কম দায়ী নয়।

আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট ছিলেন মেসিডোনিয়ার রাজা। অ্যারিস্টটলও মেসিডোনিয়ার লোক এবং কিছুদিন তিনি তরুণ আলেকজান্ডারের শিক্ষকও ছিলেন। সে যাই হোক, আলেকজান্ডার দ্য গ্রেটই পারসিকদের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত বিজয় লাভ করেছিলেন। তাছাড়া, মিসর এবং প্রাচ্যের ভারত পর্যন্ত বিজয় করে একটি বিশাল ভূখণ্ড তিনি গ্রিক সভ্যতার সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন।

এর ফলে মানব ইতিহাসে এক নতুন যুগের সূচনা হয়। উদ্ভব ঘটে এক সভ্যতার যে সভ্যতায় গ্রিক সংস্কৃতি আর গ্রিক ভাষা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। প্রায় ৩০০ বছর স্থায়ী এই সময়টি হেলেনিজম (Hellenism) নামে পরিচিত। হেলেনিজম বলতে এই সময়টি তো বটেই, সেই সঙ্গে তিনটি হেলেনিস্টিক রাজ্য মেসিডোনিয়া, সিরিয়া এবং মিশরে গ্রিক প্রাধান্য বিশিষ্ট যে-সংস্কৃতি এই একই সময়ে বিরাজ করছিল সেটিকেও বোঝায়।

৫০ খ্রিস্ট পূর্বাব্দ থেকেই সামরিক এবং রাজনৈতিক ব্যাপারে রোমের কর্তৃত্ব সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। নতুন এই পরাশক্তি ধীরে ধীরে সবকটি হেলেনিস্টিক রাজ্য জয় করে ফেলে এবং এরপর থেকে পশ্চিমে স্পেন থেকে সুদূর এশিয়া পর্যন্ত রোমান সংস্কৃতি এবং লাতিন ভাষারই আধিপত্য সূচিত হয়। এটাই রোমান যুগের প্রারম্ভ এবং একেই আমরা বলে থাকি প্রাচীন লাতিন যুগ। তবে একটা কথা কিন্তু মনে রাখা দরকার আর তা হলো হেলেনিস্টিক জগৎ জয় করার আগে রোমানরা নিজেরাই ছিল গ্রিক সংস্কৃতির প্রভাব বলয়ের অন্তর্ভুক্ত। কাজেই এ-কথা বলাটা খুবই যুক্তিযুক্ত যে গ্রিসের রাজনৈতিক প্রভাব অতীতের গর্ভে হারিয়ে যাওয়ার পরেও গ্রিক সংস্কৃতি এবং গ্রীক দর্শন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে গিয়েছিল।

হেলেনিজম-এর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই সময়টাতে বিভিন্ন দেশ এবং সংস্কৃতির সীমারেখা টুটে গেল। আগে গ্রিস, রোম, মিশর, ব্যাবিলনিয়া, সিরিয়া এবং পারস্যের মানুষেরা তাদের জাতীয় ধর্মের গণ্ডির ভেতরেই তাদের নিজেদের দেবতাদের আরাধনা বা পূজা করেছে। এবার বিভিন্ন সংস্কৃতি ধর্মীয়, দার্শনিক এবং বৈজ্ঞানিক ধারণার এক বিশাল কড়াইয়ের ভেতর মিলেমিশে একাকার হয়ে গেল।

কথাটা সম্ভবত এভাবে বলা যায় যে নগর-চত্বরের জায়গায় এলো বিশ্ব অঙ্গন। পুরনো নগর-চত্বরটিও অবশ্য গমগম করত নানান গলার আওয়াজে, কখনো হয়ত বিভিন্ন জিনিসপত্র আসতো সেখানে, কখনো বা নানান চিন্তা বা ধ্যান-ধারণা। নতুন যে-ব্যাপারটি ঘটল তা হলো এবারে নগর-চত্বর ভরে যেতে থাকল সারা দুনিয়া থেকে আসা পণ্যদ্রব্য আর ধারণাগুলোয়। আর মানুষের গলা গমগম করতে থাকল নানান ভাষার কলরবে।

এরই মধ্যে উল্লেখ করেছি যে গ্রিক জীবনদর্শন এই সময়টাতে আগের গ্রিক সাংস্কৃতিক বলয়ের চেয়ে অনেক বেশি জায়গা জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছিল। সময় যতই যেতে থাকল ততই ভূমধ্যসাগরীয় দেশের সবগুলোতে প্রাচ্যের দেবতারাও পূজিত হতে থাকলেন। নতুন ধর্মীয় সংগঠনও গড়ে উঠতে থাকল বহু পুরনো দেশ ও জাতির দেবদেবী এবং বিশ্বাসের সমন্বয়ে। একে বলা হয় নানান ধর্মবিশ্বাসের সংমিশ্রণ (syncretism)।

এর আগে লোকজন তাদের জাতি আর নগর-রাষ্ট্রের প্রতি একটা শক্ত টান অনুভব করত। কিন্তু নানান দেশের মধ্যে সীমারেখা যতই মুছে যেতে থাকল ততই অসংখ্য মানুষ তাদের নিজেদের জীবন-দর্শন সম্পর্কে সংশয় এবং অনিশ্চয়তায় ভুগতে শুরু করল। প্রাচীন লাতিন যুগের শেষ অংশটি বিশিষ্ট হয়ে আছে ধর্ম সম্পর্কিত সংশয়, সাংস্কৃতিক সংমিশ্রণ আর দুঃখবাদ-এর জন্য। তখন বলা হতো, 'পৃথিবীটা বুড়িয়ে গেছে।'

মানবজাতি কী করে মৃত্যুর হাত থেকে পরিত্রাণ লাভ করতে পারবে সে-সম্পর্কে নানান উপদেশ প্রায়ই দেখা যেতো হেলেনিস্টিক নতুন নতুন ধর্মীয় সংগঠনগুলোর মধ্যে। এই উপদেশগুলোকে প্রায়ই গোপনীয় বিষয় হিসেবে গণ্য করা হতো। এইসব উপদেশ গ্রহণ করে এবং বিশেষ কিছু আচার-অনুষ্ঠান পালনের মধ্য দিয়ে একজন বিশ্বাসী ব্যক্তি একটি অমর আত্মা ও শাশ্বত জীবনের অধিকারী হওয়ার আশা পোষণ করতো। আত্মার নির্বাণ বা মোক্ষলাভের জন্য ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের মতোই গুরুত্বপূর্ণ ছিল মহাবিশ্বের প্রকৃত স্বরূপ সম্পর্কে একটি বিশেষ অন্তর্দৃষ্টি লাভ করা।

তো, ধর্ম সম্পর্কে এ-পর্যন্তই, সোফি। ওদিকে *দর্শন*ও কিন্তু ক্রমশই আরও বেশি করে 'নির্বাণ' বা আর প্রশান্ত দশার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। ভাবা হচ্ছিল, দার্শনিক অন্তর্দৃষ্টি তার নিজস্ব উদ্দেশ্য সাধনের বাইরেও মানুষকে দুঃখবাদ আর মৃত্যুভয় থেকে মুক্তি দেবে। এভাবে ধর্ম আর দর্শনের মধ্যকার সীমারেখাও মুছে যাচ্ছিল ধীরে ধীরে।

সার্বিক দৃষ্টিতে, হেলেনিজমের দর্শন সে-রকমভাবে চোখে পড়ার মতো নতুন বা মৌলিক কিছু নয়। নতুন কোনো প্লেটো বা অ্যারিস্টটল এ-সময়ে আবির্ভূত হননি। বরং

কিছুক্ষণের মধ্যেই আমি তোমাকে যে-সব দার্শনিক প্রবণতার কথা বলব সেগুলো এই তিন মহান এথনীয় দার্শনিকের শিক্ষা থেকেই অনুপ্রেরণা লাভ করেছে।

হেলেনিস্টিক *বিজ্ঞান*-ও বিভিন্ন সংস্কৃতি থেকে পাওয়া জ্ঞানের সংমিশ্রণ। এক্ষেত্রে পূর্ব এবং পশ্চিমের মিলনস্থল হিসেবে আলেকজান্দ্রিয়ার একটি মুখ্য ভূমিকা রয়েছে। প্লেটো এবং অ্যারিস্টটলের পর তখনো টিকে থাকা নানান দর্শনের অনুসারী কিছু দল নিয়ে এথেন্স রয়ে গিয়েছিল দর্শনচর্চার কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে, অন্যদিকে আলেকজান্দ্রিয়া ছিল বিজ্ঞান-চর্চার পীঠস্থান। এখানকার বিশাল গ্রন্থাগারটি নিয়ে আলেকজান্দ্রিয়া হয়ে উঠেছিল গণিতশাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা, জীববিদ্যা এবং চিকিৎসাবিদ্যার কেন্দ্রস্থল।

হেলেনিস্টিক সংস্কৃতিকে অনায়াসে আজকের পৃথিবীর সঙ্গে তুলনা করা চলে। বিংশ শতাব্দীও ক্রমশই উদার ও উন্মুক্ত হতে থাকা একটি সভ্যতার প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছে। আমাদের সময়েও এই উদারনৈতিক প্রক্রিয়া ধর্ম এবং দর্শনের ক্ষেত্রে রীতিমতো বৈপ্লবিক পরিবর্তন সৃষ্টি করেছে। খ্রিস্টীয় যুগের গোড়ার দিকে রোমে যেমন যে-কেউ গ্রিক, মিসরীয় এবং প্রাচ্যের ধর্মগুলোর দেখা পেতে পারত, ঠিক তেমনি আজ আমরা যখন বিংশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি তখন ছোট-বড় যে কোনো ইউরোপীয় শহরে পৃথিবীর যে-কোনো অংশের ধর্মের সাক্ষাৎ পাবো। ইদানীং আমরা আরও দেখতে পাচ্ছি কী করে নতুন ও পুরনো ধর্ম, দর্শন এবং বিজ্ঞানের একটি সম্মিলিত পিণ্ড 'জীবন সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গি'-র বাজারে নতুন নতুন পণ্যের আবির্ভাবের ভিত্তি রচনা করতে পারে। এই 'নতুন জ্ঞান'-এর অনেকটাই পুরনো চিন্তা-ভাবনার ভাসমান খড়কুটো, যেগুলোর কিছু কিছু এমনকি সেই হেলেনিজম আমলের।

আগেই বলেছি, সক্রেটিস, প্লেটো এবং অ্যারিস্টটল যে-সব সমস্যার কথা উল্লেখ করে গেছেন হেলেনিস্টিক দর্শন সেগুলো নিয়েই কাজ করেছে। এই তিন দার্শনিকেরই একটি বিষয়ে মিল ছিল আর তা হলো মানবজাতি কী করে সবচেয়ে সুন্দরভাবে জীবনযাপন এবং মৃত্যুবরণ করতে পারে তা আবিষ্কার করা। তাঁদের চিন্তার মূল বিষয় ছিল *নীতিবিদ্যা*। নতুন সভ্যতায় এটাই হয়ে দাঁড়ায় মুখ্য দার্শনিক বিষয়। সত্যিকারের সুখ কী এবং কীভাবে তা অর্জন করা যায় সেটিই হয়ে দাঁড়ায় মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু। এই সব দার্শনিক প্রবণতার চারটির দিকে নজর দেবো আমরা।

বিরাগীদের কথা (The Cynics)

একটি গল্প প্রচলিত আছে যে, সব ধরনের পণ্য বিক্রি করত এ-রকম একটা দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন একবার সক্রেটিস। এবং শেষ পর্যন্ত তিনি বলে উঠেছিলেন, 'কত না জিনিস এখানে, অথচ এ-সবের একটাও আমার দরকার নেই।'

এই মন্তব্যটিকেই বলা যেতে পারে বিরাগী দর্শনের মূলসূত্র। ৪০০ খ্রিস্ট পূর্বাব্দে *অ্যান্টিস্থেনিস* (Antisthencs) নামে একজন এথেন্সে এই দর্শনের জন্ম দেন।

অ্যান্টিস্থেনিস সক্রেটিসের ছাত্র ছিলেন এবং তাঁর মিতব্যয়িতা তাঁকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল।

বিরাগীরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন বাহ্যিক সুযোগ-সুবিধা, যেমন বস্তুগত বিলাসদ্রব্য, রাজনৈতিক ক্ষমতা বা সুস্বাস্থ্য, সত্যিকারের সুখ দিতে পারে না। এ-ধরনের এলোপাতাড়ি এবং ক্ষণস্থায়ী জিনিসের ওপর সত্যিকারের সুখ নির্ভর করে না। এবং সুখ যেহেতু এ-ধরনের সুবিধা বা উপকারের ওপর নির্ভর করে না সুতরাং তা সবারই নাগালের মধ্যে। তারচেয়ে যেটা বড় কথা, একবার প্রকৃত সুখ অর্জন করা গেলে তা কখনোই হারাতে পারে না।

বিরাগীদের মধ্যে যিনি সবচেয়ে বিখ্যাত তাঁর নাম *ডায়োজেনিস* (Diogenes), অ্যান্টিস্থেনিসের একজন ছাত্র। ডায়োজেনিস একটি পিপার মধ্যে থাকতেন এবং তাঁর কেবল একটি আলখাল্লা, একটি লাঠি আর রুটি রাখার একটি থলে ছিল বলে প্রসিদ্ধি আছে। (সুতরাং বুঝতেই পারছো, তাঁর সুখ কেড়ে নেয়া খুব সহজ ব্যাপার ছিল না।) একবার তিনি যখন তাঁর পিপার পাশে শুয়ে রোদ পোহাচ্ছিলেন তখন আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসেন। সম্রাট তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলেন তিনি তাঁর জন্য কিছু করতে পারেন কিনা। 'এমন কিছু কি আছে যা তিনি চান?' ডায়োজেনিস উত্তরে বললেন, 'হ্যাঁ, চাই। এক পাশে সরে দাঁড়ান। আপনি রোদ আটকে দাঁড়িয়ে আছেন।' এভাবেই ডায়োজেনিস বুঝিয়ে দিলেন যে তাঁর সামনে দাঁড়ানো বিখ্যাত মানুষটির চেয়ে তিনি কম সুখী বা সম্পদশালী নন। তিনি যা চান তার সবই তাঁর আছে।

বিরাগীরা বিশ্বাস করতেন নিজের স্বাস্থ্যের ব্যাপারে কারও উদ্বিগ্ন হওয়ার কারণ নেই। এমনকি কষ্টভোগ এবং মৃত্যুতেও বিচলিত হওয়া উচিত নয়। অন্য মানুষের দুঃখ-কষ্ট দেখে উদ্বিগ্ন হয়ে নিজেকে যন্ত্রণা দেয়ার কোনো মানে হয় না।

বর্তমানে সিনিকাল এবং সিনিসিজম শব্দ দু'টির সাহায্যে মানুষের আন্তরিকতা সম্পর্কে একটি অবজ্ঞাসূচক মনোভাব ব্যক্ত করা হয় এবং সেই সঙ্গে মানুষের যন্ত্রণা, দুঃখ-কষ্ট ইত্যাদির ব্যাপারে উদাসীনতাও প্রকাশ করা হয়ে থাকে।

স্টোয়িকদের কথা (The Stoics)

৩০০ খ্রিস্ট পূর্বাব্দে এথেন্সে স্টোয়িক দর্শনের উদ্ভবের পেছনে বিরাগীরা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। এই দর্শনের স্রষ্টা *জেনো* (Zeno); মূলত সাইপ্রাসের লোক হলেও একটা জাহাজডুবির পর এথেন্সে এসে বিরাগীদের সঙ্গে যোগ দেন তিনি। তাঁর অনুসারীদের তিনি একটা পোর্টিকো[১০]-র সামনে জড়ো করে তাঁদের সঙ্গে কথা বলতেন। পোর্টিকো-র গ্রিক শব্দ স্টোয়া (stoa) থেকেই 'স্টোয়িক' শব্দটি এসেছে। স্টোয়িক দর্শন (Stoicism) পরবর্তীকালে রোমান সংস্কৃতির ওপর ব্যাপক প্রভাব ফেলে।

হেরাক্লিটাসের মতো স্টোয়িকরাও বিশ্বাস করতেন যে প্রত্যেকেই একই কাণ্ডজ্ঞান

---

১০. বাড়ির সামনের বা পাশের স্তম্ভশ্রেণী—অনুবাদক।

স্না 'লোগোস' (logos)-এর অংশ। তাঁরা মনে করতেন প্রতিটি মানুষই জগতের একটি ছোট্ট প্রতিলিপি বা একটি 'ক্ষুদ্র জগৎ', যা কিনা 'নিখিল বিশ্ব'-রই একটি প্রতিবিম্ব।

এ-থেকেই একটি চিন্তার জন্ম হলো যে বিশ্বজনীন একটি ন্যায়পরায়ণতা বা তথাকথিত প্রাকৃতিক আইন (natural law) নামক একটি জিনিসের অস্তিত্ব রয়েছে। এবং যেহেতু এই প্রাকৃতিক আইন শাশ্বত মানব এবং বিশ্বজনীন প্রজ্ঞার ওপর ভিত্তি করে আছে তাই সময় এবং স্থানভেদে সেটির কোনো পরিবর্তন হয় না। কাজেই এদিক দিয়ে স্টোয়িকরা সোফিস্টদের মতানুসারী নয়, সক্রেটিসের।

প্রাকৃতিক আইন সমস্ত মানব জাতিকে, এমনকি দাসদেরও শাসন করে। স্টোয়িকরা রাষ্ট্রগুলোর সব বিধিবদ্ধ আইনকে প্রকৃতিতে বিদ্যমান 'আইন'-এর অসম্পূর্ণ অনুকরণ বলে মনে করতেন।

ব্যক্তি এবং মহাবিশ্বের মধ্যে কোনো পার্থক্য যেমন স্টোয়িকরা স্বীকার করতেন না, ঠিক তেমনি তাঁরা 'চিদাত্মা' (spirit) এবং 'বস্তু'-র (matter) মধ্যকার বিরোধও স্বীকার করতেন না। তাঁরা বলতেন, রয়েছে কেবল প্রকৃতি। এই ধরনের চিন্তা বা ধারণাকে বলা হয় *অদ্বৈতবাদ* (monism) (যা প্লেটোর সুস্পষ্ট দ্বৈতবাদ (dualism) বা দুই স্তর বিশিষ্ট বাস্তবতার ঠিক বিপরীত)।

সোফিস্টরা, তাঁদের সময়ের যোগ্য সন্তান হিসেবেই, ছিলেন একেবারে 'কসমোপলিটান', 'পিপার দার্শনিকদের' মতো অর্থাৎ বিরাগীদের মতো তারা সমসাময়িক সংস্কৃতি সম্পর্কে উদাসীন ছিলেন না বা তা গ্রহণ করতে অনিচ্ছুক ছিলেন না। মানুষে মানুষে সম্পর্কের ওপর জোর দিতেন তাঁরা, রাজনীতি নিয়ে যথেষ্ট মাথা ঘামাতেন আর তাঁদের মধ্যে অনেকেই রাষ্ট্র পরিচালনার কাজে সক্রিয়ভাবে অংশ নিতেন; এ-প্রসঙ্গে রোমান সম্রাট *মার্কাস অরেলিয়াস* (Marcus Aurelius, ১২১-১৮০ খ্রিস্টাব্দ)-এর নাম অগ্রগণ্য। গ্রিক সংস্কৃতি এবং দর্শন চর্চায়ও উৎসাহ যোগাতেন তাঁরা রোমে; বাগ্মী, দার্শনিক এবং রাজপুরুষ *সিসেরো* (Cicero, ১০৬-৪৩ খ্রি.পূ.) এই উৎসাহদাতাদের মধ্যে বিশিষ্ট একজন। তিনিই 'মানবতাবাদ' (humanism) নামক ধারণাটির স্রষ্টা। মানবতাবাদ হচ্ছে জীবন সম্পর্কে এমন একটি দৃষ্টিভঙ্গি যেখানে ব্যক্তি-ই সমস্ত মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু। বেশ কিছুদিন পর স্টোয়িক সেনেকা (Seneca, খ্রি. পূ. ৪-৬৫ খ্রিস্টাব্দ) বলেন, 'মানুষের কাছে মানুষই পবিত্র।' এরপর থেকে এই কথাটিই মানবতাবাদের স্লোগান হয়ে যায়।

স্টোয়িকরা আরও বলতেন সমস্ত প্রাকৃতিক ঘটনাই, যেমন অসুখ-বিসুখ এবং মৃত্যু, প্রকৃতির অলঙ্ঘনীয় আইন অনুযায়ীই ঘটে। মানুষকে তাই তার নিয়তিকে মেনে নেবার শিক্ষাগ্রহণ করতে হবে। কোনো কিছু অপরিকল্পিতভাবে ঘটে না। কোনো না কোনো প্রয়োজনবশতই ঘটে সবকিছু। কাজেই নিয়তি যখন দরজায় এসে কড়া নাড়ে তখন অভিযোগ-অনুযোগ করে কোনো ফায়দা নেই। তাঁরা ভাবতেন, সুখের ঘটনাগুলোকেও শান্তভাবেই গ্রহণ করা উচিত মানুষের। এই দিক থেকে স্টোয়িকদের একটা মিল লক্ষ করা যায় বিরাগীদের সঙ্গে, যাঁরা দাবি করতেন যে বাহ্যিক কোনো ঘটনাই গুরুত্বপূর্ণ নয়। এমনকি আজও আমরা দুঃখ-সুখে অবিচল কোনো মানুষের প্রসঙ্গে 'স্টোয়িসুলভ স্থিরতা'-র কথা বলি।

এপিকিউরীয়দের কথা (The Epicureans)

আমরা দেখেছি, মানুষ কী করে একটি সুন্দর জীবনযাপন করতে পারে তাই নিয়ে সক্রেটিস উদ্বিগ্ন ছিলেন। বিরাগীরা এবং স্টোয়িকরা তাঁর দর্শনকে এইভাবে ব্যাখ্যা করেছেন যে বস্তুগত বিলাসিতা পরিত্যাগ করা মানুষের অবশ্যকর্তব্য। কিন্তু সক্রেটিসের আরেক ছাত্র ছিলেন, যাঁর নাম *অ্যারিস্টিপাস* (Aristippus)। তিনি বিশ্বাস করতেন যে মানুষের জীবনের লক্ষ্য হচ্ছে যদ্দূর সম্ভব ইন্দ্রিয়গত সুখ লাভ করা। তিনি বলতেন, 'আনন্দের চেয়ে ভালো আর কিছু নেই। অন্যদিকে সবচেয়ে অমঙ্গলকর জিনিস হচ্ছে ব্যথা-বেদনা।' কাজেই তিনি জীবনযাপনের এমন একটি পদ্ধতি উদ্ভাবন করতে চাইলেন যার উদ্দেশ্য সব ধরনের যন্ত্রণা পরিহার করা। (বিরাগী আর স্টোয়িকরা সব ধরনের যন্ত্রণা *সহ্য* করায় বিশ্বাসী ছিলেন; যন্ত্রণা *এড়িয়ে চলার* চেষ্টার অর্থ ঠিক সেটি নয়।)

৩০০ খ্রিস্ট পূর্বাব্দের দিকে এপিকিউরাস (Epicurus ৩৪১-২৭০) এথেন্সে এক নতুন দর্শনের প্রবর্তন করেন। তাঁর অনুসারীরা এপিকিউরীয় নামে পরিচিত। এরিসটিপাসের আনন্দবাদের কিছু সংস্কার করে এবং তার সঙ্গে ডেমোক্রিটাসের পরমাণু তত্ত্ব জুড়ে দিয়ে তিনি তাঁর দর্শন সৃষ্টি করেন।

জনশ্রুতি রয়েছে, এপিকিউরীয়রা একটি বাগানে বাস করতেন। সেই জন্য তাঁরা 'বাগানের দার্শনিক' নামে পরিচিত হন। বাগানটির প্রবেশপথে টাঙানো একটি নোটিশে লেখা ছিল 'আগন্তুক, এখানে তুমি সুন্দরভাবে জীবন কাটাতে পারবে। এখানে আনন্দই হচ্ছে পরম মঙ্গল।'

কোনো কাজের আনন্দময় ফলকে সব সময় সেটির সম্ভাব্য পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়ার বিপরীতে অবশ্যই বিচার করে দেখতে হবে বলে এপিকিউরাস দৃঢ় মত পোষণ করতেন। কখনো তোমার চকলেট খাওয়ার নেশা পেয়ে থাকলে এ-কথাটার অর্থ ভালোভাবে বুঝতে পারবে তুমি। আর যদি কখনো তা না পেয়ে থাকে তাহলে এই পরীক্ষাটা করে দেখো তোমার জমানো হাত-খরচের টাকা থেকে দুশো ক্রাউনের চকলেট কিনে ফেলো। (ধরেই নেয়া হচ্ছে যে তুমি চকলেট খেতে পছন্দ করো।) তো, এখন, এই পরীক্ষাটি করার জন্য তোমাকে চকলেটগুলো অবশ্যই একসঙ্গে খেতে হবে, একটার পর একটা। প্রায় আধ ঘণ্টা পর যখন সবগুলো চকলেট খাওয়া হয়ে যাবে তখন-ই তুমি বুঝতে পারবে পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া বলতে এপিকিউরাস কী বলতে চেয়েছেন।

তিনি আরও বিশ্বাস করতেন যে অল্প সময় স্থায়ী কোনো আনন্দময় ঘটনাকে সম্ভাব্য আরও বড়, দীর্ঘ সময়ব্যাপী আরও তীব্র আনন্দের বিপরীতে অবশ্যই বিচার করে দেখতে হবে। (যেমন ধরো, গোটা একটা বছর ধরে চকলেট খাওয়া বন্ধ রাখলে তুমি, কারণ হাত-খরচের সমস্ত টাকা জমিয়ে নতুন একটা বাইক কেনার বা বিদেশে একটা ব্যয়বহুল ভ্রমণে যাওয়ার কথা ভেবে রেখেছো মনে মনে।) আমরা আমাদের জীবন নিয়ে পরিকল্পনা করতে পারি, জীব-জন্তু তা পারে না। আমরা আমাদের আনন্দ নিয়ে হিসাব করতে পারি। চকলেট ভালো জিনিস, কিন্তু একটা নতুন বাইক বা

ইংল্যান্ড-ভ্রমণ তার চেয়ে ভালো।

অবশ্য এপিকিউরাস এটাও দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে 'আনন্দ' বলতে কেবল চকলেট খাওয়ার মতো 'ইন্দ্রিয় সুখই' বোঝায় না। বন্ধুত্ব বা শিল্পরস বিচারের মতো বিষয়ও এর অন্তর্ভুক্ত। তাছাড়া জীবনকে উপভোগ করতে হলে আত্ম-সংযম, মিতাচার এবং প্রশান্ততার মতো প্রাচীন গ্রিক আদর্শগুলোরও প্রয়োজন রয়েছে। কামনাকে সংযত রাখতেই হবে এবং প্রশান্ততা আমাদের সাহায্য করবে যন্ত্রণা বা ব্যথা-বেদনা সহ্য করতে।

দেবতাদের ভয়ে অনেকেই এসে জড়ো হয়েছিল এপিকিউরাসের বাগানে। এই প্রসঙ্গে বলতে হয়, ধর্মীয় কুসংস্কার দূর করার ক্ষেত্রে ডেমোক্রিটাসের পরমাণু তত্ত্ব একটি কার্যকর ভূমিকা রেখেছিল। সুন্দর জীবনযাপন করার জন্য মৃত্যুভয় জয় করাটা কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। আর তা করতে গিয়ে এপিকিউরাস ডেমোক্রিটাসের 'আত্মা পরমাণু' তত্ত্বকে কাজে লাগালেন। তোমার মনে থাকতে পারে যে ডেমোক্রিটাস বিশ্বাস করতেন যে মৃত্যুর পর কোনো জীবন নেই, কারণ আমরা যখন মারা যাই তখন 'আত্মা পরমাণুগুলো' চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

এপিকিউরাসের সহজ-সরল বক্তব্য ছিল এই : 'মৃত্যু আমাদের বিচলিত করে না, তার কারণ যতক্ষণ আমরা জীবিত আছি ততক্ষণ মৃত্যুর কোনো অস্তিত্ব নেই। আর যখন তা আসে তখন আর আমাদের কোনো অস্তিত্ব থাকে না।' (চিন্তা করে দেখো, এ-পর্যন্ত কেউই মারা যাওয়ার পর তা নিয়ে বিচলিত হয়নি।)

এপিকিউরাস তাঁর এই মুক্তকারী দর্শনের সার কথা তুলে ধরেছেন, তাঁর ভাষায়, চারটে রোগহর লতার সাহায্যে

দেবতাদের ভয় পাওয়ার কিছু নেই। মৃত্যু নিয়ে উদ্বিগ্ন হওয়ার কিছু নেই। মঙ্গল বা ভালো সহজেই অর্জন করা সম্ভব। ভয়ঙ্করকে সহজেই সহ্য করা যায়।

গ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখলে, দার্শনিক বিষয়বস্তুকে এভাবে চিকিৎসা বিজ্ঞানের নানান বিষয়ের সঙ্গে তুলনা করাটা নতুন কিছু নয়। উদ্দেশ্যটা ছিল নিছকই এই যাতে মানুষ এমন একটি 'দার্শনিক ওষুধ বাক্স'-র অধিকারী হতে পারে যে-বাক্সে উল্লিখিত চারটি উপাদান থাকে।

রাজনীতি এবং সমাজ নিয়ে স্টোয়িকরা যথেষ্ট আগ্রহ দেখালেও, এপিকিউরীয়রা এ-দুটো বিষয় প্রায় উপেক্ষা করে গেছেন। 'নির্জনে বাস করো!' এটাই ছিল এপিকিউরাসের উপদেশ। তাঁর 'বাগান'-কে আমরা বর্তমান কালের কমিউন বা নানান সংঘের সঙ্গে তুলনা করতে পারি। আমাদের এই যুগেও অনেক মানুষ আছেন যারা একটু নিরাপদ আশ্রয় খুঁজে নিয়েছেন, সমাজ থেকে দূরে।

এপিকিউরাসের পর অনেক এপিকিউরীয়ই আত্ম-ইচ্ছাপূরণের ওপর মাত্রাতিরিক্ত মনোযোগ দেয়া শুরু করেন। তাঁদের মতটা, ছিল, 'বর্তমানের জন্য বাঁচো!' আমাদের যুগে 'এপিকিউরীয়' শব্দটি নেতিবাচক অর্থে ব্যবহৃত হয় এবং তা এমন কাউকে বোঝায়, যে শুধু আনন্দের জন্য বাঁচে।

তাহলে দেখলে যে বিরাগী, স্টোয়িক এবং এপিকিউরীয় এই তিনটি দর্শনের মূলেই নিহিত রয়েছে সক্রেটিসের শিক্ষা। অবশ্য হেরাক্লিটাস এবং ডেমোক্রিটাসের মতো সক্রেটিস-পূর্ব দার্শনিকের কাছেও এ-দর্শনগুলোর ঋণ রয়েছে।

তবে হেলেনিস্টিক সময়ের শেষ দিকে সবচেয়ে লক্ষণীয় দার্শনিক প্রবণতাটি মুখ্যত প্লেটোর দর্শন থেকেই অনুপ্রেরণা লাভ করেছিল। কাজেই সেটিকে বলা হয় নব্য-প্লেটোবাদ (Neoplatonism)।

নব্য প্লেটোবাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব হচ্ছেন *প্লটিনাস* (Plotinus, ২০৫-২৭০ খ্রিস্টাব্দ)। তিনি দর্শন-শিক্ষা করেছিলেন আলেকজান্দ্রিয়ায়, কিন্তু থিতু হয়েছিলেন রোমে। লক্ষণীয় যে, তিনি আলেকজান্দ্রিয়ার মানুষ, যা ছিল কয়েক শতাব্দী ধরে গ্রিক সভ্যতা এবং প্রাচ্যদেশীয় মরমীবাদের মিলনস্থল। প্লটিনাস রোমে নিয়ে গিয়েছিলেন নির্বাণলাভের একটি তত্ত্ব; খ্রিস্টধর্ম যখন আবির্ভূত হয় তখন এই নির্বাণতত্ত্বটির সঙ্গে খ্রিস্টীয় মতবাদের জোর প্রতিযোগিতা হয়েছিল। খ্রিস্টীয় ধর্মতত্ত্বের ওপর অবশ্য নব-প্লেটোবাদেরও প্রবল প্রভাব পড়েছিল।

প্লেটোর ভাববাদ এবং যেভাবে তিনি ভাবজগৎ আর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের মধ্যে সীমারেখা টেনেছিলেন সে-কথা মনে করো, সোফি। সেটি ছিল দেহ এবং আত্মার মধ্যে একটি স্পষ্ট বিভাজন। এর ফলে মানুষ হয়ে পড়েছিল একটি দ্বৈত সত্তা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের অন্য সবকিছুর মতোই আমাদের দেহ ধূলি-মাটির তৈরি, তবে আমাদের একটি অমর আত্মাও আছে। প্লেটোর আগেও গ্রিসের অনেক মানুষ এ-কথা বিশ্বাস করতো। প্লটিনাস-ও এশিয়াতে প্রচলিত এ-ধরনের ধারণার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন।

প্লটিনাস বিশ্বাস করতেন জগৎ দুটো মেরু বা প্রান্তের মধ্যে বিস্তৃত। এক প্রান্তে রয়েছে একটি স্বর্গীয় আলো যার নাম তিনি দিয়েছেন 'এক' (one)। কখনো কখনো তিনি একে ঈশ্বর-ও বলেছেন। তো, অন্য প্রান্তে রয়েছে চরম অন্ধকার; এই প্রান্তে 'এক' থেকে কোনো আলোই এসে পৌঁছায় না। কিন্তু প্লটিনাস বলতে চান যে আসলে এই অন্ধকারের কোনো অস্তিত্ব নেই, এটা হচ্ছে স্রেফ আলোর অনুপস্থিতি; অন্য কথায়, এটা হচ্ছে, 'না'। যা কিছুর অস্তিত্ব আছে তা-ই হচ্ছে ঈশ্বর বা এক এবং আলোর একটি রশ্মি যেভাবে ধীরে ধীরে ম্লান হতে হতে শেষে ধীরে ধীরে মিলিয়ে যায়, ঠিক সে-রকম, একটি স্থান রয়েছে যেখানে স্বর্গীয় দীপ্তি পৌঁছুতে পারে না।

প্লটিনাসের মতানুযায়ী, 'এক' থেকে আসা আলোয় আত্মা উদ্ভাসিত হয়, অন্যদিকে বস্তু হচ্ছে অন্ধকার, যার কোনো অস্তিত্বই নেই আসলে। তবে প্রকৃতির আকারগুলো 'এক'-এর একটা আবছা দীপ্তি পায়। মনে করো রাতের বেলা বিশাল একটি অগ্নিকুণ্ড তৈরি করা হয়েছে আর সেখান থেকে চারদিকে আগুনের স্ফুলিঙ্গ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। অগ্নিকুণ্ডটা থেকে আসা আলোর একটি বিশাল ব্যাসার্ধ দিনের মতো আলোকিত করে রেখেছে অগ্নিকুণ্ড সংলগ্ন এলাকাটি; তবে তা থেকে বের হওয়া আলোর দীপ্তি দেখা যাচ্ছে বেশ কয়েক মাইল দূর থেকেও। আমরা যদি আরও দূরে সরে যাই তাহলেও অন্ধকারের মধ্যে অনেক দূরের কোনো লণ্ঠন থেকে আসা ছোট্ট এক বিন্দু আলোর

মতো একটু আলো দেখতে পাবো এবং আমরা যদি এভাবে দূরে সরে যেতেই থাকি তাহলে একটা নির্দিষ্ট স্থানে যাওয়ার পর আলো আর পৌঁছাবে না আমাদের কাছে। একটা কোথাও গিয়ে আলোর রশ্মি রাতের অন্ধকারে হারিয়ে যায় এবং সম্পূর্ণ অন্ধকারে আমরা কিছুই দেখতে পাবো না। কোনো আকৃতিও না, কোনো ছায়াও না।

এখন মনে করো, বাস্তবতা হচ্ছে এ-রকম একটা অগ্নিকুণ্ড। যা পুড়ছে তা হলো ঈশ্বর আর দূরের অন্ধকার হচ্ছে সেই শীতল বস্তু যা দিয়ে মানুষ আর জীব-জন্তু তৈরি। ঈশ্বরের সবচেয়ে কাছেই রয়েছে শাশ্বত সব ধারণা যা সমস্ত প্রাণীর প্রাথমিক আকার। আর সবার ওপর মানবাত্মা হলো 'আগুনের একটা স্ফুলিঙ্গ।' তারপরেও প্রকৃতির সবখানেই খানিকটা স্বর্গীয় আলো জ্বল জ্বল করছে। সে-আলো আমরা সমস্ত জীবন্ত প্রাণীর মধ্যে দেখতে পাই; এমনকি একটা গোলাপ বা বুবেল ফুলেও স্বর্গীয় দীপ্তি রয়েছে। সজীব ঈশ্বরের কাছ থেকে সবচেয়ে দূরে রয়েছে মাটি, পানি আর পাথর।

আমি আসলে বলতে চাইছি যে, যা কিছু অস্তিত্বশীল তার মধ্যেই স্বর্গীয় রহস্যের খানিকটা বর্তমান। একটি সূর্যমুখী বা পপি ফুলেও আমরা তা ঝকমক করতে দেখি। এই অতল রহস্যের আরও বেশ খানিকটা আমরা উপলব্ধি করতে পারি গাছের ডালে ডানা ঝাপটাতে থাকা একটা প্রজাপতি বা কোনো পাত্রে সাঁতার কাটতে থাকা গোল্ডফিশ দেখে। তবে আমাদের আত্মার ভেতরই আমরা ঈশ্বরের সবচেয়ে কাছাকাছি। একমাত্র এখানেই আমরা জীবনের বিশাল রহস্যের সঙ্গে এক হয়ে যেতে পারি। সত্যি কথা বলতে কী, কিছু কিছু খুবই বিরল মুহূর্তে-ই আমাদের এই অভিজ্ঞতা হয় বা মনে হয় আমরা নিজেরাই বুঝি সেই স্বর্গীয় রহস্য।

প্লটিনাসের উপমা বা রূপকটি খানিকটা বরং প্লেটোর গুহা-পুরাণের মতো। যতই আমরা গুহামুখটির কাছে যাই ততই আমরা সেই জিনিসটির নিকটবর্তী হই যা সমস্ত অস্তিত্বের উৎস। তবে প্লেটোর সুস্পষ্ট দ্বিস্তর বিশিষ্ট বাস্তবতার বিপরীতে প্লটিনাসের মতবাদকে বিশিষ্টতা দান করেছে সম্পূর্ণতার একটি অভিজ্ঞতা। প্রতিটি জিনিস-ই এক, কারণ প্রতিটি জিনিসই ঈশ্বর। এমনকি প্লেটোর গুহার গহীন ভেতরেও 'এক'-এর একটি আবছা দীপ্তি রয়েছে।

জীবনের কয়েকটি অত্যন্ত বিরল মুহূর্তে নিজের আত্মার সঙ্গে ঈশ্বরের সম্মিলনের অভিজ্রতা হয়েছিল প্লটিনাসের। এই ব্যাপারটিকে আমরা বলি অতীন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা। এ-রকম অভিজ্ঞতা যে কেবল প্লটিনাসেরই হয়েছিল তা নয়। সর্বকালে সব সংস্কৃতির মানুষ এ-ধরনের অভিজ্ঞতার কথা বলেছে। সে-অভিজ্ঞতার বর্ণনা একেকজন একেকভাবে দিলেও মূল ব্যাপারগুলো একই। এবার তাহলে এ-সব কিছু ব্যাপারের দিকে নজর দেয়া যাক।

মরমীবাদ (*Mysticism*)

অতীন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা হচ্ছে ঈশ্বর বা বিশ্ব-চিদাত্মা-র (cosmic-spirit) সঙ্গে এক হয়ে যাওয়ার অভিজ্ঞতা। ঈশ্বর এবং সৃষ্টির মধ্যে যোজন যোজন দূরত্বের কথা বলা হয়েছে

অনেক ধর্মেই। কিন্তু অতীন্দ্রিয় অভিজ্ঞতাতে এ-ধরনের কোনো দূরত্ব নেই। নারী-পুরুষ উভয়ই ঈশ্বরের সঙ্গে এক হওয়ার বা তাঁর সঙ্গে মিশে যাওয়ার অভিজ্ঞতা লাভ করেছে।

ধারণাটি এ-রকম যে, আমরা যাকে সাধারণত 'আমি' বলি তা আসলে সত্যিকারের আমি নয়। বার কয়েকের ক্ষণিক দৃষ্টির ভেতর বৃহত্তর 'আমি'-র সঙ্গে একাত্মবোধের অভিজ্ঞতা হতে পারে আমাদের। এই বৃহত্তর 'আমি'কে কোনো কোনো মরমীবাদী বলেছেন ঈশ্বর, কেউ কেউ বলেন বিশ্ব-চিদাত্মা, প্রকৃতি বা মহাবিশ্ব। যখন এই একীভবন (fusion) ঘটে তখন মরমীবাদী অনুভব করেন যে তিনি 'নিজেকে হারিয়ে ফেলছেন'; তিনি ঈশ্বরের মধ্যে ঠিক এমনভাবে অদৃশ্য হয়ে যান বা হারিয়ে যান যেভাবে এক ফোঁটা পানি হারিয়ে যায় সাগরে গিয়ে মেশার পর। ভারতীয় এক মরমীবাদী একবার বিষয়টাকে এভাবে প্রকাশ করেছিলেন 'যখন আমি ছিলাম তখন ঈশ্বর ছিল না। যখন ঈশ্বর আছে তখন আর আমি নেই।' খ্রিস্টান মরমীবাদী অ্যাঞ্জেলাস সিলেসিয়াস (১৬২৪-১৬৭৭) ব্যাপারটিকে বর্ণনা করেছিলেন আরেকভাবে প্রতিটি ফোঁটাই সমুদ্র হয়ে যায় যখন তা সমুদ্রের দিকে প্রবাহিত হয়, ঠিক যেমন আত্মা শেষ পর্যন্ত ওপরে উঠে ঈশ্বরে পরিণত হয়।'

এখন, তোমার মনে হতে পারে যে 'নিজেকে হারিয়ে ফেলার' ব্যাপারটি সে-রকম আনন্দদায়ক কোনো বিষয় হতে পারে না। বুঝতে পারছি তুমি কী বলতে চাইছো। কিন্তু কথা হচ্ছে, তুমি যা পাচ্ছো তার তুলনায় তুমি যা হারিয়েছো তা নেহাতই সামান্য। হারানোর মুহূর্তে তুমি যে-অবস্থায় থাকো তুমি কেবল তা-ই হারাও, কিন্তু সেই সঙ্গে তুমি উপলব্ধি করো যে তুমি তার থেকেও আরও বড় হয়ে গেছো। তুমিই হয়ে পড়েছো মহাবিশ্ব। সত্যি কথা বলতে কী, সোফি, তুমিই বিশ্ব-চিদাত্মা। তুমিই ঈশ্বর। সোফি অ্যামুন্ডসেন হিসেবে যদি নিজেকে তোমার হারাতে হয় তাহলে এই বিষয়টি স্মরণ করে বা জেনে তুমি স্বস্তি পেতে পারো যে এই 'নিত্যদিনকার আমি' এমন একটা জিনিস যেটাকে একদিন না একদিন তোমাকে হারাতে হবেই। তোমার আসল 'আমি'—যাকে তুমি কেবল তখনই উপলব্ধি করতে পারবে যখন তুমি নিজেকে হারাতে পারবে—মরমীবাদীদের মতে, এক রহস্যময় আগুনের মতো যা কিনা কোনো কালেও নেভে না, জ্বলতেই থাকে অনন্তকাল।

কিন্তু এ-ধরনের একটা অতীন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা সব সময় আপনা থেকে আসে না। কখনো কখনো মরমীবাদীকে 'বিশোধন আর আলোকপ্রাপ্তি'র পথ খুঁজে নিতে হয় ঈশ্বরের সাক্ষাৎ পেতে হলে। সহজ-সরল জীবন এবং ধ্যানের নানান কলা-কৌশলই হলো এই পথ। তারপর হঠাৎ করেই মরমীবাদী তাঁর লক্ষ্য অর্জন করে ফেলেন এবং তখন তিনি দাবি করতে পারেন যে 'আমিই ঈশ্বর' বা 'আমিই তুমি'।

পৃথিবীর বড় বড় সব ধর্মেই মরমীবাদী প্রবণতা লক্ষ করা যায়। মরমীবাদীদের দেয়া অতীন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার বর্ণনায় সমস্ত সাংস্কৃতিক সীমানা জুড়েই এক অসাধারণ সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। অতীন্দ্রিয় অভিজ্ঞতাটির ধর্মীয় বা দার্শনিক ব্যাখ্যা দেবার প্রচেষ্টার মধ্যেই সেই মরমীবাদীর সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটটি আপনা আপনি বেরিয়ে আসে।

পাশ্চাত্য মরমীবাদে, অর্থাৎ ইহুদি, খ্রিস্ট এবং ইসলাম ধর্মে, একজন মরমীবাদী এই কথাটির ওপর জোর দেন যে তাঁর সাক্ষাৎটি ঘটে এক ব্যক্তিগত ঈশ্বরের সঙ্গে। ঈশ্বর যদিও প্রকৃতি এবং মানব আত্মা দুটোর মধ্যেই বর্তমান, কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি জগতের অনেক ওপরে এবং দূরেও বটে। প্রাচ্য মরমীবাদে, অর্থাৎ হিন্দু, বৌদ্ধ এবং চৈনিক ধর্মে, এটাই জোর দিয়ে বলা হয়ে থাকে সাধারণত যে মরমীবাদী ঈশ্বর বা 'বিশ্ব-চিদাত্মা'র সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে একীভূত হওয়ার অভিজ্ঞতা লাভ করেন।

মরমীবাদী বলতে পারেন 'আমি-ই বিশ্ব-চিদাত্মা' বা 'আমি-ই ঈশ্বর।' কারণ ঈশ্বর কেবল জগতেই বিরাজমান নন; আবার তাকে এর বাইরেও পাওয়া যাবে না।

বিশেষ করে ভারতে, প্লেটোর সময়েরও অনেক আগে থেকে, শক্তিশালী মরমীবাদী আন্দোলন হয়ে এসেছে। পশ্চিমা জগতে হিন্দু ধর্মের পরিচয় করিয়ে দেবার ক্ষেত্রে যার ভূমিকা প্রধান, স্বামী বিবেকানন্দ নামে সেই ভারতীয় বলেছিলেন, 'ঠিক যেমন কিছু পশ্চিমা ধর্ম বলে যে যে-সমস্ত মানুষ একজন ব্যক্তিগত ঈশ্বরে বিশ্বাসী নয় তারা নাস্তিক, তেমনি আমরাও বলি যে যে-মানুষটি তার নিজের প্রতি বিশ্বাসী নয় সে একজন নাস্তিক। নিজের আত্মার অসাধারণত্বে অবিশ্বাসকেই আমরা নাস্তিক্যবাদ বলি।'

একটি অতীন্দ্রিয় বা মরমীয়া অভিজ্ঞতার নীতিগত গুরুত্বও থাকতে পারে। ভারতের একজন সাবেক প্রেসিডেন্ট সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ একবার বলেছিলেন, 'প্রতিবেশীকে নিজের মতোই ভালোবাসো, তার কারণ তুমিই তোমার প্রতিবেশী। তোমার প্রতিবেশী তুমি ছাড়া অন্য কেউ এটি একটি বিভ্রান্তি ছাড়া কিছু নয়।'

আমাদের সময়ে যে-সব মানুষ বিশেষ কোনো ধর্মের অনুসারী নয়, তাদের মধ্যেও কেউ কেউ নানান অতীন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার কথা বলে থাকে। হঠাৎ করেই তাদের এমন একটি অভিজ্ঞতা হয়েছে যেটাকে তারা বর্ণনা করেছে 'বিশ্ব-চৈতন্য' বলে বা 'মহাসামুদ্রিক অনুভূতি' বলে । তাদের কাছে মনে হয়েছে তাদেরকে সময়ের কাছ থেকে কেড়ে নেয়া হয়েছে এবং তারা জগৎকে উপলব্ধি করেছে 'শাশ্বতের বা চিরন্তনের পরিপ্রেক্ষিত' থেকে।

বিছানায় উঠে বসল সোফি। দেহ বলে সত্যিই তার কিছু আছে কিনা সে-কথাটা সে না ভেবে পারল না। তার মনে হচ্ছিল সে বুঝি ঘরের মধ্যে, জানালার বাইরে আর শহরের অনেক ওপর দিয়ে ভেসে বেড়াচ্ছে। সেখান থেকে সে নিচে স্কোয়্যারের সমস্ত লোকজনের দিকে তাকিয়েছে আর তারপর যেটা তার আবাসস্থল সেই পৃথিবীর ওপর দিয়ে ভেসেই চলেছে, উত্তর সাগর আর ইউরোপের ওপর দিয়ে, সাহারা মরুভূমিকে নিচে রেখে, আফ্রিকার দিগন্ত বিস্তৃত তৃণভূমি পেরিয়ে।

পুরো জগৎটাই যেন একটা জীবন্ত ব্যক্তিতে পরিণত হয়েছে আর মনে হচ্ছে সেই ব্যক্তিটি সোফি নিজে। জগৎটাই আমি, ভাবল সোফি। ব্যাপক, বিশাল যে-মহাবিশ্বকে তার প্রায়ই রহস্যময় আর ভয়ঙ্কর বলে মনে হতো তা যেন তার নিজের 'আমি'। মহাবিশ্বটা এখনো অবশ্য প্রকাণ্ড আর রাজকীয়ই আছে, কিন্তু এবার সে নিজেই অতোটা বড় হয়ে গেছে।

অসাধারণ সেই অনুভূতিটা ধীরে ধীরে চলে যাচ্ছে, কিন্তু সোফির মনে হলো অনুভূতিটা সে কখনোই ভুলতে পারবে না। মনে হচ্ছে তার ভেতরে যেন কিছু একটা বিস্ফোরিত হয়ে তার কপাল ফেটে বেরিয়ে গিয়ে অন্য সবকিছুর সঙ্গে মিলে মিশে এক হয়ে গেছে, ঠিক যেভাবে এক ফোঁটা রঙ এক জগ পানিকে রঙিন করে ফেলে।

ব্যাপারটা যখন শেষ হয়ে গেল তখন তার মনে হলো এটা যেন একটা চমৎকার স্বপ্ন দেখে মাথাব্যথা নিয়ে ঘুম থেকে জেগে ওঠার মতো। সামান্য বিভ্রান্তির সঙ্গে সোফি টের পেল তার একটা দেহ আছে যেটা বিছানায় উঠে বসার চেষ্টা করছে। উপুড় হয়ে অ্যালবার্টো নক্সের লেখা পড়তে পড়তে তার পিঠ ব্যথা হয়ে গেছে। তবে সেই সঙ্গে তার অবিস্মরণীয় একটা অভিজ্ঞতাও হয়েছে।

শেষ পর্যন্ত সে নিজের সমস্ত শক্তি এক করে উঠে দাঁড়াল। তারপর প্রথমেই যে কাজটা করল তা হলো পৃষ্ঠাগুলোতে ফুটো করে সেগুলোকে তার অন্যান্য লেসনের সঙ্গে রিং বাইন্ডারে ফাইল করে রাখল। তারপর চলে এলো বাগানে।

পাখিরা এমন করে ডাকছে যেন জগৎটা সদ্য সৃষ্টি হয়েছে। খরগোশ রাখার পুরানো খাঁচাগুলোর পেছনে বার্চগাছের আবছা সবুজে ভাবটা এমন তীব্র যে মনে হচ্ছে স্রষ্টা বুঝি রঙগুলো সব এখনো ভালো করে মেশানো শেষ করতে পারেননি।

সত্যিই কি সে বিশ্বাস করবে যে প্রতিটি জিনিসই এক স্বর্গীয় 'আমি'? সে কি বিশ্বাস করবে যে তার আত্মার ভেতর সে 'আগুনের একটা স্ফুলিঙ্গ' বহন করছে? যদি তা সত্যি হয় তাহলে সে সত্যিই এক স্বর্গীয় প্রাণী।

পোস্টকার্ড

ছাবে

...নিজের ওপর আমি এক কঠোর সেন্সরশীপ আরোপ করছি...

বেশ কিছু দিন কেটে গেল, দর্শন শিক্ষকের কাছ থেকে একটি অক্ষরও এসে পৌছল না। আগামীকাল বৃহস্পতিবার ১৭ মে, নরওয়ের জাতীয় দিবস। স্কুল ১৮ তারিখে বন্ধ থাকবে। স্কুল শেষে ওরা হেঁটে বাড়ি ফেরার সময় হঠাৎই জোয়ানা বলে উঠল, 'চল না, ক্যাম্পিংয়ে যাই!'

সোফির প্রথমেই যে-কথাটা মনে হলো তা হচ্ছে বাড়ি ছেড়ে বেশিদিন থাকা চলবে না। তারপরেও সে বলল, 'বেশ তো, চল।'

ঘণ্টা দুই পর বড়সড় একটা ব্যাকপ্যাক নিয়ে জোয়ানা হাজির হলো সোফির ঘরের দরজায়। সোফিও ততক্ষণে নিজের জিনিস গুছিয়ে নিয়েছে। তাছাড়া, তার একটা তাঁবুও আছে। ওরা দু'জনেই বেডরোল, সোয়েটার, গ্রাউন্ডশিট আর ফ্ল্যাশলাইট, বড় সাইজের থার্মোস বোতল আর সেই সঙ্গে যথেষ্ট পরিমাণে পছন্দসই খাবার-দাবার সঙ্গে নিয়েছে।

সোফির মা ওদেরকে কী করতে হবে না হবে তাই নিয়ে কিছু উপদেশ দিলেন পাঁচটার সময় বাড়ি ফিরে। তিনি এ-ও জানতে চাইলেন ক্যাম্পটা ওরা কোথায় বসাবে।

ওরা তাঁকে বলল গ্রাউস টপ-এ যাওয়ার ইচ্ছে ওদের। ভাগ্য ভালো হলে আগামীকাল সকালে ওরা জংলি হাঁসের মেটিং কলও শুনতে পারে। বিশেষ করে এই জায়গাটা বেছে নেবার পেছনে অবশ্য সোফির অন্য একটা উদ্দেশ্য আছে। গ্রাউস টপ-টা মেজরের কেবিনের বেশ কাছে বলেই সে জানে। ওখানে ফিরে যাওয়ার জন্য একটা তাড়া অনুভব করছে সে, কিন্তু একা যেতে সাহস হচ্ছিল না তার।

সোফিদের বাগানের গেটটার ঠিক পরেই কানাগলিটা থেকে যে পথটা বেরিয়ে গেছে সেটি ধরে হেঁটে চলল মেয়ে দুটি। এটা-ওটা নিয়ে আলাপ করছিল দু'জনে আর দর্শন সম্পর্কিত সমস্ত কিছুর হাত থেকে কিছু সময়ের জন্য একটা ছুটি পেয়ে সোফিরও বেশ ভাল লাগছিল।

আটটার মধ্যেই ওরা গ্রাউস টপের একটা ফাঁকা জায়গায় তাঁবু বসিয়ে ফেলল। রাতের জন্য প্রস্তুতি নিয়ে ফেলল ওরা। বিছিয়ে ফেলল বেডরোলগুলো। ওরা যখন স্যান্ডউইচ খাওয়া শেষ করেছে এমন সময় সোফি জিজ্ঞেস করল, 'তুই মেজরের কেবিনের কথা শুনেছিস কখনো?'

'মেজরের কেবিন?'

'এখান থেকে কাছেই একটা জায়গায় কুঁড়েঘর আছে একটা...ছোট্ট একটা লেকের পাশে। অদ্ভুত একটা লোক, এক মেজর থাকত সেখানে, সেজন্যই নাম মেজরের কেবিন।'

'এখন কি কেউ থাকে ওখানে?'

'গিয়ে দেখবি নাকি?'

'কোথায় ওটা?'

গাছগুলোর দিকে তর্জনী তাক করল সোফি।

জোয়ানার খুব একটা উৎসাহ নেই, কিন্তু শেষ পর্যন্ত রওনা হলো দু'জনে। আকাশে সূর্য তখন অনেকটা নেমে এসেছে।

প্রথমে উঁচু উঁচু পাইন গাছের ভেতর দিয়ে এগোলেও কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখা গেল ঘন ঝোপ-ঝাড়ের ভেতর দিয়ে পথ করে হেঁটে চলেছে ওরা। শেষ পর্যন্ত একটা পথ ধরে চলতে লাগল দুজন। এটাই কি সেই পথ রোববার যেটা ধরে গিয়েছিল সোফি?

নিশ্চয়ই তাই—প্রায় সেই মুহূর্তেই পথটার ডান দিকে গাছগুলোর ভেতর দিয়ে চকচকে একটা জিনিস দেখতে পেল সে।

'ওখানেই ওটা,' সে বলল।

একটু পরেই দু'জনে ছোট্ট লেকটার পাশে এসে দাঁড়াল। লেকের ওপারে কেবিনটার দিকে তাকিয়ে রইল সোফি। সবকটা জানালা বন্ধ এখন। লাল বাড়িটার মতো এমন নির্জন জায়গা সে বহুদিন দেখেনি।

সোফির দিকে তাকাল জোয়ানা। 'পানির ওপর দিয়ে হেঁটে যেতে হবে নাকি আমাদের?'

'কী যে বলিস। নৌকা বেয়ে ওপারে যাবো আমরা।'

নলখাগড়ার ঝোপের দিকে দেখাল সোফি। নৌকোটা ওখানেই আছে ঠিক আগের মতো।

'আগে কখনো ওখানে গিয়েছিস নাকি?'

মাথা নাড়ল সোফি। তার আগের সফরটার কথা ব্যাখ্যা করে বোঝানো সহজ হবে না। এবং তখন তার বান্ধবীকে অ্যালবের্টো নক্স আর দর্শন কোর্সটার কথাও বলে দিতে হবে।

নৌকো বেয়ে ওপারে যেতে যেতে হাসি ঠাট্টায় মেতে উঠল দু'জনে। ওপারে পৌঁছে সোফি নৌকাটাকে পুরোপুরি ডাঙায় টেনে তুলতে ভুল করল না।

সামনের দরজাটার কাছে পৌঁছল দু'জনে। যখন পরিষ্কার বোঝা গেল ভেতরে কেউ নেই, জোয়ানা হাতলটা ঘোরাবার চেষ্টা করল।

'তালা মারা... তুই নিশ্চয়ই ভাবিসনি খোলা থাকবে ওটা?'

'হয়ত চাবি-টাবি কিছু একটা পেয়ে যাবো,' সোফি বলল।

পাথরের ফাউন্ডেশনটার ফাঁক-ফোকরে খুঁজে দেখতে শুরু করল সে।

'তারচেয়ে বরং চল তাঁবুতেই ফিরে যাই, কয়েক মিনিট পর জোয়ানা বলল।

কিন্তু ঠিক তখনই চেঁচিয়ে উঠল সোফি। 'এই যে! পেয়েছি!'

বিজয়ীর ভঙ্গিতে চাবিটা উঁচু করে ধরল সে। তারপর ওটা তালার ফুটোতে ঢোকাল, দরজা খুলে গেল।

দুই বন্ধু এমনভাবে চুপিসারে ঘরের ভেতর ঢুকল যেন কোনো মন্দ উদ্দেশ্য আছে ওদের। কেবিনের ভেতরটা ঠাণ্ডা, অন্ধকার।

'কিছুই তো দেখতে পাচ্ছি না রে!' জোয়ানা বলে উঠল।

কিন্তু সোফি সে-কথা ভেবে রেখেছিল। পকেট থেকে সে দেশলাইয়ের বাক্স বের করে একটা কাঠি ধরাল। কাঠিটা নিভে যাওয়ার আগে ওরা কেবল এইটুকু দেখতে পেল যে কেবিনটা ফাঁকা। আরেকটা কাঠি ধরাল সোফি, এবার সে দেখতে পেল স্টোভের ওপর রট আয়রনের একটা মোমদানির ওপর একটা মোমবাতির অবশিষ্টাংশ দাঁড়িয়ে আছে। তৃতীয় কাঠিটা দিয়ে ওটা ধরাল সে, তাতে চারদিকে দেখতে পাওয়ার মতো যথেষ্ট আলোকিত হয়ে উঠল ছোট্ট ঘরটা।

'ব্যাপারটা একটু অদ্ভুত না যে এতো ছোট্ট একটা মোমবাতি এতোখানি অন্ধকার দূর করতে পারে?' সোফি বলে উঠল।

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল তার বন্ধু।

'কিন্তু একটা জায়গায় গিয়ে আলোটা অন্ধকারে হারিয়ে যায়,' বলে চলে সোফি। 'আসলে অন্ধকারের নিজের কোনো অস্তিত্ব নেই। আলোর অভাবই হলো অন্ধকার।'

কেঁপে উঠল জোয়ানা। 'আমার গা শিরশির করছে, চল, চলে যাই।'

'তার আগে আয়নাটায় একবার তাকাতে হবে।'

পেতলের ফ্রেমের আয়নাটা চেস্ট অভ্ ড্রয়ার্সের ওপর আগের মতোই ঝুলছে।

'খুব সুন্দর তো!' জোয়ানা বলে উঠল।

'এটা কিন্তু জাদুর আয়না।'

'মিরর অন দ্য ওয়াল, হু ইজ দ্য ফেয়ারেস্ট অভ্ দেম অল?'

'আমি ঠাট্টা করছি না, জোয়ানা। আয়নাটায় তাকালে তুই নিজেই দেখতে পাবি।'

'সত্যি করে বলতো, আসলেই কি তুই আগে আসিসনি এখানে? তাছাড়া সব সময় আমাকে ভয় দেখিয়ে কী মজা পাস বলতো?'

এবার কোনো জবাব দিতে পারল না সোফি।

'স্যরি।'

এরপর হঠাৎ করে জোয়ানা-ই আবিষ্কার করল ঘরের এক কোণায় কী যেন পড়ে আছে মেঝেতে। জিনিসটা একটা ছোট্ট বাক্স। জোয়ানা সেটি হাতে তুলে নিল।

'পোস্টকার্ড সব।' বলল সে।

মুখটা হাঁ হয়ে গেল সোফির।

'ধরিস না ওগুলো! শুনতে পাচ্ছিস-ধরিস না যেন তুই ওগুলো!'

লাফ দিয়ে উঠল জোয়ানা। এমনভাবে বাক্সটা ফেলে দিল সে যেন আগুনের ছ্যাঁকা লেগেছে তার হাতে। পোস্টকার্ডগুলো ছড়িয়ে পড়ল সারা মেঝে জুড়ে। পরের মুহূর্তেই হাসতে শুরু করল সে।

'নেহাতই পোস্টকার্ড এগুলো।'

মেঝেতে বসে পড়ে সেগুলো তুলে ফেলতে লাগল জোয়ানা। খানিক পর সোফি-ও এসে বসল তার পাশে।

'লেবানন... লেবানন... সবগুলোতেই দেখছি লেবাননের পোস্টমার্ক দেয়া,' জোয়ানা আবিষ্কার করল।

'আমি জানি,' বলল সোফি।

নিমিষে শিরদাঁড়া সোজা করে বসে সরাসরি সোফির চোখের দিকে তাকাল জোয়ানা।

'তাহলে এর আগেও এসেছিস তুই এখানে!'

'হ্যাঁ, এসেছি।'

হঠাৎ করেই তার মনে হলো সে যদি আগেই স্বীকার করতো যে এর আগেও সে এখানে এসেছে তাতেই বরং ব্যাপারটা অনেক সহজ হতো। গত কিছুদিন ধরে সে যে-সব রহস্যময় অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে যাচ্ছে সে-কথা তার বন্ধুকে বললে নিশ্চয়ই মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যেতো না।

'এখানে আসার আগে আসলে কথাটা বলতে চাইনি তোকে।'

কার্ডগুলো পড়তে শুরু করল জোয়ানা।

'সবগুলোই হিল্ডা মোলার ন্যাগ নামের কাউকে লেখা।'

কার্ডগুলো এখনো ছোঁয়নি সোফি।

'ঠিকানা কী লেখা?'

জোয়ানা পড়ে শোনাল 'হিল্ডা মোলার ন্যাগ, প্রযত্নে অ্যালবার্টো নক্স, লিলেস্যান্ড, নরওয়ে।'

স্বস্তির একটা নিঃশ্বাস ফেলল সোফি। সে ভয় পেয়েছিল ওগুলোতে প্রযত্নে সোফি অ্যামুন্ডসেন লেখা থাকবে।

'আরও ভালো করে কার্ডগুলো পরীক্ষা করতে শুরু করল সে।

'২৮ এপ্রিল...৪ মে...৬ মে...৯ মে...কয়েকদিন আগের পোস্টমার্ক।'

'কিন্তু এ-ছাড়াও আরেকটা জিনিস আছে। সবকটা পোস্টমার্কই নরওয়ের! এই দ্যাখ...ইউএন ব্যাটেলিয়ন...ডাকটিকিটগুলোও নরওয়ের!'

'আমার মনে হয় এটাই ওদের রীতি। এক ধরনের নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে হয় ওদেরকে, কাজেই ওদের সঙ্গেই নরওয়ের পোস্ট অফিস রেখেছে ওরা।'

'কিন্তু চিঠিগুলো ওরা বাড়ি পাঠায় কী করে?'

'এয়ার ফোর্সের মাধ্যমে, সম্ভবত।'

মোমদানিটা মেঝের ওপর রাখল সোফি, তারপর দুই বন্ধু মিলে পড়তে শুরু করল কার্ডগুলো। জোয়ানা সেগুলোকে তারিখ অনুযায়ী সাজাল, তারপর পড়তে লাগল প্রথম কার্ডটা

প্রিয় হিল্ডা, লিলেস্যান্ড ফেরার জন্য আমি আর অপেক্ষা করতে পারছি না। আশা করছি মিডসামার ঈভ্-এর দিন খুব সকালে কিয়েভিকে ল্যান্ড করবো। তোর ১৫শ জন্মদিন উপলক্ষে আমি ঠিক সময় মতোই পৌছুতে পারতাম,

কিন্তু বুঝিসই তো, আমি সামরিক বাহিনীর অধীনে আছি। তবে ক্ষতিপূরণ হিসেবে, তুই যাতে তোর জন্মদিন উপলক্ষে একগাদা উপহার পাস সেদিকে আমার সমস্ত সস্নেহ মনোযোগ থাকবে।

ভালোবাসা নিস আর জানবি তোর ভবিষ্যৎ নিয়ে আমি সব সময়ই ভাবি।

পুনশ্চ এই কার্ডের একটা কপি এমন একজনের কাছে পাঠাচ্ছি যে আমাদের দু'জনেরই বন্ধু। আমার ধারণা, ব্যাপারটা তুই বুঝতে পারবি, হিল্ডা। এই মুহূর্তে আমাকে খুব গোপনীয়তা বজায় রাখতে হচ্ছে। আশা করি কারণটা তুই বুঝতে পারবি।

পরের কার্ডটা তুলে নিল সোফি

প্রিয় হিল্ডা, এখানে আমরা একদিন করে এগোই। লেবাননে কাটানো আমার এই দিনগুলোর যে-স্মৃতিটা আমার মনে থেকে যাবে তা হলো এই অপেক্ষার ব্যাপারটা। আমি আমার সাধ্যমতো চেষ্টা করছি যাতে তোর ১৫শ জন্মদিনটা তুই যদ্দূর সম্ভব ভালোভাবে পালন করতে পারিস। আপাতত এরচেয়ে বেশি কিছু আর বলা সম্ভব হচ্ছে না আমার পক্ষে। নিজের ওপর আমি এক কঠোর সেন্সরশীপ আরোপ করছি। ভালোবাসা নিস, বাবা।

উত্তেজনায় দুই বন্ধুর নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এলো। দু'জনের কারও মুখেই কোনো কথা নেই, তারা শুধু পড়ে যাচ্ছে কার্ডগুলোতে কী লেখা আছে :

মা-মণি আমার, এখন আমার ভীষণ ইচ্ছে হচ্ছে নিজের গোপন চিন্তাগুলো একটা সাদা ঘুঘু পাখিকে দিয়ে তোর কাছে পাঠিয়ে দিতে। কিন্তু লেবাননে এখন সাদা ঘুঘুর খুব অভাব। এই যুদ্ধ-বিধ্বস্ত দেশে এখন যদি কোনো কিছুর প্রয়োজন থাকে তা এই সাদা ঘুঘু পাখির। আশা করি, কোনো একদিন জাতিসংঘ পৃথিবীতে সত্যি সত্যিই শান্তি আনতে পারবে।

তোর জন্মদিনের উপহারটা আশা করি তুই অন্যদের সঙ্গে ভাগ করে নিতে পারবি। আমি বাড়ি ফিরলে পর এ-নিয়ে কথা বলা যাবে। কিন্তু তুই নিশ্চয়ই এখনো বুঝতে পারিসনি আমি কী নিয়ে কথা বলছি, ঠিক কি না? ভালোবাসা নিস, এ-কথা জানিস যে আমাদের দু'জনের কথা ভাববার যথেষ্ট অবসর আছে আমার।

ছয়টা কার্ড পড়ার পর আর একটা বাকি রইল।

প্রিয় হিল্ডা, তোর জন্মদিনের এ-সব গোপন ব্যাপার-স্যাপার নিয়ে ভেতরে ভেতরে আমি এখন এমন টগবগ করে ফুটছি যে খানিক পরপরই নিজেকে

আমার সামলে নিতে হচ্ছে বাড়িতে ফোন করে সবকিছু ফাঁস করে দেয়া থেকে। জিনিসটা এমন যে দিনে দিনে সেটি বেড়ে চলেছে। আর তুই তো জানিস যে কোনো কিছু যদি ধীরে ধীরে বড় হতে থাকে তখন সেটিকে নিজের মধ্যে চেপে রাখা মুশকিল। বাবার ভালোবাসা নিস।

পুনশ্চ সোফি নামের একটা মেয়ের সঙ্গে একদিন দেখা হবে তোর। তার আগে তোরা যাতে একে অন্যকে আরও ভালোভাবে জানতে পারিস সেজন্য তোকে পাঠানো সবকটা কার্ডের একটি কপি আমি ওকেও পাঠাতে শুরু করেছি। আশা করছি শিগগিরই মেয়েটি সব বুঝে উঠতে পারবে। আপাতত সে তোর চেয়ে বেশি কিছু জানে না। মেয়েটির এক বন্ধু আছে, জোয়ানা নাম। সে কি কোনো সাহায্য করতে পারবে?

শেষ কার্ডটা পড়া হয়ে যাওয়ার পর জোয়ানা আর সোফি ছানাবড়া চোখে একে অন্যের দিকে তাকিয়ে স্থির হয়ে বসে রইল। শক্ত মুঠিতে সোফির কব্জিটা ধরে থাকল জোয়ানা।

'আমার ভয় লাগছে,' সে বলল।

'আমারও।'

'শেষ কার্ডটায় কত তারিখের পোস্টমার্ক দেয়া?'

ফের কার্ডটার দিকে তাকাল সোফি।

'ষোলই মে,' বলল সে, 'তার মানে আজকে।'

'হতেই পারে না।' একরকম রেগেই চেঁচিয়ে উঠল জোয়ানা।

ভালো করে ডাকঘরের সিলমোহরটা পরীক্ষা করে দেখল দু'জনে, কিন্তু কোনো ভুল ধরা পড়ল না...১৬.০৫.৯০।

'এ-অসম্ভব,' জোর গলায় বলল জোয়ানা। 'তাছাড়া আমি ভাবতেও পারছি না কে এমন চিঠি লিখতে পারে। নিশ্চয়ই এমন কেউ যে আমাদের দু'জনকেই চেনে। কিন্তু সে কী করে জানল যে আজকেই আমরা এখানে আসবো?'

দু'জনের মধ্যে জোয়ানাই ভয় পেয়েছে অনেক বেশি। হিল্ডা আর তার বাবার মধ্যেকার এই ব্যাপার-স্যাপার সোফির কাছে নতুন কিছু নয়।

'আমার মনে হয় পেতলের আয়নাটার কোনো সম্পর্ক রয়েছে এর সঙ্গে।'

আবারও লাফ দিয়ে উঠল জোয়ানা।

'তুই নিশ্চয়ই একথা ভাবছিস না যে কার্ডগুলোতে লেবাননে সিলমোহর মারার সঙ্গে সঙ্গে সেগুলো আয়নাটা থেকে ঝরে পড়েছে?'

'তোর কাছে কি এরচেয়ে ভালো কোনো ব্যাখ্যা আছে?'

'তা অবশ্য নেই।'

সোফি উঠে দাঁড়িয়ে দেয়ালে টাঙানো পোর্ট্রেট দুটোর সামনে গিয়ে ধরল মোমবাতিটা। জোয়ানাও এসে দাঁড়াল তার পাশে, তাকাল ছবি দুটোর দিকে।

'বার্কলে আর বিয়ার্কলে। এর অর্থ কী?'

'আমার কোনো ধারণা নেই।'

মোমবাতিটা পুড়ে পুড়ে প্রায় শেষ হয়ে এসেছে।

'চল যাই,' বলে উঠল জোয়ানা, 'আয় না!'

'আয়নাটা নিতে হবে আমাদের সঙ্গে।'

সোফি হাত বাড়িয়ে দিয়ে পেতলের ফ্রেমে বাঁধানো আয়নাটা চেস্ট অভ্ ড্রয়ার্সের ওপর থেকে খুলে নিল। জোয়ানা ওকে থামানোর চেষ্টা করল, কিন্তু সোফিকে রোখা গেল না।

ওরা যখন বেরিয়ে এলো বাইরে তখন অন্ধকার, মে-মাসের রাতগুলো যে-রকম অন্ধকার হয়। আকাশে তখনো যতটুকু আলো তাতে ঝোপ-ঝাড় আর গাছগুলোর কাঠামোটা দেখা যাচ্ছে। ছোট্ট লেকটাকে দেখে মনে হচ্ছে ওপরের আকাশটারই প্রতিবিম্ব। মেয়ে দুটো গম্ভীর মুখে বৈঠা বেয়ে অপর পারে চলে এলো।

তাঁবুতে ফেরার পথে দু'জনের কেউই কথা বলল না খুব একটা। যদিও প্রত্যেকেই বুঝতে পারছিল যে যা ঘটে গেছে তা নিয়ে অন্যজনের মনে চিন্তার ঝড় বয়ে যাচ্ছে। থেকে থেকেই শোনা যাচ্ছে ভয়ার্ত কোনো পাখির চিৎকার, তাছাড়া বার দুয়েক ওরা পেঁচার ডাকও শুনতে পেল।

তাঁবুতে পৌছেই যার যার বেডরোলের ভেতর ঢুকে পড়ল দু'জন। আয়নাটা ভেতরে ঢোকাতে দেয়নি জোয়ানা। ঘুমিয়ে পড়ার আগে ওরা দু'জনেই এ-ব্যাপারে একমত হলো যে আয়নাটা যে তাঁবুর ফ্ল্যাপের বাইরে পড়ে আছে সেটি জানাই বুকে কাঁপন ধরানোর জন্য যথেষ্ট। সোফি অবশ্য পোস্টকার্ডগুলোও নিয়ে তার ব্যাকপ্যাকের একটা পকেটে ভরে রেখেছিল।

পরদিন খুব সকালে ঘুম ভাঙল ওদের। সোফি-ই উঠল প্রথম। বুটজোড়া পরে তাঁবুর বাইরে বেরিয়ে এলো সে। বিরাট আয়নাটা ঘাসের ওপর পড়ে আছে শিশিরস্নাত হয়ে।

সোফি নিজের সোয়েটারটা দিয়ে শিশিরকণাগুলো মুছে নিচু হয়ে নিজের প্রতিবিম্বের দিকে তাকাল। ব্যাপারটা যেন সে একই সঙ্গে নিচে এবং ওপর দিকে তার নিজের দিকেই তাকিয়ে আছে। ওর সৌভাগ্যই বলতে হবে, এই ভোরবেলাতে লেবানন থেকে আসা কোনো পোস্টকার্ড দেখতে পেল না সে।

তাঁবুর পেছনের পরিষ্কার ফাঁকা জায়গাটায় ভোরবেলার ছেঁড়াফাঁড়া কুয়াশা ছোট ছোট তুলোর দলামতন হয়ে ধীরে ধীরে ভেসে বেড়াচ্ছে। ছোট ছোট পাখির তীব্র কিচিরমিচির শব্দ শোনা যাচ্ছে, কিন্তু সোফি কোনো জংলি হাঁসের দেখাও পেল না, ডাকও শুনতে পেল না।

মেয়ে দুটো বাড়তি একটা সোয়েটার চাপিয়ে নিল গায়ে। তারপর তাঁবুর বাইরে বসে ব্রেকফাস্ট সারল। কিছুক্ষণের মধ্যেই মেজরের কেবিন আর রহস্যময় কার্ডের দিকে মোড় নিল তাদের আলাপ।

ব্রেকফাস্টের পর তাঁবুটা গুটিয়ে নিয়ে বাড়ির দিকে রওয়ানা হলো ওরা। বিশাল আয়নাটা সোফি তার বাহুর নিচে চেপে ধরে হেঁটে চলল। একটু পরপরই জিরিয়ে নিতে হচ্ছিল তাকে, জোয়ানা আয়নাটা ছুঁতেই চাইল না।

শহরের প্রান্তসীমানায় পৌছাতে বিক্ষিপ্ত গুলির শব্দ কানে এলো ওদের। যুদ্ধ-

বিধ্বস্ত লেবানন সম্পর্কে হিল্ডার বাবা কী লিখেছেন সে-কথা মনে পড়ে গেল সোফির। এবং একটা শান্তিপূর্ণ দেশে জন্ম নেয়ার জন্য নিজেকে ভীষণ সৌভাগ্যবান মনে হলো তার। ওরা যে 'গুলি'-র শব্দ শুনেছে সেটি জাতীয় দিবস উদযাপনের জন্য নির্দোষ আতশবাজির।

সোফি এক কাপ গরম চকোলেট খেয়ে যেতে আমন্ত্রণ জানাল জোয়ানাকে।

আয়নাটা ওরা কোথায় পেল তা জানার জন্য ভীষণ কৌতূহলী হয়ে উঠলেন সোফির মা। সোফি তাঁকে বলল মেজরের কেবিনের বাইরে ওটা পেয়েছে ওরা। বহু বছর ধরে যে ওখানে কেউ থাকেনা সে-গল্পটা তখন ওদেরকে ফের বললেন সোফির মা।

জোয়ানা চলে যাওয়ার পর সোফি লাল একটা পোশাক পরল। নরওয়ের জাতীয় দিবসের বাকি সময়টা স্বাভাবিকভাবেই কেটে গেল। লেবাননে জাতিসংঘের নরওয়েজীয় বাহিনী কী করে দিনটি পালন করল তাই নিয়ে সন্ধ্যায় টিভির খবরে একটা ফিচার দেখাল। সোফির চোখ আঠার মতো সেঁটে রইল টিভির পর্দায়। যাদেরকে সে দেখতে পাচ্ছে তাদের মধ্যে কোনো একজন হয়ত হিল্ডার বাবা।

১৭ মে সোফি শেষ যে-কাজটা করল তা হলো বিশাল আয়নাটা সে তার ঘরের দেয়ালে টাঙিয়ে দিল। পরদিন সকালে নতুন একটা বাদামি খাম পেল সে গুহায়। সঙ্গে সঙ্গে সেটির মুখ ছিড়ে পড়তে শুরু করল সে।

দুই সংস্কৃতি

ছাব্বিশ

...শূন্যে ভেসে বেড়ানো এড়াবার একমাত্র উপায়...

প্রিয় সোফি, শিগ্‌গিরই দেখা হবে আমাদের। আমি আন্দাজ করেছিলাম মেজরের কেবিনে যাবে তুমি আবার, সেজন্যই হিল্ডার বাবার পাঠানো কার্ডগুলো সব ওখানেই রেখে এসেছিলাম। কার্ডগুলো ওর কাছে পৌঁছানোর আর কোন উপায় ছিল না। কার্ডগুলো সে কীভাবে পাবে তা নিয়ে বেশি মাথা ঘামানোর দরকার নেই তোমার। ১৫ জুনের আগে অনেক কিছুই ঘটতে পারে।

আমরা দেখেছি হেলেনিস্টিক দার্শনিকেরা কীভাবে তাঁদের আগেকার দার্শনিকদের ধারণাগুলোকে ব্যবহার করে নতুন দর্শনের সৃষ্টি করেছেন। কেউ কেউ তো আবার তাঁদের পূর্বসূরিদেরকে ধর্মীয় প্রবক্তাতেও রূপান্তরিত করতে চেয়েছিলেন। প্লটিনাস প্লেটোর প্রশংসা করতে গিয়ে তাঁকে মানব জাতির ত্রাণকর্তার আসন দিয়েছিলেন প্রায়।

কিন্তু আমরা জানি, আমরা এখন যে-সময়টা নিয়ে আলোচনা করছি ঠিক এই সময়ের আরেক জন ত্রাণকর্তা জন্ম নিয়েছিলেন আর সে-ঘটনাটা ঘটেছিল গ্রেকো-রোমান এলাকার বাইরে। আমি নাজারেথ-এর যিশুর কথা বলছি। এই অধ্যায়ে আমরা দেখবো হিল্ডার জগৎ যেভাবে ধীরে ধীরে আমাদের জগতে ঢুকে পড়ছে অনেকটা সেভাবে খ্রিস্টধর্ম কি করে ধীরে ধীরে গ্রেকো-রোমান জগতে ঢুকে পড়ল।

যিশু ছিলেন ইহুদি আর ইহুদিরা সেমিটিক সংস্কৃতির মানুষ। গ্রিক এবং রোমানরা ইন্দো-ইউরোপীয় সংস্কৃতির মানুষ। ইউরোপীয় সংস্কৃতির শেকড় এই দুই সংস্কৃতিতেই রয়েছে। তবে, খ্রিস্টধর্ম কী করে গ্রেকো-রোমান সংস্কৃতিকে প্রভাবিত করল সেটি ভালো করে বোঝার চেষ্টা করার আগে এই শেকড়গুলো পরীক্ষা করে দেখাটা ভীষণ জরুরি।

ইন্দো-ইউরোপীয়দের কথা (The Indo-Europeans)

ইন্দো-ইউরোপীয় বলতে আমরা সেই সব জাতি এবং সংস্কৃতির কথা বুঝিয়ে থাকি যারা ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা ব্যবহার করে। যে-সব জাতি ফিনো-ইউগরিয়ান ভাষাগুলোর (লাপ, ফিনিশ, এস্তোনীয় এবং হাঙ্গেরীয়) কোনো একটি বা বাস্ক ভাষা

ব্যবহার করে সেগুলো ছাড়া ইউরোপীয় সমস্ত জাতিই ইন্দো-ইউরোপীয়। তাছাড়া ভারতীয় এবং পারসিক বেশিরভাগ ভাষাই ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত।

আদি ইন্দো-ইউরোপীয়রা আজ থেকে ৪,০০০ বছর আগে কৃষ্ণ সাগর এবং কাস্পিয়ান সাগরের আশপাশের এলাকায় বাস করত।

সেখান থেকে এই ইন্দো-ইউরোপীয় জনগোষ্ঠী বিভিন্ন দলে ছড়িয়ে পড়ে দক্ষিণ-পূর্বে পারস্য (ইরান) আর ভারতে, দক্ষিণ-পশ্চিমে গ্রিস, ইতালি আর স্পেনে, পশ্চিমে মধ্য ইউরোপ থেকে ফ্রান্স আর ব্রিটেনে, উত্তর-পশ্চিমে স্ক্যানডিনেভিয়ায় আর উত্তরে পূর্ব ইউরোপ ও রাশিয়ায়। যেখানেই গিয়েছে, ইন্দো-ইউরোপীয়রা স্থানীয় সংস্কৃতিকে নিজেদের অঙ্গীভূত করে নিয়েছে, অবশ্য সব জায়গাতেই ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা এবং ইন্দো-ইউরোপীয় ধর্ম তার প্রাধান্য বজায় রেখেছে।

প্রাচীন ভারতীয় বেদশাস্ত্র, গ্রিক দর্শন এবং স্নরি স্টুরলুসান (Snorri Sturluson)-এর পুরাণ, এগুলো সব একই ধরনের ভাষাতে লেখা হয়েছে। তবে শুধু যে ভাষাগুলোই এক রকম তা নয়। একই রকম ভাবা, একই রকম ধ্যান-ধারণারও জন্ম দেয়। এই কারণেই আমরা প্রায়ই একটি ইন্দো-ইউরোপীয় সংস্কৃতির কথা বলে থাকি।

ইন্দো-ইউরোপীয়দের সংস্কৃতিকে সবচেয়ে বেশি যা প্রভাবিত করেছিল তা হলো বহু দেবতায় তাদের বিশ্বাস। বহু দেবতায় এই বিশ্বাসকে বলা হয় বহুদেবত্ববাদ (polytheism)। এই দেবতাদের নাম এবং ধর্মীয় পরিভাষার অনেক কিছুই গোটা ইন্দো-ইউরোপীয় এলাকা জুড়ে পাওয়া যাবে। কয়েকটা উদাহরণ দিচ্ছি তোমাকে

প্রাচীন ভারতীয়রা *দিয়ায়ুস* (Dyaus) বলে একজন স্বর্গীয় দেবতার পূজা করতো। সংস্কৃত এই শব্দটির অর্থ আকাশ, দিবস, স্বর্গ। গ্রিক ভাষায় এই দেবতার নাম জিউস (Zeus), লাতিনে *জুপিটার* (Jupiter, প্রকৃতপক্ষে ইয়ভ-পেতর বা 'স্বর্গপিতা') এবং প্রাচীন নর্স ভাষায় *টির* (Tyr)। কাজেই দিয়ায়ুস, জিউস, ইয়ভ এবং টির হচ্ছে একই শব্দের উপভাষাগত (dialectical) পরিবর্তিত রূপ।

তোমার হয়ত জানা আছে প্রাচীন ভাইকিংরা *আসের* (Aser) নামের একদল দেবতায় বিশ্বাস করত। এই শব্দটিও গোটা ইন্দো-ইউরোপীয় অঞ্চল জুড়ে প্রচলিত। ভারতের প্রাচীন ধ্রুপদী ভাষা সংস্কৃততে দেবতাদের অসুর[১১] বলা হয়, পারসিক ভাষায় *আহুর*। সংস্কৃত ভাষায় 'দেবতা' বোঝাতে দেব শব্দটিও ব্যবহৃত হয়। পারসিকে *দায়েভা*, লাতিনে দিউস এবং প্রাচীন নর্স-এ *টিভুর*।

ভাইকিংদের সময়ে লোকজন উর্বরতার বিশেষ একদল দেবতায় বিশ্বাস করত (যেমন নিওর্ড, ফ্রেইর, ফ্রেইয়া)। এই দেবতাদের সবাইকে বিশেষ একটা সামষ্টিক নামে ডাকা হতো ভানের (vaner), এই শব্দটির সঙ্গে লাতিন ভাষায় উর্বরতার দেবী *ভেনাস*-এর নামের সঙ্গে মিল রয়েছে। সংস্কৃততে কাছাকাছি শব্দ একটি আছে *বাণী*, যার অর্থ 'ইচ্ছা।'

---

১১. হিন্দুপুরাণে দেবতা হিসেবে ইন্দ্র, বরুণ ও অগ্নিকে অসুর বলা হতো। পরে শব্দটির অর্থ পুরোপুরি বদলে যায়—যারা দেবতাদের সঙ্গে বিরোধ লিপ্ত হয়, যারা সমুদ্রমন্থনের ফলে উঠে আসা সুধা পায়নি তারাই অসুর (সূত্র *বাংলা বিশ্বকোষ*, ১ম খণ্ড, ১ম সংস্করণ, পৃষ্ঠা ৫৭, মুক্তধারা, প্রকাশকাল ডিসেম্বর ১৯৭২)—অনুবাদক।

ইন্দো-ইউরোপীয় কিছু কিছু-পুরাণের মধ্যেও মিল লক্ষ করা যায়। প্রাচীন নর্স দেবতাদের যে-সব কাহিনী স্নরি লিখে গেছেন সেগুলোর সঙ্গে দুই-তিন হাজার বছর আগে থেকে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে প্রচলিত ভারতীয় কিছু পুরাণের সাদৃশ্য রয়েছে। যদিও স্নরির পুরাণের প্রেক্ষাপট নর্ডিক, ভারতীয় পুরাণের ভারতীয়, তারপরেও সেগুলোর অনেকগুলোতেই এমন কিছু বৈশিষ্ট্য বা চিহ্ন বর্তমান যা দেখে বোঝা যায় সেগুলোর উৎস এক। যে-সব পুরাণ অমৃত এবং দেবতা ও অরাজকতা সৃষ্টিকারী দৈত্যদের মধ্যে যুদ্ধের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সেগুলোতেই এ-সব চিহ্ন সবচেয়ে সুস্পষ্ট।

ইন্দো-ইউরোপীয় সংস্কৃতিগুলো জুড়ে চিন্তার ধরনেও সুস্পষ্ট সাদৃশ্য দেখতে পাবো আমরা। একটি খুব সাধারণ সাদৃশ্য হচ্ছে জগৎকে একটি নাটকের অন্তর্ভুক্ত হিসেবে বিবেচনা করার ধরনে, যেখানে শুভ এবং অশুভ শক্তিগুলো এক নিরন্তর সংগ্রামে রত। সেজন্য ইন্দো-ইউরোপীয়রা প্রায়ই শুভ এবং অশুভর মধ্যকার যুদ্ধের গতি-প্রকৃতি নিয়ে 'ভবিষ্যদ্বাণী' করার চেষ্টা করত।

ইন্দো-ইউরোপীয় সাংস্কৃতিক বলয়ে গ্রিক দর্শনের উদ্ভব যে কোনো দুর্ঘটনা বা আকস্মিক ঘটনা নয় সে-কথা একেবারে মিথ্যে নয়। ভারতীয়, গ্রিক এবং নর্স, সব পুরাণেই জগৎ সম্পর্কে একটি দার্শনিক বা 'চিন্তাশীল' দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে।

ইন্দো-ইউরোপীয়রা জগতের ইতিহাসের ভেতর 'অন্তর্দৃষ্টি'-র (insight) অনুসন্ধান করেছে। গোটা ইন্দো-ইউরোপীয় বিশ্ব জুড়ে এক সংস্কৃতি থেকে আরেক সংস্কৃতিতে 'অন্তর্দৃষ্টি' বা 'জ্ঞান' বোঝাতে আমরা এমনকি একটি বিশেষ শব্দ-ও পাবো। সংস্কৃততে শব্দটি 'বিদ্যা'। 'বিদ্যা' এবং প্লেটোর দর্শনে সেই অতি গুরুত্বপূর্ণ গ্রিক idea বা 'ভাব' শব্দটি একই। লাতিনে আমরা পাই *ভিডিও* (video), রোমান পরিমণ্ডলে যার অর্থ স্রেফ *দেখা*। আমরা যখন বলি 'দেখতে পাচ্ছি', তখন তার অর্থ হতে পারে 'বুঝতে পারছি' আর কার্টুনে উডি উডপেকার-এর মাথায় যখনই কোনো অসাধারণ চিন্তা বা বুদ্ধি খেলে যায় তখন হয়ত তার ওপর একটা বাল্ব জ্বলে উঠতে দেখা যায়। (আমাদের যুগ আসার আগ পর্যন্ত 'দেখা' শব্দটা টিভি পর্দার দিকে তাকিয়ে থাকার সমার্থক হয়নি।) আমরা জানি ইংরেজিতে wise এবং wisdom বলে দুটো শব্দ আছে, জার্মান ভাষায় রয়েছে wissen (জানা)। নরওয়েজীয় ভাষায় রয়েছে viten শব্দটি, মূলগতভাবে যা ভারতীয় শব্দ বিদ্যা, গ্রিক idea-এবং লাতিন video-র মতোই।

মোট কথা, এ-কথা আমরা জোর দিয়ে বলতে পারি যে ইন্দো-ইউরোপীয়দের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইন্দ্রিয় ছিল দৃষ্টি। ভারতীয়, গ্রিক, পারসিক এবং টিউটন, সব ভাষার সাহিত্যই বিশিষ্ট হয়ে আছে মহৎ মহাজাগতিক দৃষ্টি বা কল্পনার কারণে। (আবার সেই শব্দটি এসে গেল 'দৃষ্টি' বা 'vision' শব্দটি এসেছে লাতিন ক্রিয়া 'video' থেকে।) দেবদেবীর এবং পৌরাণিক ঘটনার ছবি আঁকা ও মূর্তি গড়াটাও ইন্দো-ইউরোপীয় সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য।

সব শেষে বলা যায়, ইতিহাস সম্পর্কে ইন্দো-ইউরোপীয়দের ছিল একটি আবর্তনশীল দৃষ্টিভঙ্গি। এর অর্থ হচ্ছে এই বিশ্বাস যে, বছরের ঋতুগুলোর মতো ইতিহাসও চক্রাকারে ঘোরে। কাজেই, ইতিহাসের শুরুও নেই শেষও নেই, তার বদলে আছে নানান সভ্যতা; জন্ম এবং মৃত্যুর ভেতরে এক শাশ্বত পারস্পরিক ক্রিয়া-

প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সে-সব সভ্যতার উত্থান এবং পতন ঘটে।

হিন্দু এবং বৌদ্ধ, প্রাচ্যের এই দুই বড় ধর্মেরই উৎস ইন্দো-ইউরোপীয়। গ্রিক দর্শনেরও তাই এবং হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের মধ্যে আমরা যেমন বেশকিছু স্পষ্ট সাদৃশ্য দেখতে পাবো, তেমনি পাবো এই দুইয়ের সঙ্গে গ্রিক দর্শনের। এমনকি আজও হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্ম ভীষণভাবে দার্শনিক চিন্তা-ভাবনা প্রভাবিত।

হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মে এই বিষয়টির ওপর প্রায়ই বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে যে সবকিছুর মধ্যেই দেবদেবী বা ঈশ্বর রয়েছেন (সর্বেশ্বরবাদ, Pentheism) এবং ধর্মীয় অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে মানুষ ঈশ্বরের সঙ্গে মিলিত হতে পারে। (প্লটিনাসের কথা মনে পড়ে, সোফি?) সেজন্য চাই গভীর আত্মসংযোগ বা ধ্যান। এই কারণেই প্রাচ্যে নিষ্ক্রিয়তা এবং নিঃসঙ্গতাকে কখনো কখনো ধর্মীয় আদর্শ হিসেবে দেখা হয়। প্রাচীন গ্রিসেও অনেক মানুষ ছিলেন যাঁরা আত্মার নির্বাণলাভের জন্য কঠোর তপস্যাপূর্ণ বা ধর্মীয়ভাবে নিঃসঙ্গ একটি জীবনে বিশ্বাস করতো। মধ্যযুগীয় সন্ন্যাস জীবনের বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য গ্রেকো-রোমান সভ্যতার বিভিন্ন বিশ্বাস থেকে নেয়া।

একইভাবে, দেহান্তর বা পুনর্জন্ম ইন্দো-ইউরোপীয় বহু সংস্কৃতিরই একটি মৌলিক বিশ্বাস। ২,৫০০ বছরের-ও বেশি সময় ধরে প্রত্যেক ভারতীয়র জীবনের পরম উদ্দেশ্য এই পুনর্জন্মের চক্র থেকে মুক্তি লাভ[১২]। প্লেটোও দেহান্তরে বিশ্বাস করতেন।

সীমাইটদের কথা (The Semites)

সোফি, এবার যাওয়া যাক, সীমাইটদের প্রসঙ্গে। এরা সম্পূর্ণ ভিন্ন সংস্কৃতি এবং ভাষা বিশিষ্ট একটি দল। আরবীয় উপদ্বীপ উৎপত্তিস্থল হলেও, এরাও পৃথিবীর নানান স্থানে ডেরা বেঁধেছে। ইহুদিরা নিজেরদের ঘর-বাড়ি থেকে বহু দূরে ঘুরে বেড়িয়েছে ২,০০০ বছর ধরে। খ্রিস্ট সমাজের বদৌলতে সেমিটিক ইতিহাস এবং ধর্ম তার উৎস থেকে যারপরনাই দূরে চলে যায়, অবশ্য সেমিটিক সংস্কৃতি ইসলামের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছিল দূর-দূরান্তে।

ইহুদি, খ্রিস্টান এবং ইসলাম, পশ্চিমের এই তিনটি ধর্মই পটভূমিগত দিক দিয়ে সেমিটিক। মুসলিমদের পবিত্র শাস্ত্রগ্রন্থ *কোরান* সেমিটিক ভাবাগোষ্ঠীর ভাষায় লেখা হয়েছিল; *ওল্ড টেস্টামেন্ট*-ও তাই। 'দেবতা' বোঝাতে ওল্ড টেস্টামেন্টে যে-সব শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে তার একটি শব্দার্থগত মূলের দিক থেকে মুসলিম *আল্লাহ*-র মতোই। ('আল্লাহ' শব্দের সাদামাটা অর্থ 'দেবতা'।)

আমরা যখন খ্রিস্টধর্মের দিকে তাকাই, ছবিটা তখন বেশ জটিল হয়ে ওঠে। খ্রিস্টধর্মেরও একটি সেমিটিক পটভূমি রয়েছে, কিন্তু *নিউ টেস্টামেন্ট* রচিত হয়েছিল গ্রিক ভাষায়; এবং খ্রিস্টীয় ধর্মতত্ত্ব যখন গঠিত হয় তখন তাতে গ্রিক ও লাতিন প্রভাব

---

১২. 'প্রত্যেক ভারতীয়' বললেও লেখক সম্ভবত এখানে প্রত্যেক হিন্দু, বৌদ্ধ এবং জৈন ধর্মাবলম্বীর কথাই বুঝিয়েছেন। মুসলিমরা সেই অর্থে পুনর্জন্মে বিশ্বাসী নয়—অনুবাদক।

পড়েছিল, ফলে হেলেনিস্টিক দর্শনের প্রভাবও বাদ যায়নি।

ইন্দো-ইউরোপীয়রা বহু দেবতায় বিশ্বাসী ছিল। এদিকে সীমাইটদের বৈশিষ্ট্য এই যে, একেবারে গোড়ার দিক থেকেই তারা এক ঈশ্বরে বিশ্বাসী এবং এই বিশ্বাসই তাদেরকে এক করেছে। একে বলা হয় *একেশ্বরবাদ (monogtheism)*। ইহুদি, খ্রিস্টান এবং ইসলাম, এই তিন ধর্মই এই মৌলিক ধারণায় বিশ্বাসী যে, ঈশ্বর আছেন কেবল একজনই।

সেই সঙ্গে সীমাইটরা ইতিহাস সম্পর্কে একটি *একরৈখিক* দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করত। অন্য কথায় বলতে গেলে, ইতিহাসকে দেখা হতো ক্রমেই এগিয়ে যেতে থাকা একটি রেখা হিসেবে। গোড়াতে ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করেছেন আর সেটিই ছিল ইতিহাসের শুরু। কিন্তু একদিন ইতিহাসের সমাপ্তি ঘটবে এবং সে হবে 'বিচারের দিন' সেদিন ঈশ্বর জীবিত এবং মৃতদের বিচার করবেন বা তাদের পাপ-পুণ্যের হিসাব নেবেন।

ইতিহাস যে-ভূমিকা পালন করে তা এই তিন পশ্চিমী ধর্মে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে বিবেচিত। এ-কথা বিশ্বাস করা হয় যে, ঈশ্বর ইতিহাসের গতিপথে হস্তক্ষেপ করেন বা বাগড়া দেন, এমনকি ব্যাপারটা আসলে এ-রকম যে ঈশ্বর যাতে জগতে তাঁর ইচ্ছার বাস্তবায়ন ঘটাতে পারেন সেজন্যই ইতিহাসের সৃষ্টি হয়েছে। ঠিক যেভাবে একবার তিনি আব্রাহামকে 'প্রতিশ্রুত দেশের' পথ দেখিয়েছিলেন, সেভাবেই তিনি মানবজাতির পদক্ষেপকে ইতিহাসের ভেতর দিয়ে শেষ বিচারের দিনের দিকে নিয়ে যান। দিনটি যখন আসবে সেদিন জগতের সমস্ত অশুভ ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে।

ইতিহাসের গতিপথে ঈশ্বরের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে এই জোরালো বিশ্বাসে বিশ্বাসী সীমাইটরা কয়েক হাজার বছর ধরেই ইতিহাস লিপিবদ্ধ করার কাজে নিজেদের ব্যস্ত রেখেছেন। আর ইতিহাসগত এ-সব শেকড়ই তাদের পবিত্র শাস্ত্রগ্রন্থগুলোর ভিত্তিমূল রচনা করেছে।

এমনকি আজও ইহুদি, খ্রিস্টান এবং মুসলিম, সবার কাছে জেরুজালেম একটি গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় স্থান বলে বিবেচিত। এ-ব্যাপারটি এই তিন ধর্মের একই প্রেক্ষাপট বা পটভূমির কথাই নির্দেশ করে। শহরটিতে রয়েছে কয়েকটি বিখ্যাত উপাসনালয় সিনাগগ (ইহুদিদের), গির্জা (খ্রিস্টানদের) আর মসজিদ (মুসলিমদের)। কাজেই এটা অত্যন্ত দুঃখজনক যে জেরুজালেম একটি কলহের বিষয় হয়ে উঠেছে, মানুষের হাতেই মারা পড়েছে হাজার হাজার মানুষ, স্রেফ এই কারণে যে তারা কেউই এই ব্যাপারে একমত হতে পারছে না যে এই 'শাশ্বত নগরী'-র কর্তৃত্ব কার হাতে থাকবে। কামনা করি জাতিসংঘ একদিন জেরুজালেমকে এই তিন ধর্মেরই পবিত্র স্থান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে। (আমরা আমাদের দর্শন কোর্সের এই আরও বাস্তব সংশ্লিষ্ট অংশটি সম্পর্কে আপাতত কোনো কথা বলব না। আমরা এটাকে হিল্ডার বাবার হাতেই ছেড়ে দেবো। এতোদিনে নিশ্চয়ই তুমি বুঝতে পেরেছো যে তিনি লেবাননে জাতিসংঘের একজন পর্যবেক্ষক। আরও সঠিকভাবে বললে আমাকে বলতে হয়, তিনি সেখানে মেজর হিসেবে চাকুরিরত আছেন। তুমি যদি কিছু কিছু যোগসূত্র আবিষ্কার করে থাকো সেটি অস্বাভাবিক কিছু নয়, এমনটিই হওয়া উচিত। তবে আগ বাড়িয়ে কিছু ভেবে নেয়াটাও সঙ্গত হবে না।)

আমরা বলেছি যে ইন্দো-ইউরোপীয়দের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইন্দ্রিয় ছিল দৃষ্টি। *শ্রবণ* যে সীমাইটদের কাছে কতটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল সে-ব্যাপারটিও কিন্তু কম আকর্ষণীয় নয়। এটা কোনো আকস্মিক ব্যাপার নয় যে ইহুদি ধর্মমতের গোড়াতেই এই কথাগুলো রয়েছে 'হে বনী ইসরায়েলগণ, শোনো!' ওল্ড টেস্টামেন্ট পড়ে আমরা জানতে পারি লোকজন কী করে ঈশ্বরের কথা শুনতো। তাছাড়া ইহুদিরা সচরাচর এভাবেই তাদের ধর্মীয় উপদেশ শুরু করতো 'এবং জিহোভা (ঈশ্বর) বললেন।' ঈশ্বরের কথা 'শোনা'র ওপর খ্রিস্টধর্মেও গুরুত্ব দেয়া হয়। খ্রিস্টান, ইহুদি এবং ইসলাম ধর্মের নানান আচার-অনুষ্ঠান এবং উৎসবে জোরে বা সশব্দে পড়া বা 'আবৃত্তি'-র একটি বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে।

আমি এ-কথাও বলেছি যে ইন্দো-ইউরোপীয়রা সব সময়ই তাদের দেবদেবীর ছবি আঁকত বা মূর্তি গড়তো। অন্য দিকে সীমাইটদের বৈশিষ্ট্য হলো এ-কাজটি তারা কখনোই করতো না। ঈশ্বর বা 'দেবতা'-র ছবি আঁকা বা মূর্তি গড়া বারণ ছিল তাদের জন্য। ওল্ড টেস্টামেন্টে স্পষ্ট আদেশ দেয়া আছে যে মানুষ ঈশ্বরের কোনো প্রতিমূর্তি তৈরি করতে পারবে না। ইহুদি এবং ইসলাম ধর্মে এটা আজও অবশ্যপালনীয় একটি নিয়ম। আবার বিশেষ করে ইসলাম ধর্মে ছবি তোলা এবং ছবি আঁকার ব্যাপারে একটি বিরাগপূর্ণ মনোভাব রয়েছে, কারণ কোনো কিছু 'তৈরিতে' ঈশ্বরের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হওয়া মানুষের উচিত নয়।

কিন্তু, তুমি হয়ত ভাবছো, খ্রিস্টানদের গির্জায়-তো যিশু এবং ঈশ্বরের ছবির ছড়াছড়ি। সে-কথা সত্যি, সোফি, তবে খ্রিস্ট সমাজ যে গ্রেকো-রোমান বিশ্ব দ্বারা কতটা প্রভাবিত হয়েছিল এটা তারই একটা নিদর্শন মাত্র। (গ্রিক অর্থোডক্স চার্চে, অর্থাৎ গ্রিস এবং রাশিয়ায় 'খোদাই করা মূর্তি' বা ভাস্কর্য বা যিশুর ক্রুশবিদ্ধমূর্তি একেবারে সেই বাইবেলের যুগ থেকেই নিষিদ্ধ।)

পশ্চিমী তিন ধর্ম ঈশ্বর এবং তাঁর সৃষ্টির মধ্যকার একটি দূরত্বের ব্যাপারে গুরুত্ব আরোপ করে, যা কিনা প্রাচ্যের প্রধান ধর্মগুলোর দৃষ্টিভঙ্গির একেবারে বিপরীত। আর, উদ্দেশ্যটা পুনর্জন্মের চক্রের হাত থেকে নিস্তার পাওয়া নয়, বরং পাপ এবং দোষ-ত্রুটি মুক্ত হওয়া। তাছাড়া, আত্ম-সংযোগ এবং ধ্যান নয়, বরং প্রার্থনা, উপদেশ এবং শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠই এই তিন ধর্মীয় জীবনের বৈশিষ্ট্য।

ইস্রায়েল

সোফি, তোমার স্কুলের ধর্ম শিক্ষকের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হওয়ার কোনো ইচ্ছে আমার নেই, কিন্তু তারপরেও চলো খ্রিস্ট ধর্মের ইহুদি পটভূমির ব্যাপারে চট করে একটা নজর বুলিয়ে নেয়া যাক।

ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করার পরেই শুরু হয়েছিল সবকিছু। বাইবেলের প্রথম পাতাটা পড়লেই তুমি জেনে যাবে কীভাবে তা ঘটেছিল। তো, এরপর মানুষ ঈশ্বরের বিরুদ্ধাচরণ করতে শুরু করে। তার শাস্তিস্বরূপ যে অ্যাডাম এবং ঈভ্‌কে নন্দনকানন (Garden of Eden) থেকে কেবল তাড়িয়েই দেয়া হয় তা নয়, সেই সঙ্গে পৃথিবীতে

মৃত্যুর প্রচলন ঘটে।

গোটা বাইবেল জুড়েই ঈশ্বরের বিরুদ্ধে মানুষের বিদ্রোহের নানা কাহিনী ছড়িয়ে আছে। বুক অভ্ জেনেসিস-এর আরও খানিকটা এগোলেই আমরা মহাপ্লাবন আর নোয়া-র (Noah) জাহাজের কাহিনী পাবো। এরপর আমরা দেখতে পাবো ঈশ্বর *অব্রাহাম* আর তাঁর বংশধরদের সঙ্গে একটি চুক্তিতে (covenant) আবদ্ধ হলেন। এই চুক্তি অনুযায়ী অব্রাহাম আর তাঁর সব বংশধর ঈশ্বরের অনুশাসন মেনে চলবেন। আর তার বিনিময়ে ঈশ্বর প্রতিজ্ঞা করলেন, তিনি অব্রাহামের বংশধরদের নিরাপত্তা বিধান করবেন বা তাদের রক্ষা করবেন। ১২০০ খ্রিস্ট পূর্বাব্দের দিকে সিনাই পর্বতের ওপর *মোজেস*-কে দশটি অনুজ্ঞা প্রদানের সময় এই চুক্তিটি নতুন করে করা হয়। ইস্রায়েলীয়রা তখন দীর্ঘদিন যাবৎ মিসরে বন্দি, কিন্তু ঈশ্বরের সাহায্যে তাদেরকে আবার ইস্রায়েলে ফিরিয়ে আনা হয়।

যিশুর জন্মের প্রায় ১,০০০ বছর আগে, অর্থাৎ গ্রিক দর্শন নামের কোনো কিছুর যখন কোনো অস্তিত্ব ছিল না, সেই সময়কার তিন জন মহান ইস্রায়েল রাজার কথা জানা যায়। প্রথম জন হলেন সঅল, দ্বিতীয় জন *ডেভিড* এবং তৃতীয়জন *সলোমন*। এই সময় সমস্ত ইস্রায়েলীয় একটি রাজ্যে সংঘবদ্ধ হয় এবং বিশেষ করে রাজা ডেভিডের নেতৃত্বে রাজনৈতিক, সামরিক এবং সাংস্কৃতিক গৌরবের একটি যুগ অতিবাহিত করে।

কেউ রাজা হওয়ার পর জনগণ তার শরীরে আনুষ্ঠানিকভাবে তেল লেপন করত, ফলে রাজা *মেসিয়াহ্* (Messiah) উপাধি লাভ করতেন। কথাটার অর্থ, যার শরীরে তেল লেপন করা হয়েছে। ধর্মীয় দৃষ্টিতে রাজাকে দেখা হতো ঈশ্বর আর তাঁর লোকজনের মাঝখানে একজন মধ্যস্থতাকারী হিসেবে। কাজেই রাজাকে তাই 'ঈশ্বরের পুত্র'ও বলা যেতো আর তার রাজ্য বা দেশকে 'ঈশ্বরের রাজ্য।'

কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই ইস্রায়েল তার ক্ষমতা হারাতে শুরু করে এবং একসময় উত্তর রাজ্য (ইসরায়েল) ও দক্ষিণ রাজ্য (জুডা) এই দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। ৭২২ খ্রিস্ট পূর্বাব্দে উত্তরের রাজ্যটি অ্যাসিরীয়রা জয় করে নেয় এবং দেশটি তার সমস্ত রাজনৈতিক ও ধর্মীয় গুরুত্ব হারিয়ে ফেলে। দক্ষিণ রাজ্যটির বেলাতেও এরচেয়ে ভালো কিছু ঘটল না, ব্যাবিলনীয়দের হাতে রাজ্যটির পতন ঘটে ৫৮৬ খ্রিস্ট পূর্বাব্দে। রাজ্যের মন্দিরটি ধ্বংস করে ফেলা হয় আর বেশিরভাগ লোকজনকেই দাস হিসেবে ধরে নিয়ে যাওয়া হয় ব্যাবিলনে। এই 'ব্যাবিলনীয় দাসত্ব' ৫৩৯ খ্রিস্ট পূর্বাব্দ পর্যন্ত স্থায়ী হয়, এই বছরেই তাদেরকে জেরুজালেমে ফিরে যাওয়ার অনুমতি দেয়া হয় এবং এই বছরেই বিশাল মন্দিরটি পুনর্নির্মাণ করা হয়। তবে যিশুর জন্মের আগ পর্যন্ত বাকি সময়টা ইহুদিদেরকে বৈদেশিক শাসনাধীনই কাটাতে হয়।

ইহুদিদের মনে এবার প্রশ্ন জাগতে শুরু করে ডেভিডের রাজ্য কেন ধ্বংস হয়ে গেল আর ঈশ্বর ইসরাইলকে নিজের হাতেই রাখবেন এ-প্রতিশ্রুতি তিনি ইহুদিদের দেয়ার পরেও কেন একের পর এক মহাদুর্যোগ নেমে আসছে তাদের ওপর। তবে এ-কথাও সত্যি যে লোকজনও প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তারা ঈশ্বরের অনুজ্ঞা বা আদেশ যথাযথভাবে পালন করবে। তাই ধীরে ধীরে তারা মেনে নিতে শুরু করে যে ঈশ্বর ইস্রায়েলকে তার অবাধ্যতার শাস্তি দিচ্ছেন।

আসলে ৭৫০ খ্রিস্ট পূর্বাব্দ থেকেই বিভিন্ন নবী বলতে শুরু করেন যে ঈশ্বর তাঁর নির্দেশ পালন না করায় ইস্রায়েলের ওপর ক্রুদ্ধ হয়েছেন। তাঁরা বলতেন, ঈশ্বর একদিন ইস্রায়েলের বিচার করতে বসবেন। এ-ধরনের ভবিষ্যদ্বাণীকে বলা হয় 'শেষ দিন'-এর ভবিষ্যদ্বাণী।

ধীরে ধীরে আরও নবী আসেন যাঁরা বলতে শুরু করেন যে ঈশ্বর কিছু নির্বাচিত লোকজনকে ক্ষমা করবেন এবং তাদের কাছে ডেভিডের বংশে এক 'শান্তির রাজপুত্র' বা এক রাজা পাঠাবেন। তিনিই ডেভিডের হারানো রাজ্য পুনরুদ্ধার করবেন এবং মানুষ একটি সমৃদ্ধিশালী ভবিষ্যৎ পাবে।

নবী ইসাইয়া বললেন, 'যে-সব লোক অন্ধকারে পথ চলেছে তারা একটি বিরাট আলো দেখতে পাবে আর যারা মৃত্যুর ছায়ার দেশে বাস করে তাদের ওপর আলো পড়ে ঝলমল করবে।' এ-সব ভবিষ্যদ্বাণীকে আমরা বলি পরিত্রাণ লাভের ভবিষ্যদ্বাণী।

সংক্ষেপে বললে রাজা ডেভিডের অধীনে ইস্রায়েলের লোকজন সুখেই ছিল। কিন্তু পরে যখন তাদের অবস্থার অবনতি ঘটে তখন তাদের নবীরা জোর দিয়ে বলতে থাকেন যে ডেভিডের বংশে একদিন নতুন রাজার আবির্ভাব ঘটবে। এই 'মেসিয়াহ্' বা 'ঈশ্বর-পুত্র' মানুষকে পরিত্রাণ করবেন, ইস্রায়েলের মহত্ত্ব ফিরিয়ে আনবেন এবং 'ঈশ্বরের রাজত্ব' প্রতিষ্ঠা করবেন।

যিশু

ধরে নিচ্ছি তুমি এখনো আছো আমার সঙ্গে, সোফি। সে যাই হোক, আসল কথা হলো 'মেসিয়াহ', 'ঈশ্বর-পুত্র' আর 'ঈশ্বরের রাজ্য'। গোড়ার দিকে এর সবকটিকেই নেয়া হয়েছিল রাজনৈতিকভাবে। যিশুর সময়ে অনেকেই মনে করতো রাজনৈতিক, সামরিক আর ধর্মীয় একজন নেতার অর্থে রাজা ডেভিডের সমকক্ষ একজন 'মেসিয়াহ্' আসবেন। কাজেই এই রক্ষাকর্তাকে দেখা হতো এক জাতীয় পরিত্রাতা হিসেবে যিনি রোমান শাসনাধীন ইহুদিদের দুঃখ-যন্ত্রণা দূর করবেন।

বেশ, ভালো কথা। কিন্তু দূরদৃষ্টিসম্পন্ন আরও বেশ কিছু মানুষও ছিল তখন। এর আগে প্রায় দুশো বছর ধরে অনেক নবী এসেছেন যাঁরা বিশ্বাস করতেন যে প্রতিশ্রুত 'মেসিয়াহ্' গোটা বিশ্বের পরিত্রাণ করবেন। তিনি শুধু ইস্রায়েলীয়দেরই বিদেশী শাসনের জোয়াল থেকে মুক্ত করবেন না, সমস্ত মানবজাতিকেই রক্ষা করবেন তিনি পাপ আর দোষ থেকে, এমনকি মৃত্যু থেকেও। মুক্তিলাভের অর্থে 'মোক্ষলাভ'-এর তীব্র আকাঙ্ক্ষা তাই গোটা হেলেনিস্টিক জগতে ছড়িয়ে পড়ে।

অতএব আবির্ভূত হলেন *নাজারেথ*-এর যিশু (Jesus of Nazareth[১৩])। ইতিহাসে তিনিই যে প্রথম প্রতিশ্রুত 'মেসিয়াহ' হিসেবে সামনে এসে দাঁড়ালেন তা কিন্তু নয়।

---

১৩. উত্তর ইসরায়েলের গ্যালিলি অঞ্চলের একটি শহর। নিউ টেস্টামেন্ট অনুসারে, যিশুর শৈশব এখানেই কেটেছে—অনুবাদক।

যিশু নিজেও 'ঈশ্বর-পুত্র', 'ঈশ্বরের রাজ্য' আর 'মুক্তিলাভ', এই কথাগুলো ব্যবহার করেছেন। সেদিক দিয়ে পূর্ববর্তী নবীদের সঙ্গে তাঁর একটা যোগসূত্র রয়েছে। বিশেষ এক সিংহাসন আরোহণ অনুষ্ঠান বা আচারের মাধ্যমে প্রাচীন রাজারা যেভাবে অভিষিক্ত হতেন, ঠিক সেভাবেই তিনি জেরুজালেমে প্রবেশ করে নিজেকে মানুষের কাছে তাদের রক্ষাকর্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করলেন। জনসাধারণ তাঁকে সেভাবেই বরণ করে নিল। তিনি বললেন, 'সময় হয়েছে। ঈশ্বরের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হতে আর দেরি নেই।'

তবে এখানে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় রয়েছে স্পষ্ট করে একটা কথা বলে যিশু নিজেকে অন্যান্য 'মেসিয়াহ্' থেকে আলাদা করে ফেললেন যে তিনি কোনো সামরিক বা রাজনৈতিক বিদ্রোহী নন। তাঁর আরাধ্য কাজ আরও বড়। প্রত্যেকের কাছেই তিনি নির্বাণ বা মোক্ষলাভ আর ঈশ্বরের ক্ষমার কথা বললেন। যাঁদের সঙ্গে তাঁর পথে দেখা হলো তাদেরকে তিনি বললেন, 'তোমাদের পাপ ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে তাঁর নামধারী আরেক জনের অছিলায়।'

এভাবে 'পাপমুক্তি' বিলি করার কথা আগে কখনো শোনেনি মানুষ। তারচেয়ে যেটা ভয়ঙ্কর কথা ঈশ্বরকে তিনি 'পিতা' (আব্বা) বলে সম্বোধন করলেন। এ-ধরনের কোনো নজির ইহুদি সম্প্রদায়ে একেবারেই ছিল না তখন। ফলে কিছুদিনের মধ্যেই ধর্মের ধ্বজাধারীরা নাখোশ হয়ে ওঠে তাঁর বিরুদ্ধে।

তো, পরিস্থিতিটা ছিল মোটামুটি এরকম যিশুখ্রিস্টের সময়ে অসংখ্য মানুষ একজন 'মেসিয়াহ্'র জন্য অপেক্ষা করছিল যিনি বিপুল তূর্য নিনাদের মধ্যে (অন্য কথায়, আগুন আর তরবারির সাহায্যে) ঈশ্বরের রাজ্য পুনঃস্থাপন করবেন। যিশুর উপদেশ এবং শিক্ষার মধ্যে 'ঈশ্বরের রাজ্য' কথাটি প্রায়ই এসেছে ঘুরে ফিরে, কিন্তু অনেক বৃহত্তর অর্থে। যিশু বলেছেন ঈশ্বরের রাজ্য হচ্ছে প্রতিবেশীকে ভালোবাসা, দুর্বল আর গরিবদের জন্য সহানুভূতি আর যারা ভুল করেছে তাদের জন্য ক্ষমা।

এ-ছিল রণলিপ্সু একটি প্রাচীন অভিব্যক্তির অর্থের এক নাটকীয় পরিবর্তন। লোকজন আশা করছিল এক সামরিক শাসক, শিগ্‌গিরই যিনি 'ঈশ্বরের রাজ্য'-র পত্তনের কথা ঘোষণা করবেন, অথচ এলেন আলখাল্লা আর চপ্পল পরা যিশু, বললেন ঈশ্বরের রাজ্য বা 'নতুন চুক্তি'-টি হচ্ছে 'নিজেকে যেমন ভালোবাসো ঠিক সে-রকমভাবে ভালোবাসতে হবে তোমার প্রতিবেশীকে'। কিন্তু সেটিই সব কথা নয় সোফি। তিনি আরও বললেন যে, শত্রুকেও ভালোবাসতে হবে আমাদের। তারা যখন আমাদেরকে আঘাত করবে তখন আমরা কোনোভাবেই পাল্টা আঘাত হানতে পারবো না। বরং অন্য গালটা পেতে দেবো। সেই সঙ্গে তাদের ক্ষমা করে দেবো, সাতবার নয়, সত্তর গুণ সাতবার।

যিশু নিজেই দেখিয়ে গেছেন যে বারবনিতা, দুর্নীতিপরায়ণ সুদখোর অথবা রাজনৈতিকভাবে ধ্বংসাত্মক কাজে লিপ্ত ব্যক্তিকে তিনি অস্পৃশ্য বলে ঘৃণা করতেন না। তিনি বরং আরও এক ধাপ এগিয়ে বলেছিলেন যে কাজ-কর্ম কিছুই জানে না এমন কোনো লোক যে-কিনা তার বাবার কাছ থেকে পাওয়া সমস্ত ধন-সম্পত্তি ফুঁকে দিয়েছে, অথবা সরকারি তহবিল তছরূপ করেছে এমন কোনো সাধারণ কর্মচারীও

যখন ঈশ্বরের সামনে দাঁড়িয়ে অনুতাপ করে এবং ক্ষমা প্রার্থনা করে তখন তারাও পুণ্যবান হয়ে যায়, ঈশ্বরের করুণা এতোই অপার।

শুধু তাই নয়, যিশু এখানেই থামলেন না তিনি আরও বললেন যে এই ধরনের পাপীরা ঈশ্বরের কাছে সেইসব নিষ্কলঙ্ক ফ্যারিসির (Pharisee)[১৪] চেয়েও বেশি ন্যায়পরায়ণ আর তার ক্ষমার যোগ্য যারা তাদের সদ্‌গুণের প্রদর্শনী করে বেড়ায়।

যিশু মন্তব্য করেছেন যে কেউই ঈশ্বরের করুণা অর্জন করতে পারে না। আমরা নিজেরা আমাদের নির্বাণ বা মোক্ষ দিতে পারি না (অনেক গ্রিক যা কিনা বিশ্বাস করতো)। সার্মন অন দ্য মাউন্ট বা পর্বতের হিতোপদেশ-এ যে কঠোর নৈতিক শুদ্ধতা যিশু দাবি করেছেন সে কেবল ঈশ্বরের ইচ্ছা কী তাই শেখাবার জন্যই নয়, বরং এ-কথাও জানানোর জন্য যে ঈশ্বরের দৃষ্টিতে কেউ-ই ন্যায়পরায়ণ নয়। তাঁর করুণা অপার, কিন্তু তাঁর ক্ষমা পেতে চাইলে আমাদেরকে ঈশ্বরের মুখাপেক্ষী হতে হবে আর তার ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে।

যিশু আর তাঁর শিক্ষার ব্যাপারে আরও ব্যাপক পড়াশোনার ব্যাপারটি আমি তোমার ধর্মশিক্ষকের হাতেই ছেড়ে দিতে চাই। কাজটা নেহাত সামান্য হবে না তাঁর জন্য। আমার ধারণা, যিশু যে কী অসাধারণ এক মানুষ ছিলেন সেটি বুঝিয়ে দিতে সফল হবেন তিনি। এক অসাধারণ উপায়ে তিনি তাঁর সময়ের ভাষা ব্যবহার করেছেন প্রাচীন রণ-উন্মাদনাকে এক নতুন সারবস্তু দান করতে। তিনি যে ক্রুশবিদ্ধ হয়ে প্রাণ ত্যাগ করেছেন তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। স্বার্থ আর ক্ষমতাসংক্রান্ত যে-সমস্ত বিষয় তিনি দূর করতে এসেছিলেন তার সঙ্গে মুক্তিলাভ সম্পর্কে তাঁর একেবারে মৌলিক বার্তার একটা বিরোধ দেখা দিল।

সক্রেটিস প্রসঙ্গে কথা বলার সময় আমরা দেখেছি মানুষের প্রজ্ঞা-র (Reason) কাছে আদেশ জানালে তা কতটা বিপজ্জনক হতে পারে। যীশু প্রসঙ্গে আমরা দেখছি নিঃশর্ত ভ্রাতৃতুল্য ভালোবাসা আর শর্তহীন ক্ষমার দাবি জানানো কতটা বিপজ্জনক হতে পারে। এমনকি আজকের এই পৃথিবীতেও আমরা দেখতে পাই শান্তি, ভালোবাসা আর গরিব মানুষের জন্য খাবার এবং রাষ্ট্রের শত্রুর প্রতি রাজক্ষমার মতো সাধারণ কিছু দাবির মুখে বড় বড় শক্তি কীভাবে ভেঙে পড়ে।

তোমার হয়ত মনে আছে, এথেন্সের সবচেয়ে ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিকে জীবন বিসর্জন দিতে হয়েছিল বলে প্লেটো কত ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। খ্রিস্টীয় শিক্ষা অনুযায়ী, পৃথিবীর সবচেয়ে ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন যিশু। তারপরেও তাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছিল। খ্রিস্টানরা বলে, যিশু মানবতার স্বার্থে প্রাণত্যাগ করেছিলেন। একেই খ্রিস্টানরা বলে থাকে যিশুর 'প্যাশন' (Passion) বা যন্ত্রণাভোগ ও মৃত্যু। যিশু ছিলেন সেই 'যন্ত্রণাভোগী ভৃত্য' যিনি এই কারণে মানবজাতির পাপ নিজ অঙ্গে ধারণ করেছিলেন যাতে আমরা প্রায়শ্চিত্ত করতে পারি, রক্ষা পেতে পারি ঈশ্বরের ক্রোধ থেকে।

---

১৪. প্রাচীন ইহুদিজাতির মধ্যে ধার্মিক এবং আচারনিষ্ঠ হিসেবে খ্যাত সম্প্রদায়—অনুবাদক।

যিশুকে ক্রুশবিদ্ধ করার এবং কবর দেয়ার কিছুদিন পরেই একটা গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে তিনি কবর থেকে উঠে এসেছেন। তাতে করে তিনি প্রমাণ করেছেন যে তিনি সাধারণ কোনো মানুষ নন। সত্যিই তিনি 'ঈশ্বর-পুত্র'।

আমরা বলতে পারি, ইস্টারের সকালে যিশুর পুনরুত্থানের গুজবের মধ্য দিয়ে খ্রিস্টীয় গির্জার পত্তন হয়েছিল। আর সে-কথা পল-ই অত্যন্ত জোর দিয়ে বলে গেছেন 'যিশু যদি পুনরুত্থিত না হয়ে থাকেন তাহলে আমাদের এই শিক্ষাদানও অসার, তোমাদের বিশ্বাসও অসার।'

তো, এবার পুরো মানবজাতিই দেহের পুনরুত্থানের জন্য আশা করতে পারে, তার কারণ আমাদেরকে রক্ষা করার জন্যই যিশু ক্রুশবিদ্ধ হয়েছিলেন। কিন্তু, প্রিয় সোফি, একটা কথা মনে আছে নিশ্চয়ই যে ইহুদি ধর্মের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে 'আত্মার অমরত্ব' বা কোনো ধরনের 'দেহান্তর'-এর প্রসঙ্গ অবান্তর; ওটা একটা গ্রিক, তার অর্থ, ইন্দো-ইউরোপীয় চিন্তা। খ্রিস্টধর্ম অনুযায়ী-ও মানুষের মধ্যে এমন কিছু নেই, যেমন ধরা যাক আত্মা, যা নিজে অমর। খ্রিস্টীয় গির্জা যদিও 'দেহের পুনরুত্থান এবং অনন্ত জীবনে' বিশ্বাস, কিন্তু মানুষ মৃত্যু এবং 'নরকভোগ'-এর হাত থেকে রক্ষা পেতে পারে কেবল ঈশ্বরের অলৌকিক হস্তক্ষেপের মাধ্যমেই। সেটি আমাদের নিজস্ব কোনো গুণ বা অন্য কোনো প্রাকৃতিক বা সহজাত ক্ষমতার কারণে হবে না।

কাজেই গোড়ার দিককার খ্রিস্টানরা যিশু খ্রিস্টের ওপর বিশ্বাসের মাধ্যমে মোক্ষলাভের 'সুসমাচার' প্রচার করতে শুরু করল। তাঁর মধ্যস্থতায় 'ঈশ্বরের রাজ্য' বাস্তব হয়ে উঠলো প্রায়। জয় করার জন্য গোটা পৃথিবীই রইল এখন যিশু খ্রিস্টের সামনে। (হিব্রু শব্দ 'মেসিয়াহ্' বা যাকে অভিষিক্ত করা হয়েছে, তারই গ্রিক অনুবাদ হচ্ছে 'ক্রাইস্ট')

যিশুর মৃত্যুর কয়েক বছর পর ফ্যারিসি *পল* (Paul) খ্রিস্ট ধর্মে দীক্ষিত হন। গোটা গ্রেকো-রোমান বিশ্বে তাঁর মিশনারি সফরের মাধ্যমে খ্রিস্টধর্মকে বিশ্বের নানান অঞ্চলে ছড়িয়ে দেন তিনি। সে-কথা আমরা জানতে পারি দি অ্যাক্টস অভ্ দ্য অ্যাপোসল্‌স-এ। গোড়ার দিককার খ্রিস্টীয় ধর্মসভার কাছে লেখা পলের অসংখ্য চিঠির মাধ্যমে আমরা খ্রিস্টানদের উদ্দেশে তাঁর উপদেশ ও পরামর্শের কথা জানতে পারি।

এক সময় তিনি হাজির হলেন এথেন্সে। সোজা গিয়ে হাজির হলেন দার্শনিক রাজধানীর নগর-চত্বরে। বলা হয়ে থাকে, 'তখন সেই নগর প্রতিমাতে পরিপূর্ণ দেখিয়া তাঁহার অন্তরে তাঁহার আত্মা উত্তপ্ত হইয়া উঠল।'[১৫] তিনি এথেন্সে ইহুদিদের সিনাগগে গিয়ে এপিকিউরীয় আর স্টোয়িক দার্শনিকদের সঙ্গে আলাপ করলেন। তাঁরা তাকে অ্যারিওপেগস পর্বতে নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'এই যে নূতন শিক্ষা আপনি প্রচার করিতেছেন, ইহা কি প্রকার, আমরা কি জানিতে পারি? কারণ আপনি কতকগুলি অদ্ভুত

---

১৫. টি অ্যাক্টস, ১৭: ১৬, নিউ টেস্টামেন্ট; (প্রেরিতদের কার্য-বিবরণ, ১৭: ১৬, নতুন নিয়ম)–অনুবাদক।

কথা আমাদের কানে তুলিতেছেন; অতএব আমরা জানিতে বাসনা করি এ সকল কথার অর্থ কি।'[১৬]

তুমি কল্পনা করতে পারো, সোফি? একজন ইহুদি হঠাৎ করে এথেন্সের বাজারে গিয়ে এমন একজন পরিত্রাতার কথা বলতে শুরু করলেন যিনি ক্রুশবিদ্ধ হয়ে মারা গিয়েছিলেন এবং পরে কবর থেকে উত্থিত হয়েছিলেন। এথেন্সে পলের এই সফর থেকেও গ্রিক দর্শন আর খ্রিস্টীয় পাপমুক্তি তত্ত্বের মধ্যকার একটি আসন্ন বিরোধের আভাস পাই আমরা। তবে এথেন্সবাসীদেরকে পল তাঁর কথা শোনাতে সফল হয়েছিলেন বেশ ভালো করেই। অ্যারিওপেগস থেকে, অ্যাক্রোপলিসের গর্বিত সব মন্দিরের নিচে দাঁড়িয়ে পল এই ভাষণ দিলেন

'হে আথীনীয় লোকেরা, দেখিতেছি, তোমরা সর্ব বিষয়ে বড়ই দেবতাভক্ত। কেননা বেড়াইবার সময়ে তোমাদের উপাস্য বস্তু সকল দেখিতে দেখিতে একটি বেদি দেখিলাম যাহার উপরে লিখিত আছে, 'অপরিচিত দেবের উদ্দেশ্যে।' অতএব তোমরা যে অপরিচিতের ভজনা করিতেছ, তাঁহাকে আমি তোমাদের নিকট প্রচার করি।

ঈশ্বর, যিনি জগৎ ও তন্মধ্যস্থ সমস্ত বস্তু নির্মাণ করিয়াছেন, তিনিই স্বর্গের ও পৃথিবীর প্রভু, সুতরাং হস্তনির্মিত মন্দিরের বাস করেন না; কোনো কিছুর অভাব প্রযুক্ত মনুষ্যদের হস্ত দ্বারা সেবিতও হন না, তিনিই সকলকে জীবন ও শ্বাস ও সমস্তই দিতেছেন। আর তিনি এক ব্যক্তি হইতে মনুষ্যদের সকল জাতিকে উৎপন্ন করিয়াছেন, যেন তাহারা সমস্ত ভূতলে বাস করে; তিনি তাহাদের নির্দিষ্ট কাল ও নিবাসের সীমা স্থির করিয়াছেন : যেন তাহারা ঈশ্বরের অন্বেষণ করে, যদি কোন মতে হাতড়িয়া হাতড়িয়া তাঁহার উদ্দেশ পায়; অথচ তিনি আমাদের কাহারও হইতে দূরে নহেন। কেননা তাঁহাতেই আমাদের জীবন, গতি ও সত্তা; যেমন তোমাদের কয়েকজন কবিও বলিয়াছেন, 'কারণ আমরাও তাঁহার বংশ'। অতএব আমরা যখন ঈশ্বরের বংশ, তখন ঈশ্বরের স্বরূপকে মনুষ্যের শিল্প ও কল্পনা অনুসারে ক্ষোদিত স্বর্ণের কি রৌপ্যের কি প্রস্তরের সদৃশ জ্ঞান করা আমাদের কর্তব্য নহে। ঈশ্বর সেই অজ্ঞানতার কাল উপেক্ষা করিয়াছিলেন, কিন্তু এখন সর্বস্থানের সকল মনুষ্যকে মন পরিবর্তন করিতে আজ্ঞা দিতেছেন;

কেননা তিনি একটি দিন স্থির করিয়াছেন, যে দিনে আপনার নিরূপিত ব্যক্তি দ্বারা ন্যায়ে জগৎ-সংসারের বিচার করিবেন; এই বিষয়ে সকলের বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ দিয়াছেন,ফলত মৃতগণের মধ্য হইতে তাঁহাকে উঠাইয়াছেন।'[১৭]

---

১৬. টি অ্যাক্টস, ১৭: ১৯, নিউ টেস্টামেন্ট; (প্রেরিতদের কার্য-বিবরণ, ১৭-১৯, নতুন নিয়ম)—অনুবাদক।

১৭ টি অ্যাক্টস, ১৭: ২২-৩১, নিউ টেস্টামেন্ট; (প্রেরিতদের কার্যবিবরণ, ১৭: ২২-৩১, নতুন নিয়ম:)—অনুবাদক।

এথেন্স সফররত পল, সোফি! ভিন্ন একটা কিছু হিসেবে গ্রেকো-রোমান জগতে প্রবেশ করতে শুরু করেছে খ্রিস্টধর্ম, এমন একটা কিছু যা এপিকিউরীয়, স্টোয়িক বা নিওপ্লেটোনিক দর্শন থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। তারপরেও পল তার প্রচারিত ধর্মের সঙ্গে এই সংস্কৃতির কিছু মিল খুঁজে বের করলেন। তিনি এ-কথা জোর দিয়ে বললেন যে ঈশ্বরের অনুসন্ধান করা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। কথাটা গ্রিকদের কাছে নতুন কিছু নয়। কিন্তু পলের শিক্ষা বা ধর্মোপদেশের মধ্যে যে-বিষয়টি নতুন তা হলো ঈশ্বর নিজেকে মানুষের কাছে প্রকাশ করেছেন এবং সত্যি বলতে কী, তিনি তাদের দিকে হাত বাড়িয়েও দিয়েছেন। কাজেই যে-ঈশ্বরকে লোকে তাদের বোধশক্তি দিয়ে বুঝতে পারে তিনি সে-রকম 'দার্শনিক ঈশ্বর' নন। আবার, তিনি 'স্বর্ণ বা রৌপ্য বা প্রস্তর মূর্তি'-ও নন, যে-ধরনের মূর্তি অ্যাক্রোপলিস বা নিচের বাজারে তখন ভূরি ভূরি পাওয়া যেতো। তিনি এমন এক ঈশ্বর যিনি 'হস্তনির্মিত মন্দিরে বাস করেন না।' তিনি একজন ব্যক্তিগত ঈশ্বর যিনি ইতিহাসের গতিপথে হস্তক্ষেপ করেন এবং মানবজাতির স্বার্থে ক্রুশের ওপর নিজের জীবন বিসর্জন দেন।

দি অ্যাক্টস অভ অ্যাপোসল্‌স-এ আমরা পড়ি, পল অ্যারিওপেগসে বক্তৃতা দেয়ার সময় মৃত্যু থেকে পুনর্জাগরণ সম্পর্কে যা বলেছিলেন তাই নিয়ে কিছু লোকজন তাঁকে উপহাস করেছিল। কিন্তু অন্যেরা বলেছিল 'আপনার কাছে এ বিষয় আর একবার শুনিব।' (১৭ ৩২—অনুবাদক) সেখানে আরও কিছু লোক ছিল যারা পলকে অনুসরণ করে খ্রিস্ট ধর্মে বিশ্বাস স্থাপন করেছিল। একটা বিষয় এখানে উল্লেখযোগ্য যে এই বিশ্বাস স্থাপনকারীদের মধ্যে দামারিস নামের এক নারীও ছিল। খ্রিস্টমতে ধর্মান্তরিতদের মধ্যে সবচেয়ে আগ্রহী ছিল নারীরা।

তো, পল তার মিশনারি কার্যকলাপ চালিয়ে গেলেন। যিশুর মৃত্যুর কয়েক দশক পর সবকটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রিক ও রোমান নগরীতে—এথেন্স, রোম, আলেকজান্দ্রিয়া, এফিসস আর করিন্থে-খ্রিস্টান জনগোষ্ঠী তৈরি হয়ে গেল। তিন থেকে চারশত বছরের মধ্যে গোটা হেলেনিস্টিক জগৎ-ই খ্রিস্টান হয়ে গেল।

ধর্মমত

শুধু একজন মিশনারি হিসেবেই যে পল খ্রিস্ট ধর্মের জন্য অসাধারণ অবদান রেখেছিলেন তা কিন্তু নয়। খ্রিস্টীয় ধর্মসভাগুলোর (congregations) ওপরও তার প্রভাব অপরিসীম। আধ্যাত্মিক নেতৃত্বের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হচ্ছিল তখন চারদিকে।

যিশুর মৃত্যুর অল্প কয়েক বছরের মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে-প্রশ্নটি দেখা দিল তা হচ্ছে যারা ইহুদি নয় তারা প্রথমে ইহুদি না হয়ে খ্রিস্টান হতে পারবে কিনা। যেমন ধরো, একজন গ্রিককে কি পথ্যবিধি মেনে চলতে হবে? পল বিশ্বাস করতেন, তার কোনো দরকার নেই। খ্রিস্টধর্ম ইহুদি ধর্মের নিছক কোনো উপদল নয়, তারচেয়ে বেশি কিছু। মোক্ষলাভের এক সার্বজনীন বাণীর মাধ্যমে তা নিজেকে সবার কাছে তুলে ধরে।

ঈশ্বর আর ইস্রায়েলের মধ্যকার 'পুরনো চুক্তি'-র জায়গা নিয়েছে তখন 'নতুন চুক্তি', সে-চুক্তি যিশু সম্পাদন করেছেন ঈশ্বর আর মানবজাতির মধ্যে।

সে যাই হোক, খ্রিস্টধর্মই কিন্তু একমাত্র ধর্ম ছিল না তখন। আমরা দেখেছি হেলেনিজম কীভাবে নানান ধর্মের একীভবনের মাধ্যমে প্রভাবিত হয়েছিল। কাজেই খ্রিস্ট ধর্মের একটি যথার্থ সংক্ষিপ্তসার নিয়ে এগিয়ে আসা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল খ্রিস্টীয় সম্প্রদায়ের জন্য, অন্যান্য ধর্মের সঙ্গে একটা দূরত্ব সৃষ্টির জন্য তো বটেই, সেই সঙ্গে নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে যাতে মতভেদ বা ভাঙন সৃষ্টি না হয় সেজন্যও। কাজেই, মূল খ্রিস্টীয় 'মতবাদ' (dogma) বা নীতিগুলো সংক্ষেপ করে তৈরি হলো প্রথম *ধর্মমত* (Creed)।

এ-রকম একটি মূল মতবাদ ছিল এই যে, যিশু হলেন ঈশ্বর আর মানুষ দুই-ই। তিনি কেবল তাঁর ক্রিয়াকলাপের বদৌলতেই 'ঈশ্বর-পুত্র' নন। তিনি-ই স্বয়ং ঈশ্বর। কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি একজন 'সত্যিকারের মানুষও' বটে, যিনি মানুষের দুঃখ-দুর্দশাগুলো ভাগ করে নিয়েছেন এবং বাস্তবিকই ক্রুশে যন্ত্রণাভোগ করেছেন।

ব্যাপারটা স্ববিরোধী বলেই মনে হতে পারে। কিন্তু খ্রিস্ট ধর্মের বক্তব্য ঠিক এই যে ঈশ্বর মানুষে পরিণত হয়েছেন। যিশু উপদেবতা (অর্থাৎ, অর্ধেক মানুষ এবং অর্ধেক দেবতা) ছিলেন না। এ-ধরনের উপদেবতায় বিশ্বাস অবশ্য গ্রিক আর হেলেনিস্টিক ধর্মগুলোতে যথেষ্ট পরিমাণে প্রচলিত ছিল। খ্রিস্ট ধর্ম শেখাল, যিশু ছিলেন 'সম্পূর্ণ ঈশ্বর এবং সম্পূর্ণ মানুষ।'

পুনশ্চ

প্রিয় সোফি, পুরো ব্যাপারটা কী করে একসঙ্গে দাঁড়িয়ে আছে সে-কথা বলতে দাও আমাকে। গ্রেকো-রোমান জগতে খ্রিস্ট ধর্মের প্রবেশের সময় আমরা দুই সংস্কৃতির এক নাটকীয় মিলন দেখতে পাই। সেই সঙ্গে দেখতে পাই ইতিহাসের মহান সাংস্কৃতিক বিপ্লবগুলোর একটিকে।

প্রায় বেরিয়ে আসছি আমরা প্রাচীন যুগ থেকে। প্রাচীন গ্রিক দার্শনিকদের পর প্রায় এক হাজার বছর পার হয়ে গেছে। আমাদের সামনে এখন খ্রিস্টীয় মধ্যযুগ। এ-যুগটিও প্রায় এক হাজার বছর স্থায়ী হয়েছিল।

জার্মান কবি গ্যেটে একবার বলেছিলেন, 'তিন হাজার বছর যে কাজে লাগাতে পারে না তার জীবন অর্থহীন।' আমি চাই না শেষ পর্যন্ত তোমার জীবনও এ-রকম হোক। আমি সাধ্যমতো চেষ্টা করবো তোমাকে তোমার ঐতিহাসিক শেকড়ের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে। মানুষ হওয়ার এটাই একমাত্র উপায়। একটা নগ্ন নর-বানরের চেয়ে বেশি কিছু হওয়ার এটাই একমাত্র উপায়। এটাই শূন্যে ভেসে বেড়ানো এড়াবার একমাত্র উপায়।

'মানুষ হওয়ার এটাই একমাত্র উপায়। একটা নগ্ন নর-বানরের চেয়ে বেশি কিছু হওয়ার এটাই একমাত্র উপায় '

বেড়ার ছোট ছোট ফুটো দিয়ে বাগানের দিকে বেশ কিছুক্ষণ এক দৃষ্টিতে চেয়ে বসে রইল সোফি। সে বুঝতে শুরু করেছে তার ঐতিহাসিক শেকড় সম্পর্কে জানাটা কেন এত জরুরি। ইস্রায়েলের লোকজনের কাছেও নিশ্চয়ই খুব জরুরি ছিল বিষয়টা।

সে নিজেও খুব সাধারণ একজন ব্যক্তি। তবে সে যদি তার ঐতিহাসিক শেকড় সম্পর্কে জানতে পারে তাহলে আর অতটা সাধারণ থাকবে না সে।

অল্প কিছু বছরের বেশি থাকছে না সে এই গ্রহে। তবে মানবজাতির ইতিহাস তার নিজের ইতিহাস হলে, এক অর্থে তার বয়স হাজার হাজার বছর।

ম ধ্য যু গ

৯৩৫

...পথের কেবল খানিকটা যাওয়া আর ভুল পথে যাওয়া এক কথা নয়...

এক হপ্তা হলো অ্যালবার্টো নক্সের কোনো খবর নেই। লেবানন থেকেও কোনো পোস্ট কার্ড আসেনি, যদিও মেজরের কেবিনে পাওয়া সেই পোস্ট কার্ড নিয়ে সোফি আর জোয়ানা এখনো আলাপ করে। যারপরনাই ভয় পেয়েছিল জোয়ানা সেদিন, কিন্তু এরপর তেমন কিছুই আর না ঘটাতে সেই তাৎক্ষণিক আতঙ্ক মিইয়ে গেছে, ডুবে গেছে হোমওয়ার্ক আর ব্যাডমিন্টনের তলায়।

হিল্ডা—রহস্যের ওপর আলো ফেলবে এ-রকম কিছু সূত্রের আশায় অ্যালবার্টোর চিঠিগুলো বারবার করে পড়ল সোফি। এতে করে ধ্রুপদী দর্শন আত্মস্থ করার বেশ সুবিধে হয়ে গেল তার। ডেমোক্রিটাস আর সক্রেটিস কিংবা প্লেটো আর অ্যারিস্টটলকে পরস্পরের কাছ থেকে আলাদা করে চিনে নেয়ার কোনো সমস্যা রইল না আর।

২৫ মে শুক্রবার সে তার মা বাড়ি ফেরার আগে ডিনার তৈরি করছিল। এটা বরাবরই তাদের শুক্রবারের ব্যবস্থা। আজ সে ফিশ বল আর গাজর দিয়ে ফিশ স্যুপ রান্না করছে।

বাইরে আবহাওয়াটা ক্রমেই ঝোড়ো হয়ে উঠছিল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ক্যাসেরোলটা নাড়ার সময় জানলার দিকে তাকাল সোফি। বার্চ গাছগুলো শস্যমঞ্জরীর মতো দুলছে।

হঠাৎ কী যেন সোঁ করে এসে লাগল উইন্ডোপেনে। ফের ঘুরে দাঁড়িয়ে সোফি দেখল একটা কার্ড সেঁটে আছে জানলায়।

একটা পোস্টকার্ড। কাচের ভেতর দিয়ে পড়া যাচ্ছে 'হিল্ডা মোলার ন্যাগ, প্রযত্নে, সোফি অ্যামুন্ডসেন।'

ঠিক যা ভেবেছিল সে। জানালা খুলে কার্ডটা নিল সে। সেই লেবানন থেকে নিশ্চয়ই পুরো পথ উড়তে উড়তে আসেনি ওটা।

এই কার্ডটিতেও জুন ১৫-র তারিখ লেখা। স্টোভের ওপর থেকে ক্যাসেরোলটা নামিয়ে রাখল সোফি, তারপর বসল গিয়ে কিচেন টেবিলে। কার্ডটাতে লেখা :

> প্রিয় হিল্ডা, কার্ডটা যখন তুই পড়বি তখনো তোর জন্মদিন থাকবে কিনা জানি না। আশা করছি থাকবে; অন্তত বেশ কিছু দিন পার হয়ে যাবে না। সোফির এক হপ্তা যে আমাদেরও এক হপ্তা হবে সে-রকম কোনো কথা

নেই। আমি মিডসামার ঈভে বাড়ি আসছি, তখন ঘণ্টার পর ঘণ্টা গ্লাইডারে বসে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে থাকতে পারবো, হিল্ডা। মেলা কথা জমা হয়েছে আমাদের। ভালোবাসা নিস, তোর বাবা, যে কিনা ইহুদি, খ্রিস্টান আর মুসলিমদের মধ্যকার হাজার বছর-ব্যাপী বিরোধের কথা ভেবে প্রায়ই বিষণ্ন হয়ে পড়ে। নিজেকে আমার বারবার স্মরণ করিয়ে দিতে হয় যে এই তিনটে ধর্ম-ই শুরু হয়েছে আব্রাহাম থেকে। তাই আমার ধারণা তারা সবাই একই বিধাতার কাছে প্রার্থনা করে। এদিকে কেইন আর অ্যাবেল এখনো পরস্পরকে বধ করা চালিয়ে যাচ্ছে।

পুনশ্চ সোফিকে শুভেচ্ছা জানিয়ে দিস, দয়া করে। বেচারি জানেও না পুরো ব্যাপারটা কী অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে। তবে তুই সম্ভবত জানিস, তাই না?

মাথাটা টেবিলে রাখল সোফি একেবারে বিধ্বস্তের মতো। একটা ব্যাপার নিশ্চিত যে পুরো ব্যাপারটার স্বরূপ তার একেবারেই জানা নেই। কিন্তু হিল্ডার সম্ভবত জানা আছে।

হিল্ডার বাবা যদি হিল্ডাকে বলে সোফিকে শুভেচ্ছা জানাতে, তার অর্থ দাঁড়ায় সোফি হিল্ডা সম্পর্কে যতটুকু জানে হিল্ডা সোফি সম্পর্কে তারচেয়ে বেশি জানে। ব্যাপারটা তার কাছে এতো জটিল বলে বোধ হলো যে সে আবার ডিনার তৈরি করায় মন দিল।

একটা পোস্টকার্ড, সেটি নিজে নিজেই এসে সেঁটে যায় রান্নাঘরের জানালায়। এর নাম দেয়া যেতে পারে বিমানডাক!

ক্যাসেরোলটা সে ফের স্টোভের ওপর বসাতেই টেলিফোনটা বেজে উঠল।

যদি বাবা হয়! সোফি মরিয়া হয়ে চাইল তার বাবা যেন বাড়ি আসে যাতে গত কয়েক হপ্তা ধরে যা ঘটেছে সে-সব সে বলতে পারে তাঁকে। কিন্তু দেখা যাবে ফোনটা আসলে জোয়ানা বা মার। সোফি ছোঁ মেরে ফোনটা তুলে নিল।

'সোফি অ্যামুন্ডসেন,' বলল সে।

'আমি,' ওপাশের কণ্ঠটা বলল।

তিনটে বিষয়ে নিশ্চিত হয়ে গেল সোফি ফোনটা তার বাবার নয়। কিন্তু গলাটা একজন পুরুষের আর গলাটা সে আগে শুনেছে কোথাও।

'কে বলছেন?'

'অ্যালবার্টো।'

'ওহ্‌হ্‌!'

কোনো কথা সরছিল না সোফির মুখে। সে চিনতে পারল এটা সেই অ্যাক্রোপলিসের ভিডিও-র গলা।

'তুমি ঠিক আছো তো?'

'বিলক্ষণ।'

'এখন থেকে আর কোনো চিঠি নয়।'

'কিন্তু আমি তো আপনাকে কোনো ব্যাণ্ড পাঠাইনি!'

'আমাদের সামনা-সামনি দেখা হওয়া দরকার খুব। ব্যাপারটা বেশ জরুরি হয়ে উঠছে।'

'কেন?'

'হিল্ডার বাবা আমাদের কাছে এসে পড়ছে।'

'কীভাবে কাছে এসে পড়ছে?'

'সব দিক থেকে, সোফি। এবার আমাদেরকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে।'

'কীভাবে...?'

'কিন্তু মধ্যযুগ সম্পর্কে তোমাকে আমি বলার আগে তুমি খুব একটা সাহায্য করতে পারবে না। রেনেসাঁ আর সপ্তদশ শতাব্দীও কাভার করতে হবে আমাদের। বার্কলে একজন গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র...'

'মেজরের কেবিনে তাঁর ছবিই তো ছিল, তাই না?'

'ঠিক। হয়তো আসল যুদ্ধটা হবে তাঁর দর্শন নিয়েই।'

'আপনার কথায় একটা যুদ্ধ যুদ্ধ ভাব।'

'ব্যাপারটাকে আমি বরং ইচ্ছাশক্তির যুদ্ধ বলবো। আমাদেরকে হিল্ডার নজর কাড়তে হবে, তারপর তার বাবা লিলেস্যান্ডে আসার আগেই ওকে আমাদের দলে ভেড়াতে হবে।'

'কিছুই বুঝতে পারছি না আমি।'

'হয়ত দার্শনিকরা তোমার চোখ খুলে দিতে পারবেন। আগামীকাল সকাল আটটায় সেন্ট মেরি গির্জায় দেখা করবে আমার সঙ্গে। তবে একা আসবে, মেয়ে।'

'এতো সকালে?'

ক্লিক করে একটা শব্দ হলো টেলিফোনে।

'হ্যালো?'

রিসিভার রেখে দিয়েছেন উনি। ফিশ স্যুপটা গরম হয়ে উপচে পড়ার ঠিক আগ মুহূর্তে সোফি দৌড়ে গিয়ে ক্যাসেরোলটা নামিয়ে রাখল স্টোভের ওপর থেকে।

সেন্ট মেরির গির্জা? পাথর দিয়ে তৈরি মধ্যযুগের একটা গির্জা ওটা। কনসার্ট আর খুবই বিশেষ কোনো অনুষ্ঠানের কাজেই কেবল ব্যবহার করা হয় গির্জাটা। গরমের সময় অবশ্য কখনো কখনো ট্যুরিস্টদের জন্য খুলে দেয়া হয় ওটা। কিন্তু তাই বলে মাঝরাতে নিশ্চয়ই খোলা নেই গির্জাটা?

তার মা বাড়ি ফিরতে ফিরতে লেবানন থেকে আসা কার্ডটা সোফি অ্যালবার্টো আর হিল্ডার কাছ থেকে পাওয়া জিনিসের সঙ্গে রেখে দিয়েছে। ডিনারের পর জোয়ানার বাড়ি গেল সোফি।

তার বন্ধু দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে সে বলে উঠল, 'খুবই বিশেষ একটা ব্যবস্থা করতে হবে আমাদের।'

জোয়ানা তার শোবার ঘরের দরজাটা বন্ধ করার আগ পর্যন্ত আর কিছুই বলল না সে।

'ব্যাপারটা একটু জটিল,' সোফি আগের কথার খেই ধরে বলল।

'খুলে বল!'

'মা-কে আমার বলতে হচ্ছে যে আমি আজ রাতটা এখানে থাকছি।'

'দারুণ!'

'কিন্তু ওটা আমি স্রেফ বলবোই শুধু, বুঝলি। আসলে আমি অন্য এক জায়গায় যাবো।'

'দ্যাট্‌স্‌ ব্যাড। কোনো ছেলের সঙ্গে দেখা করবি বুঝি?'

'না, সেই হিল্ডা সংক্রান্ত ব্যাপার।'

ছোট্ট করে শিস দিয়ে উঠল জোয়ানা। কড়াভাবে তার চোখের দিকে তাকাল সোফি।

'আজ সন্ধ্যায় আমি আসছি এখানে,' বলল সে। 'কিন্তু সাতটার সময় আবার চুপিচুপি বেরিয়ে পড়তে হবে আমাকে। আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত ব্যাপারটা সামলাতে হবে তোকে।'

'কিন্তু তুই যাচ্ছিস কোথায়? কী এমন ব্যাপার যা তোর না *করলেই চলছে না?*'

'দুঃখিত। আমি মুখ খুলতে পারছি না।'

বাড়ির বাইরে ঘুমানোটা কখনোই কোনো সমস্যার সৃষ্টি করেনি। প্রায় তার উল্টোটাই হয়েছে বরং। মাঝে মাঝে সোফির যেন মনে হয়েছে, বাড়িতে একা থাকাটা তার মা উপভোগই করেন।

'ব্রেকফাস্ট করতে নিশ্চয়ই বাড়ি আসবি তুই?' সোফি বেরুবার সময় কেবল এই মন্তব্যটা করলেন তিনি।

'যদি না-ও আসি তুমি তো জানো-ই আমি কোথায় থাকবো।'

এই কথাটা আবার সে বলতে গেল কেন? একটা খুঁত থেকে গেল।

সোফির সফরের শুরুটা অন্য যে-কোনো বারের বাইরে ঘুমানোর মতোই হলো, গভীর রাত পর্যন্ত গল্প করল ওরা। একমাত্র তফাৎটা হলো, শেষ পর্যন্ত ওরা যখন দুটোর সময় ঘুমোতে গেল সোফি ঘড়িতে পৌনে সাতটায় এলার্ম দিয়ে রাখল।

পাঁচ ঘণ্টা পর সোফি যখন বাযারটা বন্ধ করছে, জোয়ানার ঘুম ভেঙে গেল তখন, অবশ্য নেহাতই অল্প সময়ের জন্য।

'সাবধানে থাকিস,' বিড়বিড় করে বলল সে।

সোফি রওনা হয়ে গেল। শহরের পুরনো অংশের বাইরের দিকটায় সেন্ট মেরি-র গির্জা। মাইল কয়েকের হাঁটা-পথ। কিন্তু মাত্র কয়েক ঘণ্টা ঘুমোলে কী হবে, সোফির চোখে ঘুমের লেশমাত্র নেই।

পুরনো পাথুরে গির্জাটার প্রবেশ-পথের সামনে যখন এসে দাঁড়াল সে তখন প্রায় আটটা বাজে। বিশাল, ভারি দরজাটা খোলার চেষ্টা করল সোফি। দরজাটায় কোনো তালা নেই।

গির্জাটা যেমন পুরনো, সেটার ভেতরটাও ঠিক তেমনি নির্জন আর সুনসান। ঘষা-কাচের জানালাগুলোর ভেতর দিয়ে নীলাভ একটা আলো এসে বাতাসে ভাসমান অসংখ্য ক্ষুদে ক্ষুদে ধূলিকণাকে দৃশ্যমান করে তুলছে। ধুলোগুলো মোটা কড়িকাঠের মতো এক জায়গায় জড়ো হয়ে এদিক থেকে ওদিকে যাচ্ছে গির্জার ভেতরে। সোফি

গির্জার মূল অংশের মধ্যকার একটা বেঞ্চিতে বসে পড়ল। অনুজ্জ্বল রঙে ছোপান ক্রুশবিদ্ধ যিশুর একটা পুরনো মূর্তির নিচের বেদির দিকে তাকিয়ে রইল।

কিছুক্ষণ কেটে গেল। হঠাৎ করেই অর্গান বেজে উঠল। মুখ ঘুরিয়ে তাকাবার সাহস হলো না সোফির। মনে হলো প্রাচীন কোনো স্তবগান, সম্ভবত মধ্যযুগের। ঘুরে তাকাবে নাকি? তারচেয়ে বরং ক্রুশটার দিকে তাকিয়ে থাকাই স্থির করল সে।

তার পাশ দিয়ে আইল ধরে ওপরে উঠে গেল পদক্ষেপগুলো, সন্ন্যাসীর বাদামি পোশাক পরা একটা ছায়ামূর্তি দেখতে পেল সে। সোফি দিব্যি দিয়ে বলতে পারে ঠিক মধ্যযুগ থেকে উঠে এসেছেন সন্ন্যাসীটি।

একটু নার্ভাস বোধ করল সোফি, কিন্তু বুদ্ধি হারাল না। বেদিটার সামনে গিয়ে আধ পাক ঘুরলেন সন্ন্যাসীটি, উঠে পড়লেন সেটিতে। সামনের দিকে ঝুঁকে পড়লেন তিনি। মাথা নিচু করে সোফির দিকে তাকালেন, তারপর লাতিন ভাষায় তার উদ্দেশে বলে উঠলেন

'Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. Scicut erat in principio, et nunc, et semper et in seculorum. Amen.'

'কী যা তা বকছেন!' সোফি চেঁচিয়ে উঠল।

তার গলা পুরনো পাথুরে গির্জার ভেতর প্রতিধ্বনি তুলল।

যদিও সে বুঝতে পারছিল সে সন্ন্যাসী লোকটি অ্যালবার্টো নক্স ছাড়া অন্য কেউ নন, কিন্তু তারপরেও ঈশ্বরের আরাধনার এই পবিত্রস্থানে এভাবে নিজে সে চেঁচিয়ে ওঠায় অনুতপ্ত বোধ করল সোফি। তবে কথা হলো সে আসলে নার্ভাস বোধ করছিল আর কেউ যখন নার্ভাস বোধ করে তখন সব ধরনের বিধি-নিষেধ অমান্য করাটা বড্ড স্বস্তিদায়ক।

'শ্‌শ্‌শ্‌!' একটা হাত উঁচু করলেন অ্যালবার্টো, ঠিক যেমন পাদ্রীরা করেন যখন তাঁরা সমবেত লোকজনকে শান্ত হতে বলেন।

'মধ্যযুগ চারটার সময় শুরু হয়েছে,' তিনি বললেন।

'মধ্যযুগ চারটার সময় শুরু হয়েছে?' বোকা বনে গিয়ে জিজ্ঞেস করল সোফি, অবশ্য এখন আর তার নার্ভাস লাগছে না।

'হ্যাঁ, প্রায় চারটার সময়। আর তারপর পাঁচ, ছয়, সাতটা বাজল। কিন্তু মনে হলো সময় যেন থমকে দাঁড়িয়েছে। এরপর আট, নয়, দশ হবে। তারপরও সেটি মধ্যযুগ। তুমি হয়ত ভাববে একটা নতুন দিন শুরু হওয়ার সময় হয়েছে। বুঝতে পারছি, তুমি কী বলতে চাইছো। কিন্তু তা না হয়ে দিনটি রোববারই আছে। অসংখ্য রোববারের একটা লম্বা, অন্তহীন সারি। এরপর বাজবে এগারো, বারো, তেরো। এই সময়টাকে আমরা বলি হাই গথিক, ইউরোপের বড় বড় ক্যাথিড্রালগুলো এই সময়েই তৈরি হয়েছিল। তারপর, চৌদ্দটার কাছাকছি সময়ে, অর্থাৎ বিকেল দুটোর সময় একটা কাক ডেকে উঠল আর সঙ্গে সঙ্গে শেষ হতে শুরু করল অন্তহীন মধ্যযুগ।'

'মধ্যযুগ তাহলে ছিল দশ ঘণ্টা,' বলল সোফি। অ্যালবার্টো তাঁর সন্ন্যাসীর বাদামি আলখাল্লার ভেতর থেকে মাথাটা বের করে দিয়ে চোদ্দ বছর বয়সী একটি মেয়েকে নিয়ে গঠিত তাঁর ধর্মসভার দিকে তাকালেন।

'প্রতিটি ঘণ্টা যদি একশো বছর হয় তাহলে তাই। আমরা ধরে নিতে পারি যীশুর জন্ম হয়েছে মধ্যরাত্রে। পল তাঁর মিশনারি সফর শুরু করেছেন রাত সাড়ে বারোটার ঠিক আগে আর তার পনেরো মিনিট পর মারা গিয়েছেন রোমে। ভোর তিনটের দিকে খ্রিস্ট সম্প্রদায় একরকম নিষিদ্ধ ঘোষিত হলো আর ৩১৩ খ্রিস্টাব্দের মধ্যেই তা রোমান সাম্রাজ্যে একটি স্বীকৃত ধর্মের মর্যাদা লাভ করল। সেটি সম্রাট কনস্টান্টিনের শাসনামল। খোদ হোলি এম্পেরর বা পবিত্র সম্রাটই বহুদিন পর তাঁর মৃত্যুশয্যায় খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হলেন। ৩৮০ খ্রিস্টাব্দ থেকে খ্রিস্টধর্ম গোটা রোমান সাম্রাজ্যের সরকারি ধর্ম বলে স্বীকৃতি পেল।'

'রোমান সাম্রাজ্যের পতন হয়েছিল না?'

'পতন তখন শুরু হয়েছে সবে। সংস্কৃতির ইতিহাসে যত বড় বড় পরিবর্তন ঘটেছে তারই একটার সামনে দাঁড়িয়ে আমরা এখন। চতুর্থ শতাব্দীতে রোম দু'দিক থেকেই হুমকির সম্মুখীন হতে শুরু করল, একদিকে বর্বররা উত্তর দিক থেকে গায়ের ওপর এসে পড়ছিল, অন্যদিকে ভেতর থেকেও শুরু হয়েছিল ক্ষয়। ৩৩০ খ্রিস্টাব্দে কনস্টান্টিন দ্য গ্রেট তাঁর সাম্রাজ্যের রাজধানী রোম থেকে কনস্টান্টিনোপলে স্থানান্তরিত করলেন। কৃষ্ণ সাগরের মুখে অবস্থিত এই শহরটির পত্তন করেছিলেন তিনি-ই। অনেকেই এই নতুন শহরটিকে 'দ্বিতীয় রোম' মনে করত। ৩৯৫ খ্রিস্টাব্দে দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে গেল রোমান সাম্রাজ্য—রোমকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠল পশ্চিম সাম্রাজ্য আর নতুন শহর কনস্টান্টিনোপলকে রাজধানী হিসেবে রেখে একটি পূর্ব সাম্রাজ্য। ৩১০ খ্রিস্টাব্দে বর্বররা রোমে লুটতরাজ আর ধ্বংসযজ্ঞ চালায় আর ৪৭৬-এ গোটা পশ্চিম সাম্রাজ্য-ই ধ্বংস হয়ে যায়। ওদিকে পূর্ব সাম্রাজ্য দাপটের সঙ্গেই টিকে থাকে অনেক দিন, তারপর ১৪৫৩ সালে তুর্কিরা দখল করে নেয় কনস্টান্টিনোপল।

'আর তখন সেটির নাম হয় ইস্তাম্বুল, তাই না?'

'ঠিক! আর ওই নামটাই এখনো আছে। আরেকটি তারিখও একটু মনে রাখতে হবে আমাদের আর সেটি হলো ৫২৯। এই বছরই খ্রিস্টানরা এথেন্সে প্লেটোর একাডেমি বন্ধ করে দেয়। একই বছর প্রতিষ্ঠিত হয় বিখ্যাত মঠভিত্তিক সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে প্রথমটি—বেনেডিক্টীয় সম্প্রদায়। কাজেই খ্রিস্ট সম্প্রদায় কীভাবে গ্রিক দর্শনের মুখে কুলুপ এঁটে দিল তারই একটি প্রতীক হয়ে রইল ৫২৯ খ্রিস্টাব্দ। এরপর থেকে শিক্ষা, চিন্তা-ভাবনা এবং ধ্যান, ইত্যাদির একচেটিয়া এক্তিয়ার চলে গেল মঠগুলোর কাছে। ঘড়িতে তখন সাড়ে পাঁচটা বাজে...'

এই সময়গুলো দিয়ে অ্যালবার্টো কী বোঝাতে চাইছেন বুঝতে পারল সোফি। মধ্যরাত্রি ০, একটা হচ্ছে খ্রিস্টের জন্মের পর ১০০ বছর, ছ'টা খ্রিস্টের জন্মের পর ৬০০ বছর, চোদ্দটা হচ্ছে খ্রিস্টের জন্মের পর ১,৪০০ বছর...

অ্যালবার্টো বলে চললেন মধ্যযুগ বলতে আসলে অন্য দুটো সময়ের মধ্যবর্তী সময়টাকে বোঝায়। রেনেসাঁর (Renaissance) সময়ই শোনা যেতে থাকে কথাটা। মধ্যযুগকে—সেটিকে অন্ধকার যুগ-ও বলা হতো—তখন প্রাচীনকাল আর রেনেসাঁ-র মাঝখানে ইউরোপে নেমে আসা এক হাজার বছরের দীর্ঘ একটা রাত হিসেবে দেখা হতো। 'মধ্যযুগীয়' কথাটা ব্যবহৃত হয় অতি কর্তৃত্বপরায়ণ এবং অনমনীয় যে-কোনো

কিছুকে বোঝাবার জন্য। কিন্তু এখন অনেক ইতিহাসবিদ-ই মধ্যযুগকে এক হাজার বছর স্থায়ী অংকুরোদগম আর ক্রমবৃদ্ধির সময় হিসেবে দেখে থাকেন। যেমন ধরো, স্কুল পদ্ধতির শুরু হয়েছিল মধ্যযুগেই। এই সময়ের গোড়ার দিকেই খোলা হয়েছিল প্রথম কনভেন্ট স্কুলগুলো, তারপর দ্বাদশ শতাব্দীতে আসে ক্যাথিড্রাল স্কুল। ১২০০ খ্রিস্টাব্দের দিকে স্থাপিত হয় প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আর সেখানে যে-সব বিষয় পড়ানো হতো সেগুলোকে নানান 'অনুষদ'-এর অধীনে রাখা হয়েছিল, ঠিক যেমনটি করা হয় আজকের দিনে।'

'এক হাজার বছর সত্যিই খুব লম্বা সময়।'

'হ্যাঁ। তবে জনগণের কাছে পৌঁছাতে বেশ সময় লেগেছিল খ্রিস্টধর্মের। তাছাড়া, মধ্যযুগেই নানান শহর-নগর, নাগরিক আর লোকসঙ্গীত ও লোকগাথা নিয়ে গড়ে ওঠে নানান জাতি-রাষ্ট্র। মধ্যযুগ না থাকলে এতোসব রূপকথা আর লোকসঙ্গীত কী করে হতো বলো তো? এমনকি ইউরোপই বা কেমন হতো? একটা রোমান প্রদেশ, খুব সম্ভব। তারপরেও, ইংল্যান্ড, ফ্রান্স কিংবা জার্মানি নামগুলো যে অনুরণন সৃষ্টি করে তা হলো অনন্ত অতল যে-জলধিকে আমরা মধ্যযুগ বলি ঠিক তাই। এই অতল জলে ঘুরে বেড়ায় অসংখ্য চকচকে মাছ, যদিও সব সময় সেগুলোর দেখা মেলে না। স্নরি মধ্যযুগের লোক। সেন্ট ওলাফ আর শার্লামেন-ও তাই। রোমিও-জুলিয়েট, জোয়ান অভ আর্ক, ইভানহো, হ্যামেলিনের বংশীবাদক এবং আরও শত শক্তিমান রাজপুত্র, জমকালো রাজা-মহারাজা, বীরধর্মব্রতী নাইট আর সুন্দরী রমণী, রঙ-কাচের জানালার অজ্ঞাতপরিচয় নির্মাণকারী আর প্রতিভাবান অর্গান প্রস্তুতকারকদের কথা তো না বললেও চলে। তারপরেও তো ফ্রায়ার, ক্লনেভ বা উইচদের কথা বলাই হয়নি'

'প্রাণীদের কথাও বলেননি আপনি।'

'হ্যাঁ, তাঁরাও আছেন। ভালো কথা, নরওয়েতে কিন্তু একাদশ শতাব্দীর আগে খ্রিস্টধর্ম আসেনি। তবে নর্ডিক দেশগুলো সব একসঙ্গে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেছিল বললে বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে। খ্রিস্টধর্মের উপরিতলের নিচে খ্রিস্টপূর্ব বিশ্বাস-ও টিকে গিয়েছিল। যেমন ধরো, স্ক্যান্ডিনেভীয় বড়দিনের উৎসবে এই আজকের দিনেও অনেক খ্রিস্টীয় এবং প্রাচীন নর্স রীতিনীতি মিলেমিশে থাকে। এবং এক্ষেত্রে পুরনো সেই প্রবাদটা বেশ প্রযোজ্য বিবাহিত লোকজনের অর্থাৎ স্বামী-স্ত্রীর চেহারা ধীরে ধীরে একই রকম হয়ে যেতে থাকে। ঠিক তেমনি ইউলটাইডের কুকি, ইউলটাইডের পিগলেট আর ইউলিটাইড এইল প্রাচ্যের তিন জ্ঞানী ব্যক্তি আর বেথলেহেমের জাবনা-পাত্রের মতো চেহারা পেতে শুরু করে। তবে এ-কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে খ্রিস্টধর্ম-ই ধীরে ধীরে জীবনের প্রধান দর্শন হয়ে ওঠে। সেজন্যই মধ্যযুগকে আমরা খ্রিস্টীয় সংস্কৃতির একটা ঐক্য বা সমন্বয় সাধনকারী শক্তি হিসেবে বর্ণনা করে থাকি।

'ব্যাপারটা তাহলে অতটা হতাশাজনক ছিল না?'

'৪০০ খ্রিস্টাব্দের পর প্রথম কয়েকটা শতকে সাংস্কৃতিক একটা অবক্ষয় দেখা দিয়েছিল। তবে রোমান সময়টা ছিল খুবই উঁচু মানসম্পন্ন সাংস্কৃতিক যুগ, সেখানে ছিল বড় বড় নগর, পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থা, গণস্নানাগার; তাছাড়া জাঁকজমকপূর্ণ স্থাপত্যের কথা তো বলাই বাহুল্য। মধ্যযুগের প্রথম কয়েক শতকে এই গোটা সংস্কৃতি মুখ থুবড়ে

পতন। একই দশা ঘটল ব্যবসা-বাণিজ্য আর অর্থনীতির বেলাতেও। মধ্যযুগে লোকজন মূল্য পরিশোধের মাধ্যম হিসেবে পণ্যবিনিময় প্রথায় ফিরে গিয়েছিল। অর্থনীতিতে প্রচলিত হলো সামন্তপ্রথা (feudalism); এই সামন্তপ্রথায় অল্পসংখ্যক অভিজাত সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষের হাতে জমির মালিকানা থাকত আর সার্ফ (serf) বা ভূমিদাসরা সেই জমি চাষ করে জীবিকা নির্বাহ করত। প্রথম কয়েক শতকে জনসংখ্যাও হ্রাস পেয়েছিল বেশ। প্রাচীন যুগে রোমের জনসংখ্যা ছিল ১০ লাখেরও বেশি। কিন্তু ৬০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে প্রাচীন রোমান রাজধানীর লোকসংখ্যা ঠেকল এসে ৪০,০০০-এ, আগের জনসংখ্যার স্রেফ এক ভগ্নাংশে। অর্থাৎ নগরটির সাবেক গৌরবের চিহ্ন নিয়ে জাঁকাল সব স্মৃতিচিহ্নবাহী প্রাসাদ আর অট্টালিকার যেটুকু অবশিষ্ট ছিল তারই ভেতর ঘুরে-ফিরে বেড়াবার জন্য রয়ে গেল তুলনামূলকভাবে অল্পসংখ্যক একটি জনগোষ্ঠী। তাদের নির্মাণ সামগ্রীর প্রয়োজন মেটাতো অগুনতি সব ধ্বংসাবশেষ। স্বাভাবিকভাবেই, এতে করে বর্তমান যুগের প্রত্নতত্ত্ববিদেরা নিদারুণ দুঃখ পেয়েছেন, প্রাচীন যুগের এ-সব স্মৃতিস্তম্ভ বা চিহ্নগুলোতে মধ্যযুগের মানুষেরা হাত না দিলেই বরং খুশি হতেন তারা।'

'কোনো কিছু ঘটে গেলে তারপর সে-সম্পর্কে জানাটা সহজ হয়।'

'রাজনৈতিক দিক দিয়ে অবশ্য চতুর্থ শতাব্দীর শেষদিকেই যবনিকা পতন ঘটে গিয়েছিল রোমান যুগের। সে যাই হোক, কালে রোমের বিশপ-ই রোমান ক্যাথলিক চার্চের সর্বপ্রধান ব্যক্তি হয়ে দাঁড়ালেন। তাঁকে 'পোপ'—লাতিন ভাষায় 'পাপা', যার অর্থ বাবা—উপাধি দেয়া হলো এবং কালক্রমে তাঁকে দেখা হতে লাগল পৃথিবীতে যিশু খ্রিস্টের প্রতিনিধি হিসেবে। এভাবেই, মধ্যযুগের প্রায় পুরো সময়টাতে রোম-ই ছিল খ্রিস্টধর্মের রাজধানী। কিন্তু নতুন নতুন জাতি-রাষ্ট্রের রাজা আর বিশপেরা ক্রমেই আরও শক্তিশালী হয়ে উঠলে তাঁদের কেউ কেউ গির্জার শক্তি ও সম্পদের বিরুদ্ধেও মাথা তুলে দাঁড়ালেন।'

'আপনি বললেন খ্রিস্টানরা এথেন্সে প্লেটোর একাডেমি বন্ধ করে দিয়েছিল। তার মানে কি এই যে গ্রিক দার্শনিকদের সবাই ভুলে গিয়েছিল?'

'পুরোপুরি নয়। অ্যারিস্টটল আর প্লেটোর কিছু লেখার সঙ্গে মানুষের পরিচয় ছিল। কিন্তু প্রাচীন রোমান সাম্রাজ্য ধীরে ধীরে তিনটি ভিন্ন সংস্কৃতিতে বিভক্ত হয়ে পড়ে। পশ্চিম ইউরোপে রইল লাতিনীয় খ্রিস্টান সংস্কৃতি, রোমকে রাজধানী হিসেবে নিয়ে। পূর্ব ইউরোপে কনস্টান্টিনোপলকে রাজধানী হিসেবে নিয়ে রইল গ্রিক খ্রিস্ট সংস্কৃতি। এই নগরটি পরিচিত হলো সেটির গ্রিক নাম বাইজেন্টিয়াম (Byzantium) হিসেবে। সেজন্যই আমরা বলি বাইজেন্টীয় মধ্যযুগ বনাম রোমান ক্যাথলিক মধ্যযুগ। অবশ্য উত্তর আফ্রিকা আর মধ্য প্রাচ্য-ও রোমান সাম্রাজ্যের অংশ ছিল। মধ্যযুগে এই এলাকাটি আরবিভাষী অধ্যুষিত মুসলিম সংস্কৃতি হিসেবে গড়ে ওঠে। ৬৩২ খ্রিস্টাব্দে মুহাম্মদ-এর মৃত্যুর পর মধ্যপ্রাচ্য এবং উত্তর আফ্রিকা ইসলামের পতাকাতলে চলে যায়। এর কিছুদিন পর স্পেন-ও ইসলামী সংস্কৃতি বিশ্বের অন্তর্ভুক্ত হয়। মক্কা, মদিনা, জেরুজালেম আর বাগদাদকে ইসলাম পবিত্র নগর হিসেবে গ্রহণ করে। সাংস্কৃতিক ইতিহাসের দিক থেকে যে-বিষয়টি অত্যন্ত লক্ষণীয় তা হলো আরবরা প্রাচীন

হেলেনিস্টিক নগর আলেকজান্দ্রিয়া-ও জয় করেছিল। ফলে প্রাচীন গ্রিক বিজ্ঞানের অনেকটাই আরবরা পেয়েছিল উত্তরাধিকারসূত্রে। গোটা মধ্যযুগ জুড়ে বিজ্ঞানের এই শাখাগুলোতে গণিত, রসায়ন, জ্যোতির্বিদ্যা আর চিকিৎসাশাস্ত্রে আরবরা শীর্ষস্থানে ছিল। এখনো আমরা আরবি সংখ্যা ব্যবহার করি। বেশ কিছু ক্ষেত্রে আরবীয় সংস্কৃতি খ্রিস্টান সংস্কৃতির চেয়ে এগিয়ে ছিল।

'আমি জানতে চাই গ্রিক দর্শনের কী হলো।'

'একটা নদীর কথা কল্পনা করো তো যেটা তিনটি ভিন্ন শাখায় বিভক্ত হয়ে কিছু দূর চলার পর আবার এক বিশাল চওড়া নদীতে পরিণত হয়েছে।'

'করলাম।'

'বেশ, তাহলে তুমি এটাও বুঝতে পারবে কী করে গ্রেকো-রোমান সংস্কৃতি বিভক্ত হয়ে তিনটি ভিন্ন সংস্কৃতির মধ্যে বেঁচে রইল : পশ্চিমে রোমান ক্যাথলিক সংস্কৃতি, পুবে বাইজেন্টীয় আর দক্ষিণে আরবীয়। ব্যাপারটা অতিসরলীকরণ হয়ে যায়, তারপরেও এটা বলা চলে যে পশ্চিমে চলে এলো নব্য-প্লেটোবাদ, পুবে প্লেটো আর দক্ষিণে আরবদের কাছে অ্যারিস্টটল। কিন্তু এই তিন ধারাতেই সবগুলোরই কিছু না কিছু ছিল। লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, মধ্যযুগের শেষের দিকে এই তিনটি ধারাই এসে মিলিত হলো ইতালির উত্তরাংশে। আরবীয় প্রভাবটি আসে স্পেনের আরবদের কাছ থেকে, গ্রিক প্রভাব আসে গ্রিস আর বাইজেন্টীয় সাম্রাজ্য থেকে। এখানে আমরা দেখতে পাই রেনেসাঁর সূচনা পর্বটি, যা ছিল প্রাচীন সংস্কৃতির 'পুনর্জন্ম'। এক অর্থে বলতে গেলে, প্রাচীন সংস্কৃতি অন্ধকার যুগটির পরেও টিকে গেল।'

'বুঝতে পারছি।'

'কিন্তু তাই বলে ঘটনার গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে আগ বাড়িয়ে কিছু বলে দেয়াটা উচিত হবে না। তার আগে আমরা মধ্যযুগের দর্শন নিয়ে কিছু কথা বলব। আমি আর এই বেদি থেকে কথা বলব না। নিচে নেমে আসছি।'

ঘুম তেমন না হওয়াতে সোফির চোখের পাতা ভারি হয়ে এসেছে। অদ্ভুত সন্ন্যাসীটিকে সেন্ট মেরির গির্জার বেদি থেকে নেমে আসতে দেখে তার স্বপ্নের মতো মনে হলো।

বেদির রেইল-এর দিকে হেঁটে এলেন অ্যালবার্টো। মুখ তুলে তাকালেন প্রাচীন ক্রুশবিদ্ধ যিশুমূর্তিসহ বেদিটার দিকে, তারপর ধীরে ধীরে হেঁটে এলেন সোফির দিকে। তারপর তার পাশে উপাসকের জন্য সংরক্ষিত আসনে (pew) বসে পড়লেন।

ভদ্রলোকটিকে এতো কাছে দেখতে পেয়ে কেমন অদ্ভুত লাগল সোফির। মস্তকাবরণসহ তাঁর আলখাল্লার ভেতর একজোড়া গভীর বাদামি চোখ দেখতে পেল সে। চোখ দুটো কালো চুল আর সুচালো দাড়িবিশিষ্ট একটি মধ্যবয়স্ক মানুষের। কে আপনি? ভাবল সোফি। কেন আপনি আমার জীবন এভাবে উল্টে দিলেন?

'ধীরে ধীরে আমরা একে অন্যকে আরও ভালোভাবে জানবো,' যেন সোফির মনের কথা পড়ে নিয়ে বললেন তিনি।

দু'জনে যখন ঘষা-কাচের জানালার ভেতর দিয়ে গির্জায় ঢুকে পড়া তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে আসা আলোর মধ্যে বসেছে, অ্যালবার্টো নক্স বলতে শুরু করলেন

মধ্যযুগের দর্শনের কথা।

'মধ্যযুগের দার্শনিকেরা এ-কথা প্রায় ধরেই নিয়েছিলো যে খ্রিস্টধর্ম সত্য,' শুরু করলেন তিনি। 'প্রশ্ন ছিল কেবল এই যে, আমাদেরকে কি খ্রিস্টীয় প্রত্যাদেশ *বিশ্বাস* করতে হবে, নাকি খ্রিস্টীয় সত্যগুলোর দিকে আমরা আমাদের প্রজ্ঞার সাহায্যে এগোতে পারবো। গ্রিক দার্শনিকেরা যা বলেছেন তার সঙ্গে বাইবেলের কথার সম্পর্ক কোথায়? বাইবেল আর প্রজ্ঞার মধ্যে কি কোনো বিরোধ আছে, নাকি বিশ্বাস আর জ্ঞানের সহাবস্থান সম্ভব? মধ্যযুগের দর্শনের প্রায় পুরোটা আবর্তিত হয়েছে এই একটি প্রশ্নকে ঘিরে।'

অধৈর্যের সঙ্গে মাথা নাড়ল সোফি। এ-সব কথা সে তাদের ধর্ম ক্লাসেই শুনেছে।

'আমরা দেখব মধ্যযুগের সবচেয়ে বিখ্যাত দুই দার্শনিক কীভাবে এই প্রশ্নের সঙ্গে বোঝাপড়া করেছেন এবং আমরা শুরু করবো *সেন্ট অগাস্টিনকে* (St. Augustine) দিয়ে, যাঁর জন্ম ৩৫৪-তে মৃত্যু ৪৩০-এ। এই একজন মানুষের জীবনের দিকে তাকালেই প্রাচীন যুগের শেষ অংশ থেকে মধ্যযুগের প্রথম অংশে পর্বান্তরের চিত্রটি দেখতে পাবো আমরা। উত্তর আফ্রিকার ছোট্ট শহর তাগাস্তে-তে জন্মেছিলেন সেন্ট অগাস্টিন। ষোল বছর বয়েসে কার্থেজে গেলেন পড়াশোনা করতে। পরে তিনি রোম আর মিলান ভ্রমণ করেন এবং জীবনের শেষ অংশটা কাটান কার্থেজ থেকে মাইল কয়েক পশ্চিমের একটি ছোট্ট শহর হিপ্পো-তে। তিনি অবশ্য জন্মসূত্রে খ্রিস্টান ছিলেন না। বরং খ্রিস্টান হওয়ার আগে তিনি বেশ কিছু ধর্ম এবং দর্শন পরীক্ষা করে দেখেছিলেন।'

'যেমন?'

'জীবনের কিছু সময় তিনি ছিলেন *ম্যানিকীয়* (Manichaen)। ম্যানিকীয়রা ছিল প্রাচীন যুগের শেষ পর্বের চরম বৈশিষ্ট্যসূচক ধর্মীয় সম্প্রদায়। তাঁদের মতবাদের আধেক ধর্ম, আধেক দর্শন। তাঁরা বলতেন জগৎ ভালো আর মন্দ, আলো আর আঁধার, মন আর বস্তু, এই দ্বৈতবাদের তৈরি। মানবজাতি তার মনের সাহায্যে বস্তু জগতের ওপরে উঠে তার আত্মার মুক্তিলাভের জন্য তৈরি হতে পারে। কিন্তু ভালো এবং মন্দের মধ্যকার এই সুস্পষ্ট বিভাজন তরুণ অগাস্টিনের মনে কোনো শান্তি আনতে পারল না। তাঁর মন পুরোপুরি আচ্ছন্ন হয়ে রইল আমরা যাকে 'মন্দ সংক্রান্ত সমস্যা' (problem of evil) বলি তাই নিয়ে। এই কথাটির সাহায্যে আমরা বুঝাই মন্দ বা অশুভ কোথা থেকে এলো, এই প্রশ্নটি। একটা সময় তাঁর ওপর স্টোয়িক দর্শন খুব প্রভাব বিস্তার করেছিল। এবং স্টোয়িক মত অনুযায়ী ভালো এবং মন্দের মধ্যে সুস্পষ্ট কোনো বিভেদ নেই। তবে তিনি মূলত আকৃষ্ট হয়েছিলেন প্রাচীন যুগের শেষ পর্বের বাকি যে গুরুত্বপূর্ণ দর্শন ছিল, নব্য-প্লেটোবাদ, সেটির প্রতি। এই সুবাদে, জগতে অস্তিত্বশীল সমস্ত কিছুই যে স্বর্গীয় এই ধারণার সংস্পর্শে আসেন তিনি।

'তো, এরপর তাহলে তিনি নব্য-প্লেটোবাদী বিশপ হলেন বুঝি?'

'হ্যাঁ, তা বলতে পারো, তুমি। তিনি প্রথমে খ্রিস্টান হলেন, তবে সেন্ট অগাস্টিনের খ্রিস্ট ধর্ম ছিল অনেকটাই প্লেটোনিক ধারণা প্রভাবিত। কাজেই, সোফি, এই ব্যাপারটি তোমাকে বুঝতে হবে যে খ্রিস্টীয় মধ্যযুগে পা দেয়া মাত্রই আমরা গ্রিক

দর্শন থেকে একেবারে নাটকীয়ভাবে ভিন্ন কোনো কিছু পাবো না। গ্রিক দর্শনের অনেকটাই সেন্ট অগাস্টিনের মতো গির্জার পাদ্রিদের মাধ্যমে নতুন যুগে চলে এসেছিল।'

'তাহলে সেন্ট অগাস্টিন আধা খ্রিস্টান এবং আধা নব্য-প্লেটোবাদী ছিলেন বলছেন?'

'তিনি নিজে মনে করতেন তিনি শতকরা একশো ভাগ খ্রিস্টান, যদিও খ্রিস্টধর্ম আর প্লেটোর দর্শনের মধ্যে সত্যিকারের কোনো বিরোধ আছে বলে তিনি মনে করতেন না। তাঁর দৃষ্টিতে প্লেটো আর খ্রিস্টীয় মতবাদের মধ্যকার সাদৃশ্য এতোটাই পরিষ্কার যে তিনি ভাবতেন প্লেটো নিশ্চয়ই ওল্ড টেস্টামেন্ট সম্পর্কে জানতেন। সেটি অবশ্য ভীষণ অসম্ভব একটা ব্যাপার। আমরা বরং বলতে পারি সেন্ট অগাস্টিন-ই প্লেটোকে "খ্রিস্টান বানিয়েছেন।'

'তাহলে খ্রিস্টধর্মে বিশ্বাস স্থাপন করতে শুরু করার পর তিনি দর্শনের সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে এমন সবকিছুর দিকে পিঠ ফিরে দাঁড়াননি?'

'না, তবে তিনি মন্তব্য করেছেন যে ধর্মীয় প্রসঙ্গে প্রজ্ঞার এক্তিয়ারের একটা সীমারেখা রয়েছে। খ্রিস্টধর্ম একটি স্বর্গীয় রহস্য, যা কেবল বিশ্বাসের মাধ্যমেই বোঝা বা উপলব্ধি করা সম্ভব। তবে আমরা যদি খ্রিস্ট ধর্মে বিশ্বাস করি তাহলে ঈশ্বর আমাদের আত্মা এমনভাবে 'আলোকিত' করবেন যাতে করে আমরা ঈশ্বর সম্পর্কে এক ধরনের অতিপ্রাকৃত জ্ঞান লাভ করবো। সেন্ট অগাস্টিন উপলব্ধি করেছিলেন যে দর্শন কতদূর যেতে পারবে তার একটা সীমা রয়েছে। খ্রিস্টান হওয়ার পরেই কেবল তাঁর আত্মা প্রশান্তি লাভ করেছিল। তিনি লিখেছেন, 'তোমার মধ্যে ঠাঁই না পাওয়া পর্যন্ত আমাদের আত্মা শান্তি পায় না।'

'আমি ঠিক বুঝতে পারছি না প্লেটোর ধারণা আর খ্রিস্টধর্মের মধ্যে কীভাবে মিল থাকতে পারে,' সোফি আপত্তি জানাল। 'সেই শাশ্বত ভাবগুলোর কী হবে?'

'দেখো, সেন্ট অগাস্টিন এ-কথা অবশ্যই বিশ্বাস করতেন যে ঈশ্বর এ-জগৎ শূন্য থেকেই সৃষ্টি করেছেন এবং এটা একটা বাইবেলীয় ধারণা। ওদিকে গ্রিকরা বরং এ-কথা বিশ্বাস করতেই পছন্দ করত যে জগতের অস্তিত্ব সব সময়ই ছিল। কিন্তু সেন্ট অগাস্টিন বিশ্বাস করতেন ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করার আগে 'ভাবগুলো' ছিল স্বর্গীয় মনের মধ্যে। কাজেই প্লেটোনিক ভাবগুলোকে তিনি ঈশ্বরের ওপর ন্যস্ত করলেন আর এভাবেই শাশ্বত ভাব সম্পর্কে প্লেটোর দৃষ্টিভঙ্গিকে রক্ষা করলেন।'

'এটা অবশ্য দারুণ বুদ্ধিমানের কাজ হয়েছে।'

'তবে ব্যাপারটা এদিকেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে যে কী করে শুধু সেন্ট অগাস্টিন-ই নয়, অন্যান্য খ্রিস্টীয় পাদ্রিও পিছু ফিরে তাকিয়েছিলেন গ্রিক আর ইহুদি চিন্তাধারাগুলোকে এক করার জন্য। এক অর্থে দুটো দুই সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত। অগাস্টিন মন্দত্ব সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপারেও নব্য-প্লেটোবাদের দিকে ঝুঁকেছিলেন। প্লটিনাসের মতো তিনি বিশ্বাস করতেন মন্দ হলো 'ঈশ্বরের অনুপস্থিতি'। মন্দের কোনো স্বাধীন অস্তিত্ব নেই, এটা হলো এমন কিছু যা নেই। কারণ, ঈশ্বরের সৃষ্টি কেবল ভালোই, অন্য কিছু নয়। মন্দ আসে মানবজাতির অবাধ্যতা থেকে, অগাস্টিন তাই

ভাবতেন। অথবা, তাঁর কথায়, 'শুভ ইচ্ছা ঈশ্বরের কাজ; মন্দ ইচ্ছা ঈশ্বরের কাজ থেকে বিচ্যুত হওয়া।'

'তিনি কি এ-কথাও বিশ্বাস করতেন যে মানুষের আত্মা স্বর্গীয়?'

'হ্যাঁ এবং না। সেন্ট অগাস্টিন বিশ্বাস করতেন ঈশ্বর আর জগতের মধ্যে একটা দুর্লঙ্ঘ্য বাধার প্রাচীর রয়েছে। এদিক থেকে তিনি প্রতিটি জিনিস-ই এক, প্লটিনাসের এই মতবাদকে অস্বীকার করে বাইবেলীয় মতকেই দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরেছেন। কিন্তু তারপরেও তিনি এই ব্যাপারটিতে জোর দিয়েছেন যে মানুষ আধ্যাত্মিক প্রাণী। কিন্তু দেহটি বস্তুগত—আর তা রয়েছে বাস্তব জগতেই, যে-জগৎকে 'মথপোকা আর মরিচা বিনষ্ট করে', কিন্তু সেই সঙ্গে তার একটি আত্মা-ও আছে যা ঈশ্বরকে জানতে পারে।'

'তা, আমরা যখন মারা যাই তখন আত্মার কী হয়?'

'সেন্ট অগাস্টিনের মতানুসারে, মানুষের পতনের পর গোটা মানবজাতিই পথ হারিয়ে ফেলেছিল। কিন্তু তারপরেও ঈশ্বর ঠিক করেন যে বিশেষ কিছু লোককে নরকবাসের হাত থেকে রেহাই দেয়া হবে।'

'সেক্ষেত্রে তো ঈশ্বর ঠিক একইভাবে ইচ্ছে করলে সবাইকেই রেহাই দিতে পারতেন।'

'যদ্দূর জানা যায়, সেন্ট অগাস্টিন বিশ্বাস করতেন ঈশ্বরের সমালোচনা করার কোনো অধিকার মানুষের নেই। এ-প্রসঙ্গে তিনি রোমানদের উদ্দেশে লেখা পলের চিঠির উল্লেখ করতেন 'হে মনুষ্য, বরং তুমি কে যে ঈশ্বরের প্রতিবাদ করিতেছ? নির্মিত বস্তু কি নির্মাতাকে বলিতে পারে আমাকে এরূপ কেন গড়িলে? কিম্বা কাদার উপরে কুম্ভকারের কি এমন অধিকার নাই যে, একই মৃৎপিণ্ড হইতে একটি সমাদরের পাত্র আর একটা অনাদরের পাত্র গড়িতে পারে?'[১৮]

'তো, ঈশ্বর তাহলে স্বর্গে বসে মানুষকে নিয়ে খেলা করে যাবেন? এবং যখনই তিনি তাঁর কোনো সৃষ্টির ওপর অসন্তুষ্ট হবেন তখন সেটিকে স্রেফ ছুঁড়ে ফেলে দেবেন?'

'সেন্ট অগাস্টিনের কথা হলো, কোনো মানুষই ঈশ্বরের ক্ষমার যোগ্য নয়। কিন্তু তারপরেও তিনি কিছু মানুষকে নরকভোগ থেকে রেহাই দেবেন বলে নির্বাচন করেছেন, কাজেই কে রেহাই পাবে আর না পাবে তা নিয়ে তাঁর কাছে লুকোছাপার কিছু ছিল না। এটা পূর্ব নির্ধারিত। আমরা পুরোপুরি তাঁর করুণার অধীন।'

'অর্থাৎ এক অর্থে তিনি সেই পুরনো নিয়তিবাদেই ফিরে গেলেন।'

'হয়ত। তবে সেন্ট অগাস্টিন কিন্তু মানুষের নিজের জীবনের ব্যাপারে মানুষের দায়-দায়িত্বের ব্যাপারটি বাতিল করে দেননি। তিনি এই শিক্ষাই দিয়েছেন যে আমরা নির্বাচিত স্বল্প সংখ্যকের মধ্যেই আছি এই ধারণার মধ্যেই বাঁচতে হবে আমাদের। আমাদের যে ইচ্ছার স্বাধীনতা (free will) আছে সে-কথা অগাস্টিন অস্বীকার করেননি। তবে আমরা কীভাবে জীবন যাপন করবো ঈশ্বর তা 'আগে থেকেই জানেন'।'

'ব্যাপারটা কি একটু অন্যায় নয়?' সোফি শুধালো। 'সক্রেটিস বলেছিলেন

১৮. রোমীয়, ৯: ২০-২২; নতুন নিয়ম—অনুবাদক।

আমাদের সবার কাণ্ডজ্ঞান একই হওয়াতে আমাদের সবারই সুযোগ রয়েছে। কিন্তু সেন্ট অগাস্টিন মানুষকে দুই দলে ভাগ করে ফেলছেন। এক দল রক্ষা পেয়ে যাচ্ছে, আরেক দল নরকভোগ করছে।'

'এদিক দিয়ে তোমার কথা ঠিক যে সেন্ট অগাস্টিনের ঈশ্বরতত্ত্ব এথেন্সের মানবতাবাদ থেকে বেশ দূরে সরে গেছে। তবে তিনি কিন্তু মানবজাতিকে দুটো দলে ভাগ করছেন না। তিনি স্রেফ মুক্তিলাভ এবং নরকভোগ সম্পর্কে বাইবেলের মতবাদের গণ্ডিকে বিস্তৃত করছেন। বিষয়টি তিনি ব্যাখ্যা করেছেন তাঁর পাণ্ডিত্যপূর্ণ বই *ঈশ্বরের নগর* (City of God)-এ।'

'শোনা যাক তাহলে।'

'ঈশ্বরের নগর' বা 'ঈশ্বরের রাজ্য' কথাটা এসেছে বাইবেল আর যিশুর শিক্ষা থেকে। সেন্ট অগাস্টিন বিশ্বাস করতেন মানবজাতির ইতিহাস 'ঈশ্বরের রাজ্য' আর 'জগতের রাজ্য'-র মধ্যে যুদ্ধের ইতিহাস। এই দুই 'রাজ্য' আলাদা দুটো রাজনৈতিক রাজ্য নয়। প্রতিটি ব্যক্তি মানুষের মধ্যেই এই দুই রাজ্য যুদ্ধ করে চলে যার যার আধিপত্য কায়েম করার জন্য। তারপরেও, ঈশ্বরের রাজ্য কম বেশি সুস্পষ্টভাবে রয়েছে খ্রিস্টধর্মের মধ্যেই আর জগতের রাজ্য রয়েছে রাষ্ট্রের মধ্যে, এই যেমন রোমান সাম্রাজ্যের মধ্যে, সেন্ট অগাস্টিনের সময়ই কিনা যার পতন শুরু হয়ে গিয়েছিল। গোটা মধ্যযুগ ধরেই গির্জা আর রাষ্ট্রের মধ্যে চলা শ্রেষ্ঠত্বের লড়াই-ই এই ধারণাটিকে আরও সুস্পষ্ট করে তুলেছিল। বলা হতে থাকল, 'গির্জার বাইরে কোনো মুক্তি নেই।' সেন্ট অগাস্টিনের 'ঈশ্বরের নগর' আর রাষ্ট্র অনুমোদিত গির্জা শেষ পর্যন্ত অভিন্ন হয়ে ওঠে। ষোড়শ শতাব্দীতে রিফর্মেশনের আগ পর্যন্ত এই ধারণার বিরুদ্ধে কোনো প্রতিবাদ শোনা গেল না যে একমাত্র গির্জার মাধ্যমেই মানুষ মুক্তিলাভ করতে পারে।'

'সময় হয়ে আসছিল।'

'আমরা এটাও দেখতে পাবো যে সেন্ট অগাস্টিনই এ-পর্যন্ত আমাদের দেখা প্রথম দার্শনিক যিনি ইতিহাসকে দর্শনের ভেতর টেনে এনেছেন। ভালো-মন্দের দ্বন্দ্বের বিষয়টি কোনো অর্থেই নতুন কিছু নয়। নতুন যেটা সেটি হচ্ছে অগাস্টিনের বিবেচনায় দ্বন্দ্বটা বা লড়াইটা হয়েছে ইতিহাসের ভেতর। সেন্ট অগাস্টিনের কাজের এই ক্ষেত্রে প্লেটো খুব একটা নেই। ওল্ড টেস্টামেন্টে আমরা ইতিহাসের যে সরলরৈখিক দৃষ্টিভঙ্গির দেখা পাই তিনি বরং সেটি দিয়েই প্রভাবিত ছিলেন বেশি এই ধারণা দিয়ে ঈশ্বরের রাজ্যের বাস্তবায়ন ঘটাতে ঈশ্বরের দরকার সমস্ত ইতিহাসটাই। মানুষের আলোকপ্রাপ্তি আর মন্দের বিনাশের জন্যই ইতিহাস প্রয়োজন। অথবা সেন্ট অগাস্টিনের ভাষায় 'স্বর্গীয় অন্তর্দৃষ্টি মানুষের ইতিহাসকে অ্যাডাম থেকে সময়ের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত এমনভাবে নিয়ে গেছে যেন সেটি একজন মানুষেরই গল্প, যে-মানুষটি ধীরে ধীরে শৈশব থেকে বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত পৌঁছোয়।'

নিজের ঘড়ির দিকে তাকাল সোফি। 'দশটা বাজে,' বলল সে। 'শিগ্‌গিরই যেতে হবে আমাকে।'

'কিন্তু তার আগে তোমাকে মধ্যযুগের অন্য যে মহান দার্শনিক রয়েছেন তাঁর কথা বলতে হবে। আমরা বাইরে গিয়ে বসি, কি বলো?'

উঠে দাঁড়ালেন অ্যালবার্টো। দুই হাতের তালু এক করে আইল ধরে হাঁটতে শুরু করলেন তিনি। তাঁকে দেখে মনে হচ্ছে যেন তিনি প্রার্থনা করছেন বা কোনো আধ্যাত্মিক সত্য সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করছেন। তাঁকে অনুসরণ করল সোফি; তার মনে হলো এ-ছাড়া তার আর কিছুই করার নেই।

সকালবেলার মেঘ ভেদ করে সূর্য এখনো বেরিয়ে আসেনি। গির্জার বাইরে একটা বেঞ্চিতে গিয়ে বসলেন অ্যালবার্টো। সোফি ভাবল এখন কেউ এলে সে কী না জানি ভাববে। এমনিতেই সকাল দশটার সময় গির্জার বেঞ্চির ওপর বসে থাকা-ই অস্বাভাবিক, তার ওপর যদি এক মধ্যযুগীয় সন্ন্যাসী পাশে থাকে তাহলে তো কথাই নেই।

'আটটা বাজে,' শুরু করলেন অ্যালবার্টো। 'সেন্ট অগাস্টিনের পর কেটে গেছে প্রায় চারশো বছর, প্রচলন হয়েছে স্কুলগুলোর। এখন থেকে দশটা পর্যন্ত কনভেন্ট স্কুলগুলোরই একচেটিয়া আধিপত্য চলতে থাকবে। দশটা থেকে এগারটার মধ্যে প্রথম ক্যাথিড্রাল স্কুলগুলো স্থাপিত হবে, তারপর দুপুরবেলা থেকে আসবে প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়গুলো। এই সময়েই তৈরি হবে বিশাল বিশাল গথিক ক্যাথিড্রালগুলো। এই গির্জাটাও ১২০০ খ্রিস্টাব্দের দিকে তৈরি, এই সময়টাকেই বলে হাই গথিক যুগ। এই শহরের পক্ষে এরচেয়ে বড় ক্যাথিড্রাল তৈরি করা সম্ভব হয়নি।

'তার দরকারও পড়েনি,' সোফি বলল। 'ফাঁকা গির্জা আমার একদম পছন্দ নয়।'

'তবে বড় বড় ক্যাথিড্রাল কিন্তু শুধু বড় বড় জমায়েতের জন্যই তৈরি হয় না। ঈশ্বরের মহিমা প্রকাশের জন্যও তৈরি করা হয়। আর তাছাড়া খোদ এই গির্জাগুলোই এক ধরনের ধর্মীয় প্রসিদ্ধির পরিচায়ক। সে যাই হোক, এই সময়টাতেই আরও একটা ঘটনা ঘটে, আমাদের মতো দার্শনিকদের কাছে যার একটি বিশেষ গুরুত্ব আছে।'

অ্যালবার্টো বলে চলেছেন 'স্পেনের আরবদের প্রভাব এই সময়টাতেই অনুভূত হতে শুরু করে। গোটা মধ্যযুগ জুড়ে আরবরা অ্যারিস্টটলীয় ঐতিহ্যকে ধরে রেখেছিল এবং দ্বাদশ শতকের শেষ দিক থেকে আরব পণ্ডিতরা উত্তর ইতালিতে পা দিতে শুরু করেন অভিজাত সম্প্রদায়ের আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে। এভাবেই, অ্যারিস্টটলের অনেক লেখা ব্যাপক পরিচিতি লাভ করে এবং গ্রিক আর আরবি ভাষা থেকে লাতিনে অনূদিত হয়। এভাবেই, নতুন করে আগ্রহের সৃষ্টি হয় প্রকৃতিবিজ্ঞান সম্পর্কে আর খ্রিস্টীয় প্রত্যাদেশের সঙ্গে গ্রিক দর্শনের সম্পর্ক নিয়ে যে-বিতর্ক চলছিল তাতেও নতুন করে প্রাণের সঞ্চার ঘটে। বিজ্ঞান সম্পর্কিত বিষয়ে অবশ্য অ্যারিস্টটলকে উপেক্ষা করার কোনো উপায় ছিল না, কিন্তু কথা হচ্ছে লোকে কখন দার্শনিক অ্যারিস্টটলের কথা শুনবে আর কখনই বা অনুসরণ করবে বাইবেলকে? বুঝতে পারছো তো?'

মাথা ঝাঁকাল সোফি; সন্ন্যাসী বলে চললেন

'এই সময়ের সবচেয়ে মহান আর গুরুত্বপূর্ণ দার্শনিক হলেন সেন্ট *টমাস অ্যাকুইনাস*, (St. Thomas Aquinas), জন্ম তাঁর ১২২৫-এ মৃত্যু ১২৭৪-এ। রোম আর নেপলসের মাঝখানে ছোট শহর অ্যাকুইনোর লোক তিনি, তবে প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়েও শিক্ষকতা করেছেন। আমি তাঁকে দার্শনিক বলছি ঠিকই, কিন্তু তিনি

আসলে ছিলেন ঈশ্বরতাত্ত্বিক। সে-সময়ে দর্শন আর ঈশ্বরতত্ত্বর মধ্যে সে-রকম বড় কোনো ফারাক ছিল না। সংক্ষেপে আমরা বলতে পারি, অ্যারিস্টটলের ওপর অ্যাকুইনাস ঠিক সেভাবেই খ্রিস্টত্ব আরোপ করেছিলেন সেন্ট অগাস্টিন মধ্যযুগের প্রথমদিকে যেভাবে করেছিলেন প্লেটোর ওপর।'

'ব্যাপারটা একটু খাপছাড়া হয়ে গেল না কি, যে-সব দার্শনিক যিশুর কয়েক শ'বছর আগে জন্মগ্রহণ করেছিলেন তাঁদের ওপর খ্রিস্টত্ব আরোপ করা?'

'সেটি অবশ্য তুমি বলতে পারো। তবে এই দুই মহান গ্রিক দার্শনিকের ওপর 'খ্রিস্টত্ব' আরোপ করার অর্থ তাঁদের বক্তব্যকে কেবল এমনভাবে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা যাতে তা খ্রিস্টীয় মতবাদের পক্ষে হুমকিস্বরূপ হয়ে দেখা না দেয়। অ্যারিস্টটলের দর্শনকে যাঁরা খ্রিস্টধর্মের সঙ্গে মানিয়ে নেবার চেষ্টা করেছিলেন অ্যাকুইনাস তাঁদের অন্যতম। আমরা বলি, তিনি বিশ্বাস আর জ্ঞানের মধ্যে এক অসাধারণ সমন্বয় সাধন করেছিলেন। কাজটা তিনি করেছিলেন অ্যারিস্টটলের দর্শনের মধ্যে প্রবেশ করে আর তাঁর কথায় অক্ষরে অক্ষরে বিশ্বাস স্থাপন করে।'

'কিছু মনে করবেন না, গতরাতে আমি প্রায় ঘুমোইনি বললেই চলে, আমার মনে হয় ব্যাপারটা আরও পরিষ্কার করে বলতে হবে আপনাকে।'

'অ্যাকুইনাস বিশ্বাস করতেন দর্শন বা প্রজ্ঞা আমাদেরকে যা শিক্ষা দেয় আর খ্রিস্টীয় প্রত্যাদেশ বা বিশ্বাস যা বলে তার মধ্যে কোনো বিরোধ থাকার কথা নয়। খ্রিস্টধর্ম আর প্রজ্ঞা প্রায় একই কথা বলে। কাজেই আমরা আমাদের প্রজ্ঞা ব্যবহার করে প্রায়ই এমন সব সত্যে উপনীত হই বাইবেলে ঠিক যা লেখা আছে।'

'কীভাবে? আমাদেরকে প্রজ্ঞা কি এ-কথা বলে যে ঈশ্বর ছ'দিনে এই জগৎ সৃষ্টি করেছিলেন, বা যীশু ছিলেন ঈশ্বর-পুত্র?'

'না, বিশ্বাসযোগ্য এ-সব তথাকথিত সত্যকথা কেবল বিশ্বাস আর খ্রিস্টীয় প্রত্যাদেশের মাধ্যমেই উপলব্ধি করা সম্ভব। কিন্তু অ্যাকুইনাস বেশ কিছু 'প্রাকৃতিক ঈশ্বরতাত্ত্বিক সত্য' কথায় বিশ্বাস করতেন। এর মাধ্যমে তিনি এমন কিছু সত্যকে বোঝাতেন যা পাওয়া যায় খ্রিস্টীয় বিশ্বাস *আর* আমাদের সহজাত বা প্রাকৃতিক প্রজ্ঞা এই *দুইয়ের* মাধ্যমে। যেমন ধরো, এই সত্যটি যে ঈশ্বর আছেন। অ্যাকুইনাস বিশ্বাস করতেন ঈশ্বরকে পাওয়ার দুটো পথ আছে। একটা পথ গেছে বিশ্বাস আর খ্রিস্টীয় প্রত্যাদেশের ভেতর দিয়ে, অন্যটি প্রজ্ঞা আর ইন্দ্রিয়গুলোর মধ্য দিয়ে। এই দুইয়ের মধ্যে বিশ্বাস আর প্রত্যাদেশের পথই নিঃসন্দেহে সবচেয়ে সঠিক, কারণ স্রেফ প্রজ্ঞার ওপর ভরসা করলে খুব সহজেই পথ ভুল করার সম্ভাবনা থাকে। তবে অ্যাকুইনাসের বক্তব্য হচ্ছে অ্যারিস্টটলের মতো একজন দার্শনিক আর খ্রিস্টীয় মতবাদের মধ্যে বিরোধের কোনো অবকাশ নেই।'

'অর্থাৎ আমরা হয় অ্যারিস্টটলের ওপর বিশ্বাস রাখতে পারি, নয়ত বাইবেলের ওপর।'

'মোটেই তা নয়। অ্যারিস্টটল কেবল খানিকটা পথ গিয়েছেন, কারণ খ্রিস্টীয় প্রত্যাদেশের কথা তাঁর জানা ছিল না। কিন্তু পথের কেবল খানিকটা যাওয়া আর ভুল পথে যাওয়া এক কথা নয়। যেমন ধরো, এথেন্স ইউরোপে অবস্থিত বললে ভুল বলা

হয় না। কিন্তু তাই বলে একেবারে ঠিক বলাও হয় না। কোনো বইতে যদি শুধু এ-কথা লেখা থাকে যে এথেন্স ইউরোপে অবস্থিত তাহলে সেই সঙ্গে ভূগোলের একটা বই দেখে নেয়াটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে। সেখানেই তুমি সম্পূর্ণ সত্যটা পাবে যে এথেন্স দক্ষিণ-পশ্চিম ইউরোপের একটি ছোট্ট দেশ গ্রিসের রাজধানী। ভাগ্য ভালো হলে সেখানে অ্যাক্রোপলিস সম্পর্কেও দু'একটা কথা লেখা থাকতে পারে। থাকতে পারে সক্রেটিস, প্লেটো আর অ্যারিস্টটলের কথাও।'

'কিন্তু এথেন্স সম্পর্কে প্রথমে যে-কথাটা বলা হয়েছিল সেটিতো সত্যি।'

'অবশ্যই! অ্যাকুইনাস প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন যে সত্য রয়েছে মাত্র একটি। কাজেই অ্যারিস্টটল যখন আমাদেরকে এমন কিছু দেখান যাকে আমাদের প্রজ্ঞা সত্য বলে ঘোষণা করে তখন তার সঙ্গে খ্রিস্টীয় শিক্ষার কোনো বিরোধ থাকে না। প্রজ্ঞার সাহায্যে আর আমাদের ইন্দ্রিয়গুলোর দেয়া প্রমাণের ওপর নির্ভর করে আমরা সত্যের একটি দিকের কাছে সাফল্যের সঙ্গেই পৌঁছতে পারি। উদাহরণ হিসেবে সেই ধরনের সত্যের কথা বলা যায় যে-সব সত্যের কথা অ্যারিস্টটল উল্লেখ করেছিলেন উদ্ভিদ আর প্রাণী-রাজ্যের কথা বলতে গিয়ে। সত্যের আরেকটা দিক আমাদের কাছে উন্মোচিত করেন ঈশ্বর, বাইবেলের মাধ্যমে। তবে কিছু গুরুত্বপূর্ণ জায়গাতে সত্যের এই দুটো দিক একে অন্যের ওপর এসে পড়ে। বেশকিছু প্রশ্ন বা প্রসঙ্গ রয়েছে যে-ব্যাপারে বাইবেল আর প্রজ্ঞা ঠিক একই কথা বলে।'

'যেমন ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রশ্ন?'

'একদম ঠিক বলেছ! অ্যারিস্টটলের দর্শনও একজন ঈশ্বরের অস্তিত্ব বা একটা আকারগত কারণ (formal cause)-এর অস্তিত্বের কথা অনুমান করেছিল, যে-কারণ সমস্ত প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া বা ঘটনার সূত্রপাত ঘটায়। কিন্তু তিনি ঈশ্বরের বর্ণনা প্রসঙ্গে এরচেয়ে বেশি কিছু বলেননি। এ-ব্যাপারে আমাদেরকে বাইবেল আর যিশুর শিক্ষার ওপরই নির্ভর করতে হবে পুরোপুরি।'

'ঈশ্বরের অস্তিত্ব কি এতোটাই নিশ্চিত?'

'সেটি নিয়ে বিতর্ক হতেই পারে। কিন্তু এমনকি আমাদের যুগেও মেলা লোক এই ব্যাপারে একমত হবেন যে মানুষের প্রজ্ঞা ঈশ্বরের অস্তিত্ব খারিজ করে দেবার হিকমত একেবারেই রাখে না। অ্যাকুইনাস তো আরও খানিকটা এগিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন অ্যারিস্টটলের দর্শনের সাহায্য নিয়েই তিনি ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করে দিতে পারেন।'

'নট ব্যাড!'

'তিনি বিশ্বাস করতেন, আমাদের প্রজ্ঞার সাহায্যে আমরা এ-কথা উপলব্ধি করতে সক্ষম যে আমাদের চারপাশের সমস্ত কিছুর একটি 'আকারগত কারণ' রয়েছে। বাইবেল আর প্রজ্ঞা, এই দুটোর মাধ্যমেই ঈশ্বর নিজেকে মানবজাতির কাছে প্রকাশ করেছেন। কাজেই 'বিশ্বাসের ঈশ্বরতত্ত্ব' আর 'প্রাকৃতিক ঈশ্বরতত্ত্ব' এই দুটোরই অস্তিত্ব রয়েছে। নৈতিক ক্ষেত্রেও নিশ্চয়ই একই কথা প্রযোজ্য। বাইবেল আমাদেরকে শিক্ষা দেয় আমরা কীভাবে জীবনযাপন করবো বলে ঈশ্বর চান সে-বিষয়ে। কিন্তু ঈশ্বর আমাদেরকে একটি বিবেকও দিয়েছেন যার সাহায্যে আমরা 'প্রাকৃতিক' ভিত্তিতে ন্যায়

ও অন্যায়, ভালো ও মন্দের মধ্যে পার্থক্য বিচার করতে পারি। কাজেই দেখা যাচ্ছে নৈতিক জীবনেরও 'দুটো পথ' রয়েছে। 'অন্যের সঙ্গে ঠিক সে-রকম ব্যবহার কর যে-রকম ব্যবহার তুমি অন্যের কাছে আশা কর,' বাইবেলের এই কথা যদি আমাদের পড়া না-ও থাকে, তারপরেও আমরা জানি যে লোকের অনিষ্ট করা ঠিক নয়। এই ক্ষেত্রেও বাইবেলের অনুজ্ঞা পালন করাই শ্রেষ্ঠ পথ।'

'আমার মনে হচ্ছে আমি বুঝতে পারছি,' এবার বলল সোফি। 'ব্যাপারটা অনেকটা বজ্র-বিদ্যুৎ সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানের মতো যা কিনা বিদ্যুচ্চমক দেখা আর বজ্রের শব্দ শোনার মিলিত ফল।'

'ঠিক বলেছো! অন্ধ হলেও লোকে বজ্রের শব্দ শুনতে পায়, কালা হলেও বিদ্যুচ্চমক দেখতে পায়। দেখা আর শোনা এই দুটো হলেই যে সবচেয়ে ভালো হয় সে-কথা অবশ্য বলাই বাহুল্য। তবে আমরা যা দেখি আর যা শুনি তার মধ্যে কোনো *বিরোধ* নেই। বরং একটা আরেকটাকে আরও পোক্ত করে।'

'বুঝেছি।'

'আরেকটা উদাহরণ দিচ্ছি। ধরো যদি কোনো উপন্যাস পড়ো, এই যেমন জন স্টেইনবেকের *অভ্ মাইস অ্যান্ড মেন*...'

'আমি কিন্তু সত্যিই পড়েছি ওটা।'

'তো, তোমার কি মনে হয় না স্রেফ বইটা পড়েই তুমি লেখক সম্পর্কে খানিকটা জানতে পেরেছো?'

'আমি বুঝতে পারছি কেউ একজন নিশ্চয়ই লিখেছেন ওটা।'

'শুধু কি এইটুকু জানতে পেরেছো তুমি তাঁর সম্পর্কে?'

'মনে হয় আউটসাইডারদের প্রতি তাঁর একটা সহানুভূতি আছে।'

'বইটা পড়ার সময়—যে-বইটা স্টেইনবেক লিখেছেন—তুমি স্টেইনবেকের চরিত্র সম্পর্কেও খানিকটা জানতে পারো। কিন্তু তাই বলে তুমি লেখক সম্পর্কে ব্যক্তিগত কোনো তথ্য সেখানে আশা করতে পারো না। *অভ্ মাইস অ্যান্ড মেন* পড়ে তুমি কি বলতে পারবে বইটা লেখার সময় লেখকের বয়স কত ছিল? তিনি কোথায় থাকতেন বা তার ছেলেমেয়ে ক'টি ছিল?'

'নিশ্চয়ই না।'

'কিন্তু এ-সব তথ্য তুমি খুব সহজেই পেয়ে যাবে জন স্টেইনবেকের কোনো জীবনীতে। একমাত্র কোনো জীবনী বা আত্মজীবনীতেই তুমি *ব্যক্তি* স্টেইনবেক সম্পর্কে আরও অনেক বেশি কিছু জানতে পারবে।'

'সে-কথা ঠিক।'

'ঈশ্বরের সৃষ্টি আর বাইবেল সম্পর্কেও কথাটা কম-বেশি সত্য। প্রাকৃতিক জগতে স্রেফ খানিকক্ষণ চলাফেরা করেই আমরা একজন ঈশ্বরের অস্তিত্ব টের পাই। খুব সহজেই আমরা বুঝতে পারি যে 'তিনি' ফুল আর জীব-জন্তু ভালোবাসেন, না হলে সেগুলো তিনি তৈরি করতেন না। কিন্তু ব্যক্তি ঈশ্বর সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যাবে কেবল বাইবেলে বা ঈশ্বরের 'আত্মজীবনী'-তে।'

'উদাহরণ দেবার বেলায় আপনার জুড়ি নেই।'

'হুম...'

এই প্রথমবারের মতো অ্যালবার্টো কোনো জবাব না দিয়ে চিন্তায় ডুবে গেলেন।

'এ-সবের সঙ্গে 'হিল্ডার' কি কোনো সম্পর্ক আছে?' সোফি জিজ্ঞেস না করে পারল না।

'হিল্ডা বলে আদৌ কেউ আছে কিনা সেটিই তো জানি না।'

'জানি না। কিন্তু একটা কথা আমরা জানি যে, কেউ একজন হিল্ডা সম্পর্কে নানান সব প্রমাণ আমাদের চারপাশে রেখে যাচ্ছে। পোস্টকার্ড, রেশমি স্কার্ফ, একটা সবুজ ওয়ালেট, একটা মোজা...'

অ্যালবার্টো ওপর-নিচে মাথা ঝাঁকালেন। তারপর বললেন, 'সেই সঙ্গে মনে হচ্ছে হিল্ডার বাবাই সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন কতগুলো সূত্র তিনি আমাদের সামনে হাজির করবেন সে-ব্যাপারে। আপাতত আমরা যেটুকু জানি তা হচ্ছে কেউ একজন আমাদেরকে গাদা গাদা পোস্টকার্ড পাঠাচ্ছে। সে যদি তার নিজের সম্পর্কে লিখে জানাতো তাহলে ভালো হতো খুব। কিন্তু এ-প্রসঙ্গে আমরা পরে ফিরে আসবো।'

'পৌনে এগারোটা বাজে। মধ্যযুগ শেষ হওয়ার আগেই বাড়ি ফিরতে হবে আমাকে।'

'অ্যারিস্টটলের দর্শন যে-সব জায়গায় খ্রিস্টীয় ঈশ্বরতত্ত্বের সঙ্গে মুখোমুখি হয়নি সেগুলোর ব্যাপারে কয়েকটা কথা বলেই শেষ করবো আমি। এ-সবের মধ্যে আছে তাঁর যুক্তিবিদ্যা, তাঁর জ্ঞানতত্ত্ব (theory of knowledge) আর প্রাকৃতিক দর্শন (natural philosophy), গুরুত্বের দিক দিয়ে যেটা নেহাত কম নয়। এই যেমন ধরো, তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে গাছপালা থেকে শুরু করে জীব-জন্তু হয়ে মানুষ পর্যন্ত জীবনের একটা নিচু থেকে উঁচুর দিকে ওঠা স্কেলের কথা বলেছিলেন অ্যারিস্টটল?'

সোফি মাথা ঝাঁকাল।

'অ্যারিস্টটল বিশ্বাস করতেন যে এই স্কেল এমন এক ঈশ্বরের ইঙ্গিত দেয় যিনি এক ধরনের সর্বোচ্চ অস্তিত্ব তৈরি করেছেন। ঘটনা বা বস্তুগুলোর এই পরিকল্পনাকে খ্রিস্টীয় ঈশ্বরতত্ত্বের সঙ্গে খাপ খাওয়ানো কঠিন কিছু নয়। অ্যাকুইনাসের বক্তব্য অনুযায়ী, উদ্ভিদ আর জীব-জন্তু থেকে শুরু করে মানুষ, তারপর মানুষ থেকে দেবদূত আর শেষে দেবদূত থেকে ঈশ্বর পর্যন্ত ক্রমেই ওপরে উঠে যাওয়া একটি অস্তিত্ব রয়েছে। জীব-জন্তুর মতো মানুষেরও দেহ আর সাংবেদনিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসহ অস্তিত্ব রয়েছে। জীব-জন্তুর মতো মানুষেরও দেহ আর সাংবেদনিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আছে, কিন্তু সেই সঙ্গে মানুষের বুদ্ধিমত্তা-ও আছে যা তাকে বিভিন্ন জিনিসের মধ্যে পার্থক্য বিচার করার ক্ষমতা দিয়েছে। দেবদূতদের সাংবেদনিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসহ এ-ধরনের কোনো দেহ নেই, যে-কারণে তাদের রয়েছে স্বতঃস্ফূর্ত, তাৎক্ষণিক বুদ্ধিমত্তা। মানুষের মতো তাদেরকে 'চিন্তা' করতে হয় না; সিদ্ধান্তে পৌঁছাবার জন্য বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখার দরকার হয় না। মানুষ যা জানে তা জানার জন্য তাদেরকে ধাপে ধাপে এগোতে হয়নি। আর দেবতাদের যেহেতু কোনো শরীর নেই, তাদের মৃত্যুও নেই। তারা অবশ্য ঈশ্বরের মতো চিরস্থায়ী বা চিরন্তন নয়, তার কারণ ঈশ্বরই তাদেরকে সৃষ্টি করেছিলেন কোনো একসময়। কিন্তু তাদের এমন কোনো দেহ নেই যা থেকে একসময় তাদেরকে

বিদায় নিতে হবে আর তাই কখনো মৃত্যু হবে না তাদের।'

'চমৎকার তো!'

'কিন্তু, সোফি, দেবদূতদের ওপর কর্তৃত্ব করেন ঈশ্বর। একটি একক সঙ্গতিপূর্ণ দৃষ্টিতে তিনি সমস্ত কিছুই দেখেন এবং জানতে পারেন।'

'তাহলে তো তিনি এখন দেখতে পাচ্ছেন আমাদের।'

'হ্যাঁ, তা হয়ত তিনি পাচ্ছেন। তবে 'এখন' নয়। সময় আমাদের কাছে যেমন ঈশ্বরের কাছে ঠিক তেমন নয়। আমাদের 'এখন' ঈশ্বরের 'এখন' নয়। আমাদের জীবনে বেশ কয়েক হপ্তা কেটে গেলে ঈশ্বরের কাছে যে তা সে-রকমই হবে এমনটি মনে করার কারণ নেই।'

'এ-তো বড্ড অদ্ভুত!' আশ্চর্য হয়ে বলে উঠল সোফি। নিজের মুখের ওপর একটা হাত চলে এলো তার। মাথা নিচু করে তার দিকে তাকালেন অ্যালবার্টো। সোফি বলে চলল, 'কাল আরেকটা কার্ড পেলাম হিল্ডার বাবার কাছ থেকে। তিনি অনেকটা এ-রকম কথাই লিখেছেন—সোফির কাছে এক হপ্তা বা দুই হপ্তা পার হলে আমাদের জীবনেও যে তাই হতে হবে এমন কোনো মানে নেই। কথাটা তো ঈশ্বর সম্পর্কে আপনি যা বললেন ঠিক সে-রকমই।'

সোফি দেখতে পেল বাদামি আলখাল্লার ভেতর অ্যালবার্টোর মুখে একটা চকিত ভ্রূভঙ্গি খেলে গেল।

'তার লজ্জা হওয়া উচিত!'

সোফি ঠিক বুঝতে পারল না অ্যালবার্টো কী বোঝাতে চাইলেন কথাটা দিয়ে। তিনি বলে গেলেন; 'দুর্ভাগ্যক্রমে অ্যাকুইনাস নারী সম্পর্কেও অ্যারিস্টটলেরই মত গ্রহণ করেছিলেন। তোমার হয়ত মনে আছে যে অ্যারিস্টটল মনে করতেন নারী হচ্ছে আসলে কম-বেশি অসম্পূর্ণ পুরুষ। তিনি আরও ভাবতেন সন্তানেরা কেবল বাবার বৈশিষ্ট্যই লাভ করে উত্তরাধিকার সূত্রে, কারণ নারী কেবল নিষ্ক্রিয় আর গ্রহীতা, অন্য দিকে পুরুষ সক্রিয় আর সৃজনশীল। অ্যাকুইনাসের মতে, এই দৃষ্টিভঙ্গি বাইবেলের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ, কারণ বাইবেল বলে, অ্যাডামের পাঁজরের হাড় থেকেই নারীর সৃষ্টি।'

'ননসেন্স'

'একটা মজার ব্যাপার হচ্ছে ১৮২৭ সালের আগ পর্যন্ত স্তন্যপায়ীদের ডিম আবিষ্কৃত হয়নি। কাজেই সম্ভবত এতে আশ্চর্যের কিছু নেই যে লোকে ভাবতো সন্তান জন্মদানের ক্ষেত্রে পুরুষই সৃজনশীল আর প্রাণদায়ী শক্তি। আরেকটা লক্ষণীয় বিষয় হলো, অ্যাকুইনাসের মতে, কেবল প্রাকৃতিক-সত্তা হিসেবেই নারী-পুরুষের চেয়ে হীনতর। নারীর আত্মা আর পুরুষের আত্মা সমান। স্বর্গে কোনো লিঙ্গভেদ নেই, নারী-পুরুষ একই সমান, কারণ সেখানে শারীরিক লিঙ্গ বৈষম্যের কোনো অস্তিত্ব নেই।'

'সেটি খুব একটা স্বস্তিদায়ক কথা নয়। মধ্যযুগে কোনো নারী দার্শনিক ছিলেন না?'

'মধ্যযুগে গির্জাশাসিত জীবনে ছিল পুরুষেরই আধিপত্য। তাই বলে যে কোনো নারী চিন্তাবিদ একেবারেই ছিলেন না তা নয়। তাঁদের মধ্যেই একজন হলেন *বিঙ্গেন-*

এর হিল্ডাগার্ড (Hildegard of Bingen)... ।'

চোখ দুটো বড় বড় হয়ে গেল সোফির।

'তাঁর সঙ্গে কি হিল্ডার কোনো সম্পর্ক আছে?'

'মেয়ের প্রশ্ন শোনো! হিল্ডাগার্ড ছিলেন রাইন উপত্যকার মানুষ, জন্ম ১০৯৮ খ্রিস্টাব্দে, মৃত্যু ১১৭৯-তে। নারী হওয়ার পরেও তিনি ছিলেন ধর্ম প্রচারক, লেখক, চিকিৎসক, উদ্ভিদবিদ আর প্রকৃতিবিদ। নারীরা যে প্রায়ই পুরুষের চেয়ে বেশি বাস্তববাদী, বেশি বিজ্ঞানমনস্ক ছিল, এমনকি সেই মধ্যযুগেও, তারই একটি উদাহরণ তিনি।'

'কিন্তু হিল্ডা?'

'প্রাচীন খ্রিস্টীয় আর ইহুদি একটা বিশ্বাস এই যে ঈশ্বর কেবল পুরুষই নন। তাঁর একটা স্ত্রীসুলভ দিক বা মাতৃ-প্রকৃতিও (mother nature) রয়েছে। নারীদেরও ঈশ্বরের অনুরূপ করে তৈরি করা হয়েছে। গ্রিক ভাষায় ঈশ্বরের এই নারীসুলভ দিকটিকে বলা হয় সোফিয়া (Sophia)। সোফিয়া বা 'সোফি' (Sophie) শব্দের অর্থ বিজ্ঞতা।'

হালছাড়া ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল সোফি। কথাটা কেউ তাকে কখনো বলেনি কেন? তাছাড়া, সে নিজেই বা জিজ্ঞেস করেনি কেন?

অ্যালবার্টো বলে চললেন পুরো মধ্যযুগ জুড়েই ইহুদি এবং গ্রিক অর্থোডক্স চার্চের কাছে সোফিয়া বা ঈশ্বরের মাতৃ-প্রকৃতির একটি বিশেষ গুরুত্ব ছিল। পশ্চিমে তার কথা ভুলে গিয়েছিল সবাই। কিন্তু এরপরই এলেন হিল্ডাগার্ড। মহামূল্যবান অলঙ্কার খচিত সোনালি বস্ত্র পরে সোফিয়া হাজির হলেন হিল্ডাগার্ডের স্বপ্নে... ।'

উঠে দাঁড়াল সোফি। হিল্ডাগার্ডের স্বপ্নে দেখা দিয়েছিলেন সোফিয়া. ।

'হয়ত আমি একদিন দেখা দেবো হিল্ডার স্বপ্নে।'

ফের বসে পড়ল সে। এই তৃতীয়বারের মতো তার কাঁধে হাত রাখলেন অ্যালবার্টো।

'ব্যাপারটা আমরা একসময় অবশ্যই ভেবে দেখবো। কিন্তু এখন একটি নতুন যুগে প্রবেশ করছি। রেনেসাঁ সম্পর্কে আলাপ করাবার জন্য তোমাকে খবর পাঠাবো আমি। হার্মেস তোমার বাগানে যাবে।'

এই বলে উঠে দাঁড়ালেন অদ্ভুত সন্ন্যাসীটি, তারপরে হাঁটতে শুরু করলেন গির্জার দিকে। যেখানে ছিল সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল সোফি, ভাবছে হিল্ডাগার্ড আর সোফিয়া, হিল্ডা আর সোফির কথা। হঠাৎ করেই সে লাফ দিয়ে উঠে সন্ন্যাসীর আলখাল্লাপরা দার্শনিকের দিকে ছুটে গেল এই প্রশ্নটা করতে করতে

'মধ্যযুগে কি অ্যালবার্টো নামেও কেউ ছিলেন?'

অ্যালবার্টো তাঁর হাঁটার গতি ধীর করলেন খানিকটা, ধীরে ধীরে ঘাড় ফেরালেন, তারপর বললেন, 'অ্যাকুইনাসের একজন বিখ্যাত দর্শন শিক্ষক ছিলেন অ্যালবার্ট দ্য গ্রেট নামে...'

এই কথা বলে তিনি মাথা ঝাঁকালেন একবার, তারপর সেন্ট মেরির গির্জার দরজা দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

উত্তরটা খুশি করতে পারল না সোফিকে। সে তাঁর পিছু পিছু গির্জায় গিয়ে ঢুকল।

কিন্তু এখন সেটি একদম নির্জন। উনি কি মেঝে ফুঁড়ে ঢুকে গেলেন নাকি?

গির্জা ছেড়ে বেরিয়ে আসার মুহূর্তে ম্যাডোনার একটি ছবি নজরে পড়ল তার। সেটির কাছে গিয়ে দাঁড়াল সে, তারপর ভালো করে তাকাল সেটির দিকে। হঠাৎ সে ম্যাডোনার এক চোখের নিচে এক ফোঁটা পানি আবিষ্কার করল। অশ্রু বিন্দু?

দৌড়ে গির্জার বাইরে বেরিয়ে এলো সে, তারপর ছুটল জোয়ানার বাসার দিকে।

রে নে সাঁ

ছয়ে

...মানুষের ছদ্মবেশ নিয়ে থাকা হে স্বর্গীয় বংশ...

দৌড়ে আসার কারণে হাঁপাতে হাঁপাতে সোফি যখন জোয়ানাদের বাসার সদর দরজার সামনে পৌঁছল তখন ঠিক বারোটা বাজে। জোয়ানা তাদের হলুদ বাড়িটার সামনের আঙিনায় দাঁড়িয়ে।

'পাঁচ ঘণ্টা হলো বেরিয়েছিস তুই!' তীক্ষ্ণ স্বরে বলে উঠল জোয়ানা।

মাথা নাড়ল সোফি।

'না, আমি গিয়েছি এক হাজার বছর হয়েছে।'

'কোথায় গিয়েছিলি তুই বল তো! তোর আসলে মাথা খারাপ। আধ ঘণ্টা আগে তোর মা ফোন করেছিলেন।'

'তুই কী বলেছিস তাঁকে?'

'আমি বলেছি তুই ওষুধের দোকানে গিয়েছিস। তুই ফিরলে ফোন করতে বলেছেন। কিন্তু আজ সকাল দশটায় গরম চকলেট আর রোল নিয়ে মা আর বাবা যখন আমার ঘরে এসেছিলেন তখন তুই যদি দেখতি তাঁদের...খাঁ খাঁ করছিল তোর বিছানাটা।'

'তাঁদেরকে কী বললি তুই?'

'একেবারে অস্বস্তিতে পড়ে গিয়েছিলাম। শেষে বললাম আমাদের মধ্যে ভীষণ ঝগড়া হওয়াতে বাড়ি চলে গেছিস তুই।'

'কাজেই তাড়াতাড়ি আমাদের বন্ধু বনে যেতে হবে আবার। তাছাড়া আরেকটা ব্যাপার দেখতে হবে যে সামনের কয়েকটা দিন যেন আমার মায়ের সঙ্গে ওঁদের কোনো আলাপ হতে না পারে। ব্যবস্থাটা করা যাবে না? তুই কি বলিস?'

জোয়ানা শ্রাগ করল। ঠিক তখনই একটা হুইলব্যারো ঠেলতে ঠেলতে এক কোনায় উদয় হলেন তার বাবা। তাঁর পরনে দুটো কাভারঅল, গত বছরের গাছের পাতা আর ডালপালা পরিষ্কার করায় ব্যস্ত তিনি।

'আচ্ছা, তোমাদের মধ্যে আবার ভাব হয়ে গিয়েছে দেখছি। সে যাই হোক, বেসমেন্টের সিঁড়িতে এখন একটা পাতাও দেখতে পাবে না তোমরা।'

'চমৎকার,' সোফি বলে উঠল। 'তাহলে বিছানার বদলে ওখানেই গরম চকলেট খাওয়া যাবে'খন।'

জোর করে একটা হাসি হাসলেন জোয়ানার বাবা, কিন্তু জোয়ানা ঢোক গিলল। কথা চালাচালিটা অর্থনৈতিক উপদেষ্টা জনাব ইঙ্গারব্রিগস্টেন আর তাঁর স্ত্রীর অনেক বেশি সচ্ছল পরিবারের চাইতে সোফিদের পরিবারেই বেশি প্রচলিত।

'দুঃখিত, জোয়ানা, কিন্তু আমি মনে করলাম এই লুকোছাপার খেলায় আমারও খানিকটা অংশ নেয়া দরকার।'

'তুই আমাকে বলবি না ঘটনাটা?'

'অবশ্যই, যদি তুই আমার সঙ্গে হেঁটে বাড়ি যাস। কারণ এগুলো অর্থনৈতিক উপদেষ্টা বা বেঢপ সাইজের বার্বি ডলদের জন্য নয়।'

'কথার কী ছিরি! তোর বোধকরি ধারণা যে যে-ঝোড়ো বিয়ের কারণে একজন আরেকজনকে ফেলে সমুদ্রে চলে যায় সেটি এরচেয়ে ভালো কিছু।'

'তা হয়ত নয়। তবে গত রাতে আমি প্রায় ঘুমোইনি বললেই চলে। আরেকটা কথা, আমার কেন যেন মনে হতে শুরু করেছে আমরা যা-ই করছি হিল্ডা তার সবই *দেখতে পাচ্ছে*।'

ক্লোভার ক্লোজের দিকে হাঁটতে শুরু করল দুজনে।

'তার মানে তুই বলতে চাচ্ছিস ওর সেকেন্ড সাইট আছে?'

'হয়ত। হয়ত না।'

স্পষ্টতই, জোয়ানা এ-সব ঢাক ঢাক গুড় গুড়ের ব্যাপারে অতটা উৎসাহ বোধ করছিল না।

'কিন্তু তাতে করে তো এ-ব্যাপারটা পরিষ্কার হচ্ছে না যে তার বাবা কেন বনের ভেতরের একটা খালি কেবিনে একগাদা মাথামুণ্ডহীন পোস্টকার্ড পাঠিয়েছিলেন।'

'স্বীকার করছি এটা একটা দুর্বল জায়গা।'

'তুই কি বলবি তুই কোথায় ছিলি?'

অতএব সোফি বলে ফেলল। সবকিছু বলল সে। রহস্যময় দর্শন কোর্সটার কথাও। জোয়ানাকে দিয়ে সে শপথ করিয়ে নিল সবকিছু গোপন রাখবে সে।

অনেক হাঁটল তারা কোনো কথা না বলে। ক্লোভার ক্লোজের কাছাকাছি এসে জোয়ানা বলে উঠল, 'ব্যাপারটা পছন্দ হচ্ছে না আমার।'

সোফিদের গেটের সামনে এসে থামল সে, তারপর ঘুরে দাঁড়াল বাড়ি ফিরে যাওয়ার জন্য।

'কেউই তোকে এটা পছন্দ করতে বলছে না। কিন্তু দর্শন নেহাতই নির্দোষ কোনো পার্টি গেম না। আমরা কে, কোথা থেকে এসেছি, এ-সব নিয়েই দর্শন। তোর কি ধারণা স্কুলে এ-সব কথা আমারে ঢের শেখানো হয়?'

'যাই বলিস, এ-সব প্রশ্নের উত্তর কেউ-ই দিতে পারে না।'

'তা ঠিক, কিন্তু আমরা তো সে-সব জিজ্ঞেস *করতেও* শিখি না।'

সোফি যখন রান্নাঘরে ঢুকল তখন টেবিলের ওপর লাঞ্চ সাজানো হয়ে গেছে। জোয়ানাদের বাসা থেকে ফোন না করার জন্য তাকে কোনো জবাবদিহি করতে বলা হলো না।

লাঞ্চের পর সোফি ঘোষণা করল সে একটু ঘুমোতে যাচ্ছে। সে স্বীকার করল

জোয়ানার বাড়িতে সে ঘুমোয়নি বললেই চলে; সেটি অবশ্য বাড়ির বাইরে এ-রকম ঘুমানোর সময় অস্বাভাবিক কিছুও নয়।

বিছানায় যাওয়ার আগে সে তার ঘরের দেয়ালে ঝুলে থাকা পেতলের বিশাল আয়নাটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। প্রথমে সে তার নিজের সাদা বিধ্বস্ত মুখটা দেখতে পেল। কিন্তু তারপর তার নিজের মুখটার পেছনে আরেকটা মুখের খুবই আবছা একটা আভাস ফুটে উঠল বলে যেন মনে হলো তার। দুয়েকটা গভীর শ্বাস নিল সোফি। কাল্পনিক জিনিস দেখাটা কোনো কাজের কাজ নয়।

নিজের পাণ্ডুর মুখটার তীক্ষ্ণ দেহরেখাগুলো খুঁটিয়ে দেখল সে, মুখটাকে ঘিরে আছে তার বেখাপ্পা চুল, যে-চুল প্রকৃতির একান্তই নিজস্ব স্টাইল ছাড়া অন্য কোনো স্টাইলের আওতায় পড়ে না। কিন্তু সেই মুখটার পেছনে আরেকটি মেয়ের অপছায়া দেখা দিয়েছে। হঠাৎ করেই সেই অন্য মেয়েটি দুই চোখ দিয়েই চোখ টিপতে লাগল উন্মত্তের মতো, যেন সে বোঝাতে চাইছে সত্যি-ই সে আছে আয়নার ভেতরের ওই দিকটায়। কয়েক সেকেন্ড মাত্র দেখা গেল অপছায়াটিকে। তারপরই নেই হয়ে গেল সেটি।

বিছানার প্রান্তে বসে পড়ল সোফি। তার মনে কোনো সন্দেহই নেই যে আয়নায় সে হিল্ডাকেই দেখেছে। মেজরের কেবিনে একটা স্কুলের পরিচয়পত্রে মেয়েটির ছবি দেখেছিল সে মুহূর্তের জন্যে।

ব্যাপারটা কি অদ্ভুত নয় যে যখনই সে ভীষণ ক্লান্ত থাকে তখনই এ-ধরনের রহস্যময় সব অভিজ্ঞতা হচ্ছে তার? আর তার ফলে পরে নিজেকেই তার জিজ্ঞেস করতে হয় ব্যাপারটা সত্যি সত্যিই ঘটেছিল কিনা।

সোফি তার কাপড়-চোপড় চেয়ারের ওপর রেখে হামাগুড়ি দিয়ে উঠে পড়ল বিছানায়। সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়ল সে, দেখল ছবির মতো স্পষ্ট অদ্ভুত এক স্বপ্ন।

দেখল বিশাল একটা বাগানের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে সে, বাগানটা ঢালু হয়ে নেমে গেছে লাল একটা বোট হাউসের দিকে। সেটির পেছনের ডকে সোনালি চুলের কমবয়সী একটা মেয়ে বসে আছে পানির দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে। সোফি সেদিকে হেঁটে গিয়ে মেয়েটির পাশে বসে পড়ল। কিন্তু মনে হলো মেয়েটা তাকে খেয়ালই করল না। নিজের পরিচয় দিল সে, 'আমি সোফি।' কিন্তু মনে হলো মেয়েটি তাকে দেখছেও না, তার কথা শুনতেও পাচ্ছে না। হঠাৎ সোফি শুনল কে যেন ডেকে উঠল, 'হিল্ডা!' সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটি যেখানে বসে ছিল সেখান থেকে লাফিয়ে উঠল, তারপর একছুটে চলে গেল বাড়িটার দিকে। আর যাই হোক মেয়েটি বধির বা অন্ধ নয়। মধ্যবয়স্ক একজন লোক বড় বড় পা ফেলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলেন মেয়েটির দিকে। লোকটির পরনে খাকি ইউনিফর্ম আর একটা নীল বেরে। মেয়েটি দু'হাত বাড়িয়ে তার গলা জড়িয়ে ধরল আর লোকটি তাকে ধরে নিজের চারদিকে বার কয়েক পাক খাওয়ালেন। মেয়েটি যেখানে বসেছিল সেখানে ডকের ওপর একটা হার পড়ে আছে, তাতে ছোট, সোনার একটা ক্রুশবিদ্ধ যিশুমূর্তি লাগানো রয়েছে। সেটি তুলে নিল সোফি, ধরে রাখল হাতে, তারপরেই ঘুম ভেঙে গেল তার। ঘড়ির দিকে তাকাল সোফি, দুই ঘণ্টা ঘুমিয়েছে সে। বিছানায় উঠে বসল সে, ভাবছে অদ্ভুত স্বপ্নটার কথা। এতোই বাস্তব মনে হচ্ছিল স্বপ্নটা যেন সত্যি সত্যিই অভিজ্ঞতাটা হয়েছে তার। এ-

ব্যাপারেও তার মনে কোনো সন্দেহ রইল না যে সেই বাড়ি আর ডকটা বাস্তবে কোথাও না কোথাও নিশ্চয়ই আছে। মেজরের কেবিনে সে যে-ছবিটা দেয়ালে ঝুলতে দেখেছিল সেটির সঙ্গে মিল রয়েছে না দৃশ্যটার? সে যাই হোক, এ-ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই যে স্বপ্নের মেয়েটিই হিল্ডা মোলার ন্যাগ আর পুরুষটি তার বাবা, বাড়ি ফিরে এসেছেন তিনি লেবানন থেকে। স্বপ্নের মধ্যে তাঁকে দেখতে অ্যালবার্টো নক্সের মতো লেগেছিল খানিকটা...।

খাট থেকে নেমে সে যখন বিছানা গোছাচ্ছে, তার বালিশের নিচে একটা হারের সঙ্গে সোনার একটা ক্রুশবিদ্ধ যিশুমূর্তি পেল সে। সেটির পেছনে তিনটি অক্ষর খোদাই করা এইচএমকে।

ধন-রত্ন পাওয়ার স্বপ্ন এবারই যে সোফি প্রথম দেখল তা নয়। কিন্তু এবারই প্রথম সে তা স্বপ্ন থেকে বাস্তবে নিয়ে এলো।

'যত্তোসব!' চিৎকার করে বলে উঠল সে।

এমনই মেজাজ খারাপ হলো তার যে ক্লজেটের দরজাটা খুলে চমৎকার ক্রুশবিদ্ধ যিশুমূর্তিটাকে সে রেশমি স্কার্ফ, সাদা মোজা আর লেবানন থেকে আসা পোস্টকার্ডগুলোর সঙ্গে সবচেয়ে ওপরের তাকটায় ছুঁড়ে ফেলল।

পরদিন সকালে সে ঘুম থেকে উঠে দেখে নাস্তার টেবিলে হট রোল, কমলার রস, ডিম আর ভেজিটেবল স্যালাডের এক এলাহি আয়োজন। রোববার সকালে সোফির মা মেয়ের আগে বড় একটা ঘুম থেকে ওঠেন না। কিন্তু যেদিন ওঠেন সেদিন তিনি সোফির জন্য জম্পেশ একটা ব্রেকফাস্টের আয়োজন করতে পছন্দ করেন।

তারা যখন খাচ্ছে, মা তখন বললেন, 'বাগানে অদ্ভুত একটা কুকুর দেখতে পেলাম। সারা সকাল ধরে পুরনো বেড়ার কাছটায় ঘুর ঘুর করছে। বুঝতে পারছি না কী চায় ওটা ওখানে, তুই কিছু বলতে পারিস?'

'পারিই তো,' খুশিতে ফেটে পড়ল সোফি, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারল বড্ড ভুল হয়ে গেছে।

'এর আগেও ওটা এখানে এসেছিল নাকি?'

এরই মধ্যে সোফি টেবিল ছেড়ে লিভিং রুমে চলে গিয়েছে বিশাল বাগানের সামনের জানালা দিয়ে বাইরেটা দেখার জন্য। ঠিক যা ভেবেছিল।

হার্মেস সোফির গুহায় ঢোকার গোপন প্রবেশপথের সামনেই শুয়ে আছে।

কী বলবে সে? কোনো কিছু সে ভেবে উঠবার আগেই তার মা এসে তার পাশে দাঁড়ালেন।

'এর আগেও ওটা এখানে এসেছিল কিনা বললি না?'

'আমার মনে হয় এখানে কোনো হাড় লুকিয়ে রেখেছিল ওটা, এখন এসেছে ওর গুপ্তধন খুঁড়ে বের করতে। কুকুরেরও স্মৃতিশক্তি থাকে...'

'তোর কথাই হয়ত ঠিক, সোফি। তুই তো আবার এ-বাড়ির পশু মনোবিজ্ঞানী।'

উথাল-পাতাল চিন্তা বয়ে যাচ্ছে সোফির মনে।

'আমি ওটাকে বাড়ি পৌঁছে দিচ্ছি,' সে বলল।

'তুই তাহলে জানিস ওটা কোথায় থাকে?'

সোফি কাঁধ ঝাঁকাল।

'ওটার কলারে ঠিকানা লেখা থাকতে পারে।'

মিনিট কয়েক পরেই দেখা গেল সোফি নেমে যাচ্ছে বাগানের দিকে। তাকে দেখেই হার্মেস লাফাতে লাফাতে আর লেজ নাড়তে নাড়তে ছুটে এলো তার দিকে।

'গুড বয়, হার্মেস!' বলে উঠল সোফি।

সে জানে তার মা জানালা দিয়ে তাকিয়ে আছেন তার দিকে। সোফি মনে মনে প্রার্থনা করল কুকুরটা যেন বেড়ার ভেতর দিয়ে রওনা না দেয়। কিন্তু তার বদলে কুকুরটা বাড়ির সামনের নুড়ি-বিছানো পথের দিকে ছুট দিল, আড়াআড়িভাবে পার হয়ে গেল সামনের আঙিনাটা, তারপর লাফিয়ে উঠল গেট বরাবর।

গেটটা ওরা বন্ধ করে দেবার পর হার্মেস সোফির কয়েক গজ সামনে দৌড়ে চলল। মেলা দূরের পথ। রোববার সকালের ভ্রমণে সোফি আর হার্মেস-ই একা নয়। অনেকেই পুরো পরিবার নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে সারাদিনের জন্য। ঈর্ষার একটা খোঁচা অনুভব করল সোফি।

একটু পরপরই হার্মেস সামনে ছুটে যাচ্ছে, তারপর অন্য কোনো কুকুর বা কোনো বাগানের বেড়ার পাশে আকর্ষণীয় কোনো জিনিসের কাছে গিয়ে গন্ধ শুঁকছে, কিন্তু সোফি 'অ্যাই যে, এখানে!' বলে উঠতেই তার কাছে ফিরে আসছে সঙ্গে সঙ্গে।

পুরনো একটা পশুচারণভূমি, বিরাট একটা খেলার মাঠ পেরিয়ে লোক চলাচল অপেক্ষাকৃত বেশি এমন একটা এলাকায় বেরিয়ে এলো ওরা। খোয়া দিয়ে বাঁধানো আর স্ট্রিটকার চলাচলকারী চওড়া একটা রাস্তা ধরে শহরের কেন্দ্রের দিকে এগিয়ে চলল ওরা। পথ দেখিয়ে টাউন স্কোয়্যার আর চার্চস্ট্রিট পেরিয়ে এলো হার্মেস। একসময় এসে পড়ল পুরনো শহরে, এই শতকের গোড়ার দিককার রাশভারি টাউন হাউসগুলো রয়েছে সেখানে। প্রায় দেড়টা বাজে এখন।

শহরের অন্য প্রান্তে এসে পড়ল ওরা। এদিকটায় খুব বেশি আসা পড়েনি সোফির। তার মনে পড়ল, একবার সে যখন ছোট তখন এখানকার কোনো একটা স্ট্রিটে তার এক বৃদ্ধা আন্টিকে দেখতে নিয়ে আসা হয়েছিল তাকে।

শেষ পর্যন্ত বেশকিছু পুরনো বাড়ির মধ্যখানে ছোট্ট একটা ফাঁকা চত্বরে এসে পৌঁছল তারা। জায়গাটার নাম নিউ স্কোয়্যার, যদিও দেখতে সেটি খুব পুরনো। অবশ্য পুরো শহরটাই তো পুরনো; সেই মধ্যযুগে পত্তন হয়েছিল শহরটার।

১৪ নং বাড়িটার দিকে এগোল হার্মেস, তারপর সেখানে দাঁড়িয়ে পড়ল স্থির হয়ে, অপেক্ষা করল সোফির দরজা খোলার জন্য। সোফির হৃৎপিণ্ডের গতি বেড়ে গেল।

সামনের দরজার ভেতরে একটা প্যানেলের সঙ্গে আটকে রাখা হয়েছে বেশকিছু নীল-রঙা ডাকবাক্স। সামনের সারির ডাকবাক্সগুলোর একটা থেকে একটা পোস্টকার্ড ঝুলে রয়েছে দেখতে পেল সোফি।

সেটির প্রাপক হিল্ডা মোলার ন্যাগ, ১৪ নিউ স্কোয়্যার। ডাকঘরের সিলমোহর দেয়া আছে জুন ১৫। এখনো দুই হপ্তা বাকি সে-তারিখ আসতে। কিন্তু ডাকপিয়ন নিশ্চয়ই তা খেয়াল করেনি।

কার্ডটা টেনে নিয়ে পড়ল সোফি।

প্রিয় হিল্ডা, সোফি এবার দার্শনিকের বাড়িতে আসছে। শিগ্‌গিরই পনেরো পা দেবে মেয়েটি আর তুই তো গতকালই পনেরোয় পড়েছিস। নাকি আজকে পড়বি, হিল্ডা? যদি আজ হয় তাহলে নিশ্চয়ই দেরি হয়ে গেছে আমাদের ঘড়িগুলো সারাক্ষণ একসময় দেয় না। এক প্রজন্ম বুড়িয়ে যায়, ওদিকে অন্য প্রজন্মের আবির্ভাব ঘটে। এর মধ্যে ইতিহাস তার গতিপথ ঠিক করে নেয়। কখনো কি তোর মনে হয়েছে যে ইউরোপের ইতিহাস একজন মানুষের জীবনের মতো? প্রাচীন যুগ হচ্ছে ইউরোপের শৈশব। এরপর এলো অন্তহীন মধ্যযুগ-ইউরোপের স্কুল জীবন। শেষে আসে রেনেসাঁ, শেষ হয় দীর্ঘ স্কুল জীবন। প্রাণ-প্রাচুর্যের বিস্ফোরণ আর একটা জীবন তৃষ্ণার ভেতর দিয়ে সাবালকত্ব প্রাপ্তি ঘটে ইউরোপের। আমরা বলতে পারি, রেনেসাঁ হলো ইউরোপের ১৫শ জন্মদিন! এখন মধ্য জুন, মা আমার আর কথা কী জানিস, বেঁচে থাকাটা বড্ড চমৎকার একটা ব্যাপার!

পুনশ্চ তুই তোর সোনার ক্রুশবিদ্ধ যিশুমূর্তিটা হারিয়ে ফেলেছিস শুনে খারাপ লাগছে। আরেকটু ভালো করে নিজের জিনিসের যত্ন নেয়াটা শিখতে হবে তোকে। ভালোবাসা নিস, বাবা; লোকটা তোর কাছে-পিঠেই আছে।

* * *

হার্মেস এরই মধ্যে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে শুরু করেছে। পোস্টকার্ডটা নিয়ে সোফি তাকে অনুসরণ করল। হার্মেসের সঙ্গে পাল্লা দিতে তাকেও দৌড় দিতে হলো মহানন্দে লেজ নাড়ছে হার্মেস। দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ তলা পেরিয়ে এলো ওরা এরপর বাকি রইল কেবল চিলেকোঠায় যাওয়ার সিঁড়িটা। ওরা কি ছাদে যাচ্ছে নাকি? আছড়ে পাছড়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠে সরু একটা দরজার সামনে এসে থামল হার্মেস। থাবা দিয়ে আঁচড়াতে লাগল সেটির গায়ে।

সোফি শুনতে পেল ভেতর থেকে পায়ের শব্দ এগিয়ে আসছে। দরজা খুলে গেল, দেখা গেল অ্যালবার্টো নক্স দাঁড়িয়ে আছেন সেখানে। তাঁর আগের পোশাক ছেড়ে নতুন পোশাক পরেছেন তিনি। সাদা হোস, লাল নী-ব্রিচেস আর কাঁধের কাছে প্যাড লাগানো একটা হলুদ জ্যাকেট। অ্যালবার্টোকে দেখে তাসের প্যাকেটের জোকারের কথা মনে পড়ে গেল সোফির। তার যদি বিশেষ কোনো ভুল না হয়ে থাকে তাহলে তাঁর পোশাকটা একান্তভাবেই রেনেসাঁ যুগের।

'এ যে দেখছি রীতিমতো এক ক্লাউন!' মন্তব্য করল সোফি। তারপর ঘরের ভেতরে ঢোকার জন্য তাঁর গায়ে ছোট্ট একটা ঠেলা দিল।

আরও একবার সে তার দর্শন শিক্ষক সম্পর্কে ভয় আর লজ্জা জয় করল। নিচে, হলওয়েতে পাওয়া পোস্টকার্ডটার কারণে তার মাথায় ঝড় বয়ে যাচ্ছে।

'শান্ত হও, বৎস,' অ্যালবার্টো বললেন। তারপর বন্ধ করে দিলেন দরজাটা।

'এই যে, চিঠি এসেছে,' বলে পোস্টকার্ডটা সোফি ধরিয়ে দিল তাঁর হাতে, যেন ওটার জন্য সে তাঁকেই দায়ী ভাবছে।

কার্ডটা পড়ে মাথা ঝাঁকালেন অ্যালবার্টো।

'দিনে দিনে ঔদ্ধত্য বেড়েই চলেছে লোকটার। আমাদের দু'জনকে সে তার মেয়ের জন্মদিনের একটা আমোদের বস্তু হিসেবে ভেবে থাকলে অবাক হবো না।'

এই বলে তিনি পোস্টকার্ডটা টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ওয়েস্টপেপার বাস্কেটে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন।

'কার্ডটায় লেখা আছে হিল্ডা ওর ক্রুশবিদ্ধ যিশুর মূর্তিটা হারিয়ে ফেলেছে।'

'হ্যাঁ, তাই তো দেখলাম।'

'আর ঠিক ওটাই আমি পেয়েছি বাড়িতে আমার বালিশের নিচে। ওটা কী করে ওখানে গেল আপনি বুঝতে পারছেন কিছু?'

গম্ভীর মুখে সোফির চোখের দিকে তাকালেন অ্যালবার্টো।

'এমনিতে হয়ত ব্যাপারটা খুব রহস্যময় মনে হচ্ছে। কিন্তু আসলে ওটা একটা সস্তা কৌশল, যে-জন্য লোকটাকে তেমন কোনো কষ্টই করতে হয়নি। আমরা বরং মহাবিশ্বের টপ হ্যাটের ভেতর থেকে বের করে আনা বিশাল, সাদা খরগোশটার দিকে মনোযোগ দিই, চলো।'

বসার ঘরে গিয়ে উপস্থিত হলো দু'জন। এমন অদ্ভুত ঘর আগে কখনো দেখেনি সোফি। ঢালু দেয়ালবিশিষ্ট প্রশস্ত একটা চিলেকোঠায় থাকেন অ্যালবার্টো। দেয়ালগুলোর একটাতে বসানো একটা স্কাইলাইট ঘরটাকে ঠিক ওপর থেকে আসা উজ্জ্বল আলোয় ভাসিয়ে দিচ্ছে। অবশ্য ঘরে আরেকটা জানালা আছে শহরের দিকে। সেই জানালা দিয়ে পুরনো শহরটার সবকটা ছাদ দেখতে পাচ্ছিল সোফি। কিন্তু সোফিকে যা সবচেয়ে অবাক করল তা হলো যে-সব জিনিস দিয়ে ঘরটা ভর্তি করে রাখা হয়েছে সেগুলো—বিভিন্ন ঐতিহাসিক সময়ের আসবাব আর জিনিসপত্র। রয়েছে তিরিশের দশকের সোফা, এই শতাব্দীর গোড়ার দিকের পুরনো একটা ডেস্ক আর একটা চেয়ার, একশো বছরের কম হবে না সেটির বয়স। কিন্তু কেবল আসবাবই নয়। কেজো অথবা গৃহসজ্জার বহু পুরনো জিনিসপত্র শেলফ আর কাবার্ডে গাদাগাদি করে রাখা। আছে পুরনো ঘড়ি আর ফুলদানি, হামানদিস্তা আর বকযন্ত্র, ছুরি আর পুতুল, পালকের কলম আর বই-ঠেকা দিয়ে রাখার বুকএন্ড, অকট্যান্ট আর সেক্সট্যান্ট, কম্পাস আর ব্যারোমিটার। একটা দেয়ালের পুরোটাই ঢাকা পড়ে গেছে বইয়ে, কিন্তু বইয়ের দোকানগুলোতে যে-ধরনের বই পাওয়া যায় সে-ধরনের বইতে নয়। বইয়ের এই সংগ্রহটাই বেশ কয়েকশ' বছরের সৃষ্টির একটা প্রতিনিধিত্বমূলক নমুনা। অন্যান্য দেয়ালে ঝুলছে নানান ড্রইং, পেইন্টিং, সেগুলোর কোনোটা হয়ত সাম্প্রতিক সময়ের, কিন্তু বেশির ভাগই খুব পুরনো। দেয়ালে আরও রয়েছে বেশকিছু পুরনো চার্ট আর ম্যাপ, অবশ্য সেগুলোর যে-সব নরওয়ে সংক্রান্ত সে-সব যে খুব একটা নিখুঁত তা নয়।

বেশ কিছুক্ষণ কোনো কথা না বলে দাঁড়িয়ে রইল সোফি, মনের মধ্যে গেঁথে নিচ্ছে সবকিছু।

'রাজ্যের সব আজেবাজে জিনিস জমিয়েছেন দেখছি আপনি,' অবশেষে মন্তব্য

করল সে।

'বটে। একবার শুধু ভেবে দেখো তো কত শতাব্দীর ইতিহাস আমি প্রিজার্ভ করেছি এই ঘরটাতে। এগুলোকে ঠিক আজেবাজে জিনিস বলব না আমি।'

'আপনার কি কোনো অ্যান্টিক শপ বা সে-রকম কিছু আছে নাকি?'

অ্যালবার্টোকে ব্যথিতই দেখালো একরকম।

'আমরা সবাই যদি ইতিহাসের স্রোতে ভেসে যাই তা হলে কী করে হবে, সোফি? কাউকে না কাউকে তো নদীতীরে রয়ে যাওয়া জিনিসপত্র কুড়িয়ে নেবার জন্য থামতেই হবে কিছুক্ষণের জন্য!'

'কী অদ্ভুত কথা!'

'তা ঠিক, কিন্তু সত্যি-ও বটে। আমরা কেবল আমাদের সময়েই জীবনযাপন করি না; আমরা আমাদের ভেতরে আমাদের ইতিহাসকে বয়ে নিয়ে বেড়াই। একটা কথা ভুলো না যেন যে, এই ঘরে যা কিছু আছে তার সবই একসময় আনকোরা নতুন ছিল। ষোড়শ শতাব্দীর এই পুরোনো কাঠের পুতুলটা হয়ত কোনো পাঁচ বছর বয়সী ছোট্ট মেয়ের জন্য তৈরি করা হয়েছিল। হয়ত তার দাদা-ই বানিয়েছিল... তো, তারপর মেয়েটি টিন এজে পৌঁছল, তারপর আরও বড় হলো, বিয়ে করল। হয়ত এরপর তার নিজেরই একটা মেয়ে হলো আর তখন সে পুতুলটা তাকে দিল। দিনে দিনে সে বুড়ো হলো, একদিন মারা গেল। যদিও সে অনেকদিন বেঁচেছিল, কিন্তু একদিন সে মরে গিয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। আর কখনোই ফিরে আসবে না সে। সত্যি বলতে কী, এখানে সে এসেছিল অল্প কিছুক্ষণের জন্য বেড়াতে। কিন্তু তার পুতুলটা-ওই তো, শেলফের ওপর পড়ে আছে।'

'আপনি যখন এভাবে কথা বলেন তখন সবকিছুই কি যে বিষণ্ন আর গুরুগম্ভীর মনে হয়।'

'জীবন একই সঙ্গে বিষণ্ন আর গুরুগম্ভীর। আমাদেরকে এক চমৎকার পৃথিবীতে আসতে দেয়া হয়েছে, এখানে একে অন্যের সঙ্গে দেখা হয় আমাদের, পরস্পর কুশল বিনিময় করি, সম্ভাষণ জানাই, ঘুরে ফিরে বেড়াই একসঙ্গে কিছুক্ষণের জন্য। তারপর, হঠাৎ করে, কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ ছাড়াই একদিন যেমন এসেছিলাম আমরা, তেমনিভাবেই অদৃশ্য হয়ে যাই।'

'একটা কথা জিজ্ঞেস করতে পারি?'

'আমরা তো এখন আর লুকোচুরি খেলছি না।'

'আপনি মেজরের কেবিনে থাকতে গিয়েছিলেন কেন?'

'আমরা যখন শুধু চিঠির মাধ্যমে কথা বলছিলাম তখন যাতে কাছাকাছি থাকি দু'জনে সেজন্যে।'

'সেজন্যই স্রেফ ওখানে থাকতে চলে গেলেন আপনি?'

'ঠিক। সেজন্যই চলে গেলাম ওখানে।'

'তাহলে হয়ত আপনি এর-ও একটা ব্যাখ্যা দিতে পারবেন যে হিল্ডার বাবা কী করে জানলেন যে আপনি ছিলেন।'

'আমার যদি ভুল না হয়ে থাকে, বাস্তবিক অর্থে তিনি সবকিছুই জানেন।'

'কিন্তু তারপরেও আমি বুঝতে পারছি না বনের মধ্যে চিঠি পৌছে দেবার মতো ডাকপিয়ন উনি কোথায় পেলেন!'

বাঁকা একটা হাসি হাসলেন অ্যালবার্টো।

'এমনকি ও-ধরনের ব্যাপারও হিল্ডার বাবার জন্য নেহাতই নস্যি। সস্তা ভোজবাজি। সাদামাটা হাত-সাফাই। আমরা সম্ভবত যাকে বলে জগতের সবচেয়ে কড়া নজরদারির মধ্যে বাস করছি।'

সোফি বুঝতে পারছিল ভেতরে ভেতরে রেগে যাচ্ছে সে।

'তার সঙ্গে যদি কখনো দেখা হয় আমার তাহলে আমি তার চোখ দুটো খামচে তুলে নেবো।'

অ্যালবার্টো হেঁটে গিয়ে সোফায় বসে পড়লেন। সোফি তাকে অনুসরণ করে গভীর একটা আর্মচেয়ারে নিজেকে ডুবিয়ে দিল।

'দর্শন-ই কেবল হিল্ডার বাবার আরও কাছাকাছি নিয়ে যেতে পারে আমাদেরকে,' অ্যালবার্টো বললেন একসময়। 'আজকে আমি তোমাকে বলব রেনেসাঁ-র কথা।'

'শুরু করুন।'

'সেন্ট অগাস্টিনের মৃত্যুর কিছুদিনের মধ্যেই খ্রিস্টধর্মের সমন্বিত সংস্কৃতির মধ্যে ফাটল দেখা দিতে শুরু করল। দর্শন আর বিজ্ঞান গির্জার ঈশ্বরতত্ত্বের কাছ থেকে ক্রমেই দূরে সরে যেতে থাকল, তাতে করে ধর্মীয় জীবনের পক্ষে যুক্তি-বিশ্লেষণের সঙ্গে আরও স্বচ্ছন্দ আর সাবলীল একটা সম্পর্ক তৈরি করা সম্ভব হলো। আরও বেশি লোকজন উপলব্ধি করতে লাগল যে বুদ্ধিবাদের সাহায্যে ঈশ্বরের কাছে পৌছতে পারবো না আমরা, কারণ ঈশ্বর সবদিক থেকেই অজ্ঞেয়। স্বর্গীয় রহস্য বোঝাটা মানুষের জন্য জরুরি নয়, জরুরি বিষয় হচ্ছে ঈশ্বরের ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণ করা।

'ধর্ম আর বিজ্ঞান যেহেতু এখন আগের চেয়ে আরও সাবলীলভাবে পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কিত হতে পারছিল ফলে নতুন নতুন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি আর একটা নতুন ধর্মীয় উদ্দীপনার সম্ভাবনা বা দরজা খুলে গেল। এভাবেই ভিত্তি তৈরি হলো পঞ্চদশ আর ষোড়শ শতাব্দীর দুটো শক্তিশালী আন্দোলনের, রেনেসাঁ (Renaissance) আর রিফর্মেশনের (Reformation)।'

'একটা একটা করে এগোলে হোতো না?'

'রেনেসাঁ বলতে আমরা অত্যন্ত সমৃদ্ধ সেই সাংস্কৃতিক বিকাশকে বুঝি যার সূত্রপাত ঘটেছিল চতুর্দশ শতাব্দীর শেষের দিকে। এর শুরুটা হয়েছিল উত্তর ইতালিতে আর খুব তাড়াতাড়ি তা ছড়িয়ে পড়েছিল উত্তর দিকে, পঞ্চদশ আর ষোড়শ শতাব্দীতে।'

'আপনি আমাকে বলেছিলেন না যে 'রেনেসাঁ' অর্থ পুনর্জন্ম?'

'বলেছিলাম বৈকি। আর যে-জিনিসটির পুনর্জন্ম হচ্ছিল তা হলো প্রাচীন যুগের শিল্প আর সংস্কৃতি। আমরা রেনেসাঁর মানবতাবাদের কথাও বলি, তার কারণ দীর্ঘ অন্ধকার যুগের পর, যে-সময়ে প্রতিটি জিনিসই স্বর্গীয় আলোর সাহায্যে দেখা হতো, সবকিছুই আবার মানুষকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হতে শুরু করল। এই সময়ের মূলমন্ত্র ছিল 'উৎসের দিকে যাও,' আর সে-কথার প্রথম এবং প্রধান অর্থ প্রাচীন যুগের মানবতাবাদ।

'প্রাচীন সব ভাস্কর্য আর স্ক্রল খুঁজে খুঁজে আবিষ্কার করা যেন একটা জনপ্রিয় অবসর বিনোদন হয়ে দাঁড়াল, ঠিক যেমন ফ্যাশন হয়ে উঠল গ্রিক ভাষা শেখা। গ্রিক মানবতাবাদ চর্চার একটা শিক্ষা সংক্রান্ত দিকও ছিল। মানবতাবাদী বিষয়গুলো একটা 'ধ্রুপদী শিক্ষা'য় শিক্ষিত করতো লোকজনকে এবং তাদের মধ্যে বিকশিত করতো যাকে বলা যেতে পারে মানবীয় গুণাবলি। বলা হতো, 'ঘোড়ার জন্ম হয়, কিন্তু মানুষের জন্ম হয় না, তাকে গঠন করা হয়'।'

'মানুষ হতে হলে কি তাহলে শিক্ষিত হতে হবে আমাদের?'

'হ্যাঁ, সে-রকমটাই ভাবা হতো। কিন্তু রেনেসাঁর মানবতাবাদের ধারণাগুলোর দিকে তাকাবার আগে রেনেসাঁ-র রাজনৈতিক আর সাংস্কৃতিক পটভূমির ব্যাপারে কিছু কথা বলে নেয়া খুব জরুরি।'

সোফা থেকে উঠে ঘরময় ঘুরে বেড়াতে শুরু করলেন অ্যালবার্টো। খানিক পর থামলেন তিনি, তাকগুলোর একটার ওপর রাখা একটা প্রাচীন যন্ত্রের দিকে তর্জনী নির্দেশ করলেন।

'কী ওটা?' জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

'দেখে মনে হচ্ছে সাবেক কালের একটা কম্পাস।'

'একদম ঠিক।'

এরপর তিনি সোফার ওপরে দেয়াল থেকে ঝুলে থাকা প্রাচীন একটা আগ্নেয়াস্ত্রের দিকে আঙুল তুললেন।

'আর ওটা?'

'একটা সেকেলে রাইফেল।'

'ঠিক বলেছ—আর এটা?'

বইয়ের শেলফ থেকে বড়সড় একটা বই টেনে বার করলেন অ্যালবার্টো।

'এটা একটা পুরনো বই।'

'একদম ঠিক করে বললে, এটা হচ্ছে একটা ইনকিউনাবুলাম (incunabulum)।'

'ইনকিউনাবুলাম?'

'আসলে কথাটার অর্থ 'দোলনা'। শব্দটা ব্যবহার করা হয় প্রিন্টিংয়ের একেবারে গোড়ার দিনগুলোর বই-এর প্রসঙ্গে। তার মানে, ১৫০০ খ্রিস্টাব্দের আগের বইগুলো সম্পর্কে।'

'বইটা কি আসলেই এতো পুরনো?'

'এতোই পুরনো, হ্যাঁ, আর এই তিনটি আবিষ্কার-কম্পাস, আগ্নেয়াস্ত্র আর প্রিন্টিং প্রেস—এগুলোই ছিল আমরা যাকে রেনেসাঁ বলি তার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পূর্বশর্ত।'

'ব্যাপারটা আরেকটু পরিষ্কার করে বলতে হবে আমাকে।'

'কম্পাসের কারণে নৌ-চালনা আগের চেয়ে সহজ হয়ে এলো। অন্যভাবে বললে বলতে হয়, নতুন নতুন দেশ আবিষ্কারের বড় বড় যে-সব অভিযান হয়েছিল তখন তা সম্ভব হয়েছিল মূলত এই কম্পাসের কারণেই। এক অর্থে, আগ্নেয়াস্ত্রের কারণেও বটে। নতুন অস্ত্রগুলোর কারণে ইউরোপীয় সামরিক বাহিনী আমেরিকা আর এশিয়ার সংস্কৃতির ওপর আধিপত্য বিস্তারে সক্ষম হয়। অবশ্য ইউরোপেও আগ্নেয়াস্ত্রগুলো

একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। আর রেনেসাঁর মানবতাবাদীদের নতুন ধারণাগুলো ছড়িয়ে দেবার ক্ষেত্রে একটা বড় ভূমিকা পালন করেছিল প্রিন্টিং। জ্ঞানের একমাত্র প্রচারকারী হিসেবে গির্জার প্রাক্তন ভূমিকার অবসান ঘটাতে যে-সব কারণ অবদান রেখেছিল এই মুদ্রণশিল্প তার একটি। নতুন নতুন আবিষ্কার আর যন্ত্রপাতি দেখা দিতে থাকে একের পর এক। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, এ-রকম একটা গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার ছিল টেলিস্কোপ, জ্যোতির্বিদ্যাকে যা এক পুরোপুরি নতুন ভিত্তির ওপর দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল।'

'এবং সবশেষে এলো রকেট আর স্পেস প্রোব।'

'এবার কিন্তু তুমি বড় তাড়াতাড়ি এগোলে। তবে তুমি এ-কথা বলতে পারো যে রেনেসাঁ-র সময়েই একটা প্রক্রিয়া তৈরি হয়েছিল যা শেষ পর্যন্ত মানুষকে চাঁদে পৌঁছে দেয়। বা এক অর্থে হিরোশিমা আর চেরনোবিলে। সে যাই হোক, এর সবই শুরু হয়েছিল সাংস্কৃতিক আর অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পরিবর্তনের সূত্র ধরে। একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হলো বিদ্যমান অর্থনীতি থেকে অর্থ-ভিত্তিক অর্থনীতিতে রূপান্তর। মধ্যযুগের শেষের দিকে নানান শহর গড়ে উঠেছিল, সেই সঙ্গে গড়ে উঠেছিল কার্যকর ব্যবসা-বাণিজ্য আর নিত্য নতুন পণ্যের এক চমৎকার বেচাকেনা, সেই সঙ্গে অর্থ-নির্ভর অর্থনীতি ও ব্যাংকিং। উদ্ভব হলো মধ্যবিত্ত শ্রেণীর, যে-শ্রেণী জীবনযাপনের মৌলিক শর্ত বা অবস্থার খানিকটা উদারনৈতিক পরিবর্তন আনতে সফল হলো। এমন একটা পরিস্থিতির সৃষ্টি হলো যেখানে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র অর্থের বদলে কিনতে পাওয়া গেল। এর সবই মানুষের পরিশ্রম, কল্পনাশক্তি আর উদ্ভাবনশক্তির পুরস্কার। আর এ-সবের ফলে ব্যক্তিমানুষের ওপর নিত্য নতুন প্রত্যাশা বা দাবি সৃষ্টি হলো।'

'দুই হাজার বছর আগে গ্রিক শহরগুলো যেভাবে সৃষ্টি হয়েছিল ব্যাপারটা তো দেখছি খানিকটা সে-রকম।'

'একেবারে মিথ্যে বলনি। গ্রিক দর্শন কীভাবে গ্রামীণ সংস্কৃতির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত পৌরাণিক বিশ্বচিত্র থেকে বেরিয়ে এসেছিল সে-কথা আমি তোমাকে বলেছি। ঠিক একইভাবে, রেনেসাঁ-র সময়কার মধ্যবিত্ত শ্রেণীও সামন্তপ্রভু আর গির্জার ক্ষমতাবলয় থেকে বেরিয়ে আসতে শুরু করে। এই যখন অবস্থা তখন গ্রিক সংস্কৃতিও নতুন করে আবিষ্কৃত হচ্ছিল স্পেনে আরবদের আর পূর্বে বাইজেন্টীয় সংস্কৃতির সঙ্গে আগের চেয়েও ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের ফলে।'

'প্রাচীন যুগের তিন শাখা বিশিষ্ট জলধারা ফের মিলিত হয়ে তৈরি করল একটি বিশাল নদী।'

'মনোযোগী ছাত্রী তুমি। যাই হোক, একটা ব্যাকগ্রাউন্ড পেলে তুমি তাহলে রেনেসাঁ-র । এবার আমি তোমাকে নতুন ধারণাগুলোর কথা বলছি।'

'ঠিক আছে, কিন্তু আমাকে বাড়ি ফিরতে হবে, খেতে হবে।'

আবার সোফায় বসে পড়লেন অ্যালবার্টো। তাকালেন সোফির দিকে।

'সবকিছু ছাপিয়ে রেনেসাঁ-র সময়ে দেখা দিয়েছিল *মানবজাতি সম্পর্কে এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গি*। মানুষের পাপপূর্ণ চরিত্রের ওপর জোর-দেয়া মধ্যযুগীয় একদেশদর্শী দৃষ্টিভঙ্গির একেবারে বিপরীতে রেনেসাঁ-প্রসূত মানবতাবাদ মানুষ এবং মানুষের মূল্য

সম্পর্কে এক নতুন বিশ্বাস নিয়ে উপস্থিত হয়। মানুষকে এবার থেকে দেখা হতে থাকে সীমাহীন রকমের বিরাট আর মূল্যবান হিসেবে। রেনেসাঁ-র অন্যতম প্রধান ব্যক্তিত্ব ছিলেন *মার্সিলিও ফিসিনো* (Marsilio Ficino), যিনি বলেছিলেন, 'মানুষের ছদ্মবেশধারী হে স্বর্গীয় বংশ, নিজেকে জানো!' আরেকজন কেন্দ্রীয় ব্যক্তি ছিলেন *পিকা দেলা মিরান্দোলা* (Pica della Mirandola)। তিনি লিখেছিলেন *মানুষের সম্মান সংক্রান্ত বক্তৃতা*, যা ছিল মধ্যযুগে একটি অভাবিত বিষয়।

'পুরো মধ্যযুগ জুড়েই প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল ঈশ্বর। রেনেসাঁ-র মানবতাবাদীরা তাঁদের আলোচনার কেন্দ্রে নিয়ে এলেন মানুষকে।'

'কিন্তু গ্রিক দার্শনিকেরাও তো তাই করেছিলেন?'

'ঠিক এজন্যই তো একে আমরা বলছি প্রাচীন যুগের মানবতাবাদের পুনর্জন্ম। তবে রেনেসাঁ-র মানবতাবাদ আরও অনেক বেশি বিশিষ্ট হয়ে আছে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদের (individualism) জন্য। আমরা কেবল মানুষই না, আমরা অসাধারণ স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব। এই ধারণাটি অতঃপর সম্প্রসারিত হলো প্রতিভার এক লাগামছাড়া বন্দনায়। আমরা যাকে বলি রেনেসাঁ মানবতা-ই হয়ে উঠল আদর্শ, যে কিনা জীবন, শিল্প আর বিজ্ঞানের সমস্ত দিকস্পর্শী এক সার্বজনীন প্রতিভাসম্পন্ন মানুষ। মানুষ সম্পর্কিত নতুন দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ ঘটল মানুষের শারীরবিদ্যার ব্যাপারে সৃষ্টি হওয়া একটি নতুন আগ্রহের মধ্য দিয়েও। প্রাচীনকালের মতো লোকে আবারও শব ব্যবচ্ছেদ শুরু করল মানুষের শরীরের গঠন দেখার জন্যে। চিকিৎসাবিজ্ঞান আর শিল্পকলা, এই দুইয়ের বেলাতেই বাধ্যতামূলকভাবে করা হতো কাজটি। নগ্ন শরীর আঁকা শিল্পের ক্ষেত্রে আবারও স্বাভাবিক বিষয় হিসেবে পরিগণিত হলো। এক হাজার বছরের শালীনতার ভানের পর মানুষ তার স্বরূপে ফেরার মতো সাহসী হলো। এমন কিছুই রইল না তার যার জন্য তাকে লজ্জিত হতে হয়।'

'কেমন যেন নেশা ধরিয়ে দিচ্ছে আপনার কথাগুলো,' বলে উঠল সোফি, তার আর দার্শনিকের মাঝখানে রাখা ছোট্ট টেবিলটার ওপর হাতের ভর রেখে।

'তা ধরানোরই কথা। মানুষের প্রতি নতুন দৃষ্টিভঙ্গি সমস্ত কিছুর ব্যাপারেই একটা নতুন দৃষ্টিভঙ্গি জন্ম দিল। মানুষ কেবল ঈশ্বরের জন্যই বাঁচে না। ইহজগতের এবং বর্তমানের জীবন নিয়ে আনন্দিত হওয়ার অনেক কিছু রয়েছে মানুষের। সেই সঙ্গে বেড়ে উঠবার, উন্নতি করবার এই স্বাধীনতার কারণে সম্ভাবনার দিগন্ত-ও হয়ে গেল অনন্ত। এবারের লক্ষ্য হলো সমস্ত সীমা অতিক্রম করা। গ্রিক মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এটাও একটা নতুন ধারণা; কারণ প্রাচীন যুগের মানবতাবাদীরা গুরুত্বারোপ করেছিলেন প্রশান্ততা, পরিমিতি আর সংযমের ওপর।'

'তাহলে কি রেনেসাঁ যুগের মানবতাবাদীরা তাদের সংযম হারিয়ে ফেলেছিলেন?'

'তারা বিশেষ করে মোটেই পরিমিতিসম্পন্ন ছিলেন না। তাঁরা এমন আচরণ করেছিলেন যেন গোটা জগৎটা নতুন করে জেগে উঠেছে। নিজেদের যুগ বা কাল সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন হয়ে উঠেছিলেন তাঁরা, সে-কারণেই প্রাচীন যুগ আর তাঁদের নিজেদের সময়ের মধ্যবর্তী শতাব্দীগুলোর কথা বোঝাতে তাঁরা প্রচলন করলেন 'মধ্যযুগ' কথাটি। জীবনের সবক্ষেত্রে সূচিত হলো এক অতুলনীয় উন্নতি। শিল্পকলা ও

স্থাপত্যবিদ্যা, সাহিত্য, সংগীত, দর্শন এবং বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এমন বিকাশ ঘটল যা এর আগে কখনো হয়নি। আমি কেবল একটি বাস্তব উদাহরণ দিচ্ছি। এর আগে আমরা 'নগরগুলোর নগর' আর 'মহাবিশ্বের কেন্দ্র' নামে একসময়ে খ্যাত প্রাচীন রোমের কথা বলেছি। অথচ মধ্যযুগে নগরটি অবক্ষয়ের মুখে পতিত হয় আর ১৪১৭ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ প্রাচীন এই নগরটির জনসংখ্যা এসে দাঁড়ায় ১৭,০০০-এ।'

'হিল্ডা যেখানে থাকে সেই লিলেস্যান্ডের চেয়ে খুব বেশি নয়।'

'রোমের অবস্থা ফিরিয়ে আনাটাকে রেনেসাঁ যুগের মানবতাবাদীরা তাঁদের সাংস্কৃতিক কর্তব্য হিসেবে গণ্য করেছিলেন; তাই সবার আগে তাঁরা হাতে নিলেন অ্যাপোসল পিটারের সমাধির ওপর বিশালকায় সেন্ট পিটারের গির্জা নির্মাণের কাজ। এবং, সেন্ট পিটারের গির্জার খ্যাতি কিন্তু আর যাই হোক পরিমিতি বা সংযমের জন্য নয় মোটেই। রেনেসাঁ যুগের অনেক বড় বড় শিল্পী জগতের সবচেয়ে বড় এই নির্মাণকাজে অংশ নিয়েছিলেন। কাজটি শুরু হয় ১৫০৬-এ, চলে একশো বছর ধরে এবং বিশাল সেন্ট পিটার্স স্কোয়্যার হতে সময় নেয় আরও পঞ্চাশ বছর।

'গির্জাটা নিশ্চয়ই আকারে খুবই বিশাল হবে।'

'লম্বায় ২০০ মিটারেরও বেশি, উঁচু ১৩০ মিটার আর গির্জাটা দাঁড়িয়ে আছে ১৬,০০০ বর্গফুটেরও বেশি জায়গা দখল করে। সে যাই হোক, রেনেসাঁ যুগের মানুষদের শৌর্য-বীর্যের কথা অনেক হলো। তবে আরেকটা ব্যাপারও লক্ষণীয় যে, প্রকৃতি সম্বন্ধেও একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গির জন্ম দিয়েছিল রেনেসাঁ। মানুষ যে পৃথিবীতে বেশ স্বচ্ছন্দ বোধ করল, জীবনকে স্রেফ পরলোকের প্রস্তুতিমূলক সময় হিসেবে গণ্য করল না, এই ব্যাপারটি প্রাকৃতিক জগৎ সম্পর্কে একেবারে নতুন একটি দৃষ্টিভঙ্গির জন্ম দিল। প্রকৃতিকে এখন থেকে একটি ইতিবাচক বিষয় বলে ভাবা হতে থাকল। অনেকেই এই মতে বিশ্বাস করতে লাগলেন যে ঈশ্বর নিজেও তাঁর সৃষ্টির মধ্যে উপস্থিত থাকেন। তিনি যদি সত্যিই অসীম হয়ে থাকেন তাহলে তিনি নিশ্চয়ই সবকিছুতেই বিদ্যমান। এই বিশ্বাস বা ধারণাটিকে বলে সর্বেশ্বরবাদ। মধ্যযুগের দার্শনিকেরা এ-কথা জোর দিয়ে বলেছেন যে ঈশ্বর আর তাঁর সৃষ্টির মধ্যে দুরতিক্রম্য একটি বাধা আছে। কিন্তু এখন এ-কথা বলা গেল যে প্রকৃতি স্বর্গীয়, এমনকি এ-কথাও যে, প্রকৃতি হচ্ছে 'ঈশ্বরেব ফুটে ওঠা।'

'কিন্তু এ-ধরনের বিশ্বাস বা ধারণা গির্জা সব সময় খুব একটা সহানুভূতির দৃষ্টিতে দেখত না। জিওর্দানো ব্রুনো (Giordano Bruno)-র নিয়তি তারই একটি প্রকৃষ্ট আর নাটকীয় উদাহরণ। তিনি যে কেবল এটাই দাবি করেছিলেন যে ঈশ্বর প্রকৃতিতে বিদ্যমান তাই নয়, তিনি এ-কথাও বিশ্বাস করতেন যে মহাবিশ্ব সম্ভাবনার দিক দিয়ে অসীম। তাঁর এই বিশ্বাসের জন্য ভীষণ শাস্তিভোগ করেছিলেন তিনি।'

'কী রকম?'

'১৬০০ খ্রিস্টাব্দে রোমের পুষ্প বাজারে তাঁকে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারা হয়।'

'কী নৃশংস   কী নির্বোধ। আর একে আপনি মানবতাবাদ বলছেন?'

'না, না, মোটেই তা নয়। ব্রুনো-ই ছিলেন মানবতাবাদী, তাঁকে যারা পুড়িয়ে মেরেছিল তারা নয়। আমরা যাকে বলি মানবতাবিরোধী কার্যকলাপ তারও প্রসার

ঘটেছিল রেনেসাঁ-র সময়ে। অর্থাৎ আমি বলতে চাইছি, রাষ্ট্র আর গির্জার কর্তৃত্ববাদী শক্তির কথা। রেনেসাঁ-র সময়ে ডাইনিদের বিচার করা, ধর্মবিরোধীদের পুড়িয়ে মারা, জাদু আর কুসংস্কার, রক্তাক্ত ধর্মীয় যুদ্ধ, এ-সবের মচ্ছব পড়ে যায় রীতিমতো, তাছাড়া 'পাশবিক আমেরিকা বিজয়'-এর কথাও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। তবে মানবতাবাদের একটা ছায়া-ঢাকা অংশ সব সময়ই রয়ে গেছে। আসলে কোনো যুগই পুরোপুরি ভালো বা পুরোপুরি মন্দ নয়। ভালো আর মন্দ হচ্ছে প্রায় একই রকমের দুটো সুতো যা মানব ইতিহাসের ভেতর দিয়ে চলে গেছে। আর, প্রায়ই এই সুতো দুটো একে অন্যের সঙ্গে জড়িয়ে যায়। এই ব্যাপারটি আমাদের পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ *নতুন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি*-র বেলাতে নেহাত কম সত্য নয়। এবার আমি রেনেসাঁ-র এই দ্বিতীয় আবিষ্কার সম্পর্কেই কিছু কথা বলব।'

'এই সময়-ই কি গোড়ার দিককার কল-কারখানাগুলো তৈরি করেছিল মানুষ?'

'না, তখনো না। কিন্তু রেনেসাঁ-র পরে যে-সব প্রযুক্তিগত উন্নতি হয় তার পূর্বশর্ত ছিল এই নতুন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি। এই কথাটির সাহায্যে আমি আসলে বলতে চাইছি বিজ্ঞান সম্পর্কে পুরোপুরি নতুন একটি দৃষ্টিভঙ্গির কথা। এই পদ্ধতির প্রায়োগিক যা কিছু ফলাফল তা ভালো করে বোঝা যায় বেশ পরেই কেবল।'

'তা এই নতুন পদ্ধতিটি কী?'

'মূলত এটা হলো আমাদের ইন্দ্রিয়গুলোর সাহায্যে প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করার একটি প্রক্রিয়া। চতুর্দশ শতাব্দী থেকেই সেই সব চিন্তাবিদের সংখ্যা বেড়ে চলছিল যাঁরা প্রাচীন শাস্ত্রের প্রতি অন্ধ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে সতর্কবাণী উচ্চারণ করে যাচ্ছিলেন, তা সেটি ধর্মীয় মতবাদই হোক বা অ্যারিস্টটলের প্রকৃতিবাদী দর্শনই হোক। স্রেফ চিন্তা-ভাবনার সাহায্যেই কোনো সমস্যার সমাধান করে ফেলা সম্ভব, এ-রকম বিশ্বাসের বিরুদ্ধেও সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হচ্ছিল। পুরো মধ্যযুগ জুড়েই আসলে প্রজ্ঞার গুরুত্বের ওপর বাড়াবাড়ি রকমের ভরসার ব্যাপারটি প্রশ্রয় পেয়ে এসেছিল। কিন্তু এখন বলা হতে লাগল যে প্রাকৃতিক ঘটনাবলী সংক্রান্ত যে-কোনো অনুসন্ধান অবশ্যই পর্যবেক্ষণ, অভিজ্ঞতা আর পরীক্ষা-নিরীক্ষা নির্ভর হতে হবে। এই ব্যাপারটিকে আমরা বলি *অভিজ্ঞতাভিত্তিক পদ্ধতি* (empirical method)।'

'তার মানে?'

'স্রেফ এই যে কারও জ্ঞানের ভিত্তি কেবল তার নিজের অভিজ্ঞতা-নির্ভর। কল্পনার ধূলিধূসর কাগজপত্র বা মিথ্যা সাজানো ঘটনা-নির্ভর নয়। অভিজ্ঞতা-নির্ভর বিজ্ঞান প্রাচীন যুগে অপরিচিত ছিল না, কিন্তু নিয়মানুগ *পরীক্ষা-নিরীক্ষার* এই ব্যাপারটি ছিল একেবারেই নতুন।

'আমাদের কাছে এখন যে-সব টেকনিক্যাল অ্যাপারেটাস রয়েছে তা নিশ্চয়ই ছিল না তাদের?'

'ক্যালকুলেটর বা ইলেক্ট্রনিক তুলাযন্ত্র অবশ্য তাঁদের ছিল না। তবে তাঁরা অঙ্কশাস্ত্র জানতেন, নানান তুলাযন্ত্র-ও ছিল তাঁদের। আর তাছাড়া, বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণগুলোকে যথাযথ গাণিতিক ভাষায় প্রকাশ করার ব্যাপারটি এ-সময় মোটের ওপর বাধ্যতামূলক হয়েও দাঁড়িয়েছিল। 'যা মাপা যায় তা মাপো আর যা মাপা যায় না

তা মাপার যোগ্য করে তোলো,' বললেন সপ্তদশ শতকের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিজ্ঞানী গ্যালিলিও গ্যালিলি। তিনি আরও বলেছিলেন যে, 'প্রকৃতির গ্রন্থ লেখা হয়েছে গণিতের ভাষায়।'

'তাহলে এ-সমস্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা আর মাপজোক-ই নতুন নতুন আবিষ্কারকে সম্ভব করে তুলেছিল।'

'নতুন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিটি ছিল এ-সবের প্রথম পর্ব। এর কারণেই সম্ভব হয়েছিল প্রযুক্তিগত বিপ্লব আর এই প্রযুক্তিগত সাফল্যই এরপরের প্রতিটি আবিষ্কারের পথ খুলে দেয়। তুমি বলতে পারো, মানুষ তার প্রাকৃতিক সীমাবদ্ধতা ভেঙে বেরিয়ে আসতে শুরু করল। প্রকৃতির নিছকই একটা অংশ হয়ে রইল না আর মানুষ। 'জ্ঞানই শক্তি,' এই কথাটি বলে ইংরেজ দার্শনিক ফ্রান্সিস বেকন (Francis Bacon) জ্ঞানের ব্যবহারিক মূল্যের ওপর জোর দিলেন আর এ-ব্যাপারটি কিন্তু ছিল সত্যি-ই নতুন। সত্যি সত্যি-ই মানুষ প্রাকৃতিক কাজ-কর্মে হস্তক্ষেপ শুরু করে দিয়েছিল। শুরু করেছিল প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে।'

'কিন্তু শুধু নিশ্চয়ই ভালো অর্থে নয়?'

'না আর এই কথাটি-ই খানিক আগে বোঝাতে চেয়েছিলাম আমি যখন বলেছিলাম যে আমরা যা-ই করি তার মধ্যেই ভালো আর মন্দের সুতো জড়াজড়ি করে থাকে সর্বক্ষণ। রেনেসাঁ-র সময়ে শুরু হওয়া প্রযুক্তিগত বিপ্লবই স্পিনিং জেনি (কলের চাকা) আর বেকারত্বের সূচনা ঘটায়, সূচনা ঘটায় ওষুধপত্র আর নতুন নতুন রোগের, কৃষিকাজে উন্নত দক্ষতা আর প্রকৃতি-পরিবেশের সর্বনাশের, ব্যবহার্য যন্ত্রপাতি, যেমন ওয়াশিং মেশিন ও রিফ্রিজারেটর আর সেই সঙ্গে দূষণ ও শিল্পবর্জ্যের। আজ আমরা ভয়াবহ যে পরিবেশগত হুমকির মুখোমুখি হয়েছি তা অনেককে খোদ প্রযুক্তিগত বিপ্লবকেই প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে একটি বিপজ্জনক রকমের বেমানান জিনিস হিসেবে দেখতে বাধ্য করছে। বলা হচ্ছে যে, আমরা এমন একটি জিনিস শুরু করেছি যা আমরা আর নিয়ন্ত্রণ করতে পারছি না। আরও আশাবাদী যারা তাঁরা অবশ্য মনে করেন যে আমরা এখনো প্রযুক্তির শৈশব দশার মধ্যে বাস করছি, তাছাড়া, বৈজ্ঞানিক যুগের গোড়ার দিকে নিশ্চিতভাবেই কিছু সমস্যার মুখোমুখি হলেও ধীরে ধীরে আমরা প্রকৃতিকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে শিখব যাতে একই সঙ্গে সেটির আর আমাদের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে না পড়ে।'

'আপনার কী ধারণা?'

'আমি মনে করি এই দুই মতের ভেতরেই সম্ভবত সত্য আছে, কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্রকৃতির ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা বন্ধ করতে হবে আমাদের, কিন্তু আবার অন্যান্য কিছু ক্ষেত্রে আমরা সফল হতে পারব। একটা বিষয় নিশ্চিত, মধ্যযুগে ফিরে যাওয়ার কোনো অবকাশ নেই। রেনেসাঁ-র সময় থেকেই মানুষ সৃষ্টির স্রেফ একটা অংশের অতিরিক্ত হয়ে পড়েছে। প্রকৃতির কাজ-কর্মে মানুষ হস্তক্ষেপ করতে শুরু করেছে, প্রকৃতিকে গড়ে তুলেছে তার নিজের প্রতিমূর্তির অনুকরণে। সত্যিই 'হোয়াট আ পিস্ অভ্ ওয়ার্ক ইজ ম্যান!' '

'এরই মধ্যে আমরা চাঁদে পা রেখেছি। মধ্যযুগের কোনো লোক কি বিশ্বাস

করতো কাজটা সম্ভব?'

'তা যে করতো না সে-কথা নিশ্চিত করেই বলা যায়। আর এই সূত্র ধরেই আমরা চলে এসেছি *জগৎ সম্পর্কিত নতুন ধারণা*-য়। পুরো মধ্যযুগ ধরে লোকে আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে উপরের সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র আর গ্রহ-র দিকে তাকিয়ে থেকেছে। কিন্তু পৃথিবী যে মহাবিশ্বের কেন্দ্র এ-বিষয় নিয়ে কারও মনে কোনো সংশয় সৃষ্টি হয়নি। কোনো পর্যবেক্ষণই মানুষের মনে এ-ব্যাপারে কোনো সন্দেহ সৃষ্টি করেনি যে পৃথিবী স্থির আর 'গ্রহ-নক্ষত্রগুলো' তাদের নিজ নিজ অক্ষে থেকে পৃথিবীর চারপাশে ঘুরছে। একে আমরা বলি ভূ-কেন্দ্রিক বিশ্বচিত্র, অন্য কথায় যার অর্থ হচ্ছে এই বিশ্বাস যে সব কিছুই পৃথিবীকে কেন্দ্র করে আবর্তিত। উঁচু থেকে, সমস্ত গ্রহ-নক্ষত্রের ওপর থেকে ঈশ্বর শাসন করে যাচ্ছেন, খ্রিস্টীয় এই বিশ্বাস-ও এই বিশ্বচিত্রটিকে বজায় রাখতে সাহায্য করেছে।'

'ব্যাপারটা যদি এতোই সোজা হতো, তাহলে ভালোই হতো!'

'কিন্তু ১৫৪৩ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হলো একটি ছোট্ট বই, *অন দ্য রেভলিউশনস্ অভ্ দ্য সেলেশ্চিয়াল স্ফিয়ারস্*। বইটি লিখলেন পোল্যান্ডের জ্যোতির্বিদ *নিকোলাউস কোপার্নিকাস* (Nicolaus Copernicus)। বইটি যেদিন প্রকাশিত হয় সেদিনই কোপার্নিকাস মারা যান। তিনি দাবি করলেন যে, সূর্য পৃথিবীর চারদিকে ঘোরে না, ব্যাপারটি ঠিক উল্টো। তিনি বললেন, জগতে যে-সব গ্রহ-নক্ষত্র রয়েছে সেসব পর্যবেক্ষণ করলেই বোঝা যায় যে ব্যাপারটি খুবই সম্ভব। তিনি বললেন, লোকে যে সব সময় বিশ্বাস করে এসেছে যে সূর্য পৃথিবীর চারদিকে ঘোরে তার বদলে পৃথিবী বরং নিজের অক্ষের ওপর ঘুরে চলেছে। তিনি বললেন, গ্রহ-নক্ষত্রের সমস্ত পর্যবেক্ষণ বুঝতে পারা অনেক অনেক সহজ হয়ে পড়ে যদি কেউ এ-কথা ধরে নেয় যে পৃথিবী এবং অন্যান্য গ্রহ সূর্যের চারদিকে ঘোরে। একে আমরা বলি সূর্যকেন্দ্রিক বিশ্বচিত্র।'

'আর এই বিশ্বচিত্রটি-ই ঠিক ছিল?'

'পুরোপুরি নয়। তাঁর মূল বক্তব্য, অর্থাৎ পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘোরে, সেটি অবশ্য সঠিক। কিন্তু তিনি দাবি করেছিলেন যে, সূর্য-ই সমগ্র মহাবিশ্বের কেন্দ্র। আজ আমরা জানি যে সূর্য অসীম সংখ্যক নক্ষত্রের একটি মাত্র। আর আমাদের চারপাশের অগুনতি নক্ষত্র দিয়ে বেশ কয়েক বিলিয়ন গ্যালাক্সির মধ্যে একটি তৈরি হয়েছে। কোপার্নিকাস আরও বিশ্বাস করতেন যে, পৃথিবী এবং অন্য সব গ্রহ বৃত্তাকার কক্ষপথ ধরে সূর্যের চারপাশে ঘোরে।'

'আসলে তা নয়?'

'না। গোলাকার কক্ষপথের ব্যাপারে তাঁর বিশ্বাসের একমাত্র ভিত্তি ছিল সুপ্রাচীন এই ধারণাটি যে স্বর্গীয় বস্তুগুলো অর্থাৎ গ্রহ-নক্ষত্রসমূহ গোলাকার আর তারা গোলাকার পথে আবর্তন করে, স্রেফ এই কারণে যে সেগুলো 'স্বর্গীয়'।

প্লেটোর সময় থেকেই গোলক আর বৃত্তকে সবচেয়ে নিখুঁত জ্যামিতিক আকার হিসেবে ধরে নেয়া হচ্ছিল। কিন্তু সপ্তদশ শতাব্দী গোড়ার দিকে জার্মানির জ্যোতির্বিদ *জোহানেস কেপলার* (Johannes Keplar) ব্যাপক পর্যবেক্ষণের ফলাফল উপস্থিত করেন এবং এতে দেখা যায় যে, গ্রহগুলো উপবৃত্তাকার কক্ষপথে একটি ফোকাস থেকে

সূর্যকে আবর্তন করে। তিনি আরও দেখান যে একটি গ্রহ যখন সূর্যের সবচেয়ে কাছে থাকে তখনই সেটির গতিবেগ সবচেয়ে বেশি হয়। আর যতই তা সূর্যের কাছ থেকে দূরে সরে যায় ততোই সেটির গতি ধীর হয়ে পড়ে। আসলে কেপলারের সময়ের আগে এ-কথা বলা হয়নি যে পৃথিবী ঠিক অন্যান্য গ্রহের মতোই একটা গ্রহ। কেপলার জোর দিয়ে আরও বলেন যে সারা মহাবিশ্ব জুড়েই একই প্রাকৃতিক নিয়ম কার্যকর।'

'তিনি কী করে জানলেন সে-কথা?'

'জানলেন কারণ তিনি প্রাচীন কুসংস্কারগুলোর ওপর অন্ধভাবে বিশ্বাস স্থাপন না করে নিজের ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে গ্রহগুলোর গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। *গ্যালিলিও গ্যালিলি*, (Galileo Galilei), যিনি কেপলারের কিছুদিনের সমসাময়িক ছিলেন, তিনিও গ্রহ-নক্ষত্র পর্যবেক্ষণ করার জন্য দূরবীক্ষণ যন্ত্র ব্যবহার করেছিলেন। চাঁদের বিভিন্ন জ্বালামুখ পর্যবেক্ষণ করে তিনি বলেছিলেন চাঁদেও পৃথিবীর মতো পাহাড় এবং উপত্যকা রয়েছে। এছাড়াও তিনি আবিষ্কার করেছিলেন যে বৃহস্পতি গ্রহের চারটি চাঁদ বা উপগ্রহ রয়েছে। কাজেই, শুধু যে পৃথিবীরই চাঁদ রয়েছে তা নয়। কিন্তু গ্যালিলিওর সবচেয়ে বড় গুরুত্ব এইখানে যে তিনিই প্রথম তথাকথিত *জড়তার সূত্র* (Laws of Inertia) গঠন করেন।

'সেটি কী?'

'গ্যালিলিও-র বয়ান অনুযায়ী বিষয়টি এ-রকম স্থিতিশীল বা গতিশীল কোনো বস্তুকে বাইরের কোনো শক্তি বাধা না করলে সেটি তার পূর্বাবস্থাতেই থাকে।'

'আপনি যা বলেন।'

'তবে এটা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা পর্যবেক্ষণ। পৃথিবী যে তার নিজের অক্ষের ওপর ঘুরছে এই বক্তব্যের বিরুদ্ধে প্রাচীন কাল থেকেই যে-সব যুক্তি শানানো হতো তার একটি প্রধান যুক্তি ছিল এই যে সেক্ষেত্রে পৃথিবী এতো জোরে ঘুরতো যে ঠিক ওপরের দিকে ছুঁড়ে দেয়া একটা ঢিল সেটিকে যেখান থেকে ছুঁড়ে দেয়া হয়েছে তার থেকে অনেক গজ দূরে পড়তো।'

'তা, কেন সেটি হয় না?'

'তুমি যদি ট্রেনে বসে নিচে একটা আপেল ফেলে দাও, ট্রেনটা চলছে বলে কিন্তু সেটি পেছনে পড়ে না। সেটি সোজা নিচের দিকে পড়ে যায়। এটা ঘটে জড়তার সূত্রের কারণে। আপেলটা পড়ার আগে সেটির ভেতর যে-গতি ছিল সেই গতিটি কিন্তু তুমি যখন সেটি ছেড়ে দাও তখনো সেটির ভেতর থেকেই যায়।'

'মনে হচ্ছে বুঝতে পারছি।'

'তো, গ্যালিলিওর সময়ে তো আর ট্রেন ছিল না। কিন্তু মেঝেতে একটা বল গড়াতে গড়াতে... হঠাৎ যদি সেটি ছেড়ে দাও...'

'...ওটা চলতেই থাকে...

'...কারণ তুমি ছেড়ে দেয়ার পরেও ওটার ভেতর আগের সেই গতি থেকে যায়।'

'কিন্তু ঘরটা যদি যথেষ্ট লম্বা হয় তাহলে বলটা তো শেষ পর্যন্ত একসময় থেমে যাবে।'

'তার কারণ হচ্ছে অন্যান্য শক্তি ওটার গতি ধীর করে ফেলে। প্রথমত, মেঝে,

বিশেষ করে সেটি যদি অমসৃণ কাঠের মেঝে হয়। তাছাড়া, মাধ্যাকর্ষণ শক্তি ওটাকে আগে হোক পরে হোক থামিয়ে দেবেই। কিন্তু দাঁড়াও, একটা জিনিস দেখাচ্ছি তোমাকে।'

উঠে পড়লেন অ্যালবার্টো নক্স, গিয়ে দাঁড়ালেন পুরনো ডেস্কটার কাছে। কিছু একটা বের করলেন তিনি একটা দেরাজ থেকে। নিজের জায়গায় ফিরে এসে তিনি কফি টেবিলের ওপর রাখলেন সেটি। দেখা গেল সেটি নিছক কাঠের বোর্ড একটা, এক দিকে কয়েক মিলিমিটার পুরু, অন্য দিকে পাতলা। প্রায় পুরো টেবিল জুড়ে বসা বোর্ডটার পাশে সবুজ একটা মার্বেল রাখলেন তিনি।

বললেন, 'এটা হলো একটা আনত তল, এবার যদি আমি এই মার্বেলটাকে এখানে, মানে, বোর্ডটা যেখানে সবচেয়ে পুরু সেখানে নিয়ে ছেড়ে দিই তাহলে কী ঘটবে বলতে পারো?'

হাল-ছাড়া একটা ভঙ্গি করে দীর্ঘশ্বাস ফেলল সোফি।

'দশ ক্রাউন বাজি ধরে বলতে পারি মার্বেলটা গড়িয়ে প্রথমে টেবিলের ওপর পড়বে, তারপর মেঝেতে।'

'দেখা যাক।'

অ্যালবার্টো মার্বেলটা ছেড়ে দিলেন আর সোফি যা বলেছিল ঠিক তাই করল সেটি। গড়িয়ে গিয়ে টেবিলের ওপর পড়ল, তারপর টেবিলের ওপর থেকে মেঝেতে পড়ল ছোট্ট ভোঁতা একটা শব্দ করে, তারপর শেষমেশ গিয়ে ধাক্কা খেল একটা দেয়ালের সঙ্গে।

'দারুণ!' বলে উঠল সোফি।

'হ্যাঁ, দারুণ-ই! গ্যালিলিও ঠিক এ-ধরনেরই পরীক্ষা করেছিলেন, বুঝলে।'

'তিনি কি অতোটাই নির্বোধ ছিলেন?'

'ধীরে! ধীরে! সবকিছু নিজের ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে পরীক্ষা করে দেখতে চেয়েছিলেন তিনি আর আমরাও তাই শুরু করেছি এইমাত্র। এবার আমাকে বলো, মার্বেলটা কেন ঢালু তল বেয়ে গড়িয়ে পড়ল।'

'ওটা ওজনে ভারি বলেই গড়িয়ে পড়েছিল।'

'ঠিক আছে। তা এই ওজন জিনিসটা ঠিক কী বলো তো, মেয়ে?'

'এটা কোনো প্রশ্ন হলো?'

'তুমি উত্তর দিতে পারছো না বলেই এটা প্রশ্ন হিসেবে খারিজ হয়ে যায় না। মার্বেলটা গড়িয়ে মেঝেতে পড়ে গেল কেন?'

'অভিকর্ষ বলের জন্য।'

'ঠিক, অথবা মাধ্যাকর্ষণ শক্তির জন্য। ওজনের সঙ্গে অভিকর্ষের একটা সম্পর্ক আছে। ওটা-র কারণেই মার্বেলটার মধ্যে গতির সঞ্চার হয়েছিল।'

ততক্ষণে অ্যালবার্টো মেঝে থেকে তুলে নিয়েছেন মার্বেলটি। সেটি হাতে নিয়ে আবার তিনি আনত তলটার ওপর ঝুঁকে দাঁড়িয়ে রইলেন।

'এবার আমি মার্বেলটিকে তল বরাবর আড়াআড়ি গড়িয়ে দেবার চেষ্টা করব, তিনি বললেন 'ভালো করে লক্ষ করো ওটা কীভাবে চলে।'

সোফি দেখল মার্বেলটির গতিপথ ধীরে ধীরে বেঁকে গেল আর শেষে মার্বেলটি ঢাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ল।

'কী হলো?' অ্যালবার্টো জিজ্ঞেস করলেন।

'মার্বেলটি বাঁকা পথে গড়িয়ে পড়ল কারণ বোর্ডটা বাঁকা।'

'এবার আমি মার্বেলটিকে কালো রং করে দিচ্ছি...হয়ত এরপরই আমরা পরীক্ষা করে দেখতে পাবো বাঁকা বলতে তুমি কী বোঝাচ্ছ।'

কালির ভেতর চোবানো একটা তুলি তুলে নিয়ে পুরো মার্বেলটিকে কালো রঙ করে দিলেন তিনি। তারপর সেটিকে আবার গড়িয়ে দিলেন। এবার সোফি দেখতে পেল ঠিক কোন পথ ধরে গড়িয়ে পড়ল মার্বেলটি, কারণ, বোর্ডের ওপর একটা কালো দাগ রেখে গেল সেটি।

'মার্বেলের গতিপথটাকে কীভাবে বর্ণনা করবে তুমি?'

'পথটা বাঁকা...দেখতে বৃত্তের একটা অংশের মতো।'

'একদম ঠিক বলেছো।'

অ্যালবার্টো সোফির দিকে চোখ তুলে তাকিয়ে ভুরু নাচালেন।

'অবশ্য ওটা ঠিক বৃত্ত নয়। এ-রকম ফিগারকে বলে অধিবৃত্ত।'

'তা বেশ।'

'কিন্তু মার্বেলটা ঠিক ওভাবে গড়িয়ে গেল কেন?

মন দিয়ে খানিকক্ষণ চিন্তা করল সোফি। তারপর বলল, 'তার কারণ, বোর্ডটা বাঁকা আর মার্বেলটিকে অভিকর্ষ বল মেঝের দিকে টানছিল।'

'ঠিক! ভাবো দেখি একবার ব্যাপারটা! পনেরোয়-ও পড়েনি এমন এক বালিকাকে আমি আমার চিলেকোঠায় ডেকে এনেছি আর সে একটা পরীক্ষার পরেই ঠিক তাই বুঝে গেছে যা গ্যালিলিও-ও বুঝতে পেরেছিলেন!'

হাত তালি দিয়ে উঠলেন তিনি। মুহূর্তের জন্য সোফির ভয় হলো অ্যালবার্টো পাগল হয়ে গেলেন কিনা। তিনি বলে চললেন 'একই বস্তুর ওপর দুটো *শক্তি* একই সঙ্গে কাজ করলে কী হয় ঠিক তাই দেখেছ তুমি। গ্যালিলিও আবিষ্কার করেছিলেন যে একই ঘটনা, এই যেমন ধরো কামানের গোলার ব্যাপারেও প্রযোজ্য। ওটাকে শূন্যে ছুঁড়ে দেয়া হলো, মাটির ওপর দিক উড়ে চলল সেটি, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেটি মাটিতেই নেমে আসবে। আনত তলের আড়াআড়ি পথ বরাবর মার্বেলটার পথের প্রতিতুলনায় এটা হচ্ছে কামানের গোলার ট্র্যাজেক্টরি বা আবক্র পথ। আর গ্যালিলিও-র সময় এটা ছিল একেবারে নতুন একটা আবিষ্কার। অ্যারিস্টটল মনে করতেন কোনো কিছুকে বাঁকাভাবে শূন্যে ছেড়ে দিলে সেটি একটা সামান্য বক্ররেখা তৈরি করবে, তারপর উল্লম্বভাবে মাটিতে পড়ে যাবে। আসলে তা হয় না, কিন্তু হাতে-কলমে ব্যাপারটা *দেখিয়ে দেয়ার* আগ পর্যন্ত কেউই জানত না যে অ্যারিস্টটল ভুল বলেছিলেন।'

'এ-সব কি তেমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু?'

'গুরুত্বপূর্ণ কিছু মানে? অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ, চোখ বুঁজে বাজি ধরতে পারো তুমি। বিষয়টার মহাবৈশ্বিক গুরুত্ব রয়েছে। মানব ইতিহাসের সমস্ত বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলোর মধ্যে এটাই নিঃসন্দেহে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।'

'আমি ঠিক জানি আপনি আমাকে বুঝিয়ে বলবেন, কেন।'

'এরপর এলেন ইংরেজ পদার্থবিদ *আইজাক নিউটন* (Isaac Newton), তাঁর জন্ম ১৬৪২ খ্রিস্টাব্দে, মৃত্যু ১৭২৭-এ। সৌরজগৎ আর গ্রহমণ্ডলীর কক্ষপথ সংক্রান্ত বিষয়ে শেষ বর্ণনাটি যোগ করলেন নিউটন। গ্রহগুলো সূর্যের চারপাশে কীভাবে ঘোরে সেটিই যে কেবল তিনি ব্যাখ্যা করতে পেরেছিলেন তা নয়, গ্রহগুলো কাজটা কেন করে সেটিও বুঝিয়ে বলতে পেরেছিলেন তিনি। কাজটা তিনি করতে পেরেছিলেন, আমরা যাকে গ্যালিলিওর গতিবিদ্যা বলি, অংশত সেটির সাহায্য নিয়ে।'

'গ্রহগুলো কি তাহলে একটা আনত তলের ওপর রাখা মার্বেল?'

'খানিকটা তাই। কিন্তু, একটু দাঁড়াও, সোফি।'

'তাছাড়া আমার আর কী-ই বা করার আছে?'

'কেপলার এর আগেই মন্তব্য করেছিলেন যে গ্রহ-নক্ষত্র বা স্বর্গীয় বস্তুগুলোর পরস্পরকে আকর্ষণের পেছনে একটা শক্তি নিশ্চয়ই কাজ করছে। যেমন ধরো, গ্রহগুলোকে তাদের কক্ষপথে আটকে রাখার জন্য নিশ্চয়ই কোনো সৌরশক্তি কাজ করছে। তাছাড়া, সূর্যের কাছ থেকে গ্রহগুলো যতই দূরে যেতে থাকে, ততোই তাদের গতি কেন ধীর হয়ে আসে এই ব্যাপারটির ব্যাখ্যাও পাওয়া যায় এই সৌরশক্তির সাহায্যে। কেপলার আরও বিশ্বাস করতেন, স্রোতের বাড়া-কমা, সমুদ্রপৃষ্ঠের ওঠা-নামা নিশ্চয়ই চান্দ্রশক্তির কারণে ঘটে।'

'কথাটা তো সত্যি।'

'হ্যাঁ, সত্যি। কিন্তু গ্যালিলিও আবার এই তত্ত্বটাকে নাকচ করে দিয়েছিলেন। চাঁদ পানিকে শাসন করে বলে কেপলার মনে করেছেন, এই কথা ভেবে গ্যালিলিও উপহাস করেছেন তাঁকে। গ্যালিলিও যে কেপলারের এই তত্ত্বটিকে নাকচ করেছিলেন তার কারণ গ্যালিলিও এ-কথা বিশ্বাস করতেন না যে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি অনেক দূর থেকে কাজ করতে পারে, সেই সঙ্গে গ্রহ-নক্ষত্রগুলোর মধ্যেও কাজ করতে পারে।'

'তিনি তাহলে এইখানটায় ভুল করেছিলেন।'

'হ্যাঁ। এই একটা বিশেষ ক্ষেত্রে ভুল করেছিলেন তিনি। ব্যাপারটা কিন্তু বেশ মজার আসলে, তার কারণ পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আর পড়ন্ত বস্তুই ছিল তাঁর ধ্যান-জ্ঞান। তিনি এমনকি এটাও দেখিয়ে দিয়েছিলেন বর্ধিত শক্তি কী করে কোনো বস্তুর গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।'

'কিন্তু আপনি তো নিউটনের কথা বলেছিলেন।'

'হ্যাঁ, এরপরই এলেন নিউটন। তিনি তৈরি করলেন আমরা যাকে বলি *সার্বজনীন মাধ্যাকর্ষণ সূত্র*। এই সূত্র অনুযায়ী, প্রতিটি বস্তু অন্য প্রতিটি বস্তুকে এমন এক শক্তি দিয়ে আকর্ষণ করে যে-শক্তি বস্তুগুলোর আকার অনুপাতে বাড়ে, আবার সেগুলোর মধ্যকার দূরত্বের অনুপাতে কমে।'

'আমার মনে হয় আমি বুঝতে পারছি। যেমন ধরুন, দুটো ইঁদুরের মধ্যে যে-আকর্ষণ তারচেয়ে দুটো হাতির মধ্যেকার আকর্ষণ বেশি। অন্যদিকে আবার, একই চিড়িয়াখানায় থাকা দুটো হাতির মধ্যেকার আকর্ষণ ভারতে একটা ভারতীয় হাতি আর আফ্রিকায় একটা আফ্রিকান হাতির মধ্যেকার আকর্ষণের চেয়ে বেশি।'

'বোঝা গেল ব্যাপারটা তুমি ধরতে পেরেছ। তো, এবার আসছে আসল ব্যাপার। নিউটন প্রমাণ করলেন যে এই আকর্ষণ-বা মাধ্যাকর্ষণ-সার্বজনীন, যার অর্থ এটা সব জায়গাতেই ক্রিয়াশীল, মহাশূন্যে গ্রহ-নক্ষত্রগুলোর মধ্যেও। বলা হয়ে থাকে যে, তিনি এই ধারণাটি পেয়েছিলেন একটা আপেল গাছের নিচে বসে থাকা অবস্থায়। একটি আপেলকে গাছ থেকে পড়তে দেখে তিনি ভাবলেন চাঁদকেও পৃথিবী একই শক্তিতে আকর্ষণ করে কিনা এবং এই কারণেই চাঁদ চিরকাল পৃথিবীর চারপাশ দিয়ে ঘুরে চলেছে কিনা।'

'দারুণ। কিন্তু ততটা দারুণ নয় আসলে।'

'কেন নয়, সোফি?'

'যে-শক্তির কারণে আপেলটা মাটিতে পড়ে সেই শক্তি দিয়ে যদি পৃথিবী চাঁদকে আকর্ষণ করে তাহলে সারা জীবন পৃথিবীর চারপাশে ঘোরার বদলে একদিন সেটি নিশ্চয়ই পৃথিবীর ওপর আছাড় খেড়ে পড়বে।

'এইখানেই আসছে গ্রহ-উপগ্রহের কক্ষপথ সংক্রান্ত নিউটনীয় সূত্রের কথা। সেটি কী করে চাঁদকে আকর্ষণ করে সে-ব্যাপারে তোমার কথা শতকরা পঞ্চাশ ভাগ সঠিক, পঞ্চাশভাগ ভুল। চাঁদ কেন পৃথিবীর গায়ের ওপর পড়ে যায় না? পৃথিবীর যে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি চাঁদকে আকর্ষণ করছে সেটি তো আসলেই প্রচণ্ড। স্রেফ একবার চিন্তা করে দেখো সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা জোয়ারের সময় এক থেকে দুই মিটার বাড়াবার জন্য কত শক্তি দরকার।'

'বুঝতে পারছি বলে মনে হচ্ছে না।'

'গ্যালিলিও-র সেই আনত তলের কথা মনে করো। আড়াআড়িভাবে ওটার ওপর মার্বেলটা গড়িয়ে দেয়ার পর কী ঘটেছিল?'

'চাঁদের ওপরেও কি দুটো ভিন্ন শক্তি কাজ করছে?'

'ঠিক তাই। সৌরজগতের যখন জন্ম বা সৃষ্টি হয়েছিল তখন চাঁদ পৃথিবী থেকে বাইরের দিকে প্রচণ্ড শক্তিতে ছিটকে পড়েছিল। এই শক্তিটি চিরকালই কার্যকর থাকবে তার কারণ চাঁদটা বাধাশূন্য একটা খোলা জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছে...'

'কিন্তু পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির জন্য তো চাঁদটা পৃথিবীর দিকেও টান অনুভব করে, তাই না?'

'ঠিক তাই। দুটো শক্তিই নিত্য আর দুটোই ঠিক একই সঙ্গে কাজ করে। কাজেই চাঁদ পৃথিবীর চারপাশে আবর্তন করেই যাবে।'

'ব্যাপারটা কি এতোই সরল?'

'এতোই সরল আর বিশেষ করে এই সরলতা-ই ছিল নিউটনের সার কথা। তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন যে অল্প কিছু প্রাকৃতিক নিয়ম গোটা মহাবিশ্বেই ক্রিয়াশীল। গ্রহগুলোর কক্ষপথ সংক্রান্ত হিসেব নিকেশের সময় তিনি স্রেফ দুটো প্রাকৃতিক নিয়ম-এর সাহায্য নিয়েছেন যে-নিয়ম দুটি তাঁর আগেই গ্যালিলিও প্রস্তাব করে গিয়েছিলেন। তার একটা হচ্ছে জড়তার সূত্র আর সেটিকে নিউটন বর্ণনা করলেন এভাবে 'একটি বস্তুর ওপর কোনো বল বা শক্তি প্রয়োগ করা না হলে সেটি স্থির থাকে অথবা সরলরেখা বরাবর চলতে থাকে।' অন্য সূত্রটি গ্যালিলিও একটি আনত তলের ওপর পরীক্ষা করে

দেখিয়ে গিয়েছিলেন 'যখন দুটো শক্তি বা বল একটি বস্তুর ওপর একই সঙ্গে কাজ করে তখন সেটি একটি উপবৃত্তাকার পথে চলে।'

'তাহলে এভাবেই নিউটন ব্যাখ্যা করতে পারলেন কেন গ্রহগুলো সূর্যের চারপাশে ঘোরে।'

'হ্যাঁ। সবকটি গ্রহ সূর্যের চারপাশে উপবৃত্তাকার পথে ঘোরে দুটো অসম গতির কারণে প্রথমত, সৌরজগৎ যখন গঠিত হয়েছিল তখন পাওয়া ওদের সরলরৈখিক গতি আর দ্বিতীয়ত, মাধ্যাকর্ষণজনিত কারণে সূর্যের দিকে গতি।'

'দারুণ!'

'নিউটন দেখিয়ে দিলেন যে গোটা মহাবিশ্বেই চলন্ত বস্তুর একই সূত্র প্রযোজ্য। কাজেই, মধ্যযুগীয় যে-বিশ্বাস ছিল যে স্বর্গের জন্য এক সেট সূত্র রয়েছে ওদিকে পৃথিবীর জন্য রয়েছে আরেক সেট, সেটির সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করলেন তিনি। বিশ্ব সম্পর্কে সূর্যকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি এভাবে তার চরম নিশ্চিতি লাভ করল, পেল তার চরম ব্যাখ্যা।'

অ্যালবার্টো উঠে আনত তলাটা সরিয়ে রাখলেন। তারপর মার্বেলটি নিয়ে সেটিকে রাখলেন তাদের দু'জনের মধ্যকার টেবিলের ওপর।

সোফি ভাবল, স্রেফ একটা বাঁকা কাঠের খণ্ড আর মার্বেল থেকে তারা কত কিছুই না বের করে আনল। এখনো কালি লেগে থাকা সবুজ মার্বেলটির দিকে তাকিয়ে সে পৃথিবী নামক গোলকটার কথা চিন্তা না করে পারল না। সে বলল, 'তাহলে মানুষকে এ-কথা মেনে নিতে হলো যে তারা মহাশূন্যের কোথাও আর দশটা গ্রহের মতো একটা গ্রহে বাস করছে?'

'হ্যাঁ, তবে নতুন এই বিশ্বচিত্রটা অনেক দিক থেকেই একটা সমস্যা হয়ে দেখা দিল। মানব জাতির উদ্ভব হয়েছে জীব-জন্তু থেকে, ডারউইন যখন এ-কথা প্রমাণ করেছিলেন তখন যে-ধরনের পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল এই পরিস্থিতিটাও অনেকটা সে-রকম হয়ে দাঁড়াল। সৃষ্টি জগতে মানুষের যে একটা বিশেষ মর্যাদা ছিল এই দুই ক্ষেত্রেই তার খানিকটা ক্ষুণ্ন হলো। আর, এই দুই ক্ষেত্রেই প্রবল বাধা এলো খ্রিস্টীয় গির্জার কাছ থেকে।'

'সেটি আমি বেশ ভালোই বুঝতে পারছি। কারণ, এ-সবের মধ্যে আর ঈশ্বরের ভূমিকাটা রইল কোথায়? পৃথিবী যখন কেন্দ্রে ছিল, ঈশ্বর আর গ্রহগুলো স্বর্গে বা ওপরে, তখনই ব্যাপারটা এখনকার চেয়ে সহজ-সরল ছিল।'

'কিন্তু সেটিই কিন্তু সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ ছিল না। নিউটন যখন প্রমাণ করলেন যে মহাবিশ্বের সব জায়গাতেই একই প্রাকৃতিক নিয়ম বা সূত্র কাজ করে তখন যে-কারও পক্ষে এ-কথা ভাবা সম্ভব ছিল যে এতে করে তিনি ঈশ্বরের সর্বশক্তিমানতায় মানুষের বিশ্বাসকে খর্ব করছেন। কিন্তু নিউটনের নিজের বিশ্বাস কিন্তু এতটুকু ধাক্কা খায়নি। প্রাকৃতিক নিয়ম বা সূত্রগুলোকে তিনি সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ হিসেবেই ধরে নিয়েছিলেন। তবে এটা হতে পারে যে মানুষ নিজেকে যে চোখে দেখতো সেখানে একটা গণ্ডগোল ঘটে গিয়েছিল।'

'ঠিক কীভাবে?'

'রেনেসাঁ-র সময় থেকেই একটা বিশাল গ্যালাক্সির আর দশটা গ্রহের মতো একটা গ্রহের বাসিন্দা হিসেবে নিজেদেরকে গণ্য করায় অভ্যস্ত হয়ে উঠতে হয়েছিল মানুষকে। আমি ঠিক নিশ্চিত নই এখনো আমরা সবাই ব্যাপারটা মেনে নিতে পেরেছি কিনা। তবে সেই রেনেসাঁ-র সময়েই কিন্তু কিছু লোক বলেছিল যে এই নতুন দৃষ্টিভঙ্গির ফলে প্রতিটি মানুষই আগের চেয়ে আরও বেশি করে কেন্দ্রীয় অবস্থানে চলে এসেছে।'

'ঠিক বুঝলাম না।'

'আগে পৃথিবী-ই ছিল জগতের কেন্দ্র। কিন্তু জ্যোতির্বিদরা এবার যে-ই বললেন যে মহাবিশ্বের পরম কোনো কেন্দ্র নেই, লোকে ভাবতে লাগল যে তাহলে যত জন মানুষ ততগুলোই কেন্দ্র। প্রতিটি মানুষই তাহলে মহাবিশ্বের কেন্দ্র হতে পারে।'

'ও, বুঝেছি।'

'রেনেসাঁ জন্ম দিল এক নতুন *ধর্মভাব* (new religiosity)-এর। দর্শন এবং বিজ্ঞান ধীরে ধীরে ঈশ্বরতত্ত্ব থেকে দূরে সরে যেতে এক নতুন খ্রিস্টীয় ধার্মিকতা তৈরি হয়েছিল। এরপর রেনেসাঁ এলো মানুষ সম্পর্কে তার নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে। এর প্রভাব পড়ল গিয়ে জীবনের ওপর। ঈশ্বরের সঙ্গে একজন মানুষের ব্যক্তিগত সম্পর্ক এখন অনেক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠল মানুষের সঙ্গে একটি সংগঠন হিসেবে গির্জার সম্পর্কের চাইতে।'

'এই যেমন রাতের বেলা প্রার্থনা করা, তাই না?'

'হ্যাঁ, সেটিও। মধ্যযুগীয় ক্যাথলিক চার্চে লাতিন ভাষায় লেখা গির্জার প্রার্থনা-বিধি আর গির্জার শাস্ত্রীয় আচার মাফিক প্রার্থনা-ই ছিল ধর্মোপাসনা অনুষ্ঠানের মেরুদণ্ড। পাদ্রি আর সন্ন্যাসীরাই কেবল বাইবেল পড়তেন, তার কারণ লাতিন ছাড়া অন্য কোনো ভাষায় লেখা বাইবেলের অস্তিত্ব ছিল না। কিন্তু রেনেসাঁ-র সময় হিব্রু আর গ্রিক ভাষা থেকে বিভিন্ন জাতীয় ভাষায় বাইবেল অনূদিত হয়। আমরা যাকে *রিফর্মেশন* বলি তার মূল ব্যাপারটি ছিল এই...'

'মার্টির লুথার...'

'হ্যাঁ, মার্টিন লুথারও (Martin Luther) গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু তিনিই একমাত্র সংস্কারক ছিলেন না। যাজকীয় কিছু সংস্কারকও ছিলেন যাঁরা রোমান ক্যাথলিক চার্চের সঙ্গেই থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তাঁদের একজন হলেন *রটারডামের ইরাজমাস* (Erasmus of Rotterdam)।'

'ইন্ডালজেন্স কিনতে রাজি ছিলেন না বলে ক্যাথলিক চার্চ থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন লুথার, ঠিক বলিনি?'

'হ্যা, সেটি ছিল অনেক কারণের একটা কারণ। কিন্তু তারচেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ একটা কারণ ছিল। লুথারের মতে, ঈশ্বরের ক্ষমা পাওয়ার জন্য গির্জা কিংবা গির্জার পাদ্রিদের মধ্যস্থতা মানুষের দরকার নেই। তাছাড়া গির্জা থেকে 'ইন্ডালজেন্স' (indulgence) কেনার ওপরেও ঈশ্বরের ক্ষমা পাওয়া নির্ভর করে না। ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকেই এ-সব ইন্ডালজেন্স কেনাবেচা নিষিদ্ধ ঘোষণা করে ক্যাথলিক চার্চ।'

'ঈশ্বর নিশ্চয়ই তাতে খুশি হয়েছিলেন।'

'মোটের ওপর, মধ্যযুগের যাজকীয় ইতিহাস-নির্ভর বেশকিছু ধর্মীয় প্রথা ও

রীতিনীতি থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে এনেছিলেন লুথার। তিনি ফিরে যেতে চেয়েছিলেন আদি খ্রিস্টধর্মে, নিউ টেস্টামেন্টে যেমনটা লেখা আছে তাতে। তিনি বললেন, 'শুধু বাইবেল-ই যথেষ্ট।' এই স্লোগানের সাহায্যে তিনি খ্রিস্টধর্মের উৎসে ফিরে যেতে চাইছিলেন। ঠিক যেমন রেনেসাঁর মানবতাবাদীরা ফিরে যেতে চাইছিলেন শিল্পকলা এবং সংস্কৃতির প্রাচীন উৎসে। লুথার জার্মান ভাষায় বাইবেল অনুবাদ করলেন এবং এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হলো জার্মান লেখ্য ভাষা। তিনি বিশ্বাস করতেন, প্রতিটি মানুষেরই বাইবেল পড়তে পারা উচিত, যাতে করে প্রত্যেকেই নিজের পাদ্রি হতে পারে।'

'নিজের পাদ্রি? ব্যাপারটা একটু বেশি হয়ে গেল না?'

'তিনি যা বোঝাতে চেয়েছিলেন তা হলো ঈশ্বর-সম্পৃক্ত ব্যাপারে পাদ্রিদের সে-রকম কোনো সুবিধাজনক অবস্থান নেই। লুথারান ধর্মসভায় পাদ্রিরা কেবল ব্যবহারিক কাজ-কর্ম করার জন্য নিয়োজিত হতেন, যেমন ধর্মসভা পরিচালনা করা বা দৈনন্দিন করণিক কাজগুলো সম্পাদন করা। কিন্তু গির্জায় ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন করে কেউ ঈশ্বরের ক্ষমা লাভ করে বা পাপমুক্ত হয় সে-কথা লুথার বিশ্বাস করতেন না। তিনি বলতেন, মানুষ "নিঃশর্ত ক্ষমা বা মোক্ষলাভ করে কেবল বিশ্বাসের মাধ্যমে।" আর এই বিশ্বাসে তিনি উপনীত হয়েছিলেন বাইবেল পড়ে।'

'লুথার তাহলে আদর্শ রেনেসাঁ মানব ছিলেন?'

'হ্যাঁ এবং না। ব্যক্তি আর ব্যক্তির সঙ্গে ঈশ্বরের ব্যক্তিগত সম্পর্কের ওপর গুরুত্ব প্রদান তাঁর একটি রেনেসাঁ বৈশিষ্ট্যসূচক দিক। সেজন্য তিনি পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে গ্রিকভাষা শিখে প্রাচীন গ্রিক ভাষায় লেখা বাইবেল জার্মান ভাষায় অনুবাদ করার পরিশ্রমসাধ্য কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন। যার যার মাতৃভাষাকে লাতিনের ওপর অগ্রাধিকার দেয়ার বিষয়টিও রেনেসাঁ-র একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ দিক। কিন্তু লুথার ঠিক ফিসিনো বা *লিওনার্দো দা ভিঞ্চি*-র (Leonardo da Vinci) মতো মানবতাবাদী ছিলেন না। রটারডামের ইরাজমাসের মতো মানবতাবাদীরা লুথারের বিরুদ্ধাচারণ করেছিলেন, তার কারণ তাঁরা মনে করতেন মানুষ সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি অনেক নেতিবাচক; লুথার ঘোষণা করেছিলেন যে মোক্ষলাভের অধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়ার পর (Fall from Grace) থেকে মানবজাতি পুরোপুরি নীতিভ্রষ্ট হয়ে পড়েছে। তিনি বিশ্বাস করতেন, কেবলমাত্র ঈশ্বরের অনুগ্রহের মাধ্যমেই মানবজাতি তার আগের রূপে ফিরে আসতে পারে। কারণ পাপের প্রাপ্য হচ্ছে মৃত্যু।'

'এটাতো কেমন মন-খারাপ-করা কথা হয়ে গেল।'

উঠে দাঁড়ালেন অ্যালবার্টো নক্স। ছোট, সবুজ-কালো মার্বেলটা তুলে নিয়ে সেটি নিজের টপ পকেটে রাখলেন তিনি।

'চারটার বেশি বাজে!' আতঙ্কিত স্বরে বলে উঠল সোফি।

'মানুষের ইতিহাসে এরপরের বড় যুগটা হলো বারোক (Baroque) যুগ। কিন্তু সেটি অন্য কোনো দিনের জন্য তোলা থাকল, প্রিয় হিল্ডা আমার।'

'কী বললেন আপনি?' যে-চেয়ারে বসে ছিল সে সেখান থেকে তড়াক করে লাফিয়ে উঠল সোফি। 'আপনি আমাকে হিল্ডা বলে ডেকেছেন!'

'ওটা একটা মারাত্মক স্লিপ অভ দ্য টাং!'

'স্লিপ অভ দ্য টাং কিন্তু কখনোই একেবারে অকারণে হয় না!'

'হয়ত তোমার কথাই ঠিক। খেয়াল করেছ নিশ্চয়ই যে হিল্ডার বাবা আমাদের মুখে কথা বসিয়ে দিতে শুরু করেছে। আমার মনে হয় আমরা যে খুব উদ্বিগ্ন হয়ে উঠছি আর আমাদেরকে রক্ষা করার তেমন একটা চেষ্টা করছি না, সে এই ব্যাপারটিরই সুযোগ নিচ্ছে।'

'আপনি একবার বলেছিলেন আপনি হিল্ডার বাবা নন। কথাটা কি আসলেই সত্যি?'

অ্যালবার্টো মাথা ঝাঁকালেন।

'কিন্তু আমি কি হিল্ডা?'

'আমি ক্লান্ত বোধ করছি, সোফি। তোমাকে সেটি বুঝতে হবে। দুই ঘন্টারও বেশি সময় ধরে এখানে বসে রয়েছি আমরা। আর কথাবার্তার বেশির ভাগটা বলছি আমি-ই। তুমি বাসায় যাবে না, খাবে না?'

সোফির মনে হলো অ্যালবার্টো তাকে এক রকম তাড়িয়েই দিচ্ছেন। ছোট্ট হলঘরটায় ঢোকার পর সে খুব করে ভাবল উনি কেন ওই ভুলটা করলেন। অ্যালবার্টো-ও সোফির পিছু পিছু বেরিয়ে এলেন।

ছোট এক সারি খুঁটির ওপর অদ্ভুত কিছু কাপড়-চোপড় ঝুলছে, দেখতে সেগুলো অনেকটা থিয়েটারি পোশাকের মতো; তো, সেই খুঁটিগুলোর নিচে গভীর ঘুমে মগ্ন হার্মেস। কুকুরটার দিকে মাথা ঝাঁকিয়ে অ্যালবার্টো বললেন,

'ও গিয়ে তোমাকে নিয়ে আসবে।'

'আমার আজকের পড়াটার জন্য ধন্যবাদ,' সোফি বলল।

আন্তরিকভাবে আলিঙ্গন করল সে অ্যালবার্টোকে। 'আমার দর্শন শিক্ষকদের মধ্যে আপনিই সবচেয়ে ভালো আর সবচেয়ে সহানুভূতিশীল।' বলল সে।

এই কথা বলে সিঁড়ির দরজা মেলে ধরল সে। দরজা বন্ধ হতে হতে সে শুনতে পেলো অ্যালবার্টো বলে উঠেছেন, 'শিগ্‌গিরই আবার দেখা হবে আমাদের, হিল্ডা।'

ওই কথাগুলো নিয়েই চলে এলো সোফি।

আরেকটা স্লিপ অভ্ দ্য টাং। পাঁজি! একবার তার খুব ইচ্ছে হলো ঘুরে দাঁড়িয়ে দড়াম দড়াম করে ঘা লাগায় দরজায়, কিন্তু কী একটা যেন কাজটা থেকে নিবৃত্ত করল তাকে।

রাস্তায় পৌঁছে তার খেয়াল হলো পকেটে তার একটা পয়সাও নেই। পুরো পথটা এখন হেঁটে যেতে হবে তাকে। কী বিরক্তিকর! ছ'টার মধ্যে পৌঁছাতে না পারলে তার মা তো নির্ঘাত রেগে যাবেনই, চিন্তাও করবেন।

কয়েক গজও যেতে পারেনি সে এমন সময় সাইডওয়াকের ওপর হঠাৎ একটা পয়সা পড়ে থাকতে দেখল সে। দশ ক্রাউনের পয়সা; বাসের টিকিট কিনতে ঠিক দশ ক্রাউনই লাগবে।

বাস স্টপের দিকে পা চালাল সোফি, তারপর মেইন স্কোয়্যারের বাসের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। ওখান থেকে একই টিকিট দেখিয়ে সে আরেকটা বাসে চড়ে

প্রায় তাদের বাড়ির দরজা পর্যন্ত পৌঁছে যেতে পারবে।

মেইন স্কোয়্যারে দাঁড়িয়ে দ্বিতীয় বাসটার জন্য অপেক্ষা করার আগ পর্যন্ত তার মাথায় এই চিন্তাটা এলো না যে তার যে-পয়সাটা দরকার ছিল ঠিক সেটিই সে কেন পেয়ে গেল বরাত জোরে।

তাহলে কি হিল্ডার বাবাই পয়সাটা রেখে গিয়েছিলেন পথের ওপর? সবচেয়ে সুবিধাজনক জায়গায় জিনিসপত্র রেখে দেয়ার ব্যাপারে অবশ্য লোকটা একটা প্রতিভা।

কিন্তু তিনি যদি লেবাননে থাকেন তাহলে কাজটা তাঁর পক্ষে কী করে সম্ভব?

তাছাড়া, অ্যালবার্টো-ই বা ওই ভুলটা করলেন কেন? একবার না, দু'বার।

কেঁপে উঠল সোফি। মনে হলো, শিরদাঁড়া বেয়ে একটা ঠাণ্ডা স্রোত নিচে নেমে গেল তার।

বা রো ক

যুগ

...স্বপ্ন গড়া যা দিয়ে...

বেশ কদিন অ্যালবার্টোর আর কোনো সাড়াশব্দ পেল না সোফি, কিন্তু হার্মেসের দর্শনলাভের আশায় প্রায়ই বাগানে উঁকি মেরেছে সে। মাকে সে বলেছে কুকুরটা নিজেই নিজের পথ খুঁজে বাড়ি ফিরে গিয়েছিল আর সেটির মালিক, পদার্থবিদ্যার এক প্রাক্তন শিক্ষক, সোফিকে তাঁর বাড়িতে নেমন্তন্ন করেছিলেন। তিনি তাকে ষোড়শ শতাব্দীতে জন্ম নেয়া বিজ্ঞান আর সৌরজগৎ সম্পর্কে অনেক কথা বলেছেন।

জোয়ানাকে অবশ্য সোফি আরও অনেকটা বলল। অ্যালবার্টোর সঙ্গে তার সাক্ষাৎ, ডাকবাক্সের পোস্টকার্ড আর বাড়ি ফেরার পথে কুড়িয়ে পাওয়া দশ ক্রাউনের পয়সা, এগুলোর সবই তাকে বলল সে। হিল্ডাকে নিয়ে দেখা স্বপ্ন আর ক্রুশবিদ্ধ যিশুর সেই সোনার মূর্তিটার কথা অবশ্য চেপে গেল সে।

২৯ মে, মঙ্গলবার সোফি রান্নাঘরে দাঁড়িয়ে বাসন-কোসন ধুচ্ছিল। তার মা টিভির খবর শোনার জন্য আগেই বসার ঘরে গিয়ে হাজির হয়েছিলেন। ওপেনিং থিমটা মিলিয়ে যাওয়ার পর রান্নাঘর থেকেই সে শুনতে পেল যে বোমার আঘাতে নরওয়েজীয় জাতিসংঘ বাহিনীর এক মেজর নিহত হয়েছেন।

টেবিলের ওপর বাসন-কোসন মোছার কাপড়টা ছুঁড়ে ফেলে ছুটে চলে এলো সে বসার ঘরে। জাতিসংঘ বাহিনীর অফিসারটির মুখটা কয়েক সেকেন্ডের জন্য দেখতে পেল সে দৌড়ে এসে, তারপরেই অন্য খবরে চলে গেল ওরা।

সোফি চেঁচিয়ে উঠল, 'না!'

তার মা ঘুরে তাকালেন সোফির দিকে।

'হ্যাঁ, যুদ্ধ বড়ো ভয়ঙ্কর ব্যাপার!'

কান্নায় ভেঙে পড়ল সোফি।

'কিন্তু সোফি, অতোটা খারাপ কিছু তো দেখায়নি।'

'ওরা কি লোকটার নাম বলেছে?'

'বলেছে, কিন্তু আমার মনে পড়ছে না। তবে গ্রিমস্ট্যাডের লোক সম্ভবত।'

'লিলেস্যান্ড আর গ্রিমস্ট্যাড, একই তো হলো।'

'মোটেই না, কী যা তা বলছিস!'

'কারও বাড়ি গ্রিমস্ট্যাডে হলে সে কি লিলেস্যান্ডের স্কুলে যেতে পারে না?'

সোফি কান্না থামিয়েছে, কিন্তু তার মা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন। চেয়ার থেকে উঠে টিভিটা বন্ধ করে দিলেন তিনি।

'এ-সব কী হচ্ছে, সোফি?'

'কিছু না।'

'আলবৎ কিছু হচ্ছে। তোর একজন বয়ফ্রেন্ড আছে আর আমার সন্দেহ হচ্ছে সে তোর চেয়ে বয়সে অনেক বড়। এবার আমার কথার জবাব দে লেবাননের কোনো লোককে তুই চিনিস?'

'না, ঠিক সে-রকম না...'

'লেবাননে থাকে এমন কারও *ছেলের* সঙ্গে তোর পরিচয় হয়েছে?'

'না, হয়নি। এমনকি তার মেয়ের সঙ্গেও পরিচয় হয়নি আমার।'

'কার মেয়ে?'

'তা জেনে তোমার দরকার নেই।'

'আমার মনে হয় আছে।'

'এবার বরং আমি তোমাকে কিছু প্রশ্ন করি। বাবা কেন কখনোই বাড়ি আসে না? সেটি কি এই জন্য যে ডিভোর্স নেবার সাধ্য হয়নি তোমার? হয়ত তোমার কোনো বয়ফ্রেন্ড আছে যার কথা আমি আর বাবা জানি তা তুমি চাও না, ইত্যাদি ইত্যাদি। আমার নিজেরই প্রশ্ন আছে একগাদা।'

'আমার মনে হয় আমাদের দু'জনের মধ্যে একটা আলাপ হওয়া দরকার।'

'তা হয়ত, কিন্তু এই মুহূর্তে আমি খুব ক্লান্ত, আমি শুতে যাচ্ছি। তাছাড়া আমার পিরিয়ড শুরু হয়েছে।'

দৌড়ে নিজের ঘরে চলে গেল সোফি। তার মনে হলো সে কেঁদে ফেলবে।

বাথরুমের কাজ-টাজ সেরে সে যখন চাদর গায়ে দিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়েছে, তার মা এসে ঢুকলেন সোফির শোবার ঘরে।

সোফি ভান করল সে ঘুমিয়ে পড়েছে, যদিও জানে তার মা সে-কথা বিশ্বাস করবেন না। সোফি এ-ও জানে যে তার মা জানেন যে সোফি জানে তার মা তা বিশ্বাস করবেন না। তারপরেও তার মা ভান করলেন তিনি বিশ্বাস করেছেন যে সোফি ঘুমিয়ে পড়েছে। তার বিছানার এক প্রান্তে বসলেন তিনি, হাত বুলিয়ে দিতে থাকলেন মেয়ের চুলে।

এদিকে সোফি ভাবছে একই সঙ্গে দুটো জীবনযাপন করা কী কঠিন। দর্শন কোর্সটা কবে শেষ হবে সে-কথা চিন্তা করতে লাগল সে। হয়ত তার জন্মদিন আসতে আসতেই বা অন্তত পক্ষে মিডসামার ঈভ্-এ যখন হিল্ডার বাবা লেবানন থেকে ফিরে আসবেন তখন শেষ হবে কোর্সটা।

'একটা বার্থ ডে পার্টি করতে চাই আমি,' হঠাৎ বলে উঠল সে।

'সে তো খুব ভালো কথা। কাকে কাকে দাওয়াত করবি?'

'অনেককে । পারবো না?'

'পারবি না কেন? আমাদের বাগানটা তো বেশ বড়। আশা করছি আবহাওয়া ভালো-ই থাকবে তখনো।'

'পার্টিটা আমি মিডসামার ঈভ্-এর সময় করবো কিন্তু।'

'বেশ তো, তাই হবে।'

'দিনটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ,' সোফি বলল, অবশ্য শুধু যে তার জন্মদিনটার কথা মাথায় রেখে তা নয়।

'তা তো বটেই।'

'আমার মনে হচ্ছে গত ক'দিনে অনেক বড় হয়ে গেছি আমি।'

'সেটি তো ভালোই, তাই না?'

'ঠিক জানি না।'

মাথাটা বালিশের মধ্যে ডুবিয়ে দিয়ে কথা বলছিল সোফি। এবার তার মা বলে উঠলেন, 'সোফি, একটা কথা আমাকে তোর বলতেই হবে; তোকে এমন অস্থির, ভারসাম্যহীন লাগছে কেন ইদানীং!'

'তোমার বয়স যখন পনেরো ছিল তখন তুমিও এ-রকমই ছিলে না, বলো?'

'হয়তো। কিন্তু তুই ঠিকই বুঝতে পারছিস আমি কী বলতে চাইছি।'

হঠাৎ মায়ের দিকে মুখ ফেরাল সোফি। বলল, 'কুকুরটার নাম হার্মেস।'

'তাই?'

'অ্যালবার্টো নামের এক লোকের কুকুর ওটা।'

'আচ্ছা।'

'সেই ওল্ড টাউনে বাসা তাঁর।'

'কুকুরটার সঙ্গে তুই অত দূরে গিয়েছিলি?'

'এর মধ্যে তো বিপদের কিছু নেই।'

'তুই বলেছিস কুকুরটা প্রায়ই আসে এখানে।'

'বলেছি বুঝি?'

একটু ভাবতে হলো তাকে এবার। যতটুকু সম্ভব ততটুকুই বলে ফেলতে চায় সে, কিন্তু তাই বলে সবটা বলা সম্ভব নয়।

'তুমি তো বাড়িতে প্রায় থাকোই না,' সাহস করে বলে ফেলল সোফি।

'তা অবশ্য, নানান কাজে ব্যস্ত থাকতে হয় আমাকে।'

'অ্যালবার্টো আর হার্মেস বেশ ক'বার এসেছে এখানে।'

'কেন? ওরা কি এই বাসাতেও এসেছে?'

'একবারে একটা প্রশ্ন করতে পারো না বুঝি তুমি? এই বাসায় আসেনি। কিন্তু ওরা বনের মধ্যে হাঁটতে যায় প্রায়ই। এর মধ্যে নিশ্চয়ই রহস্যজনক কিছু নেই?'

'না, না, তা নেই।'

'ওরা যখন হাঁটতে যায় তখন অন্য যে কারও মতোই আমাদের গেটটার পাশ দিয়ে চলে যায়। একদিন স্কুল থেকে ফেরার সময় কুকুরটার সঙ্গে কথা বলেছিলাম আমি। এভাবেই অ্যালবার্টোর সঙ্গে পরিচয় আমার।'

'সেই সাদা খরগোশ আর ওই সব ব্যাপার কী?'

'অ্যালবার্টোই বলেছিলেন আমাকে ওসবের কথা। উনি সত্যিই একজন দার্শনিক, বুঝলে? তিনি আমাকে সব দার্শনিকের কথা বলেছেন।'

'ওভাবে, বেড়ার কাছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে?'

'তিনি আমাকে চিঠিও লিখেছেন। সত্যি বলতে কী, বেশকিছু চিঠি লিখেছেন। কখনো কখনো তিনি সে-সব ডাকে পাঠিয়েছেন, কখনো আবার হাঁটতে যাওয়ার সময় আমাদের ডাকবাক্সে ফেলে দিয়ে গেছেন।'

'তাহলে আমরা যে "প্রেমপত্র" নিয়ে আলাপ করেছিলাম তা এই।'

'তফাৎ হচ্ছে ওগুলো প্রেমপত্র ছিল না।'

'তো, তিনি কেবল দর্শনের কথাই লিখলেন?'

'হ্যাঁ, তুমি ভাবতে পারো! আট বছর স্কুলে পড়ে আমি যা জেনেছি তার কাছ থেকে আমি তারচেয়ে বেশি জেনেছি। এই, যেমন ধরো, তুমি কি জিওর্দানো ব্রুনোর কথা শুনেছো কখনো, যাকে ১৬০০ খ্রিস্টাব্দে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারা হয়েছিল? বা নিউটনের সার্বজনীন মাধ্যাকর্ষণ সূত্রের কথা?'

'না, অনেক কিছুই আমার জানা নেই।'

'আমি বাজি ধরে বলতে পারি, পৃথিবী কেন সূর্যের চারপাশে ঘোরে সে-কথাও তোমার জানা নেই—অথচ এটা তোমারই গ্রহ!'

'তা, লোকটার বয়স কত?'

'আমার কোনো ধারণা নেই—পঞ্চাশ-টঞ্চাশ হবে হয়ত।'

'কিন্তু লেবাননের সঙ্গে তার সম্পর্ক কোথায়?'

এই প্রশ্নটা কঠিন হয়ে গেল। দ্রুত চিন্তা করল সোফি। সবচেয়ে সম্ভাব্য গল্পটাই বেছে নিল সে।

'অ্যালবার্টোর এক ভাই জাতিসংঘ বাহিনীর মেজর। উনি লিলেস্যান্ডের লোক। হয়ত উনিই সেই মেজর যিনি মেজরের কেবিনে থাকতেন।'

'অ্যালবার্টো নামটা বেশ মজার, তাই না?'

'হয়ত।'

'শুনে তো মনে হয় ইটালিয়ান।'

'ইয়ে, দেখো, যা কিছু গুরুত্বপূর্ণ তার প্রায় সবই এসেছে হয় গ্রিস নয়ত ইতালি থেকে।'

'কিন্তু উনি কি নরওয়েজীয়ানে কথা বলেন?'

'ও, হ্যাঁ, ফ্লুয়েন্টলি।'

'আমার মনে হয় কি জানিস সোফি, তুই একদিন আমাদের বাড়িতে নেমন্তন্ন কর অ্যালবার্টোকে। সত্যিকারের কোনো দার্শনিকের সঙ্গে কখনো কোনোদিন দেখা হয়নি আমার।'

'দেখা যাক।'

'তোর বার্থ ডে পার্টিতেই দাওয়াত দে না ওঁকে? ভিন্ন প্রজন্মের কিছু লোকজন এক জায়গায় হলে মজাই হবে। তারপর ধর, আমি না হয় যোগ দিলাম। আমি নিদেনপক্ষে সার্ভিং-এ সাহায্য করতে পারবো। কী, আইডিয়াটা কেমন, ভালো না?'

'উনি যদি আসেন। মোটের ওপর, আমার স্কুলের ছেলেগুলোর সঙ্গে কথা বলার চাইতে আমি তাঁর সঙ্গে কথা বলতেই ইন্টারেস্টেড বেশি। ব্যাপারটা স্রেফ এই ...'

'কী?'

'না, মানে ওরা হয়ত ব্যাপারটা অন্যভাবে নেবে, ভাববে অ্যালবার্টো আমার নতুন বয়ফ্রেন্ড।'

'ভাবলে বলবি ব্যাপারটা আসলে তা না।'

'বললাম তো, দেখা যাক।'

'ঠিক আছে। আর, সোফি, *কথাটা* সত্যি যে তোর ড্যাড আর আমার মধ্যে ব্যাপারগুলো সবসময় সহজ ছিল না বা এখনো নেই। কিন্তু তৃতীয় আরেকজন কখনোই ছিল না '

'আমাকে ঘুমোতে হবে এখন। শরীরটা বেশ কয়েক জায়গায় ভীষণ খিঁচ ধরে আছে।'

'অ্যাসপিরিন দেবো?'

'ঠিক আছে, দাও।'

তার মা ওষুধ আর পানির গ্লাস নিয়ে ফিরে এসে দেখেন ঘুমে ঢলে পড়েছে সোফি।

* * *

৩১ মে, বৃহস্পতিবার। স্কুলে বিকেলবেলার ক্লাসগুলোতে ছটফট করে মরেছে সোফি। দর্শন কোর্সটা শুরু করার পর থেকে কিছু কিছু বিষয়ে ভালো করছে সে। সাধারণত বেশিরভাগ কোর্সেই তার গ্রেড ভালো ছিল, কিন্তু সম্প্রতি অঙ্ক ছাড়া বাকিগুলো আরও ভালো হতে শুরু করেছে।

শেষ ক্লাসটায় ওদের লেখা একটা রচনা দেখে ফেরত দেয়া হয়েছে। সোফি লিখেছিল 'মানুষ আর প্রযুক্তি' নিয়ে। রেনেসাঁ, বৈজ্ঞানিক নতুন নতুন আবিষ্কার, প্রকৃতি সম্পর্কে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি আর 'জ্ঞানই শক্তি'-এই উক্তি যিনি করেছিলেন সেই ফ্রান্সিস বেকনকে নিয়ে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা লিখে গিয়েছিল সে। খুব সতর্কতার সঙ্গে সোফি উল্লেখ করেছিল যে প্রযুক্তিগত আবিষ্কারগুলো হওয়ার আগেই অভিজ্ঞতাবাদী পদ্ধতি এসে গিয়েছিল। এরপর সে তার সাধ্য অনুযায়ী এমন কিছু প্রযুক্তির কথা লিখেছিল যে-সব প্রযুক্তি সমাজের জন্য ততো ভালো নয়। মানুষ যা কিছুই করুক তাকে ভালো এবং মন্দ এই দুই কাজেই ব্যবহার করা যেতে পারে, এই মন্তব্য করে শেষ অনুচ্ছেদটা লিখেছিল সে। ভালো এবং মন্দ হচ্ছে একটি সাদা আর একটি কালো সুতো যা মিলে একটি দড়ি তৈরি হয়। মাঝে মধ্যে এই সুতো দুটো এতো ঘনভাবে জড়াজড়ি করে থাকে যে তাদের আলাদা করা অসম্ভব হয়ে পড়ে।

সোফির শিক্ষক সোফির খাতাটা ফেরত দেয়ার সময় তার দিকে মাথা নিচু করে তাকিয়ে ভুরু নাচালেন।

সোফি 'এ' পেয়েছে, সঙ্গে মন্তব্য 'এ-সব কথা কোথা থেকে পেয়েছো তুমি?'

তার শিক্ষক যখন ওখানে দাঁড়িয়ে রইলেন, সোফি একটা কলম বের করে তার এক্সারসাইজ খাতার মার্জিনে বড় বড় করে লিখল আমি দর্শন পড়ছি।

ফের যখন খাতাটা বন্ধ করছে সে, সেটির ভেতর থেকে কী যেন একটা পড়ে

গেল। লেবানন থেকে পাঠানো একটা পোস্টকার্ড

প্রিয় হিল্ডা, তুই যখন এ-চিঠি পড়বি তার আগেই আমরা এখানে ঘটে যাওয়া একটা করুণ মৃত্যু সম্পর্কে ফোনে আলাপ করে ফেলবো। মাঝে মাঝে আমি ভাবি মানুষের চিন্তা-ভাবনা যদি আরেকটু ভালো হতো তাহলে যুদ্ধ এড়ানো যেতো কিনা। সম্ভবত দর্শনের ওপর একটা ছোটখাটো কোর্স সন্ত্রাসের একটা ভালো প্রতিষেধক হতে পারে। 'জাতিসংঘের সংক্ষিপ্ত দর্শন গ্রন্থ' নামের একটা বই বের করলে কেমন হয়, যে-বইয়ের একটা কপি বিশ্বের প্রতিটি নতুন নাগরিককে তার নিজের ভাষায় অনুবাদ করে দেয়া হবে? জাতিসংঘের মহাসচিবের কাছে এই প্রস্তাবটা রাখবো আমি।

ফোনে তুই বলেছিস নিজের জিনিসপত্র দেখেশুনে রাখার ব্যাপারে তোর উন্নতি হচ্ছে। আমি তাতে খুশি হয়েছি, কারণ আমার জানামতে তুই-ই হচ্ছিস পৃথিবীর সবচেয়ে অগোছালো প্রাণী। এরপর তুই বলেছিস, আমাদের মধ্যে শেষবার কথা হওয়ার পর থেকে একমাত্র যা তুই হারিয়েছিস তা হলো দশ ক্রাউন। আমি চেষ্টা করবো যেন ওটা ফিরে পাস তুই। যদিও আমি অনেক দূরে থাকি কিন্তু দেশে আমার এক সাহায্যকারী আছে। (পয়সাটা পেলে সেটি আমি তোর জন্মদিনের উপহারের সঙ্গে দিয়ে দেব।) ভালোবাসা নিস, বাবা, যার ধারণা সে এরই মধ্যে বাড়ি ফেরার দীর্ঘ যাত্রা শুরু করে দিয়েছে।

কার্ডটা পড়া সোফি শেষ করেছে কেবল এই সময় শেষ ঘণ্টাটা বেজে উঠল। ফের তার মাথায় চিন্তা-ভাবনার ঝড় বইতে শুরু করল।

খেলার মাঝে অপেক্ষা করছিল জোয়ানা। বাড়ি ফেরার পথে সোফি তার স্কুলব্যাগ খুলে জোয়ানাকে দেখাল সদ্য পাওয়া কার্ডটা।

'কবেকার পোস্টমার্ক দেয়া আছে ওটায়?' জোয়ানা জিজ্ঞেস করল।

'সম্ভবত ১৫ জুনের...'

'না। দ্যাখ...৫-৩০-৯০, লেখা আছে।'

'তার মানে গতকাল...লেবাননে সেই মেজরের মৃত্যুর পরের দিন।

'লেবানন থেকে কোনো পোস্টকার্ড একদিনে নরওয়ে আসতে পারে কিনা সে-ব্যাপারে সন্দেহ আছে আমার,' জোয়ানা বলল।

'আর এই অদ্ভুত ঠিকানার কথা না হয় বাদই দেয়া গেল হিল্ডা মোলার ন্যাগ, প্রযত্নে সোফি অ্যামুন্ডসেন, ফুরুলিয়া জুনিয়র হাই স্কুল...'

'তোর ধারণা ডাকে এসেছে চিঠিটা? তারপর টিচার স্রেফ ওটাকে তোর খাতার মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছেন?'

'নো আইডিয়া। সাহস করে ওটার কথা জিজ্ঞেস করব কিনা সে-কথাও বুঝতে পারছি না।'

পোস্টকার্ডটা নিয়ে আর কোনো কথা হলো না ওদের মধ্যে।

'মিডসামার ঈভ্-এ একটা গার্ডেন পার্টি দিতে যাচ্ছি আমি,' সোফি বলল।

'ছেলেদের নিয়ে?'

কাঁধ ঝাঁকাল সোফি। 'সবচেয়ে নিকৃষ্ট শ্রেণীর গাধাদের ডাকার দরকার আছে কোনো, তুই বল?'

'কিন্তু তুই জেরেমিকে ডাকবি নিশ্চয়ই?'

'তুই যদি চাস। ভালো কথা,আমি হয়ত অ্যালবার্টো নক্সকে ডাকব।'

'নির্ঘাৎ মাথা খারাপ হয়েছে তোর!'

'আমি জানি।'

সুপার মার্কেট পর্যন্ত এসে ওরা যে যার পথ ধরার আগ পর্যন্ত এটুকুই কথা হলো দু'জনের মধ্যে।

বাড়ি ফিরে সোফি প্রথমেই দেখল হার্মেস বাগানে আছে কিনা। যা ভেবেছে ঠিক তাই, ওই তো হার্মেস। আপেল গাছগুলোর চারপাশে গন্ধ শুঁকে বেড়াচ্ছে।

'হার্মেস!'

এক সেকেন্ডের জন্য স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল কুকুরটা। সোফি ঠিক জানে সেই এক সেকেন্ডে কী হচ্ছে। কুকুরটা তার ডাক শুনেছে, তার গলাটা চিনতে পেরেছে, তারপর সে ওখানে আছে কিনা তা দেখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তারপর সোফিকে আবিষ্কার করার পর তার দিকে ছুট দিল সে। শেষে, চার-চারটে পা ঢাকের কাঠির মতো উঠতে আর পড়তে লাগল দ্রুত বেগে।

এক সেকেন্ডের মধ্যে এতো সব ব্যাপার সত্যিই অনেক কিছু।

কুকুরটা ছুটে এসে তার গায়ের ওপর পড়ল, লেজটা নাড়তে লাগল ভীষণ বেগে, লাফিয়ে উঠল সোফির মুখটা চেটে দেয়ার জন্য।

'হার্মেস; চালাক ছেলে! নাম্, নাম্। না, না, এভাবে চাটিস না আমার সারা গা। শান্ত হ! এই তো!'

বাড়ির ভেতর ঢুকল সোফি। ঝোপের ভেতর থেকে লাফিয়ে বেরিয়ে এলো শিয়ার্কান। অচেনা কারও ব্যাপারে বরাবরই সতর্ক ওটা। সোফি বেড়ালের খাবার বের করল, বাজারিগারের কাপটাতে বার্ডসিড ঢালল, কচ্ছপটার জন্য সালাদের একটা পাতা বের করল, তারপর মায়ের জন্য একটা চিরকুট লিখে রাখল।

সে লিখল হার্মেসকে বাড়ি পৌঁছে দিতে যাচ্ছে সে, সাতটার মধ্যেই ফিরে আসবে।

শহরের ভেতর দিয়ে রওনা হলো দু'জন। এইবার পকেটে কিছু টাকা নিতে ভুলল না সোফি। একবার ভাবল হার্মেসকে নিয়ে বাসে চড়বে কিনা, কিন্তু পরে ঠিক করল অ্যালবার্টোকে এ-ব্যাপারে জিজ্ঞেস করার আগ পর্যন্ত বরং অপেক্ষাই করা যাক।

হার্মেসের পিছু পিছু হাঁটতে হাঁটতে সে ভাবতে লাগল একটা জন্তু আসলে কী। একটা কুকুর আর একজন মানুষের মধ্যে তফাৎ কোথায়? অ্যারিস্টটলের কথা মনে পড়ে গেল তার। তিনি বলেছিলেন, মানুষ আর জীব-জন্তু দুই-ই প্রাকৃতিক জীবন্ত প্রাণী যাদের মধ্যে অনেক মিল রয়েছে। তবে মানুষ আর জীব-জন্তুর মধ্যে একটা বিশেষ পার্থক্য আছে আর সেটি হলো মানবীয় প্রজ্ঞা।

ভদ্রলোক এত নিশ্চিত হলেন কীভাবে?

অন্যদিকে ডেমোক্রিটাস কিন্তু মনে করতেন মানুষ আর জীব-জন্তু বরং একই রকম, কারণ দুই-ই পরমাণু দিয়ে তৈরি। তাছাড়া, মানুষ বা জীব-জন্তু কারোরই অমর আত্মা রয়েছে বলে মনে করতেন না তিনি। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, আত্মাও পরমাণু দিয়ে তৈরি আর মানুষ মারা গেলে সে-সব পরমাণু বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে। তিনি-ই ছিলেন একমাত্র লোক যিনি মনে করতেন মানুষের আত্মা তার মস্তিষ্কের সঙ্গে একটি অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধা।

কিন্তু আত্মা কী করে পরমাণুর তৈরি হয়? আত্মা তো আর দেহের অন্য কোনো অংশের মতো নয় যা হাত দিয়ে স্পর্শ করা যায়। এটা হচ্ছে 'আধ্যাত্মিক' একটা জিনিস।

ততক্ষণে মেইন স্কোয়্যার ছাড়িয়ে এসেছে ওরা, কাছাকাছি চলে এসেছে ওল্ড টাউনের। ওরা যখন সাইডওয়াকটার সেইখানে চলে এসেছে যেখানে সোফি দশ ক্রাউনের পয়সাটা পেয়েছিল, সোফির চোখ আপনা আপনিই চলে গেল অ্যাসফল্টের ওপর। আর সেখানেই, ঠিক যেখানে সে ঝুঁকে পড়ে পয়সাটা তুলে নিয়েছিল, সেখানেই একটা পোস্টকার্ড পড়ে থাকতে দেখল সে, ছবির দিকটা ওপরে রয়েছে সেটির। ছবিতে পাম আর কমলা গাছ শোভিত একটা বাগান দেখা যাচ্ছে।

ঝুঁকে পড়ে কার্ডটা তুলে নিল সোফি। হার্মেস গরগর করে উঠতে শুরু করল, যেন সোফির ওটা ধরাটা পছন্দ না তার।

কার্ডটাতে লেখা

> প্রিয় হিল্ডা, জীবনটা কাকতালীয় ঘটনার একটা লম্বা শেকল। এমনটা ঘটা অসম্ভব নয় একেবারে যে তোর হারানো দশ ক্রাউন ঠিক এখানেই পাওয়া গিয়েছিল। ক্রিস্টিয়ানস্যান্ডে যাওয়ার বাসের জন্য অপেক্ষারত কোনো বৃদ্ধা মহিলা হয়ত লিলেস্যান্ডের স্কোয়্যারে পেয়েছিলেন ওটা। ক্রিস্টিয়ানস্যান্ড থেকে ট্রেনে চেপেছিলেন তিনি তাঁর নাতি-নাতনীর সঙ্গে দেখা করার উদ্দেশে, তার বেশ কয়েক ঘণ্টা পর দশ ক্রাউনটা তিনি এই নিউ স্কোয়্যারে হারিয়ে ফেলেছিলেন। তো, এরপর এটা খুবই সম্ভব যে ঠিক সেই পয়সাটাই পরে সেদিন একটা মেয়ে তুলে নিয়েছিল বাসে করে বাড়ি যাওয়ার জন্য ওটা তার আসলেই দরকার ছিল বলে। আর আসলেই যদি তাই হয়ে থাকে, হিল্ডা, তাহলে লোকে নিশ্চয়ই এ-কথা জিজ্ঞেস করবে সবকিছুর পেছনে ঈশ্বরের হাত রয়েছে কিনা। ভালোবাসা নিস, বাবা, মানসিক দিক দিয়ে যে কিনা লিলেস্যান্ডের ডক-এ বসে আছে। পুনশ্চ : আমি বলেছিলাম না তোর সেই দশ ক্রাউন খুঁজে পেতে সাহায্য করব তোকে?

ঠিকানা যে-পাশে সেখানে লেখা আছে : 'হিল্ডা মোলার ন্যাগ, প্রযত্নে কোনো এক আকস্মিক পথচারী...' ডাকঘরের সীলমোহর দেয়া আছে ৬-১৫-৯০।

হার্মেসের পিছু পিছু সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে গেল সোফি। অ্যালবার্টো দরজা খুলতেই সে বলে উঠল,

'পথ থেকে সরে দাঁড়ান। ডাকপিয়ন আসছে।'

তার মনে হলো বিরক্ত বোধ করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে তার নিজের । সে ঝড়ের বেগে ভেতরে ঢুকছে দেখে সরে দাঁড়ালেন অ্যালবার্টো। হার্মেস আগের মতোই সেই কোট ঝোলানোর খুঁটির নিচে গিয়ে শুয়ে পড়ল।

'মেজর বুঝি আরেকটা ভিজিটিং কার্ড হাজির করেছে?'

সোফি তার দিকে মুখ তুলে তাকাল, দেখল ভিন্ন একটা সাজের পোশাক পরে আছেন তিনি। লম্বা কোঁকড়া চুলের একটা উইগ আর ঢোলাঢালা এক গাদা লেস লাগানো একটা ব্যাগি স্যুট পরেছেন তিনি। গলায় দৃষ্টিকটু রঙের রেশমি একটা স্কার্ফ পেঁচানো আর স্যুটের ওপর চাপিয়েছেন লাল রঙের একটা হাতাকাটা কোর্ট। আরও পরেছেন সাদা মোজা আর পাকা চামড়ার বো লাগানো জুতো। পুরো পোশাকটা দেখে সোফির মনে পড়ে গেল তার দেখা চতুর্দশ লুইয়ের রাজসভার ছবির কথা।

'ক্লাউনের মতো দেখতে লাগছে আপনাকে!' বলে কার্ডটা তাঁর হাতে ধরিয়ে দিল সোফি।

'হুম... আর যেখানে সে কার্ডটা ফেলে রেখেছিল সেখানে তুমি সত্যিই দশ ক্রাউন পেয়েছিলে।'

'ঠিক তাই।'

'প্রতিবারই আগের চেয়ে বেশি অভব্য হয়ে উঠছে লোকটা। কিন্তু হয়ত এটাই ভালো হচ্ছে।'

'কেন?'

'এতে করে তার মুখোশ খোলাটা সহজ হবে। কিন্তু এই কৌশলটা জমকালো আর রুচিহীন দুই-ই । এটার গা থেকে প্রায় সস্তা সুগন্ধীর গন্ধ বেরোচ্ছে।'

'সুগন্ধী?'

'হ্যাঁ, তবে মার্জিত হতে চাইলে কী হবে, ওটার গন্ধ আসলে জঘন্য। দেখলে না লোকটা তার নোংরা নজরদারিকে কী ঔদ্ধত্যের সঙ্গে ঈশ্বরের তত্ত্বাবধানের সঙ্গে তুলনা করল?'

কার্ডটা তুলে ধরলেন তিনি। তারপর সেটিকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেললেন। তাঁর মেজাজটা যাতে আরও বিগড়ে না যায় সেজন্য সোফি স্কুলে তার খাতার ভেতর থেকে পড়া কার্ডটার কথা চেপে গেল।

'চলো ভেতরে গিয়ে বসি। ক'টা বাজে?'

'চারটা।'

'আজ আমরা আলাপ করবো সপ্তদশ শতাব্দী নিয়ে।'

ঢালু দেয়াল আর স্কাইলাইটঅলা বসার ঘরে চলে এলো ওরা। সোফি লক্ষ করল এর আগেরবার সে যে-সব জিনিস দেখেছিল সে-সবের কিছু কিছু সরিয়ে অ্যালবার্টো ভিন্ন কিছু জিনিস বের করে রেখেছেন।

কফি টেবিলের ওপর সাবেক কালের ছোট একটা বাক্সে নানান ধরনের চশমার কাচ রাখা আছে দেখতে পেল সে। তার পাশেই রয়েছে একটা খোলা বই। দেখতে বেশ পুরনো।

'ওটা কী?' জিজ্ঞেস করল সোফি।

'এটা আমার সবচেয়ে দামি সংগ্রহগুলোর মধ্যে একটা, ১৬৩৭ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত দেকার্তের দর্শনবিষয়ক প্রবন্ধের বই; এই বইতেই তাঁর বিখ্যাত রচনা *ডিসকোর্স অন মেথড* প্রথমবারের মতো পাঠকদের সামনে হাজির করা হয়েছিল।

'আর ওই ছোট্ট বাক্সটা?'

'ওটাতে আছে কিছু লেন্স বা চশমার কাচের একটা বিশেষ সংগ্রহ। ওলন্দাজ দার্শনিক স্পিনোজা সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি কোনো এক সময়ে এই কাচগুলো পরিষ্কার করেছিলেন। অত্যন্ত দামি কাচ ছিল এগুলো। আমার সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদের মধ্যে এগুলোকেও ধরতে পারো তুমি।'

'এগুলো কতটা দামি সেটি সম্ভবত আমি আরও ভালো করে বুঝতে পারতাম যদি জানতাম তাঁরা কে ছিলেন।'

'অবশ্যই। তবে প্রথমে, তাঁরা যে-সময়ের লোক সেই সময়টা সম্পর্কে একটা ধারণা পাওয়ার চেষ্টা করা যাক। তা, তুমি দাঁড়িয়ে কেন, বোসো না।

আগের সেই স্থানেই বসল দু'জনে, সোফি বড় আর্মচেয়ারটায় আর অ্যালবার্টো নক্স সোফায়। দু'জনের মাঝখানে কফি টেবিলটা, সেটির ওপর বই আর ছোট্ট বাক্সটা। অ্যালবার্টো পরচুলাটা খুলে লেখার ডেস্কের ওপর রেখে দিলেন।

'আমরা এখন কথা বলতে যাচ্ছি সপ্তদশ শতাব্দী বা সাধারণত যে-সময়টাকে আমরা বারোক (Baroque) যুগ বলে থাকি সেই সময়টা নিয়ে।'

'বারোক যুগ? কী অদ্ভুত নাম।'

'বারোক শব্দটা এসেছে এমন একটা শব্দ থেকে যে-শব্দ দিয়ে অসমান আকার বা গঠনের মুক্তাকে বোঝানো হতো। বারোক শিল্পের একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে নিয়মহীনতা, যা কিনা রেনেসাঁর সময়কার তুলনামূলকভাবে সহজ-সরল আরও বেশি সুসামঞ্জস্যপূর্ণ শিল্পের চেয়ে অনেক বেশি উন্নত ছিল তার প্রবলরকমের বৈপরীত্যপূর্ণ ধরন-ধারণ নিয়ে। আসলে, পুরো সপ্তদশ শতাব্দী-ই বিশিষ্ট হয়ে আছে অসেতুসম্ভব বৈপরীত্যগুলোর মধ্যকার টানাপোড়নের কারণে। একদিকে ছিল রেনেসাঁ-র নিরন্তর আশাবাদ আর অন্যদিকে অগুনতি মানুষ, যারা ধর্মীয় নিঃসঙ্গতা এবং আত্ম-স্বার্থত্যাগের মাধ্যমে খুঁজে ফিরছিল একেবারে বিপরীত মেরুর এক জীবন। শিল্প এবং বাস্তব জীবন, এই দুইয়ের ভেতরেই আমরা আত্ম-প্রকাশের আড়ম্বরপূর্ণ আর বর্ণবহুল রূপ লক্ষ করি এই সময়টায়। ওদিকে আবার ঠিক একই সময়ে দেখা দিয়েছিল জগতের দিকে পিঠ ফেরানো মঠভিত্তিক আন্দোলন।'

'অন্য কথায় বলতে গেলে, উদ্ধত সব প্রাসাদ আর দূরবর্তী সব মঠ, এই দুই-ই।'

'হ্যাঁ, তা তুমি নিঃসন্দেহে বলতে পারো। বারোক যুগের একটি প্রিয় কথা ছিল, লাতিন ভাষায়, 'কার্পে দিয়েম' (carpe diem), আজকের দিনের জন্য বাঁচো। লাতিন আরেকটা কথাও লোকের মুখে মুখে ফিরত আর সেটি হলো 'মেমেন্তো মোরি' (memento mori), 'মনে রেখো, মরতে তোমাকে হবেই।' শিল্পকলার ক্ষেত্রে, একটা ছবিতে হয়ত খুবই বিলাসবহুল জীবনের চিত্র আঁকা হলো, কিন্তু তার পাশেই এক কোনায় ছোট্ট করে এঁকে দেয়া হতো একটা খুলি।

'অনেক অর্থেই, বারোক যুগ বিশিষ্ট হয়ে আছে অহং বা ভান-এর জন্য। কিন্তু একই সময়ে, মুদ্রার অপর পিঠটা নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিল অগুনতি মানুষ। তারা উদ্বিগ্ন ছিল বস্তুর *ক্ষণস্থায়ী* প্রকৃতি বা বৈশিষ্ট্যটি নিয়ে। অর্থাৎ এই বিষয়টি নিয়ে যে আমাদের চারপাশের সব সুন্দর জিনিস একদিন অবশ্যই ধ্বংস হয়ে যাবে।'

'তা ঠিক। এ-কথা চিন্তা করলেই মনটা বিষণ্ণ হয়ে ওঠে যে কোনোকিছুই চিরস্থায়ী নয়।'

'সপ্তদশ শতাব্দীতে অনেকেই তোমার মতো ভেবেছিল। বারোক যুগ রাজনৈতিক অর্থে দ্বন্দ্ব-সংঘাতের সময়ও বটে। যুদ্ধে যুদ্ধে বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছিল ইউরোপ। সবচেয়ে বাজে যুদ্ধটা ছিল 'তিরিশ বছরের যুদ্ধ', প্রায় গোটা মহাদেশ জুড়েই চলেছিল যুদ্ধটা ১৬১৮ থেকে ১৬৪৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। সত্যি বলতে কী, এটা ছিল ধারাবাহিক কিছু যুদ্ধ, যে-যুদ্ধ মাশুল আদায় করেছিল বিশেষ করে জার্মানির কাছ থেকে। ফ্রান্স যে ধীরে ধীরে ইউরোপের প্রধানতম শক্তি হয়ে উঠেছিল তার জন্য এই তিরিশ বছরের যুদ্ধ কম দায়ী নয়।'

'তা, যুদ্ধগুলো হয়েছিল কী নিয়ে?'

'যুদ্ধগুলো ছিল মূলত প্রোটেস্টান্ট আর ক্যাথলিকদের মধ্যে। তবে রাজনৈতিক ক্ষমতাও একটা অন্যতম কারণ ছিল।'

'অনেকটা লেবাননের মতো।'

'যুদ্ধ-বিগ্রহ বাদ দিলে, সপ্তদশ শতাব্দী ছিল শ্রেণী বৈষম্যের সময়। আমি নিশ্চিত করে জানি না ফরাসি অভিজাততন্ত্র বা ভার্সাইয়ের রাজসভার কথা তুমি শুনেছ কিনা। কিন্তু জাঁকজমকে প্রদর্শনীর জন্য ক্ষমতার প্রদর্শনীরও প্রয়োজন হয়। একটা কথা প্রায়ই বলা হয় যে বারোক যুগের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সে-সময়কার শিল্পকলা আর স্থাপত্যর মতোই ছিল অনেকটা। কারণ বারোক যুগের দালান-কোঠার বৈশিষ্ট্য-ই ছিল সেগুলোর অলঙ্কারপূর্ণ কোনো-ঘুপচি আর ফাঁক-ফোকরগুলো। ঠিক একইভাবে, তখনকার রাজনৈতিক পরিস্থিতিও বিশিষ্ট হয়ে আছে ষড়যন্ত্র, ফাঁদ আর গুপ্তহত্যার জন্য।'

'সুইডিশ এক রাজাকে গুলি করে মারা হয়েছিল না থিয়েটারের মধ্যে?'

'তুমি বলছ তৃতীয় গুস্তাভের কথা; হ্যাঁ, আমি যে-ব্যাপারটি বোঝাতে চাইছি এটা তার একটা ভালো উদাহরণ বটে। অবশ্য গুস্তাভের গুপ্তহত্যা ঘটেছিল সেই ১৭৯২-তে, তবে তখনকার পরিস্থিতি কিন্তু পুরোপুরি বারোক যুগের মতোই ছিল। বিশাল একটা মাস্কড় বল নাচে অংশ নেয়ার সময় নিহত হন তিনি।'

'আমি ভেবেছিলাম থিয়েটার দেখছিলেন তিনি তখন।'

'মুখোশ পরা সেই বল নাচ হচ্ছিল আসলে একটা অপেরা ঘরে। আমরা বলতে পারি, সুইডেনে বারোক যুগের ইতি ঘটেছিল তৃতীয় গুস্তাভের সেই হত্যার মধ্য দিয়ে। তাঁর শাসনামলটা ছিল আসলে এক 'আলোকিত স্বৈরাচার'-এর যুগ, যা কিনা প্রায় একশো বছর পূর্বেকার রাজা চতুর্দশ লুইয়ের শাসনামলের মতোই একদম। তৃতীয় গুস্তাভ খুবই আত্মম্ভরি ধরনের লোক ছিলেন, ফরাসি সমস্ত আনুষ্ঠানিকতা আর আচার-অনুষ্ঠানের ভক্ত ছিলেন। থিয়েটারও ভালোবাসতেন তিনি...

'আর সেটিই মৃত্যু ডেকে আনল তাঁর।'

'হ্যাঁ, তবে বারোক যুগের থিয়েটার কিন্তু কেবলই একটা শিল্প মাধ্যম ছিল না। সেটি ছিল সেই সময়ের সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত প্রতীক।'

'কিসের প্রতীক?'

'জীবনের, সোফি। সপ্তদশ শতাব্দীতে 'জীবন একটা রঙ্গমঞ্চ' এই কথাটা যে কতবার বলা হয়েছে আমার জানা নেই। তবে এ-কথা বলা যায়, প্রায়ই বলা হতো কথাটা। বারোক যুগই আধুনিক থিয়েটারের জন্ম দিয়েছিল, সেটির নানান ধরনের সিনারি আর থিয়েটারি কলাকৌশল সমেত। থিয়েটারে আসলে মঞ্চের ওপর একটা ইল্যুশন বা বিভ্রান্তি তৈরি করা হতো, শেষ পর্যন্ত যা এই ব্যাপারটিই প্রকাশ করতো যে মঞ্চের নাটকটি আসলে একটি মায়া ছাড়া কিছু নয়। এভাবেই থিয়েটার হয়ে ওঠে সাধারণভাবে মানবজীবনেরই একটি প্রতিফলন। থিয়েটার হয়ত দেখাল 'অহংকারই পতনের মূল' এবং ফুটিয়ে তুলল মানুষের অনৈতিকতার এক নিষ্করুণ চিত্র।'

'শেক্সপীয়ার কি এই বারোক যুগের লোক ছিলেন?'

'১৬০০ খ্রিস্টাব্দের দিকেই তিনি তাঁর সবচেয়ে মহৎ নাটকগুলো লিখেছিলেন, কাজেই বলতে পারো তিনি তাঁর এক পা রেনেসাঁ-য় অন্য পা বারোক যুগে দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। শেক্সপীয়ারের লেখায় জীবনকে প্রায়ই থিয়েটারের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। সে-রকম কিছু লাইন শুনতে চাও?'

'চাই।'

'তিনি তাঁর *অ্যাজ ইউ লাইক ইট* নাটকে বলেছেন

> অল দ্য ওয়ার্ল্ড'জ আ স্টেজ,
> অ্যান্ড অল দ্য মেন অ্যান্ড উইমিন মিয়ারলি প্লেয়ার্স;
> দে হ্যাভ দেয়ার এক্সিটস্ অ্যান্ড দেয়ার এন্ট্রান্সেস;
> অ্যান্ড ওয়ান ম্যান ইন হিজ টাইম প্লে মেনি পার্টস্ ।

ওদিকে *ম্যাকবেথ*-এ তিনি বলছেন

> লাইফ'জ বাট আ ওয়াকিং শ্যাডো, আ পুওর প্লেয়ার
> দ্যাট স্ট্রাটস অ্যান্ড ফ্রেটস হিজ আওয়ার আপন দ্য স্টেজ,
> অ্যান্ড দেন ইজ হার্ড নো মোর; ইট ইজ আ টেল
> টোল্ড বাই অ্যান ইডিয়ট; ফুল অভ্ সাউন্ড অ্যান্ড ফিউরি,
> সিগনিফাইয়িং নাথিং।'

'কী হতাশাভরা কথা।'

'জীবনের সংক্ষিপ্ততা তাঁর চিন্তা আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। তাঁর সবচেয়ে বিখ্যাত লাইনটা তুমি শুনেছো নিশ্চয়ই?'

'টু বি অর নট টু বি-দ্যাট ইজ দ্য কোশ্চেন।'

'হ্যাঁ, হ্যামলেটের উক্তি। একদিন আমরা এই পৃথিবীর ওপর হেঁটে চলে বেড়াচ্ছি

তো পরের দিন হারিয়ে যাচ্ছি, মিশে যাচ্ছি মাটিতে।'

'ধন্যবাদ, বক্তব্যটা ধরতে পেরেছি আমি।'

'আর বারোক কবিরা যখন জীবনকে মঞ্চের সঙ্গে তুলনা করেন না, তখন সেটিকে তুলনা করেন তাঁরা স্বপ্নের সঙ্গে, এই যেমন শেক্সপীয়ার বলেন,

'স্বপ্ন গড়া যা দিয়ে আমরা তাই আর আমাদের এই ছোট্ট জীবনটা ঘুম দিয়ে ঘেরা...'

'এটা অবশ্য খুব-ই কাব্যিক বর্ণনা।'

'১৬০০ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণকারী স্প্যানিশ নাট্যকার কল্‌দেরন দে লা বার্কা (Calderon de la Barca) *জীবন একটা স্বপ্ন* নামে এক নাটকে বলেছেন 'জীবন কী? একটা পাগলামি। জীবন কী? একটা মায়া, একটা ছায়া, একটা গল্প আর সবচেয়ে যা ভালো তা-ও খুবই কম, কারণ জীবন একটা স্বপ্ন...।'

'হয়ত তার কথাই ঠিক। স্কুলে একটা নাটক পড়েছিলাম আমরা। *পাহাড়ের ওপর জেপ*।'

'লুদভিগ হোলবার্গের (Ludvig Holberg) লেখা। এখানে, এই স্ক্যান্ডিনেভিয়ায় খুবই বড় মাপের চরিত্র তিনি। বারোক যুগ থেকে আলোকপ্রাপ্তির (Enlightenment) যুগে উত্তরণ ঘটিয়েছিলেন তিনি।'

'তো, সেই জেপ একটা গর্তের ভেতর ঘুমিয়ে পড়েছিল একদিন। তার ঘুম ভাঙে এক ব্যারনের বিছানায়। তখন সে ভাবে সে যে এক কৃষক ছিল সেটি নিশ্চয়ই স্রেফ একটা স্বপ্ন। এরপর সে আবার ঘুমিয়ে পড়তে লোকজন যখন তাকে ধরে আবার গর্তের ওখানে নিয়ে যায় তখন আবার ঘুম ভেঙে যেতে সে ভাবে ব্যারনের বিছানায় সে যে ঘুমিয়ে ছিল সেটি নির্ঘাৎ স্বপ্ন ছিল একটা।'

'হোলবার্গ এই থিমটা ধার নিয়েছিলেন কলদেরনের কাছ থেকে আর কলদেরন নিয়েছিলেন প্রাচীন আরবি গল্প *সহস্র এক রজনী* থেকে। জীবনকে স্বপ্নের সঙ্গে তুলনা করার বিষয়টা অবশ্য আরও দূর অতীতের ইতিহাসেও পাওয়া, চীন আর ভারতেও নেহাত কম নয়। এই যেমন প্রাচীন কালের চীনা সাধু *চুয়াং-জু* (Chuang-tzo) বলেছিলেন একবার স্বপ্ন দেখলাম আমি প্রজাপতি হয়ে গেছি, তো, এখন আমি ঠিক জানি না যে আমি চুয়াং-জু কিনা যে স্বপ্ন দেখেছিল যে আমি প্রজাপতি হয়ে গেছি, নাকি আমি একটা প্রজাপতি যে স্বপ্ন দেখছে যে আমি চুয়াং-জু।'

'আমার মনে হয় কোনটা যে ঠিক তা প্রমাণ করা কঠিন।'

'নরওয়েতে এক সত্যিকারের বারোক কবি আছেন, নাম পিটার ডাস (Petter Dass): তাঁর জন্ম ১৬৪৭-এ, মৃত্যু ১৭০৭-এ। একদিকে তিনি জীবনকে ইহজাগতিক দিক থেকে বর্ণনা করেছেন, অন্যদিকে আবার তিনি এই বিষয়টি জোর দিয়ে বলতেন যে কেবল ঈশ্বরই শাশ্বত আর ধ্রুব।'

'সব জমি-ও যদি পতিত হয়ে যায়, তা-ও ঈশ্বর ঈশ্বরই, সব মানুষ যদি মরেও যায় তা-ও ঈশ্বর ঈশ্বরই।'

'কিন্তু সেই একই হিম-এ (hymn) তিনি উত্তর নরওয়ের গ্রামীণ জীবনের কথাও বলেছেন, বলেছেন লাম্প মাছ, কড মাছ আর কোল মাছের কথা। এটা একেবারেই

বারোক একটি বৈশিষ্ট্য—একই সঙ্গে ইহজগৎ আর আধ্যাত্মিক বা পরজগতের কথা বলা। এই সবকিছুই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাস্তব জগৎ আর ভাবের অপরিবর্তনীয় জগতের মধ্যে প্লেটো যে-পার্থক্য নির্ণয় করেছিলেন সে-কথা মনে করিয়ে দেয়।'

'আর তাঁদের দর্শন?'

'সেটিও বিশিষ্ট হয়ে আছে প্রবলভাবে বিপরীত চিন্তাধারার মধ্যকার দ্বন্দ্বের কারণে। আগেই বলেছি, কিছু কিছু দার্শনিক বিশ্বাস করতেন যে অস্তিত্বশীল সবকিছুই শেষ পর্যন্ত আধ্যাত্মিক। এই দৃষ্টিভঙ্গিকে বলে ভাববাদ (idealism)। এর বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গির নাম বস্তুবাদ (materialism)। এই কথাটির সাহায্যে এমন এক দর্শনকে বোঝানো হয় যে-দর্শন মনে করে সব বাস্তব জিনিস নিরেট বস্তুগত দ্রব্য থেকে আসে। সপ্তদশ শতকে বস্তুবাদের হয়ে কথা বলার মানুষও ছিলেন অনেক। সম্ভবত এঁদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিলেন ইংরেজ দার্শনিক *টমাস হব্‌স* (Thomas Hobbes)। তিনি বিশ্বাস করতেন সমস্ত প্রাকৃতিক জিনিস, মানুষ ও প্রাণী কেবল বস্তুকণা দিয়েই তৈরি। এমনকি মানবিক চেতনা বা আত্মা, তারও সৃষ্টি মস্তিষ্কে সেই সব ক্ষুদে কণার চলাফেরা থেকে।'

'তার মানে ডেমোক্রিটাস যে-কথা দুই হাজার বছর আগে বলে গিয়েছিলেন, হব্‌স তার সঙ্গে একমত পোষণ করেছিলেন?'

'ভাববাদ আর বস্তুবাদ এমন দুটো বিষয় যা তুমি দর্শনের ইতিহাসের আগাগোড়াই দেখতে পাবে। কিন্তু বারোক যুগের আগে এই দুই দৃষ্টিভঙ্গি খুব কমই এমন পরিষ্কারভাবে একই সময়ে দেখা গেছে। নতুন বিজ্ঞান নিরন্তরভাবে রসদ যুগিয়ে গেছে বস্তুবাদকে। নিউটন দেখিয়েছেন যে সারা মহাবিশ্ব জুড়ে গতির একই সূত্র প্রযোজ্য এবং প্রাকৃতিক জগতের—পৃথিবীর আর মহাশূন্যের—সমস্ত পরিবর্তন সার্বজনীন মাধ্যাকর্ষণ আর বস্তুর গতির নীতির সাহায্যে ব্যাখ্যা করা সম্ভব।

'অর্থাৎ সবকিছুই নিয়ন্ত্রণ করে একই অলঙ্ঘনীয় নিয়ম বা সূত্র বা একই *মেকানিজম*। ফলে, তত্ত্বগতভাবে একেবারে গাণিতিক সূক্ষ্মতায় প্রতিটি প্রাকৃতিক পরিবর্তন পরিমাপ করা সম্ভব। আর এভাবেই নিউটন আমরা যাকে বলি মেকানিস্টিক *বিশ্বচিত্র* তা সম্পূর্ণ করলেন।'

'জগৎকে কি তিনি বিশাল এক যন্ত্র হিসেবে কল্পনা করেছিলেন?'

'আসলেই তাই করেছিলেন তিনি। 'mechanic' শব্দটা এসেছে গ্রিক শব্দ 'mechane' থেকে, যার *অর্থ* মেশিন বা যন্ত্র। এই বিষয়টি লক্ষণীয় যে হব্‌স বা নিউটন এই মেকানিস্টিক বা যান্ত্রিক বিশ্বচিত্র আর ঈশ্বর-বিশ্বাসের মধ্যে কোনো স্ববিরোধ দেখতে পাননি। কিন্তু অষ্টাদশ এবং উনবিংশ শতাব্দীর সব বস্তুবাদীর ক্ষেত্রে এই কথাটি প্রযোজ্য নয়। ফরাসি চিকিৎসক দার্শনিক লা মেতরি (La Mettrie) অষ্টাদশ শতকে একটি বই লিখেছিলেন *লা' হোমে মেশিন* (L' homme machine) নামে, নামটির অর্থ 'মানবযন্ত্র।' পায়ের যেমন পেশি রয়েছে হাঁটার জন্য, তেমনি মস্তিষ্কেরও 'পেশি' রয়েছে চিন্তা করার জন্য। এরপর ফরাসি গণিতবিদ *লাপ্লেস* (Laplace) একটি চরম যান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ ঘটিয়েছিলেন এই ধারণাটির সাহায্যে 'যদি কোনো বুদ্ধিমান সত্তা কোনো নির্দিষ্ট সময়ে বস্তুর সমস্ত কণার অবস্থান জেনে

যেতো তাহলে কোনো কিছুই অজানা থাকত না, ভবিষ্যৎ আর অতীত দুই-ই তার চোখের সামনে উন্মুক্ত হয়ে পড়ত।' এখানে মূল বক্তব্য হচ্ছে, যা কিছু ঘটে তার সবই পূর্বনির্ধারিত। 'ভাগ্যে লেখা আছে' যে কোনো একটা কিছু ঘটবে। এই দৃষ্টিভঙ্গিকে বলে *নির্ধারণবাদ* (determinism)।'

'তার মানে দাঁড়াচ্ছে, ইচ্ছার স্বাধীনতা বলতে কিছু নেই।'

'না। সবকিছুই একটা যান্ত্রিক প্রক্রিয়ার ফসল, আমাদের চিন্তা আর স্বপ্ন-ও। ঊনবিংশ শতাব্দীর জার্মান বস্তুবাদীরা দাবি করেছিলেন যে চিন্তার সঙ্গে মস্তিষ্কের সম্পর্ক হচ্ছে প্রস্রাবের সঙ্গে কিডনি-র আর পিত্তর সঙ্গে যকৃতের সম্পর্কের মতো।'

'কিন্তু প্রস্রাব আর পিত্ত-তো বস্তু। চিন্তা তো তা নয়।'

'তুমি প্রায় আসল জায়গায় হাত দিয়েছ। এই বিষয়ে একটা গল্প বলতে পারি তোমাকে। রাশান এক নভোচারী আর ব্রেইন সার্জন একবার ধর্ম নিয়ে আলাপ করছিলেন। ব্রেইন সার্জন খ্রিস্টান, কিন্তু নভোচারী তা নন। নভোচারী বললেন, 'বহুবার মহাশূন্যে গিয়েছি, কিন্তু কখনোই ঈশ্বর বা দেবদূতদের দেখিনি আমি।' ব্রেইন সার্জন তখন বললেন, 'আমি অনেক চালাক-চতুর লোকের ব্রেইন অপারেশন করেছি কিন্তু কোনোদিনও একটা চিন্তার দেখা পাইনি।' '

'কিন্তু এতে তো প্রমাণ হয় না যে চিন্তার অস্তিত্ব নেই।'

'তা নয়, কিন্তু এর মাধ্যমে এই বিষয়টি পরিষ্কার হয় যে চিন্তা-ভাবনা এমন কোনো জিনিস নয় যার ওপর অপারেশন চালানো যায় বা যাকে ছোট ছোট অংশে ভেঙে ফেলা যায়। এই যেমন ধরো, সার্জিকালি কোনো ভ্রান্তি দূর করা সম্ভব নয়। সেটি সার্জারির অন্তর্ভুক্ত নয়। সপ্তদশ শতাব্দীর একজন গুরুত্বপূর্ণ দার্শনিক *লাইবনিজ* (Liebniz) মন্তব্য করেছিলেন যে, বস্তুগত জিনিস আর আধ্যাত্মিক বিষয়ের মধ্যে সঠিক পার্থক্য হচ্ছে বস্তুকে ছোট থেকে আরও ছোট অংশে ভেঙে ফেলা যায়; কিন্তু আত্মাকে এমনকি দুই ভাগেও ভাগ করা যায় না।'

'না, তা সম্ভব নয়। ও-কাজে কোন ধরনের ছুরি ব্যবহার করবেন আপনি?'

অ্যালবার্টো নেক্স তাঁর মাথা নাড়লেন। খানিক পর তিনি দু'জনের মধ্যকার টেবিলটার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করলেন। তারপর বললেন

'সপ্তদশ শতাব্দীর সবচেয়ে বড় দুই দার্শনিক হলেন দেকার্ত আর স্পিনোজা। 'আত্মা' আর 'দেহ'-র মধ্যকার সম্পর্ক সংক্রান্ত প্রশ্ন তাঁদেরকেও ভাবিয়েছে বেশ। এবার আমরা তাঁদের কথা জানবো আরেকটু ভালো করে।'

'বলে যান। কিন্তু সাতটার সময় বাড়ি ফেরার কথা আমার।'

দে কা র্ত

১৬৩৫

...নির্মাণস্থান থেকে সব ময়লা-আবর্জনা সরিয়ে ফেলতে চেয়েছিলেন তিনি...

উঠে পড়লেন অ্যালবার্টো, লাল আলখাল্লাটা খুলে ফেললেন, রেখে দিলেন সেটি একটি চেয়ারের ওপর। তারপর ফের গিয়ে থিতু হলেন কোনার সোফাটায়।

'*রেনে দেকার্ত*-এর (René Descartes) জন্ম ১৫৯৬ খ্রিস্টাব্দে। জীবনের বিভিন্ন সময়ে তিনি ইউরোপের বিভিন্ন দেশে বাস করেছেন। তরুণ বয়সেই মানুষ এবং মহাবিশ্বের স্বরূপ জানার জন্য একটি অন্তর্দৃষ্টি পাবার প্রবল ইচ্ছে জাগে তাঁর মনে। কিন্তু দর্শন পাঠ করার পর নিজের অজ্ঞতা সম্পর্কে ক্রমেই আরও বেশি করে নিশ্চিত হতে থাকেন তিনি।'

'সক্রেটিসের মতো?'

'হ্যাঁ, অনেকটা তাঁর মতোই। সক্রেটিসের মতো তাঁরও নিশ্চিত ধারণা জন্মে যে বিশেষ কিছু জ্ঞান কেবল প্রজ্ঞা-র সাহায্যেই অর্জন করা সম্ভব। প্রাচীন বই-পত্তর আমাদেরকে যা বলে তার ওপর আমরা কখনোই বিশ্বাস করতে পারি না। আমরা এমনকি আমাদের ইন্দ্রিয়গুলোর ওপরও বিশ্বাস রাখতে পারি না।'

'প্লেটোও তাই মনে করতেন। তিনি বিশ্বাস করতেন কেবল প্রজ্ঞাই আমাদেরকে কিছু জ্ঞান দিতে পারে।'

'ঠিক তাই। সক্রেটিস আর প্লেটো থেকে সেন্ট অগাস্টিন হয়ে দেকার্ত পর্যন্ত দর্শনে একটা পরিষ্কার ধারা লক্ষ করা যায়। এঁরা সবাই-ই ছিলেন যাকে বলে আদর্শ বুদ্ধিবাদী (rationalist), প্রজ্ঞা-ই যে জ্ঞান লাভের একমাত্র উপায় সে-ব্যাপারে কোনো সন্দেহ ছিল না তাঁদের। গভীর অধ্যয়নের পর দেকার্ত এই সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছান যে মধ্যযুগ থেকে যে-জ্ঞান প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরের কাছে এসে পৌঁছেছে সেটি খুব একটা নির্ভরযোগ্য নয়। এ-ব্যাপারে তুমি তাঁকে সক্রেটিসের সঙ্গে তুলনা করতে পারো, যিনি এথেন্সের নগর-চত্বরে লোকজনের সঙ্গে কথা বলে যে-সব দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে পরিচিত হতেন বা যে-সব ধারণার কথা জানতে পারতেন সেগুলো বিশ্বাস করতেন না। তো, এ-রকম পরিস্থিতিতে লোকে কী করে, সোফি, বলতে পারো?'

'মানুষ তখন নিজের দর্শন দাঁড় করায়।'

'ঠিক! দেকার্ত ঠিক করলেন তিনি সারা ইউরোপ ঘুরে বেড়াবেন, ঠিক যেমন সক্রেটিস এথেন্সের লোকের সঙ্গে কথা বলে জীবন কাটিয়েছেন। তিনি ঠিক করলেন,

নিজের ভেতর অথবা 'জগতের বিশাল বই'-এ যে-জ্ঞান পাওয়া যাবে তারই অনুসন্ধানে জীবন কাটিয়ে দেবেন। কাজেই, সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়ে যুদ্ধে চলে গেলেন তিনি, তার ফলে মধ্য ইউরোপের বিভিন্ন অংশে বেশ কিছুদিন কাটাবার সুযোগ হলো তাঁর। এরপর তিনি প্যারিসে কাটান কয়েক বছর, তারপর, ১৬২৯-এ চলে যান হল্যান্ড, সেখানে তিনি গণিত আর দর্শন বিষয়ক লেখালেখি নিয়ে কাটিয়ে দেন প্রায় বিশ বছর।

'১৬৪৯-এ রানী ক্রিস্টিনার আমন্ত্রণে তিনি সুইডেন যান। কিন্তু তাঁর ভাষায় সেই 'ভালুক, বরফ আর পাহাড়ের' দেশে তাঁর অবস্থানকালে তিনি নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে ১৬৫০-খ্রিস্টাব্দের শীতকালে মৃত্যুবরণ করেন।'[১৯]

'অর্থাৎ মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স ছিল মাত্র ৫৪ বছর?'

'কিন্তু, এমনকি তাঁর মৃত্যুর পরেও, দর্শনের ওপর গভীর প্রভাব বিস্তার করে গেছেন তিনি। কোনোরকম অতিরঞ্জন ছাড়াই বলা যায় যে দেকার্তই ছিলেন আধুনিক দর্শনের জনক। রেনেসাঁর সময় মানুষ আর প্রকৃতির ঝোড়ো গতির পুনরাবিষ্কারের পর সমসাময়িক চিন্তা-ভাবনাকে একটি সুসম্বদ্ধ দার্শনিক পদ্ধতিতে একত্রিত করার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয় নতুন করে। প্রথম গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতির নির্মাতা ছিলেন দেকার্ত, তারপর এলেন স্পিনোজা আর লাইবনিজ, লক আর বার্কলে, হিউম আর কান্ট।'

'দার্শনিক পদ্ধতি বলতে কী বোঝাতে চাইছেন?'

'বোঝাতে চাইছি এমন এক দর্শনের কথা যে-দর্শন তৈরি হয়েছে একেবারে মাটি থেকে ওপরের দিকে আর যা কিনা দর্শনের একেবারে মূল প্রশ্নগুলোর ব্যাখ্যা খুঁজে বের করার কাজে নিয়োজিত। প্রাচীন যুগের মহান পদ্ধতি-নির্মাতা ছিলেন প্লেটো আর অ্যারিস্টটল। মধ্যযুগে ছিলেন সেন্ট টমাস অ্যাকুইনাস, যিনি অ্যারিস্টটলের দর্শন আর খ্রিস্টীয় ঈশ্বরতত্ত্বের মধ্যে একটি সেতু তৈরি করতে চেয়েছিলেন। এরপর এলো রেনেসাঁ-প্রকৃতি ও বিজ্ঞান, ঈশ্বর ও মানুষ সম্পর্কে পুরনো আর নতুন বিশ্বাসের এক ধারাস্রোত নিয়ে। সপ্তদশ শতাব্দীর আগ পর্যন্ত দার্শনিকেরা নতুন ধারণাগুলোকে একটি স্বচ্ছ দার্শনিক পদ্ধতিতে বিন্যস্ত করার চেষ্টা করেননি। আর সে-কাজটা যিনি প্রথম করলেন তিনি দেকার্ত। পরবর্তী প্রজন্মগুলোতে যা কিনা হবে দর্শনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প তারই বার্তাবহ ছিল তাঁর কাজ। দেকার্তের চিন্তার মূল বিষয় ছিল আমরা যা জানতে পারি, বা অন্যভাবে বললে, *সুনিশ্চিত জ্ঞান* (certain knowledge)। অন্য আরেকটা যে বড় প্রশ্ন তাঁকে ব্যস্ত রেখেছিল তা হচ্ছে *দেহ এবং মনের মধ্যকার সম্পর্ক*। এই দুই প্রশ্নই ছিল পরবর্তী দেড়শত বছরের দার্শনিক বিতর্কের মূল বিষয়।'

'তিনি নিশ্চয়ই তাঁর সময়ের থেকে এগিয়ে ছিলেন।'

'তা ঠিক, কিন্তু এটা সে-যুগেরও প্রশ্ন ছিল। বিশেষ কোনো জ্ঞান অর্জনের প্রশ্নে

---

১৯. আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, হুগো গ্রোটিয়াস (Hugo Grotius, ১৫৮৩-১৬৪৫) নামের এক ওলন্দাজ দার্শনিকও ক্রিস্টিনা-র আমন্ত্রণে সুইডেনে গিয়ে তাঁকে দর্শন শিক্ষাদানের সময় নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন—অনুবাদক।

তাঁর সমসাময়িক অনেকেই পুরোপুরি দার্শনিক *সংশয়বাদের* পরিচয় দিয়েছিলেন। তাঁরা মনে করতেন মানুষের এ-কথাটি মেনে নেয়া উচিত যে সে কিছুই জানে না। কিন্তু দেকার্ত সে-কথা মানতে চাইলেন না। মানলে তিনি কখনোই একজন খাঁটি দার্শনিক হতে পারতেন না। আবারও সক্রেটিসের সঙ্গে তুলনা টেনে আনতে পারি আমরা; তিনিও সোফিস্টদের সংশয়বাদ মেনে নেননি। তাছাড়া, দেকার্তের সময়-ই নতুন প্রাকৃতিক বিজ্ঞান এমন একটি পদ্ধতির জন্ম দিচ্ছিল যার সাহায্যে প্রাকৃতিক ঘটনাবলী বা প্রক্রিয়াসমূহের একটা বিশেষ এবং সঠিক বর্ণনা দেয়া যায়।

'দেকার্ত-ও বাধ্য হলেন নিজেকে এই প্রশ্ন করতে যে দার্শনিক চিন্তা-ভাবনারও এ-রকম কোনো বিশেষ আর সঠিক পদ্ধতি রয়েছে কিনা।'

'সেটি বুঝতে পারছি।'

'কিন্তু ওটা হলো পুরো ব্যাপারটার একটা অংশ মাত্র নতুন পদার্থবিদ্যা-ও বস্তুর স্বরূপ সম্পর্কে অর্থাৎ কোন জিনিসটি প্রকৃতির বাস্তব প্রক্রিয়া (physical process) নির্ধারণ করে সে-ব্যাপারে প্রশ্ন তুলেছিল তখন। প্রকৃতির একটি যান্ত্রিক রূপের পক্ষেই মানুষের মতের প্রকাশ ঘটছিল দিন দিন আরও বেশি করে। কিন্তু বাস্তব জগৎকে যতই যান্ত্রিকভাবে দেখা হচ্ছিল দেহ আর আত্মার সম্পর্ক সংক্রান্ত প্রশ্নটিও ততই জরুরি হয়ে দেখা দিচ্ছিল। সপ্তদশ শতাব্দীর আগ পর্যন্ত আত্মাকে সাধারণত 'জীবনের প্রশ্বাস' হিসেবে মনে করা হতো যা কিনা সমস্ত জীবন্ত প্রাণীর ভেতর জুড়ে থাকে। 'আত্মা' (soul) এবং 'চিদাত্মা' (spirit) শব্দের মূল অর্থ অবশ্য শ্বাস বা শ্বাসকার্য। ইউরোপীয় প্রায় সমস্ত ভাষাতেই তাই। অ্যারিস্টটলের কাছে আত্মা এমন একটা জিনিস যা কোনো অর্গানিজম বা জীবদেহ-র সমস্ত জায়গা জুড়ে থাকে সেটির 'জীবন ধারা' হিসেবে, ফলে সেটিকে দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো কিছু বলে চিন্তা করা যায় না। সে-কারণে তাঁর পক্ষে উদ্ভিদ আত্মা বা প্রাণী আত্মা-র কথা বলা সম্ভব ছিল। সপ্তদশ শতাব্দীর আগ পর্যন্ত দার্শনিকেরা আত্মা ও দেহের মধ্যে মৌলিক কোনো পার্থক্যের কথা বলেননি। তার কারণ হচ্ছে, সমস্ত বস্তুগত জিনিসের—দেহ, প্রাণী বা মানুষের—গতিকে যান্ত্রিক প্রক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত বলে ব্যাখ্যা করা হতো। কিন্তু মানুষের আত্মা নিশ্চয়ই এই দেহযন্ত্রের অংশ হতে পারে না, তাই না? তাহলে আত্মা কী? এই প্রশ্নের যেমন একটা ব্যাখ্যা দরকার ছিল ঠিক তেমনি এই ব্যাপারটিরও একটি ব্যাখ্যা প্রয়োজন ছিল যে 'আধ্যাত্মিক' একটা কিছু কী করে একটা যান্ত্রিক প্রক্রিয়া শুরু করতে পারে।'

'এটা কিন্তু সত্যিই একটা অদ্ভুত ধারণা।'

'কোনটা?'

'আমি ঠিক করলাম হাত ওঠাবো আর তখনই হাতটা নিজে নিজে উঠে গেল। কিংবা ভাবলাম বাস ধরতে ছুটবো, ঠিক পরের মুহূর্তেই আমার পাগুলো নড়ে উঠল। কিংবা দুঃখের কোনো কিছু ভাবছি, হঠাৎ করেই কাঁদতে শুরু করলাম। কাজেই দেহ আর চৈতন্যের (consciousness) মধ্যে নিশ্চয়ই রহস্যময় একটা সম্পর্ক রয়েছে।'

'ঠিক এই সমস্যা থেকেই দেকার্তের চিন্তা-ভাবনাগুলো ডানা মেলতে শুরু করে। প্লেটোর মতো তিনিও এ-ব্যাপারে নিশ্চিত ছিলেন যে চিদাত্মা আর বস্তুর মধ্যে একটি সুস্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে। কিন্তু মন কীভাবে দেহকে প্রভাবিত করে—বা *আত্মা*

দেহকে—প্লেটো সে-প্রশ্নের কোনো জবাব দিতে পারেননি।'

'আমিও পারছি না, তাই আমি শুনতে চাইছি দেকার্ত এ-ব্যাপারে কোন তত্ত্ব দিলেন।'

'তাহলে চলো তাঁর নিজস্ব যুক্তি কী ছিল তাই শোনা যাক।'

এই বলে অ্যালবার্টো তাঁদের দু'জনের মধ্যকার টেবিলটার ওপর যে-বইটা রয়েছে সেটির দিকে আঙুল তুললেন।

'একটা দার্শনিক সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে দার্শনিককে কোন পদ্ধতি অবশ্যই অবলম্বন করতে হবে সে-ব্যাপারে প্রশ্ন তুললেন দেকার্ত তাঁর *ডিসকোর্স* অন মেথড নামক বইতে। বিজ্ঞান এরই মধ্যে একটি নতুন পদ্ধতি পেয়ে গিয়েছিল... ।'

'হ্যাঁ, সে-রকমই বলেছিলেন আপনি।'

'দেকার্তের মত অনুযায়ী, কোনো কিছুকে পরিষ্কার এবং আলাদাভাবে ইন্দ্রিয় দিয়ে প্রত্যক্ষ (perceive) না করা পর্যন্ত আমরা সেটিকে সত্য বলে মেনে নিতে পারি না। সেজন্য, কোনো জটিল সমস্যাকে যতগুলো সম্ভব একক সমস্যায় ভেঙে নেয়া বা ছোট করে নেয়া দরকার হতে পারে। তখন সেগুলোর মধ্যে সবচেয়ে সহজ ভাব থেকে আমরা আমাদের কাজ শুরু করতে পারি। এক অর্থে তুমি বলতে পারো যে প্রতিটি একক চিন্তাকে যাচাই করতে হবে, পরিমাপ করে নিতে হবে, গ্যালিলিও যেভাবে সব কিছুরই পরিমাপ করে নিতে চেয়েছিলেন, যেটাকে পরিমাপ করা যায় না সেটিকে পরিমাপের যোগ্য করে নিতে চেয়েছিলেন, অনেকটা সেভাবে। দেকার্ত বিশ্বাস করতেন দর্শনের অগ্রসর হওয়া উচিত সরল থেকে জটিলের দিকে। কেবল তখনই সম্ভব হবে একটা নতুন অন্তর্দৃষ্টি পাওয়া। সবশেষে নিরন্তর গোনা-গুনতি আর নিয়ন্ত্রণের মধ্য দিয়ে এই বিষয়টি নিশ্চিত করা দরকার হবে যে কোনো কিছুই বাদ পড়ে যায়নি। আর তখনই হাতের নাগালে এসে ধরা দেবে একটা দার্শনিক সিদ্ধান্ত বা উপসংহার।'

'এতো রীতিমতো অঙ্ক পরীক্ষার মতো শোনাচ্ছে।'

'ঠিক বলেছো। দেকার্ত গণিতবিদ ছিলেন; তাঁকে বিশ্লেষণাত্মক জ্যামিতির জনক বলা হয়। বীজগণিতের ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে গেছেন তিনি। দার্শনিক মত গঠন করার সময়ও 'গাণিতিক পদ্ধতি' ব্যবহার করতে চেয়েছেন দেকার্ত। লোকে যেভাবে গাণিতিক উপপাদ্য প্রমাণ করে তিনি সেভাবেই দর্শনগত সত্য প্রমাণ করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। অন্য কথায় বলতে গেলে, আমরা যখন ফিগার নিয়ে কাজ করি তখন আমরা যে হাতিয়ার বা যন্ত্র ব্যবহার করি, তিনিও ঠিক সেই হাতিয়ার বা যন্ত্র ব্যবহার করতে চাইলেন আর সেই যন্ত্রের নাম *প্রজ্ঞা*, কারণ কেবল প্রজ্ঞাই আমাদেরকে নিশ্চিতি দিতে পারে। আমাদের ইন্দ্রিয়গুলোর ওপর একেবারেই ভরসা রাখা চলে না। দেকার্তের সঙ্গে এরই মধ্যে আমরা প্লেটোর সাদৃশ্যের কথা উল্লেখ করেছি এবং প্লেটোও মনে করতেন ইন্দ্রিয়গুলোর দেয়া প্রমাণের চেয়ে অঙ্ক আর সংখ্যাগত অনুপাত-ই বেশি নিশ্চয়তা দিতে পারে আমাদেরকে।'

'কিন্তু দর্শনগত সমস্যাগুলো কি এভাবে সমাধান করা যায়?'

'আমরা বরং দেকার্তের নিজের চিন্তাধারার কথায় ফিরে যাই। দেকার্তের লক্ষ্য হলো জীবনের স্বরূপ বা প্রকৃতি সম্পর্কে নিশ্চয়তায় পৌছানো আর তাঁর যাত্রা শুরু হলো

এই মত থেকে যে গোড়াতে সবারই উচিত সবকিছুই সন্দেহ করা। তার মানে তিনি স্রেফ বালুর ওপর তাঁর বাড়ি তৈরি করতে চাননি।'

'চাননি তার কারণ ভিত্তিটাই যদি নড়ে যায় তাহলে গোটা বাড়িটাই ভেঙে পড়বে হুড়মুড় করে।'

'একেবারে ঠিক বলেছো। তো, সবকিছুকে সন্দেহ করা যে যুক্তিসঙ্গত নয় সেটি যে দেকার্ত বোঝেননি তা নয়, কিন্তু তিনি ভেবেছিলেন *নীতিগতভাবে* সব কিছুকেই সন্দেহ করা সম্ভব। যেমন ধরো, প্লেটো বা অ্যারিস্টটল পড়ে আমরা যে আমাদের দার্শনিক লক্ষ্যের দিকে এগোচ্ছি সেটি কোনোমতেই নিশ্চিতভাবে ধরে নেয়া যায় না। এতে ইতিহাস সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান বাড়তে পারে, কিন্তু জগৎ সম্পর্কে নয়। একান্ত ই নিজের দর্শনগত ধারণা সৃষ্টির আগে কাল পরম্পরায় চলে আসা বা গৃহীত সব ধরনের শিক্ষা থেকে নিজেকে মুক্ত করা দেকার্তের জন্য অত্যন্ত জরুরি ছিল।'

'নিজের বাড়ি তৈরির আগে নির্মাণস্থান থেকে সব ময়লা-আবর্জনা সরিয়ে ফেলতে চেয়েছিলেন তিনি ।'

'ধন্যবাদ। তাঁর নতুন চিন্তা দিয়ে গড়া অট্টালিকা যে কিছু দিন যেতে না যেতেই ভেঙে পড়বে না এই বিষয়ে নিশ্চিত হওয়ার জন্য তিনি একেবারে নতুন মাল-মশলা ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন। তবে দেকার্তের সন্দেহ কিন্তু ছিল আরও গভীরে। তিনি বললেন, আমাদের ইন্দ্রিয়গুলো আমাদেরকে যা বলে আমরা এমনকি সে-কথাও বিশ্বাস করতে পারি না। ইন্দ্রিয়গুলো তো আমাদেরকে ফাঁকিও দিতে পারে।'

'কী করে?'

'স্বপ্ন দেখার সময় আমাদের মনে হয় আমরা বাস্তবেই রয়েছি। আমাদের জাগ্রত অবস্থার অনুভূতি আর স্বপ্নকালীন অনুভূতির মধ্যে পার্থক্য ঠিক কোনখানে?'

'দেকার্ত লিখেছেন 'বিষয়টি অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে বিবেচনা করার সময় আমি এমন একটি বৈশিষ্ট্য-ও লক্ষ করি না যা জাগ্রত অবস্থা আর স্বপ্ন দেখার সময়ের অবস্থার মধ্যে নিশ্চিতভাবে কোনো পার্থক্য নির্দেশ করতে পারে। আপনার গোটা জীবনটাই যে একটা স্বপ্ন নয় সে-ব্যাপারে আপনি নিশ্চিত হবেন কীভাবে?'

'ব্যারনের বিছানায় ঘুমাবার পর জেপ ভেবেছিল সে স্রেফ স্বপ্ন দেখছিল।'

'আর সে যখন ব্যারনের বিছানায় শুয়ে ছিল তখন তার কাছে মনে হয়েছিল গরিব কৃষক হিসেবে তার জীবনটা একটা স্বপ্ন ছাড়া কিছু নয়। তো, এভাবেই দেকার্ত সব কিছুকেই সন্দেহ করতে লাগলেন। তাঁর আগে অনেক দার্শনিকই এইখানে এসে আর কোনো পথ খুঁজে পাননি।'

'অর্থাৎ তাঁরা তাহলে বেশি দূর যেতে পারেননি।'

'কিন্তু দেকার্ত এই জিরো পয়েন্ট থেকেই এগোতে চাইলেন। সবকিছুকেই সন্দেহ করলেন তিনি আর একমাত্র এই বিষয়টি সম্পর্কেই অর্থাৎ সন্দেহের ব্যাপারেই কেবল নিশ্চিত ছিলেন তিনি। কিন্তু এরপর হঠাৎ একটা ব্যাপার মনে হলো তাঁর : একটা বিষয় সত্য হতেই হবে আর তা হলো তিনি যে এই সন্দেহ করছেন সেই বিষয়টি। এবং যখন তিনি সন্দেহ করেন তখন নিশ্চয়ই তিনি চিন্তা করেন আর যেহেতু তিনি চিন্তা করছেন তাহলে নিশ্চয়ই তিনি একটি চিন্তাশীল প্রাণী। বা, তিনি নিজে যেভাবে ব্যাপারটি বর্ণনা

করেছিলেন সেভাবে বললে কজিটো এর্গো সাম (Cogito ergo sum)।'

'তার মানে?'

'আমি চিন্তা করি, তাই আমি আছি।'

'তিনি যে বিষয়টি উপলব্ধি করেছিলেন তাতে অবাক হচ্ছি না আমি।'

'স্বাভাবিক। কিন্তু যে স্বজ্ঞামূলক (intuitive) নিশ্চয়তার সঙ্গে নিজেকে হঠাৎ করে তিনি একটি চিন্তাশীল সত্তা হিসেবে প্রত্যক্ষ করলেন সেটি খেয়াল করো। হয়ত এ-প্রসঙ্গে তোমার প্লেটোর কথা মনে পড়বে; তিনি বলেছিলেন আমরা আমাদের ইন্দ্রিয় দিয়ে যা বুঝতে পারি তারচেয়ে আমরা আমাদের প্রজ্ঞা দিয়ে যা বুঝতে পারি সেটিই বেশি বাস্তব। দেকার্তের বেলাতেও ব্যাপারটি তাই। তিনি যে একটি চিন্তাশীল *আমি* সেটিই যে তিনি কেবল উপলব্ধি করলেন তাই নয়, সেই সঙ্গে তিনি আরও উপলব্ধি করলেন যে এই চিন্তাশীল আমি আমাদের ইন্দ্রিয়গুলোর সাহায্যে প্রত্যক্ষ করা বস্তুজগতের চেয়েও বেশি বাস্তব। তো, এভাবেই এগিয়ে চললেন তিনি। তাঁর দর্শনগত অনুমান শুধু ওইটুকুতেই শেষ হয়ে গেল না।'

'এরপর কী এলো?'

'একই রকম স্বজ্ঞামূলক নিশ্চয়তা দিয়ে তিনি অন্য কিছু প্রত্যক্ষ করতে পারছেন কিনা সে-কথা নিজেকে শুধোলেন তিনি। তখন তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে তাঁর নিজের মনের মধ্যে একটি নিখুঁত সত্তা সম্পর্কে একটি পরিষ্কার ও স্বতন্ত্র ধারণা রয়েছে। এই ধারণাটি তাঁর সব সময়েই ছিল, ফলে এটা দেকার্তের কাছে আপনা আপনি প্রমাণিত হয়ে গেল যে এমন একটি ধারণা সম্ভবত তাঁর নিজের ভেতর থেকে আসতে পারে না। তিনি দাবি করলেন, যে-সত্তা নিজেই ক্রটিযুক্ত তার কাছ থেকে কখনো ক্রটিহীন বা নিখুঁত কোনো সত্তার ধারণা আসতে পারে না। কাজেই একটি নিখুঁত সত্তার ধারণা নিশ্চয়ই স্বয়ং সেই নিখুঁত সত্তাটির কাছ থেকেই এসেছে, বা অন্যভাবে বলতে গেলে, ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছে। অতএব, ঈশ্বরের যে অস্তিত্ব আছে এই ধারণাটি দেকার্তের কাছে ঠিক ততোটাই স্বতঃপ্রমাণিত একটি বিষয় যতটা এই ধারণাটি যে একটি চিন্তাশীল সত্তা অবশ্যই অস্তিত্বশীল।'

'এই জায়গায় এসে তিনি লাফ দিয়ে সিদ্ধান্তে পৌছে গিয়েছিলেন দেখছি। গোড়াতে তো আরও বেশি সাবধানী ছিলেন তিনি।'

'ঠিকই বলেছ তুমি। অনেকেই এটাকে তাঁর দুর্বল দিক বলে বর্ণনা করেছেন। তবে তুমি বললে 'সিদ্ধান্ত'। আসলে এটা কিন্তু কোনো কিছু প্রমাণ করার বিষয় ছিল না। দেকার্ত শুধু বলতে চেয়েছেন যে আমাদের সবার মধ্যেই একটি নিখুঁত সত্তার ধারণা বিদ্যমান আর সেই ধারণাটির মধ্যেই এই সত্যটি লুকিয়ে রয়েছে যে এই নিখুঁত সত্তাটি অবশ্যই অস্তিত্বশীল। কারণ, যদি সেটির অর্থাৎ নিখুঁত সত্তাটির অস্তিত্বই না থাকে তাহলে আর সেটি নিখুঁত হয় কী করে। তাছাড়া নিখুঁত কোনো সত্তা না থাকলে সেটি সম্পর্কে আমাদের মনে কোনো ধারণাও থাকত না। আমরা যেহেতু নিখুঁত নই, তাই নিখুঁতত্বের ধারণা আমাদের কাছ থেকে আসতে পারে না। দেকার্তের মত অনুযায়ী ঈশ্বরের ধারণা সহজাত (innate); 'কারিগরের তৈরি জিনিসে যেমন তার চিহ্নের ছাপ মারা থাকে' এই ধারণাটির ছাপও আমাদের জন্ম থেকেই আমাদের ওপর

মারা আছে।'

'বুঝলাম, কিন্তু আমার মনে ক্রকোফ্যান্টের (crocophant) ধারণা থাকার মানেই তো এই নয় যে ক্রকোফ্যান্টের অস্তিত্ব রয়েছে।'

'দেকার্ত হয়ত বলতেন যে ক্রকোফ্যান্টের ধারণার ভেতর সহজাতভাবেই এই বিষয়টি নিহিত নেই যে ক্রকোফ্যান্টের অস্তিত্ব রয়েছে। অন্যদিকে, একটি নিখুঁত সত্তার ধারণার মধ্যেই কিন্তু এই বিষয়টি সহজাতভাবে নিহিত রয়েছে যে এ-ধরনের সত্তা অস্তিত্বশীল। দেকার্তের মত অনুযায়ী, ব্যাপারটা ঠিক ততোটাই নিশ্চিত যতটা নিশ্চিত বৃত্ত সম্পর্কিত এই সহজাত ধারণাটি যে বৃত্তের পরিধির যে কোনো বিন্দু বৃত্তের কেন্দ্র থেকে সমান দূরত্বে অবস্থিত। এই সূত্রের সঙ্গে মেলে না এমন কোনো বৃত্ত তুমি পাবে না। ঠিক তেমনি, এমন কোনো নিখুঁত সত্তা তুমি পাবে না যার মধ্যে সেটির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যটি-ই, অর্থাৎ সেটির অস্তিত্ব নেই।'

'এ বড় অদ্ভুত ধরনের চিন্তা।'

'এটা একেবারেই বুদ্ধিবাদী ধরনের চিন্তা। সক্রেটিস আর প্লেটোর মতো দেকার্তও বিশ্বাস করতেন যে প্রজ্ঞা আর সত্তা-র মধ্যে একটা সম্পর্ক রয়েছে। কারও প্রজ্ঞার কাছে কোনো জিনিস যত বেশি স্বতঃপ্রমাণিত হবে, ততোই বেশি করে এটা নিশ্চিত হবে যে সে-জিনিসটির অস্তিত্ব রয়েছে।'

'তো, আপাতত তিনি এ-পর্যন্ত পৌঁছলেন যে তিনি একজন চিন্তাশীল ব্যক্তি আর দ্বিতীয়ত, এক নিখুঁত সত্তার অস্তিত্ব রয়েছে।'

'হ্যাঁ আর এই যাত্রাবিন্দু থেকেই এগোতে শুরু করলেন তিনি। বাহ্যিক বাস্তবতা, এই যেমন সূর্য, চন্দ্র ইত্যাদি, এ-সব সম্পর্কে আমাদের ধারণার প্রশ্নে একটা সম্ভাবনা রয়েছে যে এগুলো হয়ত কল্পনা বা ফ্যান্টাসি। কিন্তু এই বাহ্যিক বাস্তবতারও এমন কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা আমরা আমাদের প্রজ্ঞার সাহায্যে প্রত্যক্ষ বা উপলব্ধি করতে পারি। এগুলো হচ্ছে গাণিতিক বৈশিষ্ট্য, বা অন্য কথায় বললে, সেই সব জিনিস যা পরিমাপ করা যায়, যেমন দৈর্ঘ্য, প্রস্থ এবং পুরুত্ব। এ-সব 'সংখ্যাবাচক' বৈশিষ্ট্য আমার প্রজ্ঞার কাছে ঠিক ততটাই পরিষ্কার আর স্বতন্ত্র যতটা পরিষ্কার এবং স্বতন্ত্র এই সত্যটি যে আমি একটি চিন্তাশীল সত্তা। অন্যদিকে রঙ, গন্ধ আর স্বাদের মতো 'গুণবাচক' বৈশিষ্ট্য আমাদের ইন্দ্রিয়গত প্রত্যক্ষণ বা উপলব্ধির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, ফলে সেগুলো বাহ্যিক বাস্তবতাকে বর্ণনা করে না।'

'প্রকৃতি তাহলে আদৌ স্বপ্ন নয়।'

'না আর এই প্রসঙ্গে দেকার্ত আবারও সেই নিখুঁত সত্তা সম্পর্কে আমাদের ধারণার দ্বারস্থ হচ্ছেন। আমাদের প্রজ্ঞা যখন কোনো কিছুকে পরিষ্কার এবং স্বতন্ত্রভাবে চিনতে পারে—এই যেমন বাহ্যিক বাস্তবতার গাণিতিক বৈশিষ্ট্যগুলোর মতো—তখন তা অবশ্যই সে-রকমই হবে। কারণ, এক নিখুঁত ঈশ্বর আমাদেরকে ধোঁকা দেবেন না। আমাদের প্রজ্ঞার সাহায্যে আমরা যা প্রত্যক্ষ করি তা যে বাস্তবতার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত এ-বিষয় দেকার্ত 'ঈশ্বরের গ্যারান্টি'-র কথা জোর দিয়ে বলেছেন।'

'বেশ, এ-পর্যন্ত তিনি যা যা আবিষ্কার করলেন তা হলো তিনি একটি চিন্তাশীল সত্তা, ঈশ্বর আছেন আর একটি বাহ্যিক বাস্তবতার অস্তিত্ব রয়েছে।'

'হ্যাঁ, কিন্তু বাহ্যিক বাস্তবতা নিশ্চিতভাবেই চিন্তার বাস্তবতা থেকে ভিন্ন। দেকার্ত এবার বললেন যে দুই ধরনের বাস্তবতা বা 'সারবস্তু' রয়েছে। একটি সারবস্তু হচ্ছে *চিন্তা* (thought) বা *মন* (mind), অন্যটি *ব্যাপ্তি* (extension) বা বস্তু (matter)। মন পুরোপুরি সচেতন এবং স্থানগত দিক দিয়ে এটা কোনো জায়গা দখল করে না, ফলে এটাকে ছোট ছোট খণ্ডে বিভক্ত করা যায় না। বস্তু অবশ্য পুরোপুরি ব্যাপ্তি, এটা জায়গা দখল করে স্থানগত দিক দিয়ে এবং একে ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর অংশে বিভক্ত করা চলে, তবে এর কোনো চৈতন্য বা চেতনা নেই। দেকার্তের মত অনুযায়ী দুই সারবস্তুই ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছে, কারণ একমাত্র ঈশ্বর-ই অন্য কোনো কিছুর মুখাপেক্ষী না হয়েও অস্তিত্বশীল। তবে চিন্তা আর ব্যাপ্তি ঈশ্বরের কাছ থেকে এলেও দুটো জিনিসের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই। চিন্তা পুরোপুরি বস্তু নিরপেক্ষ এবং উল্টোভাবে, বস্তুগত প্রক্রিয়া একেবারে চিন্তা নিরপেক্ষ।'

'তার মানে, ঈশ্বরের সৃষ্টিকে তিনি দু'ভাগে বিভক্ত করলেন।'

'ঠিক তাই। দেকার্তকে *দ্বৈতবাদী* (dualist) বলা হয়। তার অর্থ, তিনি চিন্তার বাস্তবতা এবং বস্তুগত বাস্তবতার মধ্যে একটি সুস্পষ্ট পার্থক্যে বিশ্বাস করতেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কেবল মানুষেরই মন আছে। জীব-জন্তুরা পুরোপুরি বস্তুগত বাস্তবতার অন্তর্ভুক্ত। তাদের জীবনযাপন এবং চলাফেরা যান্ত্রিকভাবে সম্পন্ন হয়। জন্তুকে দেকার্ত একটি জটিল স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র হিসেবে দেখতেন। বস্তুগত বাস্তবতা সম্পর্কে তিনি পুরোপুরি যান্ত্রিক একটি দৃষ্টিভঙ্গির আশ্রয় নিয়েছেন, ঠিক বস্তুবাদীদের মতো।'

'হার্মেস কিন্তু একটি যন্ত্র বা স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র বলে আমার একেবারেই মনে হয় না। ঘোর সন্দেহ আছে আমার এ-ব্যাপারে। দেকার্ত নিশ্চয়ই জীব-জন্তু ভালোবাসতেন না। তা, আমরা কী? আমরা কি স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র?'

'হ্যাঁ, আবার না। দেকার্ত এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন যে মানুষ একটি দ্বৈত প্রাণী যা চিন্তা-ভাবনাও করে, আবার স্থানগত দিক দিয়ে জায়গাও দখল করে। অর্থাৎ মানুষের একটি মন আছে আর আছে বস্তুগত দেহ। সেন্ট অগাস্টিন আর টমাস অ্যাকুইনাস অনেকটা এ-রকম কথাই বলেছিলেন আগে; তাঁরা বলেছিলেন জীব-জন্তুর মতো মানুষের একটি দেহ আছে আর দেবদূতদের মতো আত্মা আছে। দেকার্তের মত অনুযায়ী মানুষের দেহ একটি নিখুঁত যন্ত্র। কিন্তু মানুষের একটি মনও আছে যা দেহ-নিরপেক্ষভাবে অর্থাৎ দেহের সাহায্য ছাড়াই কাজকর্ম করতে পারে। দেহগত প্রক্রিয়াগুলোর এতোটা স্বাধীনতা নেই, তারা তাদের নিজেদের আইন অনুযায়ী চলে। তবে আমরা আমাদের প্রজ্ঞা দিয়ে যা কিছু চিন্তা করি তা দেহে ঘটে না, ঘটে মনে, যে-মন ব্যক্তিগত বাস্তবতা থেকে সম্পূর্ণ স্বাধীন। ভালো কথা, আমার অবশ্য এ-কথাটাও বলা উচিত যে জীব-জন্তুরা যে চিন্তা-ভাবনা করতে পারে এ-রকম সম্ভাবনার কথা দেকার্ত একেবারে নাকচ করে দেননি। তবে সে-গুণটি তাদের থাকলে চিন্তা আর ব্যাপ্তি মধ্যকার একই দ্বৈততা (dualism) তাদের বেলাতেও প্রযোজ্য হবে।'

'এটা নিয়ে আগেও কথা বলেছি আমরা। বাসের পেছনে ছুটবো বলে ঠিক করলে পুরো 'স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রটাই' কাজে নেমে পড়ে। আর বাসটা ধরতে না পারলে আমি

কাঁদতে শুরু করি।'

'মন আর দেহের মধ্যে যে অবিরাম একটা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার খেলা চলে দেকার্ত সে-কথা অস্বীকার করতে পারেননি। তিনি বিশ্বাস করতেন, মন যতক্ষণ দেহের মধ্যে আছে ততক্ষণ তা মস্তিষ্কের সঙ্গে বিশেষ একটি ব্রেইন অরগ্যানের সাহায্যে—যেটাকে তিনি বলেছেন পিনিয়াল গ্রন্থি—সেটির সাহায্যে যুক্ত থাকে আর সেই পিনিয়াল গ্রন্থিতে 'চিদাত্মা' আর 'বস্তু'-র মধ্যে অনবরত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া চলে। কাজেই, দেহগত প্রয়োজনের সঙ্গে সম্পর্কিত আবেগ-অনুভূতি মনকে অনবরত প্রভাবিত করতে পারে। কিন্তু মন এ-সব 'নিচ' তাড়না থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে স্বাধীনভাবে, দেহের পরোয়া না করে, কাজ করতে পারে। উদ্দেশ্য, প্রজ্ঞাকে চালকের আসনে আসীন করা। কারণ, আমার পাকস্থলীতে নিদারুণ ব্যথা হলেও ত্রিভুজের তিন কোণের সমষ্টি ১৮০ ডিগ্রিই থাকবে। তো এভাবেই, দেহগত প্রয়োজনের উর্ধ্বে উঠে যুক্তিসঙ্গতভাবে আচরণ করার ক্ষমতা মানুষের রয়েছে। এদিক থেকে বিচার করলে মন দেহের চেয়ে উঁচু অবস্থানে রয়েছে। আমাদের পায়ের বয়স হতে পারে, সেগুলো দুর্বল হয়ে পড়তে পারে, পিঠটা বেঁকে যেতে পারে, পড়ে যেতে পারে সবকটি দাঁত, কিন্তু আমাদের ভেতর প্রজ্ঞা যতক্ষণ কাজ করছে ততক্ষণ দুই আর দুইয়ে চার হয়ে যেতেই থাকবে। প্রজ্ঞা কখনো বেঁকে যায় না বা দুর্বল হয়ে পড়ে না। দেহই বরং বুড়িয়ে যায়। দেকার্তের মত অনুযায়ী, মন মূলগতভাবেই চিন্তা। কামনা আর ঘৃণার মতো হীনতর আবেগ-অনুভূতিগুলো আমাদের দেহগত কাজকর্মের সঙ্গেই বরং আরও বেশি জড়িত, ফলে ব্যক্তিগত বাস্তবতার সঙ্গে।'

'আমি এই ব্যাপারটাই বুঝে উঠতে পারছি না যে দেকার্ত কী করে মানব দেহকে যন্ত্র বা স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের সঙ্গে তুলনা করলেন।'

'তুলনাটা মূলত এই বিষয়টি থেকে এসেছে যে তাঁর সময়ে লোকে ভীষণ মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল যন্ত্র আর ঘড়ির ক্রিয়াকর্ম দেখে যেগুলো নিজের থেকেই কাজ করে যায় বলে আপাতদৃষ্টিতে মনে হতো। ওগুলো যে আপনা থেকেই কাজ করে সেটি স্পষ্টই একটা বিভ্রান্তি ছাড়া কিছু ছিল না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, একটা অ্যাস্ট্রনমিকাল ঘড়ি তৈরিও করতে হয়, হাত দিয়ে সেটিকে দমও দিতে হয়। দেকার্ত বললেন যে ওসব অসাধারণ আবিষ্কার আসলে মানুষ আর জীবজন্তুর দেহ অসংখ্য যে হাড়, পেশি, স্নায়ু, শিরা, উপশিরা আর ধমনীর সমন্বয়ে তৈরি সে-তুলনায় অনেক স্বল্প সংখ্যক পার্টস দিয়ে তৈরি। যান্ত্রিক নিয়মের ওপর ভিত্তি করে একটি জন্তু বা মানুষের দেহ তৈরি করতে না পারার মতো কোনো কারণ ঈশ্বরের নেই।'

'ইদানীং 'কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা' নিয়ে মেলা কথা শোনা যাচ্ছে।'

'হ্যাঁ, ওটাই হলো আমাদের কালের স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র। আমরা এমন সব যন্ত্র তৈরি করেছি যা আমাদের মনে কখনো কখনো এই মিথ্যা বিশ্বাসের জন্ম দেয় যে সেগুলো বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন। এ-ধরনের যন্ত্রগুলো দেকার্তকে হয়ত আতঙ্কে হতবুদ্ধি করে দিত। তিনি যতটা মনে করেছিলেন মানুষের প্রজ্ঞা কি আসলেই এত মুক্ত ও স্বাধীন কিনা তা নিয়ে হয়ত সন্দেহ দেখা দিত তাঁর মনে। এবং কিছু কিছু দার্শনিক রয়েছেন যাঁরা বিশ্বাস করেন মানুষের আধ্যাত্মিক জীবন তাঁর দেহগত প্রক্রিয়ার মতোই পরাধীন।

স্বভাবতই, মানুষের আত্মা যে-কোনো ডেটা প্রোগ্রামের চেয়ে অন্তহীনভাবে বেশি জটিল, কিন্তু কিছু লোক মনে করে তত্ত্বগতভাবে আমরা এ-সব ডেটা প্রোগ্রামের মতোই পরাধীন। কিন্তু সোফি, চলো একটা জিনিস দেখাই তোমাকে।'

ঘরের অন্য প্রান্তে বড় একটা লেখার টেবিলের দিকে আঙুল তাক করলেন অ্যালবার্টো। ওটার ওপর ছোট্ট একটা কম্পিউটার রাখা আছে। সেটির কাছে এগিয়ে গেলেন তিনি। সোফিও গেল তাঁর পিছু পিছু।

সুইচ টিপে কম্পিউটারটি চালু করে দিলেন অ্যালবার্টো, শিগ্‌গিরই দেখা গেল স্ক্রিনের একেবারে ওপরে সি লেখা রয়েছে। তিনি লিখলেন 'লায়লা', ব্যাখ্যা করে বললেন এটা একটা উন্নতমানের কথোপকথন প্রোগ্রাম।

শিগ্‌গিরই স্ক্রিনের একেবারে ওপরে কিছু লেখা ফুটে উঠল :

'হাই, আমার নাম লায়লা। তুমি আরাম করে বসেছ তো?'

একটা অক্ষর লিখল সোফি;

'হ্যাঁ,' অবশ্য তখনো বসেনি সোফি। তার জন্য একটা চেয়ার নিয়ে এলেন অ্যালবার্টো নক্স।

'তোমার নাম কী?' স্ক্রিনে লেখা ফুটে উঠল।

সোফি 'সোফি অ্যামুন্ডসেন' লিখতেই কম্পিউটার জবাব দিল :

'৩ ক্লোভার ক্লোজ। তোমার সঙ্গে পরিচিত হয়ে ভালো লাগল, সোফি। তুমি কি তোমার পঞ্চদশ জন্মদিনের জন্য অপেক্ষা করছ?'

চমকে গেল সোফি। অ্যালবার্টো তার কাঁধে একটা হাত রেখে বলে উঠলেন 'আমি ওকে স্রেফ তোমার নাম, ঠিকানা আর জন্ম তারিখটা বলেছিলাম। ব্যাপারটা অনেকটা নতুন কোনো বন্ধুর সঙ্গে পরিচিত হওয়ার মতো। তাদের সম্পর্কে আগে থেকে কিছু জানা থাকা ভালো।'

'মন্দ নয়,' সোফি লিখল।

'আহা তোমার নিশ্চয়ই খারাপ লাগছে না, সোফি। তবে আলাপ করার সময় পুরো বাক্য ব্যবহার করার চেষ্টা করবে।'

'ধন্যবাদ। আমি একদম ঠিক আছি। তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করতে পারি?'

'তুমি ভালো আছো জেনে খুশি হলাম। তা বলো, তুমি কী জানতে চাও।'

'তোমার বয়স কত?' সোফি লিখল।

'১৯৮৮ সালের ৮ অগাস্ট আমাকে আটলান্টায় তৈরি করা হয়। তবে নরওয়েজীয় ভাষায় আমার রূপান্তর ঘটানো হয় ১৯৯০ সালের ২৮ মার্চ, নরওয়েজীয় পলিটেকনিক-এ।'

'গশ্‌!'

'বলেছি না পুরো বাক্য ব্যবহার করবে কথা বলার সময়।'

'আমি শুধু বলেছি গশ্‌।'

'আমি স্ল্যাং বুঝি না। ১০০,০০০-এরও বেশি শব্দ আছে আমার শব্দ ভাণ্ডারে। কিন্তু গশ্‌-এর সবচেয়ে কাছাকাছি যে-শব্দটা আছে তা হলো গসপেল।'

'ওই শব্দটার অর্থ হলো যিশুর গল্প।'

'সোফি, তুমি কি খ্রিস্টান?'

'আমি জানি না।'

'না জানাটাকে নতুন জ্ঞানের দিকে একটি পদক্ষেপ বলেই ধরা হয় সাধারণত।'

'সম্ভবত সক্রেটিসও ঠিক একই কথা বলতেন। বা, দেকার্ত।'

'সক্রেটিস ছিলেন একজন গ্রিক দার্শনিক, তাঁর জন্ম ও মৃত্যু যথাক্রমে ৪৭০ ও ৩৯৯ খ্রিস্ট পূর্বাব্দে। এরচেয়ে বেশি কিছু জানতে চাইলে এফ সেভেন চাপ দাও।

দেকার্ত ছিলেন একজন ফরাসি দার্শনিক; তাঁর জন্ম ও মৃত্যু যথাক্রমে ১৫৯৬ ও ১৬৫০ খ্রিস্টাব্দে। এরচেয়ে বেশি কিছু জানতে চাইলে এফ সেভেন চাপ দাও।'

'ধন্যবাদ, এটুকুই যথেষ্ট। তোমাকে আরেকটা কথা জিজ্ঞেস করি?'

'এটুকুই যথেষ্ট জেনে খুশি হলাম। তা, বলো না, কী জানতে চাও!'

অ্যালবার্টো মৃদু হাসলেন। সোফি লিখল

'হিল্ডা মোলার ন্যাগ কে?'

'হিল্ডা মোলার ন্যাগ লিলেস্যান্ডে থাকে তার বয়স আর সোফি অ্যামুন্ডসেনের বয়স একই।'

'তুমি কীভাবে জানলে?'

'জানি না, কীভাবে। হার্ড ডিস্কে পেয়েছি তাকে।'

সোফি তার কাঁধে একটা হাতের স্পর্শ অনুভব করল।

'হিল্ডা সম্পর্কে আমাদের হাতে যতটুকু তথ্য আছে সেটিই আমি ডেটা প্রোগ্রামে ঢুকিয়ে দিয়েছিলাম,' অ্যালবার্টো বললেন।

'হিল্ডা সম্পর্কে তুমি আর কী জানো?' সোফি লিখল।

'হিল্ডার বাবা লেবাননে জাতিসংঘ বাহিনীর একজন পর্যবেক্ষক। তাঁর র‍্যাংক মেজর এবং তিনি তাঁর মেয়েকে প্রায়ই পোস্টকার্ড পাঠান।'

'আমি চাই তুমি তাকে খুঁজে বার করো।'

'আমি সেটি করতে পারি না। আমার কোনো ফাইলে তার কথা নেই আর তাছাড়া, অন্য কোনো ডেটা বেস-এর সঙ্গেও আমি যুক্ত নই।'

'আমি বলছি তাকে খুঁজে বের করো!!!!!!!!'

'তুমি কি রেগে গেছো, সোফি? এতোগুলো বিস্ময়বোধক চিহ্ন ক্রুদ্ধ অনুভূতির পরিচায়ক।'

'হিল্ডার বাবার সঙ্গে কথা বলতে চাই আমি।'

'নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে সমস্যা হয় তোমার। তুমি যদি তোমার শৈশব নিয়ে কথা বলতে চাও তাহলে এফ নাইন চাপ দাও।'

ফের সোফির ঘাড়ের ওপর হাত রাখলেন অ্যালবার্টো।

'ও ঠিকই বলেছে। এটা ক্রিস্টাল বল নয়। লায়লা স্রেফ একটা ডেটা প্রোগ্রাম।'

'চুপ করো!' সোফি লিখল।

'তোমার যা অভিরুচি, সোফি। আমাদের পরিচয় পর্ব মাত্র ১৩ মিনিট ৫২ সেকেন্ড স্থায়ী হলো। আমরা যা যা বললাম তার সবই মনে থাকবে আমার। এবার আমি প্রোগামটা শেষ করব।'

স্ক্রিনে আবারও সি অক্ষরটা দেখা গেল।

'এবার আবার বসতে পারি আমরা' অ্যালবার্টো বললেন।

কিন্তু এরই মধ্যে সোফি অন্য কয়েকটা কী-তে চাপ দিয়ে ফেলেছে।

'ন্যাগ,' লিখেছে সে।

সঙ্গে সঙ্গে স্ক্রিনের ওপর ফুটে উঠল নিচের মেসেজটা :

'আমি এখানে।'

এবার অ্যালবার্টোর লাফ দিয়ে ওঠার পালা।

'কে তুমি?' সোফি লিখল।

'মেজর অ্যালবার্টো ন্যাগ অ্যাট ইয়োর সার্ভিস। সোজা লেবানন থেকে এসেছি আমি। তোমার কম্যান্ড কী, বলো।'

'এটা তো দেখছি সবকিছুকে ছাপিয়ে গেল!' একটা শ্বাস টেনে বললেন অ্যালবার্টো। 'ইঁদুরটা হার্ডডিস্কেও ঢুকে পড়েছে দেখছি।'

সোফিকে সরে যাওয়ার ইঙ্গিত করে কী বোর্ডের সামনে বসে পড়লেন তিনি।

'আমার পিসির ভেতর তুমি ঢুকলে কী করে?' লিখলেন তিনি।

'স্রেফ হাতসাফাই, প্রিয় সহকর্মী। যেখানে যাবো বলে ঠিক করি ঠিক সেখানেই চলে যাই আমি।'

'জঘন্য ডেটা ভাইরাস কোথাকার!'

'আহা, আহা, চটছ কেন? এই মুহূর্তে এখানে আমি একটা বার্থডে ভাইরাস হিসেবে আছি। তা, বিশেষ একটা শুভেচ্ছাবাণী পাঠাতে পারি?'

'না, ধন্যবাদ। এ-সব মেলা দেখেছি আমরা।'

'কিন্তু আমার খুব বেশি সময় লাগবে না সব তোরই সম্মানে, প্রিয় হিল্ডা। আবারও অনেক অনেক খুশিভরা শুভ জন্মদিন জানাচ্ছি তোকে তোর পঞ্চদশ জন্মবার্ষিকীতে। কিন্তু যে পরিস্থিতিতে জানাচ্ছি সে-জন্য তুই আমাকে ক্ষমা করিস, কিন্তু আমি চেয়েছি আমার পাঠানো জন্মদিনের শুভেচ্ছা তুই যেখানেই যাস সেখানেই তোকে ঘিরে থাক, সেখানেই তোকে জড়িয়ে ধরুক। ভালোবাসা নিস, বাবা, যে তোকে আদর করে জড়িয়ে ধরার জন্য ছটফট করছে।

অ্যালবার্টো কিছু লেখার আগেই সি চিহ্নটা ফের ফুটে উঠল স্ক্রিনে।

অ্যালবার্টো লিখলেন 'ডিআইআর ন্যাগ'.',' তাতে নিচের তথ্য ভেসে উঠল স্ক্রিনে

ন্যাগ. এলআইবি	১৪৭,৬৪৩	০৬-১৫-৯০	১২:৪৭
ন্যাগ. এলআইবি	৪২৬,৪৩৯	০৬-২৩-৯০	২২:৩৪

অ্যালবার্টো লিখলেন 'ইরেজ ন্যাগ' '' তারপর সুইচ টিপে বন্ধ করে দিলেন কম্পিউটার।

'এইবার-ইরেজ করে দিয়েছি আমি ওকে,' বললেন তিনি। 'কিন্তু পরের বার ও যে কোথায় উদয় হবে তা ঠিক করে বলা মুশকিল।'

ওখানেই বসে থাকলেন তিনি, চেয়ে রইলেন স্ক্রিনটার দিকে। তারপর যোগ করলেন

'এরচেয়ে বাজে দিকটা হলো নামটা। অ্যালবার্ট ন্যাগ... ।'

নাম দুটোর মধ্যকার মিল দেখে এই প্রথমবারের মতো চমকে উঠল সোফি। অ্যালবার্ট ন্যাগ আর অ্যালবার্টো নক্স।

কিন্তু অ্যালবার্টো এতোটাই চটে আছেন যে কোনো কথা বলার সাহস হলো না তার। উঠে গিয়ে কফি টেবিলে বসল তারা দু'জন আবার।

স্পিনোজা

ছবে

...ঈশ্বর একজন পুতুল-নাচিয়ে নন...

অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে রইল দু'জনে। এরপর, যা ঘটে গেল তা থেকে অ্যালবার্টোর মন অন্য দিকে ফেরাবার জন্য কথা বলে উঠল সোফি।

'দেকার্ত নিশ্চয়ই বড্ড অদ্ভুত ধরনের লোক ছিলেন। তিনি কি বিখ্যাত হয়েছিলেন?'

উত্তর দেয়ার আগে কয়েক সেকেন্ড ধরে গভীর একটা শ্বাস নিলেন অ্যালবার্টো : 'তাঁর প্রভাব ছিল বিপুলবিস্তারী। আর এই প্রভাব সম্ভবত সবচেয়ে বেশি পড়েছিল মহান দার্শনিক *বারুচ স্পিনোজা-র* (Baruch Spinoza) ওপর, যাঁর জন্ম ১৬৩২-এ, মৃত্যু ১৬৭৭-এ।'

'তাঁর সম্পর্কে কি কিছু বলতে চাইছেন আপনি আমাকে?'

'সে-রকমই ইচ্ছে ছিল আমার। তাছাড়া, সামরিক কোনো প্ররোচনা আমাদেরকে দমিয়ে রাখতে পারবে না।'

'বেশ তো, আমি কান পেতে আছি।'

'স্পিনোজা ছিলেন অ্যামস্টার্ডামের ইহুদি সম্প্রদায়ের লোক। তবে ধর্মবিরোধী কার্যকলাপের (heresy) জন্য তাঁকে সে-সম্প্রদায় হতে বহিষ্কার করা হয়। সাম্প্রতিক সময়ে খুব অল্প দার্শনিকই এই লোকটির মতো নিন্দাভাজন আর নিপীড়িত হয়েছেন। ব্যাপারটি ঘটেছিল তার কারণ তিনি প্রচলিত বা প্রতিষ্ঠিত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কথা বলেছিলেন। তিনি মনে করতেন অটল অনড় ডগমা (dogma) আর বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠানই টিকিয়ে রেখেছে খ্রিস্ট আর ইহুদি ধর্মকে। বাইবেলের ইতিহাসবাদী-সমালোচনা নির্ভর ব্যাখ্যা সবার প্রথমে প্রয়োগ করেন তিনিই।'

'বুঝিয়ে বলুন, প্লিজ।'

'বাইবেলের প্রতিটি অক্ষরই যে ঐশ্বরিক অনুপ্রেরণায় লেখা হয়েছে সে-কথা তিনি স্বীকার করতেন না। তিনি বলতেন, আমরা যখন বাইবেল পড়ি তখন আমাদেরকে সব সময়ই মনে রাখতে হবে ওটা কোন সময় লেখা হয়েছিল। তাঁর প্রস্তাবিত এ-ধরনের একটি 'সমালোচনামূলক' পাঠ বাইবেলের টেক্সট-এ বেশকিছু অসঙ্গতির দিকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। কিন্তু নিউ টেস্টামেন্টের স্ক্রিপচারের উপরিতলের নিচেই রয়েছেন যিশু, যাঁকে অনায়াসে বলা যেতে পারে ঈশ্বরের মুখপাত্র। কাজেই

যিশুর শিক্ষা ইহুদিবাদের গোঁড়ামী বা সনাতনী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে মুক্তির একটা প্রতীক হয়ে এলো। যিশু প্রচার করলেন এক 'প্রজ্ঞার ধর্মীয়', যে-ধর্মে ভালোবাসার মূল্য অন্য সব কিছুর ওপরে। স্পিনোজা একে ব্যাখ্যা করলেন ঈশ্বরের এবং মানবতাবাদের ভালোবাসা হিসেবে। তারপরেও খ্রিস্টধর্ম তার নিজস্ব অটল-অনড় ডগমা আর বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠানের ভেতরেই থিতু হয়ে বসেছিল।'

'আমার মনে হয় না যে গির্জা বা সিনাগগ কোনোটার পক্ষেই এ-সব ধ্যান-ধারণা সহ্য করা বা মেনে নেয়া সহজ ছিল।'

'পরিস্থিতি যখন আসলেই বেশ কঠিন হয়ে উঠেছিল তখন স্পিনোজাকে এমনকি তাঁর পরিবারের লোকজন পর্যন্ত ছেড়ে গিয়েছিল। তাঁর ধর্মবিরোধী কার্যকলাপের অজুহাতে তারা তাঁকে তাঁর উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করতে চেয়েছিল। অথচ ভাগ্যের কী পরিহাস, বাক্-স্বাধীনতা আর ধর্মীয় সহনশীলতার পক্ষে কিন্তু স্পিনোজার চেয়ে বড় প্রবক্তা খুব কমই আছে। তো, চারপাশের মানুষের কাছ থেকে আক্রান্ত হয়ে তিনি একটি শান্ত এবং নিঃসঙ্গ জীবন বেছে নিয়ে পুরোপুরি দর্শনে মনোনিবেশ করেন। লেন্স পরিষ্কার করে সামান্য যে কয় পয়সা পেতেন তাই দিয়ে কষ্টেসৃষ্টে দিন কাটাতেন তিনি। আর ওইসব লেন্সের কয়েকটি আমার হাতে এসে পড়েছে।'

'দারুণ ব্যাপার তো!'

'তিনি যে লেন্স পরিষ্কার করে জীবিকা নির্বাহ করতেন এর মধ্যে প্রায় প্রতীকী একটা ব্যাপার আছে। মানুষ যাতে একটা নতুন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে জীবনকে দেখতে পারে সেজন্য একজন দার্শনিক অবশ্যই মানুষকে সাহায্য করবেন। আর, সবকিছুকে অনন্ত বা শাশ্বত-র দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখাটা আসলেই স্পিনোজার দর্শনের একটা অন্যতম স্তম্ভ বিশেষ।'

'অনন্তের দৃষ্টিভঙ্গি?'

'হ্যাঁ, সোফি। নিজের জীবনকে মহাবিশ্বের পরিপ্রেক্ষিতে কল্পনা করার কথা ভাবতে পারবে তুমি?'

'হুম...সেটি অবশ্য খুব সহজ নয়।'

'নিজেকে এই কথাটা স্মরণ করিয়ে দাও যে প্রকৃতির সমস্ত জীবনের একটা অতি ক্ষুদ্র অংশ যাপন করছো তুমি। বিশাল একটি সম্পূর্ণ-র অংশমাত্র তুমি।'

'মনে হয় বুঝতে পারছি কী বলতে চাইছেন আপনি...'

'সেটি কি তুমি সেই সঙ্গে অনুভবও করতে পারছো? তুমি কি পুরো প্রকৃতিকে—সত্যি বলতে গোটা মহাবিশ্বকে—এক সঙ্গে প্রত্যক্ষ করতে পারো, একটা মাত্র দৃষ্টিতে?'

'আমার সন্দেহ আছে। হয়ত কয়েকটা লেন্স পেলে পারতাম।'

'আমি কেবল মহাশূন্যের অসীমত্বের কথা বলছি না। সময়ের অনন্ততার কথাও বোঝাতে চাইছি আমি। ত্রিশ হাজার বছর আগে একসময় রাইন উপত্যকায় বাস করত ছোট্ট একটি বালক। প্রকৃতির এক ছোট্ট অংশ ছিল সে, এক অনন্ত সমুদ্রের এক ছোট্ট ঢেউ ছিল সে। সোফি, তুমিও প্রকৃতির জীবনের একটা ছোট্ট অংশ যাপন করছো। তোমার আর সেই ছোট্ট বালকটির মধ্যে কোনো তফাৎ নেই।'

'শুধু এইটুকু ছাড়া যে আমি এখন বেঁচে আছি।'

'হ্যাঁ আর ঠিক এই ব্যাপারটি কল্পনা করারই চেষ্টা করতে বলেছিলাম আমি তোমাকে। তিরিশ হাজার বছর পর কী হবে তুমি?'

'এটাকেই কি হেরেসি বলা হয়েছিল?'

'ঠিক তা নয়। স্পিনোজা শুধু এটাই বলেননি যে সবকিছুই প্রকৃতি। প্রকৃতিকে তিনি ঈশ্বরের সঙ্গে এক করে দেখেছিলেন। তিনি বললেন, 'ঈশ্বরই সব, সবই ঈশ্বর।'

'তার মানে তিনি সর্বেশ্বরবাদী ছিলেন।'

'ঠিক বলেছো। স্পিনোজার মত অনুযায়ী, ঈশ্বর জগৎটাকে সৃষ্টি করেছেন সেটির বাইরে দাঁড়িয়ে থাকবার জন্য নয়। না, ঈশ্বরই হলেন জগৎ। মাঝে মাঝে স্পিনোজা এই কথাটাকে একটু ভিন্নভাবে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন ঈশ্বরের মধ্যেই রয়েছে জগৎটা। এখানে তিনি আসলে অ্যারিওপেগস পাহাড়ের ওপর দাঁড়িয়ে এথেনীয়দের উদ্দেশে দেওয়া সেন্ট পলের ভাষণ থেকেই উদ্ধৃতি দিচ্ছেন 'কেননা তাঁহাতেই আমাদের জীবন, গতি ও সত্তা।' যাই হোক, আমরা বরং দেখি এ-বিষয়ে স্পিনোজার নিজের যুক্তি কী। তাঁর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বইয়ের নাম হচ্ছে *এথিক্স জিওমেট্রিক্যালি ডেমনস্ট্রেটেড* বা জ্যামিতিকভাবে ব্যাখ্যা করা নীতিবিদ্যা।'

'জ্যামিতিকভাবে ব্যাখ্যা করা নীতিবিদ্যা?'

'ব্যাপারটা আমাদের কাছে একটু অদ্ভুত বলে মনে হতে পারে। দর্শনে নীতিবিদ্যা বলতে বোঝায় একটি সুন্দর জীবনযাপনের জন্য নৈতিক আচরণের বিদ্যা। সক্রেটিস বা অ্যারিস্টটলের নীতিবিদ্যা বলতেও আমরা ঠিক এটাই বুঝিয়ে থাকি। কেবল আমাদের সময়েই নীতিবিদ্যার পরিসর ছোট হয়ে বেশকিছু নিয়মের একটি সেটে এসে ঠেকেছে যাতে করে অন্য মানুষের কোনো অসুবিধে না ঘটিয়ে জীবনযাপন করা যায়।'

'কারণ নিজের কথা চিন্তা করার নাম অহংবাদ, সেজন্য?'

'খানিকটা সে-রকমই, ঠিকই বলেছ। স্পিনোজা যখন নীতিবিদ্যা কথাটা ব্যবহার করেন তখন তিনি জীবনযাপনের শিল্প এবং নৈতিক আচরণ এই দুটোকেই বোঝান।'

'কিন্তু তাই বলে জ্যামিতিকভাবে ব্যাখ্যা করা জীবনযাপনের শিল্প?'

'জ্যামিতিক পদ্ধতি বলতে আসলে তিনি তাঁর সূত্রগুলোর জন্য যে পরিভাষা ব্যবহার করেছিলেন সেটিকেই বোঝায়। তোমার হয়ত মনে পড়বে কীভাবে দেকার্ত তাঁর দার্শনিক চিন্তা-ভাবনার ক্ষেত্রে জ্যামিতিক পদ্ধতি ব্যবহার করার কথা ভেবেছিলেন। এর মাধ্যমে তিনি আসলে এমন এক ধরনের দার্শনিক চিন্তা-ভাবনার কথা বুঝিয়েছিলেন যা কিনা একান্তভাবেই যৌক্তিক সিদ্ধান্ত থেকে তৈরি করা হয়েছে। এই একই বুদ্ধিবাদী ঐতিহ্যের অংশ ছিলেন স্পিনোজা। তিনি চেয়েছিলেন তাঁর নীতিবিদ্যা এই বিষয়টি দেখিয়ে দেবে যে মানব জীবন প্রকৃতির সার্বজনীন নিয়মের অধীন। কাজেই আমাদেরকে অতি অবশ্যই আমাদের আবেগ-অনুভূতি ও সুতীব্র কামনার হাত থেকে মুক্ত হতে হবে। শুধু তখনই আমরা তৃপ্ত আর সুখী হতে পারব বলে বিশ্বাস করতেন তিনি।'

'আমরা নিশ্চয়ই শুধু প্রকৃতির নিয়ম মেনে চলি না?'

'দেখো, স্পিনোজা সহজবোধ্য কোনো দার্শনিক ছিলেন না। তাঁকে আমরা একটু একটু করে বোঝার চেষ্টা করি চলো। তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে দেকার্ত বিশ্বাস

করতেন যে বাস্তবতা পুরোপুরি আলাদা দুটো সারবস্তু চিন্তা আর ব্যাপ্তি দিয়ে তৈরি?'।

'কী করে ভুলি সে-কথা বলুন?'

'সারবস্তু' শব্দটাকে এভাবে ব্যাখ্যা করা যায় যে 'এটা হলো তাই যা দিয়ে কোনো কিছু তৈরি' বা কোনো কিছু মূলত যা তাই, বা কোনো কিছুকে শেষ পর্যন্ত যে মৌলিক অংশে কমিয়ে আনা যায় তাই। তার অর্থ, দেকার্ত এ—ধরনের দুটো বস্তু নিয়ে কাজ করেছেন। প্রতিটি জিনিসই হয় চিন্তা, নয় ব্যাপ্তি।

'সে যাই হোক, স্পিনোজা এই বিভাজনকে অস্বীকার করলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, সারবস্তু রয়েছে মাত্র একটি। অস্তিত্বশীল যে-কোনো কিছুকে একটি মাত্র বাস্তবতায় কমিয়ে আনা যায়, যাকে তিনি বললেন স্রেফ *সারবস্তু* (substance)। মাঝে মধ্যে অবশ্য সেটিকে তিনি ঈশ্বর বা প্রকৃতিও বলেছেন। অর্থাৎ দেকার্তের যেমন বাস্তবতা সম্পর্কে দ্বৈতবাদী দৃষ্টিভঙ্গি ছিল স্পিনোজার তা ছিল না। আমরা বলি, তিনি ছিলেন একজন *অদ্বৈতবাদী* (monist)। তার অর্থ, তিনি প্রকৃতি আর সব কিছুর অবস্থাকে একটি মাত্র সারবস্তুতে নামিয়ে আনেন।'

'তার অর্থ দু'জনের চিন্তাধারা একেবারে বিপরীত মেরুর।'

'হ্যাঁ, তবে দেকার্ত আর স্পিনোজার মধ্যেকার ফারাকটা কিন্তু অনেকেই যতবেশি দাবি করে ততবেশি নয়। দেকার্ত-ও এ-কথা বলেছেন যে কেবল ঈশ্বরই স্বাধীনভাবে অস্তিত্বশীল। কিন্তু স্পিনোজা যখন ঈশ্বরকে প্রকৃতির সঙ্গে এক করে বা ঈশ্বর আর সৃষ্টিকে এক করে দেখেন কেবল তখনই তিনি দেকার্তের কাছ থেকে আর ইহুদি ও খ্রিস্টীয় মতবাদ থেকে নিজেকে যথেষ্ট দূরে সরিয়ে নিয়ে যান।'

'তাহলে প্রকৃতিই *হচ্ছে* ঈশ্বর, ঈশ্বরই প্রকৃতি?'

'কিন্তু স্পিনোজা যখন 'প্রকৃতি' শব্দটা ব্যবহার করেন তখন কিন্তু তিনি শুধু পরিব্যাপ্ত (extended) প্রকৃতিকে বোঝান না। সারবস্তু, ঈশ্বর বা প্রকৃতি এই শব্দগুলোর সাহায্যে তিনি অস্তিত্বশীল সবকিছুকেই, এমনকি আধ্যাত্মিক জিনিসগুলোকেও বোঝান।'

'তার মানে চিন্তা এবং ব্যাপ্তি দুটোকেই, তাই বলতে চাইছেন?'

'একদম ঠিক বলেছো! স্পিনোজার মত অনুযায়ী, আমরা মানুষেরা ঈশ্বরের দুটো গুণ বা প্রকাশকে চিনতে পারি। স্পিনোজা এই গুণগুলোকে বলেছেন ঈশ্বরের লক্ষণ (attribute): এই লক্ষণ দুটি আর দেকার্তের 'চিন্তা' ও 'ব্যাপ্তি' একই জিনিস। ঈশ্বর বা প্রকৃতির নিজের প্রকাশ ঘটে চিন্তা বা ব্যাপ্তি হিসেবে। এটা খুবই সম্ভব যে 'চিন্তা' আর 'ব্যাপ্তি'র চেয়ে ঢের বেশি-রীতিমতো অসীম সংখ্যক-লক্ষণ আছে ঈশ্বরের। কিন্তু মানুষ কেবল এই দুটোর কথাই জানে।'

'সে ঠিক আছে, কিন্তু সে-কথা বলার ধরনটা কী জটিল।'

'হ্যাঁ, স্পিনোজার ভাষা বুঝতে হলে প্রায় হাতুড়ি বাটালির শরণ নেয়ার দরকার পড়ে লোকের। পুরস্কার হিসেবে অবশ্য শেষ অব্দি তারা খুঁড়ে তুলে আনবে হীরের মতো স্ফটিকস্বচ্ছ কোনো চিন্তা।'

'আমার আর তর সইছে না!'

'প্রকৃতির সবকিছুই তাই হয় চিন্তা নয় ব্যাপ্তি। দৈনন্দিন জীবনে আমরা যে-সব

বিভিন্ন প্রাকৃতিক ঘটনা বা বিষয়ের মুখোমুখি হই, এই যেমন একটা ফুল বা ওয়ার্ডসওয়ার্থের একটি কবিতা, এগুলো সবই চিন্তা বা ব্যাপ্তির লক্ষণের বিভিন্ন ধরন (mode)। 'ধরন' হলো সারবস্তু, ঈশ্বর বা প্রকৃতি বিশেষ যে-রকমটা পরিগ্রহ করে তাই। একটা ফুল হলো ব্যাপ্তি লক্ষণের একটা ধরন আর ঠিক সেই ফুলটাকে নিয়ে লেখা একটা কবিতা হলো চিন্তার লক্ষণের একটা ধরন। কিন্তু এই দুটোই মূলত সারবস্তু, ঈশ্বর বা প্রকৃতিরই প্রকাশ।'

'কী মারপ্যাঁচ ভর্তি কথা রে বাবা।'

'স্পিনোজা যত জটিল করে বলেছেন আসলে কিন্তু বিষয়টা ততো জটিল নয়। তাঁর আঁটোসাঁটো বর্ণনার নিচেই এমন এক চমৎকার উপলব্ধি রয়েছে যা এতোই সাদামাটা যে দৈনন্দিন জীবনের আটপৌরে ভাষায় তা প্রকাশ করা সম্ভব নয়।'

'আপনার আপত্তি না থাকলে বলবো দৈনন্দিন জীবনের ভাষাই আমার পছন্দ।'

'সে ঠিক আছে। আমি সেক্ষেত্রে তোমাকে দিয়েই শুরু করব। তোমার পেটে যখন ব্যথা হয় তখন ব্যথাটা কার হয়?'

'যার হয় বলে আপনি বললেন। আমার।'

'বেশ। আর পরে যখন তুমি মনে করো যে একবার তোমার পেট ব্যথা হয়েছিল তখন সেটিকে চিন্তা করছে?'

'সেটিও আমি।'

'অর্থাৎ তুমি এমন এক ব্যক্তি যার এই মুহূর্তে পেট ব্যথা থাকে, আবার তার পর মুহূর্তে সে হয়ে পড়ে চিন্তামগ্ন। স্পিনোজা মনে করতেন বস্তুগত সমস্ত জিনিস আর আমাদের চারপাশে যা ঘটে সে-সব ঈশ্বর বা প্রকৃতির একটি প্রকাশ। তার মানে দাঁড়াচ্ছে, আমরা যে-সব জিনিস চিন্তা করি সে-সব ঈশ্বর বা প্রকৃতিরও চিন্তা। কারণ সবকিছুই হলো এক। তাছাড়া, ঈশ্বরও একজন, প্রকৃতিও একটি আর সারবস্তু-ও এক।'

'কিন্তু একটা কথা ভেবে দেখুন, আমি যখন কোনো কিছু নিয়ে ভাবি বা চিন্তা করি তখন তো চিন্তাটা *আমিই* করছি। *আমি* যখন চলাফেরা করি তখন এই চলাফেরাটা করছি আমি-ই। এর মধ্যে ঈশ্বরকে জড়াতে হচ্ছে কেন?'

'তোমার এই অংশগ্রহণটা আমার ভাল লাগছে। কিন্তু তুমি কে? তুমি সোফি অ্যামুন্ডসেন নিশ্চয়ই, কিন্তু সেই সঙ্গে তুমি অনন্তরকমের বড় একটা কিছুর প্রকাশও বটে। ইচ্ছে করলে তুমি বলতে পারো যে *তুমি ভাবছো* বা *তুমি* চলাফেরা করছো, কিন্তু তুমি কি এ-কথাও বলতে পারো না যে প্রকৃতিই তোমার ভাবনাগুলো ভাবছে বা প্রকৃতিই তোমার ভেতর দিয়ে চলাফেরা করছে? দেখার জন্য তুমি কোন লেন্সটা বেছে নিচ্ছ এটা হচ্ছে স্রেফ সেই ব্যাপার।'

'তার মানে কি আপনি বলতে চাইছেন যে আমি নিজে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারি না?'

'হ্যাঁ আবার না। নিজের বুড়ো আঙুলটাকে ইচ্ছে মতো নড়ানো-চড়ানোর অধিকার হয়ত তোমার আছে। কিন্তু তোমার বুড়ো আঙুলটা কেবল সেটির প্রকৃতি অনুযায়ীই নড়াচড়া করতে পারে। ওটা তোমার হাত থেকে লাফ দিয়ে খসে গিয়ে ঘরময় নেচে বেড়াতে পারবে না। ঠিক একইভাবে অস্তিত্বের কাঠামোতে তোমারও নিজস্ব একটা

অবস্থান আছে। তুমি সোফি ঠিকই, কিন্তু সেই সঙ্গে তুমি ঈশ্বরের দেহের একটা আঙুলও বটে।'

'তার মানে আমি যা কিছু করি সে-ব্যাপারে ঈশ্বরই সিদ্ধান্ত নেন?'

'নয়ত প্রকৃতি বা প্রকৃতির নিয়মগুলো। স্পিনোজা বিশ্বাস করতেন যা কিছু ঘটে *সে-সবের অভ্যন্তরীণ কারণ* (inner cause) ঈশ্বর বা প্রকৃতির নিয়ম। তিনি বাহ্যিক কারণ নন, কারণ ঈশ্বর প্রকৃতির নিয়মগুলোর ভেতর দিয়ে, হ্যাঁ, কেবল সেগুলোর ভেতর দিয়েই কথা বলেন।'

'আসলে আমি ঠিক বুঝতে পারছি না দুটোর মধ্যে তফাৎটা কোথায়।'

'ঈশ্বর একজন পুতুল-নাচিয়ে নন, যিনি যা কিছু ঘটে তার সবই সুতো টেনে নিয়ন্ত্রণ করেন। সত্যিকারের একজন পুতুল-নাচিয়ে বাইরে থেকে পুতুলগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করেন, অর্থাৎ তিনিই হচ্ছেন পুতুলগুলোর নড়াচড়ার 'বাহ্যিক কারণ।' ঈশ্বর কিন্তু সেভাবে জগৎ নিয়ন্ত্রণ করেন না। প্রকৃতির নিয়মগুলোর মাধ্যমেই ঈশ্বর জগৎকে নিয়ন্ত্রণ করেন। কাজেই ঈশ্বর বা প্রকৃতিই হচ্ছে যা কিছু ঘটে তার প্রতিটির 'অভ্যন্তরীণ কারণ'। তার অর্থ, বস্তু জগতে যা কিছু ঘটে তার সবই ঘটে প্রয়োজনবশত। বস্তুগত বা প্রাকৃতিক জগৎ সম্বন্ধে স্পিনোজার একটি নিয়তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গি ছিল।'

'আমার মনে হয় এ-ধরনের একটা কথা-ই আপনি বলেছিলেন আগে।'

'তুমি সম্ভবত স্টোয়িকদের কথা ভাবছ। তাঁরাও এই দাবি করেছিলেন যে প্রয়োজনের কারণেই প্রতিটি জিনিস ঘটে। সেই জন্যই 'স্টোয়িকতা'-র সঙ্গে সব পরিস্থিতির মুখোমুখি হওয়াটা জরুরি। মানুষ যেন তার আবেগ-অনুভূতির তোড়ে ভেসে না যায়। সংক্ষেপে বলতে গেলে, স্পিনোজার এথিক্স-ও ছিল তাই।'

'কী বলতে চাইছেন বুঝতে পারছি, কিন্তু আমি যে নিজেই নিজের সিদ্ধান্ত নিই না এই ব্যাপারটিই আমার ভাল্লাগছে না এখনো।'

'ঠিক আছে, সময়ের দিক দিয়ে পিছিয়ে আমরা প্রস্তর যুগের সেই বালকটির কাছে চলে যাই তাহলে, যে তিরিশ হাজার বছর আগে এই পৃথিবীতে বাস করত। বড় হওয়ার পর সে বুনো প্রাণীর দিকে বর্শা ছুঁড়েছে, ভালোবেসেছে কোনো এক রমণীকে, যে তার বাচ্চার মা হয়েছে আর, প্রায় নিশ্চিতভাবেই বলা যেতে পারে যে ছেলেটা পুজো করেছে তার উপজাতির দেবদেবীদের। তুমি কি সত্যিই মনে কর ছেলেটা সব সিদ্ধান্ত নিজেই নিত?'

'আমি জানি না।'

'কিংবা, আফ্রিকার একটা সিংহের কথাই ধরো। ওটা যে একটা শিকারী পশু সেটি কি সিংহটা নিজেই ঠিক করে নিয়েছে? সে জন্যই কি ওটা ঝাঁপিয়ে পড়ে আহত অ্যান্টিলোপের ওপর? এর বদলে কি সিংহটা ইচ্ছে করলে নিরামিষাশী হয়ে যেতে পারত?'

'না, সিংহ সেটির প্রকৃতি অনুযায়ীই চলে।'

'অর্থাৎ তুমি বলতে চাইছো প্রকৃতির নিয়ম অনুযায়ী চলে। তুমিও কিন্তু সেটিই করো, সোফি, কারণ তুমিও প্রকৃতির অংশ। দেকার্তের সমর্থন নিয়ে অবশ্য তুমি প্রতিবাদ করে বলতে পারো যে সিংহ হচ্ছে একটা জন্তু, মুক্ত মানসিক গুণাগুণ সম্পন্ন

মুক্ত মানুষ না। কিন্তু একটা সদ্যোজাত শিশুর কথা ভেবে দেখ, সেটি প্রায়ই চিৎকার চেঁচামেচি করে কাটায়। দুধ না পেলে আঙুল চোষে। সেই শিশুটির কি স্বাধীন ইচ্ছা বলে কিছু আছে?'

'মনে তো হয় না।'

'তাহলে সেই শিশুটি কখন সেই স্বাধীন ইচ্ছার অধিকারী হয়? দু'বছর বয়েসে বাচ্চাটা দৌড়ে বেড়ায়, যা কিছু দেখে সেদিকেই আঙুল তুলে দেখায়। তিন বছর বয়সে সে মাকে সারাক্ষণ জ্বালাতন করে আর চার বছর বয়সে হঠাৎ করে ভয় পেয়ে ওঠে অন্ধকার দেখে। স্বাধীনতাটা কোথায়, সোফি?'

'আমি জানি না।'

'বয়স পনেরো হলে পর মেয়েটি আয়নার সামনে বসে পড়ে তার মেকআপ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে। এটাই কি সেই সময় যখন সে একা তার ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তগুলো নেয়, যা খুশি তাই করে?'

'বুঝতে পারছি কী বলতে চাইছেন।'

'অবশ্যই সে সোফি অ্যামুন্ডসেন। কিন্তু সে চলে প্রকৃতির নিয়ম অনুযায়ী। ব্যাপারটা যে সে বুঝতে পারে না তার কারণ হচ্ছে সে যা কিছু করে তার পেছনে অনেক অনেক জটিল ব্যাপার কাজ করে।'

'আর কিছু আমার শোনার ইচ্ছে নেই।'

'কিন্তু শেষ একটা প্রশ্নের উত্তর তোমাকে দিতেই হবে। ধরো, সমান বয়সী দুটো গাছ একই সঙ্গে বড় হচ্ছে একটা বড় বাগানে। একটা বেড়ে উঠছে রোদেলা জায়গায়, ভালো মাটিতে, যথেষ্ট পানি পেয়ে। অন্যটা অন্ধকার একটা জায়গায়, সেখানকার মাটিটাও ভালো না মোটেই। তো, এদের মধ্যে কোন গাছটা বড় বলে মনে হয় তোমার? কোনটা বেশি ফল দেয়?'

'অবশ্যই সেটি যেটা খুবই ভালো অবস্থায় বেড়ে উঠছে?'

'স্পিনোজা বলতে চান, এই গাছটা স্বাধীন। নিজের সহজাত গুণগুলো বিকাশের পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে এই গাছটার। কিন্তু কথা হচ্ছে, এটা যদি আপেল গাছ হয় তাহলে তাতে নাশপাতি বা কুল ধরবে না। আমরা যারা মানুষ তাদের বেলাতেও কথাটা প্রযোজ্য। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, আমাদের বেড়ে ওঠা আর ব্যক্তিগত বিকাশ রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে বাধাগ্রস্ত হতে পারে। বাইরের পরিস্থিতি আমাদের দমিয়ে দিতে পারে। আমরা যখন স্বাধীনভাবে আমাদের সহজাত গুণগুলোর বিকাশ ঘটাতে পারি কেবল তখনই আমরা মানুষ হিসেবে স্বাধীন। কিন্তু রাইন নদীর তীরের সেই প্রস্তর যুগের ছেলেটি, আফ্রিকার সিংহ বা বাগানের আপেল গাছের মতো আমরাও অন্তরতর সম্ভাবনা আর বাহ্যিক সুযোগ-সুবিধা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।'

'ঠিক আছে, আমি মোটামুটি হাল ছেড়ে দিচ্ছি।'

'স্পিনোজার দৃঢ় বিশ্বাস, একটি সত্তাই কেবল সম্পূর্ণত এবং একান্তভাবেই 'তার নিজের কারণ'! এবং কেবল সেই সত্তাই সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে। কেবল ঈশ্বর বা প্রকৃতিই এ-ধরনের মুক্ত এবং 'অনাকস্মিক' (nonaccidental) প্রক্রিয়ার প্রকাশ বা উদাহরণ। বাইরের চাপমুক্ত অবস্থায় বাঁচার জন্য মানুষ স্বাধীনতা লাভের

চেষ্টা চালিয়ে যেতে পারে, কিন্তু সে কখনোই 'স্বাধীন ইচ্ছা' অর্জন করতে পারবে না। আমাদের দেহ, যা কিনা ব্যাপ্তির (extension) লক্ষণের একটি ধরন, সেখানে যা কিছু ঘটে তার প্রতিটি জিনিস আমাদের নিয়ন্ত্রণে নেই। একইভাবে, আমরা আমাদের চিন্তা-ভাবনাও নিজেদের ইচ্ছেমতো 'বেছে নিতে' পারি না। কাজেই, মানুষ 'মুক্ত আত্মা'-র অধিকারী নয়। একটি যান্ত্রিক দেহে এটা কমবেশি বন্দি।'

'ব্যাপারটা বোঝা একটু কঠিন।'

'স্পিনোজা বলেছেন, আমাদের তীব্র আবেগ (passion)—যেমন উচ্চাকাঙ্ক্ষা আর কামনা-ই—আমাদেরকে সত্যিকারের সুখ ও সম্প্রীতি অর্জনে বাধা দেয়, কিন্তু আমরা যদি বুঝতে পারি যে প্রয়োজনের কারণেই সবকিছু ঘটে তাহলে সামগ্রিক প্রকৃতি সম্পর্কে আমরা একটি সহজাত বোধ বা উপলব্ধি অর্জন করতে পারবো। এ-কথা বুঝতে পারবো যে সবকিছুই পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কিত, এমনকি এ-কথাও যে প্রতিটি জিনিসই আসলে এক। উদ্দেশ্যটা হচ্ছে, সর্বব্যাপী একটি বোধের (perception) মধ্যে যা-কিছু রয়েছে তার প্রতিটি বিষয় উপলব্ধি করা বা বোঝা। কেবল তখন-ই আমরা সত্যিকারের সুখ আর তৃপ্তি অর্জন করবো। এটাকেই স্পিনোজা বলেছেন প্রতিটি জিনিসকে 'সাব স্পেসি অ্যাটারনিট্যাটিস'-এ (sub specie aeternitatis) দেখা।'

'তার মানে?'

'প্রতিটি জিনিসকে শাশ্বতের পরিপ্রেক্ষিতে দেখা। এখান থেকেই আমরা শুরু করেছিলাম, তাই না?'

'আমাদের শেষ-ও করতে হবে এখানেই। আমাকে উঠতেই হচ্ছে।'

অ্যালবার্টো উঠে বুকশেলফ থেকে বড়সড় একটা ফলের পাত্র নিয়ে এলেন। কফি টেবিলের ওপর সেটি রাখলেন তিনি।

'যাওয়ার আগে একটা ফল অন্তত খেয়ে যাও।'

একটা কলা নিল সোফি। অ্যালবার্টো নিলেন একটা কাঁচা আপেল।

কলাটার একেবারে সামনের অংশটা ভেঙে নিয়ে সেটির খোসা ছাড়াতে শুরু করল সোফি।

'কী যেন একটা লেখা আছে এখানে,' হঠাৎ বলে উঠল সে।

'কোথায়?'

'এখানে, কলার খোসাটার ভেতরে। দেখে মনে হচ্ছে ইঙ্ক ব্রাশ দিয়ে লেখা।'

ঝুঁকে পড়ে অ্যালবার্টোকে কলাটা দেখাল সোফি। তিনি জোরে জোরে পড়লেন:

আবার এখানে এসে পড়েছি আমি, হিল্ডা। আমি সব জায়গাতেই আছি। শুভ জন্মদিন!

'ভারি মজার তো,' সোফি বলল।

'প্রতিবারই আগের চেয়ে বেশি কেরামতি দেখায় লোকটা।'

'কিন্তু এটা তো অসম্ভব...তাই না? লেবাননে কি কলা হয়? জানেন?'

অ্যালবার্টো মাথা নাড়লেন।

'আমি কিছুতেই খাচ্ছি না *ওটা*।'

'রেখে দাও তাহলে। যে-লোক খোসা না ছাড়ানো একটা কলার ভেতর তার

মেয়ের জন্মদিনের শুভেচ্ছা লিখে রাখে সে নিশ্চয়ই মানসিকভাবে প্রকৃতিস্থ নয়। তবে লোকটা নির্ঘাত প্রতিভাবান।'

'হ্যাঁ, দুটোই।'

'আমরা কি তাহলে এই সিদ্ধান্তে পৌছুবো যে হিল্ডার বাবা একটা প্রতিভা? অন্যভাবে বলতে গেলে, লোকটা নির্বোধ নয়।'

'এই কথাটাই আমি বলছিলাম আপনাকে। আর এটা হতেই পারে যে শেষ যে-বার আমি এসেছিলাম এখানে তখন সে-ই আপনাকে দিয়ে হিল্ডা বলে ডাকিয়েছে আমাকে। হয়ত সে-ই মুখে কথা বসিয়ে দিচ্ছে আমাদের।'

'কোনো কিছুকেই উড়িয়ে দেয়া যাচ্ছে না। কিন্তু সবকিছুকেই সন্দেহের চোখে দেখা উচিত আমাদের।'

'কিন্তু আমাদের সব জানা-শোনার পরেও এমন হতে পারে যে আমাদের গোটা জীবনটাই একটা স্বপ্ন।'

'কিন্তু তাই বলে হুট করে সিদ্ধান্তে আসা ঠিক হবে না। এরচেয়ে সহজ-সরল কোনো ব্যাখ্যা থাকতেও পারে।'

'তা যে যাই হোক, আমাকে এক্ষুণি বাড়ি যেতে হচ্ছে। মা অপেক্ষা করছে আমার জন্য।'

অ্যালবার্টো দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন সোফিকে। সে চলে যাওয়ার পর তিনি বলে উঠলেন

'আবার দেখা হবে আমাদের, প্রিয় হিল্ডা।'

তারপর বন্ধ করে দিলেন দরজাটা।

ল ক

৩২

...শিক্ষক আসার আগে ব্ল্যাকবোর্ড যে-রকম খালি আর শূন্য থাকে...

সাড়ে আটটায় বাড়ি পৌঁছাল সোফি। চুক্তির সময়ের চেয়ে দেড় ঘণ্টা পরে, অবশ্য ওটাকে ঠিক চুক্তি বলা যায় না। সে কেবল ডিনারটা এড়িয়ে গিয়ে তার মায়ের জন্য একটা মেসেজ রেখে গিয়েছিল যে সাতটার আগেই ফিরে আসবে সে।

'এটা তো আর চলতে দেয়া যায় না, সোফি। তথ্য কেন্দ্রে ফোন করতে হয়েছিল আমাকে, এ-কথা জানতে যে ওল্ড টাউনে অ্যালবার্টো নামে কেউ আছে বলে ওদের কাছে রেকর্ড আছে কিনা। ওরা হাসল আমার কথা শুনে।'

'উঠে আসতে পারছিলাম না আমি। আমার ধারণা, জটিল একটা রহস্য ভেদ করতে যাচ্ছি আমরা।'

'যত্তোসব!'

'সত্যি বলছি!'

'তুই কি ওকে পার্টিতে দাওয়াত দিয়েছিস?'

'এই যা, ভুলেই গেছি।'

'দ্যাখ, আমি আবারও বলছি, লোকটার সঙ্গে দেখা করতে চাই আমি। কালকের মধ্যেই। একজন বয়স্ক লোকের সঙ্গে একটা কম বয়সী মেয়ের এভাবে দেখা-সাক্ষাৎ করাটা স্বাভাবিক নয়।'

'অ্যালবার্টোর ব্যাপারে ভয় পাবার কোনো কারণ নেই তোমার। বরং হিল্ডার বাবার ক্ষেত্রেই ব্যাপারটা আরও খারাপ হতে পারে।'

'হিল্ডাটা আবার কে?'

'লেবাননের সেই লোকটার মেয়ে। লোকটা আসলেই বদ। মনে হচ্ছে গোটা দুনিয়াটা তারই খেয়াল-খুশিতে চলছে।'

'অ্যালবার্টোর সঙ্গে তুই যদি শিগ্‌গিরই আমাকে পরিচয় করিয়ে না দিস তাহলে তার সঙ্গে আর তোকে দেখা করতে দিচ্ছি না আমি। অন্তত লোকটা দেখতে কেমন সেটি না দেখা পর্যন্ত তার ব্যাপারে স্বস্তি পাবো না আমি।'

হঠাৎ করে দারুণ একটা বুদ্ধি খেলে গেল সোফির মাথায়, নিজের ঘরে ছুটে গেল সে।

'কী হলো রে তোর হঠাৎ?' পেছন থেকে বলে উঠলেন তার মা।

নিমিষেই আবার ফিরে এলো সোফি।

'এক্ষুণি তুমি দেখতে পাবে উনি দেখতে কেমন। আর তখন আশা করি তুমি আর আপত্তি করবে না।'

ভিডিও ক্যাসেটটা দুলিয়ে দেখিয়ে ভিসিআরটার কাছে চলে গেল সে।

'লোকটা কি তোকে ভিডিও দিয়েছে?'

'এথেন্স থেকে...'

শিগ্‌গিরই অ্যাক্রোপলিসের ছবি ফুটে উঠল স্ক্রিনের ওপর। সোফির মা হতবাক হয়ে বসে দেখতে পেলেন অ্যালবার্টো সামনে এগিয়ে এসে সরাসরি সোফির সঙ্গে কথা বলতে শুরু করলেন।

ভুলে গিয়েছিল এ-রকম একটা ব্যাপার এবার খেয়াল করল সোফি। নানান দলে বিভক্ত হয়ে থাকা টুরিস্টে ভর্তি অ্যাক্রোপলিস। একটা দলের মাঝখান থেকে ছোট্ট একটা প্ল্যাকার্ড তুলে ধরা হয়েছে। সেটিতে লেখা হিল্ডা...। অ্যালবার্টো ঘুরে বেড়াচ্ছেন অ্যাক্রোপলিস জুড়ে। খানিক পর তিনি প্রবেশ পথটা ধরে নিচে নেমে গিয়ে অ্যারিওপেগস পাহাড়ে চড়লেন, যেখানে থেকে পল ভাষণ দিয়েছিলেন এথেনীয়দের উদ্দেশে। এরপর তিনি স্কোয়্যার থেকে কথা বলে চললেন সোফির সঙ্গে। সোফির মা বসে বসে ছোট ছোট কথায় মন্তব্য করে চললেন ভিডিওটা সম্পর্কে

'অবিশ্বাস্য...এই কি অ্যালবার্টো? আবার খরগোশের কথা বলল লোকটা।... কিন্তু, হ্যাঁ, লোকটা সত্যিই কথা বলছে তোর সঙ্গে, সোফি। পল যে এথেন্স গিয়েছিলেন সেটি তো জানতাম না...।'

প্রাচীন এথেন্স যেখানে হঠাৎ ধ্বংসাবশেষ থেকে জেগে উঠল সেই অংশটায় চলে আসছিল ভিডিওটা। শেষ মুহূর্তে টেপটা বন্ধ করে দিতে পারল সোফি। মাকে সে অ্যালবার্টোকে দেখিয়ে দিয়েছে ঠিকই, কিন্তু তাই বলে প্লেটোর সঙ্গেও তাঁকে পরিচয় করিয়ে দেয়ার দরকার নেই।

ঘরে নীরবতা নেমে এসেছে।

'কেমন মনে হলো তোমার ওঁকে? দেখতে সুদর্শন, তাই না?' ফোড়ন কাটল সোফি।

'লোকটা নিশ্চয়ই আজব ধরনের হবে, নইলে প্রায় অচেনা একটা মেয়েকে পাঠানোর জন্যই শুধু নিজেকে ফিল্ম-বন্দি করে কেউ এথেন্সে গিয়ে? কবে এথেন্স গিয়েছিল সে?'

'সে-সম্পর্কে কোনো ধারণা নেই আমার।'

'কিন্তু আরও একটা ব্যাপার আছে...।'

'কী?'

'লোকটা দেখতে বনের মধ্যে ছোট্ট কুঁড়েঘরটায় যে-মেজর থাকতো তাঁর মতো।'

'হয়তো তিনিই সেই মেজর, মা।'

'কিন্তু গত পনেরো বছরে কেউ তাঁকে দেখেনি।'

'হয়ত উনি ঘুরে বেড়িয়েছেন মেলা...এথেন্স অব্দিও হতে পারেন।'

মাথা নাড়লেন তার মা। 'সত্তরের দশকে আমি যখন তাঁকে দেখি তখন তিনি এই

মাত্র দেখা এই অ্যালবার্টোর মতোই ছিলেন বয়েসে। বিদেশী বিদেশী একটা নাম ছিল তাঁর।'

'নক্স?'

'হতে পারে সোফি। হতে পারে নক্স-ই ছিল তাঁর নাম।'

'নাকি ন্যাগ?'

'কিছুতেই মনে করতে পারছি না।... তা, তুই কোন নক্স বা ন্যাগ-এর কথা বলছিস?'

'একজন অ্যালবার্টো, অন্যজন হিল্ডার বাবা।'

'আমার মাথা ঘুরছে এসব দেখে-শুনে।'

'বাড়িতে খাবার কিছু আছে?'

'মিটবলগুলো গরম করে নিতে পারিস।'

ঠিক দু'হপ্তা হয়ে গেছে অ্যালবার্টোর কাছ থেকে কোনো সাড়া শব্দ পাচ্ছে না সোফি। হিল্ডার জন্য পাঠানো আরেকটা কার্ড পেয়েছে সে, কিন্তু আসল দিনটা এগিয়ে আসতে থাকলেও সে নিজে একটা কার্ডও পায়নি।

একদিন বিকেলবেলা সে ওল্ড টাউনে গিয়ে অ্যালবার্টোর দরজায় টোকা দিল। তিনি বাড়িতে নেই, কিন্তু দরজায় ছোট্ট একটা চিরকুট সাঁটা। তাতে লেখা

> শুভ জন্মদিন, হিল্ডা! পরম সেই সন্ধিক্ষণ দোরগোড়ায় হাজির। সত্যের মুখোমুখি হওয়ার সময়, বুঝলি সোনামণি। যখনই এ-বিষয়টা নিয়ে ভাবি, হাসি থামাতে পারি না আমি। স্বাভাবিকভাবেই, এর সঙ্গে বার্কলের একটা সম্পর্ক রয়েছে, কাজেই তৈরি থাকিস।

দরজা থেকে চিরকুটটা টেনে ছিঁড়ে অ্যালবার্টোর ডাকবাক্সের মধ্যে সেটি ঢুকিয়ে দিয়ে বেরিয়ে এলো সোফি।

যত্তোসব! লোকটা নিশ্চয়ই এথেন্স ফিরে যায়নি? এতোগুলো প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে উনি তাকে এভাবে ফেলে রেখে যেতে পারেন না নিশ্চয়ই?

১৪ জুন স্কুল থেকে ফিরে সোফি দেখে হার্মেস বাগানে ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে। সোফি দৌড়ে গেল সেটির দিকে, কুকুরটাও খুশিতে লাফাতে লাফাতে এগিয়ে এলো তার দিকে। কুকুরটার গলা বেড় দিয়ে ধরল সোফি, যেন ওটাই পারে সবকটি ধাঁধার জবাব দিতে।

মায়ের জন্য আবার একটা চিরকুট রেখে গেল সে, তবে এবার তাতে অ্যালবার্টোর ঠিকানাটা জুড়ে দিল।

শহরের ভেতর দিয়ে হেঁটে যেতে যেতে পরের দিনের কথা ভাবতে থাকল সোফি। তার নিজের জন্মদিনের কথা অবশ্য ততটা নয়, মিডসামার ঈভ্-এ সেটি পালন করা হচ্ছে না। কিন্তু কাল হিল্ডারও জন্মদিন। সোফি ঠিক জানে, রীতিমতো অসাধারণ একটা কিছু ঘটবেই ঘটবে। অন্তত লেবানন থেকে আসা জন্মদিনের কার্ডগুলোর হাত

থেকে তো বাঁচা যাবে।

মেইন স্কোয়্যার পেরিয়ে ওরা যখন টাউনের দিকে যাচ্ছে, খেলার মাঠসহ একটা পার্কে এসে পড়ল ওরা। একটা বেঞ্চির পাশে এসে থেমে দাঁড়াল হার্মেস, যেন সে চাইছে সোফি ওটাতে বসুক।

তাই করল সে আর সে যখন কুকুরটার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে তখন সেটির চোখের দিকে তাকাল সোফি। হঠাৎ ভীষণভাবে কাঁপতে শুরু করল কুকুরটা। এক্ষুণি ঘেউ ঘেউ করে উঠবে ওটা, ভাবল সোফি।

এরপরই চোয়াল দুটো কাঁপতে লাগল কুকুরটার, কিন্তু ঘেউ ঘেউ করে ডেকে উঠল না হার্মেস। বরং সে মুখটা খুলে বলে উঠল

'শুভ জন্মদিন, হিল্ডা!'

সোফি তো হতবাক একেবারে। কুকুরটা কি সত্যিই কথা বলল তার সঙ্গে? অসম্ভব, এ নিশ্চয়ই তার কল্পনা, কারণ হিল্ডার কথা ভাবছিল সে। কিন্তু ভেতরে ভেতরে সে নিশ্চিত বুঝতে পেরেছে হার্মেসই কথা বলেছে একটা চাপা, অনুনাদী, গুরুগম্ভীর স্বরে।

পর মুহূর্তেই সবকিছু স্বাভাবিক। বার কয়েক ঘেউ ঘেউ করে উঠল হার্মেস—খানিক আগেই যে সে মানুষের গলায় কথা বলেছে সে ব্যাপারটি ধামাচাপা দেবার জন্যেই যেন—তারপর দুলকি চালে আগে আগে চলতে লাগল অ্যালবার্টোর নিবাসের দিকে। ভেতরে ঢোকার সময় আকাশের দিকে তাকাল সোফি। সারাটা দিন আবহাওয়া ভালোই ছিল, কিন্তু এখন বেশ দূরে ভারি মেঘ ঘনাতে শুরু করেছে।

অ্যালবার্টো দরজা খুলে দিতেই সোফি বলে উঠল

'কোনোরকম ভদ্রতা দেখাবেন না দয়া করে। আপনি ভালো করেই জানেন আপনি মানুষটা একটা নির্বোধ।'

'কী হলো আবার?'

'মেজর হার্মেসকে *কথা বলতে* শিখিয়েছে!'

'ও, ব্যাপারটা তাহলে এতদূর পর্যন্ত গড়িয়েছে।'

'হ্যাঁ, ভাবুন একবার!'

'তা কী বলল কুকুরটা?'

'তিনটে সুযোগ দিচ্ছি আপনাকে অনুমান করার।'

'আমার মনে হয় শুভ জন্মদিন সংক্রান্ত কিছু বলেছে হার্মেস!'

'শাবাশ!'

সোফিকে ভেতরে ঢুকতে দিলেন অ্যালবার্টো। তাঁর পরনে আরেক প্রস্থ নতুন পোশাক। আগেরবারের চেয়ে পোশাকটা খুব যে বেশি ভিন্ন তা না হলেও আজ বো বা লেস কিছুই নেই বললেই চলে।

'কিন্তু সেটিই সব নয়,' সোফি বলল।

'কী বলতে চাইছ?'

'ডাকবাক্সে চিরকুটটা পাননি?'

'ও, ওটা। ওটা আমি তখনই ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছি।'

'বার্কলের কথা ভাবতে গেলেই যদি তার হাসি পায় তাহলে আমার কিছু করার

নেই। কিন্তু বিশেষ এই দার্শনিকটির ব্যাপারে এতো হাসির কী আছে?'

'সেটি দেখার জন্য অপেক্ষা করতে হবে আমাদের।'

'কিন্তু আপনি তো আজই তার সম্পর্কে আলাপ করতে যাচ্ছেন, তাই না?'

'হ্যাঁ, আজই।'

সোফায় আরাম করে গা এলিয়ে দিলেন অ্যালবার্টো। তারপর তিনি বললেন

'শেষ যে-বার এখানে বসেছিলাম সেদিন আমি দেকার্তে আর স্পিনোজা সম্পর্কে বলেছিলাম তোমাকে। সেদিন আমরা এই ব্যাপারে একমত হয়েছিলাম যে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে এই দু'জনের মিল রয়েছে আর তা হলো এঁরা দু'জনেই ছিলেন *বুদ্ধিবাদী* (rationalist)।'

'আর, একজন যুক্তিবাদী হচ্ছেন সেইলোক যিনি যুক্তির গুরুত্বে প্রবলভাবে বিশ্বাসী।'

'ঠিক, প্রজ্ঞাকেই তিনি জ্ঞানলাভের প্রথম উৎস হিসেবে মনে করেন আর সেই সঙ্গে তিনি সম্ভবত এ-কথাও বিশ্বাস করেন যে মানুষের মনে কিছু সহজাত ভাব রয়েছে যে-সব ভাব কোনো ধরনের অভিজ্ঞতার আগেই তৈরি হয়েছে। আর এ-সব ভাব যতই স্বচ্ছ হবে ততোই এ-ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া যাবে যে ভাবগুলোর সঙ্গে বাস্তবের একটা যোগ রয়েছে। তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে একটি 'নিখুঁত সত্তা' সম্পর্কে দেকার্তের কী রকম পরিষ্কার এবং স্পষ্ট ধারণা ছিল যার ওপর ভিত্তি করে তিনি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন যে ঈশ্বর আছেন।'

'আমি অতোটা ভুলো মন নই।'

'সপ্তদশ শতাব্দীর দর্শনের পক্ষে এ-ধরনের বুদ্ধিবাদী চিন্তা ছিল খুবই সাধারণ। মধ্যযুগের কাছেও এই দর্শনের ঋণ প্রচুর, তাছাড়া প্লেটো আর সক্রেটিসের কথাও মনে পড়ে আমাদের এ-প্রসঙ্গে। কিন্তু আঠারো শতকে দর্শনটি ক্রমবর্ধমানভাবে বিশদ সমালোচনার বিষয় হয়ে পড়ে। বেশকিছু দার্শনিক বিশ্বাস করতে থাকেন যে ইন্দ্রিয়গুলোর সাহায্যে প্রত্যক্ষ করা হয়নি এমন কোনো কিছুই আমাদের মনের ভেতর নেই। এ-ধরনের দৃষ্টিভঙ্গিকে বলে *অভিজ্ঞতাবাদ* (empiricism)।'

'আজ বুঝি আপনি আমাকে এদের কথা বলবেন, অভিজ্ঞতাবাদীদের কথা?'

'হ্যাঁ, চেষ্টা করবো। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অভিজ্ঞতাবাদীরা অর্থাৎ অভিজ্ঞতাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া দার্শনিকেরা হলেন লক, বার্কলে আর হিউম আর এদের এই তিনজনই ব্রিটিশ। অন্যদিকে সপ্তদশ শতাব্দীর শীর্ষস্থানীয় বুদ্ধিবাদী দার্শনিকেরা হলেন ফরাসি দেকার্ত, ওলন্দাজ স্পিনোজা আর জার্মান লাইবনিজ। অর্থাৎ আমরা দেখতে পাচ্ছি একদিকে রয়েছে *ব্রিটিশ অভিজ্ঞতাবাদ* আর অন্যদিকে *কন্টিনেন্টাল*[২০] *বুদ্ধিবাদ*।'

'কত যে কঠিন কঠিন শব্দ! অভিজ্ঞতাবাদের অর্থটা বলবেন আরেকবার?'

---

২০. যুক্তরাজ্য (ইংল্যান্ড, স্কটল্যান্ড, ওয়েলস এবং উত্তর আয়ারল্যান্ড) ও আয়ারল্যান্ড বাদ দিয়ে ইউরোপের বাকি অংশ বা মূল ভূখণ্ড 'the Continent' নামে পরিচিত। এদিকে, আয়ারল্যান্ডের অধিবাসীরা আইরিশ নামেই পরিচিত, ব্রিটিশ বলে নয়। কাজেই বার্কলে ব্রিটিশ অভিজ্ঞতাবাদীদের অন্যতম কিনা সে-প্রশ্ন উঠতে পারে—অনুবাদক।

'একজন অভিজ্ঞতাবাদী জাগতিক সমস্ত জ্ঞান আহরণ করেন ইন্দ্রিয় থেকে পাওয়া তথ্য থেকে। অভিজ্ঞতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির ধ্রুপদী সূত্রটি দিয়েছিলেন অ্যারিস্টটল। তিনি বলেছিলেন 'মনের মধ্যে এমন কিছু নেই ইন্দ্রিয়গুলোতে যা প্রথমে ধরা পড়েনি।' এই দৃষ্টিভঙ্গিটি আসলে প্লেটোর তীব্র সমালোচনা, কারণ প্লেটো মনে করতেন যে মানুষ ভাব-জগৎ থেকে এক তাড়া ভাব নিয়ে আসে জন্মানোর সময়। লক অ্যারিস্টটলের কথারই পুনরাবৃত্তি করেছেন এবং লক যখন কথাগুলো বলেন তখন সেগুলো বলেছেন দেকার্তকে উদ্দেশ করে।'

'মনের মধ্যে এমন কিছু নেই...ইন্দ্রিয়গুলোতে যা প্রথমে ধরা পড়েনি?'

'যে-পৃথিবীতে আমাদেরকে আনা হয়েছে তা *দেখার* আগে সে-সম্পর্কে আমাদের কোনো সহজাত ভাব জন্মেনি। আমাদের মনে যদি এমন কোনো ভাব থাকে যার সঙ্গে অভিজ্ঞতালব্ধ কোনো তথ্যের সম্পর্ক নেই তাহলে সেটিকে একটি মিথ্যে ভাব বলে মনে করতে হবে। যেমন ধরো, আমরা যখন 'ঈশ্বর', 'চিরন্তনতা', বা 'সারবস্তু', এই কথাগুলো ব্যবহার করি তখন কিন্তু প্রজ্ঞার অপপ্রয়োগ হচ্ছে, কারণ কারও *অভিজ্ঞতাতেই* ঈশ্বর, চিরন্তনতা বা দার্শনিকেরা যাকে সারবস্তু বলেছেন সেগুলো নেই। কাজেই, দেখতেই পাচ্ছো যে এ-সব নিয়ে পাণ্ডিত্যপূর্ণ অনেক প্রবন্ধ হয়ত লেখা যায় কিন্তু তাতে আসলে সত্যিকার অর্থে নতুন কোনো ধ্যান-ধারণা থাকে না। এটার মতো অভ্যস্ত বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে তৈরি করা একটি দার্শনিক পদ্ধতি আপাতদৃষ্টিতে চোখ ধাঁধিয়ে দেয়ার মতো হলেও আসলে কিন্তু তা নিখাদ আজগুবি কল্পনা ছাড়া কিছু নয়। সতেরো এবং আঠারো শতকের দার্শনিকেরা এ-ধরনের বেশকিছু পাণ্ডিত্যপূর্ণ লেখা পেয়েছিলেন। নানান হাত ঘুরে এসেছিল সেগুলো। এবার সেগুলো অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নিচে রেখে পরীক্ষা করার সময় এলো। সময় এলো সেগুলোর সমস্ত শূন্যগর্ভ মতামত ঝেঁটিয়ে বিদেয় করার। ব্যাপারটিকে আমরা হাত দিয়ে ছেঁকে সোনা বাছাই করার প্রক্রিয়ার সঙ্গে তুলনা করতে পারি। যা উঠে আসে তার বেশিরভাগই কিন্তু বালু আর কাদা। কিন্তু তারই মধ্যে তুমি দেখতে পাবে কোনো না কোনো স্বর্ণকণার দীপ্তি।'

'আর সেই স্বর্ণকণা হলো গিয়ে বাস্তব অভিজ্ঞতা?'

'কিংবা অন্তত সেই সমস্ত ভাবনা-চিন্তা যেগুলোর সঙ্গে অভিজ্ঞতার একটা সম্পর্ক রয়েছে। মানবীয় সমস্ত ধ্যান-ধারণার বাস্তব অভিজ্ঞতাপ্রসূত কোনো ভিত্তি রয়েছে কিনা সেটি খতিয়ে দেখাটা ব্রিটিশ অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিকের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তবে, চলো আমরা বরং এক এক জন দার্শনিক নিয়ে এগোই।'

'ঠিক আছে, শুরু করুন।'

'প্রথমেই আসছেন ইংরেজ দার্শনিক জন লক (John Locke), তাঁর জন্ম ১৬৩২ সালে, মৃত্যু ১৭০৪-এ। তাঁর প্রধান কাজ হচ্ছে ১৬৯০ সালে প্রকাশিত *এসে কনসার্নিং হিউম্যান আন্ডারস্ট্যান্ডিং*। এই বইটিতে তিনি দুটো প্রশ্নের সমাধান খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করেছেন। প্রথমত, আমরা আমাদের ধারণাগুলো কোথা থেকে পাই আর দ্বিতীয়ত, আমাদের ইন্দ্রিয়গুলো আমাদেরকে যে-সব তথ্য দেয় সে-সবের ওপর আমরা ভরসা করতে পারি কিনা।'

'এটাকে তো এক ধরনের প্রকল্পই বলা যায়।'

'প্রশ্নগুলো একটি একটি করে দেখা যাক। লকের দাবি হলো, আমরা আমাদের ইন্দ্রিয়গুলোর সাহায্যে যে-সব জিনিস আহরণ করেছি সে-সব থেকেই আমাদের স্বতন্ত্র চিন্তা-চেতনা ধ্যান-ধারণা উদ্ভূত হয়। কোনো কিছুই যখন প্রত্যক্ষ করা হয়নি তখন আমাদের মনটা একটা 'টেবুলা রাসা' বা 'শূন্য স্লেট'।

'ল্যাটিনটা আপনি স্বচ্ছন্দে বাদ দিয়ে যেতে পারেন।'

'অর্থাৎ কোনো কিছুই যখন প্রত্যক্ষ করা হয়নি তখন আমাদের মনটা থাকে শিক্ষক আসার আগে ব্ল্যাকবোর্ড যে-রকম খালি আর শূন্য থাকে ঠিক সে-রকম। আসবাবপত্র রাখা হয়নি এ-রকম একটি কামরার সঙ্গেও মনকে তুলনা করেছেন লক। একসময় বিভিন্ন জিনিস প্রত্যক্ষ করতে থাকি আমরা। নিজেদের চারপাশের জগৎটাকে দেখি, গন্ধ নিই, স্বাদ নিই, স্পর্শ করি, শুনি। আর এই কাজটা সদ্যোজাত শিশুদের চেয়ে বেশি কেউ করে না। লক যাকে ইন্দ্রিয়ের সরল ধারণা (simple ideas of sense) বলছেন সেটি এভাবেই জন্ম নেয়। কিন্তু মন যে তার বাইরে থেকে নানান সব তথ্য নিষ্ক্রিয়ভাবে গ্রহণ করে তা কিন্তু নয়। একটা প্রতিক্রিয়া মনের ভেতরেও ঘটে। ভাবনা-চিন্তা, যুক্তি, বিশ্বাস আর সন্দেহ ইত্যাদি এসব ইন্দ্রিয়গত ধারণার ওপর কাজ করে আর তার ফলেই জন্ম নেয়, তাঁর ভাষায়, অনুচিন্তন (reflection)। অর্থাৎ তিনি 'সংবেদন' আর 'অনুচিন্তন', এই দুই ভাগে ভাগ করেছেন বিষয়টিকে। মন কেবল একটা নিষ্ক্রিয় গ্রহীতা নয়। সংবেদনগুলো যখন স্রোতের মতোন এসে ঢুকতে থাকে তখন মন সেগুলোর শ্রেণীবিন্যাস করে, সেগুলোকে প্রক্রিয়াজাত করে। আর ঠিক এই জায়গাটিতেই মানুষকে সাবধান হতে হবে।'

'সাবধান হতে হবে?'

'লক এ-কথা জোরের সঙ্গে বলেছেন যে আমরা কেবল সরল সংবেদন-ই প্রত্যক্ষ করতে পারি। যেমন ধরো, আপেল খাওয়ার সময় একটি মাত্র একক সংবেদন দিয়ে গোটা আপেলটাকে প্রত্যক্ষ করতে পারি না আমি। আসলে আমি ধারাবাহিক কিছু সরল সংবেদন লাভ করি—যেমন, দেখতে পাই যে একটা জিনিসের রং সবুজ, ঘ্রাণটা বেশ টাটকা, স্বাদটা বেশ রসাল আর কড়া। বেশ কয়েকবার আপেল খাওয়ার পরেই কেবল ভাবি যে আমি একটা 'আপেল' খাচ্ছি। লক হলে বলতেন, 'আপেল' সম্পর্কে আমরা একটা *যৌগিক ভাব* (complex idea) লাভ করেছি। যখন আমরা একেবারে শিশু ছিলাম, প্রথমবারের মতোন আপেলের স্বাদ গ্রহণ করেছি, তখন এ-ধরনের যৌগিক ধারণা ছিল না। কিন্তু আমরা সবুজ রঙের একটা জিনিস দেখেছি, টাটকা, রসাল, মজার একটা জিনিসের স্বাদ নিয়েছি...খানিকটা টকও ছিল সেটি। একটু একটু করে আমরা একই ধরনের অনেক সংবেদন জড়ো করে 'আপেল', 'নাশপাতি', 'কমলা'-র মতো ভাব তৈরি করি। তবে শেষ বিচারে, আমাদের জাগতিক জ্ঞানের সমস্ত উপাদান আমরা আমাদের সংবেদনগুলোর মাধ্যমেই পাই। যে-জ্ঞানের সূত্র খুঁজতে গিয়ে কোনো সরল সংবেদনের কাছে পৌঁছানো যায় না সে-জ্ঞানটি অতএব মিথ্যা জ্ঞান এবং অবশ্যই পরিত্যাজ্য।'

'তাহলে যে কোনো হিসেবেই এই বিষয়টি নিশ্চিত বলে তাহলে ধরে নেয়া যেতে পারে যে আমরা যা কিছু দেখি, শুনি, যে-সব জিনিসের ঘ্রাণ আর স্বাদ নিই তার সবই

হচ্ছে সে-রকম যেভাবে আমরা সেগুলোকে প্রত্যক্ষ করি।'

'একই সঙ্গে হ্যাঁ এবং না। আর এই সূত্র ধরেই আমরা পৌঁছাবো দ্বিতীয় সেই প্রশ্নটিতে লক যার উত্তর দেয়ার চেষ্টা করেছেন। কোত্থেকে আমরা আমাদের ধারণাগুলো পাই সেই প্রশ্নের উত্তর তিনি আগে দিয়েছেন। এবার তিনি প্রশ্ন করছেন জগৎটাকে আমরা যেভাবে প্রত্যক্ষ করি সেটি আসলে সে-রকম কিনা। ব্যাপারটা খুব সহজ না, বুঝলে, সোফি। এ-ব্যাপারে হুট করে সিদ্ধান্তে পৌঁছালে চলবে না। এই একটা কাজ একজন সত্যিকার দার্শনিক যেন কখনোই না করেন।'

'আমি একটা কথাও বলিনি।'

'"মুখ্য' এবং 'গৌণ' গুণ বলে দুটো জিনিসের মধ্যে একটা পার্থক্য নির্ণয় করার চেষ্টা করেছেন তিনি। এবং এর মাধ্যমে তিনি দেকার্তসহ সমস্ত মহান দার্শনিকের কাছে তাঁর ঋণ স্বীকার করেছেন।'

'*মুখ্য গুণ* (primary qualities) বলতে তিনি বুঝিয়েছেন ব্যাপ্তি, ওজন, গতি, সংখ্যা, ইত্যাদিকে। এ-ধরনের প্রসঙ্গে নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে ইন্দ্রিয়গুলো এই গুণগুলোকে নৈর্ব্যক্তিকভাবেই রিপ্রোডিউস করে। কিন্তু বস্তুর মধ্যে আমরা অন্য কিছু গুণও প্রত্যক্ষ করি। আমরা বলি জিনিসটা মিষ্টি বা টক, সবুজ বা লাল, গরম বা ঠাণ্ডা। এদেরকে লক বলছেন *গৌণ গুণ* (secondary qualities)। বর্ণ, গন্ধ, স্বাদ, শব্দ, এই ধরনের সংবেদনগুলো বস্তুর অন্তর্নিহিত প্রকৃত গুণগুলোকে রিপ্রোডিউস করে না। আমাদের ইন্দ্রিয়গুলোর ওপর বাইরের জগৎ যে-প্রভাব ফেলে ওগুলো শুধু সেসবই তুলে ধরে।'

'কমলা খাওয়ার সময় জোয়ানার মুখের যে-চেহারাটা হয় সেটি অন্য কোনো লোকের হয় লেবু খাওয়ার সময়। একবারে এক কোয়ার বেশি মুখে দিতে পারে না ও। বলে, কমলা নাকি টক। ঠিক সেই কমলাটাই আমার কাছে চমৎকার আর মিষ্টি বলে মনে হয়।'

'ব্যাপারটা এমন নয় যে তোমাদের মধ্যে একজন ঠিক বলেছ, অন্যজন ভুল। কমলাটা তোমাদের ইন্দ্রিয়গুলোর ওপর কেমন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে তোমরা ঠিক তারই বর্ণনা দিচ্ছো। হয়ত লাল্চে একটা শেড তোমার পছন্দ নয়। কিন্তু জোয়ানা সেই রঙেরই একটা পোশাক কিনলে তোমার মতটা চেপে যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। রঙটার ব্যাপারে তোমাদের দু'জনের অভিজ্ঞতা দু'রকম। কিন্তু তার মানে এই নয় যে সেটি সুন্দর বা কুৎসিত।'

'কিন্তু কমলা যে গোল সে ব্যাপারে কারও দ্বিমত নেই।'

'হ্যাঁ, একটা গোল কমলা হাতে নিয়ে তুমি 'মনে করতে' পারবে না যে এটা বর্গাকার। তুমি 'মনে করতে' পারো কমলাটা মিষ্টি বা টক, কিন্তু ওটার ওজন মাত্র দুশো গ্রাম হলে তুমি 'মনে করতে' পারো না যে ওটার ওজন আট কিলো। তুমি অবশ্যই 'বিশ্বাস করতে' পারো যে ওটার ওজন বেশ কয়েক কিলো হতে পারে। কিন্তু সেক্ষেত্রে তোমার অনুমানে বিরাট ভুল হবে। কোনো একটি জিনিসের ওজন কত এ-ব্যাপারে যদি বেশকিছু লোককে অনুমান করতে বলা হয় তাহলে দেখা যাবে তাদের মধ্যে একজন অন্য সবার চেয়ে সঠিক। সংখ্যার ব্যাপারেও ঠিক একই কথা খাটে। ক্যান-

এর ভেতর হয় ৯৮৬টা মটর *আছে* নয় নেই। গতির ব্যাপারেও একই কথা প্রযোজ্য। গাড়িটা হয় চলছে নয় দাঁড়িয়ে আছে স্থির হয়ে।'

'বুঝতে পারছি।'

'কাজেই, 'পরিব্যাপ্ত' বাস্তবতার প্রশ্নে লক দেকার্তের সঙ্গে একমত পোষণ করেছেন যে সেটির এমন কিছু গুণ রয়েছে যা মানুষ প্রজ্ঞার সাহায্যে বুঝতে সক্ষম।'

'এ-ব্যাপারে একমত হওয়াটা এমন কঠিন কিছু নয়।'

'তিনি যাকে স্বজ্ঞামূলক (intuitive) বা 'প্রামাণিক' (demonstrative) জ্ঞান বলেছেন সেটি যে অন্যান্য ক্ষেত্রেও আছে লক তা স্বীকার করেছেন। উদাহরণস্বরূপ, তিনি মনে করতেন বিশেষ কিছু নৈতিক সূত্র সবার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। অন্য কথায় বলতে গেলে, তিনি একটি *স্বাভাবিক ন্যায়* (natural right)-এর ধারণায় বিশ্বাসী ছিলেন। আর এটা তাঁর চিন্তার বুদ্ধিবাদী বৈশিষ্ট্যেরই প্রকাশ। একই রকম আরেকটি বুদ্ধিবাদী বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, লক বিশ্বাস করতেন, মানুষের প্রজ্ঞার ভেতরেই এ-কথা জানার ক্ষমতা নিহিত রয়েছে যে ঈশ্বর আছেন।'

'হয়ত তিনি ঠিকই বলেছেন।'

'কোন বিষয়ে?'

'ঈশ্বর যে আছেন সে-বিষয়ে।'

'সেটি অবশ্য সম্ভব, কিন্তু ব্যাপারটিকে তিনি বিশ্বাসের ওপর ছেড়ে দেননি। তিনি বিশ্বাস করতেন মানুষের প্রজ্ঞা *থেকেই* জন্ম নিয়েছে ঈশ্বরের ধারণা। ওটা একটা বুদ্ধিবাদী বৈশিষ্ট্য। এই সঙ্গে আমার যোগ করা উচিত যে তিনি বুদ্ধিবৃত্তিক স্বাধীনতা এবং সহনশীলতার পক্ষে সোচ্চার হয়েছিলেন। নারী পুরুষের সাম্য নিয়েও অনেক চিন্তা-ভাবনা করেছেন তিনি এবং তিনি মনে করতেন নারী যে পুরুষের অধীন এই ব্যবস্থাটি 'পুরুষেরই সৃষ্টি।' কাজেই এর পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব।'

'এ-ব্যাপারে আমি একমত না হয়ে পারছি না।'

'নারী-পুরুষের ভূমিকা সংক্রান্ত বিষয়ে সাম্প্রতিক সময়ে যে-ক'জন দার্শনিক আগ্রহ বোধ করেছেন লক তাঁদের প্রথম কয়েকজনের অন্যতম। *জন স্টুয়ার্ট মিল*-এর (John Stuart Mill) ওপর লক-এর প্রভাব প্রবল এবং মিলও নারী-পুরুষের সমতার লড়াইয়ে একটি মুখ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন। মোটের ওপর, লক ছিলেন অসংখ্য উদারনৈতিক ধারণার অগ্রদূত আর এ-সব ধারণা সপ্তদশ শতকে ফরাসি আলোকপ্রাপ্তির (French Enlightenment) যুগে পরিপূর্ণভাবে বিকাশ লাভ করেছিল। লকই প্রথম *ক্ষমতার বিভাজন*-এর পক্ষে মত প্রকাশ করেন।'

'তার মানে কি রাষ্ট্রের ক্ষমতা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ভাগ করে দেয়া নয়?'

'কোন কোন প্রতিষ্ঠান তা কি মনে আছে তোমার?'

'এই যেমন আইন প্রণয়নকারী পরিষদ বা নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ, তাছাড়াও রয়েছে বিচার সংক্রান্ত ক্ষমতা বা আদালত। আর তারপর রয়েছে নির্বাহী ক্ষমতা বা সরকার।'

'ক্ষমতার এই বিভাজন-এর বিষয়টি এসেছে ফরাসি আলোকপ্রাপ্তির সময়কার দার্শনিক মঁতেস্কু-র (Montesquieu) কাছ থেকে। লক-ই সবার আগে এ-কথা

জোরের সঙ্গে উচ্চারণ করেছেন যে স্বৈরাচার এড়াতে হলে আইন প্রণয়নকারী এবং নির্বাহী ক্ষমতাকে পৃথক করতেই হবে। লক-এর সমসাময়িক ছিলেন চতুর্দশ লুই, যিনি সমস্ত ক্ষমতা নিজের হাতের মুঠোয় পুরে রেখেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'আমিই রাষ্ট্র।' আমাদের দৃষ্টিতে তিনি ছিলেন 'পরম' (absolute) শাসক। আমাদের দৃষ্টিতে চতুর্দশ লুই-এর শাসন ছিল স্বেচ্ছাচারী এবং খামখেয়ালিপূর্ণ। লক মনে করতেন একটি বৈধ রাষ্ট্র নিশ্চিত করতে জনগণের প্রতিনিধিদেরকেই আইন প্রণয়ন করতে হবে এবং সরকারকে তা কার্যকর করতে হবে।'

হি উ ম

৫৩২

...তাহলে তা ছুঁড়ে ফেলে দাও আগুনে...

মাথা নিচু করে এক দৃষ্টিতে টেবিলটির দিকে তাকিয়ে রইলেন অ্যালবার্টো। শেষে মাথা ঘুরিয়ে জানলা দিয়ে বাইরে তাকালেন তিনি।

'আকাশে মেঘ জমেছে,' সোফি বলল।

'হ্যাঁ, বেশ গুমোট পড়েছে।'

'তা, আপনি কি বার্কলে সম্পর্কে কিছু বলবেন এবার?'

'তিনিই হলেন তিন ব্রিটিশ অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিকদের মধ্যে পরের জন। কিন্তু তিনি যেহেতু অনেক দিক থেকেই আলাদা আমরা তাই প্রথমে নজর দেবো *ডেভিড হিউমের* (David Hume) দিকে, যাঁর জন্ম ১৭১১-তে, মৃত্যু ১৭৭৬-এ। অভিজ্ঞতাবাদীদের মধ্যে তিনিই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত। মহান দার্শনিক ইমানুয়েল কান্টকে তাঁর দর্শনের পথে পরিচালিত করার ক্ষেত্রেও হিউমের একটি বিরাট ভূমিকা রয়েছে।

'কিন্তু আমি যে আগে বার্কলের দর্শনের কথা শুনতে চাইছি সেটির কি কোনো গুরুত্বই নেই আপনার কাছে?'

'সেটি কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ই নয়। স্কটল্যান্ডের এডিনবরা শহরের কাছে বড় হয়েছিলেন হিউম। পারিবারিকভাবে আশা করা হয়েছিল তিনি আইনজীবী হবেন, কিন্তু 'দর্শন আর শিক্ষা ছাড়া অন্য সবকিছুর ব্যাপারেই এক অদম্য অরুচি' বোধ করেছিলেন তিনি। ফরাসি চিন্তাবিদ ভলতেয়ার এবং রুশোর মতো আলোকপ্রাপ্তি (Enlightenment) যুগের মানুষ ছিলেন তিনি; আর, জীবনের শেষ ভাগে এডিনবরায় ফিরে থিতু হওয়ার আগে সারা ইউরোপ জুড়ে ঘুরে বেড়িয়েছেন তিনি। তাঁর প্রধান কাজ *এ ট্রিটিয অভ্ হিউম্যান নেচার* যখন প্রকাশিত হয় হিউমের বয়স আটাশ, যদিও তিনি দাবি করেছেন যে বইটির আইডিয়া তিনি পেয়েছিলেন মাত্র পনেরো বছর বয়েসে।

'আমার তো দেখছি নষ্ট করার মতো সময়-ই নেই।'

'তুমি তো এরই মধ্যে শুরুই করে দিয়েছ।'

'কিন্তু আমাকে যদি আমার নিজের দর্শন দাঁড় করাতে হয় তাহলে তা হবে এ-পর্যন্ত আমি যা কিছু শুনেছি সে-সব থেকে একেবারেই ভিন্ন কিছু।'

'সে-রকম বিশেষ কিছু বাদ পড়েছে কি?'

'এই তো, প্রথমেই ধরুন, এ-পর্যন্ত আপনি যত দার্শনিকের কথা বলেছেন তাঁরা সবাই পুরুষ আর পুরুষরা যেন সবসময় তাদের নিজেদের জগতে বাস করে। আমি বরং বাস্তব জগতের ব্যাপারে আরও বেশি আগ্রহী, যেখানে ফুল, পাখি, জীব-জন্তু আর শিশুরা জন্মায়, বড় হয়। আপনার দার্শনিকেরা সবসময় 'পুরুষ' আর 'মানুষ' নিয়ে ভাবে আর এবার পাওয়া গেল 'মানুষের প্রকৃতি' বিষয়ক আরেকটা প্রবন্ধ। ভাবখানা যেন 'মানুষ' মাঝ বয়েসী। মানে, আমি বলতে চাইছি, জীবন তো শুরু হয় গর্ভাবস্থা আর জন্ম দিয়ে, অথচ এ-পর্যন্ত ডায়াপার বা কান্নাকাটি করা বাচ্চাকাচ্চা সম্পর্কে কিছুই শুনলাম না। তাছাড়া, ভালোবাসা, বন্ধুত্ব এ-সব বিষয়েও প্রায়ই কিছুই না।'

'ঠিকই বলেছ তুমি। কিন্তু হিউম এমন একজন দার্শনিক যাঁর চিন্তাধারা একেবারে অন্যরকম। দৈনন্দিন জগৎ থেকে তিনি তাঁর যাত্রা শুরু করেছেন, যা খুব কম দার্শনিকই করেছেন। আমার তো এমন-ও মনে হয় যে জগতের নতুন নাগরিকেরা অর্থাৎ শিশুরা যেভাবে জীবনটার মুখোমুখি হয় সে-ব্যাপারে হিউমের একটা গভীর আকর্ষণ ছিল।'

'তাহলে তো তাঁর কথা শুনতে হয়।'

'একজন অভিজ্ঞতাবাদী হিসেবে হিউম এইসব পুরুষ দার্শনিকের আবিষ্কার করা ধোঁয়াটে ধারণা আর চিন্তার বুনন পরিষ্কার করার দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন। মধ্যযুগ আর সপ্তদশ শতকের বুদ্ধিবাদী দর্শন থেকেই লিখিত আর কথ্যরূপে স্তূপাকার হয়ে জমে উঠেছিল নানান পুরনো ধ্বংসাবশেষ। জগতের ব্যাপারে আমাদের স্বতঃস্ফূর্ত অভিজ্ঞতার কাছে ফিরে যাওয়ার প্রস্তাব রাখেন হিউম। তিনি বললেন, কোনো দার্শনিকই 'কখনো আমাদেরকে দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার পেছনে নিয়ে যেতে পারবেন না, বা এমন কোনো আচরণবিধি প্রদান করতে পারবেন না যা আমরা দৈনন্দিন জীবনের অনুচিন্তন থেকে পাই না।" '

'এ-পর্যন্ত তো বেশ আশাব্যঞ্জকই মনে হচ্ছে। দু'একটা উদাহরণ দিতে পারেন?'

'হিউমের সময়ে লোকে দেবদূত অর্থাৎ ডানাঅলা মানুষে বিশ্বাস করত খুব। তুমি কি কখনো এ-রকম কোনো প্রাণী দেখেছ, সোফি?'

'না।'

'কিন্তু তুমি নিশ্চয়ই মানবদেহ দেখেছ?'

'এটা কোনো প্রশ্ন হলো?'

'তাছাড়া, তুমি ডানাও দেখেছ?'

'আলবৎ, তবে মানুষের শরীরে নয়।'

'কাজেই, হিউমের মত অনুযায়ী দেবদূত একটি *যৌগিক ভাব* (complex idea)। এটা এমন দুটো অভিজ্ঞতা দিয়ে তৈরি যারা একে অন্যের সঙ্গে সম্পর্কিত নয়, কিন্তু তারপরেও এটা মানুষের কল্পনার সঙ্গে জড়িত। অন্য কথায় বলতে গেলে, এটা একটা মিথ্যে ধারণা যা কিনা অবিলম্বে পরিত্যাজ্য। আমাদের বইয়ের সংগ্রহের মতো আমাদের সমস্ত চিন্তা-ভাবনা আর ধ্যান-ধারণাও সাজিয়ে গুছিয়ে রাখতে হবে আমাদেরকে। কারণ হিউমের ভাষা কোনো বই হাতে নিয়ে আমরা চলো প্রশ্ন করি। ...'এর মধ্যে কি পরিমাণ বা সংখ্যা বিষয়ক কোনো বিমূর্ত যুক্তিবিন্যাস (abstract

reasoning) আছে?' না। 'এর মধ্যে কি বাস্তবাবস্থা বা অস্তিত্ব বিষয়ক কোনো পরীক্ষামূলক যুক্তিবিন্যাস রয়েছে?' না। তাহলে তা ছুঁড়ে ফেলে দাও আগুনে, কারণ এতে কূটতর্ক (sophistry) আর বিভ্রান্তি ছাড়া কিছুই থাকতে পারে না।'

'এটা তো গুরু দণ্ড হয়ে গেল।'

'তারপরেও কিন্তু জগৎটা টিকে আছে। অন্য যে-কোনো সময়ের চেয়ে তরতাজা আর স্পষ্টভাবে। হিউম জানতে চেয়েছিলেন একটি শিশু জগৎকে কী চোখে দেখে, জগৎ সম্পর্কে কী তার অভিজ্ঞতা। একটু আগে তুমি বললে না যে, যে-সব দার্শনিকের কথা তুমি শুনেছ তাঁরা সবাই তাঁদের নিজস্ব জগতে বাস করেছেন, অথচ তুমি বাস্তব জগৎ সম্পর্কেই বেশি আগ্রহী?'

'হ্যাঁ, এ-রকমই কিছু একটা।'

'হিউম-ও হয়ত একই কথা বলতেন। যাই হোক, চলো তাঁর চিন্তার সূত্রটি ভালো করে বোঝার চেষ্টা করা যাক।'

'আমি আপনার সঙ্গে আছি।'

'গোড়াতেই হিউম এই বিষয়টি প্রতিষ্ঠিত করেছেন যে মানুষ ইন্দ্রিয় সংবেদন (impression) আর ভাব নামক দুটো ভিন্ন প্রত্যক্ষণ-এর (perception) অধিকারী। 'ইন্দ্রিয় সংবেদন' বলতে তিনি বাহ্যিক বাস্তবতার প্রত্যক্ষ সংবেদনের কথা বুঝিয়েছিলেন। আর 'ভাব' বলতে বুঝিয়েছেন এ-ধরনের ইন্দ্রিয় সংবেদনের অনুস্মৃতিকে।'

'একটা উদাহরণ দেবেন?'

'গরম চুলায় নিজের পা পুড়লে তুমি একটা তাৎক্ষণিক 'ইন্দ্রিয় সংবেদন' লাভ করো। এরপরে কোনো সময় নিজের শরীর পুড়িয়ে ফেলার সেই ঘটনাটার কথা তুমি হয়ত মনে করলে। তো, স্মৃতি সেই ইন্দ্রিয় সংবেদনের যতটুকু ফিরিয়ে আনতে পারল সে-টুকুকেই হিউম বলছেন একটা 'ভাব।' তফাৎটা হচ্ছে, ইন্দ্রিয় সংবেদন সেই ইন্দ্রিয় সংবেদনের অনুস্মৃতির চাইতে অনেক বেশি শক্তিশালী আর জীবন্ত। তুমি এ-রকমও বলতে পারো যে সেই সংবেদনটা হচ্ছে মৌলিক বা আসল আর ভাবটি বা অনুস্মৃতিটি নেহাতই এক আবছা অনুকরণ। ইন্দ্রিয় সংবেদনটিই মনের ভেতর সংরক্ষিত ভাবটির প্রত্যক্ষ কারণ।'

'এ-পর্যন্ত আপনার কথা বুঝতে অসুবিধে হয়নি।'

'হিউম এরপর জোর দিয়ে বলছেন যে ইন্দ্রিয় সংবেদন আর ভাব এই দুটোই সরল হতে পারে আবার যৌগিক-ও হতে পারে। লক-এর প্রসঙ্গে আপেলের কথা বলেছিলাম মনে আছে নিশ্চয়ই। একটা আপেল সম্পর্কিত প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা যৌগিক ইন্দ্রিয় সংবেদনের এক মোক্ষম উদাহরণ।'

'বাধা দেয়ার জন্য দুঃখিত, কিন্তু এ-সব কি নিতান্তই জরুরি?'

'জরুরি? কী যে বলো। তবে দার্শনিকেরা যে মাঝে মাঝে কিছু ছদ্ম সমস্যা নিয়ে সময় নষ্ট করেন না তা নয়, কিন্তু তাই বলে একটা যুক্তি দাঁড় করানোর ব্যাপারে হাল ছাড়াটা তোমার মোটেই উচিত হবে না। হিউম সম্ভবত দেকার্তের সঙ্গে এই বিষয়ে একমত প্রকাশ করতেন যে, কোনো চিন্তন প্রক্রিয়া শুরু করতে হলে তা একেবারে

গোড়া থেকে শুরু করা ভাল।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে।'

'হিউমের বক্তব্য হলো, মাঝে মাঝে আমরা এমন কিছু যৌগিক ভাব পোষণ করি বাস্তব জগতে যে-সবের অনুরূপ কোনো বস্তু নেই। দেবদূতের ব্যাপারটা তো বললাম। তার আগে বলেছি ক্রকোফ্যান্টের কথা। আরেকটা উদাহরণ হলো পেগাসাস, ডানাঅলা ঘোড়া। এই তিন ক্ষেত্রেই একটা বিষয় আমাদের স্বীকার করতে হবে যে, আমাদের মন নিজে নিজেই কাটা আর জোড়া দেয়ার একটা চমৎকার কাজ করেছে। এ-সবের প্রত্যেকটা উদাহরণই কোনো একসময় প্রত্যক্ষ করা হয়েছিল এবং সেগুলো মনের রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করেছিল সত্যিকারের একটি 'ইন্দ্রিয় সংবেদন' হিসেবে। মন আসলে কোনো কিছু আবিষ্কার করেনি। মন নানান জিনিস এক সঙ্গে জুড়ে দিয়ে মিথ্যে 'ভাব' তৈরি করে।'

'হ্যাঁ, বুঝতে পারছি। বিষয়টি *আসলেই* জরুরি।'

'বেশ। তো, প্রতিটি ভাব হিউম আলাদা আলাদা করে খতিয়ে দেখতে চেয়েছেন, বাস্তবের সঙ্গে মেলে না এমন কোনো উপায়ে সেটি তৈরি হয়েছে কিনা তা দেখার জন্য। তাঁর প্রশ্ন হচ্ছে কোন ইন্দ্রিয় সংবেদন থেকে এই ভাবটি এসেছে? প্রথমে তাঁকে খুঁজে বার করতে হয়েছে কোন কোন 'একক ভাব' থেকে একটি যৌগিক ভাব সৃষ্টি হয়েছে সেটি। এটা তাকে আমাদের ভাবগুলোকে বিশ্লেষণ করার একটা সমালোচনামূলক পদ্ধতি দান করেছে এবং তাতে করে তিনি আমাদের চিন্তা-ভাবনা আর ধ্যান-ধারণাগুলোকে সাজাতে গোছাতে পেরেছেন।'

'দু'একটা উদাহরণ দেয়া যায়?'

'হিউমের সময়ে অনেকেই 'স্বর্গ' বা 'নতুন জেরুজালেম' সম্পর্কে খুব স্পষ্ট একটা ধারণার অধিকারী ছিল। তোমার বোধকরি মনে আছে যে দেকার্ত কীভাবে দেখিয়েছিলেন যে 'স্বচ্ছ এবং স্পষ্ট' ভাবগুলো নিজেরাই এই বিষয়টি নিশ্চিত করতে পারে যে বাস্তবে অস্তিত্ব রয়েছে এমন জিনিসের সঙ্গে সেগুলোর মিল রয়েছে।'

'আগেই তো বলেছি আমি অতোটা ভুলো মনা নই।'

'তো, আমরা খুব শিগগিরই উপলব্ধি করি যে 'স্বর্গ' সম্পর্কিত আমাদের ধারণা অসংখ্য উপাদানের সমন্বয়ে তৈরি। 'মুক্তোর মতো গেট', 'সোনার রাস্তা', শত সহস্র 'দেবদূত' আর এ-রকম অগুনতি জিনিস দিয়ে স্বর্গ তৈরি। এরপরেও কিন্তু আমরা সবগুলোকে একক উপাদানে ভেঙে ফেলতে পারিনি। কারণ, মুক্তোর মতো গেট, সোনার রাস্তা, দেবদূত, ইত্যাদি সবই নিজেরাই যৌগিক ভাব। যখন আমরা উপলব্ধি করব যে স্বর্গ সম্পর্কিত আমাদের ধারণা 'মুক্তা', 'গেট', 'রাস্তা', 'সোনা' 'সাদা পোশাক পরা দেহমূর্তি' আর 'ডানা'-র মতো একক ভাব দিয়ে গড়া, কেবল তখনই আমরা নিজেদেরকে জিজ্ঞেস করতে পারব সত্যিই কখনো আমরা এ-ধরনের 'সরল ইন্দ্রিয় সংবেদন' লাভ করেছিলাম কিনা।'

'তা করেছিলাম। কিন্তু আমরা এই সমস্ত 'সরল ইন্দ্রিয় সংবেদন'-কে কেটে আর জোড়া লাগিয়ে একটা ভাব তৈরি করে নিয়েছি।'

'হ্যাঁ, ঠিক তাই করেছি আমরা। কারণ কোনো কিছু মনের চোখে দেখার সময়

আমরা মানুষেরা যে-জিনিসটি করি তা হলো এই কাটা আর জোড়া লাগানো। কিন্তু হিউম যে-বিষয়টির ওপর জোর দিচ্ছেন তা হলো, আমাদের ভাবগুলোতে আমরা যে-সব উপাদান এনে জড়ো করি তার সবই কোনো একসময় 'সরল ইন্দ্রিয় সংবেদন' হিসেবে মনের মধ্যে ঢুকেছিল। যে-লোক কোনোদিন সোনা দেখেনি সে কখনো সোনার তৈরি রাস্তার কথা মনের চোখে দেখতে পারবে না।'

'বড্ড চালাক লোক ছিলেন হিউম। তা, ঈশ্বর সম্পর্কে দেকার্তের সেই স্বচ্ছ আর স্পষ্ট ভাবটার কী হবে?'

'সে-ব্যাপারেও একটা উত্তর দিয়েছেন হিউম। ধরা যাক, ঈশ্বরকে আমরা যারপরনাই রকমের 'বুদ্ধিমান, জ্ঞানী আর ভালো সত্তা' হিসেবে ভাবছি। এতে করে আমরা এমন একটা 'যৌগিক ভাব' পাচ্ছি যা তৈরি হয়েছে একটা যারপরনাই রকমের বুদ্ধিমান, যারপরনাই রকমের জ্ঞানী আর যারপরনাই রকমের ভালো কিছু দিয়ে। বুদ্ধি, প্রজ্ঞা এবং ভালোত্ব কী তা যদি আমরা না জানতাম তাহলে কস্মিনকালেও ঈশ্বর সম্পর্কে এ-রকম একটা ধারণা আমাদের হোতো না। আবার ঈশ্বর সম্পর্কে আমাদের ধারণাটা হয়ত এ-রকম যে তিনি একজন 'কঠোর কিন্তু ন্যায়পরায়ণ পিতা'; তার মানে, সেটি 'কঠোরতা', 'ন্যায়পরায়ণতা' আর 'পিতা' দিয়ে তৈরি একটা ধারণা। ধর্মের অনেক সমালোচক হিউমের এই কথার সূত্র ধরে দাবি করে আসছেন যে ঈশ্বর সম্বন্ধে এ-ধরনের ধারণা ছোটবেলায় আমরা আমাদের নিজেদের বাবাকে যেভাবে পেয়েছি তার সঙ্গে সম্পর্কিত হতে পারে। বলা হয়েছে যে, একজন পিতা সম্পর্কিত ধারণাই 'স্বর্গীয় পিতা'-র ভাবের জন্ম দিয়েছে।'

'কথাটা হয়ত সত্যি। কিন্তু এই ব্যাপারটা আমি কখনোই মেনে নিইনি যে ঈশ্বরকে পুরুষই হতে হবে। মা মাঝে মাঝে গডকে 'গডাইভা' (Godiva) বলে, ব্যাপারটার মধ্যে নেহাতই একটা ভারসাম্য আনার জন্য।'

'সে যাই হোক, মোদ্দা কথা হলো যে-সব চিন্তা আর ভাবের উৎসে গিয়ে অনুরূপ ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষণ পাওয়া যায় না, হিউম সে-সব চিন্তা ও ভাবের বিরোধিতা করেছেন। হিউম বলেছেন তিনি চেয়েছেন 'এ-ধরনের যে-সব অর্থহীন বাগাড়ম্বর দীর্ঘদিন ধরে অধিবিদ্যাগত চিন্তার (metaphysical thought) রাজ্যে আধিপত্য চালিয়ে এটাকে দুর্নামের ভাগীদার করেছে তার সব বাতিল করে দিতে।'

'কিন্তু তারপরেও আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে অনেক যৌগিক ভাব ব্যবহার করি, সেগুলো যুক্তিপূর্ণ কিনা তা ভেবে না দেখেই। এই যেমন, 'আমি' (I) বা অহং-এর (ego) প্রশ্নটাই ধরো। এটাই ছিল দেকার্তের দর্শনের ভিত্তিমূল। এটাই ছিল এক স্বচ্ছ আর সুস্পষ্ট প্রত্যক্ষণ যার ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল তাঁর সমস্ত দর্শন।'

'আশা করি হিউম এটা অস্বীকার করার চেষ্টা করেননি যে আমিই হচ্ছি আমি। তাহলে কিন্তু বড্ড বাড়াবাড়ি হয়ে যেতো।'

'সোফি, এই কোর্স-এর মাধ্যমে তোমাকে আমি যদি মাত্র একটা জিনিস-ও শেখাতে চাই তো সেটি হলো হুট করে কোনো সিদ্ধান্ত না নেয়া।'

'দুঃখিত। বলে যান।'

'না, তারচেয়ে বরং নিজেই হিউমের পদ্ধতিটা ব্যবহার করে চিন্তা করে দেখো না

তুমি তোমার 'অহং'-কে কীভাবে প্রত্যক্ষ করো।'

'প্রথমে আমাকে বের করতে হবে অহং সরল না যৌগিক ভাব সেটি।'

'তা, কী সিদ্ধান্তে আসছো তুমি?'

'স্বীকার করতেই হবে যে ব্যাপারটা বেশ জটিল বলে মনে হচ্ছে আমার কাছে। এই যেমন আমি একেবারেই স্থিরমতি নই। কোনো ব্যাপারে মনস্থির করতে বেশ সমস্যা হয় আমার। তাছাড়া, একই লোককে পছন্দ-অপছন্দ দুটোই করা সম্ভব আমার পক্ষে।'

'অন্য কথায় বলতে গেলে তাহলে 'অহং-এর ধারণা' একটা 'যৌগিক ভাব।'

'ঠিক আছে। কাজেই এখন তাহলে বোধহয় আমাকে অবশ্যই এটা বের করতে হবে আমার নিজের অহং-এর সঙ্গে মিল রয়েছে এমন কোনো 'যৌগিক ইন্দ্রিয় সংবেদন' (complex impression) আমার রয়েছে কিনা। আমার ধারণা, রয়েছে। সত্যি বলতে কী, সব সময়ই ছিল।'

'তাতে কি তুমি চিন্তিত?'

'আমি খুবই অস্থির প্রকৃতির। প্রথম কথা, আমার বয়স যখন চার ছিল তখনকার আমি আর আজকের আমি এক নয়। আমার মেজাজ-মর্জি আর আমি নিজেকে কীভাবে দেখি তা ক্ষণে ক্ষণে বদলায়। হঠাৎ করেই আমার মনে হয় যে আমি এক 'নতুন মানুষ।'

'কাজেই অপরিবর্তনীয় এক অহং-এর অধিকারী হওয়ার অনুভূতিটি মিথ্যে প্রত্যক্ষণ ছাড়া কিছু নয়। অহং-এর প্রত্যক্ষণ আসলে সরল ইন্দ্রিয় সংবেদনের এক দীর্ঘ শৃঙ্খল আর এই সংবেদনগুলো আমরা কখনোই *এক সঙ্গে* লাভ করি না। হিউমের ভাষায় অহং 'আর কিছুই না, নানান প্রত্যক্ষণ-এর একটা বান্ডিল মাত্র, যে-সব প্রত্যক্ষণ এক অচিন্তনীয় দ্রুততায় একের পরে এক এসে হাজির হয়, তাছাড়া সেগুলো থাকে নিরন্তর পরিবর্তন আর গতিশীলতার মধ্যে।' মন 'এক ধরনের থিয়েটার যেখানে অসংখ্য প্রত্যক্ষণ একের পর এক আবির্ভূত হয়; আসে, আবার আসে, পিছলে যায়, বিন্যাস আর অবস্থার এক অন্তহীন বৈচিত্র্যে মিশে যায় একে অন্যের সঙ্গে।' হিউম বলতে চান, যে-সব প্রত্যক্ষণ ও অনুভূতি আসে আর যায় সেগুলোর পেছনে বা নিচে আমাদের কোনো 'ব্যক্তিগত পরিচয়' থাকে না। এটা ঠিক মুভি স্ক্রিনের ওপরের ছবিগুলোর মতো। ছবিগুলো এতো তাড়াতাড়ি বদলে যায় যে আমরা ঠিক বুঝতে পারি না চলচ্চিত্রটি আসলে অসংখ্য একক ছবি দিয়ে তৈরি। আসলে ছবিগুলো জোড়া লাগানো নয়। চলচ্চিত্রটি আসলে বেশ কিছু মুহূর্তের সমষ্টি।'

'আমি হাল ছেড়ে দিচ্ছি।'

'তার অর্থ কি এই যে একটি অপরিবর্তনীয় অহং থাকার ধারণাটি তুমি ত্যাগ করছ?'

'সে-রকমই বোধ হচ্ছে।'

'একটু আগে কিন্তু তুমি এর উল্টোটাই বিশ্বাস করতে। এই সঙ্গে আমার যোগ করা উচিত যে হিউমের এই মানব মন বিশ্লেষণ আর অপরিবর্তনীয় অহং-এর ধারণা পরিত্যাগের বিষয়টি ২,৫০০ বছর আগেই পৃথিবীর অন্য প্রান্তে আলোচিত হয়েছে।'

'কার মাধ্যমে?'

'বুদ্ধ। দু'জন কতটা একই রকম চিন্তা করতে পারেন তা দেখে গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে প্রায়। বুদ্ধ জীবনকে দেখেছেন মানসিক আর শারীরিক প্রক্রিয়ার এক অখণ্ড পরম্পরা হিসেবে যা মানুষকে রাখে এক নিরন্তর পরিবর্তনশীল অবস্থার মধ্যে। শিশু আর বয়স্ক মানুষটি এক নয়, আজকের আমি আর গতকালকের আমি এক নই। বুদ্ধ বলছেন, এমন কিছু নেই যেটাকে আমি বলতে পারি যে 'এটাই আমার' এবং এমন কিছু নেই, যেটা সম্পর্কে আমি বলতে পারি যে 'এটাই আমি।' অতএব, 'আমি' বা অপরিবর্তনীয় অহং বলতে কিছু নেই।'

'হ্যাঁ কথাগুলো, একবারে হিউমের মতো।'

'অপরিবর্তনীয় অহং-এর ধারণার ধারাবাহিকতায় বুদ্ধিবাদী অনেকেই এই বিষয়টি নিশ্চিত বলে ধরে নিয়েছেন যে মানুষ একটি শাশ্বত আত্মার অধিকারী।'

'ওটাও কি একটা মিথ্যে ধারণা?'

'হিউম আর বুদ্ধের মত অনুযায়ী তো অবশ্যই। মৃত্যুর ঠিক আগে বুদ্ধ তাঁর অনুসারীদের কী বলেছিলেন জানো?'

'না, কীভাবে জানবো?'

'সমস্ত যৌগিক জিনিসের ভেতরেই ক্ষয় নিহিত রয়েছে। কীসে তোমাদের নিজেদের মোক্ষ বা নির্বাণ তা তোমরা নিজেরাই খুঁজে বের করে নাও অধ্যবসায়ের সঙ্গে।' হিউমও ঠিক একই কথা বলতে পারতেন। কিংবা, ডেমোক্রিটাস। আত্মার অমরত্ব বা ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণের কোনো প্রচেষ্টাই হিউমের কাছে স্বীকৃতি পায়নি। তার অর্থ এই নয় যে তিনি এ-দুটো সম্ভাবনার কোনোটিকে নাকচ করে দিয়েছেন। কিন্তু তিনি ভাবতেন ধর্মীয় বিশ্বাস মানবীয় প্রজ্ঞা দিয়ে প্রমাণ করাটা একটা বুদ্ধিবৃত্তিক ভাঁওতাবাজি। হিউম খ্রিস্টান ছিলেন না, তাই বলে যে তিনি পাঁড় নাস্তিক ছিলেন তা-ও নয়। আমরা যাকে বলি *অজ্ঞাবাদী* (agnostic) তিনি ছিলেন তাই।'

'সেটি আবার কী?'

'অজ্ঞাবাদী তিনি যিনি মনে করেন যে ঈশ্বরের বা কোনো দেবতার অস্তিত্ব প্রমাণ বা অপ্রমাণ কিছুই করা যায় না। হিউম যখন মৃত্যুশয্যায় তখন তাঁর এক বন্ধু[২১] তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলেন তিনি পরকালে বিশ্বাস করেন কিনা। হিউম নাকি তাঁকে জবাবে বলেছিলেন

'আগুনের ভেতর এক টুকরো কয়লা ফেললে সেটি না-ও জ্বলতে পারে।'

'আচ্ছা।'

'উত্তরটি তার নিঃশর্ত খোলা মানসিকতারই আদর্শ প্রকাশ। তিনি কেবল তা-ই গ্রহণ করতেন যা তাঁর ইন্দ্রিয় দিয়ে প্রত্যক্ষ করতেন। অন্য সমস্ত সম্ভাবনার দরজা খোলা রাখতেন। খ্রিস্টধর্ম বা অলৌকিক ঘটনায় বিশ্বাসের কোনোটিকেই তিনি বাতিল করে দেননি। কিন্তু এর দুটোই *বিশ্বাস* সংক্রান্ত বিষয়, জ্ঞান বা প্রজ্ঞা সংক্রান্ত নয়। এক

---

২১. বিখ্যাত সাহিত্যিক ও ইংরেজি অভিধান *Dictionary of the English Language* প্রণেতা স্যামুয়েল জনসন-এর জীবনী লেখক জেমস বসওয়েল—অনুবাদক।

অর্থে তুমি বলতে পারো যে হিউমের দর্শন-ই বিশ্বাস আর জ্ঞানের মধ্যে শেষ যোগসূত্রটি ছিন্ন করে দেয়।'

'আপনি বলতে চান অলৌকিক ঘটনা ঘটতে পারে এটা তিনি অস্বীকার করেননি?'

'তার অর্থ এই নয় যে তিনি নিজে অলৌকিক ঘটনায় বিশ্বাস করতেন। বরং তার উল্টোটাই ঠিক। আমরা আজ যাকে 'অতিপ্রাকৃত' (supernatural) ঘটনা বলি সাধারণ মানুষের কাছে যে সে-সবের একটা বড়সড় প্রয়োজন রয়েছে এই বিষয়টি তিনি গুরুত্বের সঙ্গে লক্ষ করেছেন। ব্যাপার হচ্ছে, যে-সব অলৌকিক ঘটনার কথা তুমি শোনো তার সবগুলোই কোনো না কোনো দূর স্থানে বা অনেক অনেক আগে ঘটেছে। সত্যি বলতে কী, অলৌকিক ব্যাপার-স্যাপারে হিউম যে বিশ্বাস করতেন না তার সবচেয়ে সহজ কারণ হচ্ছে সে-রকম কোনো ঘটনা তিনি ঘটতে দেখেননি। কিন্তু সেই সঙ্গে এ-কথাও ঠিক যে ওসব যে ঘটে না তা-ও তাঁর অভিজ্ঞতায় নেই।'

'ব্যাপারটা একটু ব্যাখ্যা করে বলতে হবে আপনাকে।'

'হিউমের কথা হচ্ছে, অলৌকিক ঘটনা প্রকৃতির নিয়ম বিরুদ্ধ। কিন্তু প্রকৃতির নিয়ম আমরা *প্রত্যক্ষ করেছি* বা আমাদের অভিজ্ঞতায় আছে এ-কথা বলারও কোনো মানে হয় না। আমরা দেখি যে হাত থেকে ছেড়ে দিলে পাথর মাটিতে পড়ে যায়, কিন্তু যদি তা না পড়ে তখনই না *ব্যাপারটি* আমাদের অভিজ্ঞতার ভেতর এলো।'

'আমি বলব ওটা একটা অলৌকিক বা অতিপ্রাকৃত ঘটনা।'

'তাহলে তুমি বিশ্বাস করছ বা বলছ দুটো প্রকৃতি রয়েছে; একটি 'প্রাকৃতিক' আরেকটি 'অতিপ্রাকৃতিক'। তুমি কি সেই পুরনো বুদ্ধিবৃত্তিক ভাঁওতাবাজির মধ্যে পড়ে যাচ্ছ না?'

'হতে পারে, কিন্তু আমি মনে করি যতবারই আমি পাথরটাকে ছেড়ে দেবো ততবারই সেটি মাটিতে পড়বে।'

'কেন?'

'এইবার কিন্তু বড্ড বাড়াবাড়ি করছেন আপনি।'

'আমি বাড়াবাড়ি করছি না, সোফি। প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে একজন দার্শনিক কখনোই অন্যায় বা ভুল করেন না। সম্ভবত, হিউমের দর্শনের সবচেয়ে জটিল জায়গাতে এসে পড়েছি আমরা। আচ্ছা বলতো, কী করে তুমি এতো নিশ্চিত হলে যে পাথরটা সব সময় মাটিতে পড়বে?'

'ব্যাপারটা আমি এতোবার ঘটতে দেখেছি যে আমি একদম নিশ্চিত।'

'হিউম হলে বলতেন তুমি একটা পাথরকে অসংখ্যবার মাটিতে পড়তে দেখেছ। কিন্তু তুমি কখনোই দেখোনি যে ওটা *সব সময়* মাটিতে পড়ে। এটা বলাই স্বাভাবিক যে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির কারণেই পাথরটা মাটিতে পড়ে। কিন্তু এ-ধরনের কোনো সূত্র আমাদের অভিজ্ঞতায় নেই। আমরা স্রেফ দেখেছি যে জিনিস-পত্র মাটিতে পড়ে যায়।'

'ব্যাপারটা কি একই হলো না?'

'পুরোপুরি নয়। তুমি বলছ তুমি বিশ্বাস করো পাথরটা মাটিতে পড়বে তার কারণ তুমি বহুবার ঘটনাটা ঘটতে দেখেছ। ঠিক এটাই হিউমের বক্তব্য। একটা জিনিসের পর আরেকটা জিনিস দেখতে তুমি এতোটাই অভ্যস্ত যে একটা পাথর ছেড়ে দেবার

পর প্রতিবারই তুমি একই ঘটনা ঘটবে বলে আশা করো। এভাবেই, আমরা যাকে 'প্রকৃতির অলঙ্ঘনীয় সূত্র' বলতে ভালোবাসি তার জন্ম হয়।'

'তিনি কি সত্যি সত্যিই ভাবতেন যে পাথরটা না পড়া সম্ভব?'

'সম্ভবত তিনি তোমার মতোই নিশ্চিত ছিলেন যে তিনি যতবারই ওটা ছেড়ে দেবেন ততবারই পাথরটা মাটিতে পড়ে যাবে। কিন্তু তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন যে কেন ঘটনাটা ঘটে সেটি তাঁর অভিজ্ঞতায় নেই।'

'ছোট ছোট শিশু আর ফুলের কাছ থেকে আবার কিন্তু মেলা দূরে চলে এসেছি আমরা।'

'মোটেই না, বরং ঠিক তার উল্টো। হিউমের কথার সত্যতা যাচাইয়ের জন্য তুমি স্বচ্ছন্দে শিশুদের শরণ নিতে পারো। পাথরটা যদি এক বা দু'ঘণ্টা শূন্যে ভেসে থাকে তাহলে কে বেশি অবাক হবে বলে মনে হয় তোমার, তুমি না একটা শিশু?'

'বোধকরি আমি।'

'কেন?'

'কারণ ব্যাপারটা যে কতটা অস্বাভাবিক তা বাচ্চাটার চেয়ে আমি ঢের বেশি জানবো।'

'কিন্তু বাচ্চাটার কাছে ঘটনাটা অস্বাভাবিক বলে ঠেকবে না কেন?'

'কারণ প্রকৃতি কী রকম আচরণ করে সেটি এখনো বাচ্চাটা শিখে উঠতে পারেনি।'

'অথবা হয়ত কারণটা এই যে প্রকৃতি একটা *অভ্যাসে* পরিণত হয়নি।'

'আমি বুঝতে পারছি আপনি কী বলতে চাইছেন। হিউম চেয়েছিলেন মানুষ যেন তার সচেতনতা তীক্ষ্ণ রাখে।'

'বেশ, এবার তাহলে এই এক্সারসাইজটা করো ধরা যাক, তুমি আর একটা ছোট্ট বাচ্চা একটা ম্যাজিক শোতে গিয়েছ যেখানে জিনিসপত্র শূন্যে ভাসিয়ে রাখার, খেলা দেখানো হয়। তো, সেখানে তোমাদের মধ্যে কে বেশি মজা পাবে?'

'সম্ভবত আমি।'

'কারণ আমারই জানা থাকবে ব্যাপারগুলো কত অসম্ভব।'

'কাজেই...প্রকৃতির নিয়মগুলো কী সে-কথা জানার আগে সেগুলো লংঘিত হওয়ার ঘটনায় একটি শিশুর জন্য মজার কিছুই থাকে না।'

'বোধ করি কথাটা সত্যি।'

'আমরা কিন্তু এখনো হিউমের অভিজ্ঞতার দর্শনের সবচেয়ে জটিল জায়গাতে আছি। তিনি হয়ত এসবের সঙ্গে এ-কথা যোগ করতেন যে বাচ্চাটি এখনো অভ্যাসের প্রত্যাশার দাস হয়ে যায়নি; কাজেই তোমাদের দু'জনের মধ্যে বাচ্চাটিই বেশি খোলা মনের। আমি তো ভাবি বাচ্চাটি একই সঙ্গে আরও বড় দার্শনিক কিনা। কোনোরকম পূর্বজ্ঞাত ভাব নিয়ে আসেনি সে। আর এটাই হচ্ছে একজন দার্শনিকের সবচেয়ে অসাধারণ গুণ। জগৎটা যেমন সেভাবেই সেটিকে দেখে শিশুটি, তার অভিজ্ঞতায় যা কিছু ঘটে তার বেশি সে সে-সবের মধ্যে আরোপ করে না।'

'কোনো ব্যাপার সম্পর্কে ভালো করে না জেনেই যখনই সে-সম্পর্কে ভালো-মন্দ

একটা ধারণা করে বসে থাকি তখনই আমার কেমন যেন খারাপ লাগে।'

'অভ্যাসের শক্তি নিয়ে আলোচনার সময় 'কার্য-কারণ সম্বন্ধের সূত্র'-র ওপর জোর দিয়েছেন হিউম। এই সূত্র বলে যে, যা কিছু ঘটে তার প্রত্যেকটিরই কোনো না কোনো কারণ থাকতে হবে। হিউম তাঁর উদাহরণ দেবার জন্য দুটো বিলিয়ার্ড বলের সাহায্য নিয়েছেন। স্থির অবস্থায় থাকা একটি সাদা বিলিয়ার্ড বলকে যদি কালো একটি বিলিয়ার্ড বল গড়িয়ে গিয়ে ধাক্কা মারা যায় তাহলে সাদা বলটা কী করবে?'

'কালো বলটা সাদাটার গায়ে গিয়ে আঘাত করলে সাদা বলটা চলতে শুরু করবে।'

'আচ্ছা, কিন্তু কেন ওটা তা করবে?'

'কারণ কালো বলটা ওটাকে ধাক্কা দিয়েছে।'

'কাজেই আমরা সচরাচর বলি যে কালো বলটার আঘাতই সাদা বলটার চলতে শুরু করার *কারণ*। কিন্তু একটা কথা মনে রেখো, আমরা ঠিক ততোটাই বলতে পারি যতটা আমরা প্রত্যক্ষ করেছি।'

'এই ব্যাপারটা আমি অনেকবার দেখেছি। জোয়ানার বেসমেন্টে একটা পুল টেবিল আছে।'

'হিউম বলবেন, তুমি কেবল যে-জিনিসটি প্রত্যক্ষ করেছ তা হলো সাদা বলটা টেবিলটার ওপর দিয়ে গড়াতে শুরু করেছে। ওটার গড়াতে শুরু করার আসল কারণ তুমি প্রত্যক্ষ করোনি। তুমি প্রত্যক্ষ করেছো যে একটা ঘটনা আরেকটা ঘটনার পরে ঘটেছে, কিন্তু তুমি এটা প্রত্যক্ষ করোনি যে অন্য ঘটনাটা প্রথম ঘটনাটার *কারণে* ঘটেছে।'

'ব্যাপারটা কি বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না?'

'না, বরং এটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। হিউম জোর দিয়ে বলছেন যে একটা ঘটনার পরে আরেকটা ঘটনা ঘটার প্রত্যাশাটা বস্তুগুলোর মধ্যে নিহিত নেই। আছে আমাদের মনে। আর আমরা দেখলাম, প্রত্যাশা অভ্যাসের সঙ্গে জড়িত। সেই শিশুটির প্রসঙ্গে ফিরে গিয়ে বলতে হয়, একটা বল আরেকটা বলকে আঘাত করার পর দুটোই যদি একদম স্থির থাকে তাহলে সে অবাক হয়ে চেয়ে থাকবে না। আমরা যখন 'প্রকৃতির নিয়ম' বা 'কারণ আর ফলাফল'-এর কথা বলি, তখন কোন ব্যাপারটি 'যুক্তিসঙ্গত' তা বলার বদলে আমরা আসলে বলি কী আশা করি সে-কথা। প্রকৃতির নিয়মগুলো যৌক্তিকও নয় অযৌক্তিকও নয়, সেগুলো কেবলই নিয়ম। কালো বিলিয়ার্ড বলটা আঘাত করলে সাদা বলটা চলতে শুরু করবে এই প্রত্যাশাটা অতএব সহজাত নয়। জগৎটা কেমন বা জগৎ-এর কোন জিনিসটা কী রকম আচরণ করে সে-সম্পর্কে একরাশ প্রত্যাশা নিয়ে আমরা জন্মগ্রহণ করিনি। জগৎটা ঠিক সেটিরই মতো আর এটাকে আমাদের চিনতে হবে।'

'আমার মনে হচ্ছে আমরা আবার অন্য দিকে সরে যাচ্ছি।'

'আমাদের প্রত্যাশা যদি আমাদেরকে হুট করে কোনো সিদ্ধান্তে নিয়ে আসে তাহলে নয়। হিউম অলঙ্ঘনীয় 'প্রাকৃতিক নিয়ম'-এর অস্তিত্বের কথা অস্বীকার করেননি, কিন্তু তিনি মনে করতেন খোদ সেই প্রাকৃতিক নিয়মগুলো প্রত্যক্ষ করার

মতো অবস্থায় যেহেতু আমরা নেই তাই আমরা খুব সহজেই ভুল সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলতে পারি।'

'যেমন?'

'এই যেমন কালো ঘোড়ার একটা পাল দেখার অর্থ এই নয় যে সব ঘোড়াই কালো।'

'না, অবশ্যই না।

'আবার আমি যেহেতু আমার জীবনে কালো ছাড়া অন্য কোনো রঙের কাক দেখিনি তার অর্থ এই নয় যে সাদা কাক বলে কিছু নেই। দার্শনিক আর বিজ্ঞানী দু'জনের জন্যই সাদা কাক খুঁজে পাওয়ার সম্ভাবনাটা বাতিল না করাটাই হয়ত ভালো হবে। তুমি এমনকি প্রায় এ-রকম বলতে পারো যে 'সেই সাদা কাকটাকে' খোঁজাই বিজ্ঞানের আসল কাজ।'

'হ্যাঁ, বুঝতে পারছি।'

'কারণ আর ফলাফলের প্রশ্নে এমন অনেকেই থাকতে পারে যারা মনে করে বিদ্যুচ্চমকই বজ্রের কারণ কেননা বিদ্যুচ্চমকের পরেই বজ্রের গর্জন শোনা যায়। এই উদাহরণ আর বিলিয়ার্ড বলের উদাহরণের মধ্যে কিন্তু আসলে সে-রকম কোনো পার্থক্য নেই। এখন বলো, বিদ্যুচ্চমকই কি বজ্রের কারণ?'

'ঠিক তা নয়, আসলে দুটো ব্যাপারই ঠিক একই সময় ঘটে।'

'বিদ্যুচ্চমক আর বজ্র দুটোরই কারণ বৈদ্যুতিক ডিসচার্জ। কাজেই দেখা যাচ্ছে প্রকৃত পক্ষে তৃতীয় একটা উপাদানই এ-দুটোর কারণ।

'ঠিক।'

'আমাদের এই শতাব্দীর একজন অভিজ্ঞতাবাদী বার্ট্রান্ড রাসেল দিয়েছেন আরও উদ্ভট একটা উদাহরণ। একটা মুরগির বাচ্চা যদি প্রতিদিন দেখে যে চাষী বউ মুরগির খোপের কাছে এলেই সে খাবার পায় তাহলে শেষ পর্যন্ত সেটি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছাবে যে চাষী বউয়ের আসা আর গামলার মধ্যে ওটার খাবার রাখার মধ্যে কার্য-কারণঘটিত একটা সম্পর্ক রয়েছে।'

'তাহলে কি একদিন মুরগির বাচ্চাটা খাবার পায় না?'

'না, একদিন চাষী বউ আসে ঠিকই, কিন্তু তারপর ঘাড় মটকায় মুরগির বাচ্চাটার।'

'ওয়াক্ , কী জঘন্য!'

'একটা ঘটনার পরে আরেকটা ঘটনা ঘটলেই এটা ধরে নেবার কারণ নেই যে সেখানে কার্য-কারণঘটিত কোনো সম্পর্ক আছে। দর্শনের অন্যতম প্রধান উদ্দিষ্ট হচ্ছে হুট করে সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর বিপদ সম্পর্কে মানুষকে সতর্ক করে দেয়া। সত্যি কথা বলতে কী, এই হুট করে সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর ব্যাপারটা অনেক ধরনের কুসংস্কারের জন্ম দিতে পারে।'

'কী করে?'

'কালো একটা বিড়ালকে রাস্তা পার হতে দেখলে তুমি। সেদিনই পরে কোনো একসময় পড়ে গিয়ে হাতটা ভেঙে ফেললে তুমি। কিন্তু তার মানে তো এই নয় যে এই

ঘটনা দুটোর মধ্যে কার্য-কারণঘটিত কোনো সম্পর্ক আছে। বিজ্ঞানে এই বিষয়টা বিশেষ জরুরি যে হুট করে যেন কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছানো না হয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, বিশেষ একটা ওষুধ খেয়ে অনেক লোক সুস্থ হয়ে যাওয়ার অর্থ এই নয় যে সেই ওষুধ খাওয়ার কারণেই সবাই ভালো হয়ে গেছে। এই কারণে নির্দিষ্টসংখ্যক রোগীর বিশাল একটা দলকে দরকার যাদেরকে এই ধারণা দেয়া হবে যে তাদেরকেও একই ওষুধ দেয়া হয়েছে, কিন্তু আসলে যাদেরকে দেয়া হয়েছে স্রেফ ময়দা আর পানি। এই রোগীরাও যদি ভালো হয়ে যায় তাহলে বুঝতে হবে নিশ্চয়ই তৃতীয় একটা ফ্যাক্টর রয়েছে—এই যেমন, এই বিশ্বাস যে ওষুধটা কাজ করে এবং সেটিই তাদের সারিয়ে তুলেছে।'

'আমার মনে হচ্ছে অভিজ্ঞতাবাদ কী জিনিস সেটি আমি বুঝতে শুরু করেছি।'

'নীতিবিদ্যার ক্ষেত্রে বুদ্ধিবাদী চিন্তার বিরুদ্ধেও বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন হিউম। বুদ্ধিবাদীরা সব সময়ই মনে করে এসেছেন যে ন্যায় আর অন্যায়ের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়ের ক্ষমতা মানুষের প্রজ্ঞার মধ্যেই আছে সহজাতভাবে। সক্রেটিস থেকে লক পর্যন্ত অনেক দার্শনিকের দর্শনের ভেতরেই এই তথাকথিত স্বাভাবিক ন্যায় (natural right)-এর দেখা পেয়েছি আমরা। কিন্তু হিউম বলছেন, আমরা যা বলি আর করি তা প্রজ্ঞা ঠিক করে না।'

'তাহলে কে করে?'

'আমাদের *ভাবাবেগ* (sentiment)। অসহায় কাউকে যদি তুমি সাহায্য করার সিদ্ধান্ত নাও, সেটি তুমি করো তোমার অনুভূতির কারণে, প্রজ্ঞা বা যুক্তির কারণে নয়।'

'আর আমি যদি সাহায্য করার কথা না ভাবি?'

'সেটিও হবে তোমার অনুভূতির কারণে। অসহায় কাউকে সাহায্য না করাটা যৌক্তিকও নয় আবার অযৌক্তিকও নয়। তবে তা নিষ্ঠুর হতে পারে।'

'কিন্তু একটা সীমা তো থাকতে হবে কোথাও। সবাই *জানে* খুন করা খারাপ।'

'হিউমের মত হচ্ছে, অন্য লোকজনের ভালো-মন্দের ব্যাপারে প্রত্যেকটি মানুষেরই একটা সহানুভূতিপূর্ণ মন রয়েছে। অর্থাৎ আমরা সবাই সহানুভূতিশীল, কিন্তু এর সঙ্গে প্রজ্ঞার সম্পর্ক নেই।'

'ঠিক বুঝতে পারছি না একমত হবো কিনা।'

'কাউকে সরিয়ে দেয়াটা সব সময়ই যে খারাপ তা কিন্তু নয়, সোফি। কোনো কিছু অর্জন করার জন্য এটা কিন্তু চমৎকার একটা আইডিয়া।'

'এ্যাই দাঁড়ান, দাঁড়ান! আমি প্রতিবাদ করছি!'

'তা, বেশ তো একজন উটকো, ঝামেলাপূর্ণ লোককে খুন করাটা উচিত হবে না কেন সেটি ব্যাখ্যা করে বোঝাও তো আমাকে।'

'সেই লোকটাও তো বাঁচতে চায়। কাজেই তাকে আপনার মারা উচিত হবে না।'

'সেটি কি যুক্তি হিসেবে ঠিক হলো?'

'আমি জানি না।'

'তুমি যা করেছ তা হচ্ছে একটা *বর্ণনামূলক বাক্য*—'সেই লোকটাও বাঁচতে চায়'—থেকে সিদ্ধান্ত নিয়ে পৌঁছেছ আমরা যাকে *আদর্শমূলক বাক্য* (normative

sentence) বলি সেটিতে : 'কাজেই তাকে আপনার মারা উচিত হবে না'। যুক্তির দিক থেকে এটা নিতান্তই অর্থহীন একটা কথা। কারণ তাহলে তুমি এ-ও বলতে পারো যে, 'অনেক লোকই কর ফাঁকি দেয়, কাজেই আমারও উচিত আমার কর ফাঁকি দেয়া।' হিউম বলছেন, *ইজ* (is) বাক্য থেকে তুমি কখনোই *অট* (ought) বাক্যের সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে পারো না। তারপরেও কিন্তু এটা মাত্রাতিরিক্তভাবে দেখা যায়, বিশেষ করে খবরের কাগজের বিভিন্ন লেখায়, রাজনৈতিক দলের কর্মসূচিতে আর বক্তৃতায়। দু'একটা উদাহরণ চাও?'

'প্লিজ।'

"দিন দিন আরও বেশি মানুষ আকাশপথে ভ্রমণ করতে চাইছে। কাজেই আরও বিমানবন্দর নির্মাণ করা উচিত।' তোমার কি ধারণা সিদ্ধান্তটা সঠিক?'

'মোটেই না। কোনো মানেই হয় না এ-কথার। পরিবেশের কথা ভুললে চলবে না আমাদের। আমার মনে হয়, তার বদলে আরও বেশি করে রেলরোড বানানো উচিত আমাদের।'

'অথবা ওরা বলে, 'নতুন নতুন অয়েলফিল্ডের বৃদ্ধি জনসাধারণের জীবন যাত্রার মান শতকরা দশভাগ বাড়িয়ে দেবে।' কাজেই যত দ্রুত সম্ভব নিত্য নতুন অয়েলফিল্ড তৈরি করা উচিত আমাদের।'

'অবশ্যই না। এবারও পরিবেশের কথা মাথায় রাখতে হবে আমাদের। আর তাছাড়া, নরওয়ের জীবনযাত্রার মান এমনিতেই যথেষ্ট উঁচু।'

'মাঝে মধ্যে বলা হয়, 'সিনেটে এই আইন পাস করা হয়েছে। কাজেই দেশের সব নাগরিকেরই এই আইন মেনে চলা উচিত।' কিন্তু এ-ধরনের গতানুগতিক প্রথা মেনে চলাটা মানুষের গভীরতম বিশ্বাসের বিরুদ্ধে চলে যায় প্রায়ই।'

'হ্যাঁ, বুঝতে পারছি।'

'অর্থাৎ এ-কথা আমরা প্রতিষ্ঠিত করলাম যে আমরা কেমন আচরণ করব সে-ব্যাপারে যুক্তিকে আমরা মাপকাঠি হিসেবে ব্যবহার করতে পারি না। দায়িত্বপূর্ণ আচরণ করা আমাদের যুক্তিকে শক্তিশালী করার কোনো ব্যাপার নয়, বরং অন্যের মঙ্গলের জন্য আমাদের অনুভূতিকে আরও প্রগাঢ় করার বিষয়। হিউম বললেন, 'আমার আঙুলের চুলকানির চেয়ে গোটা দুনিয়ার ধ্বংস চাওয়াটা মোটেই অযৌক্তিক নয়।' '

'এটা কিন্তু রীতিমতো গায়ের লোম খাড়া করে দেবার মতো একটা কথা হলো।'

'ব্যাপারটা আরও লোম-খাড়া করা হবে যদি অন্য দিকে তাকাও। তুমি জানো যে নাৎসিরা লাখ লাখ ইহুদিকে খুন করেছিল। তা, তুমি কী বলবে? নাৎসিদের যুক্তিতে কোনো গণ্ডগোল ছিল, নাকি তাদের ইমোশনাল লাইফে কোনো গোলমাল ছিল?'

'অবশ্যই তাদের আবেগ-অনুভূতিতে কোনো গণ্ডগোল ছিল।'

'তাদের অনেকেই কিন্তু অত্যন্ত পরিষ্কার মাথার লোক ছিল। সবচেয়ে নির্মম সিদ্ধান্তের পেছনে বরফ-শীতল হিসেব নিকেশ খুঁজে পাওয়াটা এমন কোনো বিরল ব্যাপার নয়। যুদ্ধের পর নাৎসিদের অনেকেরই বিচার হয়েছিল, কিন্তু 'অযৌক্তিক' আচরণের জন্য তাদের কাউকেই অভিযুক্ত করা হয়নি। তাদের অভিযুক্ত করা হয়েছিল জঘন্য খুনি হিসেবে। এমনও দেখা যায়, যারা মানসিকভাবে সুস্থ নয় তাদেরকে তাদের

অপরাধ থেকে খালাস দেয়া হয়। আমরা বলি 'তারা তাদের কৃতকর্মের জন্য দায়ী নয়।' নিষ্ঠুর হওয়ার জন্য কখনো কাউকে তার অপরাধ থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়নি।'

'দেয়া উচিতও নয় আমার ধারণা।'

'কিন্তু তাই বলে যত সব উদ্ভট উদ্ভট উদাহরণ নিয়েই থাকতে হবে এমন কোনো মানে নেই। বন্যায় লাখ লাখ মানুষ গৃহহীন হয়ে পড়লে তাদের আমরা সাহায্য করবো কিনা সেটি ঠিক করে দেয় আমাদের অনুভূতি-ই। নিষ্ঠুর হলে আর পুরো ব্যাপারটিই 'শীতল প্রজ্ঞা'-র ওপর ছেড়ে দিলে আমরা হয়ত ভাবতে পারি যে ব্যাপারটা ঘটেছে আসলে যাতে অতিরিক্ত জনসংখ্যার ভারে কম্পমান এই পৃথিবীতে লাখ লাখ লোক মারা যায় সেজন্য।'

'আপনি যে এভাবে চিন্তা করতে পারছেন এ-কথা ভাবতেই পাগল মনে হচ্ছে আমার নিজেকে।'

'খেয়াল করে দেখো, এখানেও তোমার প্রজ্ঞা কিন্তু পাগল হচ্ছে না।'

'ঠিক আছে, বুঝতে পেরেছি।'

বা র্ক লে

ছয়ে

...জ্বলন্ত এক সূর্যের চারপাশে ঘুরতে থাকা একটা গ্রহের মতো...

শহরের দিকে মুখ করা জানলাটার দিকে হেঁটে গেলেন অ্যালবার্টো। তাঁকে অনুসরণ করল সোফি। দু'জনে যখন পুরনো বাড়িগুলোর দিকে তাকিয়ে আছে, এমন সময় বাড়িগুলোর ছাদের ওপর দিয়ে উড়ে এলো ছোট্ট একটা প্লেন। সেটির লেজের সঙ্গে ছোট্ট একটা ব্যানার আটকানো, সোফি অনুমান করল কোনো পণ্য বা স্থানীয় কোনো ঘটনার বিজ্ঞাপন প্রচার করছে ওটা, হয়তো কোনো রক কনসার্ট। কিন্তু সেটি এগিয়ে এসে ঘুরে যেতেই একটা ভিন্ন মেসেজ চোখে পড়ল তার : শুভ জন্মদিন, হিল্ডা!

'অনাহূত,' অ্যালবার্টোর সংক্ষিপ্ত মন্তব্য।

'দক্ষিণের পাহাড়গুলোর দিক থেকে আসা ভারি মেঘগুলো শহরের ওপর জমা হতে শুরু করেছে। সেই ধূসরতায় অদৃশ্য হয়ে গেল প্লেনটা।

'ঝড় হতে পারে,' অ্যালবার্টো বললেন।

'তাহলে আমি বাসে করে বাড়ি যাবো।'

'আমি ভাবছি, এর পেছনেও মেজর আছে কিনা।'

'সে নিশ্চয়ই সর্বশক্তিমান ঈশ্বর নয়, নাকি?'

অ্যালবার্টো কোনো জবাব দিলেন না। ঘর পেরিয়ে হেঁটে গিয়ে আবার বসে পড়লেন কফি টেবিলটার পাশে।

'বার্কলের কথা আলোচনা করতে হবে আমাদের,' খানিক পর বললেন তিনি।

এরই মধ্যে সোফি আবার তার নিজের জায়গায় গিয়ে বসেছে। দাঁত দিয়ে নখ কাটছে সে।

'*জর্জ বার্কলে* (George Berkeley) ছিলেন একজন আইরিশ বিশপ। জন্ম ১৬৮৫[২২], মৃত্যু ১৭৫৩।' শুরু করলেন অ্যালবার্টো। তারপর দীর্ঘ নীরবতা।

'বার্কলে ছিলেন আইরিশ বিশপ...' সোফি খেই ধরিয়ে দিল।

'কিন্তু তিনি দার্শনিকও ছিলেন...'

---

২২. ব্যাপারটি কাকতালীয়, এবং সেটার উল্লেখ দর্শনের ইতিহাস গ্রন্থে প্রায় ষোলআনা অপ্রাসঙ্গিক হলেও পাঠকের কাছে ক্ষমাপ্রার্থনাপূর্বক উল্লেখ করছি যে পাশ্চাত্য ধ্রুপদী সঙ্গীতের দুই অমর সুরস্রষ্টা য়োহান সেবাস্টিয়ান বাখ এবং জর্জ ফ্রেডরিক হ্যান্ডেল-এর জন্ম-ও একই বছরে— অনুবাদক।

'আচ্ছা?

'তাঁর কাছে মনে হয়েছিল তৎকালীন দর্শন আর বিজ্ঞান খ্রিস্টীয় জীবন দর্শনের প্রতি হুমকি স্বরূপ। বিশেষ করে সর্বব্যাপী বস্তুবাদ স্রষ্টা এবং সমগ্র প্রকৃতির রক্ষাকর্তা হিসেবে ঈশ্বরের ওপর খ্রিস্টীয় বিশ্বাসের প্রতি হুমকি স্বরূপ।'

'তাই?'

'কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি-ই ছিলেন অভিজ্ঞতাবাদীদের মধ্যে সবচেয়ে কনসিস্টেন্ট।'

'তিনি কি এ-কথা বিশ্বাস করতেন যে আমরা আমাদের ইন্দ্রিয়গুলো দিয়ে জগতের যা কিছু প্রত্যক্ষ করি তারচেয়ে বেশি কিছু এই জগৎ সম্পর্কে জানতে পারবো না?'

'শুধু তাই নয়, বার্কলে দাবি করেছিলেন যে জাগতিক জিনিসগুলো আসলে আমরা সেগুলোকে যেভাবে প্রত্যক্ষ করি সে-রকমই, তবে তারা 'জিনিস' বা 'বস্তু' নয়।'

'কথাটা আপনাকে ব্যাখ্যা করতে হবে।'

'তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে যে লক এই বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন যে বস্তুর 'গৌণ গুণ' সম্পর্কে আমরা কোনো কিছু সত্য বলে ঘোষণা করতে পারি না। আমরা বলতে পারি না আপেল হচ্ছে সবুজ আর টক। আমরা শুধু এটুকু বলতে পারি যে জিনিসটাকে আমরা এভাবে প্রত্যক্ষ করি। কিন্তু লক এ-ও বলেছিলেন যে ঘনত্ব, অভিকর্ষ আর ওজনের মতো 'মুখ্য গুণগুলো' আসলে আমাদের চারপাশের বাহ্যিক বাস্তবতার অংশ। প্রকৃতপক্ষে বাহ্যিক বাস্তবতার একটি বস্তুগত সারবস্তু আছে।'

'আমার মনে আছে, তাছাড়া আমি মনেও করি যে বস্তু সর্ম্পকে লকের এই বিভাজনটা গুরুত্বপূর্ণ।'

'তা ঠিক, সোফি, কিন্তু সেটিই শেষ কথা নয়।'

'বলে যান।'

'ঠিক দেকার্ত আর স্পিনোজার মতো, লক বিশ্বাস করতেন যে বস্তুগত জগৎ একটা বাস্তবতা।'

'আচ্ছা?'

'ঠিক এই ব্যাপারেই প্রশ্ন তুললেন বার্কলে। আর তিনি সেটি করলেন অভিজ্ঞতাবাদের যুক্তি প্রয়োগ করে। তিনি বললেন, কেবল সেইসব জিনিসেরই অস্তিত্ব আছে যে-সব আমরা প্রত্যক্ষ করি। তবে আমরা 'উপাদান' বা 'বস্তু' প্রত্যক্ষ করি না। স্পর্শযোগ্য জিনিস হিসেবে আমরা কোনো বস্তুকে প্রত্যক্ষ করি না। আমরা যে-সব জিনিস প্রত্যক্ষ করি সেগুলোর নিজস্ব ভিত্তিস্বরূপ 'সারবস্তু' আছে বলে ধরে নেয়াটা হুট করে সিদ্ধান্তে পৌছানোরই নামান্তর। এ-ধরনের একটা দাবি করার মতো কোনো ধরনের অভিজ্ঞতা আমাদের একেবারেই নেই।'

'কী গাধার মতো কথা! এই দেখুন!' বলে সোফি তার হাতের মুষ্টিটা দিয়ে সজোরে আঘাত করল টেবিলের ওপর।[২৩] উফ্‌ফ্‌ বলে চেঁচিয়ে উঠল সে। 'এতেই কি

---

২৩. অনেকটা একইভাবে বার্কলের তত্ত্বের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছিলেন স্যামুয়েল জনসন। একটি বড় পাথরের টুকরোর গায়ে সজোরে পদাঘাত করে তিনি উঠেছিলেন, 'I refute him thus.'—অনুবাদক

প্রমাণ হয় না যে এই টেবিলটা একটা সত্যিকারের টেবিল, উপাদান আর বস্তু দুটো দিয়েই এটা তৈরি?'

'তা তুমি কী অনুভব করলে?'

'শক্ত একটা কিছু।'

'শক্ত একটা কিছুর সংবেদন হলো তোমার, কিন্তু টেবিলের আসল বস্তুটিকে তুমি অনুভব করনি। একইভাবে, তুমি স্বপ্নও দেখতে পারো যে শক্ত একটা কিছুকে আঘাত করছো, কিন্তু স্বপ্নে শক্ত কিছু থাকে না, নাকি থাকে?'

'না, স্বপ্নে থাকে না।'

'অন্য দিকে আবার একটা লোককে এমনভাবে সম্মোহিত করা যায় যাতে সে গরম, ঠাণ্ডা, আলিঙ্গন কিংবা একটা ঘুষি-র 'অনুভূতি' পাবে।'

'কিন্তু টেবিলটা যদি শক্ত না-ই হবে তাহলে আমি সে-রকম অনুভব করলাম কেন?'

'বার্কলে একটা 'চিদাত্মা'-য় (spirit) বিশ্বাস করতেন। তিনি মনে করতেন, আমাদের সব ভাবেরই (idea) আমাদের চেতনা বহির্ভূত কোনো কারণ রয়েছে, কিন্তু এই কারণ বস্তুগত নয়, আধ্যাত্মিক।'

সোফি আবার নখ কামড়াতে শুরু করল।

অ্যালবার্টো বলে চললেন 'বার্কলের মত অনুযায়ী, আমার নিজের আত্মা আমার নিজের ভাবের কারণ হতে পারে-আমি যখন স্বপ্ন দেখি সেই সময়ের মতো-কিন্তু অন্য আরেকটি ইচ্ছা বা চিদাত্মা-ই কেবল সেই সব ভাবের কারণ হতে পারে যা দিয়ে এই 'জড়' জগৎ তৈরি। তাঁর মতে, সবকিছুরই কারণ সেই চিদাত্মা যা 'প্রতিটি জিনিসের ভেতরকার প্রতিটি জিনিসের' কারণ আর যার মধ্যে 'সব কিছু থাকে।'

'কোন 'চিদাত্মা'-র কথা বলেছিলেন তিনি?'

'নিঃসন্দেহে, বার্কলে ঈশ্বরের কথাই চিন্তা করছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'আমরা এমনকি এ-ও দাবি করতে পারি যে মানুষের অস্তিত্ব যতটা পরিষ্কারভাবে প্রত্যক্ষ করা যায় ঈশ্বরের অস্তিত্ব তারচেয়েও অনেক বেশি স্পষ্টভাবে প্রত্যক্ষ করা যায়।'

'আমরা যে আছি বা আমাদের অস্তিত্ব কি তাহলে ততটা নিশ্চিত নয়?'

'উত্তরটা হ্যাঁ আর না দুটোই। বার্কলে বলছেন, যা কিছুই আমরা দেখি বা অনুভব করি তার সবই 'ঈশ্বরের শক্তির একটা প্রকাশ।' কারণ, ঈশ্বর 'আমাদের চেতনায় খুবই প্রবলভাবে উপস্থিত আর প্রতিনিয়ত আমরা যে অসংখ্য ধারণা আর প্রত্যক্ষণের মুখোমুখি হচ্ছি সেগুলো সে-কারণেই অর্থাৎ আমাদের চেতনায় ঈশ্বরের প্রবল উপস্থিতির কারণেই সম্ভব হচ্ছে।' আমাদের চারপাশের সমস্ত জগৎ আর আমাদের সমস্ত জীবন রয়েছে ঈশ্বরের ভেতরেই। যা কিছু অস্তিত্বশীল তার একমাত্র কারণ তিনি-ই। আমরা রয়েছি শুধু ঈশ্বরের মনের ভেতর।'

'কম করে বললেও বলতে হয়, রীতিমতো তাজ্জব বনে গেছি আমি।'

'কাজেই, 'টু বি অর নট টু বি'-তেই প্রশ্নের শেষ নয়। প্রশ্ন হচ্ছে, আমরা কে। আমরা কি আসলেই রক্ত-মাংসের মানুষ-নাকি আমাদের চারপাশ ঘিরে আছে মন?'

সোফি দাঁত দিয়ে নখ কামড়ে চলেছে।

অ্যালবার্টো বলে চললেন 'বার্কলে কেবল বস্তুগত বাস্তবতা নিয়েই প্রশ্ন তোলেননি। 'সময়' আর 'স্থান' (space)-এর পরম বা স্বাধীন অস্তিত্ব রয়েছে কিনা সে-প্রশ্নও তুলেছেন তিনি। সময় আর স্থান সম্পর্কে আমাদের নিজেদের প্রত্যক্ষণও স্রেফ মনের তৈরি করা একটা মিথ্যে ব্যাপার হতে পারে। আমাদের এক বা দুই হপ্তা যে ঈশ্বরেরও এক বা দুই হপ্তা হবে এমন না-ও হতে পারে...'

'আপনি বলেছেন, যে-চিদাত্মায় সবকিছুর অস্তিত্ব নিহিত সেটিই হচ্ছে, বার্কলের মতে, খ্রিস্টীয় ঈশ্বর।'

'হ্যাঁ, হয়ত, বলেছি। কিন্তু আমাদের কাছে...'

'আমাদের?'

'আমাদের কাছে—তোমার আর আমার কাছে—এই 'ইচ্ছা বা চিদাত্মা' যা কিনা 'প্রতিটি জিনিসের মধ্যকার প্রতিটি জিনিসের কারণ' তা হিল্ডার বাবাও হতে পারে।'

অবিশ্বাসে চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল সোফির। কিন্তু তার পরেও একই সঙ্গে একটা উপলব্ধি-ও জেগে উঠতে থাকল তার মনের মধ্যে।

'আপনার কি তাই ধারণা?'

'আর কোনো সম্ভাবনা তো দেখছি না আমি। যে-সব ঘটনার মুখোমুখি হয়েছি আমরা তার প্রতিটার একমাত্র সম্ভাব্য ব্যাখ্যা সম্ভবত ওটাই। এখানে ওখানে উদয় হওয়া সেইসব পোস্টকার্ড আর সাইন...হার্মেসের কথা বলতে শুরু করা...আমার কথায় অনিচ্ছাকৃত ভুল।'

'আমি '

'ভেবে দেখো হিল্ডা, তোমাকে সোফি বলে ডেকে ওঠা! আমি সব সময়ই জানতাম তোমার নাম সোফি নয়।'

'কী বলছেন এ-সব? এবার কিন্তু আপনি আসলেই সব গুলিয়ে ফেলছেন।'

'ঠিকই বলেছো, মনটা আমার ঘুরপাক খেয়ে চলেছে। জ্বলন্ত এক সূর্যের চারপাশে ঘুরতে থাকা একটা গ্রহের মতো।'

'আর সেই সূর্যটা নিশ্চয়ই হিল্ডার বাবা?'

'তা বলতে পারো।'

'আপনি কি বলতে চাইছেন আমাদের জন্য তিনি একরকম ঈশ্বরের মতো।'

'একেবারে খোলাখুলিভাবে বললে বলতে হয় হ্যাঁ। নিজের জন্য লজ্জা হওয়া উচিত লোকটার।'

'আর হিল্ডা, সে কী?'

'হিল্ডা একটা পরী।'

'পরী?'

'হিল্ডা-ই হচ্ছে সে যার মুখাপেক্ষি হয়ে থাকে এই চিদাত্মা।'

'আপনি কি বলছেন যে অ্যালবার্টো ন্যাগ হিল্ডাকে আমাদের কথা বলে?'

'অথবা লেখে আমাদের কথা। আমাদের বাস্তবতা যে কী দিয়ে তৈরি সেটি যে আমরা প্রত্যক্ষ করতে পারছি না সেটুকু আমাদের জানা হয়ে গেছে। আমাদের বাহ্যিক বাস্তবতা কি শব্দ-তরঙ্গ নাকি কাগজ আর লেখা দিয়ে তৈরি সেটিও আমরা জানতে

পারছি না। বার্কলের কথা অনুযায়ী আমরা কেবল এটুকুই জানতে পারি যে আমরা সবাই-ই হচ্ছি চিদাত্মা।'

'আর হিল্ডা হচ্ছে পরী...'

'হিল্ডা হচ্ছে পরী। হ্যাঁ, ঠিক বলেছো। সেটিই তাহলে শেষ কথা হোক। হিল্ডা, শুভ জন্মদিন।'

হঠাৎ নীলচে একটা আলোয় ভরে উঠল কামরাটা। এর কয়েক সেকেন্ড পরেই বজ্রের আওয়াজে কেঁপে উঠল গোটা বাড়িটা।

'আমাকে যেতে হচ্ছে,' বলে উঠল সোফি। আসন ছেড়ে উঠে সামনের দিকে দৌড়ে গেল সে। যখন সে বেরিয়ে এসেছে, হলওয়েতে হার্মেস তার নিদ্রা ছেড়ে জেগে উঠল। সোফির মনে হলো হার্মেস যেন বলে উঠল, 'দেখা হবে, হিল্ডা।'

দৌড়ে সিঁড়ি বেয়ে নামল হিল্ডা, ছুটে বেরিয়ে এলো রাস্তায়। কেউ নেই সেখানে। আর তখনই বৃষ্টি নামল মুষলধারে।

একটা দুটো গাড়ি সেই প্রবল বৃষ্টির ভেতর দিয়েই ছুটে গেল, কিন্তু কোনো বাসের টিকিটিরও দেখা নেই। মেইন স্কোয়্যার পার হয়ে শহরের ভেতর দিয়ে ছুটতে লাগল সোফি। দৌড়ানোর সময় একটা চিন্তাই কেবল খেলে বেড়াতে লাগল তার মধ্যে 'কাল আমার *জন্মদিন*!' কিন্তু পঞ্চদশ জন্মদিনের আগের দিনই যদি কেউ উপলব্ধি করে যে জীবনটা নেহাতই একটা স্বপ্ন তাহলে সেটি কি একটু বেশি তিক্ত হয়ে যায় না? ব্যাপারটা অনেকটা ১০ লাখ টাকা জিতে সেটি পাওয়ার ঠিক আগ মুহূর্তে ঘুম ভেঙে যাওয়ার মতো।'

প্যাচপ্যাচে ভেজা খেলার মাঠটি পেরিয়ে এলো সোফি। কয়েক মিনিট পরেই সে দেখল কে একজন দৌড়ে আসছে তার দিকে। দেখা গেল, তিনি আর কেউ নন, তার মা। বিদ্যুচ্চমকের ক্রুদ্ধ বর্শায় আকাশ বারবার চিরে ফালা ফালা হয়ে যাচ্ছে।

দু'জনে পরস্পরের কাছে পৌঁছানোর পর সোফির মা হাত দিয়ে বেড় দিয়ে ধরলেন তাকে।

'কী ঘটছে রে এ-সব আমাদের জীবনে, মা আমার?'

'আমি জানি না,' ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল সোফি।'

'ব্যাপারটা যেন একটা দুঃস্বপ্ন।'

বি য়া র্ক লে

চার

...এক জিপসি রমণীর কাছ থেকে দাদীর মায়ের কেনা একটা পুরনো জাদুর আয়না...

লিলেস্যান্ডের বাইরে বুড়ো ক্যাপ্টেনের বাড়ির চিলেকোঠায় ঘুম থেকে জেগে উঠল হিল্ডা মোলার ন্যাগ। ঘড়ির দিকে তাকাল সে। মাত্র ছ'টা বাজে, কিন্তু এরই মধ্যে আলোয় ভরে গেছে চারদিক। ভোরের সূর্যের উজ্জ্বল আলোয় ফরসা হয়ে গেছে ঘরটা।

বিছানা থেকে নেমে জানলার পাশে গিয়ে দাঁড়াল সে। মাঝপথে ডেস্কটার পাশ থেকে ক্যালেন্ডারের একটা পাতা ছিঁড়ল। বৃহস্পতিবার ১৪ জুন, ১৯৯০। পাতাটা দলা-মোচড়া করে ছুঁড়ে দিল বাজে কাগজের ঝুড়িতে।

ক্যালেন্ডারটা এখন ঝকমক করে তার দিকে তাকিয়ে জানাচ্ছে আজ শুক্রবার, ১৫ জুন, ১৯৯০। সেই কবে জানুয়ারিতে এই পৃষ্ঠাটার ওপর সে লিখে রেখেছিল 'পঞ্চদশ জন্মদিন'। পনেরো তারিখে পনেরোয় পা দেয়াটায় খানিকটা বাড়তি বিশেষত্ব আছে বলে বোধ হলো তার। আর কখনো এমনটা হবে না।

পনেরো! আজই কি তার প্রাপ্তবয়স্ক জীবনের প্রথম দিন নয়? বিছানায় তখুনি আর ফিরে যেতে পারল না সে। তাছাড়া, গরমের ছুটির আগে আজই শেষ স্কুল। ছাত্র-ছাত্রীদের একটার সময় গির্জায় হাজির হতে হবে শুধু। তারচেয়ে বড় কথা, এক হপ্তার মধ্যেই লেবানন থেকে ফিরছেন বাবা। তিনি কথা দিয়েছেন মিডসামার ঈভ্-এর জন্য বাড়ি আসবেন।

জানলার পাশে দাঁড়িয়ে বাগানের ওপর দিয়ে দৃষ্টি ছড়িয়ে দিল সে ছোট্ট লাল বোটহাউসটার পেছনে নিচের ডকটার দিকে। গরমের সময় যে-মোটরবোটটা বের করা হয় সেটি এখনো বের করা হয়নি, কিন্তু পুরনো দাঁড়টানা নৌকোটা ডকে বাঁধা আছে। গতকাল রাতের প্রবল বৃষ্টির পর এখন হিল্ডাকে ওটার পানি সেচে ফেলবার কথা মনে রাখতে হবে।

ছোট্ট একটা উপসাগরের মতো জায়গাটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তার মনে পড়ে গেল তার বয়স যখন ছ'বছর তখন সে একবার নৌকোটায় চড়ে বসে একা একাই বৈঠা চালিয়ে চলে গিয়েছিল ওখানটায়। হঠাৎ নৌকোটা উল্টে যায়, তখন সে অনেক কষ্টে সাঁতরে তীরে উঠে আসে। ভেজা চুপচুপে অবস্থায় ঘন ঝোপের বেড়া ঠেলে হেঁটে এসেছিল সে। বাগানে পৌঁছে সে যখন বাড়ির দিকে তাকিয়ে ছিল তখন

তার মা দৌড়ে এসেছিলেন তার দিকে। পরিত্যক্ত অবস্থায় নৌকো আর দুটো বৈঠাই ভাসছিল তখন সেই উপসাগরটায়। এখনো সে মাঝে মাঝে সেই নৌকোটার স্বপ্ন দেখে, নিজে নিজেই ভেসে বেড়াচ্ছে সেটি পরিত্যক্ত অবস্থায়। বিব্রতকর একটা অভিজ্ঞতা ছিল সেটি। বাগানটায় গাছ-গাছালির খুব যে একটা বাড়-বাড়ন্ত তা নয়, তাছাড়া ভালো করে দেখাশোনাও করা হয় না সেটির। তবে বাগানটি বিশাল আর সেটি হিল্ডা-র। প্রবীণ একটা আপেল গাছ আর কিছু কার্যত নিষ্ফলা ফলের গাছের ঝোপ কোনোমতে টিকে গেছে শীতের প্রবল ঝড়ের হাত থেকে। গ্রানিট পাথরগুলো আর ঝোপের মধ্যখানে দাঁড়িয়ে আছে পুরনো গ্লাইডারটা। ভোরের উজ্জ্বল আলোয় বেজায় ম্লান আর অসহায় লাগছে সেটিকে। আরও বেশি লাগছে এই কারণে যে ওটার গদি খুলে ফেলা হয়েছে। সম্ভবত মা গতকাল শেষরাতে তাড়াহুড়ো করে বেরিয়ে এসে ওগুলোকে বৃষ্টির হাত থেকে রক্ষা করেছেন।

তাছাড়া আছে বার্চ গাছ—*bjorketreer*—বিশাল বাগানটার চারপাশ ঘিরে। তাতে সবচেয়ে খারাপ ঝড়-ঝাপটার হাত থেকে অন্তত খানিকটা সুরক্ষা পায় বাগানটা। এই গাছগুলোর কারণেই একশো বছরেরও বেশি আগে বিয়ার্কলে নাম রাখা হয়েছিল বাড়িটার।

নতুন শতাব্দী শুরুর কয়েক বছর আগে হিল্ডার পিতামহের পিতা তৈরি করেছিলেন বাড়িটা। শেষ দিককার লম্বা পালতোলা জাহাজগুলোর একটার ক্যাপ্টেন ছিলেন তিনি। অনেকেই তাই এটাকে ক্যাপ্টেনের বাড়ি বলতে শুরু করে।

গতকাল সন্ধ্যার শেষ দিকে হঠাৎ করে শুরু হওয়া প্রবল বৃষ্টির চিহ্ন আজ সকালেও বাগানে দিব্যি দেখা যাচ্ছে। বজ্রপাতের আওয়াজে মাঝে মাঝেই ঘুম ভেঙে জেগে উঠছিল হিল্ডা। কিন্তু আজ আকাশে মেঘের চিহ্নটুকু নেই।

এমন একটা গ্রীষ্মকালীন ঝড়ের পর সবকিছু একেবারে নতুনের মতো লাগছে। কয়েক হপ্তা ধরে আবহাওয়াটা বেশ গরম আর শুকনো ছিল, বার্চ গাছের পাতার ডগা হলুদ হতে শুরু করেছিল। এখন মনে হচ্ছে যেন গোটা জগৎটাই নতুন করে ধোয়া হয়েছে। মনে হচ্ছে, এমনকি তার শৈশবও যেন ধুয়ে মুছে নিয়ে গেছে ঝড়টা।

'বসন্তের মুকুল যখন ফোটে, সত্যি, ব্যথা আছে তাতে...' এক সুইডিশ কবি এরকম একটা কথা বলেছিলেন না? নাকি মহিলা ফিনিশ?

দাদি-র পুরনো ড্রেসারটার ওপর ঝুলিয়ে রাখা ঝুলে থাকা ভারি, পেতলের আয়নাটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল হিল্ডা।

সে কি সুন্দরী? আর যাই হোক, কুৎসিত নয় সে। সম্ভবত সে মাঝামাঝি কিছু একটা...

লম্বা উজ্জ্বলবর্ণ চুল তার। হিল্ডা সব সময়ই চেয়েছে তার চুল যেন আরও খানিকটা উজ্জ্বল বা আরও একটু কালো হয়। এই মাঝামাঝি রঙটা কোনো কাজের না। অন্যদিকে ভালো যে দিক তা হলো তার চুলের এই নরম-সরম কোঁকড়া ব্যাপারটা। তার বন্ধুদের অনেকেই তাদের চুল একটু কোঁকড়া করার জন্য কী প্রাণপাত চেষ্টাটাই না করে, কিন্তু হিল্ডার চুল প্রকৃতিগতভাবেই কোঁকড়া। আরেকটা ভালো দিক হচ্ছে, তার মনে হলো, তার গভীর সবুজ চোখ দুটো। হিল্ডার চাচা-চাচিরা তাকে দেখার জন্য

ঝুঁকে পড়ে প্রায়ই বলতেন, 'চোখ দুটো কি আসলেই সবুজ?'

সোফি ভাবতে লাগল যে-ছবিটা সে খুঁটিয়ে দেখছে সেটি কি কোনো বালিকার না কোনো তরুণী রমণীর। তার মনে হলো কারোরই না। দেহটা হয়ত বেশ নারীসুলভ। কিন্তু মুখটা তাকে মনে করিয়ে দিল একটা কাঁচা আপেলের কথা।

পুরনো এই আয়নাটায় এমন একটা কিছু আছে যা তাকে তার বাবার কথা মনে করিয়ে দেয়। একসময় ওটা স্টুডিওতে ঝোলানো থাকত। বোটহাউসের ওপরে স্টুডিওটা ছিল তার বাবার একাধারে লাইব্রেরি, লেখাজোকা বিষয়ক ওয়ার্কশপ আর বিশ্রামের স্থান। অ্যালবার্ট—বাবা বাড়ি থাকলে তাঁকে হিল্ডা এই নামে ডাকে—সব সময়ই চেয়েছেন গুরুত্বপূর্ণ কিছু একটা লিখতে। একবার তিনি একটা উপন্যাস লেখার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু সেটি আর শেষ করা হয়ে ওঠেনি। মাঝে মধ্যে একটা জাতীয় সাময়িকীতে তার কিছু কবিতা আর দ্বীপপুঞ্জটার কিছু স্কেচ ছাপা হয়। ওগুলো ছাপা হলে প্রতিবারই খুব গর্ব হয় হিল্ডার। অ্যালবার্টো ন্যাগ। লিলেস্যান্ড ভাষায় এর কী যেন একটা অর্থ আছে। তার দাদার বাবার নামও ছিল অ্যালবার্ট।

আয়নাটা। বেশ কয়েক বছর আগে তার বাবা একবার এই নিয়ে ঠাট্টা করেছিলেন যে পেতলের এই আয়নাটা ছাড়া অন্য কোনো আয়নার সামনে কেউ নিজের প্রতিবিম্বটাকে একই সঙ্গে দুই চোখে চোখ টিপতে পারে না। এটা একটা ব্যতিক্রম কারণ এটা এক জিপসি রমণীর কাছ থেকে দাদির মায়ের কেনা একটা জাদুর আয়না, তার বিয়ের ঠিক আগে কিনেছিলেন তিনি ওটা।

বহুদিন চেষ্টা করেছে হিল্ডা, কিন্তু দুই চোখ দিয়ে নিজেকে চোখ টেপার ব্যাপারটা যেন নিজের ছায়ার কাছ থেকে পালাবার মতোই অসম্ভব। শেষ অব্দি, পারিবারিক পুরনো তাঁতটা তাকে দেয়া হয়েছিল রাখার জন্য। এই এতো বছর ধরে মাঝে মাঝেই সে চেষ্টা করে আসছে অসম্ভব ওই কৌশলটা শেখার।

এটা আশ্চর্যের কিছু নয় যে আজ সে একটু চিন্তিত। আর এটাতেও অস্বাভাবিক কিছু নেই যে সে আজ নিজের মধ্যেই মগ্ন। পনেরো বছর বয়স...

হঠাৎ বিছানার পাশে রাখা টেবিলটার দিকে তাকাল সে। বড়সড় একটা প্যাকেট দেখা যাচ্ছে সেখানে। সুন্দর নীল একটা মোড়ক দিয়ে প্যাকেটটা ঢাকা, লাল রেশমি ফিতে দিয়ে বাঁধা। নিশ্চয়ই জন্মদিনের উপহার ওটা।

এটাই কি তাহলে *সেই* উপহারটা? বাবার তরফ থেকে সেই বিশাল বড় উপহার যা নিয়ে এতো গোপনীয়তা? লেবানন থেকে পাঠানো তাঁর কার্ডগুলোতে এ-ব্যাপারে কত রহস্যময় ইঙ্গিতই না দিয়েছেন তিনি। কিন্তু 'নিজের ওপর কড়া সেন্সরশীপ আরোপ করেছিলেন তিনি।'

তিনি লিখেছিলেন উপহারটা এমন যা 'দিনে দিনে আরও বড় হয়ে ওঠে।' এরপর তিনি সেই মেয়েটার কথা লিখেছিলেন যার সঙ্গে শিগ্‌গিরই দেখা হবে হিল্ডার। আরও লিখেছিলেন যে তিনি হিল্ডাকে পাঠানো সব কার্ডের কপি পাঠিয়েছেন সেই মেয়েটাকে। রহস্যটার জট খুলতে কিছু সূত্রের জন্য বেশ কয়েকবার মাকেও চেপে ধরেছিল সে, কিন্তু তার মা-ও কিছুই জানতেন না এ ব্যাপারে।

সবচেয়ে খাপছাড়া সূত্রটা ছিল এই যে, 'উপহারটা অন্য লোকজনের সঙ্গে ভাগ

করে নেয়া যাবে।' খামোখাই কি তিনি জাতিসংঘে চাকরি করছেন! তার বাবার মাথায় যদি একটা পোকা-ও থেকে থাকে তার মাথায় আসলে অনেক পোকা—তাহলে সেটি হচ্ছে জাতিসংঘ কাজ করবে একটা বিশ্ব সরকার হিসেবে। তাঁর কার্ডে তিনি একবার এই ইচ্ছে প্রকাশ করেছিলেন যে জাতিসংঘ যেন একদিন সত্যি সত্যিই গোটা মানবজাতিকে ঐক্যবদ্ধ করতে পারে।

তার মা প্যাস্ট্রি আর নরওয়ের একটা পতাকা নিয়ে ওপরে উঠে এসে তার উদ্দেশে 'হ্যাপি বার্থ ডে টু ইয়ু' গানটা গাওয়ার আগে প্যাকেটটা খোলা কি উচিত হবে? নিশ্চয়ই ঠিক সেজন্যই রাখা হয়েছে ওটা?

ধীর পায়ে কামরাটা পেরিয়ে হেঁটে গিয়ে প্যাকেটটা তুলল সে। বেশ ভারি তো! ট্যাগটা খুঁজে পেল সে হিল্ডার পঞ্চদশ জন্মদিন উপলক্ষে, বাবা।

বিছানায় বসে সাবধানে খুলে ফেলল সে লাল রেশমি ফিতাটা। তারপর খুলল নীল মোড়কটা।

বিশাল একটা রিং বাইন্ডার।

এটাই কি তার উপহার? এটাই কি পঞ্চদশ-জন্মদিনের সেই উপহার যেটা নিয়ে এতো ব্যাপার হয়ে গেল? যে-উপহার দিন দিন বড় হয় আর লোকজনের সঙ্গে ভাগ করে নেয়া যায়?

চট করে নজর বুলাতে দেখা গেল রিং বাইন্ডারটা টাইপ করা পৃষ্ঠায় ভর্তি। হিল্ডা চিনতে পারল, লেখাগুলো তার বাবার টাইপরাইটারেরই, যেটা তিনি সঙ্গে করে লেবানন নিয়ে গেছেন।

তিনি কি তার জন্য পুরো একটা বই লিখেছেন তাহলে?

প্রথম পৃষ্ঠায় বড় বড় করে হাতে লেখা নামটা, সোফির জগৎ। সেই পৃষ্ঠারই বেশ খানিকটা নিচে একটা কবিতার দুটো লাইন টাইপ করা

মাটির কাছে সূর্যের আলো যেমন,
সত্যিকারের আলোকসম্পাত-ও মানুষের কাছে তেমন।
—এন. এফ. এস. গ্রুন্ডভিগ

পরের পৃষ্ঠায়, প্রথম অধ্যায়ের শুরুতে চলে এলো হিল্ডা। অধ্যায়টার নাম দেয়া হয়েছে 'নন্দনকানন'। বিছানায় উঠে আরাম করে বসল হিল্ডা, তারপর রিং বাইন্ডারকে হাঁটুর ওপর রেখে শুরু করল পড়তে।

স্কুল থেকে বাসায় ফিরছে সোফি অ্যামুন্ডসেন। প্রথমে, খানিকটা পথ, জোয়ানার সঙ্গে হাঁটছিল সে। রোবট নিয়ে কথা বলছিল ওরা। জোয়ানার ধারণা, মানব-মস্তিষ্ক উন্নত একটা কম্পিউটারের মতো। সোফি ঠিক সায় দিতে পারছিল না ওর কথায়। মানুষ নিশ্চয়ই স্রেফ টুকরো হার্ডওয়্যার নয়?

সবকিছু ভুলে পড়ে চলল হিল্ডা, সে এমনকি এ কথাও ভুলে গেল যে আজ তার

জন্মদিন। পড়ার ফাঁকে ছোট ছোট দু'একটা চিন্তা ঢুকে পড়তে থাকল লাইনগুলোর মধ্যে বাবা কি একটা বই লিখে ফেলেছে? শেষ পর্যন্ত কি বাবা সেই গুরুত্বপূর্ণ উপন্যাসটা লেবাননে বসে শুরু করে শেষও করে ফেলেছে? বাবা প্রায়ই অভিযোগ করত দুনিয়ার ওই প্রান্তে সময় যেন ফুরোতেই চায় না।

সোফির বাবাও বাড়ি থেকে অনেক দূরে থাকেন। সম্ভবত সোফিই সেই মেয়ে যার সঙ্গে ধীরে ধীরে পরিচয় হবে তার...

একদিন যে সে মারা যাবে এই বিষয়ে মনের মধ্যে একটা তীব্র অনুভূতি সৃষ্টি করার মাধ্যমেই কেবল সে উপলব্ধি করতে পারল বেঁচে থাকাটা কী অসাধারণ রকমের একটা ব্যাপার।...এই পৃথিবী কোথা থেকে এলো?... কোনো একটা পর্যায়ে কোনো একটা কিছু নিশ্চয়ই শূন্য থেকে সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু সেটি কি সম্ভব? সেটি কি ওই ব্যাপারটির মতোই অসম্ভব নয় যে আগাগোড়াই পৃথিবীর অস্তিত্ব ছিল?

পড়তেই থাকল সোফি। লেবানন থেকে সোফি অ্যামুন্ডসেন একটি কার্ড পেয়েছে পড়ে হতবাক হয়ে গেল সে: 'হিল্ডা মোলার ন্যাগ। প্রযত্নে, সোফি অ্যামুন্ডসেন, ৩ ক্লোভার ক্লোজ।...'

প্রিয় হিল্ডা, শুভ ১৫শ জন্মদিন। আশা করি তুই বুঝতে পারবি আমি তোকে এমন একটা উপহার দিতে চাই যা তোকে বড় হয়ে উঠতে সাহায্য করবে। সোফির প্রযত্নে কার্ডটা পাঠানোর জন্য দুঃখিত। কিন্তু এটাই ছিল সবচেয়ে সহজ পথ। বাবার শুভেচ্ছা রইল।

জোকার! হিল্ডা জানে তার বাবা বরাবরই একটু চালাক-চতুর, কিন্তু আজকে তিনি সত্যিই একেবারে অবাক করে দিয়েছেন তাকে। কার্ডটা প্যাকেটের সঙ্গে জুড়ে দেবার বদলে তিনি সেটি বইটিতে লিখে দিয়েছেন।

জন্মদিনের একটা কার্ড একজন বাবা সোফির নামে পাঠাবেন কেন, যখন সেটি নিশ্চিতভাবেই অন্য জায়গায় যাওয়ার কথা? এ আবার কেমনতর বাবা যিনি তার নিজের মেয়েকে ধোঁকা দেন তার জন্মদিনের কার্ডটা ইচ্ছে করে ভুল ঠিকানায় পাঠিয়ে দিয়ে? এটা কী করে সবচেয়ে সহজ পথ হয়? আর সবচেয়ে বড় কথা, সে কী করে খুঁজে পাবে হিল্ডা নামের এই মেয়েটাকে?

তাইতো, কী করে পাবে?

কয়েকটা পাতা উল্টে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ পড়তে শুরু করল সে। 'টপ হ্যাট'। শিগগিরই সে সোফিকে নিয়ে এক রহস্যময় লোকের লেখা লম্বা চিঠিটাতে চলে এলো।

> আমরা কেন পৃথিবীতে রয়েছি তা জানার ব্যাপারে উৎসাহী হওয়াটা ডাকটিকিট সংগ্রহের মতো কোনো 'খেয়ালি' বিষয় নয়। যারা এ-প্রশ্ন করছেন তাঁরা এমন এক বিতর্কে অংশ নিচ্ছেন যে-বিতর্ক মানুষ এই গ্রহে বসবাস শুরু করার পর থেকেই চলে আসছে।

'সোফি একেবারে অবসন্ন হয়ে পড়ে।' হিল্ডারও সেই একই অবস্থা। বাবা যে শুধু তার পঞ্চদশ জন্মদিনের জন্য একটি বই লিখেছেন তা নয়, তিনি একটি অদ্ভুত আর সুন্দর বই লিখেছেন।

> তো, সংক্ষেপে ব্যাপারটা হচ্ছে একটি টপ হ্যাটের ভেতর থেকে সাদা একটি খরগোশ বের করা হয়েছে। খরগোশটি যেহেতু বিশাল বড় তাই খেলাটা খেলতে বেশ কয়েক বিলিয়ন বছর লেগেছে। খরগোশটির মিহি-মসৃণ রোমের ডগায় জন্ম নিয়েছে সমস্ত মানুষ আর সেখানে বসে তারা ভাবছে কী করে অসম্ভব চাতুর্যপূর্ণ এই কাজটি সম্ভব হলো। কিন্তু তাদের বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তারা সেই রোমের আরও গভীরে ঢুকে যেতে থাকে। তারপর সেখানেই থাকে তারা...

খরগোশের লোমের গহীন ভেতরে নিজের জন্য একটি আরামদায়ক জায়গা খুঁজে নেবার পর্যায়ে এসে পড়ার অনুভূতি যে কেবল সোফিরই হয়েছে তাই নয়। আজ হিল্ডার পঞ্চদশ জন্মদিন এবং তার মনে হলো কোন দিকে সে হামাগুড়ি দেবে সে-ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়ার সময় এসে গেছে।

গ্রিক প্রকৃতিবাদী দার্শনিকদের কথা পড়ল সে। হিল্ডা জানে তার বাবা দর্শন সম্পর্কে আগ্রহী। দর্শনকে স্কুলের একটা নিয়মিত বিষয় করে নেয়া উচিত এই প্রস্তাব করে পত্রিকার একটি লেখা-ও লিখেছিলেন তিনি। লেখাটির শিরোনাম ছিল, 'দর্শন কেন স্কুলের পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত?' প্রসঙ্গটি তিনি এমনকি হিল্ডার ক্লাসের পিটিএ মিটিং-এও তুলেছিলেন। তাই নিয়ে হিল্ডা কী যে অস্বস্তিতে পড়েছিল।

ঘড়ির দিকে তাকাল সে। সাড়ে সাতটা বাজে। সম্ভবত আধ ঘণ্টার মধ্যেই সকালের নাশতার ট্রে-টা নিয়ে হাজির হবেন তার মা, ভাগ্যিস, কারণ এই মুহূর্তে সে সোফি আর রাজ্যের সব দার্শনিক প্রশ্নের মধ্যে ডুবে আছে। ডেমোক্রিটাস শিরোনামের পরিচ্ছেদটায় চলে এসেছে সে। গোড়াতেই, চিন্তা করার জন্য একটা প্রশ্ন দেয়া হয়েছে সোফিকে: লেগো কেন পৃথিবীর সবচেয়ে অসাধারণ খেলনা? এরপর, ডাকবাক্সের ভেতর বড়সড় একটা খাম পেল সে

> ডেমোক্রিটাস তাঁর পূর্বসূরিদের সঙ্গে এই মর্মে একমত প্রকাশ করেছিলেন যে কোনো কিছু আসলেই 'বদলে যাওয়ার' কারণে প্রকৃতির পরিবর্তনগুলো ঘটে না। কাজেই তিনি অনুমান করলেন যে সবকিছুই ক্ষুদে ক্ষুদে অদৃশ্য ব্লক দিয়ে তৈরি আর এই ব্লকগুলোর প্রত্যেকটিই শাশ্বত

ও অপরিবর্তনীয়। ক্ষুদ্রতম এই এককগুলোকে ডেমোক্রিটাস বললেন *পরমাণু* (atom)।

সোফি যখন তার বিছানার নিচে লাল রেশমি স্কার্ফটা পেল তখন চটে উঠল হিল্ডা। আচ্ছা, তাহলে ওখানে ছিল ওটা! কিন্তু একটি স্কার্ফ কী করে গল্পের মধ্যে হারিয়ে যেতে পারে? হারাতে হলে একটি জায়গাতো থাকতে হবে...

সক্রেটিসকে নিয়ে লেখা পরিচ্ছেদটা শুরু হয়েছে খবরের কাগজে সোফির 'লেবাননে জাতিসংঘের নওয়েজীয় ব্যাটেলিয়ন সম্পর্কে কিছু একটা' পড়ার কথা দিয়ে। একেবারে আদি ও অকৃত্রিম বাবা! নরওয়ের লোকেরা যে জাতিসংঘ বাহিনীর শান্তিরক্ষামূলক কাজ-কর্মে যথেষ্ট উৎসাহী নয় এ-নিয়ে বাবার চিন্তার অন্ত নেই। কিন্তু কেউ যদি উৎসাহী না হয়, তাহলে অন্তত সোফিকে তা হতেই হবে। তাহলেই তিনি সে-কথা তাঁর গল্পে লিখতে পারবেন, ফলে মিডিয়ার খানিকটা মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারবেন।

সোফির কাছে লেখা দর্শন শিক্ষকের চিঠিতে পুনঃপুনশ্চ অংশটা পড়ে মুচকি না হেসে পারল না হিল্ডা।

কোথাও যদি একটি লাল রেশমি স্কার্ফ পাও, দয়া করে সেটি যত্নের সঙ্গে রেখো। মাঝে মধ্যে মানুষের ব্যক্তিগত জিনিসপত্র অদল-বদল হয়ে যায়। বিশেষ করে স্কুলে বা সে-রকম জায়গায় আর এটা দর্শনের একটা স্কুল তো বটেই।

সিঁড়িতে মায়ের পায়ের আওয়াজ শুনতে পেল হিল্ডা। তিনি দরজায় টোকা দেবার আগেই এথেন্সের ভিডিওটা সোফি তার গোপন ডেরায় আবিষ্কার করার অংশটা পড়তে শুরু করে দিয়েছে হিল্ডা।

'হ্যাপি বার্থ ডে...' তার মা মাঝ সিঁড়িতেই গাইতে শুরু করেছেন।

'ভেতরে এসো,' বলে উঠল হিল্ডা, যে-প্যাসেজটায় দর্শন শিক্ষক অ্যাক্রোপলিস থেকে সরাসরি সোফির সঙ্গে কথা বলছেন তার মাঝখানে রয়েছে সে তখন। 'কালো সযত্নে ছাঁটা দাড়ি আর একটা নীল বেরে-তে তাকে অবিকল হিল্ডার বাবার মতো লাগছে।'

'হ্যাপি বার্থ ডে, হিল্ডা!'

'উম্‌ম্‌।'

'হিল্ডা?'

'ওখানে রেখে যাও না।'

'তুই কি...?'

'দেখতেই তো পারছ আমি পড়ছি।'

'ভেবে দেখ, পনেরোয় পড়েছিস তুই!'

'তুমি কখনো এথেন্সে গিয়েছো, মা?'

'না, কেন বলছিস?'

'পুরনো সেই দালানগুলো আজও দাঁড়িয়ে আছে, ব্যাপারটা কি আশ্চর্য না! সত্যি বলতে কি ২৫০০ বছরের পুরনো ওগুলো। ভালো কথা সবচেয়ে বড়টার নাম ভার্জিন'স প্লেস।'

'তুই তোর বাবার প্রেজেন্টটা খুলেছিস নাকি?'

'কোন প্রেজেন্ট?'

'তুই মুখ তুলে একবার *তাকাবি*, হিল্ডা? পুরোপুরি ঘোরের মধ্যে আছিস তুই।'

বিশাল রিং বাইন্ডারটা কোলের ওপর ছেড়ে দিল হিল্ডা।

ট্রে-টা হাতে নিয়ে বিছানার ওপর ঝুঁকে আছেন তার মা। সেটির ওপর কয়েকটি জ্বলন্ত মোমবাতি, মাখন দেয়া রোল শ্রিম্প আর সালাদসহ মাখন লাগানো রোল আর সোডা। সেই সঙ্গে ছোট্ট একটি প্যাকেটও রয়েছে। এক বাহুর নিচে একটি পতাকা নিয়ে দুই হাতে ট্রে-টা ধরে অপ্রস্তুতভাবে দাঁড়িয়ে আছেন তার মা।

'ও, মা, অনেক ধন্যবাদ তোমাকে। এ-সব এনে খুব ভালো করেছ, কিন্তু আমি সত্যি-ই ব্যস্ত।'

'তাহলে আর স্কুলে গিয়ে কাজ নেই তোর, একটা পর্যন্ত এখানেই বসে থাক।'

কেবল তখনই হিল্ডার মনে পড়ল সে কোথায় রয়েছে। ততক্ষণে তার মা ট্রে-টা নামিয়ে রেখেছেন বেডসাইড টেবিলের ওপর।

'দুঃখিত, মা, পুরোপুরি ডুবে গিয়েছিলাম আমি এটার মধ্যে।'

'ও কী লিখেছে রে, হিল্ডা? তোর মতোই অবাক হয়ে গেছি আমি। বেশ কয়েক মাস ধরে তো তোর বাবার কাছ থেকে সহজ কোনো কথাবার্তা আশা করা অসম্ভব হয়ে পড়েছে।'

কোনো একটা কারণে অস্বস্তির একটা বোধ হলো সোফির। 'ও, এটা, তেমন কিছু না, স্রেফ গল্প একটা।'

'গল্প?'

'হ্যাঁ, গল্প আর সেই সঙ্গে দর্শনের ইতিহাস বা সে-রকম একটা কিছু।'

'আমার প্যাকেটটা বুঝি খুলবি না তুই?'

অশোভনতা দেখাতে চাইল না হিল্ডা, কাজেই তক্ষুণি মায়ের উপহারটা খুলল সে। দেখা গেল সেটি একটা সোনার ব্রেসলেট।

'দারুণ সুন্দর তো, মা। অনেক অনেক ধন্যবাদ।'

বিছানা থেকে নেমে এসে মাকে জড়িয়ে ধরল হিল্ডা।

মা-মেয়েতে বসে গল্প করল তারা খানিকক্ষণ।

তারপর সোফি বলল, 'বইটাতে আবার ফিরে যেতে হচ্ছে, মা। এই মুহূর্তে সে ঠিক অ্যাক্রোপলিসের ওপর দাঁড়িয়ে আছে?'

'কে?'

'আমার কোনো ধারণা নেই। সোফির-ও নেই। এটাই আসল কথা।'

'ঠিক আছে, আমাকেও কাজে যেতে হচ্ছে। কিছু খেয়ে নিতে ভুলিস না। তোর কাপড়-চোপড় নিচে একটা হ্যাঙ্গারের ওপর আছে।'

শেষ পর্যন্ত তার মা সিঁড়ি বেয়ে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। সোফির দর্শন শিক্ষকও তাই করলেন; অ্যাক্রোপলিস থেকে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে এলেন তিনি, তারপর এথেন্সের পুরনো স্কোয়্যারের ওখানটায় হাজির হওয়ার খানিক আগে দাঁড়ালেন গিয়ে অ্যারিওপেগস পাহাড়টার ওপর।

পুরনো ভবনগুলো হঠাৎ ধ্বংসস্তূপের ভেতর থেকে দাঁড়িয়ে যেতে গা কেঁপে উঠল হিল্ডার। তার বাবার প্রিয় চিন্তাগুলোর একটা ছিল জাতিসংঘের সমস্ত দেশ মিলে এথেন্সের স্কোয়্যারটার একটা অবিকল প্রতিরূপ তৈরিতে সাহায্য করা। সেটিই হবে দর্শন আর নিরস্ত্রীকরণ সংক্রান্ত আলাপ-আলোচনার একটা ফোরাম। তিনি মনে করতেন যে এ-রকম বিশাল একটা প্রজেক্ট-ই বিশ্ব ঐক্য সৃষ্টি করবে। 'যে যাই বলুক, আমরা একই সঙ্গে অয়েল রিগ আর চাঁদে যাওয়ার রকেট দুটোই তৈরি করতে পেরেছি।'

এরপর পড়ল সে প্লেটোর কথা। 'আত্মা এক তীব্র আকুলতা অনুভব করে ভালোবাসার ডানায় ভর করে ভাব-জগতে তার নিজের আবাসে ফিরে যাওয়ার জন্যে। দেহের শেকড় থেকে মুক্তি পাবার জন্য আঁকুপাঁকু করতে থাকে সে...'

বেড়ার ভেতর দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে এসে হার্মেসের পিছু নিয়েছিল সোফি। কিন্তু হার্মেস তাকে ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল। প্লেটো সম্পর্কে পড়ার পর সোফি বনের আরও ভেতরে ঢুকে ছোট্ট লোকটার পাশে লাল কেবিনটার কাছে চলে গিয়েছিল। ভেতরে বিয়ার্কলে-র একটা ছবি ঝুলছিল। বর্ণনা থেকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে এটা হিল্ডাদেরই বিয়ার্কলে। তবে সেই সঙ্গে ওখানে বার্কলে নামের একটা লোকের প্রতিকৃতিও ছিল। 'কী অদ্ভুত!'

ভারি রিং বাইন্ডারটা বিছানায় এক পাশে সরিয়ে রেখে বুক শেলফটার কাছে গিয়ে চতুর্দশ জন্মদিনে উপহার পাওয়া তিন ভল্যুমের বিশ্বকোষটায় লোকটির খোঁজ করল হিল্ডা। এই তো পাওয়া গেছে-বার্কলে!

বার্কলে, জর্জ, ১৬৮৫-১৭৫৩, ইংলিশ[২৪] দার্শনিক, ক্লয়ন-এর বিশপ। মানব মনের বাইরে কোনো বস্তুজগতের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন। আমাদের ইন্দ্রিয়গত প্রত্যক্ষণ ঈশ্বরের কাছ থেকে আসে। প্রধান রচনা: *আ ট্রিটিজ কনসার্নিং দ্য প্রিন্সিপলস্ অভ্ হিউম্যান নলেজ* (১৭১০)।

ঠিকই, বিষয়টা আসলেই অদ্ভুত। বিছানায় তার সেই রিং বাইন্ডারটার কাছে ফিরে যাওয়ার আগে দাঁড়িয়ে কয়েক মুহূর্ত ভাবল হিল্ডা।

এক অর্থে তার বাবাই ছবি দুটো দেয়ালে টাঙিয়েছেন। দুটো নামের মধ্যে মিল ছাড়া এদের মধ্যে অন্য আর কোনো সাদৃশ্য আছে?

বার্কলে ছিলেন একজন দার্শনিক যিনি মানব মনের বাইরে কোনো বস্তুজগতের অস্তিত্ব অস্বীকার করেছিলেন। মানতেই হবে, কথাটা রীতিমতো অদ্ভুত। কিন্তু সেই

---

২৪. বার্কলে যে আইরিশ সে-কথা পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে। সম্ভবত অনাবধানতাবশত তাকে ইংলিশ বলা হচ্ছে—অনুবাদক।

সঙ্গে এটিও ঠিক যে এ-ধরনের দাবি খুব সহজে উড়িয়ে দেয়া যায় না। অন্তত সোফির প্রসঙ্গে তো কথাটা খুবই প্রযোজ্য। শত হলেও, হিল্ডার বাবা-ই তার 'ইন্দ্রিয়গত প্রত্যক্ষণের' জন্য দায়ী।

যাই হোক, আরও পড়লে আরও জানা যাবে। যেখানটায় সোফি সেই মেয়েটিকে আবিষ্কার করে যে দুই চোখ দিয়েই চোখ টেপে সেখানটায় এসে হিল্ডা রিং বাইন্ডার থেকে মুখ তুলে মুচকি হাসল। 'অন্য মেয়েটি যেন এই কথা বলতে সোফিকে চোখ টিপল যে আমি তোমাকে দেখতে পাচ্ছি, সোফি। আমি এখানে, অন্য দিকটাতে।'

কেবিনে সোফি সবুজ ওয়ালেটটাও পেল—টাকা-পয়সা আর অন্যান্য সবকিছু শুদ্ধ! ওটা কী করে ওখানে গেল?

অবাস্তব! দুই-এক সেকেন্ডের জন্য হিল্ডা সত্যিই বিশ্বাস করে ফেলল যে সোফি সত্যিই পেয়েছে ওয়ালেটটা। কিন্তু তারপর সে ভাবতে শুরু করল পুরো ব্যাপারটা সোফির কাছে কী রকম ঠেকেছিল। নিশ্চয়ই রীতিমতো রহস্যময় আর ভৌতিক।

এই প্রথমবারের মতো সোফির মুখোমুখি হওয়ার একটা প্রবল ইচ্ছা অনুভব করল হিল্ডা। পুরো ব্যাপারটার সব কথা তাকে খুলে বলার ইচ্ছে হলো তার।

কিন্তু সোফিকে এখন হাতেনাতে ধরা পড়া এড়াতে বেরিয়ে আসতে হবে কেবিনটা থেকে। লেকের নৌকোটা অবশ্য ভেসে ভেসে অনেক দূরে চলে গেছে। (হিল্ডার বাবা কী আর হিল্ডাকে পুরনো সেই গল্পটা মনে না করিয়ে দিয়ে পারেন!)

এক মুঠো সোডা মুখে পুরে দিয়ে রোলটাতে একটা কামড় বসাল হিল্ডা 'অতি যত্নশীল' অ্যারিস্টটলের কথা লেখা চিঠিটা পড়তে পড়তে, যিনি প্লেটোর তত্ত্বগুলোর সমালোচনা করেছিলেন।

> অ্যারিস্টটল এই বলে মন্তব্য করেছিলেন যে চেতনায় এমন কোনো কিছু নেই যা পঞ্চেন্দ্রিয় প্রথমে প্রত্যক্ষ করেনি। প্লেটো হলে বলতেন প্রাকৃতিক জগতে এমন কিছু নেই যা প্রথমে ভাব-জগতে ছিল না। অ্যারিস্টটল মনে করতেন এভাবে প্লেটো আসলে 'জিনিসপত্রের সংখ্যা দ্বিগুণ করে ফেলেছিলেন।'

হিল্ডার জানা ছিল না যে অ্যারিস্টটলই আবিষ্কার করেছিলেন 'প্রাণী, উদ্ভিদ বা খনিজ'-এর খেলা।

> প্রকৃতির 'ঘরের' সবকিছু গুছিয়ে ফেলতে চেয়েছিলেন অ্যারিস্টটল। তিনি দেখাতে চেয়েছিলেন যে প্রকৃতির সবকিছুই বিভিন্ন শ্রেণী বা উপশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

নারী সম্পর্কে অ্যারিস্টটলের দৃষ্টিভঙ্গির কথা পড়ে একই সঙ্গে বিরক্ত আর হতাশ হলো সে। ভাবো একবার, এতো অসাধারণ এক দার্শনিক অথচ কী রাম গর্দভ!

নিজের ঘর পরিষ্কার করায় সোফিকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন অ্যারিস্টটল। আর

সেখানে, অন্যান্য জিনিসের মধ্যে সে হিল্ডার ক্লজেট থেকে মাস খানেক আগে হারিয়ে যাওয়া সাদা মোজাটা পেয়েছিল! অ্যালবার্টোর কাছ থেকে আসা সবকটি পাতা একটা রিং বাইন্ডারে রেখেছিল সোফি। 'সব মিলিয়ে ওখানে পঞ্চাশ পাতা হবে।' অন্যদিকে হিল্ডা নিজে পৌঁছেছে ১২৪ পৃষ্ঠা পর্যন্ত। অবশ্য অ্যালবার্টো নক্স-এর সব চিঠি ছাড়াও তার কাছে রয়েছে সোফির গল্পটাও। পরের পরিচ্ছেদটার নাম 'হেলেনিজম'। প্রথমে জাতিসংঘের একটা জিপের ছবিসহ একটা পোস্টকার্ড পায় সোফি। তাতে সিলমোহর দেয়া আছে জাতিসংঘ বাহিনী, ১৫ জুন। এটা হচ্ছে ডাকে না পাঠিয়ে গল্পের মধ্যে ঢুকিয়ে দেয়া হিল্ডাকে পাঠানো বাবার আরেকটা কার্ড।

প্রিয় হিল্ডা, আন্দাজ করছি এখনো তুই তোর জন্মদিন পালন করে চলেছিস। নাকি তার পরের দিনের সকাল এখন? কিন্তু সে যাই হোক, তাতে তোর উপহারের কেনো তারতম্য হচ্ছে না। এক অর্থে, ওটা সারা জীবনই তোর কাজে লাগবে। তবে আমি তোকে আরও একবার তোর জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানাতে চাই। এখন তুই নিশ্চয়ই বুঝতে পারছিস কেন আমি সোফির কাছে কার্ডগুলো পাঠাই। আমি জানি ওগুলো সে ঠিকই তোর কাছে পৌঁছে দেবে।

পুনশ্চ: মা বলল তুই তোর ওয়ালেটটা হারিয়ে ফেলেছিস। ঠিক আছে, আমি কথা দিচ্ছি, তোর হারানো ১৫০ ক্রাউন আমি দিয়ে দেবো। আর, স্কুলের আরেকটা পরিচয়পত্র পেতে সম্ভবত তোর অসুবিধে হবে না, গ্রীষ্মের ছুটির আগে। ভালোবাসা নিস, বাবা।

খারাপ নয়! আগের চেয়ে ১৫০ ক্রাউন বেশি বড়লোক হয়ে গেল সে। বাবা সম্ভবত ভেবেছেন কেবল ঘরে তৈরি একটা উপহারই যথেষ্ট নয়।

তাহলে দেখা যাচ্ছে ১৫ জুন সোফিরও জন্মদিন। কিন্তু সোফির ক্যালেন্ডার কেবল মে-র মাঝখান পর্যন্ত গড়িয়েছে। নিশ্চয়ই সেই সময়ই এই পরিচ্ছেদটা লিখেছিল বাবা এবং আগেভাগেই 'বার্থ ডে কার্ড'টা পাঠিয়ে দিয়েছিলেন হিল্ডাকে। কিন্তু বেচারা সোফি, জোয়ানার সঙ্গে দেখা করার জন্য দৌড়ে যাচ্ছে।

কে এই হিল্ডা? তার বাবা কী করে এটা ধরেই নিলেন যে সোফি তাকে খুঁজে পাবে? সে যাই হোক, কার্ডগুলো সরাসরি নিজের মেয়ের কাছে না পাঠিয়ে সোফির কাছে পাঠিয়ে তিনি কোনো কাজের কাজ করেননি।

প্লটিনাস সম্পর্কে পড়ার সময় সোফির মতো হিল্ডাও স্বর্গীয় স্তরে উঠে গেল।

আমি আসলে বলতে চাইছি যে, যা কিছু অস্তিত্বশীল তার মধ্যেই স্বর্গীয় রহস্যের খানিকটা বর্তমান। একটি সূর্যমুখী বা পপি ফুলেও আমরা তা ঝকমক করতে দেখি। এই অতল রহস্যের আরও বেশ খানিকটা আমরা উপলব্ধি করতে পারি গাছের ডালে ডানা ঝাপটাতে থাকা একটা প্রজাপতি

বা কোনো পাত্রে সাঁতার কাটতে থাকা গোল্ডফিশ দেখে। তবে আমাদের আত্মার ভেতরই আমরা ঈশ্বরের সবচেয়ে কাছাকাছি। একমাত্র এখানেই আমরা জীবনের বিশাল রহস্যের সঙ্গে এক হয়ে যেতে পারি। সত্যি কথা বলতে কী, কিছু কিছু খুবই বিরল মুহূর্তে-ই আমাদের এই অভিজ্ঞতা হয়, বা মনে হয় *আমরা নিজেরাই বুঝি সেই স্বর্গীয় রহস্য*।

এ-পর্যন্ত হিল্ডা যতটুকু পড়েছে তার মধ্যে এটাই তার মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছে সবচেয়ে বেশি। তবে এটাই আবার সবচেয়ে সরল সন্দেহ নেই। প্রতিটি জিনিস-ই এক আর এই 'এক'-ই হচ্ছে এক স্বর্গীয় রহস্য, প্রত্যেকেই যে-রহস্যের ভাগীদার।

এ-সব অবশ্য আসলে এমন কিছু নয় যা বিশ্বাস করতেই হবে। এটা স্রেফ এরকম, ভাবল হিল্ডা। কাজেই 'স্বর্গীয়' শব্দটার জায়গায় যে কেউ ইচ্ছামতো একটা অর্থ বসিয়ে দিতে পারে।

জলদি পরের পরিচ্ছেদে এলো সে। ১৭ই জাতীয় ছুটির দিনের আগের রাতে ক্যাম্পিংয়ে যাচ্ছে সোফি আর জোয়ানা। মেজরের কেবিনে ঢুকে পড়ে তারা...

অল্প কয়েকটা পাতা পড়েই রাগে বিছানার চাদর-টাদর ছুঁড়ে ফেলল হিল্ডা, খাট থেকে নেমে রিং বাইন্ডারটা দুই হাতে আঁকড়ে ধরে পায়চারী শুরু করল ঘরের এমাথা-ওমাথা।

এমন নির্লজ্জ চালাকির কথা আগে কোনোদিন শোনেনি হিল্ডা। মে-র প্রথম দুই হপ্তায় তার বাবা হিল্ডাকে যে-সব কার্ড পাঠিয়েছিলেন তার সবগুলোর কপি তিনি বনের ভেতরে সেই ছোট্ট কুঁড়েঘরটাতে এই ছোট্ট মেয়ে দুটোর হাতে তুলে দেবার ব্যবস্থা করেছেন। আর কপিগুলো আসল-ই একেবারে। একই কথাগুলো সে যে কতবার পড়েছে। প্রত্যেকটা শব্দ চিনতে পারল সে।

প্রিয় হিল্ডা, তোর জন্মদিনের এ-সব গোপন ব্যাপার-স্যাপার নিয়ে ভেতরে ভেতরে আমি এখন এমন টগবগ করে ফুটছি যে খানিক পরপরই নিজেকে আমার সামলে নিতে হচ্ছে বাড়িতে ফোন করে সবকিছু ফাঁস করে দেয়া থেকে। জিনিসটা এমন যে দিনে দিনে সেটি বেড়ে চলেছে। আর তুই তো জানিস যে কোনো কিছু যদি ধীরে ধীরে বড় হতে থাকে তখন সেটিকে নিজের মধ্যে চেপে রাখা মুশকিল...

অ্যালবার্টোর কাছ থেকে সোফি একটা নতুন পাঠ পায়। ইহুদি, গ্রিক আর দুই মহান সংস্কৃতি নিয়ে লেখা। ইতিহাসের এই ব্যাপক বার্ডস-আই ভিউটা পছন্দ হলো হিল্ডার। এ-রকম কোনো কিছু স্কুলে শেখেনি তারা। ওরা খালি তোমাকে বেশি বেশি করে খুঁটিনাটি নানান কিছু দিয়ে যাবে। যিশু আর খ্রিস্টধর্মকে সে এখন একটা নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখতে পাচ্ছে।

গ্যেটের উদ্ধৃতিটা পছন্দ হলো তার 'তিন হাজার বছর যে কাজে লাগাতে পারে না তার জীবন অর্থহীন।'

এর পরের পরিচ্ছেদটা শুরু হয়েছে সোফিদের রান্নাঘরের জানলায় সেঁটে থাকা একটা কার্ডের কথা দিয়ে। হিল্ডার কাছে পাঠানো নতুন একটা বার্থ ডে কার্ড ওটা, বলাই বাহুল্য।

প্রিয় হিল্ডা, কার্ডটা যখন তুই পড়বি তখনো তোর জন্মদিন থাকবে কিনা জানি না। আশা করছি থাকবে। অন্তত বেশ কিছু দিন পার হয়ে যাবে না। সোফির এক হপ্তা যে আমাদেরও এক হপ্তা হবে সে-রকম কোনো কথা নেই। আমি মিডসামার ঈভে বাড়ি আসছি, তখন ঘণ্টার পর ঘণ্টা গ্লাইডারে বসে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে থাকতে পারবো, হিল্ডা। মেলা কথা জমা হয়েছে আমাদের...

এরপর অ্যালবার্টো সোফিকে ফোন করেন আর তখনই সে প্রথমবারের মতো তাঁর কণ্ঠ শোনে।

'আপনার কথায় একটা যুদ্ধ যুদ্ধ ভাব।'

'ব্যাপারটাকে আমি বরং ইচ্ছাশক্তির যুদ্ধ বলবো। আমাদেরকে হিল্ডার নজর কাড়তে হবে, তারপর তার বাবা লিলেস্যান্ডে আসার আগেই ওকে আমাদের দলে ভেড়াতে হবে।'

তারপর দ্বাদশ শতকের পাথরের তৈরি একটা গির্জায় মধ্যযুগীয় এক সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশ নিয়ে থাকা অ্যালবার্টো নক্সের সঙ্গে দেখা করে সোফি।

এই যাহ, গির্জা! সময় দেখল হিল্ডা। সোয়া একটা...সময় জ্ঞান একেবারেই লোপ পেয়েছিল ওর।

জন্মদিনে স্কুল কামাই করলে এমন কিছু মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে না। কিন্তু তার অর্থ দাঁড়াবে এই যে তার ক্লাসের বন্ধুরা তার সঙ্গে উপলক্ষটা উদযাপন করতে পারবে না। শত হলেও, তার প্রচুর শুভার্থী আছে।

খানিক পরেই দেখা গেল লম্বা একটা সারমন হাজির হয়েছে তার জন্য। মধ্যযুগীয় পাদ্রির ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে কোনো অসুবিধেই হলো না অ্যালবার্টোর।

হিল্ডেগার্ডের দিব্যদৃষ্টিতে সোফিয়া-র দেখা দেয়ার বর্ণনা পড়ে আরেকবার বিশ্বকোষ ঘাঁটতে হলো হিল্ডাকে। কিন্তু এবার দু'জনের একজনের সম্পর্কেও কোনো তথ্য পেল না সে। ব্যাপারটা খুবই স্বাভাবিক নয় কি! নারী সংক্রান্ত কোনো প্রসঙ্গ বা তথ্যের বিষয় হলেই বিশ্বকোষ একেবারে চন্দ্রগুহার মতো নীরব। পুরো বিশ্বকোষটা কি পুরুষরক্ষা সমিতি সেন্সর করেছিল?

বিঙ্গেন-এর হিল্ডেগার্ড ছিলেন প্রিচার, লেখক, ডাক্তার, উদ্ভিদবিজ্ঞানী আর জীববিজ্ঞানী। 'সম্ভবত মধ্যযুগে যে নারীরা প্রায়ই অনেক বেশি বাস্তববাদী এমনকি বিজ্ঞানমনস্ক হতো তারই একটি উদাহরণ ছিলেন' তিনি।

অথচ বিশ্বকোষে তাঁর সম্পর্কে একটা কথাও নেই। কী কেলেঙ্কারি!

হিল্ডা কখনো শোনেনি যে ঈশ্বরের কোনো 'নারীত্বসূচক দিক' বা 'মাতৃ-প্রকৃতি' আছে। খুব সম্ভব সেই দিকটার নাম সোফিয়া, কিন্তু সেই সঙ্গে সম্ভবত তিনি ছাপার কালির যোগ্যও ছিলেন না।

সবচেয়ে কাছাকাছি যা সে বিশ্বকোষে পেল তা হচ্ছে কনস্টান্টিনোপলে (বর্তমান ইস্তাম্বুল) সান্তা সোফিয়া গির্জার ওপর একটা এন্ট্রি, নাম হেজিয়া সোফিয়া, যার অর্থ পবিত্র জ্ঞান। কিন্তু সেটির নারী চরিত্রের ব্যাপারে কিছুই লেখা নেই। এটা নিশ্চয়ই সেন্সরশীপ, তাই না?

অন্যদিকে অবশ্য এ-কথা সত্যি যে হিল্ডার কাছে সোফি নিজেকে প্রকাশ করেছে। হিল্ডা মেয়েটাকে সোজা চুলের একটা মেয়ে হিসেবেই কল্পনা করছে সব সময়...

সেন্ট মেরি'জ চার্চে সকালের বেশির ভাগ সময় কাটিয়ে বাড়িতে ফিরে এসে, বনের ভেতরে কেবিন থেকে সে যে পেতলের আয়নাটা নিয়ে এসেছিল সেটির সামনে গিয়ে দাঁড়ায় সোফি।

> নিজের পাণ্ডুর মুখটার তীক্ষ্ণ দেহরেখাগুলো খুঁটিয়ে দেখল সে, মুখটাকে ঘিরে আছে তার বেখাপ্পা চুল, যে-চুল প্রকৃতির একান্তই নিজস্ব স্টাইল ছাড়া অন্য কোনো স্টাইলের আওতায় পড়ে না। কিন্তু সেই মুখটার পেছনে আরেকটি মেয়ের অপছায়া দেখা দিয়েছে।
>
> হঠাৎ করেই সেই অন্য মেয়েটি দুই চোখ দিয়েই চোখ টিপতে লাগল উন্মত্তের মতো, যেন সে বোঝাতে চাইছে সত্যি-ই সে আছে আয়নার ভেতরের ওই দিকটায়। কয়েক সেকেন্ড মাত্র দেখা গেল অপছায়াটিকে। তারপরই নেই হয়ে গেল সেটি।

আয়নাটার পেছনে যেন সে অন্য আরেকজনকে খুঁজছে এমনিভাবে কতবার সেটির সামনে দাঁড়িয়েছে হিল্ডা? কিন্তু সে-কথা তার বাবা জানলেন কী করে? হিল্ডা কী সেই সঙ্গে কালো চুলের এক রমণীকেও খোঁজেনি? এক জিপসি রমণীর কাছ থেকে আয়নাটা কিনেছিলেন দাদির মা, তাই না? হিল্ডার মনে হলো বইটা ধরে থাকা হাত দুটো কাঁপছে তার। মনে হলো 'অন্য দিকটায়' সত্যি-ই আছে সোফি।

সোফি এবার হিল্ডা আর বিয়ার্কলকে নিয়ে স্বপ্ন দেখছে। হিল্ডা তাকে দেখতেও পাচ্ছে না, তার কথা শুনতেও পাচ্ছে না, কিন্তু তারপর ডকের ওপর সোফি হিল্ডার সোনার তৈরি যিশুর ক্রুশবিদ্ধ মূর্তিটা পায়। তারপর, সোফি স্বপ্নটা দেখে জেগে ওঠবার পর দেখা যায় ক্রুশবিদ্ধ যিশুর মূর্তিটা—হিল্ডার নামের আদ্যক্ষর ইত্যাদিসহ—পড়ে রয়েছে সোফির বিছানার ওপর।

ভালো করে চিন্তা করার চেষ্টা করল হিল্ডা। তার ক্রুশবিদ্ধ যিশুর মূর্তিটাও হারায়নি নিশ্চয়ই? ড্রেসারের কাছে গিয়ে নিজের জুয়েলারি কেসটা বার করল হিল্ডা। তার নাম রাখার সময় দাদির কাছ থেকে পাওয়া উপহার যিশুর সেই ক্রুশবিদ্ধ মূর্তিটা নেই ওখানে।

ওটা তাহলে আসলেই হারিয়ে ফেলেছে সে। কিন্তু যেখানে ব্যাপারটা সে নিজেই

জানে না সেখানে কথাটা বাবা জানলেন কী করে? তাছাড়া, আরেকটা কথা : দৃশ্যত সোফি স্বপ্ন দেখেছিল যে হিল্ডার বাবা লেবানন থেকে বাড়ি ফিরছেন। কিন্তু সেটি তো ঘটনাটার এক হপ্তা আগে। তাহলে কি সোফির স্বপ্নটা ভবিষ্যদ্বাণীসূচক? তার বাবা কি এটাই বোঝাতে চেয়েছেন যে-যখন তিনি বাড়ি আসবেন তখন কোনো না কোনোভাবে সোফিও থাকবে সেখানে? তিনি লিখেছিলেন যে হিল্ডা নতুন একজন বন্ধু পাবে...

একটা ক্ষণিক দিব্যদৃষ্টিতে পরিপূর্ণ স্বচ্ছতার সঙ্গে হিল্ডা জেনে গেল সোফি স্রেফ কাগজ-কলমের অতিরিক্ত একটা কিছু। সত্যিই সোফির অস্তিত্ব আছে।

আ লো ক প্রা প্তি

৩৩

...সুচ বানাবার উপায় থেকে কামান তৈরির পদ্ধতি পর্যন্ত...

রেনেসাঁর ওপর লেখা পরিচ্ছেদটা হিল্ডা পড়তে শুরু করেছে কেবল এমন সময় সদর দরজা দিয়ে মায়ের ভেতরে ঢোকার আওয়াজ পেল সে। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল বিকেল চারটা বাজে।

তার মা ছুটে ওপরে এসে হিল্ডার ঘরের দরজা খুললেন।

'তুই গির্জায় যাসনি?'

'হ্যাঁ, গিয়েছিলাম তো?'

'কিন্তু...কী পরে গিয়েছিলি?'

'এখন যা পরে আছি তাই পরে।'

'নাইটগাউন?'

'ওটা মধ্যযুগে বানানো একটা পাথুরে গির্জা।'

'হিল্ডা!'

রিং বাইন্ডারটা কোলের ওপর ছেড়ে দিয়ে মুখ তুলে মায়ের দিকে তাকাল সে। 'সময়ের দিকে খেয়াল-ই ছিল না, মা। মাফ করে দাও, তবে আমি কিন্তু খুব এক্সাইটিং একটা বই পড়ছি।'

ওর মা না হেসে পারলেন না।

'এটা একটা জাদুর বই,' যোগ করল হিল্ডা।

'ঠিক আছে বুঝলাম। হ্যাপি বার্থ ডে ওয়ান্স এগেইন, হিল্ডা! ভালো কথা, আমি এখন কিছুক্ষণ জিরোব, তারপর জম্পেশ একটা ডিনারের ব্যবস্থা করব। কিছু স্ট্রবেরি যোগাড় করেছি।'

'ঠিক আছে। আমি তাহলে আরেকটু পড়ি।'

তার মা চলে গেলেন, হিল্ডা পড়তে থাকল।

শহরের ভেতর দিয়ে হার্মেসের পিছু পিছু চলছে সোফি। লেবানন থেকে পাঠানো আরেকটা কার্ড পায় সে অ্যালবার্টোর হলঘরে। এটার তারিখ দেয়া আছে ১৫ জুন। তারিখগুলোর মধ্যে একটা পদ্ধতি আবিষ্কার করতে শুরু করেছে হিল্ডা। ১৫ জুনের আগের তারিখ দেয়া কার্ডগুলো বাবার কাছ থেকে হিল্ডার আগেই পাওয়া কার্ডগুলোরই কপি। কিন্তু আজকের তারিখ দেয়া কার্ডগুলো রিং বাইন্ডারের মাধ্যমে আজই

প্রথমবারের মতো পৌঁছাচ্ছে তার কাছে।

> প্রিয় হিল্ডা, সোফি এবার দার্শনিকের বাড়িতে আসছে। শিগগিরই পনেরোয় পা দেবে মেয়েটা আর তুই তো গতকালই পনেরোয় পড়েছিস। নাকি আজকে পড়বি, হিল্ডা? যদি আজ হয় তাহলে নিশ্চয়ই দেরি হয়ে গেছে। আমাদের ঘড়িগুলো সারাক্ষণ এক সময় দেয় না।

হিল্ডা পড়তে থাকল অ্যালবার্টো কীভাবে সোফিকে রেনেসাঁ আর নতুন বিজ্ঞান, সপ্তদশ শতাব্দী আর ব্রিটিশ অভিজ্ঞতাবাদ সম্পর্কে অনেক কথা বললেন। গল্পের মধ্যে বাবার সেঁটে দেয়া প্রত্যেকটা কার্ড দেখে লাফিয়ে উঠল সে। তিনি এমন ব্যবস্থা করেছেন যাতে সেগুলো এক্সারসাইজ খাতার ভেতর থেকে পড়ে যায়, কলার খোসার ভেতর উদয় হয় অথবা কোনো কম্পিউটার প্রোগ্রামের ভেতর লুকিয়ে থাকে। একেবারে অনায়াসে তিনি অ্যালবার্টোর মুখ ফসকে দিয়ে তাকে দিয়ে সোফিকে হিল্ডা বলাতে পারেন। আর সবচেয়ে বড় কথা, হার্মেসকে দিয়ে তিনি 'হ্যাপি বার্থ ডে, হিল্ডা!' বলাতে পারেন।

অ্যালবার্টোর সঙ্গে সে এই ব্যাপারে একমত হলো যে নিজেকে ঈশ্বরের সঙ্গে তুলনা করে বাবা একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলেছেন। কিন্তু সে ঠিক কার সঙ্গে একমত হচ্ছে? তার বাবাই কি ওই ভর্ৎসনাসূচক বা আত্মভর্ৎসনাসূচক শব্দগুলো অ্যালবার্টোর মুখে বসিয়ে দেননি? এবার তার মনে হলো ঈশ্বরের সঙ্গে তুলনাটা অতোটা ক্ষ্যাপাটে ছিল না। সোফির জগতে তার বাবা সত্যি-ই সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের মতোই। অ্যালবার্টো যখন বার্কলেতে পৌঁছালেন, তখন সোফি যেমন মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল ঠিক সে-রকমই হয়ে পড়ল হিল্ডা। এবার কী হবে? নানান সব ইঙ্গিতে এ-কথা বলা হয়েছে যে ওরা এই দার্শনিক পর্যন্ত পৌঁছালেই বিশেষ একটা কিছু ঘটবে, এমন এক দার্শনিক যিনি মানব চেতনার বাইরে কোনো বস্তুগত জগতের অস্তিত্ব স্বীকার করেননি।

পরিচ্ছেদটার শুরুতে অ্যালবার্টো আর সোফি জানালার সামনে দাঁড়িয়ে ছোট্ট প্লেনটার পেছনে পতপত করে উড়তে থাকা 'হ্যাপি বার্থ ডে' লেখা লম্বা স্টিমারটার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। সেই সময়ই শহরের ওপরে জমতে শুরু করেছে কালো মেঘ।

> 'কাজেই, 'টু বি অর নট টু বি'-তেই প্রশ্নের শেষ নয়। প্রশ্ন এটাও যে আমরা কে। আমরা কি আসলেই রক্ত-মাংসের মানুষ—নাকি আমাদের চারপাশ ঘিরে আছে মন?'

সোফির নখ কামড়াতে শুরু করার ঘটনায় অবাক হওয়ার কিছু নেই। নখ কামড়ানোর বদ-অভ্যাস হিল্ডার কখনোই ছিল না ঠিকই, কিন্তু এই মুহূর্তে তার খুব একটা ভালো বোধ হচ্ছে না। তো, এরপর শেষ পর্যন্ত প্রকাশ হয়ে পড়ল সবকিছু 'আমাদের কাছে—তোমার আর আমার কাছে—এই 'ইচ্ছা বা চিদাত্মা' যা কিনা 'প্রতিটি জিনিসের মধ্যকার প্রতিটি জিনিসের কারণ' তা হিল্ডার বাবাও হতে পারে।'

'আপনি কি বলতে চাইছেন আমাদের জন্য তিনি একরকম ঈশ্বরের মতো?'

'একেবারে খোলাখুলিভাবে বললে বলতে হয় হ্যাঁ। নিজের জন্য লজ্জা হওয়া উচিত লোকটার।'

'আর হিল্ডা, সে কী?'

'হিল্ডা একটা পরী।'

'পরী?'

'হিল্ডা-ই হচ্ছে সে যার মুখাপেক্ষী হয়ে থাকে এই চিদাত্মা।'

এরপরই সোফি অ্যালবার্টোকে ফেলে দৌড়ে বেরিয়ে আসে ঝড়ের মধ্যে। সোফি শহরের ভেতর দিয়ে ছুটে যাবার কয়েক ঘণ্টা পর বিয়ার্কলের ওপর দিয়ে কাল রাতে যে-ঝড় বয়ে গেছে এটা কি সেই একই ঝড়?

দৌড়ানোর সময় একটা চিন্তাই কেবল খেলে বেড়াতে লাগল তার মধ্যে 'কাল আমার *জন্মদিন!*' কিন্তু পঞ্চদশ জন্মদিনের আগের দিনই যদি কেউ উপলব্ধি করে যে জীবনটা নেহাতই একটা স্বপ্ন তাহলে সেটি কি একটু বেশি তিক্ত হয়ে যায় না? ব্যাপারটা অনেকটা ১০ লাখ টাকা জিতে সেটি পাওয়ার ঠিক আগ মুহূর্তে ঘুম ভেঙে যাওয়ার মতো।'

প্যাচপ্যাচে ভেজা খেলার মাঠটা পেরিয়ে এলো সোফি। কয়েক মিনিট পরেই সে দেখল কে একজন দৌড়ে আসছে তার দিকে। দেখা গেল, তিনি আর কেউ নন, তার মা। বিদ্যুচ্চমকের ক্রুদ্ধ বর্শায় আকাশ বারবার চিরে ফালা ফালা হয়ে যাচ্ছে।

দু'জনে পরস্পরের কাছে পৌঁছানোর পর সোফির মা হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরলেন তাকে।

'কী ঘটছে রে এ-সব আমাদের জীবনে, মা আমার?'

'আমি জানি না,' ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল সোফি।

'ব্যাপারটা একটা দুঃস্বপ্নের মতো।'

হিল্ডা অনুভব করল অশ্রু গড়াতে শুরু করেছে তার চোখ বেয়ে। 'টু বি অর নট টু বি-দ্যাট ইজ দ্য কোশ্চেন।' বিছানার শেষ মাথায় রিং বাইন্ডারটা ছুঁড়ে ফেলে উঠে দাঁড়াল হিল্ডা। একবার এদিক আরেকবার ওদিক পায়চারি করতে থাকল সে মেঝেতে। শেষে, থেমে দাঁড়াল পেতলের আয়নাটার সামনে, তারপর ওর মা এসে ডিনার তৈরি হওয়ার কথা জানানো পর্যন্ত ওখানেই দাঁড়িয়ে রইল সে। দরজায় টোকার শব্দটা তার কানে পৌঁছানোর সময় তার কোনো ধারণাই ছিল না কতক্ষণ সে ওভাবে দাঁড়িয়ে ছিল।

কিন্তু সে নিশ্চিত, পুরোপুরি নিশ্চিত যে তার প্রতিবিম্বটা দুই চোখ দিয়েই চোখ টিপেছিল।

ডিনারের পুরো সময়টা কৃতজ্ঞ এক জন্মদিন-কন্যা হয়ে থাকার চেষ্টা করে গেল

হিল্ডা। তবে সারাক্ষণই তার মন পড়ে রইল সোফি আর অ্যালবার্টোর কাছে।

হিল্ডার বাবাই সবকিছু নির্ধারণ করেন এ-কথা *জানার* পর এবার ওদের দিনকাল কেমন কাটবে? অবশ্য 'জানা' বললে সম্ভবত অতিশয়োক্তি হয়ে যায়। ওরা যে আদৌ কিছু জানে এটা ভাববারই তো কোনো মানে হয় না। তারা যেটুকু জানছে সেটি তো হিল্ডার বাবাই তাদের জানতে দিচ্ছেন বলে তারা জানছে, তাই না?

তারপরেও, যেদিক দিয়েই তাকানো যাক না কেন সমস্যাটা একই রয়ে গেছে। সোফি আর অ্যালবার্টো পুরো ব্যাপারটার স্বরূপ 'জেনে যাওয়ার' পর তাদের জন্য অবস্থাটা হয়ে পড়েছে রাস্তার শেষ মাথায় এসে দাঁড়ানোর মতো।

একই সমস্যাটা যে সম্ভবত তার নিজের জগতের বেলাতেও প্রযোজ্য সে-কথাটা হঠাৎ উপলব্ধি করল সে আর তখন মুখভর্তি খাবার নিয়ে আরেকটু হলেই বিষম খেতে যাচ্ছিল সে। প্রাকৃতিক নিয়ম-কানুন সম্পর্কে মানুষের বোধ-বুদ্ধি ধীরে ধীরে বেড়েছে। দর্শন আর বিজ্ঞানের জিগজ্‌স পাজল্-টার শেষ খণ্ডটা জায়গামতো বসে গেলেই কি ইতিহাস অনন্তকালের দিকে চলতে শুরু করবে? একদিকে ধ্যান-ধারণা আর বিজ্ঞানের উন্নতি এবং অন্যদিকে গ্রিনহাউস অ্যাফেক্ট আর বৃক্ষশূন্যতা, এই দুইয়ের মধ্যে নিশ্চয়ই একটা সম্পর্ক আছে? সেজন্যই মানুষের জ্ঞানতৃষ্ণাকে নীতিভ্রষ্টতা বলাটা হয়ত ততটা পাগলামি নয়।

প্রশ্নটা এতোই বড় আর ভয়ঙ্কর যে আবার ওটা ভুলে থাকার চেষ্টা করল হিল্ডা। বাবার পাঠানো জন্মদিনের বইটার আরও খানিকটা পড়লে সম্ভবত আরও অনেক বেশি জিনিস জানতে পারবে সে। দু'জনে আইসক্রিম আর ইতালীয় স্ট্রবেরি শেষ করার পর হিল্ডার মা আবার গেয়ে উঠলেন, 'হ্যাপি বার্থ ডে টু য়্যু...' তারপর বললেন, 'এবার তোর যা পছন্দ তাই করবো আমরা।'

'জানি কথাটা বেশ বেখাপ্পা শোনাবে, কিন্তু সত্যি কথা হচ্ছে বাবার উপহার দেয়া বইটাই পড়তে চাই আমি এখন।'

'বেশ তো পড়, যতক্ষণ পর্যন্ত না ও তোকে পুরোপুরি পাগল বানিয়ে ছাড়ে।'

'নো ওয়ে।'

'এটা পিৎজা খেতে খেতে টিভিতে এই মিস্ট্রিটা দেখা যেতে পারে।'

'ঠিক আছে, তুমি যখন বলছ।'

সোফি কীভাবে তার মায়ের সঙ্গে কথা বলেছিল সে-কথা হঠাৎ মনে পড়ে গেল হিল্ডার। আশা করা যায় হিল্ডার মায়ের কোনো কিছু বাবা অন্যের মায়ের চরিত্রে ঢোকাননি। স্রেফ সে-সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার জন্যই সে সিদ্ধান্ত নিল টপ হ্যাটের ভেতর থেকে বের করে আনতে থাকা সাদা খরগোশের কথা উল্লেখ না করার। অন্তত আজ নয়।

'ভালো কথা,' টেবিল ছেড়ে ওঠার সময় বলে উঠল সে।

'কী?'

'আমার সেই সোনার ক্রুসিফিক্সটা পাচ্ছি না কোথাও।'

হেঁয়ালিভরা একটা অভিব্যক্তি নিয়ে হিল্ডার দিকে তাকালেন তার মা। 'কয়েক হপ্তা আগে ডকের পাশে পেয়েছিলাম আমি ওটা। তুই নিশ্চয়ই হারিয়ে ফেলেছিলি ওটা,

অগোছালো পাজি মেয়ে কোথাকার।'

'বাবাকে সে-কথা বলেছিলে বুঝি তুমি?'

'দাঁড়া, মনে করি...হ্যাঁ, বলেইছিলাম খুব সম্ভব।'

'তাহলে কোথায় ওটা?'

তার মা উঠে দাঁড়িয়ে নিজের অলঙ্কারের বাক্সটা আনতে গেলেন। শোবার ঘর থেকে ভেসে আসা আশ্চর্যসূচক একটা ধ্বনি শুনতে পেল হিল্ডা। দ্রুত লিভিং রুমে ফিরে এলেন তিনি।

'এই মুহূর্তে তো ওটা পাচ্ছি না দেখছি।'

'আমিও তাই ভেবেছিলাম।'

মাকে একটা আলিঙ্গন করে ওপরে তার নিজের ঘরে চলে গেল হিল্ডা দৌড়ে। অবশেষে এবার সে সোফি আর অ্যালবার্টোর কথা পড়তে পারবে। আগের মতোই রিং বাইন্ডারটা হাঁটুর ওপর নিয়ে বিছানায় বসে পড়তে শুরু করল সে পরের পরিচ্ছেদটা।

পরের দিন তার মা এক ট্রে-ভর্তি জন্মদিনের উপহার নিয়ে ঘরে ঢুকতে ঘুম থেকে উঠল সোফি। খালি একটা সোডার বোতলে একটা পতাকা লাগিয়ে এনেছেন তিনি।

'হ্যাপি বার্থ ডে, সোফি!'

দু'হাতে চোখ ঘষে ঘুম তাড়াল সোফি। আগের রাতে কী ঘটেছে মনে করার চেষ্টা করল সে। কিন্তু সব যেন একটা জিগজঅ পাজল্-এর এলোমেলো টুকরোর মতো ঠেকল তার কাছে। একটা টুকরো হলো অ্যালবার্টো, আরেকটা হচ্ছে হিল্ডা আর সেই মেজর। তৃতীয়টা হলো বার্কলে, চতুর্থটা বিয়ার্কলে। সবচেয়ে কালো টুকরোটা হলো গতরাতের ভয়ঙ্কর ঝড়টা। আসলেই একটা ধাক্কা খেয়েছিল সে। একটা তোয়ালে দিয়ে তার শরীরটা মুছে দিয়েছিলেন তার মা তারপর এক কাপ গরম দুধ খাইয়ে স্রেফ শুইয়ে দিয়েছিলেন বিছানায়। সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়েছিল সে।

'আমি নিশ্চয়ই বেঁচে আছি এখনো?' দুর্বল গলায় বলল সে।

'আলবৎ বেঁচে আছিস তুই! আর আজ তোর বয়স পনেরো হলো।'

'তুমি ঠিক বলছ তো?'

'তা নয় তো কী? মা জানবে না তার মেয়ের জন্ম কবে? ১৫ জুন, ১৯৭৫... দেড়টার সময়। ওটা ছিল আমার জীবনের সবচেয়ে সুখের মুহূর্ত।'

'তুমি ঠিক জানো এগুলো সব নিছক স্বপ্ন নয়?'

'ঘুম থেকে জেগে উঠে রোল আর সোডা আর জন্মদিনের উপহার পাওয়াটা নিশ্চয়ই একটা ভালো স্বপ্ন।'

একটা চেয়ারের ওপর উপহারগুলো রেখে এক মুহূর্তের জন্য বাইরে গেলেন তিনি। যখন ফিরে এলেন, তার হাতে তখন রোল আর সোডাসহ আর একটা ট্রে। ওটা তিনি বিছানার শেষ মাথায় রাখলেন।

এটা হচ্ছে গতানুগতিক জন্মদিনের সকালের আচার-অনুষ্ঠান শুরুর একটা সংকেত। এরপরই উপহারগুলো খোলা হবে, তার মা ভাবাবেগের সঙ্গে স্মরণ করবেন পনেরো বছর আগে ওঠা তার প্রথম ব্যথার কথা। সোফির মা উপহার দিয়েছেন একটা

টেনিস র‍্যাকেট। সোফি কখনো টেনিস খেলেনি, তবে ক্লোভার ক্লোজ থেকে কয়েক মিনিটের হাঁটা-পথের দূরত্বেই রয়েছে কয়েকটা খোলা কোর্ট। তার বাবা সোফির জন্য পাঠিয়েছেন একটা মিনি টিভি আর এফ এম রেডিও। স্ক্রিনটা সাধারণ একটা ছবির চেয়ে বড় হবে না। বয়স্কা ফুপু-খালা আর পারিবারিক বন্ধুরাও উপহার পাঠিয়েছেন।

হঠাৎ তার মা বললেন, 'তুই কি বলিস? আজ না হয় কাজে না-ই গেলাম?'

'না, তা কেন করবে?'

'কাল বড্ড আপসেট ছিলি তুই। এ-রকম চললে বোধকরি একজন সাইকিয়াট্রিস্টের সঙ্গে দেখা করার জন্য একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট করতে হবে।'

'তার দরকার হবে না।'

'কারণটা কী, ঝড় নাকি অ্যালবার্টো?'

'তোমার কী হয়েছিল? তুমি বলেছিলেঃ কী ঘটছে রে এ-সব আমাদের জীবনে, মা আমার?'

'শহরময় দৌড়ে বেড়াচ্ছিস তুই একটা রহস্যময় লোকের সঙ্গে দেখা করার জন্য, এ-সব নিয়ে ভাবছিলাম আমি।...হয়ত দোষটা আমারই।'

'আমি যে আমার অবসর সময়ে দর্শনের একটা কোর্স করছি এটা কারো "দোষ" না। তুমি কাজে চলে যাও তো। দশটার আগে স্কুল শুরু হবে না, তাছাড়া আমরা তো আজ স্রেফ গ্রেড পাবো আর বসে থাকবো।'

'জানিস নাকি কী পাবি?'

'অন্তত গত সিমেস্টারে যা পেয়েছিলাম তার চেয়ে বেশি।'

তার মা চলে যাওয়ার পর খানিকক্ষণ যেতে না যেতেই ফোনটা বেজে-উঠল।

'সোফি অ্যামুন্ডসেন।'

'অ্যালবার্টো বলছি।'

'ও।'

'কাল কোনো অস্ত্র-ই বাকি রাখেনি মেজর।'

'কী বলতে চাইছেন?'

'ঝড়-বৃষ্টি, সোফি।'

'কিছুই ভেবে উঠতে পারছি না।'

'এরচেয়ে ভাল গুণ আর হয় না একজন দার্শনিকের। এতো অল্প সময়ে তুমি এতোটা শিখেছো বলে গর্ব হচ্ছে আমার তোমাকে নিয়ে।'

'কিন্তু আমার ভয় হচ্ছে এসবের কোনো কিছুই বাস্তব নয়।'

'এটাকে বলে অস্তিত্ববাদী উৎকণ্ঠা (angst) বা ভয়। আর, সাধারণত নতুন চেতনা অর্জনের পথে এটা একটা ধাপ মাত্র।'

'আমার মনে হয় এই কোর্সে একটা ব্রেক দরকার আমার।'

'বাগানে কি এই মুহূর্তে এতোগুলোই ব্যাঙ রয়েছে?'

হাসতে শুরু করল সোফি। অ্যালবার্টো বলে চললেন: 'আমার মনে হয় লেগে থাকাটাই বরং আরও ভালো হবে। ও ভালো কথা, হ্যাপি বার্থ ডে। মিডসামার ঈভ-

এর মধ্যে কোর্সটা শেষ করতেই হবে আমাদের। এটাই আমাদের শেষ সুযোগ।'

'কীসের শেষ সুযোগ আমাদের?'

'তুমি আরাম করে বসেছ তো? এই বিষয়ে খানিকটা সময় দিতে হবে আমাদের বুঝলে।'

'আমি বসছি।'

'দেকার্তের কথা মনে আছে তো?'

'আমি চিন্তা করি, তাই আমি অস্তিত্বশীল?'

'আমাদের নিজস্ব পদ্ধতিগত সন্দেহের কারণে এই মুহূর্ত থেকে আমরা একেবারে গোড়া থেকে শুরু করছি। আমরা এমনকি এটাও জানি না যে আমরা চিন্তা করি কিনা। এমনও দেখা যেতে পারে যে আমরা আসলে কিছু চিন্তা আর সেটি কিন্তু চিন্তা করার থেকে একেবারে ভিন্ন একটা জিনিস। এ-কথা বিশ্বাস করবার সঙ্গত কারণ রয়েছে আমাদের যে আমরা স্রেফ হিল্ডার বাবার আবিষ্কার এবং আমাদেরকে সে আবিষ্কার করেছে লিলেস্যান্ডে অবস্থানরত মেজরের মেয়ের জন্মদিনের আমোদ হিসেবে। বুঝতে পারছো তো তুমি?

'পারছি...'

'কিন্তু এইখানটায় আবার একটা অন্তর্নিহিত স্ববিরোধ আছে। আমরা কাল্পনিক হয়ে থাকলে কোনো কিছু 'বিশ্বাস করার' আদৌ কোনো অধিকার নেই আমাদের। সেক্ষেত্রে এই টেলিফোন সংলাপের পুরোটাই নিখাদ কাল্পনিক।'

'তাহলে তো আমাদের একরত্তিও স্বাধীন ইচ্ছা নেই, তার কারণ আমরা যা বলি আর করি তার সবকিছুই মেজরের পরিকল্পনা মতো ঘটছে। কাজেই আমরা এখন অনায়াসে ফোন রেখে দিতে পারি।'

'না, না, এবার কিন্তু তুমি ব্যাপারগুলো অতিসরলীকরণ করছো।'

'ঠিক আছে, তাহলে ব্যাখ্যা করুন ব্যাপারটা।'

'তুমি কি এ-রকম দাবি করতে পারো যে লোকে যা স্বপ্ন দেখে তার সবই পরিকল্পনামাফিক দেখে? হতে পারে আমরা যা করি তার সবই হিল্ডার বাবা জানে। হতে পারে যে নিজের ছায়ার কাছ থেকে পালিয়ে বেড়ানো যতটা কঠিন, তার সর্বজ্ঞতা থেকে পালানো-ও ঠিক ততটাই কঠিন। সে যাই হোক-আর এই জায়গাটাতেই আমি একটা ফন্দি আঁটতে শুরু করেছি—এটা কিন্তু নিশ্চিত নয় যে যা কিছু ঘটবে তার সবই মেজর এরই মধ্যে ভেবে রেখেছে। একেবারে শেষ মুহূর্তের আগে অর্থাৎ সৃষ্টির সময়ের আগে হয়ত সে সিদ্ধান্ত নেয় না। ঠিক এই ধরনের মুহূর্তগুলোতেই আমরা হয়ত নিজেরাই একটা উদ্যোগ নিতে পারি যা ঠিক করবে আমরা কী বলব আর করব। স্বভাবতই, এ-ধরনের উদ্যোগ মেজরের ভারি কামানগুলোর তুলনায় খুবই দুর্বল অভিঘাত তৈরি করবে। কথা-বলা কুকুর, কলার ভেতরে থাকা মেসেজ আর আগে থেকেই বুক করা বজ্রবৃষ্টির মতো অনুপ্রবেশমূলক বাহ্যিক শক্তির বিরুদ্ধে আমরা খুব সম্ভবত অসহায়। কিন্তু তাই বলে আমরা আমাদের একগুঁয়েমিটিকে বাতিল করে দিতে পারি না, তা সেটি যতই দুর্বল হোক না কেন।'

'তা কী করে সম্ভব?'

'আমাদের ছোট্ট পৃথিবীর সবকিছুই স্বভাবত মেজর জানে, কিন্তু তার মানে এই নয় যে সে সর্বশক্তিমান। অন্তত আমাদেরকে অবশ্যই এমনভাবে বাঁচার চেষ্টা করতে হবে যেন সে তা নয়।'

'আমার মনে হয় আমি বুঝতে পারছি আপনি কী বলতে চাইছেন।'

'কৌশলটা হবে পুরোপুরি আমাদের নিজেদের চেষ্টায় কিছু করা যায় কিনা তা দেখা—এমন কিছু যা মেজর টের পাবে না।'

'আমাদের যদি স্রেফ অস্তিত্বটুকুও না থাকে তাহলে তা কেমন করে করব আমরা?'

'কে বলেছে আমাদের অস্তিত্ব নেই? আমরা *আছি* কি না সেটি প্রশ্ন নয়, প্রশ্ন হচ্ছে আমরা কী আর আমরা কে। এমনকি যদি দেখা যায় যে মেজরের দ্বৈত সত্তায় আমরা স্রেফ কিছু অভিঘাত ছাড়া কিছু নয় তাতেও আমাদের এই ক্ষুদ্র অস্তিত্ব আমাদের কাছ থেকে বিলীন হয়ে যায় না।

'অথবা আমাদের স্বাধীন ইচ্ছা?'

'আমি তো সেটি নিয়েই কাজ করছি, সোফি।'

'কিন্তু হিল্ডার বাবার নিশ্চয়ই এটা মোটেই অজানা নয় যে আমরা এটা নিয়ে কাজ করে যাচ্ছি?'

'তা তো বটেই। কিন্তু আসল পরিকল্পনাটা যে কী সেটি সে জানে না, একটা আর্কিমিডিয়ান পয়েন্ট খুঁজে বের করা যায় কিনা সেই চেষ্টা করছি আমি।'

'আর্কিমিডিয়ান পয়েন্ট?'

'আর্কিমিডিস ছিলেন এক গ্রিক বৈজ্ঞানিক, তিনি বলেছিলেন: 'দাঁড়াবার মতো একটা শক্ত জায়গা শুধু দাও আমাকে, পৃথিবীটাকে নাড়িয়ে দিচ্ছি আমি।' মেজরের ভেতরের মহাবিশ্ব থেকে আমাদের নিজেদেরকে সরিয়ে নেবার জন্য ঠিক ওই রকমের একটা জায়গা খুঁজে বের করতেই হবে আমাদের।'

'সেটি একটা কাজের কাজ হবে কিন্তু।'

'কিন্তু দর্শনের কোর্সটা শেষ হওয়ার আগে আমরা সরে পড়তে পারছি না। যতক্ষণ সেটি চলছে ততক্ষণ আমাদের ওপর তার বজ্র আঁটুনি থেকেই যাবে। স্পষ্টতই, সে ঠিক করেছে যে শতাব্দীর পর শতাব্দীর ভেতর দিয়ে একেবারে আমাদের সময় পর্যন্ত তোমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে হবে আমাকে। কিন্তু মধ্যপ্রাচ্যের কোনো এক জায়গা থেকে প্লেনে চড়ার খুব বেশিদিন আর বাকি নেই তার। সে বিয়ার্কলেতে পা দেবার আগেই যদি তার আঠাল কল্পনার কাছ থেকে নিজেদেরকে ছাড়িয়ে নিতে না পারি আমরা তো আমাদের কম্ম কাবার হয়ে যাবে।'

'আপনি ভয় পাইয়ে দিচ্ছেন আমাকে।'

'প্রথমেই ফরাসি আলোকপ্রাপ্তি (French Enlightenment) সম্পর্কে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যগুলো দেবো তোমাকে। এরপর নজর দেবো সংক্ষেপে কান্টের দর্শনের প্রধান প্রধান বিষয়গুলোর দিকে, যাতে করে রোমান্টিসিজমে যেতে পারি আমরা। এসবের মধ্যে হেগেল-ও একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে যোগ দেবেন। আর তাঁর সম্পর্কে আলাপ করতে গিয়ে অবশ্যম্ভাবীভাবে যা চলে আসবে তা হলো হেগেলীয় দর্শনের সঙ্গে কিয়ের্কেগার্ডের ক্রুদ্ধ এবং ভর্ৎসনামূলক সংঘর্ষের বিষয়টা। তারপর

সংক্ষেপে আলাপ করব আমরা মার্কস, ডারউইন আর ফ্রয়েডের কথা। তারপর সার্ত্রে আর অস্তিত্ববাদ সম্পর্কে শেষে কিছু মন্তব্য করতে পারলেই আমাদের পরিকল্পনাটা নিয়ে মাঠে নেমে পড়তে পারব আমরা।'

'এক সপ্তাহের জন্য বড্ড বেশি হয়ে গেল।'

'সেজন্যই এক্ষুণি শুরু করতে হবে আমাদের। এখনই চলে আসতে পারবে তুমি?'

কিন্তু আমাকে যে স্কুলে যেতে হবে। আমাদের ক্লাসের একটা গেট-টুগেদার আছে আজ, তারপর আমাদের গ্রেড দেয়া হবে।'

'বাদ দাও। আমরা যদি নিছক অলীক-ই হয়ে থাকি তাহলে ক্যান্ডি আর সোডার মজাটা নিখাদ কল্পনা ছাড়া অন্য কিছু নয়।'

'কিন্তু আমার গ্রেড...'

'সোফি, হয় তুমি বেশ কয়েকশ বিলিয়ন গ্যালাক্সির একটি গ্যালাক্সির ছোট্ট একটা গ্রহের এক আশ্চর্য বিশ্বে বাস করছ আর নয়ত তুমি মেজরের মনে গুটিকয়েক ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক অভিঘাতের ফল মাত্র। অথচ তুমি কিনা বলছ গ্রেডের কথা! নিজের ওপর লজ্জা হওয়া উচিত তোমার!'

'দুঃখিত।'

'ঠিক আছে, আমাদের দেখা হওয়ার আগে তুমি বরং স্কুল থেকে ঘুরেই এসো। তোমার শেষ স্কুল-দিবসটায় তুমি যদি না যাও তাহলে সেটি হিল্ডার ওপর একটা খারাপ প্রভাব ফেলতে পারে। সম্ভবত ও তার জন্মদিনের দিনও স্কুলে যায়। তুমি তো জানোই, ও একটা পরী।'

'আমি তাহলে স্কুল থেকে সোজা চলে যাব।'

'মেজরের কেবিনে দেখা করতে পারি আমরা।'

'মেজরের কেবিন?'

...ক্লিক!

রিং বাইন্ডারটা নিজের কোলের ওপর গড়িয়ে পড়তে দিল হিল্ডা। বাবা ওর বিবেকে একটা খোঁচা দিয়েছেন এইখানটায়-সে তার স্কুলের শেষ দিনটা কামাই করেছে। বড্ড পচা হয়েছে বাবাটা!

অ্যালবার্টো কী ফন্দি আঁটছে তাই ভাবল সে খানিকক্ষণ বসে বসে, চট করে শেষ পাতাটায় একটা উঁকি মেরে দেখে নেবে নাকি? না, সেটি চুরি করা হয়ে যাবে। তারচেয়ে বরং তাড়াতাড়ি শেষ পর্যন্ত পড়াটাই ভালো হবে।

তবে সে নিশ্চিত যে গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়ে অ্যালবার্টো একদম ঠিক কথা বলেছেন। সোফি আর অ্যালবার্টোর বরাতে কী ঘটবে সে-সম্পর্কে তার বাবার একটা সার্বিক ধারণা আছে সে-কথা ঠিক। কিন্তু লেখার সময়, সম্ভবত, যা কিছু ঘটবে তার সবকিছু তাঁর জানা থাকে না। তাড়াহুড়োর সময় তিনি হয়ত কিছু একটা ভুলে যান, সেটি তার মনে পড়ে লেখার অনেক পরে। এরকম একটা পরিস্থিতিতে সোফি আর অ্যালবার্টোর খানিকটা অবসর জুটবে।

আরও একবার হিল্ডার প্রায় দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাল যে সোফি আর অ্যালবার্টো সত্যিই

আছে। স্টিল ওয়াটারস রান ডিপ, মনে মনে ভাবল হিল্ডা।

কথাটা মনে হলো কেন তার?

এ-ধরনের চিন্তা যে-কোনো সময় হয় না।

স্কুলে অনেক খাতির পেল সোফি আজ তার জন্মদিন বলে। গ্রীষ্মের বন্ধ, গ্রেড আর সোডার চিন্তায় স্কুলের শেষ দিনে সোফির ক্লাসের বন্ধুরা আজ এমনিতেই মহা উত্তেজিত ছিল। বন্ধের জন্য শুভকামনা জানিয়ে শিক্ষক ছুটি দিয়ে দিতেই দৌড়ে বাড়ি চলে এলো সোফি। জোয়ানা ওকে থামাতে চেয়েছিল কিন্তু সোফি ঘাড় ফিরিয়ে জানিয়ে দিল একটা কাজ আছে তার যা না করলেই নয়।

ডাকবাক্সে লেবানন থেকে আসা দুটো কার্ড পেল সে। দুটোই বার্থডে কার্ড : শুভ জন্মদিন-১৫ বছর। একটা কার্ড এসেছে 'হিল্ডা মোলার ন্যাগ, প্রযত্নে সোফি অ্যামুন্ডসেন...' এর কাছে। অন্যটা সোফির কাছে। দুটো কার্ডেই সীলমোহর দেয়া রয়েছে 'জাতিসংঘ বাহিনী-১৫ জুন।'

তার নিজের কার্ডটা আগে পড়ল সোফি

প্রিয় সোফি অ্যামুন্ডসেন, আজ তুমিও একটা কার্ড পাচ্ছো। শুভ জন্মদিন সোফি আর তাছাড়া, হিল্ডার জন্য তুমি যা কিছু করেছ সেজন্য অনেক ধন্যবাদ তোমাকে। বেস্ট রিগার্ডস, মেজর অ্যালবার্ট ন্যাগ।

হিল্ডার বাবা শেষ পর্যন্ত তার কাছেও চিঠি লিখেছেন, এতে সোফি ঠিক বুঝতে পারল না তার নিজের প্রতিক্রিয়াটা কী হবে।

হিল্ডার কার্ডে লেখা

প্রিয় হিল্ডা, লিলেস্যান্ডে এই মুহূর্তে কী বার বা কোন সময় সে বিষয়ে কোনো ধারণাই নেই আমার। তবে, আগেই তো বলেছি, তাতে খুব একটা কিছু আসে যায় না। আমি যদি তোকে চিনে থাকি তাহলে এখান থেকে তোকে শেষবারের মতো বা শেষবারের আগের বারের মতো শুভেচ্ছা জানাতে খুব দেরি করে ফেলিনি আমি। তবে খুব বেশি রাত জাগিস না কিন্তু! অ্যালবার্টো খুব শিগগিরই তোকে ফরাসি আলোকপ্রাপ্তি সম্পর্কে বলতে শুরু করবে। সাতটা পয়েন্টের ওপর জোর দেবে সে। সেগুলো হচ্ছে

১. কর্তৃপক্ষের বিরোধিতা।

২. বুদ্ধিবাদ।

৩. আলোকপ্রাপ্তি আন্দোলন।

৪. সাংস্কৃতিক আশাবাদ।

৫. প্রকৃতির কাছে প্রত্যাবর্তন।

৬. প্রাকৃতিক ধর্ম।

৭. মানবাধিকার।

মেজর যে এখনো তাদের ওপর নজর রাখছেন সেটি পরিষ্কার।

বাড়ির ভেতর ঢুকে সব 'এ' পাওয়া রিপোর্ট কার্ডটা রান্নাঘরের টেবিলের ওপর রেখে দিল সোফি, তারপর বেড়াটা গলে বেরিয়ে এসে ছুট লাগাল বনের ভেতর।

শিগগিরই নৌকো বেয়ে ছোট্ট লেকটা পাড়ি দিতে দেখা গেল তাকে।

কেবিনে পৌঁছে সে দেখল দোরগোড়ায় বসে আছেন অ্যালবার্টো। তাকে পাশে বসার আমন্ত্রণ জানালেন তিনি। লেকটা থেকে ভেজা টাটকা বাতাসের হালকা একটা কুয়াশা যদিও ভেসে আসছে তারপরেও আবহাওয়াটা চমৎকারই বলতে হবে। যেন ঝড়টার প্রভাব এখনো পুরোপুরি কাটিয়ে উঠতে পারেনি সেটি।

'চলো শুরু করা যাক, দেরি না করে,' অ্যালবার্টো বললেন।

'হিউম-উত্তর পরবর্তী মহান দার্শনিক হলেন জার্মান ইমানুয়েল কান্ট। অবশ্য অষ্টাদশ শতকে ফ্রান্সেও অনেক গুরুত্বপূর্ণ চিন্তাবিদ ছিলেন। আমরা বলতে পারি, অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধে ইউরোপের দার্শনিক ভরকেন্দ্র ছিল ইংল্যান্ডে, মাঝামাঝি সময়ে ফ্রান্সে আর শেষের দিকে জার্মানিতে।'

'অন্য কথায় বলতে গেলে, পশ্চিম থেকে পূর্বে স্থানান্তর।'

'ঠিক বলেছ। তো, এখন, ফরাসি আলোকপ্রাপ্তির সময়কার দার্শনিকেরা যে-সব ধারণা পোষণ করতেন সেগুলো সংক্ষেপে বলে নিই তোমাকে। গুরুত্বপূর্ণ নামগুলো হলো মঁতেস্কু, *ভলতেয়ার* (Voltaire) আর *রুশো* (Rousseau), অবশ্য এছাড়া আরও অনেকেই রয়েছেন। আমি এখন সাতটা পয়েন্টের ওপর আলোকপাত করছি।'

'ধন্যবাদ, জানি আমি ওগুলোর কথা, যদিও খুব সুখের সঙ্গে নয়।' হিল্ডার বাবার পাঠানো কার্ডটা তাঁর হাতে ধরিয়ে দিল সোফি। গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন অ্যালবার্টো। 'কষ্টটা সে না করলেও পারতো; সে যাই হোক, তাহলে প্রথম জরুরি প্রসঙ্গটি হলো *কর্তৃপক্ষের বিরোধিতা*। ফরাসি আলোকপ্রাপ্তি যুগের অনেক দার্শনিকই ইংল্যান্ড ভ্রমণ করেছিলেন, অনেক দিক থেকেই দেশটা তাদের মাতৃভূমির চেয়ে উদার ছিল। তো, সেই সফরে গিয়ে তাঁরা ইংলিশ প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, বিশেষ করে নিউটন আর তাঁর বৈশ্বিক পদার্থবিদ্যার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। কিন্তু সেই সঙ্গে তাঁরা ব্রিটিশ দর্শনের প্রতিও আকৃষ্ট হন। বিশেষ করে লক আর তাঁর রাজনৈতিক দর্শনের প্রতি। ফ্রান্সে ফিরে গিয়ে ক্রমেই তাঁরা আরও বেশি বিরুদ্ধাচারণ করতে থাকেন কর্তৃপক্ষের। তাঁরা মনে করলেন, উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া সত্যগুলোর ব্যাপারে সন্দেহপ্রবণ থাকাটা নিতান্তই জরুরি আর এর পেছনে যে ধারণাটা ছিল তা হচ্ছে একজন মানুষকে অবশ্য তার প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর নিজেকেই খুঁজে নিতে হবে। এক্ষেত্রে দেকার্তের ঐতিহ্যটা ছিল খুবই অনুপ্রেরণামূলক।'

'তার কারণ তিনি সবকিছু একেবারে গোড়া থেকে শুরু করেছিলেন।'

'ঠিক তাই। কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধাচারণের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ছিল যাজক, রাজা আর অভিজাতবংশীয়দের ক্ষমতা। অষ্টাদশ শতাব্দীতে এই প্রতিষ্ঠানগুলো ইংল্যান্ডের চেয়ে ফ্রান্সে অনেক বেশি ক্ষমতাশালী ছিল।'

'এরপর এলো ফরাসি বিপ্লব।'

'হ্যাঁ, ১৭৮৯-তে। কিন্তু বিপ্লবী ধারণাগুলোর উদ্ভব হয়েছিল কিন্তু আরও অনেক

আগে। তো, এরপরের জরুরি প্রসঙ্গটি হচ্ছে *বুদ্ধিবাদ*।'

'আমি তো ভেবেছিলাম হিউম-ই সেটির ইতি টেনে দিয়েছিলেন।'

'হিউম-ই তো বেঁচে ছিলেন ১৭৭৬ পর্যন্ত। তার মানে, মঁতেস্কুর মৃত্যুর বিশ বছর পর আর ভলতেয়ার ও রুশোর মৃত্যুর দুই বছর আগে পর্যন্ত। কিন্তু এঁরা তিনজনেই ইংল্যান্ড ভ্রমণ করেছিলেন, তিন জনই পরিচিত ছিলেন লকের দর্শনের সঙ্গে। তোমার হয়ত মনে পড়বে লক তার অভিজ্ঞতাবাদে পুরোপুরি স্থির ছিলেন না। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, তিনি বিশ্বাস করতেন ঈশ্বরে বিশ্বাস এবং বিশেষ কিছু নৈতিক মানদণ্ড মানুষের প্রজ্ঞায় অন্তর্নিহিত থাকে। এই ধারণাটি-ও ফরাসি আলোক প্রাপ্তির মূলে রয়েছে।'

'আপনি এ-কথাও বলেছিলেন যে ফরাসিরা বরাবরই ব্রিটিশদের চেয়ে বেশি বুদ্ধিবাদী।'

'হ্যাঁ আর এই পার্থক্যটা তুমি সেই মধ্যযুগ থেকেই দেখতে পাবে। ব্রিটিশরা বলে 'কাণ্ডজ্ঞান'-এর কথা, ওদিকে ফরাসিরা সাধারণত বলে 'সুস্পষ্টতা'-র কথা। ইংলিশ অভিব্যক্তিটার অর্থ 'যা প্রত্যেকে জানে', ফরাসিটার, কারও যুক্তি বা প্রজ্ঞার কাছে 'যা সুস্পষ্ট' তাই।'

'বুঝতে পেরেছি।'

'সক্রেটিস আর স্টোয়িকদের মতো প্রাচীনকালের মানবতাবাদীরা যেমন, ঠিক তেমনি আলোকপ্রাপ্তির বেশিরভাগ দার্শনিকই ছিলেন মানুষের প্রজ্ঞার ওপর প্রবল আস্থাবান। বিষয়টি এতোই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ যে ফরাসি আলোকপ্রাপ্তিকে প্রায়ই 'প্রজ্ঞার যুগ' (Age of Reason)-ও বলা হয়ে থাকে। নব্য প্রাকৃতিক বিজ্ঞানও এটা দেখিয়ে দিয়েছিল যে প্রকৃতি প্রজ্ঞার অধীন। এবার আলোকপ্রাপ্তি যুগের দার্শনিকেরা মানুষের অপরিবর্তনীয় প্রজ্ঞা অনুযায়ী নীতি, ধর্ম আর নীতিশাস্ত্রের ভিত্তিমূল রচনা করাকে তাঁদের কর্তব্য জ্ঞান করলেন। এরই ফলে সৃষ্টি হলো *আলোকপ্রাপ্তি আন্দোলন*।

'তৃতীয় প্রসঙ্গটা।'

'সেটিই ছিল জনসাধারণ-কে 'আলোকপ্রাপ্ত' করার প্রারম্ভিক সময়। আরও ভালো একটা সমাজ তৈরির ভিত্তি হবে সেটিই। মানুষ মনে করতো দারিদ্র্য আর উৎপীড়ন অজ্ঞতা আর কুসংস্কারের কুফল। তাই শিশু এবং জনসাধারণের শিক্ষার ওপর মনোযোগ দেয়া হলো বেশি করে। আলোকপ্রাপ্তির সময়ই যে শিক্ষা বিজ্ঞান (pedagogy)-এর সূত্রপাত ঘটেছিল এটা নেহাত কাকতালীয় ঘটনা নয়।

'তার মানে স্কুলের শুরু মধ্যযুগে আর শিক্ষা বিজ্ঞান আলোকপ্রাপ্তি-র সময়।

'তা তুমি বলতে পারো। আলোকপ্রাপ্তি আন্দোলনের সবচেয়ে বড় স্মারক তাই অতি স্বভাবতই এক বিশাল বিশ্বকোষ। ১৭৫১ থেকে ১৭৭২-এর মধ্যে প্রকাশিত ২৮ ভল্যুমের বিশ্বকোষের কথা বলছি আমি। বড় বড় সমস্ত দার্শনিক আর বিদ্বান ব্যক্তি মিলে রচনা করেছিলেন বিশ্বকোষটা। বলা হলো, 'সব কিছুই পাওয়া যাবে ওখানে, সুচ বানাবার উপায় থেকে কামান তৈরির পদ্ধতি পর্যন্ত।'

'এর পরের পয়েন্টটা হলো *সাংস্কৃতিক আশাবাদ*,' সোফি বলল।

'আমরা কথা বলার সময় কার্ডটা দয়া করে সরিয়ে রাখলে উপকৃত হতাম।'

'দুঃখিত।'

'আলোকপ্রাপ্তি যুগের দার্শনিকরা ভেবেছিলেন প্রজ্ঞা আর জ্ঞান বিপুলভাবে বিস্তার লাভ করলে মানবজাতির শনৈ শনৈ উন্নতি ঘটবে। অ-বুদ্ধিবাদ আর অজ্ঞতা অপসারিত হয়ে এক 'আলোকপ্রাপ্ত' মানবজাতির উদ্ভব হওয়াটা নেহাতই সময়ের ব্যাপার। এই গত কয়েক দশক আগ পর্যন্ত-ও এটাই ছিল পশ্চিম ইউরোপে সবচেয়ে প্রভাব বিস্তারকারী চিন্তা। ইদানীং আমরা আর অতোটা নিশ্চিত নই যে সব 'উন্নতি'-ই ভালোর জন্য।

'কিন্তু 'সভ্যতার' এই সমালোচনা এরই মধ্যে আলোকপ্রাপ্ত যুগের দার্শনিকদের মুখে শোনা গিয়েছিল।'

'তাদের কথা শোনাই হয়ত ভালো ছিল আমাদের।'

'কারও কারও কাছে সার্বক্ষণিক বুলি হয়ে দাঁড়ায় *ফিরে চলো প্রকৃতির কাছে*। কিন্তু আলোকপ্রাপ্ত যুগের দার্শনিকদের কাছে 'প্রকৃতি' আর 'প্রজ্ঞা' ছিল প্রায় সমার্থক, কারণ, মানুষের প্রজ্ঞা প্রকৃতিরই দান, 'ধর্ম' বা 'সভ্যতার' নয়। মন্তব্য করা হলো যে তথাকথিত আদিম মানুষেরা ইউরোপীয়দের চেয়ে স্বাস্থ্যবান আর সুখী হয় প্রায়ই আর তার কারণ হচ্ছে, বলা হলো, তারা 'সভ্য' হয়নি। রুশো-ই চালু করলেন কথাটা, 'প্রকৃতির কাছে ফিরে যাওয়া উচিত আমাদের'। কারণ প্রকৃতি ভালো আর মানুষ 'প্রকৃতিগতভাবে' ভালো; সভ্যতাই মানুষকে ধ্বংস করে। রুশো আরও বিশ্বাস করতেন যে যদ্দিন সম্ভব তদ্দিন একটি শিশুকে তার 'প্রকৃতিগত' সরল অবস্থায় থাকতে দেয়া উচিত। এ-কথা বললে ভুল বলা হবে না যে শৈশবের স্বকীয় (intrinsic) মূল্যের বিষয়টি গুরুত্ব পেতে শুরু করেছে আলোকপ্রাপ্তির সময় থেকেই। তার আগে শৈশবকে দেখা হতো স্রেফ বয়ঃপ্রাপ্ত অবস্থার প্রস্তুতি হিসেবে। কিন্তু আমরা সবাই-ই মানুষ আর পৃথিবীতে আমরা আমাদের জীবন কাটাই, তা আমরা যখন শিশু তখন-ও।'

'আমারও তো ঐ একই মত।'

'তাঁরা মনে করতেন ধর্মকেও প্রাকৃতিক হতে হবে।'

'ঠিক কী বোঝাতে চেয়েছিলেন তারা?'

'তাঁরা বোঝাতে চেয়েছিলেন যে ধর্মকেও 'প্রাকৃতিক' প্রজ্ঞার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ করতে হবে। যাকে বলা যেতে পারে *প্রাকৃতিক ধর্ম* সেই জিনিসটির জন্য অনেকেই সংগ্রাম করেছেন আর ওটাই আমাদের তালিকার ছ'নম্বর প্রসঙ্গ। অসংখ্য ঘোর বস্তুবাদী ছিলেন তখন যারা ঈশ্বরে বিশ্বাস করতেন না; নাস্তিক্যবাদের প্রবক্তা ছিলেন তাঁরা। কিন্তু আলোকপ্রাপ্ত যুগের দার্শনিকদের বেশিরভাগই ঈশ্বরহীন জগতের কল্পনাকে অযৌক্তিক বলে মনে করতেন। ঈশ্বরহীন জগৎ যুক্তির পক্ষে বড্ড বেশি হয়ে যায়। নিউটনের মতও ছিল তাই। আত্মার অমরত্বে বিশ্বাস করাকেও যৌক্তিক বলেই মনে করা হতো। মানুষ অমর আত্মার অধিকারী কিনা সে-প্রশ্নকে বিশ্বাসের চেয়ে প্রজ্ঞা-সংক্রান্ত বলেই মনে করা হতো বেশি, ঠিক যেমন দেকার্ত মনে করতেন।'

'এটা অবশ্য আমার কাছে অদ্ভুত বলে মনে হচ্ছে। আমার ধারণা, এটা একান্তই বিশ্বাস-সংক্রান্ত, মোটেই প্রজ্ঞা-সংক্রান্ত নয়।'

'তার কারণ তুমি অষ্টাদশ শতাব্দীর বাসিন্দা নও। আলোকপ্রাপ্ত যুগের

দার্শনিকদের মতে ধর্মের যা দরকার ছিল তা হচ্ছে যিশুর সহজ সরল শিক্ষার সঙ্গে যাজকীয় ইতিহাসের গতিপথে যে-সব অযৌক্তিক ধর্মগত বা মতবাদ যুক্ত হয়ে গিয়েছিল সে-সব থেকে ধর্মকে মুক্ত করা।'

'বুঝেছি।'

'ফলে অনেকেই হয়ে উঠলেন যাকে বলে *ঈশ্বরবাদ*-এর (Deism) প্রবক্তা।'

'সেটি কী?'

'ঈশ্বরবাদ বলতে এই বিশ্বাস বোঝায় যে ঈশ্বর বহু যুগ আগে এই জগৎ সৃষ্টি করেছেন বটে কিন্তু কখনোই নিজের প্রকাশ ঘটাননি সেটির কাছে। এভাবে ঈশ্বর সংকুচিত হয়ে পড়েছেন এক 'পরম সত্তা'-য় (Supreme Being), যে-সত্তা প্রকৃতি আর প্রাকৃতিক নিয়মের মধ্য দিয়েই নিজের প্রকাশ ঘটায় মানুষের কাছে। কোনো অতিপ্রাকৃত পদ্ধতিতে নয়। একই রকম এক 'দার্শনিক ঈশ্বর'-কে পাই আমরা অ্যারিস্টটলের লেখায়। তাঁর কাছে ঈশ্বর ছিলেন 'আকারগত কারণ' (formal cause) বা 'আদি চালক' (first mover)।'

'তাহলে বাকি থাকছে আর মাত্র একটা প্রসঙ্গ, *মানবাধিকার*।'

'তারপরেও, সম্ভবত এটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। মোটের ওপর তুমি এ-কথা বলতে পারো যে ফরাসি আলোকপ্রাপ্তি ইংরেজ দর্শনের চেয়ে বেশি বাস্তবপন্থী।'

'তার মানে আপনি বলতে চান তাঁরা তাঁদের দর্শন অনুযায়ী জীবনযাপন করতেন?'

'হ্যাঁ, অনেকটা তাই। ফরাসি আলোকপ্রাপ্ত যুগের দার্শনিকেরা সমাজে মানুষের অবস্থানের স্রেফ তাত্ত্বিক দিকটি নিয়েই আত্মতৃপ্ত থাকেননি। সক্রিয়ভাবে সংগ্রাম করেছেন তাঁরা, তাঁদের ভাষায়, নাগরিকদের 'প্রাকৃতিক অধিকার' প্রতিষ্ঠায়। গোড়ার দিকে এটা রূপ নিয়েছিল সেন্সরশিপের বিরুদ্ধে—সংবাদমাধ্যমের পক্ষে—একটা আন্দোলনের। কিন্তু ধর্ম, নৈতিকতা আর রাজনীতির ক্ষেত্রেও ব্যক্তির চিন্তা এবং বাক্‌-স্বাধীনতা রক্ষা করা জরুরি ছিল। তাঁরা দাসত্ব বিলোপ আর অপরাধীদের প্রতি আরও মানবিক আচরণের জন্যেও সংগ্রাম করেছিলেন।'

'আমি বোধকরি এসবের বেশির ভাগের সঙ্গেই একমত।'

'১৭৮৯ সালে ফরাসি জাতীয় সংসদে গৃহীত 'মানুষ এবং নাগরিকবৃন্দের অধিকারের ঘোষণা'-য় 'ব্যক্তির অলঙ্ঘনীয়তার' (inviolability of the individual) নীতিটি চূড়ান্ত রূপ পায়। 'মানবাধিকারের ঘোষণা'-ই আমাদের নরওয়েজীয় সংবিধান ১৮১৪-র মূল ভিত্তি।'

'কিন্তু এখনো তো অনেক মানুষকে তাদের অধিকার আদায়ের জন্য যুদ্ধ করতে হচ্ছে।'

'হ্যাঁ, দুঃখের সঙ্গে। কিন্তু আলোকপ্রাপ্ত যুগের দার্শনিকেরা এমন কিছু অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন প্রত্যেকেই যার অধিকারী হবে স্রেফ জন্মসূত্রেই। প্রাকৃতিক অধিকার বলতে সে-কথাই বুঝিয়েছিলেন তারা।

'এখনো আমরা এমন কিছু প্রাকৃতিক অধিকারের কথা বলি যার সঙ্গে প্রায়ই কোনো না কোনো ভূখণ্ডের আইনের দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। আর আমরা প্রায়ই দেখে থাকি যে ব্যক্তি বা এমনকি গোটা জাতিই নৈরাজ্য, পরাধীনতা আর উৎপীড়নের বিরুদ্ধে

বিদ্রোহ করার সময় তাদের 'প্রাকৃতিক অধিকার' দাবি করছে।'

'আর নারী অধিকারের কী খবর?'

'১৭৮৭-র ফরাসি বিপ্লব সব 'নাগরিক'-এর জন্য বেশ কিছু অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছিল। কিন্তু নাগরিক বলতে প্রায় সব সময়ই পুরুষকে বোঝাতো। তারপরেও ফরাসি বিপ্লবই আমাদেরকে নারীবাদের (feminism) প্রথম আভাস দিয়েছিল।'

'সে-সময় প্রায় হয়ে এসেছিল!'

'১৭৮৭-র দিকেই আলোকপ্রাপ্তি যুগের দার্শনিক কনডর্সেট (Condorce) নারী অধিকার সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। সেই ভদ্রলোক মত প্রকাশ করেন যে নারীরও পুরুষের সমান 'প্রাকৃতিক অধিকার' রয়েছে। ১৭৮৯-এর বিপ্লবের সময় পুরনো সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে যুদ্ধে নারীরা অত্যন্ত সক্রিয় ভূমিকা রেখেছিলেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, যে বিক্ষোভ মিছিলের কারণে রাজা তার ভার্সাই-এর প্রাসাদ ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন তাতে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন নারীরাই। প্যারিসে গঠন করা হয়েছিল নারীদের দল বা সংগঠন। পুরুষের সমান রাজনৈতিক অধিকারের দাবির পাশাপাশি তারা বিবাহ আইন আর নারীর সামাজিক অবস্থা পরিবর্তনেরও দাবি জানিয়েছিলেন।'

'সমান অধিকার কি তারা পেয়েছিলেন?'

'না, পরবর্তী আরও অনেক ঘটনার মতো নারীর অধিকারের বিষয়টিকেও সংগ্রামের সেই উত্তপ্ত পরিস্থিতিতে কাজে লাগানো হয়েছিল, কিন্তু নতুন সরকারের আমলে সবকিছু ফের ঠিকঠাক হয়ে গেলে পুরনো সেই পুরুষ শাসিত সমাজই চালু করা হলো আবার।'

'বরাবরই যা হয় আর কী।'

'ফরাসি বিপ্লবের সময় নারী অধিকারের প্রশ্নে যাঁরা মরিয়া হয়ে লড়াই করেছিলেন তাঁদের একজন হলেন *অলিম্পে ডি গগস্* (Olympe de Gouges)। ১৭৯১ সালে-বিপ্লবের দু'বছর পর-নারী অধিকারের ওপর একটি ঘোষণা প্রকাশ করেন সেই মহিলা। নাগরিকদের অধিকারের ঘোষণায় নারীর প্রাকৃতিক অধিকার সম্পর্কে কোনো কথা-ই ছিল না। অলিম্পে ডি গগস্ এবার পুরুষের সমান অধিকারের দাবি তুললেন নারীর জন্য।'

'কী ঘটল শেষে?'

'১৭৯৩-এ তার গর্দান নেয়া হলো। সেই সঙ্গে নারীর জন্য নিষিদ্ধ ঘোষিত হলো সব ধরনের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড।'

'কী লজ্জাজনক।'

'শুধু ফ্রান্সেই নয়, ইউরোপের বাকি সমস্ত অংশেই উনবিংশ শতাব্দীর আগ পর্যন্ত নারীবাদ বিকাশ লাভ করতে পারেনি। একটু একটু করে ফল দিতে শুরু করল এই সংগ্রাম। এই নরওয়েতেও ১৯১৩-র আগে মেয়েরা ভোটের অধিকার পায়নি। আর পৃথিবীর অনেক জায়গাতেই নারীদের এখনো অনেক কিছুর জন্য সংগ্রাম করতে হবে।'

'তারা আমার সমর্থনের জন্য ভরসা করতে পারে।'

লেকটার দিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণ বসে রইলেন অ্যালবার্টো। এক কী দুই মিনিট

পর বলে উঠলেন আলোকপ্রাপ্তি সম্পর্কে আমি যা বলতে চেয়েছিলাম তা মোটামুটি এই-ই।'

'মোটামুটি বলতে কী বোঝাতে চাইছেন?'

'আমার মনে হচ্ছে আর কিছু বলার নেই।'

কিন্তু তিনি কথাটা বলতে বলতে লেকের মাঝখানে কিছু একটা ঘটতে শুরু করল। পানির মধ্যে কীসের যেন বুদবুদ উঠতে লাগল। তারপর বিশাল আর কুৎসিত-দর্শন একটা প্রাণী মাথা তুলল ভেতর থেকে।

'সামুদ্রিক সাপ!' বলে চেঁচিয়ে উঠল সোফি।

কালো দানবটা শরীর আঁকিয়ে-বাঁকিয়ে বার কয়েক সামন-পেছন করে ফের মিলিয়ে গেল জলের অতলে। আগের মতোই শান্ত হয়ে এলো লেকের পানি।

অ্যালবার্টো এরই মধ্যে ঘুরে দাঁড়িয়েছিলেন।

'এবার ভেতরে যাবো আমরা,' বললেন তিনি।

ছোট্ট কুঁড়েটার ভেতর ঢুকল দু'জন।

বার্কলে আর বিয়ার্কলের ছবি দুটোর সামনে দাঁড়িয়ে ও-দুটোর দিকে তাকিয়ে রইল সোফি। বিয়ার্কলের ছবিটা দেখিয়ে সে বলে উঠল

'আমার মনে হয় ছবিটার ভেতরেই কোথাও থাকে হিল্ডা।'

ছবি দুটোর মাঝখানে একটা সূচিশিল্পের নমুনা ঝুলছে এখন। তাতে লেখা : *মুক্তি, সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব*।

অ্যালবার্টোর দিকে ফিরল সোফি 'ওটা কি আপনি ঝুলিয়েছেন?'

একেবারে হতাশ একটা ভঙ্গিতে স্রেফ মাথা ঝাঁকালেন তিনি। তখনই ম্যান্টেলপিসের ওপর একটা খাম আবিষ্কার করল সোফি। তাতে লেখা 'প্রতি, হিল্ডা এবং সোফি।' চিঠিটা কার কাছ থেকে এসেছে সে-কথা বুঝতে একটুও দেরি হলো না সোফির, তবে মেজর যে তাকেও ইদানীং হিসেবের মধ্যে ধরছে এটা একটা নতুন ঘটনা।

চিঠিটা খুলে জোরে জোরে পড়তে শুরু করল সে

> প্রিয় দু'জন, যে আদর্শ এবং নীতিকে ভিত্তি করে জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠিত তার ওপর ফরাসি আলোকপ্রাপ্তির ভূমিকা বা গুরুত্ব কতখানি সে-কথা সোফির দর্শন শিক্ষকের বুঝিয়ে বলা উচিত ছিল। 'মুক্তি সাম্য এবং ভ্রাতৃত্ব', এই স্লোগান দুশো বছর আগে ফরাসি জনগণকে ঐক্যবদ্ধ হতে সাহায্য করেছিল, আজ এই একই কথায় গোটা বিশ্বের মানুষের ঐক্যবদ্ধ হওয়া উচিত। মানুষের এক বিশাল পরিবার সৃষ্টি হওয়াটা আজ যতটা জরুরি এমনটা আর কখনোই ছিল না। আমাদের উত্তরসূরিরা আমাদেরই সন্তান-সন্ততি। আমাদের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে কেমন বিশ্ব পাচ্ছে তারা?

নিচতলা থেকে হিল্ডার মা চেঁচিয়ে বলছিলেন মিস্ত্রিটা দশ মিনিটের মধ্যেই শুরু হচ্ছে আর তিনি পিৎসাটা আভ্‌ন-এ দিয়েছেন। এতোক্ষণে এতো কিছু পড়ে রীতিমতো ক্লান্ত

হয়ে পড়েছে হিল্ডা। সেই সকাল ছ'টায় উঠেছে সে।

সে ঠিক করল সন্ধ্যার বাকি সময়টা সে তার মায়ের সঙ্গে নিজের জন্মদিন উদযাপন করে কাটাবে। কিন্তু তার আগে বিশ্বকোষে একটা জিনিস খুঁজে বের করতে হবে তাকে। Gouges ...উঁহু, নেই। De Gouges? এবারো নেই। Olympe de Gouges? তা-ও কিছু নেই। যে-নারীর গর্দান গিয়েছে তাঁর রাজনৈতিক দায়বদ্ধতার কারণে, তাঁর সম্পর্কে এই বিশ্বকোষে এক অক্ষরও লেখা নেই। এটা কি ন্যক্কারজনক নয়?

উনি নিশ্চয়ই এমন কেউ ছিলেন না যাঁকে হিল্ডার বাবা মন থেকে গড়েছেন? নিচতলায় ছুটে এলো হিল্ডা আরও বড় একটা বিশ্বকোষের জন্য।

তার বিস্মিত মা-কে সে বলল, 'একটা জিনিস শুধু খুঁজে বের করতে হবে আমাকে।'

বড়, পারিবারিক বিশ্বকোষটার এফওআরভি থেকে জিপি ভল্যুমটা নিয়ে ফের নিজের ঘরে চলে এলো সে এক দৌড়ে।

Gouges... এই তো আছে!

> Gouges, Marie Olympe (১৭৪৮-১৭৯৩), ফরাসি লেখক। সামাজিক প্রসঙ্গে অসংখ্য ব্রোশিওর এবং নাটক লিখে ফরাসি বিপ্লবের সময় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। গুটিকয়েক যে-ক'জন মানবাধিকারকে নারীর জন্যও প্রযোজ্য করার প্রচারণায় নেমেছিলেন তাঁদের অন্যতম। ১৭৯১-এ প্রকাশ করেন তাঁর নারী অধিকার বিষয়ক ঘোষণা'। ষোড়শ লুইকে সমর্থন এবং রোবস্‌পীয়র-এর বিরোধিতা করার স্পর্ধার কারণে ১৭৯৩-এ তাঁর গর্দান নেয়া হয় (লিট এল. লেকার, 'লেস অরিজিনেস দু ফেমিনিজমে কন্টেম্পোরেইন,' ১৯০০)

কা ন্ট

চওঁ

...আমার ওপরের তারাভরা আকাশ আর আমার ভেতরের নৈতিক নিয়ম...

হিল্ডাকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানাতে প্রায় মাঝরাতে বাড়িতে ফোন করলেন মেজর অ্যালবার্টো ন্যাগ। হিল্ডার মা ধরলেন ফোনটা।

'তোর ফোন, হিল্ডা!'

'হ্যালো?'

'বাবা বলছি।'

'তোমার কি মাথা খারাপ? এখন প্রায় মাঝরাত।'

'আমি স্রেফ তোকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানাতে চেয়েছিলাম।'

'তা তো তুমি দিনভরই করছ।'

কিন্তু আমি ঠিক দিন শেষ হওয়ার আগে ফোন করতে চাইনি।'

'কেন?'

'তুই আমার উপহারটা পাসনি?'

'হ্যাঁ, পেয়েছি তো। অনেক ধন্যবাদ তোমাকে, বাবা।'

'ওটা তোর কেমন লাগল জানার জন্য অস্থির হয়ে আছি আমি।'

'দারুণ। এত্তো এক্সসাইটিং যে আজ সারাদিন আমি কিছু খাইনি বললেই চলে।'

'তুই কদ্দূর গেছিস সেটি জানতে হবে আমাকে।'

'একটা সামুদ্রিক সাপ দিয়ে তুমি ওদের জ্বালাতন করাতে ওরা এই মাত্র মেজরের কেবিনে ঢুকে পড়ল।'

'আলোকপ্রাপ্তি।'

'আর অলিম্পে ডি গগস্‌ ।'

'তার মানে পুরোপুরি ভুল হয়নি।'

'কীসের ভুল?'

'আমার মনে হয় জন্মদিনের আরও একটা শুভেচ্ছা এখনো বাকি আছে। তবে সেটি সঙ্গীত সহযোগে।'

'ঘুমোতে যাওয়ার আগে আমি বরং আরেকটু পড়ে নিই।'

'তুই তাহলে পড়ছিস এখনো।'

'এই একদিনে যা শিখেছি তা এতোদিনে শিখিনি আমি।' আমার এখনো বিশ্বাসই

হচ্ছে না যে স্কুল থেকে বাড়ি ফিরে সোফি প্রথম খামটা পাওয়ার পর চব্বিশ ঘণ্টাও পেরোয়নি।'

'ব্যাপারটা খুব অদ্ভুত যে পড়তে কত কম সময় লাগে।'

'তবে আমার কিন্তু খুব দুঃখ হচ্ছে বেচারির জন্য।'

'কার জন্য? তোর মা-র?'

'না, না, সোফির জন্য।'

'কেন বলতো?'

'বেচারি একেবারে কনফিউজ্‌ড হয়ে পড়েছে।'

'কিন্তু ও তো স্রেফ...'

'কল্পনা, এই তো বলবে?'

'হ্যাঁ, ও-রকমই তো খানিকটা।'

'আমার কী মনে হয় জানো, সোফি আর অ্যালবার্টো দু'জনই *বাস্তব*।'

'আমি বাড়ি ফিরি, তখন এ-নিয়ে আরও কথা হবে।'

'ঠিক আছে।'

'হ্যাভ এ নাইস ডে।'

'কী?'

'আই মিন, গুড নাইট।'

'গুড নাইট।'

আধ ঘণ্টা পর হিল্ডা যখন বিছানায় গেল তখন এতো আলো চারদিকে যে বাগান আর ছোট্ট উপসাগরটা দিব্যি দেখতে পাচ্ছিল সে। বছরের এই সময়টাতে আসলে কখনোই পুরোপুরি অন্ধকার হয় না।

বনের ভেতরের ছোট্ট কেবিনের দেয়ালে ঝুলে থাকা ছবির ভেতর রয়েছে সে, এই চিন্তাটা খানিকক্ষণ খেলে বেড়াল হিল্ডার মনে। সে ভাবল ছবির ভেতর থেকে মাথা বাড়িয়ে উঁকি মেরে সেটির চারদিকে কী আছে তা দেখে নেয়া যায় কিনা।

ঘুমিয়ে পড়ার আগে বিশাল রিং বাইন্ডারটার আরও কিছু পাতা পড়ে ফেলল সে।

হিল্ডার বাবার চিঠিটা আবার ম্যান্টেলের ওপর রেখে দিল সোফি।

'জাতিসংঘ সম্পর্কে সে যা বলেছে সেটি গুরুত্বপূর্ণ নয় তা বলছি না,' অ্যালবার্টো বললেন। 'তবে আমার উপস্থাপনার মধ্যে তার নাক গলানোটা পছন্দ নয় আমার।'

'আমার মনে হয় এ নিয়ে আপনার বেশি চিন্তা করা উচিত হবে না।'

'তারপরেও, এখন থেকে আমি এ-সব সামুদ্রিক সাপ বা এ-রকম অন্য কোনো ঘটনা গ্রাহ্যের মধ্যে আনব না বলে ঠিক করেছি। চলো, এই জানালার পাশে বসে আমরা কান্টের কথা আলাপ করি।'

সোফি খেয়াল করল দুই আর্ম চেয়ারের মাঝখানের ছোট্ট টেবিলটার ওপর এক জোড়া চশমা রাখা আছে। সে আরও খেয়াল করল, ওটার লেন্স লাল রঙের।

হয়ত খুব শক্তিশালী চশমা...

'প্রায় দুটো বাজে এখন। পাঁচটার মধ্যে বাড়ি ফিরতে হবে আমাকে। আমার

জন্মদিন নিয়ে মায়ের বোধকরি কিছু প্ল্যান আছে।'

'তার মানে হাতে তিন ঘণ্টা সময় আছে আমাদের।'

'তাহলে শুরু করা যাক।'

'*ইমানুয়েল কান্টের* (Immanuel Kant) জন্ম ১৭২৪ খ্রিস্টাব্দে, পূর্ব প্রুশিয়ার ছোট্ট শহর কনিসবার্গে। তাঁর বাবা ছিলেন ঘোড়ার জিন প্রস্তুতকারী হিসেবে খুবই দক্ষ। আশি বছর বয়সে মারা যাওয়ার আগ পর্যন্ত কান্ট কনিসবার্গ শহরেই বাস করেছেন প্রায় সারা জীবন। অত্যন্ত ধার্মিক ছিলেন তাঁর পরিবারের লোকজন আর কান্টের নিজের ধর্মীয় বিশ্বাস তাঁর দর্শনের ওপর গভীর প্রভাব ফেলেছিল। বার্কলের মতো তিনিও খ্রিস্টীয় বিশ্বাসের ভিত্তিমূল সংরক্ষণ করাকে অত্যন্ত জরুরি বলে মনে করতেন।'

'বার্কলে সম্পর্কে মেলা কথা শুনেছি আমি, ধন্যবাদ।'

'বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শন পড়িয়েছেন এ-রকম যে-ক'জন দার্শনিকের কথা আমরা জানি, কান্ট তাঁদের মধ্যে প্রথম। দর্শনের অধ্যাপক ছিলেন তিনি।'

'অধ্যাপক?'

'জগতে দু'ধরনের দার্শনিক আছেন। প্রথমত আছেন তাঁরা যাঁরা তাঁদের নিজেদের দর্শনগত প্রশ্নের নিজস্ব উত্তর খোঁজেন আর অন্যদিকে আরেক ধরনের দার্শনিক আছেন যাঁরা দর্শনের ইতিহাস সম্পর্কে পণ্ডিত হলেও আবশ্যিকভাবে নিজের কোনো দর্শন সৃষ্টি করেন না।'

'তা, কান্ট কোন দলের ছিলেন?'

'কান্ট ছিলেন দু'দলেরই। তিনি যদি কেবল একজন তুখোড় অধ্যাপক আর অন্যান্য দার্শনিকের দর্শন সম্পর্কে পণ্ডিত হতেন তাহলে তিনি কখনোই দর্শনের ইতিহাসে নিজের জায়গা করে নিতে পারতেন না। তবে এ-কথাটা মনে রাখা জরুরি যে অতীতের দার্শনিক ঐতিহ্য সম্পর্কে অত্যন্ত শক্ত একটা ভিতের অধিকারী ছিলেন কান্ট। দেকার্ত আর স্পিনোজার বুদ্ধিবাদ, অন্যদিকে লক, বার্কলে আর হিউমের অভিজ্ঞতাবাদ, এই দুই সম্পর্কেই ভালোভাবে ওয়াকিবহাল ছিলেন তিনি।'

'বার্কলের কথা বারবার বলতে মানা করেছি আমি আপনাকে।'

'এ-কথাটা মনে রাখবে যে বুদ্ধিবাদীরা বিশ্বাস করতেন মানুষের সমস্ত জ্ঞানের ভিত্তি হচ্ছে মনের মধ্যে। আর অভিজ্ঞতাবাদীরা মনে করতেন জাগতিক সমস্ত জ্ঞান আসে ইন্দ্রিয়গুলো থেকে। তাছাড়া, হিউম দেখিয়েছেন যে আমাদের ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষণের সাহায্যে আমরা কোন কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে পারি সে-ব্যাপারে স্পষ্ট সীমারেখা রয়েছে।'

'তা, কান্ট কাদের সঙ্গে একমত প্রকাশ করেছেন?'

'তাঁর ধারণা, দুটো দৃষ্টিভঙ্গি-ই আংশিক সঠিক, কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি এ-ও মনে করতেন যে দু'দলই কিছুটা ভুল করেছেন। প্রত্যেকেই যে-প্রশ্নটি নিয়ে চিন্তিত ছিলেন তা হচ্ছে জগতের কী কী জিনিস আমরা জানতে পারি। দেকার্তের পর থেকে সমস্ত দার্শনিকই ব্যস্ত ছিলেন এই দার্শনিক প্রকল্পটি নিয়ে। 'দুটো প্রধান সম্ভাবনার কথা ভাবা হলো হয় জগৎটা ঠিক সে-রকমই যেভাবে আমরা সেটিকে প্রত্যক্ষ করি আর নয়ত আমাদের প্রজ্ঞার কাছে সেটিকে যেমন বলে বোধ হয় সেটি ঠিক তেমন।'

'আর কান্ট কী মনে করতেন?'

'কান্ট মনে করতেন জগৎ সম্পর্কে আমাদের ধারণায় প্রত্যক্ষণ (sensing) আর প্রজ্ঞা দুটোরই ভূমিকা আছে। কিন্তু তিনি মনে করতেন এ-ব্যাপারে প্রজ্ঞা কতটুকু অবদান রাখতে পারে সে-সম্পর্কে বুদ্ধিবাদীরা বড্ড বেশি উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন। আবার, সেই সঙ্গে তিনি এ-ও মনে করতেন যে, অভিজ্ঞতাবাদীরা ইন্দ্রিয়গত অভিজ্ঞতার ওপর বড্ড বেশি গুরুত্বারোপ করে ফেলেছেন।'

'শিগ্‌গিরই একটা উদাহরণ না দিলে এগুলো স্রেফ কথার ফুলঝুরি হয়েই থাকবে আমার কাছে।

'গোড়াতে কান্ট, হিউম আর অভিজ্ঞতাবাদীদের সঙ্গে একমত প্রকাশ করেছেন যে জগৎ সম্পর্কে আমাদের যাবতীয় জ্ঞানের উৎস হচ্ছে আমাদের ইন্দ্রিয় সংবেদন। কিন্তু—আর এইখানে এসে কান্ট তাঁর হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন বুদ্ধিবাদীদের দিকে—আমাদের প্রজ্ঞাতে কিছু নিষ্পত্তিমূলক উপাদান-ও (decisive factor) রয়েছে যা নির্ধারণ করে দেয় আমরা আমাদের চারপাশের জগৎটাকে *কীভাবে* প্রত্যক্ষ করবো। অন্য কথায় বলতে গেলে, মানুষের মনে বিশেষ কিছু প্রতিবেশ (condition) রয়েছে যা জগৎ সম্পর্কে আমাদের ধারণা তৈরি হতে সাহায্য করে।'

'এটাকে আপনি উদাহরণ বলছেন?'

'চলো, ছোট্ট একটা পরীক্ষা করা যাক। টেবিলের ওপর থেকে ওই চশমা জোড়া নিয়ে আসবে একটু? ধন্যবাদ। এবার পরো ওটা।'

চশমাটা পরল সোফি, তার চারপাশের সমস্ত কিছু লাল হয়ে উঠল। পাণ্ডুর রঙগুলো গোলাপি হয়ে গেল আর গাঢ় রঙগুলো হয়ে গেল টকটকে লাল।

'কী দেখতে পাচ্ছ?'

'আগে যা দেখছিলাম ঠিক তাই-ই, তবে তফাৎটা হচ্ছে এখন সব কিছুই লাল হয়ে গেছে।'

'তার কারণ হচ্ছে, যেভাবে তুমি বাস্তবকে প্রত্যক্ষ করো সেটিকে ওই চশমাটা সীমাবদ্ধ করে দিচ্ছে। যা কিছু দেখছ তার সবই তোমার চারপাশের জগৎটারই অংশ, কিন্তু সেটিকে তুমি কীভাবে দেখছ সেটি নির্ধারণ করে দিচ্ছে তুমি যে-চশমাটা পরে আছো সেটি। কাজেই, যদিও জগৎটাকে তুমি লাল হিসেবে দেখতে পাচ্ছ, তারপরেও তুমি এ-কথা বলতে পারো না যে তা লাল।'

'বনের মধ্যে যদি এখন তুমি হাঁটতে যেতে বা 'ক্যাপ্টেনের বাঁকে' তোমাদের বাড়িতে যেতে তাহলে সবকিছু তুমি সে-রকমই দেখতে পেতে যেমনটা সব সময় স্বাভাবিকভাবে দেখো। কিন্তু যা-কিছু দেখতে তার সবই লাল দেখতে পেতে।'

'যতক্ষণ না চশমাটা খুলে নিতাম, হ্যাঁ, তা ঠিক।'

'কান্ট যখন বলেছিলেন যে মনের ক্রিয়াকলাপের ওপর খবরদারি করার বিশেষ কিছু প্রতিবেশ রয়েছে তখন তিনি ঠিক এ-কথাই বুঝিয়েছিলেন।'

'কোন ধরনের প্রতিবেশ?'

'যা কিছুই আমরা দেখি তা প্রথমত এবং প্রধানত *সময়* আর স্থানগত *ঘটনা* (phenomena) হিসেবে প্রত্যক্ষ করা হবে। 'সময়' আর 'স্থান'-কে কান্ট আমাদের

'স্বজ্ঞার দুই আকার' বা ধরন' বলে অভিহিত করেছেন। এবং তিনি জোর দিয়ে বলেছেন যে, এই দুই 'আকার বা ধরন' প্রতিটি অভিজ্ঞতার *পূর্ববর্তী* হিসেবে থাকে। অন্য কথায় বলতে গেলে, কোনো অভিজ্ঞতা হওয়ার আগেই আমরা এটা ধরে নিতে পারি যে সেগুলোকে আমরা সময় আর স্থানগত ঘটনা হিসেবে প্রত্যক্ষ করবো। কারণ, প্রজ্ঞার 'চশমা' আমরা খুলে নিতে অক্ষম।'

'তার মানে তিনি মনে করতেন ঘটনাকে সময় আর স্থানগতভাবে প্রত্যক্ষ করার ব্যাপারটি মানুষের সহজাত?'

'হ্যাঁ, এক অর্থে তাই। আমরা *কী* দেখছি তা আমরা ভারত না গ্রীনল্যান্ডে বড় হয়েছি তার ওপর হয়ত নির্ভর করতে পারে, তবে আমরা যেখানেই থাকি না কেন জগৎকে আমরা সময় আর স্থানের ভেতর ধারাবাহিক কিছু প্রক্রিয়া হিসেবেই প্রত্যক্ষ করি। এই কথাটা অন্তত আগেভাগেই বলে দিতে পারি আমরা।'

'কিন্তু সময় আর স্থানের *অস্তিত্ব* নিশ্চয়ই আমাদের ওপর নির্ভরশীল নয়?'

'ভুল। কান্ট মনে করতেন সময় আর স্থান মানুষের অবস্থার ওপর নির্ভরশীল। সময় আর স্থান প্রত্যক্ষণের প্রথম আর প্রধান উপায়, বাস্তব জগতের কোনো গুণ বা বৈশিষ্ট্য নয়।'

'এটা অবশ্য একেবারে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি।'

'কারণ, মানুষের মন কেবল 'নিষ্ক্রিয় মোম' নয় যা শুধু বাইরের সংবেদন গ্রহণ করে। জগৎটাকে আমরা যেভাবে উপলব্ধি করি তার ওপর মন একটা ছাপ ফেলে যায়। কাঁচের একটা পাত্রে যখন তুমি পানি ঢাল তখন যা ঘটে, তার সঙ্গে তুলনা করতে পারো তুমি ব্যাপারটাকে। পানি পাত্রটার আকার ধারণ করে। ঠিক একইভাবে আমাদের প্রত্যক্ষণও 'স্বজ্ঞার আকারের' সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেয়।'

'সম্ভবত বুঝতে পারছি কী বলতে চাইছেন।'

'কান্টের দাবি, শুধু মন-ই ঘটনার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেয় না, আমাদের প্রত্যক্ষণও মনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেয়। মানুষের জ্ঞানের সমস্যার ক্ষেত্রে একে কান্ট বলেছেন কোপার্নিকান বিপ্লব।

'এ-কথার সাহায্যে তিনি এটাই বোঝাতে চেয়েছেন যে পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘোরে, সূর্য পৃথিবীর চারদিকে নয়, কোপার্নিকাসের এই দাবি আগের চিন্তা-ভাবনার তুলনায় যতটা নতুন আর মূলগতভাবে ভিন্ন ছিল এই ব্যাপারটাও ঠিক তাই।

'এখন বুঝতে পারছি কেন তিনি ভাবতেন বুদ্ধিবাদী আর অভিজ্ঞতাবাদীরা একটা বিশেষ পর্যায় পর্যন্ত ঠিক বলেছেন। অভিজ্ঞতার গুরুত্বের কথা প্রায় ভুলেই গিয়েছিলেন বুদ্ধিবাদীরা, আবার আমরা যেভাবে জগৎটিকে দেখি সেটিকে আমাদের মন কীভাবে প্রভাবিত করে সেদিকে অভিজ্ঞতাবাদীরা চোখ বন্ধ করে ছিলেন।

'এমনকি, *কার্য-কারণ সূত্র*, (law of causaly) যা কিনা মানুষ প্রত্যক্ষ করতে পারে না বলে হিউম দাবি করেছিলেন, তা-ও কান্টের মত অনুযায়ী, মানুষের মনের অধীন।'

'বুঝিয়ে বলুন, প্লিজ।'

'তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে যে হিউম কীভাবে এই দাবি করেছিলেন যে

অভ্যাসের জোরেই আমরা সমস্ত প্রাকৃতিক ঘটনার মধ্যে একটা কার্য-কারণজনিত সম্পর্ক দেখতে বাধ্য হই? হিউমের বক্তব্য অনুযায়ী, কালো বিলিয়ার্ড বলটাকে সাদা বিলিয়ার্ড বলটার গতির কারণ হিসেবে আমরা প্রত্যক্ষ করতে পারি না। কাজেই এ-কথা আমরা প্রমাণ করতে পারি না যে কালো বলটা সব সময়-ই সাদা বলটাতে গতির সঞ্চার করবে।'

'হ্যাঁ, মনে আছে।'

'কিন্তু যে-জিনিসটাকে আমরা প্রমাণ করতে পারি না বলে হিউম দাবি করছেন, ঠিক সেটিকেই কান্ট মানুষের প্রজ্ঞার একটি বৈশিষ্ট্য হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। কার্য-কারণ সূত্র স্রেফ এই কারণে শাশ্বত আর পরম যে যা-ঘটে তার সবকিছুকেই মানুষের প্রজ্ঞা, কারণ আর ফল সংক্রান্ত বিষয় হিসেবেই প্রত্যক্ষ করে।'

'তারপরেও, আমি মনে করি কার্য-কারণ সূত্র বাস্তব জগতেরই অন্তর্ভুক্ত, আমাদের মনের নয়।'

'কান্টের দর্শন অনুযায়ী, এটা মানুষের মধ্যে সহজভাবেই আছে। এ-ব্যাপারে তিনি হিউমের সঙ্গে একমত যে জগতের 'স্বরূপ' আমরা নিশ্চিতভাবে কখনোই জানতে পারবো না। আমরা কেবল এটুকু জানতে পারি জগৎটা 'আমার কাছে' বা অন্য সবার কাছে কেমন। দর্শনের ক্ষেত্রে কান্টের সবচেয়ে বড় অবদান হচ্ছে বস্তুর স্বরূপ—das Ding an sich-আর আমাদের কাছে মনে হওয়া রূপের মধ্যে তাঁর টানা বিভাজন রেখা।'

'জার্মান আমি খুব একটা জানি না।'

''বস্তুর স্বরূপ' আর 'আমার কাছে' মনে হওয়া রূপ-এর মধ্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য নিরূপণ করেছেন কান্ট। 'বস্তুর স্বরূপ' আমরা নিশ্চিতভাবে কখনোই জানতে পারবো না। আমরা শুধু এটুকুই জানতে পারি সেটি আমাদের কাছে কেমন 'প্রতীয়মান' হচ্ছে। অন্য দিকে, কোনো অভিজ্ঞতা হওয়ার আগেই, মানুষের মন কীভাবে ঘটনাগুলো প্রত্যক্ষ করবে সে-বিষয়ে আমরা আগাম কিছু বলতে পারি।'

'পারি বুঝি?'

'সকালবেলা বাইরে বের হওয়ার আগেই তুমি জানতে পারো না তুমি কী দেখবে বা সেদিন তোমার কী কী অভিজ্ঞতা হবে। কিন্তু তুমি এটা জানতে পারো যে যা-কিছু তুমি দেখবে বা যে-সব অভিজ্ঞতা তোমার হবে তার সবই সময় আর স্থানে প্রত্যক্ষ করা হবে। তাছাড়া তুমি এ-বিষয়েও নিশ্চিত থাকতে পারো যে কার্য-কারণ সূত্র সেখানে কাজ করবে এবং তা স্রেফ এই কারণে যে তোমার চেতনার অংশ হিসেবে সেটি তুমি তোমার সঙ্গেই বহন করবে।'

'কিন্তু আপনি বলতে চাইছেন আমাদেরকে অন্যভাবেও তৈরি করা যেতো?'

'হ্যাঁ, ভিন্ন এক ধরনের সাংবেদনিক সরঞ্জাম থাকতে পারত আমাদের। ফলে ভিন্ন ধরনের সময়জ্ঞান আর স্থান সম্বন্ধে ভিন্ন ধরনের অনুভূতি থাকতে পারত আমাদের। আমাদেরকে এমনভাবে তৈরি করা যেতো যাতে আমাদের চারপাশে যা ঘটছে সে-সবের কারণ খুঁজে বেড়াতাম না আমরা।'

'ঠিক কী বোঝাতে চাইছেন?'

'মনে করো, বসবার ঘরের মেঝেতে একটি বেড়াল শুয়ে আছে। একটি বল গড়িয়ে দেয়া হলো ঘরটাতে, তো এরকম অবস্থায় বেড়ালটি কী করে সাধারণত?'

'এটা আমি অনেকবার করে দেখেছি। বেড়ালটি বলটির পিছু পিছু ছোটে।'

'ঠিক আছে। এবার মনে করো সেই একই ঘরে তুমি বসে আছো। হঠাৎ যদি দেখ একটি বল গড়িয়ে ভেতরে ঢুকছে তখন কি তুমি ওটার পেছন পেছন ছুটতে শুরু করবে?'

'প্রথমে আমি ঘুরে তাকাব বলটি কোত্থেকে এলো তা দেখার জন্য।'

'ঠিক, কারণ তুমি মানুষ, প্রতিটি ঘটনার কারণ তুমি অবশ্যই খুঁজবে, তার কারণ, কার্য-কারণ সূত্র তোমার গঠনের অংশ।'

'কান্ট সে-কথাই বলছেন।'

'হিউম দেখিয়েছিলেন যে প্রাকৃতিক নিয়মগুলো আমরা প্রত্যক্ষ-ও করতে পারি না, প্রমাণ-ও করতে পারি না। এই বিষয়টি অস্বস্তিতে ফেলে দিয়েছিল কান্টকে। কিন্তু তাঁর এই বিশ্বাস ছিল যে, আমরা যে আসলে মানবজ্ঞানের সূত্র (laws of human cognition) নিয়ে কথা বলছি এটা দেখিয়ে দিয়ে তিনি প্রাকৃতিক সেই নিয়মগুলোর পরম যাথার্থ্য প্রমাণ করতে পারবেন।'

'বলটি কোত্থেকে এলো তা দেখার জন্য একটি শিশুও কি ঘুরে তাকাবে?'

'সম্ভবত না। কিন্তু কান্ট মন্তব্য করেছেন যে কিছু সাংবেদনিক বস্তুর সঙ্গে পরিচিত হওয়ার আগ পর্যন্ত শিশুর প্রজ্ঞা পুরোপুরি বিকাশ লাভ করে না। ফাঁকা বা শূন্য মনের কথা বলা একেবারেই অর্থহীন।'

'তা ঠিক, সে-রকম মন খুবই অদ্ভুত মন হতো।'

'বেশ, এবার তাহলে পুরো ব্যাপারটির একটি সার-সংক্ষেপ তৈরি করা যাক। কান্টের বক্তব্য অনুযায়ী, জগৎ সম্পর্কে মানুষের জ্ঞান তৈরি হয় দুটো উপাদানের বদৌলতে। একটি হচ্ছে বাহ্যিক পরিস্থিতি, যেটার ব্যাপারে আমরা কিছুই জানতে পারি না, ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে সেটিকে প্রত্যক্ষ করার আগে। এটাকে আমরা বলতে পারি জ্ঞানের *উপাদান*। আরেকটি হচ্ছে, খোদ মানুষের মধ্যকার অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি—এই যেমন, সময় আর স্থানে এবং অলঙ্ঘনীয় কার্য-কারণ সূত্রের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ প্রক্রিয়া হিসেবে ঘটতে থাকা নানান ঘটনার প্রত্যক্ষণ। একে আমরা বলতে পারি জ্ঞানের *আকার*।'

জানলার বাইরে দৃষ্টি মেলে কিছুক্ষণ বসে রইলেন অ্যালবার্টো আর সোফি। হঠাৎ লেকের অপর পাড়ে গাছগুলোর ভেতর ছোট্ট একটি মেয়েকে দেখতে পেল সোফি।

'দেখুন!' বলে উঠল সোফি! 'ও কে?'

'ওকে যে আমি চিনি না সে-ব্যাপারে আমি নিশ্চিত।'

মাত্র কয়েক সেকেন্ডের জন্য দেখা গেল মেয়েটিকে, তারপরই নেই হয়ে গেল সে। সোফি খেয়াল করল, এক ধরনের লাল টুপি পরে ছিল মেয়েটি।

'কোনো পরিস্থিতিতেই আমাদের মনোযোগ বিচ্ছিন্ন হতে দেয়া যাবে না।'

'ঠিক আছে, বলে যান তাহলে।'

'কান্ট বিশ্বাস করতেন আমরা কী জানতে পারি তার একটি স্পষ্ট সীমারেখা

আছে। কথাটি তুমি হয়ত এভাবে বলতে পারো যে মনের 'চশমা' সেই সীমা নির্দিষ্ট করে দেয়।'

'কীভাবে?'

'তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে যে কান্টের পূর্ববর্তী দার্শনিকেরা কিছু প্রকৃত 'বড়' প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করে গেছেন—এই যেমন মানুষের আত্মা অমর কিনা, ঈশ্বর আছেন কি নেই, প্রকৃতি ছোট ছোট অবিভাজ্য কণা দিয়ে গঠিত কিনা বা মহাবিশ্ব কি অসীম না সসীম, এ-সব।'

'হ্যাঁ, মনে আছে।'

'কান্ট বিশ্বাস করতেন যে এই ধরনের প্রশ্নের ব্যাপারে নিশ্চিত কোনো কিছু জানা সম্ভব নয়। এ-ধরনের যুক্তি-তর্ক যে তিনি বাতিল করে দিয়েছিলেন তা নয়। বরং তার উল্টো। এ-সব প্রশ্ন যদি তিনি একপাশে সরিয়ে রাখতেন তাহলে তাকে দার্শনিক বলা যেতো কিনা সন্দেহ।'

'তিনি কী করলেন?'

'ধৈর্য ধরো। এ-ধরনের মহৎ দার্শনিক প্রশ্নের ক্ষেত্রে কান্ট বিশ্বাস করতেন যে, আমরা মানুষেরা যা বুঝতে পারি তার বাইরেও প্রজ্ঞা কাজ করে। ঠিক সেই সঙ্গে আমাদের স্বভাবের মধ্যেই রয়েছে এই একই প্রশ্নগুলো তুলে ধরার একটি মৌলিক বাসনা। কিন্তু যখন আমরা প্রশ্ন করি এই মহাবিশ্ব সসীম না অসীম তখন আমরা এমন এক সমগ্রতার বিষয়ে প্রশ্ন করি যার অতি ক্ষুদ্র একটা অংশ আমরা। কাজেই আমাদের পক্ষে এই সমগ্রতাকে পুরোপুরি জানা কখনোই সম্ভব নয়।'

'কেন?'

'তুমি যখন সেই লাল চশমা পরেছিলে তখন আমরা দেখিয়ে দিয়েছিলাম যে, কান্টের বক্তব্য অনুযায়ী, দুটো উপাদান রয়েছে যেগুলো জগৎ সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানলাভে অবদান রাখে।'

'ইন্দ্রিয় সংবেদন (sensory perception) আর প্রজ্ঞা।'

'হ্যাঁ, আমাদের জ্ঞানের উপাদান আমাদের কাছে আসে আমাদের ইন্দ্রিয়গুলোর সাহায্যে, কিন্তু এই উপাদানকে অবশ্যই আমাদের প্রজ্ঞার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে। যেমন ধরো, প্রজ্ঞার একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ঘটনার কারণ খোঁজা।'

'মেঝেতে বলের গড়িয়ে যাওয়ার মতো কোনো ঘটনা।'

'তা বলতে পারো। কিন্তু যখন আমরা ভাবি দুনিয়াটা কোত্থেকে এলো আর তারপর সম্ভাব্য উত্তরগুলো নিয়ে আলাপ করি তখন এক অর্থে প্রজ্ঞাকে 'স্থগিত' রাখা হয়। কারণ প্রজ্ঞার এমন কোনো সাংবেদনিক উপাদান নেই যা সে প্রক্রিয়াজাত করতে পারে, কোনো অভিজ্ঞতা নেই যা সে কাজে লাগাতে পারে, কারণ যে বিশাল বাস্তবতার আমরা এক ক্ষুদ্র অংশ তার পুরোটা আমাদের অভিজ্ঞতায় নেই।'

'এক অর্থে, যে-বলটি মেঝেতে গড়িয়ে আসে সেই বলটির একটি ছোট্ট অংশ আমরা। কাজেই ওটি কোত্থেকে এলো সেটি আমরা জানতে পারি না।'

'কিন্তু বলটি কোত্থেকে আসছে সেটি জিজ্ঞেস করাটা সব সময়ই মানুষের প্রজ্ঞার একটি বৈশিষ্ট্য হিসেবে থাকবে। সেই কারণেই আমরা প্রশ্ন করেই যাই, গভীরতম সব

প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাওয়ার জন্য নিজেদের সব উজাড় করে দিই। তবে কামড় বসানোর মতোন শক্ত কোনো কিছু আমরা পাই না; সন্তোষজনক একটি উত্তর আমরা কখনোই পাই না, কারণ প্রজ্ঞা নিজে থেকে তার লক্ষ্য খুঁজে নিতে পারে না।'

'আমি জানি এই অনুভূতিটি ঠিক কেমন, ধন্যবাদ।'

'বাস্তবতার স্বরূপের মতো ভারি প্রশ্নের ক্ষেত্রে কান্ট দেখিয়েছেন যে সব সময়ই এমন দুটো বিপরীতধর্মী দৃষ্টিভঙ্গি থাকে যেগুলোর সম্ভবপরতা একই সমান আর তা নির্ভর করে প্রজ্ঞা আমাদের কী বলে তার ওপর।'

'উদাহরণ, প্লিজ।'

'সময়ের দিক থেকে জগতের একটা শুরু ছিল এ-কথাটি যেমন অর্থপূর্ণ, তেমনি সে-ধরনের কোনো শুরু ছিল না এ-কথা বলাটিও ঠিক একই রকম অর্থপূর্ণ। প্রজ্ঞা বা যুক্তির সাহায্যে দুটোর মধ্যে একটি বেছে নেয়া সম্ভব নয়। আমরা দাবি করতে পারি বরাবরই এই জগতের অস্তিত্ব ছিল, কিন্তু কখনো শুরু না থাকলে কোনো কিছু কি সব সময়ের জন্য থাকতে *পারে?* কাজেই এবার আমরা বাধ্য হচ্ছি উল্টো মতটি গ্রহণ করতে।

'আমরা তাহলে বলছি যে নিশ্চয়ই নির্দিষ্ট একটি সময় থেকে জগতের শুরু ছিল আর আমরা যদি এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় পরিবর্তনের কথাটি গণ্য না করি তাহলে বলতে হয় জগৎটা নিশ্চয়ই তখন শূন্য থেকে সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু শূন্য থেকে কি কোনো কিছুর সৃষ্টি *হতে পারে*, সোফি?'

'না, দুটো সম্ভাবনাতেই একই রকম সমস্যা। তারপরেও এটি মনে হয় যে এর একটি নিশ্চয়ই ঠিক, অন্যটি ভুল।'

'বোধকরি তোমার মনে আছে ডেমোক্রিটাস আর জড়বাদীরা বলেছিলেন যে, প্রতিটি জিনিস যা দিয়ে তৈরি তারই সবচেয়ে ক্ষুদ্র অংশ দিয়ে এই প্রকৃতি তৈরি। অন্যরা, দেকার্তের মতোই, এ-কথা বিশ্বাস করতেন যে বাহ্যিক বাস্তবতাকে ক্রমেই ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর অংশে অন্তহীনভাবে বিভক্ত করা সব সময়ই সম্ভব। কিন্তু এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এদের মধ্যে কার কথা ঠিক?'

'দু'দলেরই। আবার কারোরই না।

'আবার, অনেক দার্শনিকই মানুষের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মূল্যবোধ হিসেবে স্বাধীনতার কথা বলেছেন। একই সঙ্গে আমরা স্টোয়িকদের এবং স্পিনোজার মতো দার্শনিকের কথাও শুনেছি যাঁরা বলেছেন সবকিছুই ঘটে প্রাকৃতিক নিয়মের প্রয়োজনের কারণে। কান্টের বক্তব্য অনুযায়ী, স্থির সিদ্ধান্তে পৌছানোর ব্যাপারে মানব-প্রজ্ঞার ব্যর্থতার আরেকটি উদাহরণ এটা।'

'দুটো দৃষ্টিভঙ্গি-ই একই রকম যৌক্তিক, একই রকম অযৌক্তিক।'

'সবশেষে, প্রজ্ঞার সাহায্যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে গেলে ব্যর্থতা অবশ্যম্ভাবী। দেকার্তের মতো যুক্তিবাদীরা প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে নিশ্চিতভাবেই ঈশ্বর রয়েছেন আর তা স্রেফ এই কারণে যে আমাদের মধ্যে 'পরম সত্তা' সম্পর্কিত ধারণা বর্তমান। অন্যরা, এই যেমন অ্যারিস্টটল এবং টমাস অ্যাকুইনাস, এই সিদ্ধান্তে পৌছেছিলেন যে প্রতিটি জিনিসেরই যেহেতু একটি প্রথম বা আদি কারণ রয়েছে

সুতরাং ঈশ্বর অবশ্যই আছেন।'

'কান্ট কী মনে করতেন?'

'ঈশ্বরের অস্তিত্বের এই দুই প্রমাণ-ই খারিজ করে দিয়েছেন তিনি। ঈশ্বরের অস্তিত্বের পক্ষে দাবি জানানোর জন্য প্রজ্ঞা বা অভিজ্ঞতা কোনোটিই নিশ্চিত কোনো ভিত্তি নয়। ঈশ্বরের অস্তিত্ব বা অনস্তিত্ব দুটোই প্রজ্ঞার কাছে সমান সম্ভবপরতার বিষয়।'

'কিন্তু গোড়াতে আপনি বলেছিলেন যে খ্রিস্টীয় বিশ্বাসের ভিত্তিভূমি কান্ট রক্ষা করতে চেয়েছিলেন।'

'হ্যাঁ, এক ধর্মীয় মাত্রা খুলে দিয়েছিলেন কান্ট। প্রজ্ঞা আর অভিজ্ঞতা, দুটোই যখন ব্যর্থ হয় তখন একটি শূন্যস্থান সৃষ্টি হয় যা পূরণ করা যায় *বিশ্বাস* (faith) দিয়ে।'

'এভাবেই খ্রিস্টধর্মকে রক্ষা করলেন তিনি?'

'তা তুমি যা বলো। তো, এখন এই ব্যাপারটি খেয়াল রাখা দরকার যে কান্ট ছিলেন প্রোটেস্ট্যান্ট। সেই রিফর্মেশনের সময় থেকেই বিশ্বাসের ওপর গুরুত্ব আরোপের জন্য প্রোটেস্ট্যান্টবাদ বিশিষ্ট হয়ে আছে। অন্যদিকে, ক্যাথলিক চার্চ মধ্যযুগ থেকেই বিশ্বাসের একটি স্তম্ভ হিসেবে প্রজ্ঞার ওপরেই বেশি আস্থা রেখে এসেছে।

'কিন্তু, এইসব ওজনদার প্রশ্ন ব্যক্তির বিশ্বাসের ওপর ছেড়ে দেয়া উচিত, স্রেফ এই বিষয়টি প্রতিষ্ঠিত করার চেয়েও বেশি কিছু করেছিলেন কান্ট। তিনি বিশ্বাস করতেন যে নৈতিকতার কারণে এটা আগে থেকেই ভেবে নেয়া অত্যন্ত জরুরি যে মানুষ *অমর আত্মা*-র অধিকারী, *ঈশ্বর আছেন* আর মানুষ *স্বাধীন ইচ্ছার* অধিকারী।'

'তার মানে দেকার্ত যা করেছিলেন তিনিও তাই করলেন। প্রথমে তিনি আমাদের বোধগম্য সব কিছু সম্পর্কেই সমালোচনা মুখর হয়ে উঠেছেন, তারপর একসময় পেছন দরজা দিয়ে স্মাগল করে নিয়ে এলেন ঈশ্বরকে।'

'কিন্তু তিনি বিশেষ করে এই বিষয়টির ওপর বিশেষ জোর দিয়েছেন যে—দেকার্ত যা করেননি—ঈশ্বরকে এই পর্যায়ে এনেছে বিশ্বাস, প্রজ্ঞা নয়। আত্মার অমরত্ব, ঈশ্বরের অস্তিত্ব এবং মানুষের স্বাধীন ইচ্ছায় বিশ্বাসকে তিনি নিজে বলেছেন ব্যবহারিক *স্বতঃসিদ্ধ* (practical postulates)।'

'তার অর্থ?'

'কোনো কিছু postulate করার অর্থ হচ্ছে যা প্রমাণ করা যাবে না তা ধরে নেয়া বা স্বীকার করে নেয়া। 'ব্যবহারিক স্বতঃসিদ্ধ' কথাটি দিয়ে কান্ট এমন একটি জিনিসকে বুঝিয়েছেন যেটাকে 'প্রচলিত প্রথা' (praxis) বা অভ্যাসের (practice) স্বার্থে স্বীকার করে নেয়া হয়েছে; তার মানে, মানুষের নৈতিকতার স্বার্থে। তিনি বলছেন, 'ঈশ্বরের অস্তিত্বকে স্বীকার করে নেয়া একটি নৈতিক প্রয়োজন।'

হঠাৎ দরজায় ঠক ঠক আওয়াজ হলো। সোফি উঠে দাঁড়াল, কিন্তু অ্যালবার্টোর মধ্যে সে-রকম কোনো লক্ষণ দেখতে না পেয়ে সোফি বলে উঠল, 'কে এলো সেটি দেখতে হবে না?'

শ্রাগ করে, নিমরাজি ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়ালেন অ্যালবার্টো। দু'জনে খুলে দিলেন দরজাটা, দেখা গেল সাদা একটি গ্রীষ্মের পোশাক আর একটি লাল বনেট পরা ছোট্ট একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এই মেয়েটিকেই দেখেছিলেন তাঁরা লেকের অপর পাড়ে।

তার একটা বাহুর সঙ্গে খাবারের একটা ঝুড়ি ঝোলানো।

'হাই,' সোফি বলে উঠল। 'কে তুমি?'

'দেখতে পাচ্ছো না, আমি রেড রাইডিংহুড?'

সোফি অ্যালবার্টোর দিকে তাকাল, অ্যালবার্টো মাথা ঝাঁকালেন।

'শুনলেই তো মেয়েটি কী বলল।'

'আমি আমার দাদির বাড়ি খুঁজছি,' মেয়েটি বলল। 'বেচারির অনেক বয়েস, তাছাড়া তাঁর অসুখ, অবশ্য তাঁর জন্য আমি কিছু খাবার নিয়ে যাচ্ছি।'

'এটা সেই বাড়ি নয়,' অ্যালবার্টো বললেন, 'কাজেই তুমি বরং নিজের পথে যাও।'

তিনি এমন একটি ভঙ্গি করলেন যা দেখে সোফির মাছি তাড়ানোর কথা মনে পড়ে গেল।

'কিন্তু আমার যে একটা চিঠি দেয়ার কথা তাকে,' লাল বনেটের মেয়েটি বলল।

কথাটি বলেই ছোট্ট একটি খাম বের করে সোফির হাতে ধরিয়ে দিল সে। তারপরই লাফাতে লাফাতে চলে গেল সে।

'নেকড়ে থেকে সাবধান!' পেছন থেকে বলে উঠল সোফি।

অ্যালবার্টো এরই মধ্যে বসবার ঘরের দিকে পা বাড়িয়েছেন।

'ভাবুন একবার! ও সেই ছোট্ট রেড রাইডিংহুড!' সোফি বলল।

'ওকে সাবধান করে কোনো লাভ নেই। ও ঠিকই ওর দাদির বাড়ি যাবে আর তারপর নেকড়ে ওকে খাবে। ওর কখনোই শিক্ষা হবে না। সময়ের শেষ পর্যন্ত বারবার ঘটতে থাকবে এই ঘটনা।'

'কিন্তু ওর দাদির বাসা খুঁজে পাওয়ার আগে সে কখনো অন্য কোনো বাড়ির দরজায় গিয়ে টোকা মেরেছে বলে কোনোদিন শুনিনি আমি।'

'নেহাতই তুচ্ছ ব্যাপার, সোফি।'

তাকে দেয়া খামটির দিকে তাকাল এবার সোফি। তাতে লেখা, 'প্রতি, হিল্ডা।' খামটা খুলে জোরে জোরে পড়ল সে।

> প্রিয় হিল্ডা, মানব মস্তিষ্ক যদি আমাদের বুঝবার মতো সরলও হতো তারপরেও আমরা ওটাকে না বুঝবার মতোই নির্বোধ থেকে যেতাম।
> ভালোবাসা নিস, বাবা।

মাথা ঝাঁকালেন অ্যালবার্টো। 'বড্ড খাঁটি কথা। আমার ধারণা এ-ধরনের একটি কথা কান্ট বলেছিলেন। আমরা কী তা বোঝার আশা করতে পারি না। একটি ফুল বা একটি পোকাকে হয়তো আমরা হৃদয়ঙ্গম করতে পারি, কিন্তু নিজেদেরকে আমরা কখনোই বুঝতে বা জানতে পারি না। মহাবিশ্বের কথা তো ছেড়েই দেয়া গেল।'

হিল্ডার কাছে লেখা রহস্যময় বাক্যটি আরও বেশ ক'বার পড়ল সোফি: অ্যালবার্টো এরপর বলে চললেন: সামুদ্রিক সাপ বা ও-রকম জিনিস যেন আমাদের মনোযোগে বিঘ্ন ঘটাতে না পারে। আজকের মতো শেষ করার আগে কান্টের

নীতিবিদ্যা সম্পর্কে কিছু কথা বলব তোমাকে।'

'প্লিজ, তাড়াতাড়ি করুন। শিগ্‌গির বাড়ি যেতে হবে আমাকে।'

'প্রজ্ঞা আর ইন্দ্রিয় আমাদেরকে কতটুকু বলতে পারে সে-ব্যাপারে হিউমের সংশয়বাদ জীবনের অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন নিয়ে চিন্তা করতে বাধ্য করেছে কান্টকে। নীতিবিদ্যা সেসবের মধ্যে অন্যতম।'

'হিউম বলেছিলেন না যে কোনটা ন্যায় কোনটা অন্যায় তা কখনোই প্রমাণ করা যায় না? হ্যাঁ বা না-বাক্য থেকে সিদ্ধান্ত নিয়ে ঔচিত্যবোধক বাক্যে পৌঁছানো যায় না।'

'হিউমের দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী, আমাদের প্রজ্ঞা বা আমাদের অভিজ্ঞতা কোনোটিই ন্যায়-অন্যায়ের ভেতরে পার্থক্য নিরূপণ করতে পারে না। পারে স্রেফ আমাদের ভাবাবেগ। কান্টের জন্য এ-রকম একটি ভিত্তি গ্রহণযোগ্য ছিল না।'

'সেটি কল্পনা করে নিতে পারি।'

'কান্ট সব সময়ই মনে করেছেন যে ন্যায়-অন্যায়ের মধ্যে পার্থক্যটা প্রজ্ঞা সংক্রান্ত ব্যাপার, ভাবাবেগ সংক্রান্ত নয়। এদিক দিয়ে তিনি বুদ্ধিবাদীদের অনুসারী, যাঁরা বলতেন ন্যায়-অন্যায়ের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করার শক্তি মানব প্রজ্ঞার সহজাত। কোনটা ন্যায় কোনটা অন্যায় সবাই যে সেটি জানে সেটি এ-কারণে নয় যে ব্যাপারটি আমরা শিখেছি, বরং এই কারণে যে বিষয়টির জন্ম আমাদের মনে। কান্টের মত অনুযায়ী সবারই 'বাহ্যিক প্রজ্ঞা' রয়েছে, অর্থাৎ যে-বুদ্ধি আমাদেরকে প্রতিটি ক্ষেত্রে কোনটি ন্যায় কোনটি অন্যায় সে-ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা দেয় সেই বুদ্ধি আছে।'

'এবং এটা সহজাত?'

'প্রজ্ঞার অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের মতো ন্যায়-অন্যায়ের পার্থক্য করার ব্যাপারটিও সহজাত। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, আমরা সবাই যেহেতু বুদ্ধিমান প্রাণী, প্রতিটি জিনিসকেই একটি কার্য-কারণজনিত সম্পর্কসূত্রে প্রত্যক্ষ করার মধ্য দিয়ে আমরা একই সর্বজনীন *নৈতিক সূত্র*-তে (moral laws) প্রবেশাধিকার পাই।

'ভৌত সূত্রগুলোর (physical laws) মতো এই নৈতিক সূত্রেরও পরম যাথার্থ্য (absolute validity) রয়েছে। প্রতিটি জিনিসেরই একটি কারণ রয়েছে বা সাত আর পাঁচ বারো হয়, এ-সব কথা যেমন আমাদের বুদ্ধির ক্ষেত্রে মৌলিক ব্যাপার, ঠিক তেমনি এই নৈতিক সূত্র বা নিয়মও আমাদের নৈতিকতার ক্ষেত্রে একেবারে মৌলিক বিষয়।'

'তা এই নৈতিক নিয়ম কী বলে?'

'যেহেতু সব অভিজ্ঞতার আগেই থাকে এটা, সেজন্য এটা 'আকারগত', অর্থাৎ বিশেষ কোনো নৈতিক পছন্দের সঙ্গে বাঁধা নয়। কারণ এটা সব সময়ের সব সমাজের সব মানুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। অর্থাৎ এটা এ-রকম কিছু বলে না যে এমন বা অমন পরিস্থিতিতে পড়লে তুমি এটা বা ওটা করবে। বরং বলে, *সব* পরিস্থিতিতে তোমাকে কেমন আচরণ করতে হবে।'

'কিন্তু বিশেষ কোনো পরিস্থিতিতে কী করতে হবে তা যদি এটা না-ই বলে তাহলে একটি নৈতিক নিয়ম নিজের মধ্যে ঢুকিয়ে লাভটা কী?'

'নৈতিক নিয়মকে কান্ট দেখেছেন একটি শর্তহীন আদেশ (categorical imperative) হিসেবে। এর সাহায্যে তিনি বোঝাচ্ছেন যে নৈতিক নিয়ম পরম বা শর্তহীন বা এটা সব পরিস্থিতিতে প্রযোজ্য। তাছাড়া, এটা আদেশমূলক (imperative), তার অর্থ, এটা নিয়ন্ত্রণকামী, কাজেই পুরোপুরি কর্তৃত্বপরায়ণ।'

'বুঝতে পেরেছি।'

'কান্ট এই 'শর্তহীন আদেশ' তৈরি করেছেন বিভিন্নভাবে। প্রথমে তিনি বলছেন শুধু সেই নীতির ওপর কাজ করো যার মাধ্যমে সেই সঙ্গে তুমি এই ইচ্ছা পোষণ করতে পারো যে সেটি একটি সর্বজনীন নিয়মে পরিণত হবে।'

'অর্থাৎ যখন আমি কিছু করবো তখন আমাকে এই ব্যাপারে নিশ্চিত হতে হবে যে আমি চাই অন্যরা এই একই পরিস্থিতিতে ঠিক একই কাজ করবে।'

'ঠিক তাই। কেবলমাত্র তখনই তুমি তোমার ভেতরকার নৈতিক আইন অনুযায়ী কাজ করবে। কান্ট তার 'শর্তহীন আদেশ'টিকে এভাবেও তৈরি করেছেন : *এমনভাবে কাজ করো যাতে সব সময়ই মনুষ্যত্বকে তুমি কখনোই নিছক উপায় হিসেবে নয় বরং সেই সঙ্গে সব সময় এটি উদ্দেশ্য হিসেবে ব্যবহার করবে তা সে তোমার ক্ষেত্রেই হোক বা অন্যের ক্ষেত্রে।*

'অর্থাৎ অন্য লোকজনকে আমরা যেন কখনোই আমাদের নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার না করি।'

'ঠিক, তার কারণ প্রত্যেক মানুষই নিজে একটি উদ্দেশ্য। কিন্তু সেটি কেবল অন্যদের বেলাতেই প্রযোজ্য নয়। তোমার নিজের বেলাতেও প্রযোজ্য। তুমিও নিজেকে নিজের স্বার্থে ব্যবহার করবে না।'

'কথাটি শুনে আমার সেই গোল্ডেন রুলটা মনে পড়ছে: অন্যের সঙ্গে এমন আচরণ করো...

'হ্যাঁ, সেটিও আচরণের একটা 'আকারগত' নীতি যা আসলে সমস্ত নৈতিক পছন্দের বা বিচারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তুমি বলতে পারো যে সেই গোল্ডেন রুলটা কান্টের সার্বজনীন নৈতিক নিয়মের মতো একই কথা বলে।'

'কিন্তু নিশ্চয়ই ওটা নিছক একটা দাবি। হিউম সম্ভবত ঠিকই বলেছিলেন যে প্রজ্ঞা দিয়ে ঠিক করা যায় না কোনটি ন্যায়, কোনটি অন্যায়।'

'কান্টের বক্তব্য অনুযায়ী, নৈতিকতার নিয়ম কার্য-কারণ সূত্রের মতোই পরম এবং সর্বজনীন। সেটিও প্রজ্ঞা দিয়ে প্রমাণ করা যায় না, কিন্তু তারপরেও সেটি পরম আর অপরিবর্তনীয়। কেউ-ই সে-কথা অস্বীকার করবে না।'

'আমার মনে হচ্ছে আমরা আসলে বিবেকের কথা বলছি। কারণ সবারই বিবেক আছে, তাই না?

'হ্যাঁ, নৈতিকতার নিয়ম বর্ণনা করার সময় কান্ট আসলে মানুষের বিবেকের কথাই বলেন। আমাদের বিবেক আমাদেরকে কী বলে আমরা তা প্রমাণ করতে না পারলেও আমরা জানি তা কী বলে।'

'মাঝে মাঝে অন্যের প্রতি আমি সদয় হই, তাদের সাহায্য করি এই জন্য যে এ-কাজের একটি প্রতিদান পাওয়া যায়। জনপ্রিয় হওয়ার একটি উপায়, এটা।'

'কিন্তু তুমি যদি শুধু জনপ্রিয় হওয়ার জন্য অন্যের কষ্টের ভাগীদার হও তাহলে কিন্তু তুমি নৈতিক নিয়মের প্রতি শ্রদ্ধাবশত কাজটি করছ না। হয়ত তুমি নৈতিক নিয়ম অনুযায়ী-ই কাজ করছ আর হয়ত সেটিই যথেষ্ট ভালো, কিন্তু ব্যাপারটা নৈতিক কাজ তখনই হবে যখন তুমি নিজেকে জয় করেছ। একেবারেই কর্তব্য জ্ঞান করে যখন তুমি কোনো কাজ করো কেবল তখনই সেটিকে একটি নৈতিক কাজ বলা যেতে পারে। কান্টের নীতিবিদ্যাকে তাই মাঝে মাঝে *কর্তব্যজনিত নীতিবিদ্যা* বলা হয়।'

'রেড ক্রস বা গির্জার বাজারের জন্য টাকা সংগ্রহ করাকে আমি আমার কর্তব্য মনে করতে পারি।'

'ঠিক। আর জরুরি বিষয় হচ্ছে কাজটি তুমি করছ কারণ তুমি জানো কাজটি অন্যায় নয়। তোমার জোগাড় করা টাকাটা যদি রাস্তায় হারিয়ে যায় বা যাদের মুখের অন্ন যোগানোর জন্য ওটা জোগাড় করা হয়েছিল তাদের জন্য যদি টাকাটা যথেষ্ট না-ও হয় তারপরেও কিন্তু তুমি নৈতিক নিয়ম মান্য করেছো। সদিচ্ছা নিয়ে কাজ করেছো তুমি আর কান্টের বক্তব্য অনুযায়ী, এই সদিচ্ছাই নির্ধারণ করে কাজটি নৈতিকভাবে ঠিক ছিল কিনা, কাজটির পরিণতি বা ফলাফল নয়। সে-কারণেই কান্টের নীতিবিদ্যাকে সদিচ্ছার নীতিবিদ্যাও বলা হয়ে থাকে।'

'একজন মানুষ কখন নৈতিক নিয়মের প্রতি শ্রদ্ধাবশত কাজ করছে সে-কথা জানাটা তাঁর জন্য এত জরুরি ছিল কেন? সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিশ্চয়ই আমরা যা করছি তা আসলেই মানুষের কাজে লাগছে কিনা।'

'সেটিই আসলে ঠিক, কান্টও অবশ্যই এ-ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করতেন না। কিন্তু আমরা যখন ভেতরে ভেতরে জানি যে নৈতিক নিয়মের প্রতি শ্রদ্ধাবশতই আমরা কাজ করছি তখনই কেবল আমরা স্বাধীনভাবে কাজ করি।'

'যখন একটা নিয়ম মেনে চলি তখনই আমরা স্বাধীনভাবে কাজ করি? এটা কি একটু অদ্ভুত হয়ে গেল না?'

'কান্ট বলছেন, তা নয়। বোধকরি তোমার মনে আছে যে তাকে 'ধরে নিতে' বা postulate করতে হয়েছিল যে মানুষ স্বাধীন ইচ্ছার অধিকারী। এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, কারণ কান্ট আরও বলেছিলেন যে সবকিছুই কার্য-কারণ সূত্র মেনে চলে। তাহলে আর কী করে স্বাধীন ইচ্ছা থাকতে পারে আমাদের?'

'আমি কী করে বলব?'

'এইখানে কান্ট মানুষকে এমনভাবে দু'ভাগে ভাগ করছেন যা দেকার্ত যখন দাবি করেছিলেন যে মানুষ একটি 'দ্বৈত প্রাণী' তার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। মানুষ হচ্ছে দেহ ও মন এই দুইয়েরই অধিকারী। কান্ট বলছেন বস্তুগত প্রাণী হিসেবে আমরা সম্পূর্ণভাবে কার্য-কারণের অলঙ্ঘনীয় নিয়মের অধীন। আমরা যা প্রত্যক্ষ করি তা আমরা নির্ধারণ করি না, প্রয়োজনের মাধ্যমেই প্রত্যক্ষণ আসে আমাদের কাছে আর তা আমাদেরকে প্রভাবিত করে, ব্যাপারটা আমাদের পছন্দ হোক বা না হোক। কিন্তু আমরা কেবল বস্তুগত প্রাণী-ই নই, আমরা প্রজ্ঞাবিশিষ্ট প্রাণীও বটে।

'বস্তুগত প্রাণী হিসেবে আমরা পুরোপুরি প্রাকৃতিক জগতের অংশ বিশেষ। কাজেই আমরা কার্য-কারণজনিত সম্পর্কের অধীন। সে-হিসেবে আমাদের কোনো স্বাধীন ইচ্ছে

নেই। কিন্তু বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন প্রাণী হিসেবে আমরা সেটির একটি অংশ কান্ট যাকে বলছেন *das Ding an sich*, অর্থাৎ আমাদের ইন্দ্রিয় সংবেদন নিরপেক্ষ, অনন্য সাপেক্ষ জগৎ। যখন আমরা আমাদের 'ব্যবহারিক প্রজ্ঞা' (practical reason), যা আমাদেরকে নৈতিক বাছ-বিচার করতে বাধ্য করে, কেবল তখনই আমরা আমাদের স্বাধীন ইচ্ছা প্রয়োগ করি, কারণ যখন আমরা নৈতিক নিয়ম মেনে চলি বা তার বশ্যতা মেনে নিই তখন আমরাই সেই নিয়ম তৈরি করি যে-নিয়ম আমরা পালন করছি।'

'হ্যাঁ, এক হিসেবে কথা সত্যি। আমি-ই বা আমার ভেতরের একটা কিছুই আমাকে বলে অন্যের সঙ্গে দুর্ব্যবহার না করতে।'

'কাজেই যখন তুমি সেটি না করাটিই পছন্দ করছ, তখন ব্যাপারটি হয়ত তোমার স্বার্থের বিপক্ষে যাচ্ছে, কিন্তু তারপরেও তুমি স্বাধীনভাবে কাজ করছ।'

'যে কোনো ক্ষেত্রেই, যা ইচ্ছে তা করার মানেই যে কেউ মুক্ত বা স্বাধীন তা নয়।'

'মানুষ সব ধরনের জিনিসের দাস হয়ে উঠতে পারে। এমনকি মানুষ তার নিজের অহমিকতারও দাস হয়ে উঠতে পারে। কামনা-বাসনা আর অনৈতিকতার ওপরে ওঠবার জন্যই স্বাধীনতা বা মুক্তি দরকার।'

'কিন্তু জন্তু-জানোয়ারদের বেলায়? আমার মনে হয় ওরা স্রেফ ওদের প্রবণতা আর প্রয়োজন অনুযায়ী-ই চলে। ওদের নিশ্চয়ই নৈতিক নিয়ম মেনে চলার স্বাধীনতা নেই, না কি আছে?'

'না আর সেটিই ওদের সঙ্গে মানুষের পার্থক্য।'

'বুঝতে পেরেছি।'

'আর সবশেষে আমরা বলতে পারি যে বুদ্ধিবাদ আর অভিজ্ঞতাবাদের মধ্যকার সংগ্রামের ফলে দর্শন যে কানা গলিতে পৌছেছিল কান্ট সেটি থেকে বেরোবার রাস্তা দেখিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। কাজেই কান্টের সঙ্গেই দর্শনের ইতিহাসে একটি যুগের সমাপ্তি ঘটল। তিনি মারা যান ১৮০৪-এ; আমরা যে সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে রোমান্টিসিজম বলি তখন তা তুঙ্গে। কনিসবার্গে কান্টের সমাধিফলকে খোদাই করা আছে তাঁর সবচেয়ে বেশি উদ্ধৃত কথাটা: "যতো বেশি সময় ধরে আর তীব্রভাবে আমি দুটো বিষয়ের কথা ভাবি, ততোই ক্রমবর্ধমান বিস্ময় আর সশ্রদ্ধ ভীতিতে সেগুলো আমার মনকে ভরে দেয় আমার ওপরের তারাভরা আকাশ আর আমার ভেতরের নৈতিক নিয়ম।" '

চেয়ারে পিঠ ঠেস দিয়ে বসলেন অ্যালবার্টো। 'বাস, এই পর্যন্ত।' বললেন তিনি। 'আমার ধারণা, কান্ট সম্পর্কে সবচেয়ে জরুরি কথাগুলো তোমাকে বলে ফেলেছি আমি।'

'যাই হোক, সোয়া চারটা বাজে এখন।'

'অবশ্য একটা ব্যাপার এখনো বাকি আছে। স্রেফ এক মিনিট সময় দাও আমাকে।'

'টিচার তাঁর কথা শেষ করার আগে কখনো ক্লাসরুম ছেড়ে বাইরে যাই না আমি।'

'আমি কি বলেছিলাম যে নিছক ইন্দ্রিয়পরায়ণ জীব হিসেবে জীবন যাপন করলে আমাদের কোনো স্বাধীনতা থাকে না?'

'হ্যাঁ, এ-রকমই একটি কথা বলেছিলেন আপনি।'

'কিন্তু সর্বজনীন প্রজ্ঞা ব্যবহার করলে আমরা মুক্ত ও স্বাধীন। এ-কথাও কি বলেছি?'

'হ্যাঁ। কিন্তু এ-সব আবার বলছেন কেন?'

সোফির দিকে ঝুঁকে এলেন অ্যালবার্টো, গভীর দৃষ্টিতে তাকালেন তার চোখের দিকে, তারপর ফিসফিস করে বললেন: 'যা দেখো তাই-ই বিশ্বাস কোরো না, সোফি।'

'আপনি ঠিক কী বোঝাতে চাইছেন?'

'একবার শুধু ও-দিকটায় তাকিয়ে দেখো।'

'দেখুন, আমি কিন্তু আপনার কথা কিছুই বুঝতে পারছি না।

'লোকে সাধারণত বলে দেখলে তবেই বিশ্বাস করো। তুমি কিন্তু দেখলেও কোরো না।'

'এর আগেও এ-রকম একটি কথা বলেছিলেন আপনি।'

'হ্যাঁ, পার্মেনিদেস সম্পর্কে।'

'কিন্তু এখনো বুঝতে পারছি না আপনি কী বোঝাতে চাইছেন।'

'দেখো, বাইরে আমরা সিঁড়িতে বসে কথা বলছিলাম, তখন সেই তথাকথিত সামুদ্রিক সাপটা পানির মধ্যে দাপাদাপি শুরু করল।'

'দারুণ ছিল না ওটা?'

'মোটেই না। তো, এরপর রেড রাইডিংহুড এলো দরজার কাছে। 'আমি আমার দাদির বাড়ি খুঁজছি।' বালখিল্য সব ব্যাপার। এগুলো মেজরেরই ট্রিক, সোফি। সেই কলার খোসার ভেতরে দেয়া মেসেজ আর সেই মূর্খামিভরা ঝড়বৃষ্টিটা।'

'আপনার কি মনে হয়...?'

'কিন্তু আমি বলেছি আমার একটা প্ল্যান আছে। যতক্ষণ আমরা আমাদের প্রজ্ঞার সঙ্গে রয়েছি সে আমাদের সঙ্গে কোনো জারিজুরি খাটাতে পারবে না। কারণ এক অর্থে আমরা স্বাধীন। সে আমাদেরকে সব ধরনের জিনিসকে 'প্রত্যক্ষ' করতে দিতে পারে; কিছুই আমাকে অবাক করবে না। সে যদি আকাশ অন্ধকার করে দেয় বা হাতিকে আকাশে ওড়ায় আমি স্রেফ মুচকি হাসবো। কিন্তু সাত আর পাঁচ যোগ করলে বারো হবে। এটা এমন একটা সত্য যা তার সমস্ত কমিক স্ট্রিপ মার্কা ঘটনার পরেও টিকে থাকবে। দর্শন রূপকথার ঠিক বিপরীত।'

কয়েক মুহূর্ত অবাক হয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকল সোফি।

'এখন তাহলে তোমার ছুটি,' শেষ পর্যন্ত অ্যালবার্টো বললেন।

'রোমান্টিসিজমের ওপর একটা বৈঠকের জন্য ডাকবো আমি তোমাকে পরে। হেগেল আর কিয়ের্কেগার্ডের কথাও শোনার দরকার আছে তোমার। কিন্তু কিয়েভিক এয়ারপোর্টে মেজর এসে পৌছানোর আর এক হপ্তা বাকি মোটে। তার আগেই লোকটার আঠাল ফ্যান্টাসি থেকে মুক্তি পেতে হবে আমাদেরকে। আজ এ-পর্যন্ত সোফি। তবে শেষ করার আগে শুধু এটুকু শুনে রাখো যে আমাদের দু'জনকে নিয়ে চমৎকার একটা পরিকল্পনা করছি আমি।'

'আমি তাহলে আসি।'

'দাঁড়াও, সম্ভবত সবচেয়ে জরুরি জিনিসটির কথাই ভুলে গেছি আমরা।'
'সেটি কী?'
'জন্মদিনের গান, সোফি। হিল্ডার বয়স আজ পনেরো হলো।'
'আমারও।'
'হ্যাঁ, তোমারও। তাহলে গাওয়া যাক।'
দু'জনেই উঠে দাঁড়িয়ে গাইতে শুরু করল

'হ্যাপি বার্থ ডে টু ইউ।'

সাড়ে চারটা বাজে। লেকের প্রান্ত পর্যন্ত দৌড়ে গেল সোফি, তারপর নৌকো বেয়ে পৌঁছে গেল অপর পাড়ে। নৌকোটা নলখাগড়ার ঝোপ পর্যন্ত টেনে রাখল সে, তারপর পা চালাল বনের ভেতর দিয়ে।

রাস্তায় পৌঁছানোর পর হঠাৎ লক্ষ করল কী যেন নড়ছে গাছগুলোর মধ্যে। ছোট্ট রেড রাইডিংহুড বনের মধ্যে একা তার দাদির বাড়ি খুঁজে বেড়াচ্ছে হয়ত, ভাবল সোফি, কিন্তু গাছের সেই মূর্তিটা আরও অনেক ছোট।

কাছে এগোল সে। একটা পুতুলের চেয়ে বড় হবে না ওটা। বাদামি রঙের, পরনে একটা সোয়েটার।

ওটা যে একটা টেডি বিয়ার সে-কথা বুঝতে পেরে হাঁটা থামিয়ে একেবারে স্থির হয়ে গেল সোফি।

বনের মধ্যে কেউ একটা টেডি বিয়ার ফেলে রেখে যেতে পারে, তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। কিন্তু এই টেডি বিয়ারটা জ্যান্ত আর তাছাড়া মনে হচ্ছে ভয়ানক ব্যস্ত।

'হাই,' সোফি বলে উঠল।

'আমার নাম উইনি-দ্য-পুহ্,' টেডি বিয়ারটা বলল। 'কিন্তু কপাল খারাপ, বনের মধ্যে পথ হারিয়ে ফেলেছি, নইলে এমনিতে দিনটি মন্দ ছিল না। কিন্তু তোমাকে তো আগে কখনো দেখিনি?

'হয়ত আমি এখানে কখনো আসিনি,' সোফি বলল। 'কিন্তু তারপরেও 'একশ একর জঙ্গলে' তুমি তোমার বাড়িতে ফিরে যেতে পারো।'

'না, ওই অঙ্কটা খুব কঠিন। ভুলে যেয়ো না আমি ছোট্ট একটা ভালুক মাত্র, তাছাড়া খুব চালাকও নই।'

'তোমার কথা শুনেছি আমি।'

'আমার মনে হয় তুমি এলিস। ক্রিস্টোফার রবিন একদিন বলেছিল তোমার কথা। আমার ধারণা সেভাবেই সাক্ষাৎ হয়েছিল আমাদের। একটা বোতল থেকে তুমি এতো বেশি খেয়েছিলে যে ছোট হতেই থাকলে। কিন্তু তারপর আরেকটা বোতল থেকে খেলে তুমি, তখন আবার বড় হতে শুরু করলে। কী খাচ্ছ না খাচ্ছ সে-ব্যাপারে সাবধান থাকতে হয়। একবার আমি এতো বেশি খেয়ে ফেলেছিলাম যে আটকা পড়ে গিয়েছিলাম একটা খরগোশের গর্তে।'

'আমি এলিস না।'

'তুমি কে তাতে কিছুছু এসে যায় না। জরুরি ব্যাপারটা হচ্ছে আমরা একটা কিছু। পেঁচা সে-কথাই বলেছিল, বেশ জ্ঞানগম্যি ওর। একদিন সাদামাটা একটি রোদেলা দিনে সে বলেছিল সাত আর চারে বারো হয়। আইওর আর আমার দু'জনেরই বড্ড বোকা বোকা লেগেছিল, কারণ অঙ্ক করা খুব কঠিন। তারচেয়ে বরং আবহাওয়ার পূর্বাভাস দেয়া সহজ।'

'আমার নাম সোফি।'

'তোমার সঙ্গে পরিচিত হয়ে ভালো লাগল, সোফি। তা, যা বলছিলাম, তুমি নিশ্চয়ই এ-দিকটায় নতুন এসেছো। কিন্তু এবার তো এই ক্ষুদে ভালুককে যেতে হয়, কারণ পিগলেটকে খুঁজে বের করতে হবে আমার। খরগোশ আর তার বন্ধুদের জন্য দেয়া বিশাল একটা গার্ডের পার্টিতে যাচ্ছি আমরা।'

একটা থাবা নেড়ে বিদায় জানাল সে। এবার সোফি দেখতে পেল ভালুকটি তার অন্য থাবায় ছোট্ট একটা ভাঁজ করা কাগজ ধরে আছে।

'ওটা কী?' সোফি জিজ্ঞেস করল।

উইনি-দ্য-পুহ্ কাগজটা দেখিয়ে বলল : 'এটার জন্যই তো পথ হারালাম আমি।'

'কিন্তু এটা তো নেহাতই এক টুকরো কাগজ।'

'না, এটা শুধু এক টুকরো কাগজ নয়, এটা হিল্ডা-থ্রু-দ্য-লুকিং-গ্লাসের কাছে লেখা একটা চিঠি।'

'ও, তাহলে ওটা আমি নিতে পারি।'

'তুমি কি সেই আয়নার মেয়েটি?'

'না, কিন্তু '

'যার চিঠি সব সময়ই সেটি তার কাছে দিতে হয়। এই তো মাত্র কালই ক্রিস্টোফার রবিন সেটি শেখাতে বাধ্য হলো আমাকে।'

'কিন্তু হিল্ডাকে আমি চিনি।'

'তাতে কিছু আসে যায় না। কারও সঙ্গে যতই পরিচয় থাক তারপরেও তার চিঠি পড়া উচিত নয়।'

'আমি বলতে চাইছি যে চিঠিটিই আমি হিল্ডাকে দিতে পারি।'

'সেটি অবশ্য একেবারে ভিন্ন ব্যাপার। এই নাও, সোফি। এই চিঠিটির হাত থেকে নিষ্কৃতি পেলে সম্ভবত আমি পিগলেটকেও পাবো। হিল্ডা-থ্রু-দ্য-লুকিং-গ্লাসকে খুঁজে পেতে হলে প্রথমে তোমাকে বড়সড় একটা আয়না জোগাড় করতে হবে। কিন্তু সেটি খুব একটা সহজ কাজ নয় এখানে।'

এই কথা বলে ছোট্ট ভালুকটা ভাঁজ-করা কাগজটা সোফির হাতে ধরিয়ে দিয়ে ছোট্ট ছোট্ট পা ফেলে বনের ভেতর রওনা হয়ে গেল। সে দৃষ্টির আড়ালে চলে যেতে সোফি কাগজের টুকরোটির ভাঁজ খুলে সেটি পড়তে শুরু করল :

> প্রিয় হিল্ডা, এটা খুবই দুঃখজনক যে অ্যালবার্টো সোফিকে আরেকটা কথা বলেননি যে কান্ট একটি 'জাতিপুঞ্জ' গঠনের পক্ষে জোর মত প্রকাশ করেছিলেন। তিনি তাঁর প্রবন্ধ চিরন্তন শান্তি-তে লিখেছিলেন যে সবকটি

দেশের একটি জাতিপুঞ্জের ছত্রছায়ায় একতাবদ্ধ হওয়া উচিত। ১৭৯৫ সালে প্রবন্ধটি প্রকাশিত হওয়ার ১২৫ বছর পর, প্রথম মহাযুদ্ধ শেষে গঠিত হয়েছিল জাতিপুঞ্জ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর জাতিসংঘ সেটিকে প্রতিস্থাপিত করে। কাজেই এক অর্থে তুই বলতে পারিস যে কান্ট-ই ছিলেন জাতিসংঘের ধারণার জনক। কান্টের যুক্তি ছিল এই যে, মানুষের 'ব্যবহারিক প্রজ্ঞা'র দাবি হচ্ছে জাতিগুলো তাদের বুনো প্রকৃতি থেকে বেরিয়ে আসুক—যে বুনো প্রকৃতির কারণেই যুদ্ধ বিগ্রহ ঘটে—এবং শান্তি রক্ষায় চুক্তিবদ্ধ হোক। যদিও একটি জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠার পথ বিঘ্নসঙ্কুল, তারপরেও 'শান্তির সার্বজনীন ও দীর্ঘস্থায়ী সংরক্ষণ'-এর জন্য কাজ করা আমাদের কর্তব্য। এ-ধরনের একটি সংঘ প্রতিষ্ঠা ছিল কান্টের জন্য একটি অতি দূরবর্তী লক্ষ্য। তুই অনেকটা বলতে পারিস যে ওটা ছিল দর্শনের পরম লক্ষ্য। এই মুহূর্তে আমি লেবাননে আছি। ভালোবাসা নিস, বাবা।

চিরকুটটা সোফি তার পকেটে পুরে বাড়ির দিকে চলতে থাকে। অ্যালবার্টো তাকে বনের মধ্যে এ-ধরনের দেখা-সাক্ষাতের ব্যাপারেই সতর্ক করে দিয়েছিলেন। কিন্তু সে তো আর সেই ছোট্ট টেডিটাকে হিল্ডা-থ্রু-দ্য-লুকিং-গ্লাসের পেছনে বনের ভেতর এক অন্তহীন সন্ধান চালিয়ে যেতে দিতে পারে না, তাই না?

৬না শা ।ন্ট াস জ ম
ছয়ে

...রহস্যের পথ অন্তর্মুখী...

ভারি রিং বাইন্ডারটাকে নিজের কোলের ওপর গড়িয়ে পড়তে দিল সোফি। তারপর সেটিকে মেঝেতে গড়িয়ে পড়ে যেতে দিল।

যখন সে বিছানায় উঠেছিল তখনকার চেয়ে ঘরে অনেক বেশি আলো এখন। ঘড়ির দিকে তাকাল সে। প্রায় তিনটা বাজে।

গুটিসুটি মেরে চাদরের ভেতর ঢুকে পড়ে চোখ বন্ধ করল সে। ঘুমিয়ে পড়বার সময় সে ভাবল তার বাবা রেড রাইডিংহুড আর পুহ্-র কথা লিখলেন কেন...

পরদিন সকাল এগারোটা পর্যন্ত ঘুমোল সে। শরীরের টানটান ভাবটা তাকে বলে দিল সারারাত সে স্বপ্ন দেখেছে, কিন্তু কী স্বপ্ন তা সে মনে করতে পারল না। মনে হলো ওটা যেন একেবারে আলাদা একটা বাস্তবতা। নিচে নেমে এসে ব্রেকফাস্ট তৈরি করল সে। তার মা নীল জাম্পস্যুট পরে নিয়েছেন বোটহাউসে গিয়ে মোটরবোটটা ঠিকঠাক করার জন্য। ওটা জলে না থাকলেও, বাবা যখন লেবানন থেকে ফিরে আসবে তখন বোটটাকে একেবারে ফিটফাট থাকতে হবে।

'তুই নিচে এসে একটু হাত লাগাবি নাকি আমার সঙ্গে?'

'আগে একটু পড়তে হবে আমাকে। চা আর মাঝ-সকালের নাস্তা নিয়ে যাবো আমি?'

'মাঝ-সকাল কী বলছিস?'

খাওয়া সেরে নিজের ঘরে গেল হিল্ডা, বিছানাটা গোছগাছ করল । তারপর রিং বাইন্ডারটা দুই হাঁটুর ওপর রেখে বসল আরাম করে।

বিরাট যে-বাগানটাকে একসময় সোফি তার নিজের নন্দনকানন বলে ভেবেছিল তার মধ্যে এসে দাঁড়াল সে বেড়ার ভেতর দিয়ে গলে...

আগের রাতের ঝড়ের পর সব জায়গায় ডালপালা আর পাতা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। তার মনে হলো সেই ঝড় আর ভেঙে-পড়া ডালপালার সাথে ছোট্ট রেড রাইডিংহুড আর উইনি-দ্য-পুহ্র সঙ্গে তার সাক্ষাতের একটা সম্পর্ক রয়েছে।

বাড়ির ভেতর ঢুকল সে। মাত্র কিছুক্ষণ আগে বাড়ি ফিরেছেন তার মা, ফ্রিজে কিছু সোডার বোতল রাখছিলেন তিনি। টেবিলের ওপর দারুণ মজার দেখতে একটা

চকলেট কেক রাখা।

'কোনো মেহমান আসছে বুঝি?' জিজ্ঞেস করল সোফি; সে প্রায় ভুলেই গেছে আজ তার জন্মদিন।

'আসলে পার্টিটা হচ্ছে সামনের শনিবার। কিন্তু আমি ভাবলাম আজকেও ছোট্ট একটা উৎসব করলে মন্দ হয় না।'

'কীভাবে?'

'জোয়ানা আর ওর বাবা-মাকে দাওয়াত দিয়েছি আমি।'

'বেশ তো।'

সাড়ে সাতটার খানিক আগে পৌঁছে গেলেন অতিথিরা। পরিবেশটা খানিকটা ফর্মাল-ই হলো। সামাজিক অনুষ্ঠানে জোয়ানার বাবা-মাকে খুব কমই দেখেছেন সোফির মা।

খানিক পরেই সোফি আর জোয়ানা সোফির ঘরে উঠে এলো গার্ডেন পার্টির দাওয়াত-পত্রটা লেখার জন্য। অ্যালবার্টো নক্সকেও যেহেতু ডাকা হচ্ছে সোফির তাই মনে হয়েছিল লোকজনকে একটা 'দার্শনিক গার্ডেন পার্টি'-তে দাওয়াত করলে মন্দ হয় না, জোয়ানা তাতে আপত্তি করেনি। শত হলেও পার্টিটা সোফির আর তাছাড়া ইদানীং থিম পার্টির বেশ চল-ও হয়েছে।

শেষ পর্যন্ত দাওয়াত-পত্রটা লেখা শেষ হলো ওদের। দু'ঘণ্টা সময় লাগল ওটা শেষ করতে আর এই দু'ঘণ্টা ওরা হেসে কুটিপাটি হয়েছে।

প্রিয়...

আসছে শনিবার ২৩ জুন (মিডসামার ঈভ্) সন্ধ্যা ৭টায় ৩ ক্লোভার ক্লোজ-এ অনুষ্ঠিতব্য একটি দার্শনিক গার্ডেন পার্টিতে আপনাকে নেমন্তন্ন। সেই সন্ধ্যায় আমরা জীবনের রহস্য উন্মোচন করব বলে আশা রাখি। অনুগ্রহ করে সঙ্গে গরম সোয়েটার আর দর্শনগত ধাঁধা সমাধানের উপযোগী দারুণ সব আইডিয়া নিয়ে আসবেন। আমরা বহ্ন্যুৎসব করতে পারছি না, কিন্তু নিজের কল্পনার শিখা জ্বলতে দিতে কারও কোনো বাধা থাকবে না। আমন্ত্রিত অতিথিদের মধ্যে অন্তত একজন প্রকৃত দার্শনিক থাকবেন। সে-কারণেই পার্টিটা হবে একান্তই আমাদের নিজস্ব আয়োজন। সংবাদপত্রের লোকজনের প্রবেশাধিকার থাকবে না সেখানে।

শুভেচ্ছান্তে,
জোয়ানা ইঙ্গেব্রিগস্টেন (আয়োজক কমিটি)
সোফি অ্যামুন্ডসেন (নিমন্ত্রণকর্ত্রী)

মেয়ে দুটো নিচে নেমে এলো তাদের বাবা-মা'র কাছে, তাঁরা তখন আগের চেয়ে খানিকটা বেশি অন্তরঙ্গ হয়ে কথা বলছেন। ক্যালিগ্রাফি করার একটা কলম দিয়ে লেখা খসড়া দাওয়াত-পত্রটা সোফি তার মায়ের হাতে দিল।

'এটার আঠারোটা কপি করতে পারবে, প্লিজ?' এর আগেও বেশ কয়েকবার

মা-কে তার অফিস থেকে ফটোকপি করে আনতে দিয়েছে সে।

তার মা দাওয়াত-পত্রটা পড়ে সেটি জোয়ানার বাবার হাতে দিলেন। 'আপনি বুঝতে পারছেন তো আমি কী বলতে চাইছি? ওর মাথায় একটু গণ্ডগোল দেখা দিয়েছে।'

'কিন্তু এটাতো বড্ড এক্সাইটিং ব্যাপার বলে মনে হচ্ছে,' কাগজের টুকরোটা স্ত্রীর হাতে ধরিয়ে দিয়ে মন্তব্য করলেন জোয়ানার বাবা। 'আমি নিজে তো সানন্দে আসবো।'

বার্বি-ও দাওয়াত-পত্রটা পড়লেন। তারপর বললেন, 'তা তো বটেই। তা, আমরা কি আসতে পারি, সোফি?'

'তাহলে বিশ কপি-ই কোরো।' ওঁদের কথা সত্যি ধরে নিয়ে সোফি বলল।

'তোমাদের নিশ্চয়ই মাথা খারাপ!' জোয়ানা বলল।

সে-রাতে বিছানায় যাওয়ার আগে বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকল সোফি। কী করে একবার অন্ধকারে অ্যালবার্টোর দেহকাঠামো দেখেছিল সে সে-কথা মনে পড়ল সোফির। সেটি এক মাসেরও আগের কথা। এখনও রাত অনেক গভীর, কিন্তু আজ এক ঝকমকে গ্রীষ্মের রাত।

মঙ্গলবার সকালের আগ পর্যন্ত অ্যালবার্টোর তরফ থেকে কোনো সাড়া-শব্দ পেল না সোফি। সেদিন তার মা কাজে চলে যাওয়ার ঠিক পরপরই ফোন করলেন তিনি।

'সোফি অ্যামুন্ডসেন।'

'আর অ্যালবার্টো নক্স।'

'সে-রকমই ভেবেছিলাম।'

'দুঃখিত, আরও আগে ফোন করতে পারিনি বলে, কিন্তু আমি আসলে আমাদের সেই প্ল্যানটা নিয়ে খুব ব্যস্ত ছিলাম। মেজর যখন পুরোপুরি তোমার ওপর মনোযোগ দেয় কেবল তখনই আমি একা হতে পারি, নির্বিঘ্নে কাজ করতে পারি।'

'সেটিতো বড্ড অদ্ভুত ব্যাপার।'

'তো, তখন আমি সুযোগটাকে কাজে লাগাই, বুঝতে পারলে? দুনিয়ার সবচেয়ে সেরা প্রতিরক্ষা ব্যবস্থারও সীমাবদ্ধতা থাকে যখন তা মাত্র একজন লোক নিয়ন্ত্রণ করে তোমার কার্ড পেয়েছি।'

'মানে সেই নেমন্তন্নের?'

'রিস্কটা নেয়ার সাহস হয় তোমার?'

'কেন নয়?'

'ও-রকম একটা পার্টিতে যা কিছু তাই ঘটতে পারে।'

'আপনি আসছেন তো?'

'অলবৎ। কিন্তু আরেকটি ব্যাপার আছে। তোমার কি মনে ছিল যে ওই দিনই হিল্ডার বাবা লেবানন থেকে আসছে?'

'না, সত্যি বলতে কী, খেয়াল ছিল না।'

'ব্যাপারটা হয়ত পুরোটাই কাকতালীয় নয় যে সে যেদিন বিয়ার্কলে-তে ফিরছে

সেদিনই একটি দার্শনিক গার্ডেন পার্টি আয়োজনের ব্যবস্থা করতে দিয়েছে তোমাকে।'

'বললাম তো, কথাটা মাথায় আসেনি আমার।'

'আমি নিশ্চিত, তার মাথায় ঠিকই এসেছিল। কিন্তু সে যাকগে, এ-নিয়ে পরে কথা বলব আমরা। আজ সকালে মেজরের কেবিনে আসতে পারবে?'

'ফ্লাওয়ার বেডগুলোর আগাছা পরিষ্কার করার কথা আমার।'

'তাহলে দুটোর সময়। পারবে তখন?'

'ঠিক আছে, থাকবো আমি ওখানে।'

সোফি যখন পৌছল, অ্যালবার্টো নক্স তখন আবারো সিঁড়ির ওপর বসে।

'বোসো,' তিনি বললেন, সরাসরি কাজের কথায় এসে।

'এর আগে আমরা রেনেসাঁ, বারোক যুগ আর আলোকপ্রাপ্তির কথা বলেছি। আজ আমরা কথা বলবো রোমান্টিসিজম নিয়ে। এটাকে বলা যেতে পারে ইউরোপের শেষ মহান সাংস্কৃতিক যুগ। দীর্ঘ কাহিনীটির শেষ দিকে এগোচ্ছি আমরা, সোফি।'

'রোমান্টিসিজম কি অতোদিন ধরে চলেছিল?'

'এর শুরুটা হয়েছিল অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে আর তা চলেছিল উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত। কিন্তু ১৮৫০-এর পর আর এমন কোনো সম্পূর্ণ যুগের কথা বলা গেল না যে-যুগ কাব্য, দর্শন, শিল্পকলা, বিজ্ঞান আর সঙ্গীত দিয়ে গড়া।'

'রোমান্টিসিজম কি তাহলে সে-রকম একটা যুগ?'

'বলা হয়ে থাকে যে রোমান্টিসিজম-ই ছিল জীবনের দিকে ইউরোপের শেষ সম্মিলিত অথবা সাধারণ অগ্রযাত্রা। রোমান্টিসিজমের শুরু জার্মানিতে, প্রজ্ঞার ওপর আলোকপ্রাপ্তির অবিচল আস্থার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ। কান্ট আর তার শীতল বুদ্ধিবাদের পরে জার্মান তারুণ্য যেন স্বস্তির একটা নিঃশ্বাস ফেলল।'

'তা সেটির জায়গায় তারা কী নিয়ে এলো?'

'নতুন জনপ্রিয় শব্দগুলো ছিল 'অনুভূতি,' 'কল্পনা', 'অভিজ্ঞতা' আর 'আকুতি'। আলোকপ্রাপ্তিযুগের কয়েকজন দার্শনিকও অনুভূতির গুরুত্বের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে রুশোর নাম কম উল্লেখযোগ্য নয়, কিন্তু তখন সেটি ছিল প্রজ্ঞার প্রতি পক্ষপাতিত্বের একটা সমালোচনা স্বরূপ। একসময় যা ছিল একটা চোরাস্রোত এখন তা-ই হয়ে দাঁড়াল জার্মান সংস্কৃতির প্রধান ধারা।'

'কান্টের জনপ্রিয়তা তাহলে বেশিদিন টেকেনি?'

'টিকেছিল আবার টেকেওনি। অনেক রোমান্টিক-ই নিজেদেরকে কান্টের উত্তরসূরি বলে মনে করতেন, যেহেতু কান্ট-ই এ-কথা প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন যে 'das Ding an sich' সম্পর্কে আমরা কী জানতে পারবো তার একটা সীমা আছে। অন্য দিকে আবার, জ্ঞান বা বোধ (cognition)-এর ক্ষেত্রে অহম-এর গুরুত্বের কথাও জোর দিয়ে বলেছেন তিনি। কাজেই ব্যক্তি এখন জীবনকে তার নিজের মতো করে ব্যাখ্যা করে নেয়ার ব্যাপারে পূর্ণ স্বাধীনতা পেয়ে গেল। এরই সুযোগ নিলেন রোমান্টিকরা প্রায় অবারিত এক 'অহম পূজা'-র মধ্য দিয়ে, যা জন্ম দিল শৈল্পিক প্রতিভাকে মহিমান্বিত করার বিষয়টির।'

'এ-ধরনের প্রতিভা তখন খুব বেশি ছিল বুঝি?'

'এঁদের মধ্যে একজন ছিলেন *বেঠোভেন* (Beethoven)। তাঁর সঙ্গীত তাঁরই নিজস্ব অনুভূতি আর আকুতি প্রকাশ করে। এক অর্থে বেঠোভেন ছিলেন একজন 'স্বাধীন' শিল্পী—বারোক মাস্টার বাখ্ আর হ্যান্ডেল কিন্তু তা ছিলেন না। তাঁরা তাঁদের সঙ্গীত রচনা করতেন ঈশ্বরের মহিমা প্রকাশের জন্য, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কঠোর সাঙ্গিতিক ফর্মের মধ্যে থেকে।'

'আমি শুধু মুনলাইট সোনাটা আর ফিফ্‌থ্ সিম্ফনির কথা জানি।'

'কিন্তু তুমি এটা তো জানো মুনলাইট সোনাটা কতটা রোমান্টিক আর ফিফ্‌থ্ সিম্ফনিতে বেঠোভেন কতটা নাটকীয়ভাবে নিজেকে প্রকাশ করেছেন।'

'আপনি বলেছিলেন রোমান্টিক মানবতাবাদীরা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীও ছিলেন।'

'ঠিক। রেনেসাঁ আর রোমান্টিসিজমের মধ্যে মিল ছিল প্রচুর। তার মধ্যে প্রধান একটি হলো মানুষের বোধ-এ শিল্পের গুরুত্বের বিষয়টি। এক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন কান্ট। তিনি তাঁর নন্দনতত্ত্বে খতিয়ে দেখার চেষ্টা করেছেন সৌন্দর্য, এই যেমন ধরো শিল্পের কোনো কাজের সৌন্দর্য, যখন আমাদের অভিভূত করে ফেলে তখন কী ঘটে। শুধু নান্দনিক আনন্দের জন্য যখন একটি শৈল্পিক কাজের ভেতর নিজেদেরকে আমরা সমর্পণ করি তখন 'das Ding an sich'-এর অভিজ্ঞতার কাছাকছি চলে যাই আমরা।'

'তাহলে দার্শনিক যা প্রকাশ করতে পারেন না শিল্পী তা দিতে পারেন দেখা যাচ্ছে?

'রোমান্টিকদের দৃষ্টিভঙ্গি সে-রকমই ছিল। কান্টের বক্তব্য অনুযায়ী, শিল্পী তাঁর বোধশক্তির ওপর স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারেন। জার্মান কবি *শিলার* (Schiller) কান্টের চিন্তাকে আরও সম্প্রসারিত করেন। তিনি লিখেছিলেন যে শিল্পীর কাজকর্ম খেলা করার মতো আর মানুষ যখন খেলে তখন সে স্বাধীন ছাড়া কিছু নয়, কারণ তখন সে তার নিজের নিয়ম-কানুন তৈরি করে। রোমান্টিকরা বিশ্বাস করতেন 'যা ব্যক্ত করা যায় না' তার কাছে কেবল শিল্পই আমাদের নিয়ে যেতে পারে। কেউ কেউ তো এতোদূর পর্যন্ত গেলেন যে শিল্পীকে ঈশ্বরের সঙ্গে তুলনা করলেন।'

'কারণ ঈশ্বর যেভাবে জগৎ তৈরি করেছেন শিল্পী সেভাবে তাঁর নিজের বাস্তবতা তৈরি করেন।'

'বলা হতো যে শিল্পীর রয়েছে এক 'মহাবিশ্ব-সৃষ্টিকারী কল্পনা'। শৈল্পিক পরমানন্দে ভাবাবেগে অভিভূত দশায় তিনি স্বপ্ন আর বাস্তবের সীমারেখা মুছে যাওয়ার অনুভূতি লাভ করতে পারেন।

'তরুণ প্রতিভাবানদের অন্যতম *নোভালিস* (Novalis) বলেছেন, 'জগৎ হয়ে যায় স্বপ্ন আর স্বপ্ন জগৎ।' মধ্যযুগের পটভূমিতে *Heinrich von Ofterdingen* নামের একটি উপন্যাস লিখেছিলেন তিনি, সেটি শেষ করার আগেই ১৮০১ সালে মৃত্যু হয় তাঁর: কিন্তু তারপরেও উপন্যাস হিসেবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সেটি। উপন্যাসে হেনরিখ নামের এক যুবকের কথা বলা হয়েছে যে একটা 'নীল ফুল' খুঁজে বেড়াচ্ছে; স্বপ্নে একবার সেই ফুলটিকে দেখেছিল সে আর তারপর থেকেই সেটির জন্য আকুল

আকাঙ্ক্ষা তার। ইংরেজ রোমান্টিক কবি *কোলরিজ*-ও (Coleridge) একই ধারণা ব্যক্ত করেছেন খানিকটা এ-ধরনের কথা বলে

'ধরো যদি ঘুমিয়ে পড়লে? আর ধরো যদি সেই ঘুমের ভেতর তুমি একটা স্বপ্ন দেখলে? আর ধরো যদি সেই স্বপ্নে তুমি স্বর্গে গিয়ে অদ্ভুত আর সুন্দর একটা ফুল তুললে? আর ধরো যদি জেগে উঠে সেই ফুলটিকে তোমার হাতে দেখতে পেলে? তো, কী হবে তখন?'

'কী সুন্দর!'

'এমন কিছু যা দূরের, যা পাওয়া যায় না তার জন্য এই আকুল আকাঙ্ক্ষা-ই রোমান্টিকদের বৈশিষ্ট্য। হারিয়ে যাওয়া সময় যেমন মধ্যযুগের জন্য আকুতি অনুভব করতেন তাঁরা, যে-মধ্যযুগকে আলোকপ্রাপ্তির নেতিবাচক মূল্যায়নের পর তখন অতি উৎসাহভরে নতুন করে দেখা হচ্ছিল। তাছাড়া তাঁরা প্রাচ্য আর তার অতীন্দ্রিয়বাদের মতো দূরের সংস্কৃতির প্রতিও আকুতি অনুভব করতেন। বা তাঁরা আকর্ষণ অনুভব করতেন রাত্রি, প্রদোষকাল, প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ আর পরাবাস্তবতার প্রতি। আমরা সাধারণত যাকে জীবনের অন্ধকার, ঝাপসা, অতিপ্রাকৃত আর রহস্যময় দিক বলি সেদিকটা নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন তাঁরা।

'এ-সব শুনে তো পিরিয়ডটাকে আমার খুব এক্সাইটিং বলে মনে হচ্ছে। তা, এই রোমান্টিকদের মধ্যে কে কে ছিলেন?'

'রোমান্টিসিজমটা ছিল প্রধানত একটা শহুরে ব্যাপার। গত শতাব্দীর প্রথমার্ধে আসলে ইউরোপের অনেক জায়গাতেই মেট্রোপলিটন সংস্কৃতির একটা জোয়ার ছিল। জার্মানির নাম এক্ষেত্রে কম উল্লেখযোগ্য নয়। প্রতিনিধিত্বশীল রোমান্টিকেরা ছিলেন বয়সে তরুণ, বেশিরভাগই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, যদিও তাঁরা তাঁদের পড়াশোনাকে খুব একটা গুরুত্বের সঙ্গে নেননি। জীবনের প্রতি তাঁদের একটা ইচ্ছাকৃত মধ্যবিত্ত-বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গি ছিল, এই যেমন পুলিশ বা তাঁদের বাড়িওয়ালীদেরকে তাঁরা শিল্প-সংস্কৃতি সম্পর্কে অজ্ঞ বা উদাসীন বা স্রেফ শত্রু বলে উল্লেখ করতেন।'

'কোনো রোমান্টিককে ঘর ভাড়া দেয়ার সাহস আমার হতো না।'

'১৮০০ সালের দিকে তরুণ ছিলেন প্রথম প্রজন্মের রোমান্টিকেরা এবং রোমান্টিক আন্দোলন আমরা আসলে ইউরোপের প্রথম ছাত্র আন্দোলন বলতে পারি। একশো পঞ্চাশ বছর পরের হিপ্পিদের সঙ্গে রোমান্টিকদের খুব একটা অমিল ছিল না কিন্তু।'

'তার মানে সেই ফ্লাওয়ার পাওয়ার, লম্বা লম্বা চুল নিয়ে যারা গিটার বাজাত, এখানে-সেখানে শুয়ে থাকত, তারা?'

'হ্যাঁ। বলা হতো 'আলস্য-ই হচ্ছে প্রতিভাধরের আদর্শ, শ্রমবিমুখতা রোমান্টিকের গুণ'। জীবন সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জনই একজন রোমান্টিকের কর্তব্য-বা নিজেকে সেটি থেকে দূরে সরিয়ে নেয়ার স্বপ্ন দেখা। দৈনন্দিন ব্যাপার-স্যাপারগুলোর ভার তাদের ওপরই ছেড়ে দেয়া ভালো যারা শিল্প-সংস্কৃতি সম্পর্কে অজ্ঞ, উদাসীন।'

'বায়রন তো একজন রোমান্টিক কবি ছিলেন, তাই না?'

'হ্যাঁ, বায়রন আর শেলি দু'জনেই তথাকথিত স্যাটানিক স্কুলের রোমান্টিক কবি ছিলেন। তাছাড়া, রোমান্টিক যুগকে বায়রন উপহার দিয়েছিলেন সেটির আইডল বায়রনিক হিরো-অস্বভাবী (alien), খেয়ালি, বিদ্রোহী এক সত্তা, শুধু শিল্পের ক্ষেত্রেই নয় বাস্তব জীবনেও। বায়রন নিজেও ছিলেন একগুঁয়ে আর প্রবল আবেগপূর্ণ, তাছাড়া দেখতে অত্যন্ত সুদর্শন হওয়াতে ফ্যাশনদুরস্ত রমণী পরিবেষ্টিত। সাধারণ মানুষের মুখরোচক গল্পগুজব অনুযায়ী বায়রনের কবিতার রোমান্টিক অ্যাডভেঞ্চারগুলো তার নিজেরই জীবনের কাহিনী। তবে এ-কথা ঠিক যে তিনি অসংখ্য অবৈধ প্রেমে জড়িত থাকলেও সত্যিকারের ভালোবাসা নোভালিসের সেই নীল ফুলের মতোই চিরদিন তাঁর অধরা থেকে গেছে। নোভালিসের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল চৌদ্দ বছর বয়েসী একটি মেয়ের সঙ্গে। মেয়েটি তার পঞ্চদশ জন্মদিনের চার দিন পর মারা যায়, কিন্তু নোভালিস তাঁর স্বল্পায়ু জীবনের বাকি কটা দিন সেই মেয়েটির প্রতিই বিশ্বস্ত থাকেন।'

'মেয়েটি তার পঞ্চদশ জন্মদিনের চারদিন পর মারা গিয়েছিল বলছেন?'

'হ্যাঁ...'

'আজ আমার বয়স পনের বছর চারদিন।'

'আচ্ছা।'

'কী নাম ছিল মেয়েটার?'

'সোফি।'

'কী?'

'হ্যাঁ, তাই।'

'আপনি ভয় পাইয়ে দিলেন আমাকে। এটা কি একটা কাকতালীয় ঘটনা?'

সেটি আমি বলতে পারবো না, সোফি। তবে তার নাম ছিল সোফি।'

'বলে যান!'

'নোভালিস নিজে মারা যান মাত্র উনত্রিশ বছর বয়েসে। 'তরুণ বয়েসে মৃতদের' মধ্যে অন্যতম ছিলেন তিনি। রোমান্টিকদের অনেকেই তরুণ বয়েসে মারা যান, যক্ষাতেই প্রধানত। কেউ কেউ আত্মহত্যা করেন...'

'আহা।'

'যাঁরা বেশি বয়স পর্যন্ত বেঁচেছিলেন তাঁদের রোমান্টিকত্ব ত্রিশ বছর বয়সেই ঘুচে গিয়েছিল। তাঁদের কেউ কেউ আবার পুরোপুরি মধ্যবিত্ত আর প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে গিয়েছিলেন।

'তাহলে তারা সেই শত্রু বনে গিয়েছিলেন।'

'হয়ত। কিন্তু আমরা কথা বলছি রোমান্টিক ভালোবাসা নিয়ে। থিম হিসেবে প্রতিদানহীন ভালোবাসা প্রচলন করেন *গ্যেটে* (Goethe) সেই ১৭৭৪-এ, তাঁর উপন্যাস *তরুণ ওয়ার্থার এর দুঃখ*-তে। যে-রমণীকে সে ভালোবাসে তাকে না পেয়ে নিজের গায়ে গুলি চালাচ্ছে ওয়ার্থার এইখানে এসে শেষ হয় উপন্যাসটি।'

'এতো বাড়াবাড়ির দরকার ছিল কী?'

'এই উপন্যাস প্রকাশিত হওয়ার পর আত্মহত্যার হার বেড়ে যায় এবং ডেনমার্ক

আর নরওয়েতে কিছু দিনের জন্য নিষিদ্ধ থাকে বইটি। তার মানে রোমান্টিক হওয়া বিপজ্জনকও ছিল। এর সঙ্গে জড়িত ছিল প্রবল সব অনুভূতি।'

'আপনি যখন 'রোমান্টিক' শব্দটা উচ্চারণ করেন আমার মনে পড়ে যায় গহীন অরণ্য আর বুনো রূঢ় প্রকৃতিসহ বড় বড় ল্যান্ডস্কেপ পেইন্টিংয়ের কথা...সে-সবের অনেকগুলোতেই থাকে কুয়াশার ঘূর্ণি।'

'হ্যাঁ, রোমান্টিসিজমের বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে প্রকৃতি এবং প্রকৃতির রহস্য সম্পর্কে এই আকুলতা। আর আগেই বলেছি, এটা এমন একটা জিনিস যা পল্লী অঞ্চলে উদয় হয় না। হয়ত তোমার মনে পড়বে রুশোর কথা, যিনি 'ফিরে চল প্রকৃতির কাছে'—এই শ্লোগানটা চালু করেছিলেন। রোমান্টিকরা জনপ্রিয়তা দিয়েছিলেন শ্লোগানটাকে। আলোকপ্রাপ্তির যান্ত্রিকতাপূর্ণ মহাবিশ্বের বিরুদ্ধে রোমান্টিসিজম একটি উল্লেখযোগ্য প্রতিবাদ। বলা হয়ে থাকে যে প্রাচীন *মহাবৈশ্বিক চেতনা*-র একটি পুনরুজ্জীবনের পরোক্ষ প্রকাশ হলো রোমান্টিসিজম।'

'বুঝিয়ে বলুন, প্লিজ।'

'এর মানে হলো প্রকৃতিকে সামগ্রিকভাবে দেখা; রোমান্টিকরা তাঁদের উৎস হিসেবে কেবল স্পিনোজার কাছেই ফিরে যাচ্ছিলেন না, ফিরছিলেন প্লটিনাস আর রেনেসাঁ যুগের দার্শনিক জ্যাকব বোহমে (Jacob Böhme) আর জিওর্দানো ব্রুনোর কাছেও। এই তাবৎ চিন্তাবিদের মধ্যেই যে-জিনিসটি ছিল তা হচ্ছে প্রকৃতির ভেতরে তাঁরা একটি স্বর্গীয় 'অহম' প্রত্যক্ষ করেছিলেন।'

'তাহলে তাঁরা সর্বেশ্বরবাদী ছিলেন বলুন...'

'দেকার্ত আর হিউম দু'জনেই 'অহম' আর 'পরিব্যাপ্ত' বাস্তবতার মাঝখানে একটি স্পষ্ট বিভাজন রেখা টেনে দিয়েছিলেন। কান্টও জ্ঞানমূলক (cognitive) 'আমি' আর 'অনন্যসাপেক্ষ' প্রকৃতির মধ্যে এক সুস্পষ্ট বিভেদরেখা টেনে দিয়ে গেছেন। তো, এখন বলা হলো যে প্রকৃতি একটি বিশাল 'আমি' ছাড়া আর কিছুই নয়। 'বিশ্ব আত্মা' বা 'বিশ্ব চিদাত্মা' কথাগুলোও ব্যবহার করতেন রোমান্টিকরা।'

'আচ্ছা।'

'শীর্ষস্থানীয় রোমান্টিক দার্শনিক ছিলেন *শেলিং* (Schelling), জন্ম ১৭৭৫-এ, মৃত্যু ১৮৫৪-তে। মন আর বস্তুকে এক করতে চেয়েছিলেন তিনি। শেলিং বিশ্বাস করতেন প্রকৃতির সমস্ত কিছু-মানব আত্মা আর ভৌত বাস্তবতা, এই দুই-ই-এক পরম বা বিশ্ব চিদাত্মার প্রকাশ।'

'আচ্ছা, ঠিক স্পিনোজার মতো।'

'শেলিং-এর বক্তব্য অনুযায়ী, প্রকৃতি হচ্ছে দৃশ্যমান চিদাত্মা, চিদাত্মা অদৃশ্য প্রকৃতি, তার কারণ প্রকৃতির সর্বত্রই মানুষ এক 'গঠনশীল আত্মা' প্রত্যক্ষ করে। তিনি আরও বলেছিলেন বস্তু হচ্ছে ঘুমিয়ে থাকা বুদ্ধিমত্তা।'

'বিষয়টা আরেকটু পরিষ্কার করে বলতে হবে আপনাকে।'

'প্রকৃতিতে এক 'বিশ্ব চিদাত্মা' দেখতে পেয়েছিলেন শেলিং, কিন্তু সেই একই 'বিশ্ব চিদাত্মা'-কে দেখেছিলেন তিনি মানুষের মনের ভেতরেও। প্রাকৃতিক আর আধ্যাত্মিক আসলে একই জিনিসের ভিন্ন অভিব্যক্তি।'

'হ্যাঁ, তাই তো।'

'কাজেই প্রকৃতি এবং কারো নিজের মনের ভেতর, এই দুই জায়গাতেই খোঁজা যেতে পারে বিশ্ব চিদাত্মাকে। সেজন্যই নোভালিস বলতে পেরেছিলেন 'রহস্যের পথ অন্তর্মুখী'। তিনি যা বলছিলেন তা হচ্ছে গোটা মহাবিশ্বকেই মানুষ তার মনের মধ্যে ধারণ করে এবং সে তখনই জগতের রহস্যের সবচেয়ে কাছাকছি উপনীত হয় যখন সে নিজের ভেতর পা বাড়ায়।'

'এটা কিন্তু চমৎকার একটা চিন্তা।'

'অনেক রোমান্টিকের কাছেই দর্শন, প্রকৃতি অধ্যয়ন আর কাব্য একটি সংশ্লেষণ বা সমন্বয় তৈরি করেছিল। চিলেকোঠায় বসে অনুপ্রাণিত কাব্যের ফোয়ারা ছোটানো আর গাছ-গাছড়ার জীবন বা পাথরের গঠন পর্যবেক্ষণ করা আসলে একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ, কারণ প্রকৃতি কেবলই একটা প্রাণহীন মেকানিজম নয়, এটা এক সজীব বিশ্ব চিদাত্মা।'

'আরেকটা কথা বললেই কিন্তু আমি রোমান্টিক হয়ে যাব।'

'নরওয়েজীয় প্রকৃতিবিদ *হেনরিক স্টেফেন্স* (Henrik Steffens)-যাঁকে ওয়ার্গল্যান্ড (Wergland) 'নরওয়ের ঝরে যাওয়া লরেল পাতা' বলে অভিহিত করেছেন কারণ তিনি জার্মানিতে সেট্‌ল করেছিলেন—তিনি ১৮০১ সালে কোপেনহেগেনে গিয়েছিলেন জার্মান রোমান্টিসিজমের ওপর বক্তৃতা করতে। রোমান্টিক আন্দোলনকে তিনি চিহ্নিত করেছিলেন এই বলে যে নির্জলা বস্তুর ভেতর দিয়ে যুদ্ধ করে পথ বের করে নেয়ার নিরন্তর চেষ্টায় ক্লান্ত হয়ে অন্য আরেক পথ বেছে নিয়ে আমরা অনন্তকে আলিঙ্গন করতে চেয়েছি। নিজেদের ভেতর প্রবেশ করে আমরা সৃষ্টি করেছি একটি নতুন জগৎ...'

'এত কিছু কী করে মনে থাকে আপনার?'

'তুচ্ছ ব্যাপার, বৎস।'

'ঠিক আছে, বলে যান।'

'শেলিং-ও মাটি ও পাথর থেকে মানুষের মন পর্যন্ত প্রকৃতির একটা বিকাশ লক্ষ্য করেছিলেন। জড় প্রকৃতি থেকে আরও জটিল জৈব রূপ পর্যন্ত অতি ধীর রূপান্তরের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন তিনি। সাধারণভাবে এটা রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গির বৈশিষ্ট্য যে এখানে প্রকৃতিকে একটা জীবদেহ (organism) হিসেবে বা অন্যভাবে বললে একটা সামগ্রিক বস্তু (unity) হিসেবে ভাবা হতো যা অনবরত তার অন্তর্নিহিত সম্ভাবনাগুলোর বিকাশ ঘটিয়ে চলছে। প্রকৃতি হচ্ছে ফুলের মতো যে-ফুল তার পাপড়ি মেলে যাচ্ছে। কিংবা এক কবির মতো যিনি তার কবিতার চরণগুলো মেলে ধরছেন।'

'এই সব কথাবার্তা অ্যারিস্টটলের কথা মনে করিয়ে দেয় না আপনাকে?'

'তা করায় অবশ্য। রোমান্টিক প্রকৃতিবাদী দর্শনে অ্যারিস্টটলীয় আর নিওপ্লেটোনিক এই দুয়েরই প্রচ্ছন্ন সুর পাওয়া যায়। প্রাকৃতিক প্রক্রিয়াগুলোর বিষয়ে যান্ত্রিক বস্তুবাদীদের চেয়ে অনেক বেশি জৈবিক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল অ্যারিস্টটলের

'হ্যাঁ, আমারও তাই ধারণা...'

'ইতিহাসের ক্ষেত্রেও এই ধরনের চিন্তা-ভাবনা ক্রিয়াশীল দেখতে পাই আমরা।

জোহান গটফ্রিড ভন *হার্ডার* (Johann Gottfried von Herder) নামে একজন ঐতিহাসিক দার্শনিক প্রবল গুরুত্ব লাভ করেছিলেন রোমান্টিকদের কাছে। তাঁর জন্ম ১৭৪৪-এ, মৃত্যু ১৮০৩-এ। তিনি বিশ্বাস করতেন যে চলমানতা, বিবর্তন আর পরিকল্পনা (design) ইতিহাসের বৈশিষ্ট্য। আমরা বলি, ইতিহাস সম্পর্কে একটি 'বহুমাত্রিক' দৃষ্টিভঙ্গি ছিল তাঁর, কারণ বিষয়টিকে তিনি একটি প্রক্রিয়া হিসেবে দেখেছিলেন। আলোকপ্রাপ্ত যুগের দার্শনিকদের ইতিহাস সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গি ছিল প্রায় ক্ষেত্রেই 'স্থবির'। তাঁদের বিবেচনায় একটি-ই মাত্র সার্বজনীন প্রজ্ঞা বর্তমান। হার্ডার দেখিয়েছেন যে প্রতিটি ঐতিহাসিক যুগেরই নিজস্ব সহজাত মূল্য আছে আর প্রত্যেক জাতিরই আছে তার নিজস্ব চরিত্র বা 'আত্মা'। প্রশ্ন হচ্ছে অন্যান্য সংস্কৃতির সঙ্গে আমরা নিজেদেরকে অবিচ্ছেদ্যভাবে একাত্ম করতে পারি কিনা।'

'তার মানে, লোকজনকে আরও ভালোভাবে বুঝতে হবে আমাদের।'

'এটা এখন মেনেই নেয়া হয়, কিন্তু রোমান্টিক যুগে ধারণাটা ছিল একেবারে নতুন রোমান্টিসিজম-ই জাতীয় একাত্মতার অনুভূতিকে সুদৃঢ় করতে সাহায্য করেছে। এটা কোনো কাকতালীয় ব্যাপার নয় যে এই সময়েই, ১৮১৪-তে, জাতীয় স্বাধীনতার জন্য নরওয়ের সংগ্রাম প্রবল হয়ে ওঠে।'

'আচ্ছা।'

'রোমান্টিসিজম যেহেতু বিভিন্ন ক্ষেত্রে নতুন নতুন সম্পর্ক তৈরি করছিল কাজেই স্বাভাবিকভাবেই দু'ধরনের রোমান্টিসিজম স্বাভাবিকভাবেই স্পষ্ট হয়ে উঠল। একদিকে রয়েছে প্রকৃতি, বিশ্ব আত্মা আর শৈল্পিক প্রতিভা নিয়ে ব্যস্ত রোমান্টিকদের *সার্বজনীন রোমান্টিসিজম*। এ-ধরনের রোমান্টিসিজম-ই বিস্তার লাভ করেছিল গোড়ার দিকে, বিশেষ করে ১৮০০ সাল নাগাদ, জার্মানির জেনা শহরে।'

'আর অন্যটা?'

'অন্যটা হচ্ছে তথাকথিত জাতীয় রোমান্টিসিজম, যা জনপ্রিয়তা অর্জন করে আরেকটু পরে। বিশেষ করে হাইডেলবার্গ শহরে। জাতীয় রোমান্টিকরা প্রধানত আগ্রহী ছিলেন সাধারণ অর্থে 'জনগণের' ইতিহাস, 'জনগণের' ভাষা এবং 'জনগণের' সংস্কৃতি সম্পর্কে। আর 'জনগণ'-কে দেখা হতো তার সহজাত সম্ভাবনাগুলোকে ঠিক প্রকৃতি আর ইতিহাসের মতো মেলে ধরতে থাকা এক জীবদেহ হিসেবে।'

'কোথায় থাকো বলো, আমি বলে দেবো তুমি কে।'

'যে-জিনিসটি এই দু'ধরনের রোমান্টিসিজমের মধ্যে একটা ঐক্য তৈরি করেছিল তা প্রথমত এবং প্রধানত সেই চাবি শব্দ 'জীবদেহ'। একটা গাছ আর একটা জাতি, এই দুটোকেই রোমান্টিকেরা সজীব জীবদেহ হিসেবে বিবেচনা করতেন। একটা কবিতাও একটা সজীব জীবদেহ। ভাষাও একটা জীবদেহ। গোটা ভৌত জগৎটাকে পর্যন্ত একটা জীবদেহ বলে ভাবা হতো। কাজেই সর্বজনীন রোমান্টিসিজম আর জাতীয় রোমান্টিসিজমের ভেতর সে অর্থে সে-রকম সুস্পষ্ট কোনো বিভাজন রেখা ছিল না। বিশ্ব চিদাত্মা জনগণ আর জনপ্রিয় সংস্কৃতির ভেতরে যেমন, তেমনি প্রকৃতি আর শিল্পের ভেতরেও একইভাবে বিদ্যমান।'

'আচ্ছা।'

'বহু দেশের লোক কাহিনী সংগ্রহ করে *জনগণের কণ্ঠস্বর* এই বাঙ্ময় নামের বইতে সেগুলো প্রকাশ করার মাধ্যমে হার্ডার পরিণত হয়েছিলেন একজন অগ্রদূতে। হাইডেলবার্গে লোকসঙ্গীত আর রূপকথা সংগ্রহ করতে শুরু করেন গ্রিম ভ্রাতৃদ্বয় (Brothers Grimm) এবং অন্যরা। তুমি নিশ্চয়ই *গ্রিমভাইদের রূপকথা*-র নাম শুনেছ।'

'তা শুনিনি আবার? তুষারকন্যা আর সাত বামন, রাম্পলস্টিল্টস্কিন, ব্যাঙ রাজকুমার, হ্যানসেন আর গ্রেটেল...'

'তাছাড়াও আরও অনেক আছে। নরওয়েতে আমাদের ছিল *অ্যাসবিয়র্নসেন* আর মো, তাঁরাও সারা দেশ ঘুরে ঘুরে 'জনসাধারণের নিজস্ব গল্প-কাহিনী' সংগ্রহ করেছেন। ব্যাপারটা অনেকটা হঠাৎ করেই চমৎকার আর পুষ্টিকর একটা রসাল ফল আবিষ্কার করে সেটি গোলায় এনে তোলার মতো ব্যাপার। আর ব্যাপারটা ছিল বেশ জরুরি কারণ ফলটা তখন পেকে পড়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। লোকসঙ্গীত-ও সংগ্রহ করা হলো; বৈজ্ঞানিকভাবে অধ্যয়ন করা শুরু হলো নরওয়েজীয় ভাষা। পৌত্তলিক যুগের প্রাচীন পুরাণ আর সাগা আবিষ্কৃত হলো নতুন করে। আর ইউরোপের সমস্ত কম্পোজার তাঁদের কম্পোজিশনে লোকসঙ্গীতের মিশ্রণ ঘটাতে শুরু করলেন যাতে লোকসঙ্গীত আর শিল্প সঙ্গীতের (art music) মধ্যে একটা সেতুবন্ধ রচনা করা যায়।'

'এই শিল্প সঙ্গীতটা কী?'

'শিল্প সঙ্গীত হচ্ছে বিশেষ কোনো ব্যক্তি যেমন বেঠোভেনের তৈরি সঙ্গীত। লোকসঙ্গীত বিশেষ কোনো ব্যক্তি রচনা নয়, সেটি এসেছে জনসাধারণের কাছ থেকে। সে-কারণেই বিভিন্ন লোকজ সুরগুলো কবেকার তা সঠিকভাবে জানা যায় না। একইভাবে আমরা লোক-কাহিনী আর শিল্প কাহিনী-র (art tales) কথাও বলে থাকি।'

'তাহলে শিল্প কাহিনী হচ্ছে...'

'বিশেষ কোনো লেখক যেমন *হ্যান্স ক্রিশ্চিয়ান অ্যান্ডারসন*-এর (Hans Christian Andersen) লেখা কাহিনী। রূপকথা নামের জাঁর (genre) রোমান্টিকেরা খুবই আগ্রহ নিয়ে চর্চা করেছেন। এই জাঁরের অন্যতম জার্মান ওস্তাদ ছিলেন *ই.টি.এ. হফম্যান* (E.T.A. Hoffman)।'

'শুনেছি আমি *হফম্যানের* গল্প-র কথা।'

'রূপকথা ছিল রোমান্টিকদের পরম সাহিত্যিক আদর্শ, ঠিক যেমন বারোক যুগের পরম শৈল্পিক ফর্ম ছিল থিয়েটার। রূপকথা কবিকে তার নিজের সৃষ্টিশীলতার পূর্ণ সদ্ব্যবহারের সুযোগ দিত।'

'এক কাল্পনিক মহাবিশ্বের ঈশ্বরের ভূমিকা নিতে পারতেন তিনি।'

'ঠিক বলেছ। তো, এবার আমরা পুরো ব্যাপারটা সংক্ষেপে একবার দেখে নেবার পর্যায়ে পৌঁছে গেছি।'

'বলে যান।'

'রোমান্টিসিজমের দার্শনিকেরা 'বিশ্ব আত্মা'-কে দেখেছেন একটি 'অহম' হিসেবে, যে-অহম কম-বেশি এক স্বপ্নময় অবস্থায় জগতের সবকিছু তৈরি করেছে। দার্শনিক ফিক্‌টে (Fichte) বলেছেন প্রকৃতির জন্ম হয়েছে উচ্চতর অচেতন এক কল্পনা

থেকে। শেলিং স্পষ্ট করেই বলেছেন যে 'ঈশ্বর-এর ভেতরেই' রয়েছে জগৎটা। তিনি বিশ্বাস করতেন, ঈশ্বর সেটির খানিকটা সম্পর্কে সচেতন, কিন্তু প্রকৃতির অন্যান্য কিছু ব্যাপার রয়েছে যা ঈশ্বরের ভেতরকার অজানা অংশের প্রতিনিধিত্ব করে। কারণ ঈশ্বরেরও একটা অন্ধকার দিক আছে।'

'চিন্তাটা একই সঙ্গে মজার আর ভীতিজনক। বার্কলের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে কথাটা শুনে।'

'ঠিক একই আলোতে দেখা হয়েছিল শিল্পী আর তার কাজের মধ্যকার সম্পর্কটিকে। রূপকথা লেখককে তাঁর 'মহাবিশ্ব সৃষ্টিকারী কল্পনা'র সুযোগ নেবার পুরো এক্তিয়ার দিয়েছিল। আর এমনকি সৃজনশীল কাজও যে সব সময় পুরোপুরি সচেতনভাবে করা হতো তা নয়। লেখকের মনে হতে পারে যে কোনো একটা অন্তর্নিহিত শক্তি তাঁর গল্পটা লিখে যাচ্ছে। লেখার সময় কার্যতই তিনি একটা সম্মোহক ঘোরের মধ্যে থাকতে পারেন।'

'তাই বুঝি?'

'হ্যাঁ, তাই, তবে সেই মায়া বা বিভ্রান্তিটা তিনি হঠাৎই নষ্ট করে দিতে পারেন। গল্পের মাঝখানে বাগড়া দিয়ে পাঠকের উদ্দেশে তিনি শ্লেষাত্মক মন্তব্যও ছুঁড়ে দিতে পারেন, যাতে করে পাঠককে অন্তত মুহূর্তের জন্য স্মরণ করিয়ে দেয়া যায় যে শত হলেও এটা নিছকই একটা গল্প মাত্র।'

'আচ্ছা।'

'একই সঙ্গে লেখক তাঁর পাঠককে মনে করিয়ে দেন যে তিনি-ই সেই কাল্পনিক মহাবিশ্বের সমস্ত কলকাঠি নাড়ছেন। এই ধরনের বিভ্রান্তিকে বলে 'রোমান্টিক আয়রনি'। এই যেমন *হেনরিক ইবসেন* (Henric Ibsen) *পিয়ার গিন্ট* নাটকে তাঁর এক চরিত্রকে দিয়ে বলাচ্ছেন: 'পঞ্চম অঙ্কের মাঝখানে তো কেউ মরতে পারে না।'

'সত্যিই বড় মজার কথা। সে আসলে যা বলছিল তা হচ্ছে সে একটা কাল্পনিক চরিত্র।'

'বক্তব্যটা এতোই প্যারাডক্সিকাল যে এটার ওপর গুরুত্বারোপ করার জন্য আমরা একটা নতুন পর্ব শুরু করতে পারি।'

'তার মানে?'

'ও কিছু না, সোফি। তবে আমরা জানি যে নোভালিসের প্রেমিকার নাম ছিল সোফি, ঠিক তোমার মতো আর সে যখন মারা গিয়েছিল তখন তার বয়স ছিল পনের বছর চার দিন...

'আপনি জানেন না বুঝি আমি ভয় পাচ্ছি?'

পাথরের মতো মুখ করে তাকিয়ে রইলেন অ্যালবার্টো। তারপর তিনি বললেন: 'কিন্তু নোভালিসের প্রেমিকার ভাগ্য তোমাকে বরণ করতে হবে না, তুমি নিশ্চিত থাকতে পারো।'

'কেন?'

'কারণ আরও বেশ কিছু চ্যাপ্টার এখনো বাকি।'

'কী বলতে চাইছেন?'

'বলতে চাইছি যে সোফি আর অ্যালবার্টোর গল্পের পাঠক তার স্বজ্ঞা দিয়েই বুঝে নেবেন যে গল্পের শেষ হতে এখনো অনেক পৃষ্ঠা বাকি। মাত্র রোমান্টিসিজম পর্যন্ত এসেছি আমরা।'

আপনি আমার মাথা ঘুরিয়ে দিচ্ছেন।'

'আসলে মেজর-ই হিল্ডার মাথা ঘুরিয়ে দিতে চাইছে। কাজটা সে খুব ভালো করছে না, করছে কি? নতুন পর্ব!'

* * *

অ্যালবার্টো তাঁর কথা শেষ করেছেন কি করেননি বনের ভেতর থেকে দৌড়ে বেরিয়ে এলো একটি ছোট্ট ছেলে। তার মাথায় একটা পাগড়ি আর হাতে একটা তেলের প্রদীপ। খপ করে অ্যালবার্টোর হাত চেপে ধরল সোফি।

'ও কে?' জিজ্ঞেস করল সে।

জবাবটা ছেলেটাই দিয়ে দিল 'আমার নাম আলাদিন, সেই লেবানন থেকে এতদূর এসেছি আমি।'

কঠোর দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালেন অ্যালবার্টো।

'তোমার বাতির মধ্যে কী?

প্রদীপটায় একটা ঘষা দিল ছেলেটা আর তখন সেটির ভেতর থেকে ঘন একটা মেঘ বেরিয়ে এসে একটা মানুষের আকৃতি নিল। অ্যালবার্টোর মতো কালো দাড়ি আর মাথায় বেরে টুপি তার। প্রদীপটার ওপর ভাসতে ভাসতে সে বলে উঠল 'আমার কথা শুনতে পাচ্ছিস, হিল্ডা? আমার মনে হয় জন্মদিনের বাড়তি কোনো শুভেচ্ছা দেয়ার পক্ষে বড্ড দেরি হয়ে গেছে। আমি স্রেফ বলতে চেয়েছি যে বিয়ার্কলে আর দেশের দক্ষিণ দিকটা এখানে এই লেবানন থেকে আমার কাছে পরীর দেশ বলে মনে হয়। দিন কয়েকের মধ্যেই ওখানে দেখা হবে আমাদের।'

এ-কথা বলার পরেই ফের মেঘ বনে গেল আকৃতিটা, তারপর আবার ঢুকে পড়ল প্রদীপটার ভেতর। পাগড়ি-পরা ছেলেটা তার বাহুর নিচে ঢুকিয়ে রাখল প্রদীপটা, দৌড়ে ঢুকে পড়ল বনের ভেতর, তারপর অদৃশ্য হয়ে গেল।

'এ-আমি বিশ্বাস করি না,' বলে উঠল সোফি।

'সস্তা চালাকি, মাই ডিয়ার।'

'প্রদীপের ভূতটার গলা অবিকল হিল্ডার বাবার গলার মতো।'

'তার কারণ ওটা ছিল হিল্ডার বাবারই ভূত।'

'কিন্তু '

'তুমি আর আমি দু'জনেই এবং আমাদের চারপাশের সমস্ত কিছুই রয়েছে মেজরের মনের গহীন ভেতরে। এখন শনিবার গভীর রাত্রি, ২৮ এপ্রিল, মেজরের চারপাশের জাতিসংঘের সমস্ত সৈন্য গভীর ঘুমে বিভোর আর মেজর যদিও জেগে, কিন্তু তার চোখ ঘুমে ভেঙে আসছে। তবে হিল্ডাকে তার পঞ্চদশ জন্মদিনের উপহার হিসেবে সে যে-বইটা দেবে সেটি তাকে শেষ করতেই হবে। সেজন্যই তাকে কাজ করতে হবে,

সোফি। সেজন্যেই বেচারার নিঃশ্বাস নেবার কোনো ফুরসতই নেই প্রায়।'

'আমি হাল ছেড়ে দিচ্ছি।'

'নতুন পর্ব!'

সোফি আর অ্যালবার্টো ছোট্ট লেকটার দিকে তাকিয়ে বসে রয়েছেন। অ্যালবার্টোকে দেখে মনে হচ্ছে, একটা ঘোরের মধ্যে আছেন। খানিক পর তাঁর কাঁধে মৃদু একটা ঠেলা দিল সোফি।

'স্বপ্ন দেখছিলেন বুঝি?'

'হ্যাঁ, ঠিক ওখানটাতে বাগড়া দিচ্ছিল সে। শেষ কয়েকটা প্যারাগ্রাফের প্রতিটা অক্ষর ডিক্টেট করে গেছে সে। নিজের ওপর লজ্জা হওয়া উচিত তার। কিন্তু এবার তার জারিজুরি ফাঁস হয়ে গেছে, খোলা জায়গায় এসে পড়েছে সে। এখন আমরা জানি যে আমরা আমাদের জীবন যাপন করছি একটা বইয়ের ভেতর যে-বই হিল্ডার বাবা বাড়িতে হিল্ডার কাছে পাঠাবে তার জন্মদিনের উপহার হিসেবে। শুনলে তো কী বললাম? ইয়ে, কথাটা কিন্তু 'আমি' বলছিলাম না।'

'আপনি যা বললেন তা যদি সত্যি হয় তো আমি বইটা থেকে পালিয়ে নিজের ইচ্ছে মতো যেদিকে খুশি চলে যাব।'

'ঠিক সে-কথাই ভাবছি আমি। কিন্তু তা ঘটার আগে হিল্ডার সঙ্গে অবশ্যই কথা বলার চেষ্টা করতে হবে আমাদের। আমরা যা বলছি তার প্রতিটি শব্দ পড়ছে সে। একবার যদি এখান থেকে আমরা বেরিয়ে পড়তে পারি তাহলে তার সঙ্গে যোগাযোগ করাটা বড্ড কঠিন হয়ে পড়বে। তার মানে এক্ষুণি সুযোগটা কাজে লাগাতে হবে আমাদের।'

'আমরা তাহলে কী করছি?'

'আমার মনে হয় মেজর এক্ষুণি তার টাইপরাইটারটার ওপর ঘুমে ঢলে পড়বে, যদিও তার সবকটা আঙুল চাবিগুলোর ওপর ঝড়ের বেগে খেলে বেড়াচ্ছে এখনো...'

'এটা একটা অদ্ভুতুড়ে চিন্তা।'

'এখনই সেই সময় যখন সে এমন কিছু লিখে ফেলবে যা নিয়ে পরে আফসোস করবে সে। আর, তার কাছে কোনো ফ্লুইডও নেই যা দিয়ে ভুলটা শোধরানো যায়। এটাই আমার প্ল্যানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ। কেউ যেন মেজরকে তার লেখার ভুল শোধরানোর জন্য এক বোতল কারেকশন ফ্লুইড না দেয়।'

'আমি তো অন্তত এক ফোঁটাও দেবো না তাকে।'

'আমি সেই বেচারিকে এখানে এক্ষুণি হাজির হতে বলছি তার নিজের বাবার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার জন্য। ছায়ার সঙ্গে মেজরের আত্মসংযমহীন এই খেলায় নিজেকে মজা পেতে দেয়ার জন্য মেয়েটির লজ্জিত হওয়া উচিত। শুধু যদি লোকটিকে পেতাম এখানে তাহলে ওকে টের পাইয়ে দিতাম মজাটা।'

'কিন্তু সে তো আর এখানে নেই।'

'মনে-প্রাণে সে এখানে আছে, কিন্তু সেই সঙ্গে সে লেবাননে আটকে আছে বহাল তবিয়তে। আমাদের চারপাশের সবকিছুই মেজরের অহম।'

'কিন্তু আমরা এখানে যা দেখতে পাচ্ছি সে তো তারচেয়ে অনেক বেশি কিছু।'

'মেজরের আত্মার ভেতর ছায়া ছাড়া আর কিছুই না আমরা। আর ছায়ার পক্ষে তার প্রভুর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো খুব সহজ কথা নয়, সোফি। কাজটাতে ধূর্ততা আর কৌশল দুটোই লাগে। তবে হিল্ডাকে প্রভাবিত করার একটা সুযোগ আছে আমাদের। দেবদূতই কেবল ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে পারে।'

'মেজর বাড়ি ফিরলে তাকে সব কথা খুলে বলার জন্য হিল্ডাকে বলতে পারি আমরা। হিল্ডা তাকে বলতে পারে সে একটা পাজি লোক। সে তার নৌকোটা ফুটো করে দিতে পারে বা অন্তত লণ্ঠনটা ভেঙে গুঁড়িয়ে দিতে পারে।'

অ্যালবার্টো মাথা ঝাঁকালেন। তারপর তিনি বললেন 'সে তার কাছ থেকে পালিয়েও যেতে পারে। কাজটা তার জন্য আমাদের চেয়ে অনেক বেশি সহজ হবে। এমনও হতে পারে সে মেজরের বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল আর ফিরল না। আমাদের মাথার ওপর কাঁঠাল ভেঙে যে-মেজর তার 'মহাবিশ্ব সৃষ্টিকারী কল্পনা' নিয়ে খেলে তার জন্য ব্যাপারটা বড্ড যুতসই হবে না? কি বল?'

'বেশ কল্পনা করতে পারছি দৃশ্যটা। সারা দুনিয়া জুড়ে হিল্ডাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে মেজর। কিন্তু হিল্ডা স্রেফ বাতাসে মিলিয়ে গেছে, তার কারণ সে এ-রকম কোনো বাবার কাছে থাকা বরদাশত করতে পারে না যে-কিনা অ্যালবার্টো আর সোফিকে নিয়ে মশকরা করে।'

'হ্যাঁ, ঠিক, মশকরা করে। আমাদেরকে জন্মদিনের আমোদ হিসেবে ওর ব্যবহারের কথা বলতে আমি এটাই বুঝিয়েছিলাম, কিন্তু তার সাবধান হওয়া উচিত। হিল্ডারও।'

'কী বলতে চাইছেন?'

'তুমি ঠিক মতো বসেছো তো?'

'প্রদীপ থেকে কোনো ভূত-টুত না বেরোনো পর্যন্ত ঠিক আছে।'

'কল্পনা করার চেষ্টা করো যে আমাদের চারপাশে যা কিছু ঘটছে তা আসলে চলছে একজন মানুষের মনের ভেতর। আমরা সেই মন। তার অর্থ আমাদের কোনো আত্মা নেই, আমরা অন্যের আত্মা। এ-পর্যন্ত আমরা মোটামুটি পরিচিত দার্শনিক পরিস্থিতির ভেতরেই আছি। বার্কলে আর শেলিং দু'জনেই নিশ্চয়ই কান খাড়া করবেন এখন।'

'আচ্ছা?'

'তো, এটা খুবই সম্ভব যে এই আত্মাটা হিল্ডা মোলার ন্যাগ-এর বাবা। সে লেবাননে বসে তার মেয়ের পঞ্চদশ জন্মদিনের উপহার হিসেবে দর্শনের ওপর একটা বই লিখছে। ১৫ জুন ঘুম থেকে উঠে হিল্ডা বিছানার পাশের টেবিলটার ওপর দেখতে পাবে বইটা। এখন, সে বা অন্য যে-কেউ-আমাদের কথা পড়তে পারবে। অনেক দিন ধরেই এই ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে যে 'উপহারটা' অন্যদের সঙ্গে ভাগ করে নেয়া যাবে।'

'হ্যাঁ, আমার মনে আছে।'

'তোমাকে আমি এখন যা বলছি তা হিল্ডা পড়ে ফেলবে লেবাননে তার বাবা এ-কথা একবার কল্পনা করার পর যে আমি তোমাকে বলছি যে সে-লোকটি লেবাননে আছে...আর কল্পনা করছে যে আমি তোমাকে বলছি যে সে লেবাননে আছে।'

মাথা ঘুরতে শুরু করল সোফির। বার্কলে আর রোমান্টিকদের সম্পর্কে কী শুনেছে সে-কথা মনে করার চেষ্টা করল সে। অ্যালবার্টো নক্স বলে চলেছেন 'কিন্তু সেজন্য ওদের অতো পায়াভারি হওয়া উচিত হবে না। বরং ওদেরই হাসা উচিত সবার শেষে, কারণ ওদের হাসি খুব সহজেই ওদের গলায় আটকে যেতে পারে।'

'কাদের কথা বলছেন বলুন তো?'

'কেন, হিল্ডা আর তার বাবার কথা। ওদের কথাই আলোচনা করছিলাম না আমরা?'

'কিন্তু ওদের অতো পায়াভারি হওয়া উচিত হবে না কেন বলছেন?'

'কারণ এটাও সম্ভব যে ওরা-ও মন ছাড়া আর কিছুই নয়।'

'সে কী করে সম্ভব?'

'বার্কলে আর রোমান্টিকদের জন্য ব্যাপারটা সম্ভব হতে পারলে ওটা তাদের জন্যেও সম্ভব। এমনও হতে পারে যে মেজরও তাকে আর হিল্ডাকে নিয়ে লেখা বইয়ের একটা ছায়া, যে-বইটা আবার আমাদেরকে নিয়েও লেখা, কারণ আমরা ওদের জীবনের একটা অংশ।'

'সেটি তো আরও খারাপ হবে। তাতে আমরা হবো ছায়ার ছায়া।'

'কিন্তু আবার এটা সম্ভব যে একেবারে ভিন্ন একজন লেখক কোথাও বসে জাতিসংঘের এক মেজর অ্যালবার্ট ন্যাগ সম্পর্কে একটা বই লিখছে, যে-মেজর তার মেয়ে হিল্ডার জন্য একটা বই লিখছে। এ-বইটা এক অ্যালবার্টো নক্সকে নিয়ে লেখা যে হঠাৎ করেই ৩ ক্লোভার ক্লোজ-এর সোফি অ্যামুন্ডসেনের কাছে সাধারণ কিছু দার্শনিক বক্তৃতা পাঠাতে শুরু করে।'

'আপনি এ-কথা বিশ্বাস করেন?'

'আমি শুধু বলছি ব্যাপারটা সম্ভব। আমাদের কাছে সেই লেখক হবেন এক 'গুপ্ত ঈশ্বর' যদিও আমরা যা তার সবকিছু আর আমরা যা বলি বা করি তার সবকিছু তার কাছ থেকেই আসছে, কারণ আমরাই সে, কিন্তু তারপরেও তার সম্পর্কে কিছুই জানতে পারবো না আমরা। আমরা রয়েছি সবচেয়ে ভেতরের বাক্সটায়।'

অ্যালবার্টো আর সোফি এবার অনেকক্ষণ বসে রইলেন কোনো কথা না বলে। সোফি-ই ভাঙল নীরবতাটা 'কিন্তু সত্যি-ই যদি এমন এক লেখক থেকে থাকেন যিনি লেবাননে থাকা হিল্ডার বাবাকে নিয়ে একটি গল্প লিখছেন, ঠিক যেমন হিল্ডার বাবা আমাদের নিয়ে একটা গল্প লিখছে...'

'হ্যাঁ?'

'...তো, সেক্ষেত্রে এটাও সম্ভব যে সেই লেখকেরও পায়াভারি হওয়া উচিত নয়।'

'কী বলতে চাইছ?'

'হিল্ডা আর আমাকে তাঁর মাথার গহীন ভেতরে লুকিয়ে রেখে তিনি কোথাও বসে আছেন। এখন এটা কি সম্ভব না যে তিনিও উচ্চতর একটা মন-এর অংশ?'

মাথা ঝাঁকালেন অ্যালবার্টো।

'অবশ্যই, সোফি। সেটিও সম্ভব। আর, ব্যাপারটা যদি তাই-ই হয় তাহলে তার অর্থ এই দার্শনিক আলাপে আমাদের নিয়োজিত হতে দিয়েছেন তিনি এই সম্ভাবনাটি

উপস্থাপন করার জন্য। তাঁর ইচ্ছা এই বিষয়টির ওপর গুরুত্বারোপ করা যে তিনি-ও এক অসহায় ছায়া মাত্র আর এই বইটি, যেখানে হিল্ডা আর সোফির আবির্ভাব ঘটেছে সেটি আসলে দর্শনের একটা টেক্সট বই।'

'টেক্সট বই?'

'কারণ আমাদের সমস্ত কথোপকথন, আমাদের সমস্ত সংলাপ...'

'হ্যাঁ?'

আসলে এক দীর্ঘ একক সংলাপ (monologue)...'

'আমার মনে হচ্ছে সবকিছুই মন আর আত্মার ভেতর বিলীন হয়ে যাচ্ছে। তবে আমি খুশি যে অল্প কয়েকজন দার্শনিক এখনো বাকি আছেন। থেলিস, এম্পিডক্লেস আর ডেমোক্রিটাসকে দিয়ে যে-দর্শনের সগৌরব যাত্রা শুরু হয়েছিল তা নিশ্চয়ই এখানে এসে আটকে যেতে পারে না, তাই না?'

'অবশ্যই না। এখনো হেগেলের কথা বলিনি তোমাকে। রোমান্টিকেরা সবকিছু আত্মার ভেতর মিশিয়ে দেয়ার পর দর্শনকে উদ্ধার করতে এগিয়ে আসা প্রথম দার্শনিক তিনি-ই।

'খুব কৌতূহল হচ্ছে আমার।'

'আর কোনো ভূত-প্রেত বা ছায়া যাতে আমাদের কাজে বিঘ্ন ঘটাতে না পারে সেজন্য এখন ভেতরে যাবো আমরা।'

'এমনিতেও বাইরে এখানটা বেশ ঠাণ্ডা হয়ে আসছে।'

'পরের চ্যাপ্টার!'

হে গে ল

৩৩৫

...যা টিকে যাওয়ার ক্ষমতা রাখে সেটাই যৌক্তিক...

হিল্ডা ছেড়ে দিতে রিং বাইন্ডারটা বেশ ভারি একটা শব্দ করে মেঝেতে পড়ে গেল। সিলিং-এর দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল সে। তার মাথায় চিন্তার ঝড় বইছে।

এবার তার বাবা তার মাথাটা আসলেই ঘুরিয়ে দিয়েছেন। পাজি কোথাকার!

কী করে পারলেন তিনি এমন কাজ করতে?

সোফি তার সঙ্গে সরাসরি কথা বলতে চেয়েছে। হিল্ডাকে সে বলেছে তার বাবার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে। আর, হিল্ডার মনের ভেতর একটা আইডিয়া সে শেষমেশ সত্যিই ঢুকিয়ে দিতে পেরেছে। একটা আইডিয়া...

সোফি আর অ্যালবার্টো তার বাবার মাথার একটা চুলও ছুঁতে পারবে না, কিন্তু হিল্ডা পারবে। আর হিল্ডার মাধ্যমে সোফি তার বাবার কাছে পৌঁছে যেতে পারবে।

সোফি আর অ্যালবার্টোর সঙ্গে সে একমত যে তার বাবা তাঁর ছায়ার খেলাটা নিয়ে বড্ড বাড়াবাড়ি করছেন। হলোই বা অ্যালবার্টো আর সোফি তাঁর কল্পনার সৃষ্টি ছাড়া কিছু নয়, কিন্তু কতটুকু ক্ষমতা প্রদর্শনের এক্তিয়ার তিনি নিজেকে দেবেন তার একটা সীমা থাকতে হবে তো।

বেচারি সোফি আর অ্যালবার্টো! মেজর লোকটার কল্পনার বিরুদ্ধে ওরা ঠিক ততটাই অসহায় ছবির পর্দা যতটা অসহায় ফিল্ম প্রোজেক্টরের বিরুদ্ধে।

বাবা বাড়ি ফিরলে হিল্ডা যে তাঁকে একটা শিক্ষা দেবে তাতে কোনো ভুল নেই! দুর্দান্ত ভালো একটা প্ল্যানের আবছা কাঠামো সে এরই মধ্যে দেখতে পাচ্ছে।

উঠে পড়ল সে, উপসাগরের দিকে তাকাবার জন্য এগিয়ে গেল। প্রায় দু'টো বাজে। জানালা খুলে বোট হাউসটা লক্ষ্য করে ডেকে উঠল।

'মা!'

ওর মা বেরিয়ে এলেন।

'কিছু স্যান্ডউইচ নিয়ে ঘণ্টাখানেকের মধ্যে নিচে আসছি আমি, ঠিক আছে?'

'ফাইন।'

'হেগেলের ওপর একটা চ্যাপ্টার পড়তে হবে শুধু।'

লেকের দিকে মুখ করা জানালাটার পাশে দুটো চেয়ারে বসেছেন অ্যালবার্টো আর সোফি।

'*গিয়র্গ উইলহেম ফ্রিডরিখ হেগেল* (Georg Wilhem Friedrich Hegel) ছিলেন রোমান্টিসিজমের বৈধ উত্তরসূরি,' শুরু করলেন অ্যালবার্টো। 'এ-কথা একরকম বলা-ই যেতে পারে যে জার্মান সত্তা যখন জার্মানিতে ধীরে ধীরে বিকশিত হচ্ছিল তখন তার সঙ্গেই বেড়ে উঠেছিলেন তিনি। ১৭৭০ খ্রিস্টাব্দে স্টুটগার্টে জন্ম হয় তাঁর তারপর আঠারো বছর বয়সে ঈশ্বরতত্ত্ব নিয়ে পড়াশোনা শুরু করেন টুবিঙ্গেন-এ। ১৭৯৯ সালে জেনা শহরে শেলিংয়ের সঙ্গে যখন তিনি কাজ শুরু করেন রোমান্টিক আন্দোলন তখন রীতিমতো বিস্ফোরক বিকাশ লাভ করছে। জেনাতে কিছুকাল সহকারী অধ্যাপক হিসেবে কাটাবার পর জার্মান জাতীয় রোমান্টিসিজমের কেন্দ্র হাইডেলবার্গে তিনি অধ্যাপক পদ লাভ করেন। ১৮১৮-তে যখন বার্লিনে অধ্যাপক হিসেবে নিযুক্ত হন, তখনই শহরটি ইউরোপের আধ্যাত্মিক কেন্দ্র হয়ে উঠছিল। ১৮৩১-এ কলেরায় আক্রান্ত হয়ে মারা যান তিনি, কিন্তু তার আগেই হেগেলবাদের প্রচুর অনুসারী তৈরি হয়ে গেছে জার্মানির প্রায় সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে।'

'তাহলে তাঁর প্রভাব তো কম ছিল না দেখছি।'

'হ্যাঁ আর সে-কথা তাঁর দর্শনের বেলাতেও প্রযোজ্য। রোমান্টিক যুগে উদ্ভব হওয়া প্রায় সমস্ত ধারণা একত্রিত এবং সেগুলোর বিকাশ সাধন করেছিলেন তিনি। তবে শেলিংসহ অনেক রোমান্টিক সম্পর্কেই তীব্রভাবে সমালোচনা করেছেন তিনি।

'ঠিক কোন বিষয়টির সমালোচনা করেছিলেন তিনি?'

'শেলিং এবং অন্য রোমান্টিকেরা বলেছিলেন যে জীবনের গভীরতম অর্থ নিহিত রয়েছে, তাদের ভাষায় 'বিশ্ব চিদাত্মা'-র মধ্যে। হেগেল-ও 'বিশ্ব চিদাত্মা' কথাটি ব্যবহার করেছেন, তবে এক নতুন অর্থে। তিনি যখন 'বিশ্ব চিদাত্মা' বা 'বিশ্ব প্রজ্ঞা'-র কথা বলেন তখন তিনি বোঝাতে চান সমগ্র মানবিক উচ্চারণকে, কারণ কেবল মানুষেরই 'চিদাত্মা' রয়েছে।

'এই অর্থে তিনি সমগ্র ইতিহাস জুড়ে বিশ্ব চিদাত্মা-র অগ্রযাত্রার কথা বলতে পারছেন। তবে সে যা-ই হোক, এ-কথা আমরা যেন না ভুলি যে তিনি আসলে বলছেন মানব জীবন, মানব ইতিহাস আর মানব সংস্কৃতির কথা।'

'এতে করে এই 'চিদাত্মা-টি অনেক কম ভূতুড়ে রূপ নিচ্ছে। পাথর আর গাছের মধ্যে সেটি এখন আর একটা 'ঘুমন্ত বুদ্ধিমত্তা'-র মতো ওঁৎপেতে থাকছে না।'

'তো, এখন, তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে যে 'das Ding an sich' বলে একটা জিনিসের কথা বলেছিলেন কান্ট। প্রকৃতির গূঢ়তম রহস্য সম্পর্কে মানুষ কোনো স্বচ্ছ ধারণা পেতে পারে বলে তিনি মনে না করলেও এক অপ্রাপনীয় 'সত্য'-র অস্তিত্বের কথা স্বীকার করেছিলেন তিনি। হেগেল বললেন, 'সত্য বিষয়ীগত (subjective), অর্থাৎ মানবিক প্রজ্ঞার অতিরিক্ত বা বাইরের কোনো সত্যের অস্তিত্ব অস্বীকার করলেন তিনি। তাঁর বক্তব্য হচ্ছে, সমস্ত জ্ঞানই মানবিক জ্ঞান।'

'দার্শনিকদের আবার মাটিতে নামিয়ে আনতে হয়েছিল তাকে, তাই না?'

'হ্যাঁ, তা বোধকরি তুমি বলতে পারো। সে যাই হোক, হেগেলের দর্শন এমনই সর্বব্যাপী আর বিচিত্রমুখী যে আমাদের বর্তমান উদ্দেশ্যের খাতিরে প্রধান প্রধান কয়েকটি দিক নিয়ে আলাপ করেই সন্তুষ্ট থাকব আমরা। অবশ্য, হেগেলের আদৌ

কোনো নিজস্ব 'দর্শন' ছিল বলে দাবি করা যায় কিনা তা নিয়েও সন্দেহ রয়েছে। হেগেলের দর্শন বলে যা পরিচিত তা প্রধানত ইতিহাসের অগ্রযাত্রাকে বোঝার বা অনুধাবন করার একটা *পদ্ধতি* মাত্র। জীবনের অন্তঃপ্রকৃতি সম্পর্কে হেগেলের দর্শন কিছুই শেখায় না আমাদের, তবে তা সৃজনশীলভাবে চিন্তা করতে শেখাতে পারে।'

'সেটিও বা কম কীসে?'

'হেগেলের পূর্ববর্তী সমস্ত দার্শনিক পদ্ধতির ভেতরেই একটি সাধারণ ব্যাপার ছিল আর তা হলো মানুষ এ-জগৎ সম্পর্কে কী জানতে পারে সে-ব্যাপারে একটি চিরন্তন মাপকাঠি স্থাপনের চেষ্টা। দেকার্ত, স্পিনোজা, হিউম আর কান্টের বেলাতে এ-কথা সত্য। প্রত্যেকেই মানবিক বোধের ভিত্তিটাকে খতিয়ে দেখার চেষ্টা করেছেন। তবে তাঁদের প্রত্যেকেই জগৎ সম্পর্কে মানুষের জ্ঞানের *চিরন্তন* দিকটির কথা বলেছেন।'

'সেটিই তো দার্শনিকের কাজ, তাই না?'

'ব্যাপারটা সম্ভব বলে বিশ্বাস করতেন না হেগেল। তিনি মনে করতেন যে মানবিক বোধের ভিত্তি প্রজন্ম ভেদে পরিবর্তিত হয়। কাজেই 'চিরন্তন সত্য' বলে কিছু নেই, নেই কোনো চিরন্তন প্রজ্ঞা। একমাত্র যে স্থির বিন্দুটি দর্শন আঁকড়ে ধরে থাকতে পারে তা হলো খোদ ইতিহাস।'

'আপনাকে বোধকরি এটা একটু বুঝিয়ে বলতে হবে। ইতিহাস তো অনবরত বদলাচ্ছে, সেটি কী করে একটা স্থির বিন্দু হয়?'

'নদীরও তো নিত্যই পরিবর্তন ঘটছে। তার মানে তো এই নয় যে সেটি নিয়ে তুমি কথা বলতে পারবে না। তবে উপত্যকার ঠিক কোনখানটায় যে একটা নদী 'সবচেয়ে খাঁটি বা আসল' নদী তা কিন্তু তুমি বলতে পারবে না।'

'তা ঠিক, কারণ আগাগোড়া-ই সেটি একই নদী।'

'কাজেই হেগেলের কাছে ইতিহাস ছিল ছুটে চলা এক নদীর মতো। নদীর একটা নির্দিষ্ট জায়গায় পানির প্রতিটি ক্ষুদ্র আন্দোলন নিয়ন্ত্রিত হয় অনেক উজানে পানির ঢল আর ঘূর্ণির কারণে। কিন্তু তুমি নদীটির যেখানে তাকিয়ে আছো সেখানকার পাথর-টাথর আর বাঁকও এইসব আন্দোলন নিয়ন্ত্রণ করে।'

'মনে হয় বুঝতে পারছি...'

'আর চিন্তা বা প্রজ্ঞার ইতিহাস এই নদীর মতো। অতীত ঐতিহ্যের স্রোতের ধারায় যে-সব চিন্তা-ভাবনা ধৌত হয়ে আসে সেসব আর সে-সময়কার বস্তুগত অবস্থা, এই দুটি জিনিস তোমার চিন্তার ধরনকে নিয়ন্ত্রণ করে। কাজেই তুমি কখনোই এমন দাবি করতে পারো না যে বিশেষ একটা চিন্তা সর্বকালের জন্য সঠিক। অবশ্য তুমি যেখানটায় দাঁড়িয়ে আছো সেখান থেকে ওটা সঠিক হতে পারে।'

'এ-কথা বলার অর্থ নিশ্চয়ই এই নয় যে প্রতিটি জিনিস-ই একই রকম ন্যায় বা সঠিক অথবা একই রকম অন্যায় বা ভুল, ঠিক কি না?'

'তা তো বটেই, তবে বিশেষ একটি ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে কিছু জিনিস সঠিক বা ভুল হতে পারে। আজ যদি তুমি দাসপ্রথার কথা প্রচার করতে তাহলে তোমাকে একটা নির্বোধ ছাড়া কিছু ভাবা হতো না। কিন্তু ২,৫০০ বছর আগে কিন্তু নির্বোধ ভাবা হতো না তোমাকে, যদিও দাসপ্রথা বিলোপের পক্ষে সেই সময়-ও প্রগতিশীল কথা-

বার্তা বলা হচ্ছিল। অবশ্য আমরা আরও কাছের একটা উদাহরণ নিতে পারি। একশো বছর আগেও চাষবাসের জন্য বনভূমির বিশাল একটা এলাকা আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে ফেলাটা অসঙ্গত বলে ভাবা হতো না। কিন্তু আজ কাজটা ভীষণ রকমের অসঙ্গত হবে। এ-ধরনের বিচার-বিবেচনার জন্য আজ আমরা একেবারে ভিন্ন এবং আরও ভালো একটা ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে আছি।'

'এখন বুঝতে পারছি।'

'হেগেল মন্তব্য করেছেন যে দর্শনগত অনুচিন্তনের (reflection) ক্ষেত্রেও প্রজ্ঞা যথেষ্ট শক্তিশালী; সত্যি বলতে, এটা একটা প্রক্রিয়া। আর 'সত্য' হচ্ছে এই একই প্রক্রিয়া, যেহেতু খোদ ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া ছাড়া অন্য কোনো মানদণ্ড নেই যা নির্ণয় করতে পারে কোনটি সবচেয়ে সত্যি বা সবচেয়ে যৌক্তিক।'

'উদাহরণ, প্লিজ।'

'প্রাচীন যুগ, মধ্যযুগ, রেনেসাঁ বা আলোকপ্রাপ্তির সময় থেকে বিশেষ কিছু চিন্তা-ভাবনা বা ধ্যান-ধারণা বেছে নিয়ে সেগুলোকে সঠিক বা ভুল আখ্যা দেয়া যায় না। ঠিক একইভাবে তুমি বলতে পারো না যে প্লেটোর কথা ভুল বা অ্যারিস্টটলের কথা ঠিক। তুমি এ-ও বলতে পারো না যে হিউম ভুল বলেছিলেন, কিন্তু কান্ট আর শেলিং ঠিক বলেছিলেন। বললে সেটি হবে চিন্তার একটা অনৈতিহাসিক পদ্ধতি।'

'হ্যাঁ, কথাটা ঠিক শোনায় না।'

'সত্যি বলতে কি, কোনো দার্শনিককে বা আদৌ কোনো চিন্তাকে তুমি সেই দার্শনিকের বা সেই চিন্তার ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারো না। তবে—এখানে আমরা অন্য একটা প্রসঙ্গে এসে পড়ছি—নতুন কিছু যেহেতু সবসময়ই যোগ হচ্ছে, তাই প্রজ্ঞা 'প্রগতিশীল'। অন্যভাবে বলতে গেলে, মানবিক জ্ঞান নিত্যই সম্প্রসারিত হচ্ছে, এগিয়ে যাচ্ছে।'

'তার অর্থ কি এই যে তারপরও কান্টের দর্শন প্লেটোর দর্শনের চেয়ে ঠিক?'

'হ্যাঁ, বিশ্ব চিদাত্মা প্লেটো থেকে কান্ট পর্যন্ত বিকাশ লাভ করেছে, এগিয়ে গেছে। এবং ব্যাপারটা খারাপ কিছু হয়নি। সেই নদীর উদাহরণে ফিরে গেলে বলতে হয় সেখানে এখন আরও অনেক পানি এসে জড়ো হয়েছে। হাজার বছরের বেশি সময় ধরে বয়ে চলেছে নদীটা। কথা শুধু, কান্টের এ-কথা ভাবলে চলবে না যে তাঁর 'সত্যগুলো' নদীটার তীরে অটল অনড় পাথরের মতো রয়ে যাবে। কান্টের চিন্তা-ভাবনাও প্রক্রিয়াজাত হতে পারে আর তাঁর 'প্রজ্ঞা' ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সমালোচনার বিষয়বস্তু হতে পারে। আর ঠিক সেটিই ঘটেছে।'

'কিন্তু আপনি যে-নদীটার কথা বলেছিলেন...'

'হ্যাঁ?'

'সেটি কোথায় যায়?'

'হেগেল দাবি করেছেন 'বিশ্ব চিদাত্মা' তার নিজের সম্পর্কে এক ক্রমবর্ধমান জ্ঞানের দিকে বিকশিত হচ্ছে। ব্যাপারটা ঠিক নদীর মতোই, নদী যতই সমুদ্রের নিকটবর্তী হয় ততোই তা চওড়া হতে থাকে। হেগেল-এর বক্তব্য অনুযায়ী, ইতিহাস হচ্ছে 'বিশ্ব চিদাত্মা'-র ক্রমেই আত্মসচেতন হয়ে ওঠার গল্প। জগৎ যদিও বরাবরই

অস্তিত্বশীল কিন্তু মানব-সংস্কৃতি আর মানব-প্রগতি বিশ্ব চিদাত্মাকে ক্রমবর্ধমানভাবে নিজের অন্তর্নিহিত মূল্য সম্পর্কে সচেতন করে তুলেছে।'

'তিনি এতোটা নিশ্চিত হলেন কীভাবে?'

'ব্যাপারটাকে তিনি দাবি করেছেন ঐতিহাসিক বাস্তবতা হিসেবে। এটা কোনো ভবিষ্যদ্বাণী নয়। ইতিহাস অধ্যয়ন করেন এমন যে-কেউ-ই দেখতে পাবেন যে মানবতা ক্রমবর্ধমান 'আত্মজ্ঞান' আর 'আত্ম-উন্নয়নের' দিকে এগিয়ে গেছে। হেগেলের বক্তব্য অনুযায়ী, অধ্যয়ন আমাদের দেখিয়ে দেয় যে মানবতা এগিয়ে যাচ্ছে বৃহত্তর যৌক্তিকতা (rationality) আর স্বাধীনতার দিকে। ইতিহাসগত বিকাশ বা উন্নয়ন সেটির সমস্ত লম্ফ-ঝম্ফ সত্ত্বেও, প্রগতিশীল। আমরা বলি, ইতিহাস নির্দিষ্ট লক্ষ্য সাধনে নিয়োজিত।'

'সেজন্যই তা বিকাশ লাভ করে। সেটি খুব পরিষ্কার।'

'ঠিক। ইতিহাস হচ্ছে অনুধ্যানের দীর্ঘ একটি শেকল। অনুধ্যানের এই শেকল সম্পর্কে বিশেষ কিছু নিয়ম-নীতির দিকেও অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন হেগেল। গভীরভাবে ইতিহাস চর্চা করছেন এমন কেউ লক্ষ করবেন যে একটি চিন্তা বা ধারণার প্রস্তাব দেয়া হয় পূর্ববর্তী অন্যান্য প্রস্তাবিত চিন্তা বা ধারণার ভিত্তিতে। কিন্তু চিন্তাটি প্রস্তাবিত হতে না হতেই আরেকটি চিন্তা বা ধারণা সেটির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যায়। এই দুই বিপরীতধর্মী চিন্তা-পদ্ধতির মধ্যে তৈরি হয় একটি দ্বন্দ্ব। কিন্তু সেই দ্বন্দ্বের অবসান ঘটে তৃতীয় আরেকটি চিন্তার প্রস্তাবের মাধ্যমে, যেখানে ঠাঁই পায় আগের দুটো বক্তব্যের সেরা অংশটি। হেগেল একে বলছেন দ্বান্দ্বিক (dialectic) প্রক্রিয়া।'

'একটা উদাহরণ দিতে পারবেন?'

'প্রাক-সক্রেটিস দার্শনিকেরা আদিম সারবস্তু (primeval substance) আর পরিবর্তনের প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করেছিলেন, মনে আছে তোমার?'

'অল্প-বিস্তর।'

'এরপর ইলিয়াটিকরা (Eliatics) এসে বললেন পরিবর্তন জিনিসটা আদপেই অসম্ভব। কাজেই ইন্দ্রিয় দিয়ে পরিবর্তন লক্ষ করার পরেও সেগুলো অস্বীকার করতে বাধ্য হলেন তাঁরা। ইলিয়াটিকরা একটা দাবি বা প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন এবং এ-ধরনের একটি দৃষ্টিভঙ্গিকে হেগেল বলেছেন *থিসিস* (thesis) বা মত।'

'আচ্ছা?'

'কিন্তু কোথাও এ-রকম চরম কোনো দাবি উত্থাপিত হলে তার একটি বিরুদ্ধ দাবি উঠবে। হেগেল ব্যাপারটিকে বলছেন *অস্বীকৃতি* (negation)। ইলিয়াটিক দর্শনের অস্বীকৃতি ছিল হেরাক্লিটাস, যিনি বললেন সবকিছুই পরিবর্তনশীল। তো, এবার নাটকীয় রকমের বিপরীতমুখী এই দুই ঘরানার চিন্তার মধ্যে একটি দ্বন্দ্ব তৈরি হলো। কিন্তু এম্পিডক্লেস যখন দেখিয়ে দিলেন যে দুটো দাবিই অংশত সঠিক, অংশত ভুল তখন এই দ্বন্দ্বের নিরসন ঘটল।'

'হ্যাঁ, এখন বুঝতে পারছি আমি...

'ইলিয়াটিকরা এই দিক দিয়ে ঠিক বলেছিলেন যে আসলে কিছুই বদলায় না, তবে তাঁরা এ-কথাটি ঠিক বলেননি যে আমরা আমাদের ইন্দ্রিয়গুলোর ওপর ভরসা রাখতে পারি না। হেরাক্লিটাস এ-কথা ঠিকই বলেছিলেন যে আমরা আমাদের ইন্দ্রিয়গুলোর

ওপর ভরসা করতে পারি, কিন্তু এটা তিনি ঠিক বলেননি যে সবকিছু বদলে যায়।'

'কারণ সারবস্তু আছে একাধিক। এই সারবস্তুগুলোর কম্বিনেশনটা বদলায়, সারবস্তুগুলো নয়।'

'ঠিক! এম্পিডক্লেসের দৃষ্টিভঙ্গি—যা দুই ঘরানার চিন্তার মধ্যে একটা আপসরফা করে দিয়েছে—সেটিকে হেগেল বলছেন *অস্বীকৃতির অস্বীকৃতি*।'

'কী ভয়ঙ্কর নাম!'

'জ্ঞানের এই তিনটে ধাপকে তিনি আরও বলেছেন *থিসিস*, *অ্যান্টিথিসিস আর সিনথিসিস*। যেমন ধরো, তুমি বলতে পারো দেকার্তের বুদ্ধিবাদ (rationalism) ছিল একটা থিসিস, যার প্রতিবাদ করল হিউমের অভিজ্ঞতাবাদী *অ্যান্টিথিসিস*। কিন্তু সেই বিরুদ্ধতা বা দুই ধরনের চিন্তার মধ্যকার দ্বন্দ্বের নিরসন ঘটালো কান্টের *সিন্থেসিস*। কান্ট বুদ্ধিবাদীদের কিছু কথার সঙ্গে একমত পোষণ করলেন, আবার অভিজ্ঞতাবাদীদের কিছু কথার সঙ্গেও একমত হলেন। কিন্তু কান্টের সঙ্গে সঙ্গেই গল্পটা শেষ হয়ে গেল না। কান্টের সিনথিসিস এবার অনুচিন্তার আরেকটি শৃঙ্খল বা 'ত্রিপদী'-র যাত্রা বিন্দু হয়ে দাঁড়াল। কারণ একটা সিনথিসিসের বিরুদ্ধে সব সময়ই আরেকটা অ্যান্টিথিসিস দাঁড়িয়ে যাবে।'

'এর সবই বড্ড বেশি তাত্ত্বিক!'

'হ্যাঁ, আলবৎ তাত্ত্বিক। কিন্তু বিষয়টিকে হেগেল এমনভাবে দেখেননি যে এটা ইতিহাসকে বিশেষ কোনো কাঠামোর মধ্যে ঠেলে দিচ্ছে। তিনি বিশ্বাস করতেন ইতিহাস নিজেই এই দ্বান্দ্বিক প্যাটার্নটির প্রকাশ ঘটিয়েছে। ফলে হেগেল দাবি করলেন প্রজ্ঞার বিকাশের বা ইতিহাসের মাধ্যমে 'বিশ্ব চিদাত্মা'-র বিকাশ লাভের কিছু সূত্র আবিষ্কার করেছেন তিনি।'

'সেই কথাই এলো ঘুরে ফিরে।'

'কিন্তু হেগেলের দ্বান্দ্বিকতা শুধু ইতিহাসের বেলাতেই প্রযোজ্য তা নয়। চিন্তা করার সময়ও দ্বান্দ্বিকভাবে চিন্তা করি আমরা। যুক্তির ভেতরে দোষ খুঁজতে চেষ্টা করি আমরা। হেগেল একে বলছেন 'নেতিবাচক চিন্তা'। তবে একটা যুক্তিতে দোষ খুঁজে পাবার পর আমরা কিন্তু যুক্তিটার সবচেয়ে ভালো অংশটা খারিজ করে দিই না, বরং সেটুকুকে তুলে রাখি।'

'একটা উদাহরণ দিন।'

'এই যেমন, একজন সমাজবাদী আর একজন রক্ষণশীল মানুষ যখন একসঙ্গে বসে সামাজিক একটা সমস্যা সমাধান করার চেষ্টা করেন তখন তাঁদের চিন্তার বিপরীতমুখী ধরনের মধ্যে শিগ্‌গিরই একটা দ্বন্দ্ব ফুটে উঠবে। কিন্তু তার মানে এই নয় যে একটি পুরোপুরি সঠিক অন্যটি পুরোপুরি ভুল। এটা খুবই সম্ভব যে দুটোই আংশিক সঠিক, আংশিক ভুল। আর, তর্কটা জমে উঠতে থাকলে দুটো যুক্তির-ই সবচেয়ে ভালোটুকু দানা বেঁধে উঠবে।'

'আশা করি।'

'কিন্তু আমরা যখন এ-রকমের একটা আলোচনার সংকটপূর্ণ অবস্থায় থাকি তখন কোন অবস্থানটা বেশি যৌক্তিক তা ঠিক করা খুব সহজ নয়। এক অর্থে, কোনটা ঠিক

আর কোনটা নয় সে-সিদ্ধান্ত নেয়ার ভার ইতিহাসের ওপর। যা টিকে যাওয়ার ক্ষমতা রাখে সেটিই যৌক্তিক।'

'যা টিকে থাকে সেটিই ঠিক।'

'বা তার উল্টো যেটা ঠিক সেটিই টিকে থাকে।'

'আমার জন্য ছোট্ট একটা উদাহরণ দেয়া যাবে না?'

'দেড়শ বছর আগে বেশকিছু মানুষ নারীর অধিকারের জন্য সংগ্রাম করেছিলেন। আবার অনেকেই নারীকে সমানাধিকার দেবার প্রচণ্ড বিরোধিতাও করেছিলেন। আজ যখন আমরা দু'পক্ষের যুক্তি পড়ি তখন এটা বুঝতে কষ্ট হয় না কাদের মত বেশি 'যৌক্তিক' ছিল। কিন্তু একটা কথা আমাদের ভুললে চলবে না যে আমাদের এই জ্ঞানটা ঘটনা-পরবর্তী জ্ঞান। এটা 'প্রমাণিত হয়েছে' যে যাঁরা সমানাধিকারের জন্য লড়েছিলেন তাঁরাই ঠিক ছিলেন। অনেকেই আজ নিঃসন্দেহে কুঁকড়ে যেতো যদি তারা ছাপার অক্ষরে দেখতো তাদের পূর্ব-পুরুষেরা এই বিষয়টি সম্পর্কে কী বলেছিলেন।'

'আমি নিশ্চিত আসলেই তাই হতো তারা। তা, হেগেলের দৃষ্টিভঙ্গি কী ছিল?'

'নারী-পুরুষের সমানাধিকার প্রসঙ্গে?'

'সেটি নিয়েই তো কথা বলছি আমরা, তাই না?'

'একটা উদ্ধৃতি শুনবে?'

'অবশ্যই।'

'হেগেল বলছেন, 'পুরুষ এবং নারীর মধ্যে পার্থক্য জীব-জন্তু আর উদ্ভিদের মধ্যে পার্থক্যের মতো। পুরুষ হচ্ছে জীব-জন্তুর মতো, অন্যদিকে নারী উদ্ভিদের মতো, কারণ তাদের বিকাশটা অপেক্ষাকৃত শান্ত রকমের আর সেটির নেপথ্যে যে নীতিটা কাজ করে তা হচ্ছে অনুভূতির এক ধরনের অস্পষ্ট ঐক্য। নারী যখন সরকারের হাল ধরে রাষ্ট্র তখন মুহূর্তের মধ্যে ঝুঁকির মধ্যে পতিত হয়, কারণ নারী সার্বজনীনতার দাবির সাহায্যে নিজের ক্রিয়াকর্ম নিয়ন্ত্রণ করে না, করে খেয়ালি ঝোঁক আর মতামতের সাহায্যে। নারী শিক্ষা লাভ করে—কে জানে কীভাবে—যেন নানান ধ্যান-ধারণার বাতাস টেনে নিয়ে, জ্ঞান আহরণ করে নয় বরং স্রেফ বেঁচে থেকে। অন্য দিকে পুরুষত্বের মর্যাদা অর্জিত হয় কেবল চিন্তার পীড়ন আর প্রায়োগিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে।'

'ধন্যবাদ, ঢের হয়েছে। এমনধারা কথাবার্তা আর শুনে কাজ নেই আমার।'

'কিন্তু কোন বিষয়টি যৌক্তিক বা বিচার-বিবেচনাপ্রসূত আর কোনটি নয় সে-সম্পর্কে মানুষের ধারণা কীভাবে পাল্টে যায় তার একটি জ্বলন্ত উদাহরণ এটা।'

'এতে প্রমাণ হয় হেগেলও ছিলেন তাঁর সময়েরই সন্তান। আমরাও তাই। আমাদের 'সুস্পষ্ট' দৃষ্টিভঙ্গিগুলিও কালের পরীক্ষায় উতরাতে পারবে না।'

'কোন দৃষ্টিভঙ্গিগুলো, উদাহরণ দিন।'

'সে-রকম কোনো উদাহরণ আমার কাছে নেই।'

'কেন নেই?'

'কারণ যে-সব জিনিসের উদাহরণ আমি দেবো সেগুলো এরই মধ্যে একটা পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। যেমন ধরো, আমি বলতে পারি গাড়ি চালানো নির্বুদ্ধিতা, কারণ গাড়ি পরিবেশ দূষণ করে। এরই মধ্যে অনেক মানুষ এ-রকম ভাবতে

শুরু করেছেন। কিন্তু ইতিহাস এ-কথা প্রমাণ করবে যে যে-সব ব্যাপার আমাদের কাছে সুস্পষ্টভাবে বোধগম্য তার অনেকগুলোই ইতিহাসের আলো দেখলে মুখ লুকোবে।'

'আচ্ছা।'

'আরেকটা ব্যাপারও দেখতে পাবো আমরা হেগেলের সময়ের অনেক মানুষ, যারা নারীর হীনতর অবস্থা সম্পর্কে ও-রকম অশালীন কথাবার্তা আওড়াতো তারাই কিন্তু নারীদের বিকাশ ত্বরান্বিত করেছিল।'

'কীভাবে?'

'তারা একটা থিসিস উপস্থাপন করেছিল। কেন? কারণ তখনই নারীরা বিদ্রোহ করতে শুরু করেছিল। যে-বিষয়ে সবাই একমত তা নিয়ে তো আর মন্তব্য করার দরকার হয় না। তো, যত অশালীনভাবে তারা নারীর হীনতর অবস্থা সম্পর্কে নিজেদের বক্তব্য রাখছিল ততোই জোরালো হয়ে উঠছিল অস্বীকৃতিটা।'

'তুমি হয়ত বলতে পারো যে সবচেয়ে ভালো যে-ব্যাপারটা ঘটতে পারে তা হচ্ছে প্রবল রকমের সক্রিয় বিরুদ্ধপক্ষ জোটা। তারা যতই প্রবল হয়ে উঠবে, ততোই শক্তিশালী প্রতিক্রিয়ার মুখোমুখি হতে হবে তাদের। নিখাদ যুক্তিবিদ্যা বা দর্শনের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বলতে গেলে, দুটি ধারণার মধ্যে প্রায়ই একটা দ্বান্দ্বিক উত্তেজনা দেখা দেবে।'

'যেমন?'

'আমি যদি 'সত্তা' নামক ধারণাটি নিয়ে চিন্তা করি তাহলে তার বিরুদ্ধ ধারণা 'অসত্তা' বা 'নেতি'-র (nothing) কথাও ভাবতে বাধ্য হবো আমি। তোমার অস্তিত্বের কথা চিন্তা করতে গেলে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তুমি এ-কথা উপলব্ধি না করে পারবে না যে তুমি চিরদিন থাকবে না। 'সত্তা' আর 'অসত্তা' বা 'নেতি'-র মধ্যকার দ্বন্দ্ব ঘুচে যায় 'হয়ে ওঠা' বা 'পরিবর্তন'-এর (becoming) ধারণার মধ্যে। কারণ কোনো কিছু যদি 'হয়ে ওঠা' বা 'পরিবর্তনের' প্রক্রিয়ার মধ্যে থাকে তবে তা একই সঙ্গে অস্তিমান বা বর্তমান আবার তা নয়।'

'বুঝতে পারছি।'

'হেগেলের 'প্রজ্ঞা' তাই 'গতিবাদী যুক্তিবিদ্যা' (dynamic logic)। বাস্তবতা যেহেতু বিপরীতধর্মিতার বৈশিষ্ট্যপূর্ণ, বাস্তবতার বর্ণনা তাই অবশ্যই নানান বিপরীত জিনিসে পরিপূর্ণ থাকবে। এবার তোমার জন্য আরেকটা উদাহরণ: ডেনমার্কের পারমাণবিক পদার্থবিদ নীলস বোর নাকি একটা গল্প বলেছিলেন যে নিউটন তাঁর সদর দরজার ওপর ঘোড়ার খুরের নাল লাগিয়ে রাখতেন।'

'ওটা সৌভাগ্যের চিহ্ন।'

'কিন্তু ওটা নেহাতই একটা কুসংস্কার এবং নিউটন আর যাই হোক কুসংস্কারাচ্ছন্ন ছিলেন না। সত্যি-ই তিনি এ-ধরনের জিনিসে বিশ্বাস করেন কিনা এ-কথা জিজ্ঞেস করাতে তিনি বলেছিলেন, 'না, তা করি না, তবে জিনিসটা নাকি কাজ করে শুনেছি।'

'আশ্চর্য তো।'

'কিন্তু তাঁর উক্তিটা ছিল একেবারে দ্বান্দ্বিক, প্রায় পরস্পর-বিরোধী শব্দে গড়া একটা উক্তি। নীলস বোর, যিনি তাঁর দ্ব্যর্থবোধকতার জন্য আমাদের নরওয়ের কবি

ভিনিয়ে-র মতোই বিখ্যাত ছিলেন, তিনি একবার বলেছিলেনঃ দু'ধরনের সত্য আছে। এক হচ্ছে উপরিগত সত্য (superficial truths), যার উল্টোটা অবশ্যই মিথ্যে বা ভুল। কিন্তু সেই সঙ্গে আছে গভীর সত্য (profound truths), যার বিপরীতটাও ঠিক একই রকমের সত্য বা সঠিক।'

'সে-সব আবার কেমন সত্য?'

'যেমন ধরো, যদি আমি বলি জীবন ছোট...'

'আমি মেনে নেবো।'

'কিন্তু অন্য একটা সময় আমি আমার দু'হাত ছড়িয়ে দিয়ে বলতে পারি জীবন খুব বড়।'

'ঠিকই বলেছেন। এক অর্থে সেটিও ঠিক।'

'সবশেষে, দ্বান্দ্বিক উত্তেজনা একটা স্বতঃস্ফূর্ত কাজে রূপ নিয়ে কীভাবে একটা পরিবর্তনের সূচনা করতে পারে সে-ব্যাপারে তোমাকে আমি একটা উদাহরণ দিচ্ছি।'

'ঠিক আছে, দিন।'

'একটা কিশোরীর কথা কল্পনা করো যে সব সময়ই তার মায়ের কথার উত্তরে বলে হ্যাঁ, মা... ঠিক আছে, মা... তোমার যা ইচ্ছা, মা... এক্ষুণি করছি, মা।'

'আমার তো শুনেই গায়ে কাঁটা দিচ্ছে!'

'তো, শেষ পর্যন্ত মেয়েটির মা তার মেয়ের অতি বাধ্যতায় পুরোপুরি পাগল হয়ে চেঁচিয়ে উঠলেনঃ থামতো, তোকে এতো সুবোধ বালিকা হতে হবে না! আর তখন মেয়েটি বলেঃ ঠিক আছে মা।'

'আমি হলে একটা চড় লাগিয়ে দিতাম মেয়েটিকে।'

'হয়ত। কিন্তু তখন কী হতো যদি মেয়েটি তার বদলে উত্তরে এ-কথা বলে উঠত : কিন্তু আমি তো সুবোধ বালিকা-ই হতে চাই?'

'সেটি খুবই অদ্ভুত জবাব হতো। সে যাই হোক, আমি হয়ত তারপরেও চড়টা মারতাম ওকে।'

'অন্য কথায়, পরিস্থিতিটাকে একটা অচলাবস্থা বলা যেতে পারে। দ্বান্দ্বিক উত্তেজনাটা এমন জায়গায় গিয়ে পৌঁছেছে যেখানে একটা কিছু ঘটা খুব দরকার।'

'গালে একটা চড়ের মতোন?'

'হেগেলের দর্শনের শেষ একটা দিকের কথা উল্লেখ করা দরকার এখানে।'

'আমি শুনছি।'

'তোমার কি মনে আছে রোমান্টিকদের আমরা স্বাতন্ত্র্যবাদী বলেছিলাম?'

'রহস্যের পথ অন্তর্মুখী...'

'হেগেলের দর্শনে এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদিতাও সেটি অস্বীকৃতি বা বিপরীতের মুখোমুখি হয়েছিল। হেগেল জোর দিয়েছিলেন, তাঁর ভাষায়, 'বিষয়গত' বা 'নৈর্ব্যক্তিক' (objective) শক্তির ওপর। এ-ধরনের শক্তিগুলোর মধ্যে আবার হেগেল জোর দিয়েছেন পরিবার, সুশীল সমাজ আর রাষ্ট্রের গুরুত্বের ওপর। তুমি এমনও বলতে পারো যে ব্যক্তির ব্যাপারে হেগেল সংশয়বাদী ছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন ব্যক্তি হচ্ছে সম্প্রদায়ের একটা জৈবিক অংশ। প্রজ্ঞা বা 'বিশ্ব চিদাত্মা' প্রথম এবং প্রধানত

প্রকাশিত হয়েছিল জনগণের মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মধ্যে।'

'আরও পরিষ্কার করে বলুন, দয়া করে।'

'প্রজ্ঞা নিজেকে প্রকাশিত করে প্রথমত ভাষার মধ্যে। আর, একটা ভাষা হচ্ছে এমন জিনিস যার ভেতর আমরা জন্ম নিই। নরওয়েজীয় ভাষা হ্যানসেন সাহেবের তোয়াক্কা না করেই ভালোভাবে চলতে পারবে, কিন্তু হ্যানসেন সাহেব নরওয়েজীয় ভাষা ছাড়া অচল। তার মানে ব্যক্তি ভাষা তৈরি করে না, ভাষা-ই ব্যক্তিকে তৈরি করে।'

'সে-কথা বোধ করি বলা যায়।'

'একটি শিশু যেমন একটি ভাষার ভেতর জন্ম নেয়, ঠিক তেমনি সে তার ঐতিহাসিক পটভূমির ভেতর-ও জন্ম নেয়। এবং এ-ধরনের পটভূমিকার সঙ্গে কারোরই 'স্বাধীন' কোনো সম্পর্ক নেই। যে-মানুষ রাষ্ট্রের মধ্যে তার অবস্থান খুঁজে পায় না, সে তাই এক অনৈতিকহাসিক মানুষ। তোমার হয়ত মনে পড়বে, এই ধারণাটি মহান এথেনীয় দার্শনিকদের কাছেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। নাগরিকদের ছাড়া যেমন রাষ্ট্রের কথা ভাবা যায় না, ঠিক তেমনি রাষ্ট্র ছাড়াও নাগরিকদের কথা ভাবা যায় না।'

'অবশ্যই।'

'হেগেলের বক্তব্য অনুযায়ী, রাষ্ট্র ব্যক্তি নাগরিকের চেয়েও 'বেশি' বা 'বড়'। তাছাড়া, রাষ্ট্র তার নাগরিকদের সমষ্টি থেকেও বড়। কাজেই হেগেলের বক্তব্য হচ্ছে কেউ সমাজ থেকে নিজেকে 'প্রত্যাহার করে নিতে' পারে না। নিজের সমাজের প্রতি স্রেফ উদাসীন হয়েও যে 'নিজের আত্মা খুঁজে পেতে' চায় তাকে নিয়ে লোকে হাসাহাসি-ই করবে শুধু।'

'ঠিক বুঝতে পারছি না আমি পুরোপুরি একমত কিনা, তারপরেও ঠিক আছে।'

'হেগেলের বক্তব্য অনুযায়ী, ব্যক্তি নিজেকে খুঁজে পায় না, 'বিশ্ব চিদাত্মা' পায়।'

'বিশ্ব চিদাত্মা নিজেকে খুঁজে পায়?'

'হেগেল বলেছেন বিশ্ব চিদাত্মা তিনটে পর্যায়ে নিজের কাছে ফিরে যায়। এই কথার মাধ্যমে তিনি বলতে চাইছেন যে বিশ্ব চিদাত্মা তিনটি পর্যায়ে নিজের সম্পর্কে সচেতন হয়।'

'যেমন?'

'বিশ্ব চিদাত্মা প্রথমে নিজের সম্পর্কে সচেতন হয় ব্যক্তির মধ্যে। এটাকে হেগেল বলছেন বিষয়ী চিদাত্মা (subjective spirit)। পরিবার, সুশীল সমাজ এবং সমাজে এটা একটা উচ্চতর চেতনায় পৌঁছোয়। হেগেল একে বলছেন *বিষয়গত* চিদাত্মা, কারণ মানুষের মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মধ্যে এটা আবির্ভূত হয়। কিন্তু একটা তৃতীয় পর্যায় রয়েছে...'

'আর সেটি হলো...?'

'বিশ্ব চিদাত্মা সর্বোচ্চ পর্যায়ের আত্মোপলব্ধিতে পৌঁছোয় পরম চিদাত্মা-য়। আর এই পরম চিদাত্মা হচ্ছে শিল্প, ধর্ম আর দর্শন। এবং এদের মধ্যে সর্বোচ্চ পর্যায়ের জ্ঞান হচ্ছে দর্শন, কারণ দর্শনের মধ্যেই বিশ্ব চিদাত্মা ইতিহাসের ওপর তার নিজের প্রভাবের কথা বিবেচনা করে। কাজেই বিশ্ব চিদাত্মা প্রথমে নিজের মুখোমুখি হয় দর্শনের মধ্যে। তুমি বোধকরি বলতে পারো যে দর্শন-ই বিশ্ব চিদাত্মার আয়না।'

'ব্যাপারটা এতো রহস্যজনক যে এটা নিয়ে চিন্তা করার জন্য সময় দরকার আমার। কিন্তু শেষ যে-কথাটি বললেন সেটি পছন্দ হয়েছে আমার।'

'কোন কথাটি, দর্শন যে বিশ্ব আত্মার আয়না, এটা?'

'হ্যাঁ, কথাটি খুব সুন্দর। আপনার কি মনে হয় এর সঙ্গে পেতলের আয়নাটার কোনো সম্পর্ক আছে?'

'জিজ্ঞেস করছো যখন, হ্যাঁ, আছে।'

'কী বলতে চাইছেন?'

'আমার ধারণা, পেতলের আয়নাটা যেহেতু যেখানে-সেখানে হুট করে উদয় হচ্ছে ওটার একটি বিশেষ গুরুত্ব আছে?'

'সেই বিশেষ গুরুত্বটা কী সেটি সম্পর্কে আপনার নিশ্চয়ই একটি ধারণা আছে?'

'না নেই। আমি বলেছি যে হিল্ডা আর তার বাবার জন্য বিশেষ কোনো গুরুত্ব বহন না করলে এটা এ-রকমভাবে আসতে থাকত না। সেই গুরুত্বটা কী সে-কথা জানে কেবল হিল্ডা।'

'এটা কি একটি রোমান্টিক আয়রনি?'

'প্রশ্নটার কোনো মানে হয় না, সোফি।'

'কেন?'

'কারণ আমরা নিজেরা এটা নিয়ে কাজ করছি না। আমরা কেবল সেই আয়রনির অসহায় শিকার। কোনো ইঁচড়ে পাকা শিশু কাগজের ওপর কিছু আঁকলে তুমি সেই কাগজটাকে জিজ্ঞেস করতে পারো না সেই ছবিটার মানে কী।'

'আমার গায়ে কাঁটা দিচ্ছেন আপনি।'

কি য়ে র্কে গা র্ড

৩৫

...ইউরোপ দেউলিয়া হওয়ার পথে...

নিজের ঘড়ির দিকে তাকাল হিল্ডা। সাড়ে চারটার বেশি বেজে গেছে এরই মধ্যে। সে তার রিং বাইন্ডারটা ডেস্কের ওপর রেখে দৌড়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে রান্নাঘরে চলে এলো। তার মা তার জন্য অপেক্ষা করে ক্লান্ত হয়ে যাওয়ার আগেই বোট হাউসে নেমে যেতে হবে তাকে। যেতে যেতে পেতলের আয়নাটার দিকে একবার তাকাল সে।

চায়ের জন্য তাড়াতাড়ি কেতলিটা চাপিয়ে দিয়ে কিছু স্যান্ডউইচ বানালো সে।

বাবার ওপর কয়েকটা ফন্দি খাটাবে বলে মনে মনে ঠিক করেছে সে। ক্রমেই সোফি আর অ্যালবার্টোর সঙ্গে বেশি করে একাত্ম বোধ করতে শুরু করেছে হিল্ডা। বাবা কোপেনহেগেন পৌঁছলেই তার পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ শুরু হবে।

বড়সড় একটা রেকাবি নিয়ে বোটহাউসে নেমে এলো সে।

'এই নিয়ে এসেছি আমাদের ব্রাঞ্চ,' বলল হিল্ডা।

শিরিষ কাগজ মোড়া একটা ব্লক ধরে আছেন তার মা। কপালের ওপর এসে পড়া এক গোছা চুল হাত দিয়ে ঠেলে পেছনে সরিয়ে দিলেন তিনি। তাঁর চুলেও বালু লেগে রয়েছে।

'ডিনারটা বাদ দেই তাহলে চল।'

বাইরে ডকের ওপর বসলেন দু'জনে, তারপর খেতে শুরু করলেন।

'বাবা কবে আসছে?' খানিক পর জিজ্ঞেস করল হিল্ডা।

'শনিবার। আমি তো ভেবেছিলাম তুই জানিস।'

'কিন্তু কখন? তুমি বলেছিলে না কোপেনহেগেনে প্লেন বদলাবে বাবা?'

'তা ঠিক...

স্যান্ডউইচে একটা কামড় বসালেন তার মা।

'প্রায় পাঁচটার দিকে কোপেনেহেগেন পৌঁছবে ও। ক্রিসটিয়ানস্যান্ডের প্লেন ছাড়ে পৌনে আটটায়। সম্ভবত সাড়ে ন'টায় কিয়েভিক ল্যান্ড করবে ও।'

'আচ্ছা, তাহলে কাস্ট্রাপে কয়েক ঘণ্টা সময় থাকবে বাবার হাতে...'

'হ্যাঁ, কিন্তু কেন বলছিস?'

'এমনি। স্রেফ ভাবছিলাম।'

হিল্ডার যখন মনে হলো যথেষ্ট সময় কেটে গেছে তখন সে হালকা চালে জিজ্ঞেস

করল, 'অ্যান আর ওলের কোনো খবর শুনেছো ইদানীং?'

'মাঝে মাঝেই তো ফোন করে। জুলাইয়ের কোনো একসময় ছুটিতে বাড়ি আসবে দু'জন।'

'তার আগে না তো?'

'না, তা মনে হয় না।'

'তার মানে এই হপ্তায় কোপেনহেগেন থাকছে ওরা...?'

'এতো সব প্রশ্ন করছিস কেন, হিল্ডা?'

'কোনো কারণ নেই। এই কথার কথা আর কী।'

'এই নিয়ে দু'বার কোপেনহেগেনের কথা বললি তুই।'

'বলেছি বুঝি?'

'আমরা বলছিলাম বাবা নামছে...'

'সেজন্যই বোধহয় অ্যান আর ওলে-র কথা মনে পড়েছিল আমার।'

দু'জনের খাওয়া শেষ হতেই মগ আর প্লেটগুলো রেকাবির ওপর উঠিয়ে রাখল হিল্ডা।

'আমাকে আমার পড়াটা শুরু করতে হবে আবার, মা।'

'তা তো বটেই।'

মা'র গলায় একটু ভর্ৎসনার সুর ফুটল কি? বাবা বাড়ি ফেরার আগে তারা দু'জনে মিলে নৌকোটা ঠিকঠাক করে রাখার কথা ছিল।

'বাবা আমাকে দিয়ে প্রায় দিব্যি করিয়ে রেখেছে সে বাড়ি ফেরার আগেই বইটা শেষ করার ব্যাপারে।'

'ব্যাপারটা একটু উদ্ভট। বাড়ির বাইরে থাকার সময় বাড়িতে আমাদের হুকুম করে বেড়াবার তো দরকার নেই তার।'

'তুমি যদি জানতে, বাবা লোককে কী রকম হুকুম করে বেড়ায়,' রহস্যের সুরে বলে উঠল হিল্ডা। 'আর, তুমি কল্পনাও করতে পারবে না ব্যাপারটা কতটা এনজয় করে বাবা।'

নিজের ঘরে ফিরে পড়তে শুরু করল হিল্ডা।

হঠাৎ দরজায় একটা করাঘাতের শব্দ শুনতে পেল সোফি। গরম চোখে তার দিকে তাকালেন অ্যালবার্টো।

'আমরা চাই না কেউ আমাদের বিরক্ত করুক।'

করাঘাতের শব্দ আগের চেয়ে জোরাল হয়ে উঠল।

'তোমাকে আমি হেগেলের দর্শনের ওপর মহাক্রুদ্ধ হয়ে ওঠা এক দিনেমার (Danish) দার্শনিকের কথা বলতে যাচ্ছি,' অ্যালবার্টো বললেন।

করাঘাত এতো প্রচণ্ড হয়ে উঠল যে পুরো দরজাটা কেঁপে উঠল।

'নিশ্চয়ই সেই মেজর কোনো ভূত-টুত পাঠিয়ে দিয়ে দেখছে আমরা টোপটা গিলি কিনা,' অ্যালবার্টো বললেন। 'এতে তার কোনো কষ্টই করতে হয় না।'

'কিন্তু আমরা যদি দরজা খুলে না দেখি কে এসেছে তাহলে পুরো বাড়িটা ভেঙে ফেলতেও তো কোনো কষ্ট করতে হবে না তাকে।'

'এটা অবশ্য একটা ভালো কথা বলেছ। ঠিক আছে, তাহলে খোলাই যাক দরজাটা।'

দু'জনেই এগিয়ে গেলেন দরজার কাছে। করাঘাতটা যেহেতু খুবই জোরাল ছিল, সোফি তাই রীতিমতো বড় সড় কোনো লোক দেখবে বলে আশা করেছিল। কিন্তু দেখল সামনের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে আছে লম্বা সোনালি চুলের ছোট্ট একটা মেয়ে, পরনে নীল পোশাক। তার দুই হাতে একটা করে ছোট্ট বোতল। একটা বোতল লাল, অন্যটা নীল।

'হাই,' সোফি বলল, 'কে তুমি?'

'আমার নাম এলিস,' লাজুকভাবে মাথাটা একটু নুইয়ে মেয়েটি বলল।

'আমিও তাই ভেবেছিলাম,' মাথা ঝাঁকিয়ে অ্যালবার্টো বললেন। 'এ হচ্ছে এলিস ইন ওয়ান্ডারল্যান্ড।'

'ও কী করে পথ চিনে আমাদের কাছে এলো?'

এলিস-ই সেটি ব্যাখ্যা করল 'ওয়ান্ডারল্যান্ড হলো একেবারে কোনো সীমানা ছাড়া একটা দেশ। তার মানে, ওয়ান্ডারল্যান্ডটা সবখানেই আছে, অনেকটা ওই জাতিসংঘের মতো। জাতিসংঘের অনারারি সদস্য হওয়া উচিত ওয়ান্ডারল্যান্ডের। সব কমিটিতেই আমাদের প্রতিনিধি থাকা দরকার, কারণ জাতিসংঘেরও সৃষ্টি হয়েছে মানুষের বিস্ময় থেকে।'

'হুম্...সেই মেজর!' বিড়বিড়িয়ে বললেন অ্যালবার্টো।

'তা, তোমার আগমনের হেতু?' সোফি শুধাল।

'সোফিকে এই দুটো দর্শনের বোতল দিতে এসেছি আমি।'

বোতল দুটো সোফির হাতে তুলে দিল সে। একটাতে লাল তরল, অন্যটাতে নীল। লাল বোতলের লেবেলে লেখা 'আমাকে পান করো,' নীল বোতলের লেবেলেও লেখা: 'আমাকে পান করো।'

পরমুহূর্তেই সাদা একটা খরগোশ ছুটে এলো কেবিনটার পাশ দিয়ে। সোজা হয়ে দু'পায়ে হাঁটছে সেটি, পরনে একটি ওয়েস্টকোট আর জ্যাকেট, কেবিনের ঠিক সামনে এসে সে তার ওয়েস্টকোটের পকেট থেকে একটি হাতঘড়ি বের করে বলে উঠল

'এই সেরেছে! এই সেরেছে! বড্ড দেরি হয়ে যাবে আমার।'

এরপরই ছুট লাগাল সে। এলিসও দৌড়তে শুরু করল তার পিছু পিছু। বনের ভেতরে ঢুকে পড়ার ঠিক আগে আবারও মাথাটা একটু নুইয়ে ভদ্রতা দেখিয়ে সে বলে উঠল 'এই তো ফের শুরু হলো বলে।'

'দিনা আর রানীকে আমার শুভেচ্ছা দিও,' মেয়েটির পেছন থেকে বলে উঠল সোফি। সামনের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে বোতল দু'টো ভালো করে দেখলেন অ্যালবার্টো আর সোফি।

'আমাকে পান করো,' 'আমাকে পান করো,' পড়ল সোফি। 'বুঝতে পারছি না সাহস করবো কিনা। তরলটা বিষাক্তও হতে পারে।'

অ্যালবার্টো স্রেফ কাঁধ ঝাঁকালেন।

'মেজর পাঠিয়েছে ওগুলো আর মেজর যে-সব জিনিস পাঠায় সেগুলো পুরোপুরি

মনের জিনিস। কাজেই এ-শুধু নকল-জ্যুস।'

লাল বোতলের ছিপিটা খুলে ফেলে সাবধানে বোতলের মুখটা নিজের ঠোঁটে ছোঁয়াল সোফি। অদ্ভুত মিষ্টি স্বাদ জ্যুসটার, কিন্তু সেটিই সব নয়। জ্যুসটা পান করতেই সোফির চারপাশে কিছু একটা ঘটতে শুরু করল।

মনে হলো লেক, বন আর কেবিন মিলেমিশে একটা জিনিস হয়ে গেছে। শিগ্‌গিরই এমন মনে হলো যে সোফি যা-কিছু দেখছে সবই যেন একই ব্যক্তি আর সেই ব্যক্তিটি হচ্ছে সোফি নিজে। অ্যালবার্টোর দিকে মুখ তুলে তাকাল সে, কিন্তু তাঁকেও সোফির আত্মার অংশ বলে মনে হলো তার কাছে।

সোফি বলল, 'সবকিছুই ঠিক আগের মতোই দেখাচ্ছে, কিন্তু এখন এগুলো সব একটা জিনিস। আমার মনে হচ্ছে যেন প্রত্যেকটা জিনিসই একটাই চিন্তা।'

মাথা ঝাঁকালেন অ্যালবার্টো ওপর-নিচ, কিন্তু সোফির কাছে মনে হলো যেন সে নিজেই নিজের উদ্দেশ্যে মাথা ঝাঁকাচ্ছে।

'এটা হচ্ছে সর্বেশ্বরবাদ বা ভাববাদ,' তিনি বললেন। 'এটা হচ্ছে রোমান্টিকদের বিশ্ব চিদাত্মা। সবকিছুকেই তারা প্রত্যক্ষ করেছেন এক বিশাল 'অহম' হিসেবে। আবার হেগেল-ই ব্যক্তি সম্পর্কে সমালোচনামুখর ছিলেন আর তিনিই সবকিছুকে দেখতেন এক এবং একমাত্র বিশ্ব প্রজ্ঞার প্রকাশ হিসেবে।'

'অন্য বোতলটা থেকেও পান করব?'

'লেবেল-এ তো সে-রকমই বলা আছে।'

নীল বোতলটার ছিপি খুলে বড় এক ঢোক খেয়ে নিল সোফি। এই জ্যুসটা আগের চেয়ে টাটকা আর তীব্র বলে বোধ হলো তার কাছে। হঠাৎ করে তার চারপাশের সব কিছু আবারও বদলে গেল।

লাল বোতলের প্রভাব মুহূর্তেই কেটে গেল আর সবকিছুই ফিরে এলো যার যার স্বাভাবিক অবস্থায়। অ্যালবার্টো হয়ে গেলেন অ্যালবার্টো, গাছগুলো ফিরে গেল বনে আর পানিটুকুকে ফের লেকের মতোই দেখালো।

কিন্তু ব্যাপারটা স্থায়ী হলো এক মুহূর্ত মাত্র, কারণ জিনিসগুলো সব পিছলে সরে যেতে থাকল পরস্পরের কাছ থেকে। বন আর বন রইল না, প্রত্যেকটা গাছকেই একেকটা জগৎ বলে মনে হতে লাগল। সবচেয়ে ছোট ডালটাকেও একটা রূপকথার জগৎ বলে মনে হতে লাগল যে-জগৎ সম্পর্কে হাজারটা গল্প বলা যেতে পারে।

ছোট্ট লেকটা হঠাৎ করেই হয়ে গেল কূল-কিনারাহীন একটা মহাসমুদ্র, গভীরতা বা প্রশস্ততার দিক দিয়ে নয়, বরং সেটির ঝকমকে বিস্তার আর ঢেউগুলোর জটিল নকশায়। সোফির মনে হলো এই পানির দিকে তাকিয়ে সারা জীবন কাটিয়ে দিতে পারবে সে অথচ তার জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত এটা একটা অথৈ রহস্যই থেকে যাবে তার কাছে।

একটা গাছের মাথার দিকে তাকাল সে। অদ্ভুত একটা খেলায় মগ্ন হয়ে আছে তিনটে চড়ুই পাখি। লুকোচুরি খেলা খেলছে ওরা? লাল বোতলের জ্যুস খাওয়ার পরেও সোফি কোনোভাবে জানত যে এই গাছটায় কিছু পাখি রয়েছে, কিন্তু সেগুলোকে আসলে ঠিকভাবে দেখতে পায়নি সে। লাল জ্যুসটা সব ধরনের বৈপরীত্য আর বিশেষ

পার্থক্য মুছে দিয়েছিল।

বড় যে চ্যাপ্টা পাথরের সিঁড়ি ধাপের ওপর দাঁড়িয়ে ছিল ওরা সেটি থেকে লাফ দিয়ে নেমে ঝুঁকে পড়ল সোফি ঘাসের দিকে তাকাবার জন্য। ওখানে সে আবিষ্কার করল আরেকটা নতুন জগৎ, যেন পানির নিচে প্রথমবারের মতো দৃষ্টি মেলে দিয়েছে গভীর সমুদ্রের এক ডুবুরি। নানান শাখা-পল্লব আর শুকনো ঘাসের গুচ্ছের ভেতর জলাভূমিটা সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম নানান জিনিসে ভরে আছে। সোফি দেখল একটা মাকড়সা দৃঢ়পায়ে স্থিরলক্ষ্যে দৌড়ে গেল জলাভূমির ওপর দিয়ে, লাল একটা গেছো উকুন ঘাসের একটা ফলা বেয়ে ওপর-নিচ ছুটোছুটি করছে আর পিঁপড়ের একটা গোটা সৈন্যদল সম্মিলিতভাবে কাজ করে যাচ্ছে ঘাসের মধ্যে। কিন্তু ক্ষুদে ক্ষুদে প্রতিটি পিঁপড়াই যার যার পাগুলো নাড়াচ্ছে স্বকীয় ভঙ্গিমায়।

কিন্তু সে যখন ফের উঠে অ্যালবার্টোর দিকে তাকাল তখনই এসবের মধ্যে সবচেয়ে অদ্ভুত দৃশ্যটা চোখে পড়ল তার; তখনও কেবিনের সামনের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি। তো, অ্যালবার্টোর ভেতর সোফি দেখতে পেল এক অদ্ভুত ব্যক্তিকে, ভিনগ্রহ থেকে আসা একটা প্রাণীর মতো দেখাচ্ছে তাঁকে বা যেন কোনো রূপকথা থেকে উঠে আসা এক মন্ত্রমুগ্ধ চরিত্র। ঠিক একই সঙ্গে নিজেকে সে পুরোপুরি নতুনভাবে এক অনুপম ব্যক্তি হিসেবে উপলব্ধি করল। স্রেফ একজন মানুষের চেয়ে, পনেরো বছর বয়েসী এক কিশোরীর চেয়ে অতিরিক্ত একটা কিছু সে। সে সোফি অ্যামুন্ডসেন আর, কেবল সে-ই তাই।

'কী দেখতে পাচ্ছো?' জিজ্ঞেস করলেন অ্যালবার্টো।

'দেখতে পাচ্ছি, আপনি একটা অদ্ভুত পাখি হয়ে গেছেন।'

'তাই বুঝি?'

'আমার তো মনে হয় না অন্য একজন হওয়াটা কেমন সেটি আমি কোনোদিন বুঝতে পারবো। দুনিয়াতে দুটো মানুষ কোনো দিনই একই রকম নয়।'

'আর বনটা?'

'সেটিকেও তো আর আগের মতো মনে হচ্ছে না। সেটি যেন অদ্ভুত সব গল্পে ভর্তি গোটা একটা মহাবিশ্ব।'

'ঠিক এটাই সন্দেহ করেছিলাম। নীল বোতলটা হলো ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদ। এটা হলো, উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, রোমান্টিকদের ভাববাদের বিরুদ্ধে *সোরেন কিয়ের্কেগার্ড*-এর (Soren Kierkegaard) প্রতিক্রিয়া। কিন্তু এর সঙ্গে আরেকজন দিনেমারেরও নাম জড়িত, যিনি কিয়ের্কেগার্ডের সমসাময়িক। আর তিনি হচ্ছেন রূপকথার লেখক বিখ্যাত হ্যান্স ক্রিশ্চিয়ান অ্যান্ডারসেন। তাঁরা দু'জনেই ছিলেন প্রকৃতিতে সূক্ষ্ম জিনিসের অবিশ্বাস্য রকমের প্রাচুর্যের ব্যাপারে একই রকম তীক্ষ্ণ দৃষ্টির অধিকারী। অবশ্য একশো বছর আগে যে-দার্শনিক একই ব্যাপার লক্ষ্য করেছিলেন তিনি হচ্ছেন জার্মান লাইবনিজ। কিয়ের্কেগার্ড যে-রকম হেগেলের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন, লাইবনিজ-ও তেমনি স্পিনোজার ভাববাদী দর্শনের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিলেন।'

'আপনার কথা আমি শুনতে পাচ্ছি, কিন্তু আপনার কথাগুলো এমনই মজার

শোনাচ্ছে যে হাসতে ইচ্ছে আমার।'

'সেটি ঠিক আছে। লাল বোতলটা থেকে আরেকটা সিপ নাও শুধু। এসো, এই সিঁড়ির ধাপে বসা যাক। আজকের মতো থামবার আগে কিয়ের্কেগার্ড নিয়ে কিছু কথা বলি।'

অ্যালবার্টোর পাশে বসে পড়ল সোফি সিঁড়ির ধাপের ওপর। লাল বোতল থেকে খানিকটা পান করল সে। সবকিছু আবার এক হয়ে যেতে শুরু করল। একটু বেশি পরিমাণেই এক হয়ে গেল আসলে; আবারও তার একটা অনুভূতি হলো যে কোনো পার্থক্যেই কিছু আসে যায় না আদৌ। তবে নীল বোতলটা তার ঠোঁটে ছোঁয়ানোর অপেক্ষামাত্র, তারপরেই তার চারপাশের জগৎটা কম-বেশি সেই সময়ের মতো হয়ে গেল যখন এলিস এসে পৌঁছেছিল বোতল দুটো নিয়ে।

'কিন্তু কোনটা সত্যি?' এবার জিজ্ঞেস করল সে। 'লাল না নীল বোতল, কোনটার চিত্র আসল?'

'লাল নীল দুটোরই, সোফি। একটিই মাত্র বাস্তবতা রয়েছে এ-কথা বলে রোমান্টিকরা যে ভুল করেছিলেন সেটি আমরা বলতে পারি না। তবে তাদের দৃষ্টিভঙ্গিটা হয়ত খানিকটা সংকীর্ণ ছিল।'

'আর নীল বোতলটার ব্যাপারটা কী?'

'আমার ধারণা কিয়ের্কেগার্ড ওই বোতলটা থেকে তাড়াহুড়ো করে কয়েক ঢোক খেয়ে নিয়েছিলেন। কোনো সন্দেহ নেই, ব্যক্তির গুরুত্বের ব্যাপারে তিনি অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। আমরা কেবল 'আমাদের সময়ের সন্তান' নই, তারচেয়েও বেশি কিছু। আর তাছাড়া, আমাদের প্রত্যেকেই একেকজন অনুপম ব্যক্তি যে কেবল একবারই বাঁচে।'

'এবং হেগেল এ-ব্যাপারটিকে সে-রকম গুরুত্ব দেননি?'

'না, তিনি বরং আগ্রহী ছিলেন ইতিহাসের বৃহৎ ক্ষেত্রের ব্যাপারে। আর এই বিষয়টি-ই বেশি ক্ষুব্ধ করে তুলেছিল কিয়ের্কেগার্ডকে। তিনি মনে করতেন রোমান্টিকদের ভাববাদ এবং হেগেলের 'ইতিহাসবাদ' এই দুই-ই নিজের জীবনের প্রতি ব্যক্তির দায়িত্বের বিষয়টি অস্পষ্ট করে দিয়েছে। কাজেই কিয়ের্কেগার্ডের বিবেচনায় হেগেল আর রোমান্টিকরা একই দোষে দুষ্ট।'

'এখন বুঝতে পারছি কেন তিনি এমন পাগল ছিলেন।'

'সোরেন কিয়ের্কেগার্ড-এর জন্ম ১৮১৩ সালে, তাঁর বাবা খুবই কড়া শাসনে মানুষ করেছিলেন তাঁকে। তাঁর ধর্মীয় বিষণ্ণতা বাবার কাছ থেকেই পেয়েছিলেন তিনি।'

'শুনতে কেমন যেন ভয় ভয় লাগছে।'

'এই বিষণ্ণতা বা বিষাদগ্রস্ততার কারণেই তিনি তাঁর এনগেজমেন্ট ভেঙে দিতে বাধ্য হন আর এ-ব্যাপারটিকে কোপেনহেগেনের বুর্জোয়া সমাজ খুব ভালো চোখে দেখেনি। কাজেই, প্রথম থেকেই একজন সমাজবিচ্ছিন্ন এবং নিন্দনীয় মানুষে পরিণত হন তিনি। যাই হোক, ধীরে ধীরে তিনি এসবের প্রত্যুত্তর দিতে শিখলেন এবং ক্রমেই পরিণত হলেন ইবসেন যাকে বর্ণনা করেছেন 'একজন গণশত্রু' হিসেবে ঠিক তাই।'

'স্রেফ একটা এনগেজমেন্ট ভেঙে দিয়েছিলেন বলে এত কিছু?'

'না, শুধু সেই কারণেই নয় অবশ্য। বিশেষ করে জীবনের শেষ দিকে এসে সমাজের সমালোচনায় একেবারে মুখিয়ে থাকতেন তিনি। তিনি বলেছিলেন, 'গোটা ইউরোপ দেউলিয়া হওয়ার পথে।' তিনি বিশ্বাস করতেন তিনি এমন এক যুগে বাস করছেন যা পুরোপুরি প্যাশন এবং দায়বদ্ধতাশূন্য। তিনি বিশেষ করে ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন ডেনিশ লুথারান গির্জার নীরসতায়। যাকে তুমি বলতে পারো 'সানডে ক্রিশ্চিয়ানিটি' তার নির্দয় সমালোচক ছিলেন তিনি।'

'ইদানীং আমরা বলি 'কনফার্মেশন ক্রিশ্চিয়ানিটি'-র কথা। বেশির ভাগ বাচ্চাই কনফার্মড হয় ওরা যে-সব উপহার পায় সেগুলোর কারণে।'

'হ্যাঁ, তুমি ঠিকই ধরেছ। কিয়েৰ্কেগার্ডের বিবেচনায়, খ্রিস্টধর্ম একইসঙ্গে এমনই অদম্য আর অযৌক্তিক যে তা হয় এটা/নয় ওটা(either/or) এরকম না হয়ে যায় না। 'এক অর্থে' অথবা 'খানিকটা' ধার্মিক হওয়াটা কোনো কাজের কথা নয়। তার কারণ, ইস্টারের দিন যিশু হয় পুনরুত্থিত হয়েছিলেন, নয়ত হননি। আর তিনি যদি সত্যিই পুনরুত্থিত হয়ে থাকেন, সত্যিই যদি তিনি আমাদের জন্য মৃত্যুবরণ করে থাকেন তাহলে সেটি এতোই অভিভূত করার মতো ব্যাপার যে তা আমাদের গোটা জীবনের ভেতরে চারিয়ে যাবেই যাবে।'

'হ্যাঁ, বোধকরি বুঝতে পারছি।'

'কিন্তু ধর্মীয় প্রশ্নগুলোর ব্যাপারে মানুষ এবং গির্জা এই দুই পক্ষের দৃষ্টিভঙ্গি যে কীরকম দায়বদ্ধতাহীন সেটি কিয়ের্কেগার্ড লক্ষ্য করেছিলেন। কিয়ের্কেগার্ডের কাছে ধর্ম এবং জ্ঞান ছিল আগুন এবং পানির মতো। খ্রিস্টধর্ম 'সত্য', এটা বিশ্বাস করাটাই যথেষ্ট নয়। খ্রিস্টীয় বিশ্বাসে বিশ্বাসী হওয়ার অর্থ খ্রিস্টীয় জীবনধারা অনুসরণ করা।'

'এর সঙ্গে হেগেলের সম্পর্ক কোথায়?'

'তুমি ঠিকই বলেছো। আমরা বোধকরি ভুল জায়গা থেকে শুরু করেছি।'

'তাই আমার পরামর্শ হলো ফিরতি পথে গিয়ে গোড়া থেকে শুরু করুন।'

'সতেরো বছর বয়সে ঈশ্বরতত্ত্ব নিয়ে পড়াশোনা শুরু করেন কিয়ের্কেগার্ড, কিন্তু ক্রমেই তিনি আত্মমগ্ন হয়ে পড়েন বিভিন্ন দার্শনিক প্রশ্নের ভেতর। সাতাশ বছর বয়সে মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেন তিনি 'আয়রনি সম্পর্কিত ধারণা' এই শিরোনামের একটি গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখে। এই কাজটিতে তিনি রোমান্টিক আয়রনি আর মায়া বা বিভ্রান্তি (illusion) নিয়ে রোমান্টিকদের দায়বদ্ধতাহীন খেলার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন। এর বিপরীতে তিনি উপস্থাপন করেছেন 'সক্রেটিক আয়রনি'। সক্রেটিস যদিও আয়রনিকে অনেক বড় কাজে লাগিয়েছেন, এর উদ্দেশ্য ছিল জীবন সম্পর্কে মৌলিক সত্যগুলো বের করে আনা। সক্রেটিস ছিলেন কিয়ের্কেগার্ড যাকে বলেছেন একজন "অস্তিত্ববাদী" চিন্তাবিদ, রোমান্টিকরা যা ছিলেন না। তার মানে, সক্রেটিস এমন একজন চিন্তাবিদ যিনি তাঁর দার্শনিক ভাবনা-চিন্তায় তাঁর সমগ্র অস্তিত্বকে জড়িয়ে নেন।'

'তো?'

'১৮৪১ সালে এনগেজমেন্টটা ভেঙে দিয়ে কিয়ের্কেগার্ড বার্লিন চলে যান শেলিং-এর বক্তৃতা শুনতে।'

'হেগেলের সঙ্গে কি দেখা করেছিলেন তিনি?'

'না, তার দশ বছর আগেই মারা গিয়েছিলেন হেগেল, যদিও বার্লিন এবং ইউরোপের অনেক জায়গাতেই তাঁর চিন্তা-ভাবনাই প্রাধান্য বিস্তার করেছিল। হেগেলের 'পদ্ধতি' (system) ব্যবহৃত হচ্ছিল সব ধরনের প্রশ্নের একটা সব-খোল চাবির মতো। কিন্তু কিয়ের্কেগার্ড বললেন যে হেগেলীয়বাদ যে-ধরনের 'বিষয়গত সত্য'-র সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সে-সব সত্য একজন মানুষের ব্যক্তিগত জীবনের ক্ষেত্রে পুরোপুরি অপ্রাসঙ্গিক।'

'তাহলে কোন ধরনের সত্য প্রাসঙ্গিক?'

'কিয়ের্কেগার্ডের বক্তব্য অনুযায়ী, বড় বা মহৎ কোনো সত্যের অনুসন্ধানের চেয়ে জরুরি হচ্ছে সেইসব সত্য আবিষ্কার করা যে-সব সত্য ব্যক্তির জীবনের জন্য অর্থপূর্ণ। 'আমার নিজের জন্য সত্য আবিষ্কার করা'টাই জরুরি। এভাবেই তিনি ব্যক্তিকে বা প্রত্যেকটি মানুষকে 'পদ্ধতি'-র বিরুদ্ধে দাঁড় করালেন। কিয়ের্কেগার্ড মনে করতেন হেগেল ভুলে গিয়েছিলেন যে তিনি একজন মানুষ। হেগেলীয় অধ্যাপক সম্পর্কে তিনি যা লিখেছিলেন তা এই 'ভারিক্কি স্যার প্রফেসর যখন জীবনের গোটা রহস্য ব্যাখ্যা করছিলেন তখন চিত্তবিক্ষেপবশে তিনি তাঁর নিজের নাম ভুলে গিয়েছিলেন; ভুলে গিয়েছিলেন যে তিনি একজন মানুষ, তার বেশিও নয় কমও নয়, একটা প্যারাগ্রাফের চমৎকার আটভাগের তিন ভাগও নয়।'

'তাহলে কিয়ের্কেগার্ডের মত অনুযায়ী মানুষ কী?'

'সেটি ঠিক সরলভাবে বলা যাবে না। মানব প্রকৃতি বা মানুষ সম্পর্কে বড়সড় কোনো সংজ্ঞার ব্যাপারে একেবারেই কোনো উৎসাহ ছিল না কিয়ের্কেগার্ডের। একমাত্র জরুরি বিষয়টি হচ্ছে প্রত্যেক মানুষের 'নিজস্ব অস্তিত্ব'। আর, কেউ তো তার নিজের অস্তিত্ব ডেস্কের পেছন থেকে টের পায় না। আমরা যখন কাজ করি, বিশেষ করে যখন গুরুত্বপূর্ণ কোনো *পছন্দ বা বাছাই করি* তখনই আমরা অস্তিত্বের সঙ্গে যুক্ত হই। কিয়ের্কেগার্ড ঠিক কী বোঝাতে চেয়েছেন সেটি বোঝা যাবে বুদ্ধ সম্পর্কে এই গল্পটায়।'

'বুদ্ধ সম্পর্কে?'

'হ্যাঁ, যেহেতু বুদ্ধের দর্শনও মানুষের অস্তিত্বকেই সেটির সূচনাবিন্দু হিসেবে গ্রহণ করেছিল। একবার এক সন্ন্যাসী বুদ্ধকে শুধোলেন তিনি তাঁকে জগৎ কী এবং মানুষ কী এই মৌলিক প্রশ্নগুলোর ব্যাপারে অন্যদের চেয়ে পরিষ্কার উত্তর দিতে পারেন কিনা। গায়ে বিষাক্ত তীর বেঁধা এক মানুষের সঙ্গে সন্ন্যাসীকে তুলনা করে বুদ্ধ সে-প্রশ্নের জবাব দিলেন। তিনি বললেন, তীরটা কী দিয়ে তৈরি, কোন ধরনের বিষ সেটির গায়ে লাগানো হয়েছে বা তীরটা কোন দিক থেকে এসেছে তা নিয়ে কোনো তাত্ত্বিক প্রশ্নে আহত লোকটার বিন্দুমাত্র আগ্রহ থাকত না।'

'খুব সম্ভবত তখন তার চাওয়া শুধু কেউ তীরটা টান দিয়ে বের করে তার ক্ষতটার চিকিৎসা করুক।'

'ঠিক তাই। অস্তিত্বগতভাবে সেটিই জরুরি হতো তার কাছে। বুদ্ধ এবং কিয়ের্কেগার্ড দু'জনের মধ্যেই শুধু অল্প কিছুক্ষণ অস্তিত্বশীল থাকার ব্যাপারে প্রবল একটা বোধ ক্রিয়াশীল ছিল। আর কেবল সেটি থাকলেই তুমি ডেস্কের পেছনে বসে

বিশ্ব চিদাত্মার স্বরূপ সম্পর্কে দার্শনিক তত্ত্ব ফলাবে না।'

'না, অবশ্যই না।'

'কিয়ের্কেগার্ড আরও বলেছিলেন যে সত্য 'বিষয়ীগত' (subjective)। এ-কথা বলে তিনি এটা বোঝাননি যে আমরা কী ভাবি বা বিশ্বাস করি তার কোনো গুরুত্ব নেই। তিনি বোঝাতে চেয়েছেন যে প্রকৃত গুরুত্বপূর্ণ সত্যগুলো *ব্যক্তিগত*। কেবল এই সত্যগুলোই 'আমার জন্য সত্য'।'

'বিষয়ীগত সত্যের একটা উদাহরণ দিতে পারবেন?'

'এই যেমন, একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হচ্ছে খ্রিস্টধর্ম সত্য কিনা। তত্ত্বগত বা কেতাবীভাবে নেয়ার মতো কোনো প্রশ্ন এটা নয়। যে মানুষটি 'এই জীবনে নিজেকে চিনতে পেরেছে' তার কাছে এটা জীবন-মরণের প্রশ্ন। এটা এমন কোনো কিছু নয় যা নিয়ে তুমি বসে বসে স্রেফ আলোচনার খাতিরে আলোচনা করতে পারো। এটা এমন একটা ব্যাপার যার দিকে তোমাকে এগোতে হবে সর্বোচ্চ আবেগ বা আসক্তি আর আন্তরিকতার সঙ্গে।'

'তা বোঝাই যায়।'

'তুমি যদি পানিতে পড়ে যাও তাহলে তুমি ডুববে কি না তা নিয়ে তোমার মধ্যে কোনো তত্ত্বগত আগ্রহ থাকে না, পানিতে কুমির আছে কিনা সে-বিষয়টা 'ইন্টারেস্টিং-ও' না আবার 'আনইন্টারেস্টিং-ও' না। প্রশ্নটা জীবন-মৃত্যু সংক্রান্ত।'

'বুঝতে পারছি, অনেক ধন্যবাদ।'

'কাজেই আমাদেরকে অবশ্যই ঈশ্বর আছেন কিনা এই দার্শনিক প্রশ্ন আর এই প্রশ্নের সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক, এই দুটোর মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে হবে; এটা এমন একটা পরিস্থিতি বা অবস্থা যেখানে প্রত্যেকটি মানুষই পুরোপুরি একা। এ-ধরনের মৌলিক প্রশ্নের দিকে কেবল *বিশ্বাস* নিয়েই এগিয়ে যাওয়া সম্ভব। যে-সমস্ত জিনিস আমরা প্রজ্ঞা বা জ্ঞানের মাধ্যমে জানতে পারি সেগুলো, কিয়ের্কেগার্ডের মত অনুযায়ী, নিতান্তই গুরুত্বহীন।'

'আমার মনে হয় ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করে বললে ভালো হয়।'

'আট আর চার যোগ করলে বারো হয়। এ-ব্যাপারে আমরা পুরোপুরি নিশ্চিত। এটা সেই ধরনের 'প্রজ্ঞালব্ধ সত্য'-র (reasoned truth) একটা উদাহরণ যে-সত্যের কথা দেকার্ত থেকে পরবর্তী প্রত্যেক দার্শনিকই বলে এসেছেন, কিন্তু এটাকে কি আমরা আমাদের দৈনন্দিন প্রার্থনায় অন্তর্ভুক্ত করি? এটা কি এমন কোনো বিষয় যা নিয়ে আমরা আমাদের মৃত্যুর সময় চিন্তা করবো? মোটেই না। ওই ধরনের সত্য 'বিষয়গত' বা 'সাধারণ' দুটোই হতে পারে, কিন্তু তারপরেও সে-সব একটি মানুষের অস্তিত্বের ক্ষেত্রে নিতান্তই অর্থহীন।'

'আর বিশ্বাস?'

'কোনো মানুষের সঙ্গে যখন তুমি কোনো অন্যায় আচরণ করো তখন তুমি কখনোই জানতে পারো না লোকটি তোমাকে ক্ষমা করল কিনা। কাজেই ব্যাপারটা তোমার কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এটা এমন একটা প্রশ্ন যার সঙ্গে তুমি প্রবলভাবে জড়িত। আবার, কোনো ব্যক্তি তোমাকে ভালোবাসে কিনা সেটিও তুমি জানতে পারো

না। এটা এমন একটা বিষয় যেটা তোমাকে স্রেফ বিশ্বাস বা আশা করতে হবে। কিন্তু এটা ত্রিভুজের তিন কোণের সমষ্টি ১৮০ ডিগ্রি এই সত্যটির চাইতে এই বিষয়গুলো তোমার কাছে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তোমার প্রথম চুম্বনের মাঝপথে তুমি কার্য-কারণ সূত্র বা প্রত্যক্ষণের উপায়গুলো নিয়ে চিন্তা করো না।'

'কেউ তা করলে সেটি বড্ড অদ্ভুত হবে।'

'ধর্মীয় প্রশ্নগুলোর বেলায় বিশ্বাস-ই হলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কিয়ের্কেগার্ড লিখছেন 'ঈশ্বরকে যদি আমি বিষয়গতভাবে (objectively) উপলব্ধি করতে পারি, আমি তাকে বিশ্বাস করি না আর যেহেতু আমি তা করতে পারি না ঠিক সে-কারণেই আমি অবশ্যই বিশ্বাস করব। নিজেকে যদি আমি বিশ্বাসে স্থির রাখতে চাই সেক্ষেত্রে অবশ্যই আমাকে প্রতিনিয়ত বিষয়গত অনিশ্চয়তা দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে থাকায় মন দিতে হবে যাতে করে সেই অতল সত্তর হাজার ফ্যাদম গভীর জলাশয়ের ওপর আমার বিশ্বাস বজায় রেখে অবস্থান করতে পারি।'

'বড্ড গুরুপাক জিনিস।'

'অনেকেই ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে চেয়েছেন বা অন্ততপক্ষে তাঁকে বিচার-বুদ্ধির আওতার মধ্যে আনতে চেয়েছেন। কিন্তু তুমি যদি এ-ধরনের কোনো প্রমাণ বা যৌক্তিক তর্ক নিয়ে তুষ্ট থাক তখন তুমি বিশ্বাস হারাও আর সেই সঙ্গে হারাও ধর্মীয় গভীর আবেগ। কারণ যা গুরুত্বপূর্ণ তা হচ্ছে খ্রিস্টধর্ম তোমার জন্য সত্য কিনা, খ্রিস্টধর্ম সত্য কিনা তা নয়। এই একই চিন্তা প্রকাশিত হয়েছে মধ্যযুগের এই বাণীতে *credo quia absurdum*।'

'মানে?'

'এর মানে হচ্ছে আমি বিশ্বাস করি কারণ ব্যাপারটা অযৌক্তিক। খ্রিস্টধর্ম যদি আমাদের যুক্তি বা প্রজ্ঞার কাছে আবেদন সৃষ্টি করত, আমাদের অন্য দিকগুলোর কাছে নয়, তাহলে এটা বিশ্বাস সংক্রান্ত কোনো ব্যাপার হতো না।'

'তা ঠিক, বুঝতে পারছি এখন।'

'তো, কিয়ের্কেগার্ড 'অস্তিত্বসংক্রান্ত' বলতে কী বুঝিয়েছেন, 'বিষয়ীগত সত্য' বলতেই বা কী বুঝিয়েছেন আর 'বিশ্বাস'-সম্পর্কে তাঁর ধারণা কী ছিল সে-সব আমরা দেখলাম। এই তিনটে ধারণা তৈরি করা হয়েছিল সাধারণভাবে দার্শনিক ঐতিহ্যকে আর বিশেষ করে হেগেলের দর্শনকে সমালোচনা করে। কিন্তু সেই সঙ্গে এগুলো তীক্ষ্ন 'সামাজিক সমালোচনা'-রও মূর্ত প্রকাশ। তিনি বললেন আধুনিক শহুরে সমাজে ব্যক্তি পরিণত হয়েছিল 'জনতা'-য় (the public) আর জনতা বা জনসাধারণের প্রধান বৈশিষ্ট্যই হলো তার দায়বদ্ধতাহীন 'কথাবার্তা'। আজ সম্ভবত আমরা ব্যবহার করব 'অনুরূপতা' (conformity) শব্দটা; তার মানে যখন প্রত্যেকে কোনো কিছু সম্পর্কে গভীরভাবে কিছু অনুভব না করেই একই জিনিস 'ভাবে' এবং 'বিশ্বাস করে'।'

'ভাবছি, কিয়ের্কেগার্ড জোয়ানার বাবা-মা সম্পর্কে না জানি কী বলতেন।'

'উনি তাঁর বিচার-বিবেচনায় সব সময় খুব একটা সদয় ছিলেন না। চোখা একটা কলম আর তিক্ত একটা সেন্স অভ্ আয়রনি ছিল তাঁর। এই যেমন ধরো তিনি এ-ধরনের কথা বলতেন যে 'জনসাধারণ-ই হচ্ছে অসত্য' (untruth) বা 'সত্য আছে সব

সময়ই সংশয়াপন্নদের ভেতর', তাছাড়া তিনি এ-ও বলতেন যে বেশিরভাগ মানুষই জীবনটাকে দেখে ভাসাভাসা ভাবে।'

'বার্বি ডল হলেই কল্পনা এক কথা। কিন্তু একটা বার্বি ডল হয়ে যাওয়াটা আরও খারাপ।'

'তো, এই প্রসঙ্গে আমরা চলে আসবো কিয়ের্কেগার্ডের সেই তত্ত্বে যাঁকে তিনি বলছেন জীবনের পথে তিনটি স্তর।'

'মাফ করবেন?'

'কিয়ের্কেগার্ড বিশ্বাস করতেন তিন ধরনের জীবন রয়েছে। তিনি নিজে ব্যবহার করেছিলেন স্তর (stage) শব্দটা। এই তিনটে স্তরকে তিনি বলছেন ভোগী (aesthetic)[25] স্তর, নৈতিক স্তর এবং ধর্মীয় স্তর। 'স্তর' কথাটা তিনি এই বিষয়টি জোর দিয়ে বলার জন্য ব্যবহার করেছেন যে লোকে অপেক্ষাকৃত নিচু দুটো স্তরের যে কোনো একটাতে বাস করতে পারে আর তারপর হঠাৎ করে লাফ দিয়ে উঠে যেতে পারে উচ্চতর একটা স্তরে। অনেকে আবার সারা জীবন এক স্তরেই বাস করে যায়।'

'বাজি ধরে বলতে পারি এর একটা ব্যাখ্যা আসছে একটু পরই। আমার খুব জানতে ইচ্ছে করছে আমি কোন স্তরে আছি।'

'যে ভোগী স্তরে বাস করে সে বর্তমান মুহূর্তের জন্যই বাঁচে, আনন্দ উপভোগের প্রতিটি সুযোগের সদ্ব্যবহার করে। যা সুন্দর, যা তৃপ্তিদায়ক বা মনোরম তাই-ই ভালো। এই লোকটি বাস করে পুরোপুরি ইন্দ্রিয়ের জগতে এবং সে তার নিজের কামনা-বাসনা আর মেজাজ-মর্জির দাস। যা কিছু একঘেয়ে তাই-ই মন্দ।'

'হ্যাঁ, ধন্যবাদ, আমার মনে হয় আমি এ-ধরনের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে পরিচিত।'

'টিপিকাল রোমান্টিক তাই টিপিকাল aesthete, যেহেতু নিখাদ ইন্দ্রিয় সুখের চাইতে বাড়তি কিছু আছে এর মধ্যে। যে-মানুষ চিন্তাশীলতার সঙ্গে বাস্তবতার মুখোমুখি হয় বা সেই অর্থে যে-শিল্প বা দর্শনের সঙ্গে সে জড়িত তার মুখোমুখি হয়, সে বাস করছে ভোগীস্তরে। দুঃখ বা যন্ত্রণাভোগের ব্যাপারেও কিন্তু একটা ভোগী বা 'চিন্তাশীল' দৃষ্টিভঙ্গি থাকা সম্ভব। সেক্ষেত্রে অহংকার (vanity) ব্যাপারটার কর্তৃত্ব গ্রহণ করে। ইবসেন-এর *পীয়ার গিন্ট* এক টিপিকাল aesthete-এর প্রতিকৃতি।'

'আমার মনে হয় আমি বুঝতে পারছি আপনি কী বলতে চাইছেন।'

'এ-রকম কাউকে চেনো নাকি তুমি?'

---

২৫. aesthetic, শব্দটির প্রচলিত ইংরেজি অর্থে কিয়ের্কেগার্ড শব্দটি ব্যবহার করেননি। এ প্রসঙ্গে আমি গোলাম ফারুক রচিত *অস্তিত্ববাদের দ্রষ্টা সোরেন কিয়ের্কেগার্ড* (অবসর, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯) বইটিতে লেখকের দেওয়া মতটি গ্রহণ করে পাঠকদের উদ্দেশ্যে নিবেদন করছি কিয়ের্কেগার্ড 'aesthetical person' বা 'aesthete' বলতে এমন লোককে বুঝিয়েছেন যে সবসময় যা ভালো লাগে, যা তাকে আনন্দ দেয়, যা তাকে একঘেয়েমিজনিত বিরক্তি থেকে মুক্তি প্রদান করে তার পেছনে ছোটে। অর্থাৎ আমাদের মধ্যে যারা সবসময় মজা করে, সুখের পেছনে ছোটে কিংবা একঘেয়েমি থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে ছটফট করে তারাই কিয়ের্কেগার্ডের aesthete। বাংলায় aesthete শব্দটির কোনো উপযুক্ত প্রতিশব্দ নেই বিধায় ইংরেজি শব্দটির ব্যবহার করা হলো — অনুবাদক।

'পুরোপুরি নয়। তবে বোধকরি মেজরের মতোই শোনাচ্ছে খানিকটা।'

'হতে পারে, হতে পারে, সোফি...যদিও সেটি ছিল লোকটার অসুস্থ রোমান্টিক আয়রনির আরেকটা উদাহরণ। তুমি মুখটা ভাল করে পরিষ্কার করে নিও।'

'কী?'

'ঠিক আছে, দোষটা তোমার নয়।'

'তাহলে বলে যান।'

'ভোগী স্তরে বাসরত একজন মানুষের খুব সহজেই একটি উদ্বেগের বোধ (angst) বা একটা আতঙ্কের অনুভূতি হতে পারে, সেই সঙ্গে হতে পারে একটা শূন্যতার অনুভূতিও। তা যদি ঘটে তাহলে আশাও থাকে। কিয়ের্কেগার্ডের বক্তব্য অনুযায়ী উদ্বেগের বোধ হচ্ছে প্রায় ইতিবাচক। এটা এই সত্যের প্রকাশ যে 'ব্যক্তি' হচ্ছে একটি "অস্তিত্বহীন পরিস্থিতি" এবং এবার সে একটি উচ্চতর স্তরে বিরাট লাফ দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে নিতে পারে। কিন্তু ব্যাপারটা হয় ঘটে, নয় ঘটে না। লাফটা যদি পুরোপুরি না দেয়া যায় তাহলে শুধু লাফ দেয়ার উপক্রম করলে কোনো উপকার হয় না। এটা হচ্ছে 'হয় এটা/ নয় ওটা' এ-রকম ব্যাপার। কিন্তু কাজটা কেউ-ই তোমার হয়ে করতে পারে না। এটা একান্তই তোমার নিজের পছন্দ।'

'ব্যাপারটা খানিকটা মদ খাওয়া ছেড়ে দেয়া বা ড্রাগ নেয়ার সিদ্ধান্ত নেবার মতো।'

'হ্যাঁ, তা হবে হয়ত। কিয়ের্কেগার্ডের এই 'ধরনের সিদ্ধান্ত'-র বর্ণনা খানিকটা সক্রেটিসের এই দৃষ্টিভঙ্গির কথা মনে পড়িয়ে দেয় যে সমস্ত সত্য অন্তর্দৃষ্টি-ই আসে ভেতর থেকে। যে পছন্দের কারণে একজন মানুষ একটি ভোগী স্তর থেকে একটি নৈতিক বা ধর্মীয় স্তরের দিকে লাফ দেবে সেই পছন্দটি অবশ্যই ভেতর থেকে আসতে হবে। *পীয়ার গিন্ট*-এ ইবসেন এই বিষয়টিই চিহ্নিত করেছেন। অস্তিত্বশীল পছন্দ কীভাবে ভেতরের প্রয়োজন এবং হতাশা থেকে লাফিয়ে বেরিয়ে আসে তার আরেকটি অসাধারণ বর্ণনা পাওয়া যেতে পারে *দস্তয়েভস্কি*-র (Dostoevsky) মহৎ উপন্যাস *ক্রাইম অ্যান্ড পানিশমেন্ট*-এ।'

'আরেক ধরনের জীবন পছন্দ করে নেয়াটাই সবচেয়ে ভাল কাজ।'

'আর তাই সম্ভবত তুমি নৈতিক স্তরে বাস করতে শুরু করবে। এই স্তরের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে নৈতিক পছন্দগুলোর ব্যাপারে আন্তরিকতা এবং দৃঢ়তা। এই দৃষ্টিভঙ্গিটা কান্টের কর্তব্যের নীতিবিদ্যার মতোই। যার অর্থ হচ্ছে, নৈতিকতার রীতি-নীতি মেনে বাঁচা। কিয়ের্কেগার্ড, কান্টের মতোই, প্রথম এবং প্রধানভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন মানুষের মেজাজ-মর্জির (temperament) দিকে। তুমি যা ভাবো তা একেবারে ঠিক না বেঠিক সেটি জরুরি বিষয় নয়। কোনটি ঠিক, কোনটি নয় সে-বিষয়ে যে তুমি একটি মত প্রকাশ করছ সেটিই বরং বেশি গুরুত্বপূর্ণ। aesthete-এর একমাত্র চিন্তা হচ্ছে একটা জিনিস মজার না একঘেয়ে সেটি।'

'খুব সিরিয়াস হওয়ার বা সে-রকম জীবন যাপন করাটায় একটা ঝুঁকি থেকে যায় না?'

'আলবৎ! কিয়ের্কেগার্ড কখনোই এটা দাবি করেননি যে নৈতিক স্তরটা তৃপ্তিদায়ক।

এমনকি একজন কর্তব্যপরায়ণ লোকও সব সময় নিবেদিত প্রাণ আর খুঁতখুঁতে হওয়ার ব্যাপারে শেষ পর্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়বেন। অনেক মানুষই জীবনের শেষ দিকে এ-ধরনের অবসাদজনিত প্রতিক্রিয়ার সম্মুখীন হয়। কেউ কেউ আবার ফিরে যায় তাদের ভোগী স্তরের চিন্তাশীল জীবনে।

'কিন্তু অন্যরা একটা নতুন লাফ দেয় *ধর্মীয় স্তরের* দিকে। বিশ্বাসের 'সত্তর হাজার ফ্যাদম'-এর 'অতল গহ্বরে লাফ' দেয় তারা। aesthetic আনন্দ এবং প্রজ্ঞার কর্তব্যের প্রতি আহ্বানের বদলে বিশ্বাসকে বেছে নেয় তারা আর কিয়ের্কেগার্ড বলছেন, যদিও 'এটা জাগ্রত ঈশ্বরের উন্মুক্ত বাহুর ভেতর একটি ভয়ঙ্কর লাফ' হতে পারে, কিন্তু তার পরেও, মোক্ষলাভের এটাই একমাত্র উপায়।'

'অর্থাৎ খ্রিস্টধর্ম, সেটিই তো বোঝাতে চাইছেন?'

'হ্যাঁ, কারণ কিয়ের্কেগার্ডের কাছে ধর্মীয় স্তরটা ছিল খ্রিস্টধর্ম। কিন্তু অখ্রিস্টীয় চিন্তাবিদদের কাছেও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিলেন তিনি। এই দিনেমার দার্শনিকের কাছ থেকে প্রাণশক্তি পেয়ে বিংশ শতাব্দীতে অস্তিত্ববাদ বিপুল প্রসার লাভ করে।'

নিজের ঘড়ির দিকে তাকাল সোফি।

'প্রায় সাতটা বাজে। আমাকে দৌড় দিতে হবে। মা'র মাথা খারাপ হয়ে যাবে।'

দার্শনিকের উদ্দেশে হাত নেড়ে নৌকোটার দিকে দৌড় লাগাল সে।

মা র্ক স

৫৩৫

...ইউরোপকে একটা ভূত তাড়া করে ফিরছে...

বিছানা থেকে নেমে উপসাগরটার দিকে মুখ করা জানালাটার কাছে গিয়ে দাঁড়াল হিল্ডা। এই শনিবার যখন সে পড়তে শুরু করেছিল তখনও সোফির পঞ্চদশ জন্মদিন ছিল। তার আগের দিন ছিল হিল্ডার নিজের জন্মদিন।

তার বাবা যদি ভেবে থাকেন যে গতকালই সে সোফির জন্মদিন পর্যন্ত পৌছে যাবে তাহলে তিনি নিশ্চয়ই বাস্তববোধের পরিচয় দেননি। সারাদিন সে পড়া ছাড়া আর কিছু করেনি। তবে তিনি এই কথাটা ঠিকই বলেছেন যে আর মাত্র একবার জন্মদিনের শুভেচ্ছা পাওয়া যাবে। এই সময়টাতেই অ্যালবার্টো আর সোফি তার উদ্দেশে শুভ জন্মদিনের গান গেয়ে উঠেছিল। খুবই অস্বস্তিকর ব্যাপার, ভাবল হিল্ডা।

আর এখন সোফি ঠিক সেই দিনই একটা দার্শনিক গার্ডেন পার্টি হবে বলে লোকজনকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে যেদিন তার বাবার ফেরার কথা লেবানন থেকে। হিল্ডা ঠিক বুঝতে পারছে সেদিন এমন একটা কিছু ঘটবে যে-ব্যাপারে সে বা তার বাবা কেউই ঠিক নিশ্চিত নয়।

তবে একটা ব্যাপার ঠিক: বিয়ার্কলেতে পৌছানোর আগেই একটা চমক অপেক্ষা করবে তার বাবার জন্য। সোফি আর অ্যালবার্টোর জন্য এটুকু অন্তত সে করতে পারবে, বিশেষ করে তাদের সেই সাহায্যের আবেদনের পর...

তার মা তখনো নিচে, বোটহাউসে। হিল্ডা দৌড়ে নিচের তলায় নেমে এলো টেলিফোনটার কাছে। অ্যানি আর ওলে-র কোপেনহেগেনের নম্বরটা পেয়ে সে ফোন করল।

'অ্যানি ভ্যাম্‌সডাল।'

'হাই, আমি হিল্ডা বলছি।'

'তাই, কেমন আছো? কেমন চলছে তোমাদের লিলেস্যান্ড-এ?'

'ফাইন, ভ্যাকেশন আর সবকিছু মিলিয়ে। তাছাড়া বাবা এক হপ্তার মধ্যেই লেবানন থেকে ফিরছে।'

'দারুণ হবে, তাই না হিল্ডা?'

'হ্যাঁ, আমার তো তরই সইছে না। আর ঠিক সেই জন্যই আমি ফোনটা করলাম।'

'তাই?'

'আমার ধারণা ২৩ তারিখ শনিবার বিকেল ৫টার দিকে কাসট্রাপে ল্যান্ড করছে বাবা। তুমি কি তখন কোপেনহেগেনে থাকবে?'

'আই থিংক সো।'

'আমি ভাবছিলাম তুমি একটা উপকার করতে পারবে কিনা আমার।'

'কেন নয়, আলবৎ পারবো।'

'এটা একটা বিশেষ ধরনের উপকার। আমি এমনকি ঠিক শিওর-ও না ব্যাপারটা সম্ভব কিনা।'

'তুমি তো এবার আমার কৌতূহল বাড়িয়ে দিলে...'

হিল্ডা তার প্ল্যানটা বর্ণনা করতে শুরু করল। অ্যানিকে সে রিং বাইভার, সোফি আর অ্যালবার্টো এবং বাকি সব কথা খুলে বলল। মাঝে মাঝেই পেছন থেকে শুরু করতে হচ্ছিল হিল্ডাকে, তার কারণ সে আর অ্যানি দু'জনেই হাসছিল বেদম। কিন্তু হিল্ডা ফোন রেখে দেয়ার পর থেকেই তার পরিকল্পনামাফিক কাজ এগোতে লাগল।

এবার তার নিজস্ব কিছু প্রস্তুতি সারতে হবে। তবে হাতে এখনো যথেষ্ট সময় আছে।

বিকেলের বাকি সময়টা আর সন্ধ্যাটা সে তার মায়ের সঙ্গেই কাটাল। শেষ পর্যন্ত ওরা গাড়ি করে ক্রিস্টিয়ানস্যান্ডে গিয়ে মুভি দেখে এলো। ওদের মনে হলো আগের দিন যেহেতু বিশেষ কিছু তারা করেনি আজ সেটি পুষিয়ে নিতে হবে। ক্যিয়েভিক এয়ারপোর্টের এক্সিটের পাশ দিয়ে যখন গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছিল ওরা তখন হিল্ডা যে-জিগজগ পাজল তৈরি করছিল তার আরও কয়েকটা টুকরো খাপে খাপে বসে গেল।

বিছানায় যেতে সে-রাতে বেশ দেরি হলো তার। কিন্তু তারপরেও রিং বাইভারটা নিয়ে পড়তে শুরু করল সে।

সোফি যখন বেড়ার ভেতর দিয়ে গুহা থেকে বেরিয়ে এলো তখন প্রায় আটটা বাজে। সোফি যখন উদয় হলো তার মা তখন সদর দরজার পাশের ফ্লাওয়ার বেডগুলোর আগাছা বাছছেন।

'কোত্থেকে উদয় হলি তুই?'

'বেড়ার ভেতর থেকে।'

'বেড়ার ভেতর থেকে?'

'তুমি জানতে না অন্য দিকটায় একটা পথ আছে?'

'কিন্তু তুই কোথায় ছিলি, সোফি? এই নিয়ে দু'বার হলো তুই কোনো কিছু না জানিয়ে হাওয়া হয়ে গেছিস।'

'আই অ্যাম সরি, মাম, দিনটা এতো সুন্দর, আমি একটু হাঁটতে গিয়েছিলাম।'

তার মা আগাছার স্তূপ থেকে উঠে কঠোর একটা দৃষ্টি হানলেন সোফির দিকে।

'সেই দার্শনিক লোকটার সঙ্গে ছিলি না তো আবার?'

'সত্যি বলতে কী, তাই ছিলাম। তোমাকে তো বলেইছি, ভদ্রলোক অনেক দূরে হাঁটতে যেতে পছন্দ করেন।'

'কিন্তু গার্ডেন পার্টিতে তো আসছে সে তাই না?'

'হ্যাঁ, তা তো বটেই। উনি তো আশা করছেন আসবেন।'

'আমিও। আমি সেই দিনই শুনছি।'

সোফির মায়ের গলায় কি একটু ঝাঁজের আভাস পাওয়া গেল? ব্যাপারটা সামাল দেয়ার জন্য সোফি বলল

'ভাগ্যিস জোয়ানার মা-বাবাকে দাওয়াত দিয়েছিলাম। নইলে ব্যাপারটা খুব এমব্যারাসিং হতো।'

'তা আমি জানি না...কিন্তু যা-ই হোক না কেন অ্যালবার্টোর সঙ্গে আমি কথা বলব, বড়রা যেভাবে বড়দের সঙ্গে কথা বলে সেভাবে।'

'ইচ্ছে হলে আমার ঘরটা ব্যবহার করতে পারো তুমি। তবে আমি ঠিক জানি তুমি ওঁকে পছন্দ করবে।'

'ও, আরেকটা কথা। একটা চিঠি আছে তোর।'

'তাই?'

'জাতিসংঘ বাহিনীর স্ট্যাম্প লাগানো।'

'তাহলে ওটা নিশ্চয়ই অ্যালবার্টোর ভাই লিখেছে।'

'ব্যাপারটা আর চলতে দেয়া যায় না সোফি।'

সোফির মাথা বাড়তি খাটুনি খেটেছে। কিন্তু তারপরেও, বিশ্বাসযোগ্য একটা উত্তর খেলে গেল তার মাথায় একেবারে বিদ্যুচ্চমকের মতো। ব্যাপারটা যেন কোনো সাহায্যকারী স্পিরিটের কাছ থেকে অনুপ্রেরণা পাচ্ছিল সে।

'অ্যালবার্টোকে বলেছিলাম আমি রেয়ার পোস্টমার্ক কালেক্ট করি।'

মনে হলো সোফির মা আশ্বস্ত হলেন।

'ফ্রিজে ডিনার রাখা আছে,' আগের চেয়ে আন্তরিক সুরে বললেন তিনি।

'চিঠিটা কোথায়?'

'ফ্রিজের ওপর।'

দৌড়ে ভেতরে গেল সোফি। খামটাতে তারিখ দেয়া আছে ১৫ জুন ১৯৯০। খামটা খুলে ভেতর থেকে একটা চিরকুট বের করল সে :

> হোয়াট ম্যাটারস্ আওয়ার ক্রিয়েটিভ এন্ডলেস টয়েল,
> হোয়ের অ্যাট আ স্ন্যাচ, অবলিভিয়ন এন্ডস্ দ্য কয়েল?

এ-প্রশ্নের উত্তর সোফির আসলেই জানা নেই। খাওয়ার আগে চিরকুটটা সে ক্লজেটে রেখে দিল, গত কয়েক হপ্তায় যে-সব জিনিস সে সংগ্রহ করেছে সেগুলোর সঙ্গে। শিগগিরই সে জানতে পারবে প্রশ্নটা কেন করা হয়েছে।

পরদিন সকালে জোয়ানা এসে হাজির। এক গেম ব্যাডমিন্টন খেলার পর দার্শনিক গার্ডেন পার্টি নিয়ে শলা-পরামর্শ করতে বসল ওরা। পার্টিটা যদি হঠাৎ কোথাও এসে ঝুলে যায় সেজন্য হাতে কিছু চমক লাগানো ব্যাপার-স্যাপার রাখতে হবে।

সোফির মা যখন কাজ থেকে বাড়ি ফিরে এলেন তখনো তারা এ-নিয়ে কথা বলে

যাচ্ছে। সোফির মা বারবার করে বললেন: 'টাকা-পয়সা নিয়ে চিন্তা কোরো না।' অথচ তার গলায় শ্লেষের লেশমাত্র নেই!

হয়তো তার মনে হয়েছে বেশ কয়েক সপ্তাহের নিবিড় দর্শনচর্চার পর সোফিকে বাস্তবতায় ফিরিয়ে আনতে ঠিক দার্শনিক গার্ডেন পার্টির মতোই একটা কিছু দরকার।

সন্ধ্যে পেরিয়ে যাওয়ার আগেই প্রত্যেকটা ব্যাপারে মতৈক্যে পৌছাল ওরা। কাগজের লণ্ঠন থেকে শুরু করে একটা উপহারসহ দার্শনিক কুইজ পর্যন্ত। উপহারটা অবশ্য তরুণদের জন্য লেখা দর্শনের কোনো বই হলেই ভালো হয়। অবশ্য সে-রকম কিছু যদি থেকে থাকে। সোফি ঠিক নিশ্চিত নয়।

মিডসামার ঈভ্-এর দু'দিন আগে ২১ জুন বৃহস্পতিবার অ্যালবার্টো আবার ফোন করলেন সোফিকে।

'সোফি।'

'অ্যালবার্টো।'

'ও, হাই! কেমন আছেন?'

'সত্যিই খুব ভালো। ধন্যবাদ। আমার মনে হয় আমি একটা দুর্দান্ত পথ বের করতে পেরেছি।'

'কীসের পথ?'

'তুমি তো জানোই কীসের। দীর্ঘদিন আমরা যে মানসিক বন্দিত্বের ভেতর বাস করে আসছি তা থেকে বেরোবার পথ।'

'ও, সেটির কথা বলছেন?'

'কিন্তু কাজ শুরু করার আগে একটা কথাও বলতে পারছি না আমি সে-ব্যাপারে।'

'ততক্ষণে বড্ড দেরি হয়ে যাবে না? কোন ব্যাপারে জড়িয়ে আছি সেটি আমার জানা দরকার।'

'এবার কিন্তু ছেলেমানুষী করছ তুমি? আমাদের সব কথা আড়িপেতে শোনা হচ্ছে। কোনো কিছু না বলাটাই হবে সবচেয়ে উচিত কাজ।'

'ব্যাপারটা কি এতোই বাজে অবস্থায় গিয়ে ঠেকেছে?'

'ন্যাচারলি, মাই চাইল্ড। আমরা যখন কথা বলছি না তখনই ঘটতে হবে সবচেয়ে জরুরি ঘটনাটা।'

'ও।'

'লম্বা একটা কাহিনীর শব্দগুলোর নেপথ্যে অবস্থিত একটা কাল্পনিক বাস্তবতায় জীবনযাপন করছি আমরা। মেজর একটা পুরনো পোর্টেবল টাইপ রাইটারে লিখে যাচ্ছে প্রতিটা শব্দ। কাজেই ছাপা কোনো কিছুই তার নজর এড়াতে পারবে না।'

'না, সেটি আমি বুঝি। কিন্তু তার কাছ থেকে আমরা কীভাবে পালাবো?'

'শ্ শ্ শ্।'

'কী?'

'লাইনগুলোর মাঝখানেও কিছু একটা ঘটে চলেছে। ঠিক ওই জায়গাটাতেই কৌশল খাটাতে চাইছ আমি আমার তূণে যত জারিজুরি আছে তার সব ব্যবহার করে।'

'বুঝতে পারছি।'

কিন্তু আমাদেরকে অবশ্যই আজ আর কালকের সময়টার পুরোপুরি সদ্ব্যবহার করতে হবে, শনিবারে ব্যাপারটা শুরু হবে। তুমি কি এক্ষুণি একবার আসতে পারো?'

'আমি রওনা হয়ে গেছি।'

পাখি আর মাছগুলোকে খাওয়াল সোফি, গোবিন্দর জন্য বের করে রাখল বড়সড় একটা লেটুস পাতা। শিয়ার্কানের জন্য বেড়ালের খাবারের একটা কৌটো খুলে কিছু খাবার বের করে একটা গামলায় ঢেলে সেটি সিঁড়ির ওপরে রেখে বেরিয়ে পড়ল সে।

বেড়ার ভেতর দিয়ে গলে বেরিয়ে এলো সে দূরের দিকের পথটায়। খানিকটা পথ যেতেই হঠাৎ তার নজরে পড়ল লতা-গুল্মের ভেতর বড়সড় একটা ডেস্ক দাঁড়িয়ে আছে। বয়স্ক একজন লোক বসে আছে সেই ডেস্কের পাশে, দেখে মনে হলো কিছু একটা হিসাব করছে। তার কাছে গিয়ে সোফি তার নাম জিজ্ঞেস করল।

'এবেনেজার স্ক্রুজ,' বলল সে, তারপর আবার ব্যস্ত হয়ে পড়ল তার জমা-খরচের খাতা নিয়ে।

'আমার নাম সোফি। মনে হচ্ছে, আপনি একজন ব্যবসায়ী।'

মাথা ঝাঁকাল লোকটা। 'আর ধনীও খুব। একটা পেনিও অপচয় হতে পারবে না। সেজন্যই আমার হিসাবের দিকে মন দিতে হবে আমায়।'

'বেশ তো।'

সোফি হাত নেড়ে বিদায় জানিয়ে এগিয়ে চলল। কিন্তু অল্প কয়েক গজ যেতে না যেতেই সে দেখতে পেল ছোট্ট একটি মেয়ে লম্বা গাছগুলোর নিচে একেবারে একা বসে আছে। তার পরনের জামা-কাপড় টুটোফাটা, চেহারা মলিন, রোগা রোগা। সোফি তার পাশ দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় মেয়েটি ছোট্ট একটি ব্যাগের ভেতর হাত ঢুকিয়ে দিয়ে দেশলাইয়ের একটা বাক্স বের করল।

সেটি সে সোফির দিকে বাড়িয়ে ধরে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কয়েকটা দেশলাই কিনবে?' সোফি নিজের পকেট হাতড়ে দেখল তার কাছে কোনো টাকা-পয়সা আছে কিনা। আছে, একটা ক্রাউন পেল সে।

'কত দাম তোমার দেশলাইয়ের?'

'এক ক্রাউন।'

মেয়েটিকে পয়সাটা দিয়ে দেশলাইয়ের বাক্সটা নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল সোফি।

'একশ বছরে তুমিই প্রথম যে কোনো কিছু কিনলে আমার কাছ থেকে। মাঝে মাঝে না খেয়ে মরেই যাই আমি। অন্য সময় বরফ আমাকে শেষ করে দেয়।'

সোফির মনে হলো, এই বনের মধ্যে দেশলাই সে-রকম বিক্রি না হওয়াটা সম্ভবত খুব একটা আশ্চর্যের নয়। কিন্তু এরপরই তার মনে পড়ে গেল একটু আগে পিছে ফেলে আসা ব্যবসায়ী লোকটার কথা। লোকটার এতো টাকা-কড়ি থাকার পরেও ছোট্ট এই দেশলাই বালিকার অনাহারে মরার কোনো মানে হয় না।

'এদিকে এসো,' বলল সোফি।

মেয়েটির হাত ধরে তাকে নিয়ে হেঁটে ফিরে গেল সে ধনী লোকটার কাছে।

'এই মেয়েটি যাতে আরও ভালো একটা জীবনযাপন করতে পারে সেটি কিন্তু

আপনাকে দেখতেই হবে,' সোফি বলল লোকটিকে।

লোকটি তার কাগজপত্র থেকে মুখ তুলে তাকিয়ে বলল, 'এ-সমস্ত ব্যাপারে টাকা লাগে আর আমি তো বলেইছি যে একটা পয়সাও বাজে খরচ করা চলবে না।'

'কিন্তু আপনি এতো ধনী অথচ মেয়েটি এতো গরিব, এটা তো হতে পারে না,' সোফি জেদি সুরে বলল। 'এটা অন্যায়!'

'ফুঃ! ফেরেব্বাজি! সমান সমান না হলে আবার ন্যায়ের কথা আসে কী করে?'

'কী বলতে চান?'

'ওপরে উঠতে খাটতে হয়েছে আমাকে আর সেটিই কাজে দিয়েছে। লোকে একেই বলে উন্নতি।'

'আপনি যদি আমাকে সাহায্য না করেন তাহলে আমি মরে যাবো,' গরিব মেয়েটি বলল।

ব্যবসায়ী লোকটি তার জমা-খরচের খাতা থেকে মুখ তুলে তাকালো আবার। তারপর সে তার পালকের কলমটা অধৈর্যভরে ছুঁড়ে ফেলল টেবিলটার ওপর।

'আমার হিসাব-নিকাশের ভেতর তোমার নাম নেই। কাজেই মানে মানে কেটে পড়, গরিবশালায় যাও।'

'আপনি আমাকে সাহায্য না করলে বনে আগুন ধরিয়ে দেবো আমি,' মেয়েটি নাছোড়বান্দা।

এই কথা শুনে তড়াক করে লাফিয়ে উঠল লোকটা, কিন্তু ততক্ষণে দেশলাইয়ের একটা কাঠি ধরিয়ে ফেলেছে মেয়েটি। কাঠিটা এক গোছা শুকনো ঘাসের কাছে ধরতেই আগুন ধরে উঠল সেটিতে।

লোকটা দুই হাত ছুঁড়ে চিৎকার করে বলে উঠল, 'ঈশ্বর রক্ষা করুন! লাল মোরগ ডাক দিয়েছে।'

কৌতুকপূর্ণ একটা হাসি হেসে লোকটার দিকে তাকিয়ে মেয়েটি বলল, 'আমি যে কম্যুনিস্ট সেটি আপনি জানতেন না, তাই না?'

এর পরের মুহূর্তেই সেই মেয়েটা, ব্যবসায়ী লোকটা আর ডেস্কটা উধাও হয়ে গেল। আগুনের শিখা সেই শুকনো ঘাসের গোছাটাকে আরও উদগ্রভাবে গ্রাস করে নিতে থাকল আর সোফি ফের একা দাঁড়িয়ে রইল। আগুনটুকু পা-চাপা দিয়ে নেভাতে খানিকটা সময় লাগল তার।

যাক বাবা! পোড়া ঘাসটুকুর দিকে তাকাল সোফি। তার হাতে দেশলাইয়ের একটা বাক্স।

তার নিজের পক্ষে আগুনটা ধরানো সম্ভব হতো না, হতো কি?

অ্যালবার্টোর সঙ্গে কেবিনের বাইরে দেখা হতে সোফি তাঁকে বলল যা যা ঘটেছে।

স্ক্রুজ হচ্ছে চার্লস ডিকেন্সের লেখা *এ ক্রিসমাস ক্যারল*-এর সেই কৃপণ পুঁজিবাদী। আর, হ্যান্স ক্রিশ্চিয়ান অ্যান্ডারসেনের গল্পের সেই দেশলাই বিক্রি করা মেয়েটির কথা নিশ্চয়ই মনে আছে তোমার।'

'এই বনের ভেতর ওদের দেখা পাবো সেটি ভাবিনি।'

'না পাওয়ার কী আছে? এটা তো আর সাধারণ কোনো বন নয়। আর তাছাড়া, এখন আমরা আলোচনা করতে যাচ্ছি *কার্ল মার্কসের* (Karl Marx) কথা। এটা খুবই কাজের কাজ হয়েছে যে তুমি উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ের তীব্র শ্রেণী সংগ্রামের একটা উদাহরণ দেখতে পেয়েছো। তবে এখন চলো, ভেতরে যাই। মেজরের হস্তক্ষেপ থেকে আরও খানিকটা বেশি সুরক্ষা পাওয়া যাবে ওখানে।'

লেকটার দিকে মুখ করা জানালাটার পাশে ছোট টেবিলটা ঘিরে আবারো বসলেন দু'জনে। নীল বোতলটা থেকে খানিকটা জ্যুস খাওয়ার পর ছোট্ট লেকটা সম্পর্কে তার কী অভিজ্ঞতা হয়েছিল সোফি সেটি এখনো তার সারা শরীর জুড়ে অনুভব করতে পারল।

দুটো বোতলই ম্যান্টেলপিসের ওপর দাঁড়িয়ে আছে আজ। টেবিলের ওপর রয়েছে গ্রিক একটা মন্দিরের একটা মিনিয়েচার মডেল।

'ওটা কী?' জিজ্ঞেস করল সোফি।

'সবই বলব সময়মতো, মাই ডিয়ার।'

অ্যালবার্টো বলতে শুরু করলেন '১৮৪১ সালে কিয়ের্কেগার্ড যখন বার্লিন গিয়েছিলেন তখন হয়ত তিনি শেলিংয়ের বক্তৃতা শোনার জন্য কার্ল মার্কসের পাশেই বসেছিলেন। কিয়ের্কেগার্ড তার এমএ থিসিস লিখেছিলেন সক্রেটিসের ওপর। সেই একই সময় মার্কস তার ডক্টরাল থিসিস লেখেন ডেমোক্রিটাস আর এপিকিউরাসের ওপর, অন্য কথায় বলতে গেলে, প্রাচীন কালের বস্তুবাদের ওপর। তো, এভাবেই তাঁরা তাঁদের যার যার দর্শনের গতিপথ নির্ধারণ করে নিয়েছিলেন।'

'কারণ কিয়ের্কেগার্ড হয়েছিলেন একজন অস্তিত্ববাদী, অন্যদিকে মার্কস হয়েছিলেন বস্তুবাদী।'

'মার্কস আসলে হয়েছিলেন যাকে বলা হয় একজন ঐতিহাসিক বস্তুবাদী। তবে সে প্রসঙ্গে পরে আসা যাবে'খন।'

'বলে যান।'

'কিয়ের্কেগার্ড এবং মার্কস দু'জনেই নিজের মতো করে হেগেলের দর্শন থেকেই যাত্রা শুরু করেছেন। হেগেলের চিন্তার ধরন দু'জনকেই প্রভাবিত করলেও দু'জনেই কিন্তু তার 'বিশ্ব চিদাত্মা' বা তাঁর ভাববাদকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।'

'ব্যাপারটা নিশ্চয়ই তাদের কাছে খুবই আড়ম্বরভরা কিছু একটা বলে মনে হয়েছিল।'

'তা নিশ্চয়ই। সাধারণভাবে আমরা সচরাচর বলি যে হেগেলের সঙ্গে সঙ্গেই মহৎ দার্শনিক পদ্ধতির যুগের অবসান ঘটেছিল। হেগেলের পর দর্শন একটা নতুন দিকে মোড় নেয়। মহৎ চিন্তাশীল পদ্ধতির বদলে আমরা পেলাম, যাকে বলা হয়, অস্তিত্ববাদী দর্শন বা একটা কর্ম দর্শন। মার্কস যখন মন্তব্য করেছিলেন যে এতদিন পর্যন্ত 'দার্শনিকেরা জগৎকে বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যাই করেছেন শুধু; আসল কথা হচ্ছে এটাকে পরিবর্তন করা,' তখন তিনি ঠিক এটাকেই বুঝিয়েছিলেন। এই কথাগুলো দর্শনের ইতিহাসে একটা গুরুত্বপূর্ণ ক্রান্তিকালের সূচনা করে।'

'স্ক্রুজ আর সেই দেশলাই ফেরি করা মেয়েটির সঙ্গে দেখা হওয়ার পর আমার

আর বুঝতে বাকি নেই মার্কস কী বুঝিয়েছিলেন।'

'মার্কসের চিন্তার একটা ব্যবহারিক বা রাজনীতিক উদ্দেশ্য ছিল। তিনি কেবল দার্শনিকই ছিলেন না; তিনি ছিলেন ইতিহাসবিদ, সমাজবিজ্ঞানী এবং অর্থনীতিবিদ।'

'তিনি কি এই সবগুলো ক্ষেত্রেই অগ্রদূত ছিলেন?'

'ব্যবহারিক রাজনীতির ক্ষেত্রে যে আর কোনো দার্শনিক এতো বেশি প্রভাব বিস্তার করতে পারেননি সেটি নিশ্চিত করে বলা যায়। অন্যদিকে আবার, নিজেকে মার্কসবাদী বলে দাবি করে এমন সব কিছুকেই মার্কসের নিজস্ব চিন্তাধারার সঙ্গে মিলিয়ে নেবার ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে। মার্কস সম্পর্কে বলা হয় যে তিনি নিজেই মার্কসবাদী হয়েছিলেন ১৮৪০-এর দশকের মাঝামাঝি নাগাদ, কিন্তু তারপরেও মাঝে মধ্যে তিনি এ-কথা ঘোষণা করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতেন যে তিনি মার্কসবাদী নন।'

'যিশু কি খ্রিস্টান ছিলেন?'

'সেটি নিয়েও অবশ্য বিতর্ক উঠতে পারে।'

'বলে যান।'

'পরবর্তীকালে যা মার্কসবাদ বলে পরিচিতি লাভ করবে সেক্ষেত্রে একেবারে গোড়া থেকেই মার্কসের বন্ধু এবং সহকর্মী *ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস* (Friedrich Engels) অবদান রাখতে থাকেন। আমাদের শতাব্দীতে লেনিন, স্ট্যালিন, মাও এবং আরও অনেকেই মার্কসবাদ বা মার্কসবাদ-লেনিনবাদের ক্ষেত্রে যার যার অবদান রেখেছেন।'

'আমি বলব, আমরা বরং মার্কসবাদেই স্থির থাকি। আপনি বললেন না যে তিনি ঐতিহাসিক বস্তুবাদী ছিলেন?'

'প্রাচীনকালের পরমাণুবাদীদের মতো দার্শনিক বস্তুবাদী ছিলেন না তিনি, আবার, সপ্তদশ আর অষ্টাদশ শতকের যান্ত্রিক বস্তুবাদও তিনি প্রচার করেননি। কিন্তু তিনি মনে করতেন, আমরা যেভাবে চিন্তা-ভাবনা করি তার অনেকখানি-ই নির্ধারণ করে সমাজের বস্তুগত উপাদানগুলো। ঐতিহাসিক বিকাশের ক্ষেত্রে এ-ধরনের বস্তুগত উপাদান নিশ্চিতভাবেই যুগান্তকারী ভূমিকা রেখেছে।'

'এটা তো হেগেলের বিশ্ব চিদাত্মা থেকে একেবারেই ভিন্ন একটা ব্যাপার দেখছি।'

'হেগেল মন্তব্য করেছিলেন যে ঐতিহাসিক বিকাশ সাধিত হয়ে বিপরীতের মধ্যকার দ্বন্দ্ব থেকে, যা পরিণতি পায় হঠাৎ করে আসা একটা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে। এই ধারণাটিরই আরও বিকাশ সাধন করেন মার্কস। কিন্তু মার্কস বলছেন যে হেগেল তাঁর মাথার ওপর দাঁড়িয়ে ছিলেন।'

'সব সময় নয়, আশা করি।'

'যে-শক্তিটা ইতিহাসকে সামনের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যায় তাকে হেগেল বলেছিলেন বিশ্ব চিদাত্মা বা বিশ্ব প্রজ্ঞা। মার্কস দাবি করেছেন ব্যাপারটা আসলে ঠিক উল্টো। তিনি দেখাতে চেয়েছেন যে বস্তুগত পরিবর্তনই ইতিহাসকে প্রভাবিত করছে। 'আধ্যাত্মিক সম্পর্ক' বস্তুগত পরিবর্তন আনে না, বরং এর উল্টোটাই সত্যি। মার্কস বিশেষ করে এই ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করেছেন যে সমাজের অর্থনৈতিক শক্তিগুলোই পরিবর্তন এনেছে এবং এভাবেই তা ইতিহাসকে সামনে নিয়ে গেছে।'

'একটা উদাহরণ দিতে পারেন?'

'প্রাচীন যুগের দর্শন এবং বিজ্ঞান উদ্দেশ্যগত দিক থেকে ছিল পুরোপুরি তত্ত্বগত। নিত্য নতুন আবিষ্কারকে কাজে লাগানোর ব্যাপারে কারও কোনো উৎসাহই ছিল না।'

'তাই বুঝি?'

'সেটির কারণ হচ্ছে সমাজের অর্থনৈতিক জীবন যেভাবে বিন্যস্ত ছিল সেটি। উৎপাদন ছিল মুখ্যত দাস শ্রম-নির্ভর, কাজেই ব্যবহারিক কোনো উদ্ভাবনের সাহায্যে উৎপাদন বাড়ানোর কোনো দরকার ছিল না নাগরিকদের। বস্তুগত সম্পর্ক কী করে সমাজের দার্শনিক চিন্তা-ভাবনাকে প্রভাবিত করতে সাহায্য করে এটা তার একটা উদাহরণ।'

'হ্যাঁ, বুঝতে পারছি।'

'এই বস্তুগত, আর্থনীতিক এবং সামাজিক সম্পর্কগুলোকেই সমাজের ভিত্তি বলে বর্ণনা করেছেন মার্কস। একটা সমাজ যেভাবে চিন্তা-ভাবনা করে, সেখানে কোন কোন ধরনের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান রয়েছে, কোন কোন আইন রয়েছে আর এটাও কম গুরুত্বপূর্ণ নয় যে সেখানে ধর্ম, নৈতিকতা, শিল্প, দর্শন এবং বিজ্ঞান কী অবস্থায় রয়েছে, এই সবকিছুকে মার্কস বলেছেন সমাজের উপরিকাঠামো।

'ভিত্তি আর উপরিকাঠামো, ঠিক আছে।'

'এবার তুমি লক্ষ্মী মেয়ের মতো গ্রিক মন্দিরটা আমার হাতে দাও দেখি।'

সোফি তাই করল।

'এটা হচ্ছে অ্যাক্রোপলিসের ওপর গড়া সেই পার্থেনন-এর মডেল। এটা তুমি অবশ্য বাস্তবেও দেখেছো।'

'মানে বলতে চাইছেন, ভিডিওতে।'

'লক্ষ করলে দেখবে ভবনটার ছাদটা খুবই সুরুচিপূর্ণ এবং জাঁকাল। সম্ভবত সামনের গেইবল (gable)সহ ছাদটাই সবার নজর কাড়ে প্রথম। এটাকেই আমরা বলি উপরিকাঠামো।

'কিন্তু ছাদটা তো আর নিছক বাতাসে ভেসে থাকতে পারে না।'

'সেটির ভর রক্ষা করে স্তম্ভগুলো।'

'দালানটা খুবই শক্ত ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে আছে আর সেই ভিত্তি গোটা ভবনটার ভর রক্ষা করছে। ঠিক একই ভাবে, মার্কস বিশ্বাস করতেন যে, বস্তুগত সম্পর্কগুলোও সমাজে চিন্তা-ভাবনা আর ধারণা হিসেবে যা কিছু আছে, বলতে গেলে সেগুলোর সবকিছুর ভর রক্ষা করে। একটি সমাজের উপরিকাঠামো আসলে সেই সমাজের ভিত্তিগুলোরই প্রতিফলন।'

'তার মানে আপনি বলছেন প্লেটোর ভাববাদ ফুলদানি আর মদ উৎপাদনের প্রতিফলন?'

'না, ব্যাপারটা অতো সরল নয়, মার্কস সেটি স্পষ্ট করে বলেও দিয়েছেন। এটা হচ্ছে সমাজের উপরিকাঠামোর সঙ্গে সেটির ভিত্তির মিথস্ক্রিয়ার[২৬] প্রভাব। এই মিথস্ক্রিয়ার কথা অস্বীকার করলে মার্কস হতেন এক যান্ত্রিক বস্তুবাদী (mechanical

---

২৬. পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া—অনুবাদক।

materialist)। কিন্তু তিনি যেহেতু উপলব্ধি করেছিলেন যে ভিত্তি আর উপরিকাঠামোর ভেতরে একটা মিথষ্ক্রিয়া বা দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক রয়েছে, সে-কারণে আমরা বলি তিনি একজন *দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী*। আর, ভালো কথা, একটা কথা মনে রেখো যে প্লেটো কিন্তু কুমোরও ছিলেন না মদা উৎপাদনকারীও ছিলেন না।'

'ঠিক আছে। তা, মন্দিরটা সম্পর্কে আর কিছু বলার আছে আপনার?'

'হ্যাঁ, সামান্য। মন্দিরটার গোড়ার দিকটার একটু বর্ণনা দিতে পারবে?'

'স্তম্ভগুলো যে-ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে আছে সেটি তিন স্তর বা ধাপ বিশিষ্ট।

'ঠিক একইভাবে সমাজের ভিত্তিতেও তিনটে স্তর শনাক্ত করতে পারবো আমরা। সবচেয়ে মৌলিক বা প্রাথমিক স্তরকে আমরা বলতে পারি সমাজের *উৎপাদনের শর্তাবলী*। অন্য কথায় বলতে গেলে, সমাজে বিদ্যমান প্রাকৃতিক অবস্থা বা সম্পদ। যে-কোনো সমাজে এগুলোই হচ্ছে বুনিয়াদ এবং এই বুনিয়াদ-ই পরিষ্কারভাবে নির্ধারণ করে দেয় সমাজে উৎপাদনের ধরন এবং একইভাবে, সেই সমাজের প্রকৃতি আর সাধারণ অর্থে, সেটির সংস্কৃতি।'

'সাহারায় আপনি হেরিং মাছের ব্যবসা করতে পারবেন না বা নরওয়ে যেতে পারবেন না খেজুর ফলাতে।'

'ঠিকই বুঝেছো তুমি। একটা যাযাবর সংস্কৃতিতে লোকে যেভাবে চিন্তা-ভাবনা করে তা উত্তর নরওয়ের একটা জেলে পল্লীর লোকের চিন্তা-ভাবনা থেকে খুবই আলাদা। তো, এর পরের স্তরটা হচ্ছে *সমাজে উৎপাদনের উপায়*। শব্দ দুটোর সাহায্যে মার্কস বিভিন্ন ধরনের সাজ-সরঞ্জাম, হাতিয়ার আর যন্ত্রপাতি, সেই সঙ্গে কাঁচামালের কথা বুঝিয়েছেন।'

'আগেকার দিনে লোকে নৌকো বেয়ে মাছ ধরতে যেতো। এখন জেলেরা যায় বিশাল বিশাল সব ট্রলারে করে।'

'হ্যাঁ আর এখন তুমি বলছ সমাজের ভিত্তির পরের স্তরটির কথা, অর্থাৎ তাদের কথা যারা এই উৎপাদনের হাতিয়ারের মালিক। এই শ্রম বিভাজন বা কাজ এবং মালিকানার এই বন্টনকেই মার্কস বলেছেন সমাজের "*উৎপাদন সম্পর্ক*"।'

'আচ্ছা।'

'আপাতত আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারি যে একটি সমাজে কোন ধরনের রাজনৈতিক এবং আদর্শগত অবস্থা বিরাজমান তা নির্ধারণ করে এই উৎপাদনের ধরন। আমরা যে সাবেক সামন্ততান্ত্রিক সমাজ থেকে খানিকটা ভিন্নভাবে চিন্তা-ভাবনা করি এবং আমাদের নৈতিক মানদণ্ড (moral codex) যে খানিকটা ভিন্ন, সেটি এমনি এমনি নয়।'

'তার মানে মার্কস চিরন্তনভাবে প্রযোজ্য কোনো প্রাকৃতিক ন্যায়ে বিশ্বাস করতেন না।'

'না; নৈতিকভাবে কোনটি ঠিক তা মার্কসের মতে সমাজের ভিত্তির-ই সৃষ্ট একটা জিনিস। যেমন ধরো, আগেকার কৃষক সমাজে বাবা-মা-যে ঠিক করে দিতেন সন্তান কাকে বিয়ে করবে সেটি এমনি এমনি নয়। উত্তরাধিকারসূত্রে খামারটা কে লাভ করবে সেই প্রশ্ন জড়িত ছিল এর সঙ্গে। একটি আধুনিক সমাজে সামাজিক সম্পর্কগুলো ভিন্ন

রকমের। এখন কোনো পার্টি বা ডিস্কোতে তোমার সঙ্গে তোমার ভাবি বরের দেখা হয়ে যেতে পারে আর সে-রকম গভীর প্রেমে পড়লে থাকবার একটা না একটা জায়গা তুমি ঠিকই পেয়ে যাবে।'

'আমি কাকে বিয়ে করব সেটি আমার মা-বাবা ঠিক করে দেবে এটা আমি কক্ষনো সহ্য করতে পারব না।'

'পারবে না তার কারণ তুমি তোমার সময়ের সন্তান। মার্কস জোর দিয়ে আরও বলেছেন যে সমাজের শাসক শ্রেণীই মূলত ঠিক করে ন্যায়-অন্যায়ের মাপকাঠিগুলো। কারণ 'আজ পর্যন্ত যত সমাজ দেখা গেছে সেগুলোর সবক'টির ইতিহাস শ্রেণী সংগ্রামের ইতিহাস'। অন্য কথায় বলতে গেলে উৎপাদনের হাতিয়ার কার মালিকানায় থাকবে ইতিহাস হচ্ছে মুখ্যত তাই।'

'মানুষের চিন্তা এবং ধারণাগুলো কি তাহলে ইতিহাসের পরিবর্তন ঘটাতে সাহায্য করে না?'

'হ্যাঁ এবং না। মার্কস বুঝতে পেরেছিলেন যে সমাজের উপরিকাঠামোর অবস্থা সমাজের ভিত্তির ওপর একটা মিথষ্ক্রিয়া প্রভাব ফেলে, কিন্তু সমাজের উপরিকাঠামোর কোনো স্বাধীন ইতিহাস আছে বলে তিনি স্বীকার করেননি। ঐতিহাসিক বিকাশকে প্রাচীন যুগের দাস সমাজ থেকে আজকের শিল্পভিত্তিক সমাজে যা নিয়ে এসেছে তা মূলত নির্ধারিত হয়েছে সমাজের ভিত্তিস্তরে ঘটা পরিবর্তনগুলোর মাধ্যমে।'

'আচ্ছা।'

'মার্কস বিশ্বাস করতেন যে ইতিহাসের সমস্ত পর্বেই সমাজের দুটো প্রধান শ্রেণীর মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব বিরাজ করেছে। প্রাচীন যুগের *দাস সমাজে* দ্বন্দ্বটা ছিল স্বাধীন নাগরিক আর দাসদের মধ্যে। মধ্যযুগের সামন্ততান্ত্রিক সমাজে সামন্তপ্রভু আর ভূমিদাসদের মধ্যে; পরে, অভিজাত শ্রেণী আর সাধারণ নাগরিকদের মধ্যে। কিন্তু মার্কসের নিজের সময়ে, তিনি যাকে বলেছেন বুর্জোয়া বা *পুঁজিবাদী* সমাজ সেখানে দ্বন্দ্বটা ছিল প্রথমত এবং প্রধানত পুঁজিপতি আর শ্রমিক বা প্রোলেতারিয়েতদের মধ্যে। অর্থাৎ, দ্বন্দ্বটা ছিল যাদের হাতে উৎপাদনের হাতিয়ার আর যাদের হাতে তা নেই এই দুই দলের মধ্যে। আর যেহেতু 'উচ্চতর শ্রেণীগুলো' স্বেচ্ছায় তাদের ক্ষমতা ছাড়ে না তাই কেবল বিপ্লবের মধ্য দিয়েই পরিবর্তন আসতে পারে।'

'আর কম্যুনিস্ট সমাজের ব্যাপারটা কী?'

'মার্কস বিশেষভাবে উৎসাহী ছিলেন পুঁজিবাদী সমাজ থেকে কম্যুনিস্ট সমাজে রূপান্তরের ব্যাপারে। পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার একটি পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণও করেছিলেন তিনি। তবে সেদিকে নজর দেয়ার আগে আমাদেরকে অবশ্যই মানুষের *শ্রম* সম্পর্কে মার্কসের দৃষ্টিভঙ্গির কথা বলতে হবে।'

'বলে যান।'

'কম্যুনিস্ট হওয়ার আগে তরুণ মার্কস ব্যস্ত ছিলেন কাজ করার সময় মানুষের মধ্যে কী ঘটে এই বিষয়টি পর্যবেক্ষণে। হেগেলও বিষয়টি বিশ্লেষণ করেছিলেন। হেগেল বিশ্বাস করতেন মানুষ এবং প্রকৃতির মধ্যে একটা মিথষ্ক্রিয়া অথবা দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক রয়েছে। মানুষ যখন প্রকৃতিকে পরিবর্তন করে তখন সে নিজেই বদলে যায়।

অথবা ব্যাপারটাকে খানিকটা অন্যভাবে বললে বলা যায় যে, মানুষ যখন কাজ করে তখন প্রকৃতির সঙ্গে সে মিথস্ক্রিয়ায় অংশ নেয় এবং সেটিকে পরিবর্তন করে। কিন্তু সেই প্রক্রিয়ায় প্রকৃতিও মানুষের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়ায় রত হয় এবং তার চেতনাকে পরিবর্তন করে।'

'তুমি কী করো আমাকে বলো, আমি বলে দেবো তুমি কে।'

'সংক্ষেপে, এটাই হচ্ছে মার্কসের বক্তব্য। আমরা কীভাবে কাজ করি সেটি আমাদের চেতনার ওপর প্রভাব ফেলে, কিন্তু সেই সঙ্গে, আমরা যেভাবে কাজ করি তার ওপর আমাদের চেতনাও প্রভাব ফেলে। তুমি বলতে পারো, হাত আর চেতনার ভেতর এটা একটা মিথস্ক্রিয়ামূলক সম্পর্ক। এভাবেই, তুমি কীভাবে চিন্তা করো তার সঙ্গে তুমি যে-কাজ করো সেটি খুবই ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত।'

'তার মানে, বেকার থাকাটা নিশ্চয়ই খুবই হতাশাজনক ব্যাপার।'

'হ্যাঁ। একজন বেকার লোক এক অর্থে শূন্য লোক। গোড়া থেকেই এই বিষয়ে সচেতন ছিলেন হেগেল। হেগেল এবং মার্কস দু'জনের কাছেই কাজ ছিল একটা ইতিবাচক জিনিস এবং তা মানবজাতির নির্যাসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত।'

'তার মানে শ্রমিক হওয়া নিশ্চয়ই ইতিবাচক একটা ব্যাপার।'

'হ্যাঁ, মূলত তাই। কিন্তু পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার ঠিক এই জায়গাটি লক্ষ করেই তাঁর আক্রমণ শানিয়েছেন মার্কস।'

'সেটি কীরকম?'

'পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় শ্রমিক পরিশ্রম করে অন্যের জন্য। তার শ্রম তাই তার বাইরের জিনিস বা এমন একটা কিছু যা তার নিজের নয়। শ্রমিক তার নিজের শ্রমের কাছেই অচেনা হয়ে পড়ে, কিন্তু সেই সঙ্গে সে তার নিজের কাছেও অচেনা হয়ে পড়ে। নিজের বাস্তবতার সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটে যায় তার। হেগেলীয় একটা বাক্‌ভঙ্গি ব্যবহার করে মার্কস বলেছেন, শ্রমিক হয়ে পড়ে *বিচ্ছিন্ন* (alienated)।'

'আমার এক চাচি আছেন বিশ বছরেরও বেশি সময় ধরে একটা ফ্যাক্টরিতে ক্যান্ডি প্যাকেজিং করছেন তিনি, ফলে আমি সহজেই বুঝতে পারছি আপনি কী বোঝাতে চাইছেন। প্রত্যেকদিন সকালবেলা উনি বলেন কাজে যেতে ঘেন্না করেন তিনি।'

'কিন্তু তিনি যদি তাঁর কাজকে ঘৃণা করেন তাহলে এক অর্থে তিনি নিজেকেও ঘৃণা করেন।'

'তিনি যে ক্যান্ডি ঘেন্না করেন সেটি নিশ্চিত।'

'একটি পুঁজিবাদী সমাজে এমনভাবে শ্রমকে সংগঠিত করা হয় যাতে শ্রমিক আরেকটা সামাজিক শ্রেণীর দাসত্ব করে। এভাবে একজন শ্রমিক তার শ্রম আর সেই সঙ্গে তার সমগ্র জীবন বুর্জোয়াদের কাছে হস্তান্তর করে।'

'ব্যাপারটা কি এতোই খারাপ?'

'আমরা মার্কসের কথা আলোচনা করছি, কাজেই আমাদেরকে অবশ্যই শুরু করতে হবে গত শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ের সামাজিক অবস্থা থেকে। কাজেই তোমার প্রশ্নের উত্তরটা হবে একটা জোরাল হ্যাঁ। বরফ-ঠাণ্ডা একটা উৎপাদন কক্ষে শ্রমিকদের দৈনিক ১২ ঘণ্টাও খাটতে হতো। মজুরি এতোই কম ছিল যে শিশু এবং গর্ভবতী

মায়েদেরও কাজ করতে হতো প্রায়ই। এর ফলে সৃষ্টি হলো অবর্ণনীয় সামাজিক অবস্থা। অনেক জায়গাতেই বেতনের একটা অংশ দেয়া হতো সস্তা মদ হিসেবে আর মেয়েদেরকে বাড়তি আয়ের জন্য করতে হতো পতিতাবৃত্তি। তাদের খদ্দেররা ছিল শহরের গণ্যমান্য লোকজন। সংক্ষেপে, ঠিক যে-পরিস্থিতিটা হওয়ার কথা ছিল মানবজাতির সম্মানজনক উৎকর্ষসূচক চিহ্ন, অর্থাৎ কিনা কাজ, ঠিক সেখানেই শ্রমিক পরিণত হলো একটা ভারবাহী পশুতে।'

'আমার ভীষণ রাগ হচ্ছে!'

'মার্কসেরও তাই হয়েছিল। আর এ-সব ব্যাপার যখন চলছিল তখন বুর্জোয়াদের ছেলেমেয়েরা শ্রান্তিহর গোসলের পর উষ্ণ, প্রশস্ত বসবার ঘরে বসে বেহালা বাজাতো। কিংবা চার কোর্সের ডিনারের জন্য অপেক্ষা করতে করতে পিয়ানো বাজাতো। ঘোড়ার পিঠে দীর্ঘ সময়ের একটা ভ্রমণ থেকে ফেরার পর বেহালা আর পিয়ানোবাদন একটা অবসর বিনোদনের কাজ করতো।'

'ইশ! কী অন্যায়!'

'মার্কস-ও তোমার সঙ্গে একমত হতেন। এঙ্গেলসের সঙ্গে যৌথভাবে ১৮৪৮ সালে প্রকাশ করেন তিনি একটি *কম্যুনিস্ট ইশতেহার*। সেই ইশতেহারের প্রথম বাক্য হচ্ছে 'ইউরোপকে একটা ভূত তাড়া করে ফিরছে—কম্যুনিজমের ভূত'।'

'শুনে তো ভয় লাগছে।'

'বুর্জোয়াদেরও ভয় লেগেছিল। কারণ এবার প্রোলেতারিয়েতরাও বিদ্রোহ করতে শুরু করেছিল। ইশতেহারের শেষটা শুনতে চাও?'

'হ্যাঁ, বলুন না।'

'কম্যুনিস্টরা তাদের দৃষ্টিভঙ্গি এবং লক্ষ্য গোপন রাখতে ঘৃণা বোধ করে। তারা খোলাখুলিভাবেই ঘোষণা করে যে তাদের লক্ষ্য অর্জিত হতে পারে শুধু সমস্ত প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার সবল উচ্ছেদের মাধ্যমে। কম্যুনিস্ট বিপ্লবের আতঙ্কে শাসকশ্রেণীরা কাঁপুক। শৃঙ্খল ছাড়া হারাবার কিছু নেই প্রোলেতারিয়েতের। জয় করবার জন্য রয়েছে গোটা জগৎ। দুনিয়ার মজদুর এক হও!'

'আপনি যতটা বলছেন, পরিস্থিতি ততটাই খারাপ হয়ে থাকলে আমার মনে হয় আমি সেই ইশতেহারে সই করতাম। কিন্তু আজকে নিশ্চয়ই অবস্থা অনেক ভিন্ন?'

'নরওয়েতে ভিন্ন ঠিকই, কিন্তু সব জায়গায় নয়। বহু মানুষ এখনো মানবেতর জীবনযাপন করছে, অথচ তারা এমন সব পণ্য উৎপাদন করে যাচ্ছে যা পুঁজিবাদীদের আরও ধনী করছে, মার্কস একে বলেছেন শোষণ।'

'শব্দটা একটু ব্যাখ্যা করবেন দয়া করে?'

'কোনো শ্রমিক একটা পণ্য উৎপাদন করলে সেটির নিশ্চয়ই একটা বিনিময় মূল্য থাকবে?'

'হ্যাঁ।'

'শ্রমিকের বেতন আর পণ্যটির উৎপাদন খরচ সেই বিনিময় মূল্য থেকে বাদ দিলে সব সময়ই কিছু টাকা উদ্বৃত্ত থেকে যাবে। ঠিক এটাকেই মার্কস বলেছেন লাভ। অন্যভাবে বলতে গেলে, পুঁজিপতি এমন একটা মূল্য বা অঙ্ক পকেটস্থ করছে যা

আসলে সেই শ্রমিকের তৈরি। এটাকেই বলে শোষণ।'

'আচ্ছা।'

'তো এবার পুঁজিপতিটি তার খানিকটা লাভ নতুন পুঁজিতে খাটায়, এই যেমন ধরো তার প্রোডাকশন প্ল্যানটার আধুনিকায়নে, এই আশাতে যে আরও সস্তায় সে তার পণ্য উৎপাদন করতে পারবে আর তাতে করে ভবিষ্যতে তার লাভ আরও বেড়ে যাবে।'

'এটাতো যৌক্তিকই শোনাচ্ছে।'

'তা ঠিক, কথাটা যৌক্তিক শোনাতে পারে। কিন্তু এক্ষেত্রে এবং অন্যান্য ক্ষেত্রের কোনো দিকেই ব্যাপারটা কিন্তু শেষ পর্যন্ত পুঁজিপতিটি যেমনটি ভেবেছিল ঠিক তেমনটি ঘটবে না।'

'ঠিক কী বলতে চাইছেন?'

'মার্ক্স মনে করতেন, পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার ভেতর বেশ কিছু সহজাত স্ববিরোধ রয়েছে। পুঁজিবাদ এমন একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যা আত্মবিধ্বংসী কারণ এতে বিচারবুদ্ধি সংক্রান্ত নিয়ন্ত্রণের অভাব রয়েছে।'

'সেটিতো নির্যাতিতদের জন্য ভালো, তাই না?'

'হ্যাঁ। পুঁজিবাদী ব্যবস্থা অন্তর্নিহিতভাবেই তার নিজের ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। সেই অর্থে পুঁজিবাদ 'প্রগতিশীল' তার কারণ এটা কম্যুনিজমের পথে একটা ধাপ।'

'পুঁজিবাদ যে আত্মবিধ্বংসী সে-ব্যাপারে একটা উদাহরণ দিতে পারেন?'

'আমরা বলেছি পুঁজিপতির প্রচুর উদ্বৃত্ত অর্থ রয়েছে এবং সে সেটির খানিকটা তার কারখানার আধুনিকায়নে ব্যয় করে। কিন্তু সেই সঙ্গে সে বেহালাবাদন শেখার জন্যও অর্থ ব্যয় করে। তাছাড়া তার স্ত্রী একটা বিলাসী জীবনযাপনে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে।'

'কোনো সন্দেহ নেই।'

'আর নতুন যন্ত্রপাতি কেনার ফলে তার কারখানায় আর আগের মতো এতো শ্রমিকের দরকার নেই। এবং কাজটা তাকে করতে হয়েছে নিজের প্রতিযোগিতামূলক ক্ষমতা বাড়াবার জন্যে।'

'বুঝতে পেরেছি।'

'কিন্তু সে-ই যে শুধু এ-রকম চিন্তা করছে তা নয় আর তার মনে হচ্ছে মোটের ওপর উৎপাদন ক্রমেই আরও বেশি কার্যকর হচ্ছে। কারখানা বড় থেকে আরও বড় হচ্ছে। আর ধীরে ধীরে সেগুলো মুষ্টিমেয় মানুষের হাতে কেন্দ্রীভূত হচ্ছে। তো, এর পর কী ঘটবে, সোফি?'

'ইয়ে, মানে...

'আগের চেয়ে কম শ্রমিক দরকার হবে, তার মানে বেকার লোকের সংখ্যা বেড়ে যাবে। তার মানে সামাজিক সমস্যা বাড়বে। আর এ-ধরনের পুঁজিবাদ যে ক্রমেই তার নিজের ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে এরকম *সমস্যাগুলো* তারই একটা সংকেত। তবে পুঁজিবাদের আরও অনেক আত্মবিশ্বাসী উপাদান রয়েছে। যখনই উৎপাদনের উপায়ে বিনিয়োগ করার জন্য লাভের টাকাটা আটকে পড়ে অথচ প্রতিযোগিতামূলক দামে

উৎপাদন চালিয়ে যাওয়ার মতো যথেষ্ট পরিমাণ উদ্বৃত্ত অর্থ হাতে থাকে না...'

'হ্যাঁ?'

'...পুঁজিপতি তখন কী করেন বলতে পারো?'

'উঁহু, পারছি না।'

'মনে করো, তুমি একটা কারখানার মালিক। টাকা-পয়সার টানাটানি যাচ্ছে তোমার। উৎপাদন চালিয়ে যাওয়ার জন্য যে-কাঁচামাল তোমার দরকার তা তুমি কিনতে পারছো না। দেউলিয়া হওয়ার মতো অবস্থা তোমার । তো, এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছে খরচ কমানোর জন্য তুমি কী করতে পারো?'

'ধরুন গিয়ে, বেতন কমিয়ে দিতে পারি।'

'দারুণ! হ্যাঁ, সবচেয়ে কাজের কাজ যেটা তুমি করতে পারো তা এটাই। কিন্তু সব পুঁজিপতিই যদি তোমার মতো চালাক হয়—অবশ্য আসলেই তারা তাই—তাহলে শ্রমিকেরা এতোই গরিব হয়ে পড়বে যে জিনিসপত্র কেনার আর সামর্থ্য থাকবে না তাদের। এই পরিস্থিতিতে আমরা বলবো যে ক্রয়-ক্ষমতা কমে যাচ্ছে। এবার কিন্তু আমরা সত্যিই একটা দুষ্ট চক্রের মধ্যে পড়ে গেছি। মার্কস হলে বলতেন, পুঁজিপতির ব্যক্তিগত সম্পদের মৃত্যু-ঘণ্টা বেজে গেছে। দ্রুত একটা বিপ্লবাত্মক পরিস্থিতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছি আমরা।'

'হ্যাঁ, বুঝতে পারছি।'

'অল্প কথায় বলতে গেলে, শেষ পর্যন্ত প্রোলেতারিয়েতরা জেগে উঠে উৎপাদনের উপায়ের দখল নিয়ে নেবে।'

'তারপর?'

'কিছুদিনের জন্য আমরা একটা নতুন 'শ্রেণী সমাজ' পাই যেখানে প্রোলেতারিয়েতেরা জোর করে দাবিয়ে রাখে বুর্জোয়াদের। মার্কস একে বলেছেন *প্রোলেতারিয়েতের একনায়কত্ব*। কিন্তু একটা ক্রান্তিকালের পর প্রোলেতারিয়েতের একনায়কত্বের জায়গা নেয় একটি 'শ্রেণীহীন সমাজ' যেখানে উৎপাদনের উপায় থাকে 'সবার হাতে', অর্থাৎ, জনসাধারণের নিজের হাতে। এ-ধরনের সমাজে নীতিটি হলো 'যার যার ক্ষমতা অনুযায়ী প্রত্যেকের কাছ থেকে আর যার যার প্রয়োজন অনুযায়ী প্রত্যেকের কাছে।' তাছাড়া শ্রম এখন শ্রমিকদের নিজেদের জিনিসে পরিণত হয়েছে আর সমাপ্তি ঘটেছে পুঁজিবাদের বিচ্ছিন্নতার।'

'সবকিছুই তো খুব চমৎকার শোনাচ্ছে, কিন্তু আসলে কী ঘটেছিল? কোনো বিপ্লব কি ঘটেছিল?'

'হ্যাঁ আবার না। আজ অর্থনীতিবিদরা দেখাতে পারবেন যে বেশ কয়েকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুর ব্যাপারে ভুল হয়েছিল মার্কসের। বিশেষ করে পুঁজিবাদের সংকট সম্পর্কে তার বিশ্লেষণের ভেতরেই। তাছাড়া, যেটার ভয়াবহ পরিণতি আমরা আজ দেখতে পাচ্ছি সেই প্রাকৃতিক পরিবেশ ধ্বংসের বিষয়টির দিকে তিনি যথেষ্ট পরিমাণ নজর দেননি। তারপরেও...'

'তারপরেও ?'

'মার্কসবাদের যথেষ্ট উত্থান ঘটেছিল। এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে একটি

অমানবিক সমাজের সঙ্গে যুদ্ধে অনেকটাই সাফল্য অর্জন করেছে সমাজবাদ। সে যাই হোক না কেন, ইউরোপে আমরা এমন এক সমাজে বাস করি যেখানে মার্কস যে-সমাজে ছিলেন তার চেয়ে ন্যায় বিচার বেশি, সেই সঙ্গে সংহতি বা একতাও। মার্কসের নিজের এবং গোটা সমাজবাদী আন্দোলনের যে এ-ব্যাপারে বিশেষ ভূমিকা আছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না।'

'কী ঘটেছিল?'

'মার্কসের পর সমাজবাদী আন্দোলন প্রধান দুটো ভাগে ভাগ হয়ে যায়—সোশ্যাল ডেমোক্রেসি আর লেনিনবাদ। স্যোশাল ডেমোক্রেসি যা কি না সমাজবাদের দিকে একটি ধীর এবং শান্তিপূর্ণ পথের প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছে সেটিই ছিল পশ্চিম ইউরোপের পথ। একে আমরা বলতে পারি ধীর বিপ্লব। লেনিনবাদ, যা মাকর্সের এই বিশ্বাসের ওপর আস্থা রেখেই চলছিল যে পুরনো শ্রেণীভিত্তিক সমাজের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হলে বিপ্লবই হচ্ছে একমাত্র পথ, তা একটা বিরাট প্রভাব ফেলেছিল পূর্ব ইউরোপ, এশিয়া এবং আফ্রিকার ওপর। যার যার নিজস্ব ধরনে এই মতবাদই দুঃখ-কষ্ট এবং নিপীড়নের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে।'

'কিন্তু এটাই কি আবার নতুন ধরনের একটা নিপীড়নের সৃষ্টি করেনি? যেমন ধরুন, রাশিয়ায় আর পূর্ব ইউরোপে?'

'নিঃসন্দেহে আর এখানেই আমরা আবার দেখতে পাই যে মানুষ যা কিছু স্পর্শ করে সেটিই ভালো আর মন্দের একটা মিশ্রণ হয়ে দাঁড়ায়। অন্যদিকে আবার মার্কসের মৃত্যুর পঞ্চাশ বা একশো বছর পর তথাকথিত সমাজবাদী দেশগুলোর নেতিবাচক দিকগুলোর জন্য তাঁকে দোষারোপ করাটাও যুক্তিসঙ্গত হবে না। তবে কম্যুনিস্ট সমাজে যারা প্রশাসক হবে তাদের ব্যাপারে সম্ভবত তিনি খুবই অল্প নজর দিয়েছিলেন। একটা প্রমিজড্ ল্যান্ড হয়ত কোনোদিনই পাওয়া যাবে না। মানুষ সব সময়ই নিত্য নতুন সমস্যা তৈরি করে যাবে আর তারপর সেগুলো দূর করার সংগ্রাম করবে।'

'আমি নিশ্চিত, তাই-ই ঘটবে।'

'আর এখানেই মার্কসের ওপর যবনিকা টানব আমরা, সোফি।'

'দাঁড়ান, দাঁড়ান, সমান সমান যারা কেবল তাদের মধ্যেই ন্যায় বিচার থাকে, এরকম একটা কথা বলেছিলেন না আপনি?'

'না, আমি না, কথাটা আসলে বলেছিল স্ক্রুজ।'

'সে কী বলেছিল তা আপনি কী করে জানলেন?'

'ইয়ে, দেখো, আমাদের দু'জনের লেখকই তো একজন। সত্যি বলতে কী, একজন সাধারণ লোকের কাছে যতটা মনে হবে তার চেয়ে কিন্তু বেশি ঘনিষ্ঠ আমরা দু'জন।'

'আবারও আপনার সেই জঘন্য আয়রনি!'

'ডাবল, সোফি, এটা হচ্ছে ডাবল আয়রনি।'

'সেই ন্যায় বিচার প্রসঙ্গে ফিরে আসি। আপনি বলেছিলেন মার্কস মনে করতেন পুঁজিবাদ একটি অন্যায় বা অসঙ্গত সমাজ ব্যবস্থা। একটি ন্যায়পরায়ণ সমাজকে কীভাবে ব্যাখ্যা করবেন আপনি?'

'জন রঅলস (John Rawls) নামের এক মোরাল ফিলসোফার একটা উদাহরণ দিয়ে এ-ব্যাপারে কিছু বলার চেষ্টা করেছিলেন : মনে করুন আপনি এমন একটি বিশিষ্ট পরিষদের সদস্য যার কাজ হচ্ছে ভবিষ্যতের সমাজের জন্য সমস্ত আইন প্রণয়ন করা ।'

'এ-রকম একটা পরিষদের সদস্য হতে আমি একটুও আপত্তি করবো না ।'

'তো, তাঁদেরকে প্রতিটি খুঁটিনাটি মাথায় রাখতে হবে কারণ তাঁরা একটা ঐকমত্যে পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে এবং প্রত্যেক আইন-এ সই করার পরই মারা যাবেন ।

'আহ্...'

'কিন্তু যে-সমাজের জন্য তাঁরা আইন প্রণয়ন করলেন সে-সমাজের সদস্য হিসেবে সঙ্গে সঙ্গেই প্রাণ ফিরে পাবেন তাঁরা । তবে কথা হচ্ছে সেই সমাজে তাঁদের *অবস্থান* কী হবে সে-সম্পর্কে আগে থেকে কোনো ধারণা থাকবে না তাঁদের ।'

'ও, আচ্ছা ।'

'সেই সমাজ-ই হবে একটা ন্যায়পরায়ণ সমাজ । সেটির উদ্ভব হবে সমমর্যাদা সম্পন্ন মানুষ নিয়ে ।'

'পুরুষ মানুষ *এবং* মেয়েমানুষ ।'

'সেটিতো বলাই বাহুল্য । ওঁদের কেউ-ই জানতেন না তাঁরা কি পুরুষ হয়ে জেগে উঠবেন, না নারী হয়ে । সম্ভাবনা যেহেতু আধাআধি, সমাজটা নারী আর পুরুষ দুয়ের জন্য একই রকম আকর্ষণীয় হবে ।'

'শুনে আশা জাগছে ।'

'তো, এখন বলো, কার্ল মার্কসের ইউরোপ কি সে-রকম একটা সমাজ ছিল?'

'অবশ্যই না !'

'কিন্তু সে-রকম কোনো সমাজ এ-যুগেও আছে বলে কি জানা আছে তোমার?'

'হুম্...এটা একটা ভালো প্রশ্ন ।'

'চিন্তা করো ব্যাপারটা নিয়ে । তো, আপাতত মার্কস সম্পর্কে এটুকুই ।'

'কী বললেন ?'

'পরের চ্যাপ্টার !'

ডারউইন

...একটি জাহাজ যা জিন-এর কার্গো নিয়ে ভেসে চলেছে জীবনের ভেতর দিয়ে...

রোববার সকালে জোরে একটা ধপাস শব্দে ঘুম ভেঙে গেল হিল্ডার। রিং বাইন্ডারটা মেঝেতে পড়ে গেছে। বিছানায় শুয়ে মার্কস সম্পর্কে সোফি আর অ্যালবার্টোর আলাপের কথা পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়েছিল সে। বিছানার পাশের রিডিং ল্যাম্পটা সারা রাত ধরেই জ্বলা ছিল।

তার ডেস্কের ওপর রাখা অ্যালার্ম ঘড়ির জ্বলজ্বলে সবুজ আলো বলছে ৮:৫৯।

বিশাল বিশাল সব কারখানা আর দূষিত শহরের স্বপ্ন দেখছিল সে এতোক্ষণ; রাস্তার এক কোণে বসে ছোট্ট একটি মেয়ে দেশলাই বিক্রি করছে, লম্বা লম্বা কোট পরা সুবেশী লোকজন পাশ দিয়ে চলে যাওয়ার সময় ফিরেও তাকাচ্ছে না তার দিকে।

বিছানায় উঠে বসতে সেই আইন প্রণেতাদের কথা মনে পড়ে গেল হিল্ডার যাঁরা তাদেরই গড়া একটা সমাজে জেগে উঠেছিলেন। হিল্ডা অবশ্য বিয়ার্কলেতে জেগে উঠতে পেরেই খুশি হলো।

নরওয়ের কোথায় সে জেগে উঠবে সে-কথা না জেনে নরওয়েতে জেগে ওঠার সাহস হতো তাঁর?

তবে এটা শুধু *কোথায়* সে জেগে উঠবে সে-প্রশ্ন নয়। ঠিক অমনই অনায়াসে সে কি অন্য যুগেও জেগে উঠতে পারতো না? এই যেমন মধ্যযুগে অথবা বিশ হাজার বছর আগেকার প্রস্তর যুগে? হিল্ডা কল্পনা করার চেষ্টা করল সে একটা গুহার প্রবেশমুখে বসে আছে, হয়ত একটা পশুর চামড়া পরিষ্কার করছে।

যখন সংস্কৃতি বলে কিছু তৈরিই হয়নি এমন একটা সময়ে পনেরো বছর বয়সী একটি মেয়ে হওয়াটা কেমন হতো? কীভাবে চিন্তা-ভাবনা করতো সে? তার কি আদৌ কোনো চিন্তা-ভাবনা থাকতো?'

একটা সোয়েটার টেনে নিল সে, রিং বাইন্ডারটা তুলল কষ্ট করে, তারপর স্থির হয়ে বসল পরের চ্যাপ্টারটা পড়ার জন্য।

অ্যালবার্টো সবেমাত্র বলেছে 'পরের চ্যাপ্টার' এমন সময় মেজরের কেবিনের দরজায় টোকা দিল কেউ।

'আমাদের কোনো উপায় নেই, আছে?' সোফি জিজ্ঞেস করল।

'না, আমার মনে হয় নেই।' অ্যালবার্টো বললেন।

বাইরের সিঁড়িতে লম্বা সাদা চুল আর দাড়িঅলা এক অতি বৃদ্ধ লোক দাঁড়িয়ে। তাঁর এক হাতে একটা লাঠি অন্য হাতে একটা বোর্ড, তাতে একটা নৌকোর ছবি আঁকা। নৌকোটা সব ধরনের জীব-জন্তুতে ভর্তি।

'তা এই বয়স্ক ভদ্রলোক কে?' জিজ্ঞেস করলেন অ্যালবার্টো।

'আমার নাম নোয়া।'

'সে-রকমই আন্দাজ করেছিলেম।'

'তোমাদের প্রাচীনতম পূর্ব পুরুষ আমি, বাবা। তবে পূর্ব-পুরুষদের পরিচয় স্বীকার করার রেওয়াজ বোধহয় এখন আর নেই।'

'আপনার হাতে ওটা কী?' সোফি জিজ্ঞেস করল।

'এটা হচ্ছে প্লাবনের হাত থেকে যত প্রাণী বেঁচে গিয়েছিল সেগুলোর ছবি। এই যে, মা, এটা তোমার জন্য।'

হাত বাড়িয়ে বড় বোর্ডটা নিল সোফি।

'আমি বরং বাড়ি যাই, আঙুরলতাগুলোর দেখভাল করি গে,' বৃদ্ধ লোকটি বললেন, তারপর ছোট্ট একটা লাফ দিয়ে তিনি শূন্যে তাঁর গোড়ালিদুটো এক করে এখনকার বা তখনকার যে-কোনো যুগেরই অতি বৃদ্ধ লোকের পক্ষে অদ্ভুত ধরনে আনন্দে লাফাতে লাফাতে বনের মধ্যে হারিয়ে গেলেন।

সোফি আর অ্যালবার্টো ভেতরে গিয়ে বসল আবার। ছবিটা দেখতে লাগল সোফি। কিন্তু সেটি সে ভালো করে দেখার সুযোগই পেল না, তার আগেই কর্তৃত্বপরায়ণ একটা থাবায় ওর হাত থেকে সেটা কেড়ে নিলেন অ্যালবার্টো।

'ব্রড আউট লাইনগুলোর ওপর মনোযোগ দেবো আমরা প্রথমে।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে।'

'আমি বলতে ভুলে গেছি যে মার্কস তাঁর জীবনের শেষ ৩৪ বছর লন্ডনে কাটিয়েছিলেন। ১৮৪৯-এ সেখানে গিয়েছিলেন তিনি আর মারা গিয়েছিলেন ১৮৮৩-তে। এই গোটা সময় জুড়েই লন্ডনের একটু বাইরেই বাস করতেন *চার্লস ডারউইন* (Charles Darwin)। তিনি মারা যান ১৮৮২ সালে। মহা জাঁকজমক আর আনুষ্ঠানিকতার সঙ্গে ওয়েস্টমিনস্টার অ্যাবেতে কবর দেয়া হয় তাঁকে। অর্থাৎ মার্কস এবং ডারউইনের পথ পরস্পরের সঙ্গে মিশেছিল, যদিও কেবল কাল আর স্থান এই দুটি ক্ষেত্রে নয়। মার্কস তাঁর সবচেয়ে বড় কাজ *ক্যাপিটাল*-এর ইংরেজি সংস্করণ ডারউইনের নামে উৎসর্গ করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু ডারউইন সে-সম্মান গ্রহণ করতে রাজি হননি। ডারউইনের মৃত্যুর পরের বছর মার্কস মারা গেলে তাঁর বন্ধু এঙ্গেলস মন্তব্য করেন 'ডারউইন যেমন জৈব বিবর্তনের তত্ত্ব আবিষ্কার করেছেন, তেমনি মার্কসও মানবজাতির ঐতিহাসিক বিবর্তনের তত্ত্ব আবিষ্কার করেছেন।'

'আচ্ছা।'

'আরেকজন বড় চিন্তাবিদ যিনি নিজের কাজকে ডারউইনের সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন তিনি হচ্ছেন মনোবিজ্ঞানী সিগমুন্ড ফ্রয়েড। তিনিও লন্ডনেই কাটিয়েছেন তাঁর শেষ জীবন। ফ্রয়েড বলেছেন 'ডারউইনের বিবর্তনবাদ আর তাঁর নিজের মনোসমীক্ষণ, এই দুই-ই মানুষের সরল অহংবাদের প্রতি একটা প্রতিবাদ হিসেবে দেখা দিয়েছে।'

'এক সঙ্গে অনেক নাম হয়ে গেল তো। আমরা কি মার্কস, ডারউইন না ফ্রয়েড সম্পর্কে আলাপ করছি?'

'এক বৃহত্তর অর্থে আমরা উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে একেবারে আমাদের সময় পর্যন্ত একটা *প্রাকৃতিক* ধারার কথা বলতে পারি। প্রাকৃতিক বলতে আমরা এমন এক বাস্তব বোধের কথা বোঝাচ্ছি যা প্রকৃতি আর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ ছাড়া অন্য কোনো বাস্তবতা গ্রহণ করে না। একজন প্রকৃতিবাদী অতএব তিনিই যিনি মানবজাতিকে প্রকৃতিরই অংশ বলে মনে করেন। একজন প্রকৃতিবাদী দার্শনিক প্রাকৃতিক ব্যাপার-স্যাপারের ওপরই পুরোপুরি নির্ভর করবেন, বুদ্ধিবৃত্তির অনুমানের ওপরও নয় বা কোনো ধরনের স্বর্গীয় রহস্যোদঘাটনের ওপরেও নয়।'

'মার্কস, ডারউইন আর ফ্রয়েড-এর বেলাতে বুঝি এ-কথা প্রযোজ্য?'

'পুরোপুরি। গত শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকেই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা হিসেবে শোনা যাচ্ছিল প্রকৃতি, পরিবেশ, ইতিহাস, বিবর্তন আর ক্রমবিকাশ, এই শব্দগুলো। মার্কস আগেই দেখিয়ে গিয়েছিলেন যে মানব আদর্শগুলো সমাজের ভিত্তিরই সৃষ্টি। ডারউইন দেখালেন যে মানবজাতি একটি ধীর জীববিজ্ঞান সংক্রান্ত বিবর্তনের ফল আর মনের নির্জ্ঞান স্তর সম্পর্কে ফ্রয়েডের পর্যবেক্ষণ জানালো যে মানুষের কাজ-কর্ম প্রায়শই "জান্তব" উদ্দীপনা বা সহজাত প্রবৃত্তির ফল।'

'প্রাকৃতিক বলতে আপনি কী বোঝাতে চাইছেন আমি তা মোটামুটি বুঝতে পারছি। কিন্তু একবারে একজনকে নিয়ে বললেই সবচেয়ে ভালো হতো না?'

'আমরা ডারউইনের কথা আলাপ করবো, সোফি। তোমার হয়ত মনে পড়বে যে সক্রেটিস-পূর্ব দার্শনিকেরা প্রাকৃতিক প্রক্রিয়াগুলোর প্রাকৃতিক ব্যাখ্যা-র অনুসন্ধান করেছিলেন। ঠিক যেভাবে তাদেরকে প্রাচীন পৌরাণিক ব্যাখ্যাগুলো থেকে নিজেদের সরিয়ে আনতে হয়েছিল, ঠিক সেভাবে ডারউইনকেও মানুষ এবং জীব-জন্তু সৃষ্টি সম্পর্কে গির্জার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে নিজেকে সরিয়ে নিতে হয়েছিল।'

'কিন্তু তাকে কি একজন প্রকৃত দার্শনিক বলা যায়?'

'ডারউইন ছিলেন একজন জীববিজ্ঞানী এবং একজন প্রকৃতিবাদী বিজ্ঞানী। কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি সাম্প্রতিক সময়ের একজন বিজ্ঞানী যিনি একেবারে খোলাখুলিভাবে সৃষ্টির জগতে মানুষের অবস্থান সম্পর্কে বাইবেলের দৃষ্টিভঙ্গিকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিলেন।'

'কাজেই ডারউইনের বিবর্তনবাদ সম্পর্কে কিছু বলতে হচ্ছে আপনাকে।'

'মানুষ ডারউইনকে দিয়েই শুরু করা যাক। ১৮০৯ সালে ছোট্ট শহর শ্রুসবেরিতে জন্মগ্রহণ করেন তিনি। তাঁর বাবা ডা. রবার্ট ডারউইন ছিলেন একজন বিখ্যাত স্থানীয় চিকিৎসক আর সন্তানের লালন-পালনের ব্যাপারে খুবই কড়া। চার্লস যখন স্থানীয় গ্রামার স্কুলের ছাত্র, সেখানকার হেডমাস্টার তাকে বর্ণনা করেছিলেন সারাক্ষণ হেথায়-হোথায় ঘুরে বেড়ানো কেজো-অকেজো নানা জিনিস নিয়ে খেলে বেড়ানো, কিন্তু কাজে লাগে এমন সামান্য জিনিসও না-করা একটা ছেলে হিসেবে। 'কাজে লাগে এমন জিনিস' বলতে হেডমাস্টার সাহেব বুঝিয়েছিলেন গ্রিক আর ল্যাটিন ক্রিয়াপদ মুখস্ত করা। 'ঘুরে বেড়ানো' বলতে তিনি অন্যান্য জিনিসের মধ্যে এই বিষয়টিকে

বুঝিয়েছিলেন যে চার্লস বিচিত্র সব গুবরে পোকা সংগ্রহ করে বেড়াতেন সম্ভব অসম্ভব নানান জায়গায় ঢুঁ মেরে।'

'বাজি ধরে বলতে পারি কথাগুলো বলেছিলেন বলে পরে আফসোস হয়েছিল তাঁর।'

'শেষ পর্যন্ত যখন ঈশ্বরতত্ত্ব নিয়ে পড়াশোনা শুরু করলেন তখনো কিন্তু পাখি পর্যবেক্ষণ আর পোকা-মাকড় সংগ্রহেই বেশি উৎসাহ ডারউনেরর। ফলে ঈশ্বরতত্ত্বে বেশি ভালো গ্রেড পেলেন না তিনি। তবে কলেজের ছাত্র থাকাকালীনই একজন প্রাকৃতিক বিজ্ঞানী হিসেবে সুনাম অর্জন করে ফেলেন তিনি, বিশেষ করে ভূতত্ত্ব সম্পর্কে তাঁর উৎসাহের কারণে আর ভূতত্ত্ব ছিল সম্ভবত সে-সময়কার সবচেয়ে বিকাশমান বিজ্ঞান। ১৮৩১ সালের এপ্রিল মাসে ঈশ্বরতত্ত্বে স্নাতক হওয়ার পর পাথরের গঠন নিয়ে পড়াশোনা করতে আর ফসিল খুঁজতে নর্থ ওয়েলস্ যান তিনি। সেই বছরেরই অগাস্ট মাসে, তাঁর বয়স যখন সবে বাইশ, একটা চিঠি পেলেন তিনি। সেই চিঠিই নির্দিষ্ট করে দিল তাঁর গোটা জীবনের গতিপথ...'

'কী লেখা ছিল চিঠিটাতে?'

'চিঠিটা লিখেছিলেন তাঁর বন্ধু এবং শিক্ষক জন স্টিভেন হেনস্লো। তিনি লিখেছিলেন: 'আমাকে অনুরোধ করা হয়েছে...আমি যেন ক্যাপ্টেন ফিটসরয়, যিনি সরকার কর্তৃক দক্ষিণ আমেরিকার দক্ষিণ উপকূল জরিপ করার জন্য সরকারিভাবে নিযুক্ত হয়েছেন, তাঁর সফর সঙ্গী হিসেবে একজন প্রকৃতিবিদকে সুপারিশ করি। আমি বলেছি এ-রকম দায়িত্বভার গ্রহণ করার মতো আমার চেনা সবচেয়ে উপযুক্ত মানুষ হিসেবে আমি তোমাকেই মনে করি। কাজটার অর্থ-কড়ি সংক্রান্ত ব্যাপারে আমার কিছু বলবার নেই। অভিযানটি দু'বছর স্থায়ী হওয়ার কথা...'

'এতো কথা আপনি মনে রাখেন কীভাবে?'

'তুচ্ছ ব্যাপার, সোফি।'

'তো, উত্তরে ডারউইন কী বললেন?'

'তিনি তো সুযোগটা একেবারে লুফে নিতে চাইছিলেন, কিন্তু সে-সময়ে কমবয়সী ছেলেরা বাবা-মা'র অনুমতি ছাড়া কিছু করতো না। অনেক কাকুতি-মিনতির পর শেষ পর্যন্ত তাঁর বাবা রাজি হলেন। এবং ছেলের অভিযাত্রার জন্য তিনিই টাকা দিলেন। 'অর্থ-কড়ির ব্যাপারটা' কী হবে সেটি পরিষ্কার বোঝা গিয়েছিল সেটির অনুপস্থিতি থেকেই।'

'আহা।'

'জাহাজটা ছিল নৌবাহিনীর এইচএমএস *বীগল* (Beagle)। ১৮৩১ সালের ২৭ ডিসেম্বর প্লাইমাউথ থেকে যাত্রা শুরু করেছিল সেটি দক্ষিণ আমেরিকার উদ্দেশ্যে এবং ১৮৩৬ সালের অক্টোবরের আগে সেটি ফিরে আসেনি। দু'বছরের অভিযান গিয়ে দাঁড়াল পাঁচ বছরে আর দক্ষিণ আমেরিকা ভ্রমণ হয়ে দাঁড়াল গোটা দুনিয়া পরিভ্রমণ। আবিষ্কারের সাম্প্রতিক সময়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভ্রমণগুলো একটির কথা বলছি আমরা এখন।'

'সারা দুনিয়া পরিভ্রমণ করেছিলেন তাঁরা?'

'হ্যাঁ, প্রায় আক্ষরিক অর্থেই। দক্ষিণ আমেরিকা থেকে প্রশান্ত মহাসাগর পাড়ি দিয়ে নিউজিল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া এবং দক্ষিণ আফ্রিকা গেলেন তাঁরা। তারপর দক্ষিণ আমেরিকায় ফিরে এসে যাত্রা করলেন ইংল্যান্ডের উদ্দেশে। ডারউইন লিখেছেন *বীগল* জাহাজে করে যে-ভ্রমণ তিনি করেছিলেন তা নিঃসন্দেহে তাঁর জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।'

'সমুদ্রের মধ্যে প্রকৃতিবিদের কাজটা খুব একটা সহজ হয়নি নিশ্চয়ই।'

'গোড়ার দিকে কয়েক বছর *বীগল* দক্ষিণ আমেরিকার উপকূল বরাবর এ-মাথা ও-মাথা ঘুরে বেড়িয়েছে। তাতে করে ডারউইন মহাদেশটার সঙ্গে আর স্থলভূমির সঙ্গেও, পরিচিত হওয়ার যথেষ্ট সুযোগ পেয়েছেন। অভিযানের সময় দক্ষিণ আমেরিকার প্রশান্ত মহাসাগরীয় পশ্চিমে গ্যালাপেগস দ্বীপগুলোতে বেশ কয়েকবার ঢুঁ মারাটাও যুগান্তকারী ভূমিকা রেখেছিল। বেশকিছু জিনিস সংগ্রহ করে ইংল্যান্ডে পাঠাতে পেরেছিলেন তিনি। তবে, প্রকৃতি আর প্রাণের বিবর্তন সম্পর্কে নিজের চিন্তা-ভাবনা তিনি কারও কাছে প্রকাশ করলেন না। সাতাশ বছর বয়সে বাড়ি ফিরে দেখলেন বিজ্ঞানী হিসেবে বিখ্যাত হয়ে গেছেন। একসময় যা তাঁর বিবর্তনবাদ বলে পরিচিতি লাভ করবে সে-সম্পর্কে সে-সময়ে তাঁর মনের মধ্যে একটা পরিষ্কার চিত্র ছিল। কিন্তু ফিরে আসার অনেক পরে সেটি প্রকাশ করেন তিনি, কারণ ডারউইন ছিলেন সতর্ক মানুষ, একজন বিজ্ঞানীর ঠিক যেমনটি হওয়া উচিত।

'তা, তাঁর প্রধান কাজ কী?'

'সত্যি বলতে কী, অনেক। কিন্তু ইংল্যান্ডে যে-বইটি সবচেয়ে উত্তপ্ত বিতর্কের জন্ম দিয়েছিল সেটি হচ্ছে ১৮৫৯ সালে প্রকাশিত *দি অরিজিন অভ স্পিসিজ*। বইটির পুরো নাম হচ্ছে *অন দি অরিজিন অভ স্পিসিজ বাই মিনস অভ ন্যাচরাল সিলেকশন, অর দ্য প্রিজার্ভেশন অভ ফেভারড রেইসেজ ইন দ্য স্ট্রাগল ফর লাইফ*। লম্বা নামটা আসলে ডারউইনের তত্ত্বের একটা পূর্ণ সার-সংক্ষেপ।'

'একটা নামের মধ্যে আসলে অনেক কিছু পুরে দিয়েছিলেন তিনি।'

'তবে সবটা একবারে না দেখে নামটার একেকটা অংশের দিকে নজর দেয়া যাক। প্রথমত, তিনি প্রস্তাব করলেন যে সব ধরনের উদ্ভিদ এবং প্রাণী উদ্ভূত হয়েছে পূর্বতন আরও আদিম নমুনাগুলো থেকে ক্রমোন্নতিমূলক বিবর্তনের মধ্য দিয়ে। দ্বিতীয়ত, তিনি বললেন, বিবর্তনটি *প্রাকৃতিক নির্বাচন*-এর ফল।'

'দ্য সারভাইভাল অভ দ্য ফিটেস্ট, ঠিক না?'

'সেটি ঠিক, তবে গোড়াতেই বিবর্তনের ধারণাটার ওপর একটু নজর দেয়া যাক। এটা কিন্তু একেবারে মৌলিক কোনো ধারণা নয়। জীববিজ্ঞান সংক্রান্ত বিবর্তনের ধারণা কোনো কোনো পরিমণ্ডলে বেশ সাদরেই গৃহীত হচ্ছিল সেই ১৮০০ সাল থেকে। এই ধারণাটির নেতৃস্থানীয় মুখপাত্র ছিলেন ফরাসি প্রাণীবিজ্ঞানী *লামার্ক* (Lamarck)। এমনকি তাঁরও আগে ডারউনের-ই দাদা *ইরাজমাস ডারউইন* (Erasmus Darwin) এ-রকম একটি কথা বলেছিলেন যে উদ্ভিদ এবং প্রাণীর উদ্ভব ঘটেছিল কিছু আদিম প্রজাতি থেকে। কিন্তু এই বিবর্তন কীভাবে হয়েছিল সে-ব্যাপারে এঁদের কেউই গ্রহণযোগ্য কোনো ব্যাখ্যা দিতে এগিয়ে আসেননি। কাজেই পাদ্রিরা

তাঁদেরকে বড় কোনো হুমকি বলে গণ্য করেনি।

'কিন্তু ডারউইন তাঁদের জন্য হুমকি ছিলেন বুঝি?'

'হ্যাঁ, তাই এবং সেটি বিনা কারণে নয়। যাজকীয় এবং বৈজ্ঞানিক মহলে উদ্ভিদ এবং প্রাণী জগতের সমস্ত প্রজাতির অপরিবর্তনীয়তার বাইবেলীয় মতই মানা হতো। প্রত্যেকটি প্রাণী জীবন আলাদা আলাদাভাবে একবারই এবং শেষবারের মতো তৈরি করা হয়েছে। খ্রিস্টীয় এই দৃষ্টিভঙ্গি অবশ্য প্লেটো আর অ্যারিস্টটলের মতবাদের সঙ্গেও সঙ্গতিপূর্ণ।'

'কীভাবে?'

'প্লেটোর ভাবতত্ত্বে ধরেই নেয়া হয়েছে যে সমস্ত প্রাণী প্রজাতি অপরিবর্তনীয়, কারণ সেগুলো তৈরি হয়েছে শাশ্বত ভাব বা আকারের ছবি বা নকশা অনুযায়ী। প্রাণী প্রজাতির অপরিবর্তনীয়তা অ্যারিস্টটলের দর্শনেরও একটি প্রধান স্তম্ভ। কিন্তু ডারউইনের সময় বেশ কিছু পর্যবেক্ষণ এবং আবিষ্কার প্রথাগত ধ্যান-ধারণাগুলোকে পরীক্ষার মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিচ্ছিল।'

'কোন ধরনের পর্যবেক্ষণ আর আবিষ্কার?'

'এই যেমন, প্রথমত, দিন দিন আগের চেয়ে বেশি পরিমাণে ফসিল খুঁড়ে তোলা হচ্ছিল। কিছু সামুদ্রিক প্রাণীর চিহ্ন স্থলভূমির অনেক ভেতরে আবিষ্কার করে ডারউইন নিজেও যারপরনাই অবাক হয়েছিলেন। দক্ষিণ আমেরিকাতেও তিনি একই ধরনের ব্যাপার আবিষ্কার করেছিলেন আন্দিজ পর্বতমালার অনেক উঁচু স্থানে। সামুদ্রিক প্রাণী আন্দিজে কী করে, সোফি, বলতে পারো আমাকে?'

'না।'

'কেউ কেউ বিশ্বাস করতেন যে ওগুলোকে মানুষ বা কোনো প্রাণী ওখানে ছুঁড়ে ফেলেছে। অন্যরা বিশ্বাস করতেন যে অধার্মিকদের পথভ্রষ্ট করার জন্য ঈশ্বরই এ-সব সামুদ্রিক প্রাণীগুলোর এ-সব ফসিল আর নানান চিহ্ন তৈরি করেছেন।'

'কিন্তু বিজ্ঞানীরা কী বিশ্বাস করতেন?'

'বেশির ভাগ ভূতত্ত্ববিদেরই একটা 'মহাবিপর্যয় তত্ত্ব'-তে প্রবল বিশ্বাস ছিল। আর সেই তত্ত্ব অনুযায়ী, পৃথিবী বেশ কিছু বন্যা, ভূমিকম্প এবং অন্যান্য মহাবিপর্যয়ের শিকার হয়েছিল যা সব ধরনের জীবন ধ্বংস করে ফেলেছিল। বাইবেলে এ-সবেরই একটির কথা পড়ি আমরা, মহাপ্লাবন আর নোয়ার নৌকা। প্রত্যেক বিপর্যয়ের পর ঈশ্বর পৃথিবীতে নতুন এবং আরও নিখুঁত উদ্ভিদ আর প্রাণী নতুন করে সৃষ্টি করেছেন।'

'তার মানে, ফসিলগুলো হচ্ছে এ-সব মহাবিপর্যয়ের পর আগেকার যেসব প্রাণী বিলুপ্ত হয়ে গেছে সেগুলোর রেখে যাওয়া চিহ্ন?'

'ঠিক তাই। যেমন ধরো, এ-রকমটা মনে করা হতো যে যে-সব প্রাণী নৌকোয় উঠতে পারেনি সেগুলোরই চিহ্ন হচ্ছে এই ফসিলগুলো। কিন্তু ডারউইন যখন *বীগল* নামের জাহাজে চেপে যাত্রা করলেন তখন তাঁর সঙ্গে ছিল ইংরেজ জীববিজ্ঞানী *স্যার চার্লস লিয়েল*-এর (Sir Charles Lyell) *প্রিন্সিপলস অভ্ জিওলজি*। লিয়েল মনে করতেন পাহাড়-পর্বত আর উপত্যকাসহ পৃথিবীর এই বর্তমান ভূতাত্ত্বিক অবস্থা এক অন্তহীন রকমের দীর্ঘ আর ধীর বিবর্তনের ফসল। তাঁর বক্তব্য ছিল, এ-পর্যন্ত কত শত

যুগ কেটে গেছে সে-কথা বিবেচনায় রেখে বলা যায় যে এমনকি নিতান্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিবর্তনও বিশাল ভূতাত্ত্বিক পরিবর্তন ঘটাতে পারে।'

'কোন ধরনের পরিবর্তনের কথা বলেছিলেন তিনি?'

'যে-ধরনের শক্তি আজো আমরা দেখতে পাই সেগুলোর কথাই বলছিলেন তিনি বাতাস আর আবহাওয়া, গলতে থাকা বরফ, ভূমিকম্প এবং ভূমিস্তরের বৃদ্ধিপ্রাপ্তি। তুমি হয়ত এক ফোঁটা পানির পাথর ক্ষয়ে ফেলার কথা শুনে থাকবে, তবে সেটি জান্তব কোনো শক্তির সাহায্যে নয় অনবরত ফোঁটায় ফোঁটায় পড়ে। লিয়েল বিশ্বাস করতেন যে বহু বছর ধরে ঘটা এ-ধরনের ছোট এবং ধীর পরিবর্তনগুলো প্রকৃতির রূপ পুরোপুরি পাল্টে দিতে পারে। তবে কেবল এই তত্ত্বটি দিয়ে এ-কথা ব্যাখ্যা করা গেল না যে ডারউইন সামুদ্রিক প্রাণীর দেহাবশেষ আন্দিজ পবর্তমালার অনেক উঁচুতে আবিষ্কার করেছিলেন কেন। কিন্তু ডারউইন এটা সব সময়ই মনে রেখেছিলেন যে সেই সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র *পরিবর্তন* নাটকীয় পরিবর্তন আনতে পারে যদি সেগুলোকে যথেষ্ট সময় দেয়া যায়।'

'আমার মনে হয় প্রাণীর বিবর্তনের ক্ষেত্রেও একই ব্যাখ্যা দেয়া যেতে পারে।'

'হ্যাঁ। তিনিও সে-রকমই ভেবেছিলেন। আমি আগেই বলেছি ডারউইন ছিলেন খুবই সতর্ক মানুষ। উত্তর দেবার চেষ্টা করার অনেক আগেই প্রশ্নগুলো করেছিলেন তিনি। সে-অর্থে তিনি সমস্ত প্রকৃত দার্শনিকের পদ্ধতি-ই ব্যবহার করেছিলেন প্রশ্ন করা জরুরি, কিন্তু সেটির উত্তর দেবার জন্য তাড়াহুড়ো করার কোনো প্রয়োজন নেই।'

'হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছি।'

'লিয়েল-এর তত্ত্বের একটি যুগান্তকারী ব্যাপার ছিল পৃথিবীর বয়স। ডারউইনের সময় অনেকেই বিশ্বাস করত যে ঈশ্বর পৃথিবী তৈরি করার পর প্রায় ৬,০০০ বছর পার হয়ে গেছে। অ্যাডাম আর ঈভ্-এর পরের প্রজন্মগুলো হিসাব করে এই অঙ্কটা বের করেছিল তারা।'

'কী বোকা!'

'ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর জ্ঞানী হওয়া কিন্তু খুব সহজ। ডারউইন-এর হিসেব মতে পৃথিবীর বয়স ৩০ কোটি বছর। কারণ, অন্তত একটা ব্যাপার স্পষ্ট ছিল খুব লিয়েল-এর ধীর ভূতাত্ত্বিক বিবর্তন বা ডারউইনের নিজস্ব বিবর্তনের তত্ত্ব, কোনোটিই ধোপে টেকে না যদি না অসম্ভব রকমের লম্বা সময়কে হিসাবের মধ্যে ধরা হয়।'

'পৃথিবীর বয়স কত?'

'আজ আমরা জানি যে পৃথিবীর বয়স ৪.৬ বিলিয়ন বছর।'

'ওরেব্বাবা!'

'এ-পর্যন্ত আমরা জীববিজ্ঞানসংক্রান্ত বিবর্তনের পক্ষে ডারউইনের যুক্তিগুলোর একটির দিকে নজর দিয়েছি যা হলো পাথরের বিভিন্ন স্তরে *ফসিলের স্তরীভূত সঞ্চয়*। আরেকটি যুক্তি হলো জীবন্ত প্রজাতিগুলোর *ভৌগোলিক বন্টন*। আর এই জায়গাটিতেই ডারউইনের বৈজ্ঞানিক অভিযাত্রা নতুন আর অত্যন্ত ব্যাপক উপাত্ত যোগাতে পেরেছিল। তিনি তাঁর নিজের চোখে দেখেছেন যে একই এলাকায় একটি প্রজাতির বিভিন্ন প্রাণীর মধ্যে খুবই সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম তফাৎ থাকতে পারে। বিশেষ করে ইকুয়েডরের পশ্চিমে

গ্যালাপেগস দ্বীপগুলোতে খুবই মজার কিছু ব্যাপার লক্ষ করেন তিনি।'

'বলুন না সেগুলোর কথা।'

'গ্যালাপেগস দ্বীপগুলো কিছু নিবিড় আগ্নেয় দ্বীপের একটি দল। কাজেই সেখানকার উদ্ভিদ এবং প্রাণীগুলোর মধ্যে তেমন কোনো বড় পার্থক্য নেই। কিন্তু ডারউইন আগ্রহী ছিলেন ছোট ছোট পার্থক্যের ব্যাপারে। তো, সবকটি দ্বীপেই তিনি দৈত্যাকার কিছু কচ্ছপের দেখা পেলেন যেগুলো দ্বীপভেদে সামান্য হলেও অন্যরকম। তাহলে কি একক দ্বীপের জন্য ঈশ্বর ভিন্ন প্রজাতির কচ্ছপ তৈরি করেছিলেন?'

'সে-ব্যাপারে সন্দেহ আছে।'

'গ্যালাপেগসের পাখিদের জীবনধারা সম্পর্কে ডারউইনের পর্যবেক্ষণ তো আরও আকর্ষণীয়। গ্যালাপেগস ফিন্‌শ্ নামের পাখিগুলো এক দ্বীপ থেকে অন্য দ্বীপে স্পষ্টতই অন্যরকম, বিশেষ করে ঠোঁটের গড়নের দিক দিয়ে। ডারউইন দেখালেন যে এই বিভিন্নতা নানান দ্বীপে ফিন্‌শ্‌গুলো যেভাবে তাদের খাবার সংগ্রহ করে তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত । গির্জার চূড়ার মতো সরু পাশওয়ালা মেঠো ফিনশের প্রধান খাদ্য পাইন গাছের মোচাকৃতি ফলের বীজ, ছোট ছোট ওয়ার্বলার ফিন্‌শ্ বাঁচে পোকামাকড় খেয়ে আর গেছো ফিন্‌শ্ গাছের বাকল ও ডালপালা খুঁটে বের-করা উইপোকা খেয়ে...। প্রজাতিগুলোর প্রত্যেকটি পাখিরই রয়েছে সেটির গ্রহণ-করা খাদ্যের সঙ্গে পুরোপুরি মানানসই ঠোঁট। এইসব ফিন্‌শ্ কি একটিই মাত্র প্রজাতি থেকে এসেছে? এবং সেই ফিন্‌শ্‌গুলো কি যুগ যুগ ধরে বিভিন্ন দ্বীপে তাদের পরিবেশের সঙ্গে এমনভাবে নিজেদের মানিয়ে নিয়েছে যাতে করে নতুন প্রজাতির ফিন্‌শ্-এর উদ্ভব ঘটতে পারে?'

'ডারউইন নিশ্চয়ই সেই সিদ্ধান্তেই পৌঁছেছিলেন, তাই না?'

'হ্যাঁ। সম্ভবত ওখানেই-গ্যালাপেগস দ্বীপপুঞ্জেই-ডারউইন 'ডারউইনবাদী' হয়ে উঠেছিলেন। তিনি আরও লক্ষ করেছিলেন যে ওখানকার প্রাণীকুলের সঙ্গে দক্ষিণ আমেরিকায় তাঁর দেখা নানান প্রজাতির সঙ্গে অসম্ভব মিল রয়েছে। সত্যি সত্যিই কি ঈশ্বর এ-সমস্ত প্রাণীকে পরস্পরের থেকে খানিকটা ভিন্ন হিসেবে একবারেই তৈরি করেছিলেন, নাকি কোনো বিবর্তন ঘটেছিল? সব প্রজাতিই অপরিবর্তনীয় এ-ব্যাপারে ক্রমেই সন্দেহ বাড়তে থাকে ডারউইনের। কিন্তু এ-ধরনের একটা বিবর্তন কী করে ঘটল সে-বিষয়ে তখনও তাঁর কাছে সে-রকম গ্রহণযোগ্য কোনো ব্যাখ্যা ছিল না। তবে পৃথিবীর সমস্ত প্রাণীর মধ্যেই যে একটা সম্পর্ক রয়েছে সে-রকম ইঙ্গিত দেয়ার মতো আরেকটি বিষয় রয়েছে।'

'কী সেটি?'

'স্তন্যপায়ী প্রাণীদের ভ্রূণের বিকাশ। যদি তুমি কুকুর, বাদুড়, খরগোশ আর মানব ভ্রূণের প্রাথমিক অবস্থায় সেগুলোর মধ্যে তুলনা কর তাহলে দেখবে দেখতে সেগুলো এতোটাই একরকম যে কোনটি কিসের ভ্রূণ সেটি বলা শক্ত। বেশ পরিণত অবস্থার আগ পর্যন্ত তুমি বলতে পারবে না কোনটি মানব ভ্রূণ আর কোনটি খরগোশের। এর থেকেই কি এটা বোঝা যায় না যে আমরা দূরবর্তী স্বজন?'

'কিন্তু এই বিবর্তনটি কী করে ঘটল সেটির ব্যাখ্যা কি তখনো তাঁর কাছে ছিল না?'

'দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পরিবর্তন বড়সড় পার্থক্য ঘটাতে পারে এই মর্মে লিয়েল যে-তত্ত্ব দিয়েছিলেন সেটি নিয়ে ক্রমাগত ভেবে যাচ্ছিলেন ডারউইন। কিন্তু সাধারণ একটি নীতি বা নিয়ম হিসেবে কাজ করবে এ-রকম কোনো ব্যাখ্যা বের করতে পারছিলেন না তিনি। ফরাসি প্রাণীবিদ লামার্ক-এর তত্ত্বের কথা জানা ছিল তাঁর আর এই তত্ত্ব অনুযায়ী, বিভিন্ন প্রজাতি তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের বিকাশ ঘটিয়েছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, জিরাফ লম্বা গলার বিকাশ ঘটিয়েছে কারণ প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে তারা গাছের পাতা খাওয়ার জন্য গলা বাড়িয়ে দিয়েছে। লামার্ক মনে করতেন যে প্রতিটি প্রাণী নিজের চেষ্টায় যেসব বৈশিষ্ট্য অর্জন করে সেগুলো পরবর্তী প্রজন্মে চালিয়ে যায়। কিন্তু বংশগতির এই 'অর্জিত বৈশিষ্ট্যের' সূত্র ডারউইন প্রত্যাখ্যান করলেন, কারণ এতো বড় একটি দাবির পক্ষে লামার্ক কোনো প্রমাণ দেখাতে পারেননি। অবশ্য ডারউইন আরেকটি আরও বেশি সুস্পষ্ট একটি চিন্তাধারা ধরে এগোতে শুরু করেছিলেন। এক হিসেবে তুমি বলতে পারো যে বিভিন্ন প্রজাতির বিবর্তনের আসল মেকানিজমটা একেবারে তার নাকের ডগাতেই দাঁড়িয়ে ছিল।'

'তা, কী সেটি?'

'আমি বরং চাই তুমি নিজেই সেটি বের কর। সেজন্যই আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করছি: ধরো তোমার তিনটে গরু আছে, কিন্তু দুটোর বেশি গরুকে খাওয়ানোর মতো পশুখাদ্য নেই, এ-অবস্থায় তুমি কী করবে?'

'আমার মনে হয় তখন একটি গরুকে জবাই করে ফেলতে হবে আমাকে।'

'বেশ...কিন্তু কোনটাকে জবাই করবে তুমি?'

'মনে হয়, যেটা সবচেয়ে কম দুধ দেয় সেটিকে।'

'তাই?'

'হ্যাঁ, সেটিই তো যুক্তিযুক্ত, তাই না?'

'ঠিক এই কাজটাই হাজার হাজার বছর ধরে করে এসেছে মানুষ। তবে তোমার ওই দুই গরুর কাহিনী এখনো শেষ হয়নি। ধরো, তোমার ইচ্ছে হলো এই দুটো গরুর মধ্যে একটার বাছুর হওয়ানো দরকার। কোনটাকে বেছে নিতে তুমি?'

'যেটা সবচেয়ে বেশি দুধ দেয়। তাতে করে সেটির বাছুরও হয়ত বেশি দুধ দিতো।'

'তার মানে, যেটা বেশি দুধ দেয় সেটিই তোমার বেশি পছন্দের গরু। এবার আরও একটা প্রশ্ন। তুমি যদি একজন শিকারী হতে আর তোমার দুটো গানডগ থাকতো, তাহলে সেই দুটোর মধ্যে একটাকে অন্য কাউকে দিয়ে দিতে হলে নিজের জন্য কোন কুকুরটা রাখতে তুমি?'

'আমি যে-ধরনের প্রাণী শিকার করি সেগুলো খুঁজে আনায় যেটা সেরা সেটিই নিশ্চয়ই রেখে দিতাম।'

'ঠিক তাই, দুটো গানডগের মধ্যে যেটা ভালো সেটির প্রতিই পক্ষপাত দেখাতে তুমি। ঠিক এভাবেই দশ হাজার বছরেরও বেশি সময় ধরে লোকে গৃহপালিত জীব-জন্তুর বংশবৃদ্ধি ঘটিয়েছে, সোফি। মুরগি চিরকাল সপ্তাহে পাঁচ দিন ডিম দেয়নি, ভেড়া

সব সময় এতো উল দিতো না আর ঘোড়া আজ যেমন শক্তিশালী ও দ্রুতগামী তেমনটা সে সব সময় ছিল না। ব্রিডাররা একটা *কৃত্রিম নির্বাচন* করেছে। উদ্ভিদ রাজ্যের বেলাতেও একই কথা প্রযোজ্য। ভালো আলু বীজ থাকতে খারাপ আলু কেউ রোপণ করে না এবং যে-গম গাছে শস্যদানা নেই সেটি কেটে সময়ও নষ্ট করে না কেউ। ডারউইন বললেন দুটো গরু, গমের দুটো ছড়া, দুটো কুকুর এবং দুটো ফিন্‌শ্‌ পাখি কখনোই পুরোপুরি একরকম হতে পারে না। প্রকৃতিই এক বিপুল বৈচিত্র্যের বিস্তার তৈরি করে। এমনকি একই প্রজাতির দুই সদস্য কখনো পুরোপুরি এক নয়। সম্ভবত তুমি নিজেও সেটি বুঝতে পেরেছো যখন নীল তরলটা খেলে তখন।'

'ঠিক।'

'তো, ডারউইন এবার নিজেকেই প্রশ্ন করলেন প্রকৃতিতেও কি তাহলে একই পদ্ধতি কাজ করছে? এটা কি সম্ভব যে কোন সদস্য বাঁচবে সেটি ঠিক করতে প্রকৃতি একটা 'প্রাকৃতিক নির্বাচন' করে? আর, বহুদিনব্যাপী এ-ধরনের একটি নির্বাচন কি নতুন প্রজাতির উদ্ভিদ এবং প্রাণী সৃষ্টি করতে পারে?'

'আমার মনে হয় প্রশ্নটার উত্তর হচ্ছে 'হ্যাঁ'।'

'ডারউইন তখনো ভেবে উঠতে পারেননি এ-রকম একটি 'প্রাকৃতিক নির্বাচন' ঠিক কীভাবে ঘটতে পারে। কিন্তু ১৮৩৮-এর অক্টোবরে, *বীগল* জাহাজে ফেরার ঠিক দুই বছর পর, ঘটনাক্রমে, জনসংখ্যা বিষয়ক বিদ্যায় বিশেষজ্ঞ *টমাস ম্যালথাসের* (Thomas Malthus) একটা ছোট্ট বই তাঁর নজরে আসে। বইটির নাম *অ্যান এসে অন দ্য প্রিন্সিপাল অভ্ পপিউলেশন*। রচনাটির আইডিয়া ম্যালথাস পেয়েছিলেন *বেঞ্জামিন ফ্র্যাংকলিনের* (Benjamin Franklin) কাছ থেকে। সেই আমেরিকান ভদ্রলোকের কাছ থেকে যিনি অন্যান্য অনেক জিনিসের সঙ্গে লাইটনিং কন্ডাক্টর-ও আবিষ্কার করেছিলেন। ফ্র্যাংকলিন মন্তব্য করেছিলেন যে প্রকৃতিতে যদি নিয়ন্ত্রক কোনো উপাদান (limiting factor) না থাকতো তাহলে উদ্ভিদ বা প্রাণীর একটি প্রজাতিই ছড়িয়ে পড়তো গোটা বিশ্বে। কিন্তু অনেক প্রজাতি থাকায় সেগুলো একটি আরেকটির ভারসাম্য বজায় রাখে।'

'সেটি বুঝতে পারি।'

'ম্যালথাস এই ধারণাটিরই বিকাশ ঘটিয়ে সেটিকে জনসংখ্যার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে সন্তান উৎপাদনের ক্ষমতা মানুষের এতো বেশি যে যত শিশু বেঁচে থাকতে পারে, সব সময় তারচেয়ে বেশি শিশু জন্মগ্রহণ করে। খাদ্য উৎপাদন যেহেতু কখনোই জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলতে পারে না, তাই তিনি মনে করতেন যে অসংখ্য শিশু যে মৃত্যুমুখে পতিত হবে সেটিই নিয়তি নির্দিষ্ট। যারা বড় হওয়ার জন্য বেঁচে রয়েছিল—এবং সেই সঙ্গে জাতিটিকে বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করেছিল—তারাই অতএব অস্তিত্বের লড়াইয়ে সবার সেরা।'

'এটাই তো যুক্তিযুক্ত শোনাচ্ছে।'

'আসলে কিন্তু এটাই ছিল সেই সার্বজনীন মেকানিজম ডারউইন যার খোঁজ করছিলেন। বিবর্তন কীভাবে ঘটে তার ব্যাখ্যা ছিল এখানেই। আর সেটি হলো এই যে, বিবর্তনটা ঘটেছিল জীবন রক্ষার সংগ্রামে *প্রাকৃতিক নির্বাচনের* কারণে, যে-সংগ্রামে

তারাই বেঁচে থাকবে এবং নিজেদের জাতিকে বাঁচিয়ে রাখতে পারবে যারা তাদের পরিপার্শ্বের সঙ্গে সবচেয়ে ভালোভাবে খাপ খাওয়াতে পারবে। এটা ছিল *দি অরিজিন অভ্ স্পিশিজে* উপস্থাপন করা তাঁর দ্বিতীয় তত্ত্ব। তিনি লেখেন 'পরিচিত সমস্ত প্রাণীর মধ্যে হাতিকেই সবচেয়ে ধীরগতিসম্পন্ন বংশবৃদ্ধিকারী হিসেবে গণ্য করা হয়,' কিন্তু এটার যদি দুটো শাবক থাকে এবং সেগুলো একশো বছর বাঁচে তাহলে '৭৪০ থেকে ৭৫০ বছর পরে প্রথম জোড়া থেকে জন্ম নেয়া জীবিত হাতির সংখ্যা গিয়ে দাঁড়াবে প্রায় এক কোটি নব্বই লাখ।'

'একটা কডমাছের হাজার হাজার ডিমের কথা তো বলাই বাহুল্য।'

'ডারউইন এরপর যে-প্রস্তাবনাটা উপস্থাপন করলেন তা হলো, যে-প্রজাতির সদস্যরা দেখতে সবচেয়ে একরকম তাদের পক্ষে এই টিকে থাকার সংগ্রামটা প্রায়শই সবচেয়ে কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। একই খাদ্যের জন্য যুদ্ধ করতে হয় তাদের। সেখানে সামান্যতম সুবিধাও, এই যেমন সূক্ষাতিসূক্ষ্ম তফাৎ, সেটির পুরো প্রাপ্য পায়। বেঁচে থাকার সংগ্রাম যত তীব্র হবে, নতুন প্রজাতির বিবর্তন ততো তাড়াতাড়ি হবে। আর তাতে করে, সবচেয়ে ভালোভাবে খাপ খাইয়ে নিতে পেরেছে যে সে-ই টিকে যাবে, বাকিরা যাবে বিলুপ্ত হয়ে।'

'খাবার যত কম থাকবে আর প্রজাতিটি যত বড় হবে ততো তাড়াতাড়ি বিবর্তন ঘটবে?'

'হ্যাঁ। কিন্তু এটা শুধু খাবারের প্রশ্ন নয়। অন্য প্রাণীর খাদ্যে পরিণত না হওয়াটাও ঠিক একই রকমের গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। এই যেমন ধরো, সুরক্ষা বা নিরাপত্তামূলক ছদ্মাবরণ থাকা, দ্রুত দৌড়াতে পারা, শত্রু প্রাণী চিনতে পারা, কিংবা শেষ পর্যন্ত চরম খারাপ অবস্থাটা যদি এসেই পড়ে, নিজের একটা অরুচিকর স্বাদ থাকা। শিকারী প্রাণীদের মেরে ফেলতে পারে এমন বিষ থাকাটাও বেশ কাজের কিন্তু। এই জন্যই অসংখ্য ক্যাকটাস বিষাক্ত, বুঝলে সোফি। বস্তুত মরুভূমিতে প্রায় কিছুই জন্মাতে পারে না, তাই বিশেষত এই প্রজাতিটি উদ্ভিদভোজী প্রাণীর কাছে বেশ অসহায়।'

'বেশিরভাগ ক্যাকটাসেরই অবশ্য কাঁটাও আছে।'

স্পষ্টতই, বংশবৃদ্ধি করার ক্ষমতাটাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। উদ্ভিদের পরাগায়নের উদ্ভাবনী দক্ষতার ব্যাপারটিও ডারউইন বেশ বিস্তারিতভাবে পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। যে-সব পোকা-মাকড় পরাগায়নের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সেগুলোকে আকৃষ্ট করার জন্য ফুল উজ্জ্বল রঙ নিয়ে জ্বলজ্বল করে আর মতিচ্ছন্নকারী সুবাস ছড়ায়। নিজের প্রজাতিকে দীর্ঘস্থায়ী করতে পাখি সুরেলা কণ্ঠে ডাকে। গাভীর প্রতি কোনো আকর্ষণহীন শান্ত-শিষ্ট বা বিষণ্ন কোনো ষাঁড়ের যে বংশতালিকা সম্পর্কেও আগ্রহ থাকবে না সে তো বলাই যায়, কারণ এ-রকম বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হলে সেটির বংশ হঠাৎ করে বিলুপ্ত হয়ে যাবে। ষাঁড়ের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে যৌন পরিপক্কতা অর্জন করা এবং নিজের প্রজাতিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য বংশবৃদ্ধি করে চলা। এটা একটা রিলে রেসের মতো ব্যাপার। যারা কোনো না কোনো কারণে তাদের জিন চালিয়ে দিতে পারে না তারা ক্রমাগতভাবে বাদ পড়তে থাকে আর এভাবেই প্রজাতিটি পরিশুদ্ধ হতে থাকে। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও অনেক গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের একটি যা

টিকে থাকা ভিন্নরূপটির মধ্যে ক্রমাগতভাবে জমা হতে থাকে, সংরক্ষিত হতে থাকে।'

'তার মানে সবকিছুই আরও ভালো হতে থাকে?'

'এই নিরন্তর নির্বাচনের ফল হচ্ছে এই যে যারা একটি *বিশেষ পরিবেশের* বা বিশেষ ইকলজিকাল স্থানের সঙ্গে সবচেয়ে ভালোভাবে খাপ খাইয়ে নিতে পারবে তারাই দীর্ঘমেয়াদে সেই পরিবেশে নিজেদের প্রজাতিকে টিকিয়ে রাখতে পারবে। কিন্তু এক পরিবেশে যা সুবিধা অন্য পরিবেশে তা না-ও হতে পারে। কিছু কিছু গ্যালাপেগস ফিনশ্-এর জন্য উড়তে পারাটা ছিল খুবই জরুরি। কিন্তু খাবার যদি মাটির ভেতর থেকে খুঁড়ে খেতে হয় এবং কোনো শিকারী প্রাণী না থাকে তাহলে ওড়ার ব্যাপারে ভালো হওয়াটা তেমন একটা দরকারী ব্যাপার নয়। এই দীর্ঘ সময়ে কেন এতোগুলো বিভিন্ন প্রাণী প্রজাতির উদ্ভব ঘটেছে তার ঠিক ঠিক কারণ হচ্ছে প্রাকৃতিক পরিবেশের এই অসংখ্য একান্ত স্থান।'

'কিন্তু তারপরেও, মানব জাতি কিন্তু একটাই।'

'তার কারণ হলো জীবনের নানান পরিবেশে মানিয়ে নেয়ার একটা অনন্যসাধারণ গুণ আছে মানুষের। ডারউইনকে যে-সব ব্যাপার সবচেয়ে অবাক করেছিল তার মধ্যে একটা হচ্ছে টিয়েরা ডেল ফিউগোতে ইন্ডিয়ানদের এতো ভয়ঙ্কর আবহাওয়ার মধ্যেও বেঁচে থাকাটা। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে সব মানুষই এক রকম। যারা বিষুবরেখার কাছাকাছি বাস করে তাদের চামড়ার রঙ উত্তরাঞ্চলের মানুষের চেয়ে কালো, তার কারণ কালো চামড়া তাদেরকে সূর্যের তাপ থেকে রক্ষা করে। যে-সব শ্বেতাঙ্গ দীর্ঘ সময়ের জন্য সূর্যালোকে থাকে তাদের ক্যান্সার হওয়ার আশঙ্কা বেশি।'

'উত্তরের দেশগুলোতে থাকলে সাদা চামড়ায় কি একই সুবিধা পাওয়া যায়?'

'হ্যাঁ, নইলে দুনিয়ার সবার গায়ের চামড়াই কালো হতো। সাদা চামড়া খুব তাড়াতাড়ি সান ভিটামিন তৈরি করে এবং যেখানে সূর্য প্রায় দেখাই যায় না সেখানে এই ব্যাপারটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তবে ইদানীং আর ব্যাপারটা অতটা গুরুত্বপূর্ণ নেই, তার কারণ আমাদের খাদ্যের ভেতরেই যাতে সান ভিটামিন থাকে সে-ব্যাপারটা আমরা নিশ্চিত করতে পারি। কিন্তু প্রকৃতির কোনো কিছুই আকস্মিক নয়। প্রতিটি জিনিস-ই অগুনতি প্রজন্ম ধরে ঘটা অসংখ্য পরিবর্তনের ফল।'

'ব্যাপারটা চিন্তা করলে সত্যিই খুব আশ্চর্য লাগে।'

'সত্যিই তাই। তো, এবার আমরা কয়েকটা কথায় ডারউইনের তত্ত্বের একটি সার সংক্ষেপ দাঁড় করাতে পারি।'

'বলে যান।'

'আমরা বলতে পারি যে পৃথিবীতে প্রাণের বিবর্তনের পেছনে 'কাঁচামাল' বা 'রসদ' ছিল একই প্রজাতির ভেতর প্রাণী বিশেষের নিরন্তর *বৈচিত্র্য* আর সেই সঙ্গে *বহুসংখ্যক বংশধর*, যার অর্থ হচ্ছে এদের ভগ্নাংশমাত্রের বেঁচে থাকা বা টিকে থাকা। বিবর্তনের পেছনের প্রকৃত 'মেকানিজম' বা অনুপ্রেরণা তাই বেঁচে থাকার সংগ্রামে *প্রাকৃতিক নির্বাচন*। এই নির্বাচনই এটা নিশ্চিত করেছে যে সবচেয়ে শক্তিশালী বা 'যোগ্যতম'-ই টিকে থেকেছে।'

'ব্যাপারটা অঙ্কের মতোই লজিকাল। তা, *অরিজিন অভ্ দ্য স্পিশিজ* বইটাকে

লোকে কীভাবে নিয়েছিল?'

'তিক্ত বিতর্কের জন্ম দিয়েছিল বইটা। চার্চতো প্রচণ্ডভাবে প্রতিবাদ জানিয়েছিল আর বিজ্ঞান জগৎও বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল পরিষ্কার দুটো শিবিরে। সেটি অবশ্য আশ্চর্যের কিছু নয়। শত হলেও, সৃষ্টির ব্যাপারটা থেকে ঈশ্বরকে অনেক দূরে সরিয়ে এনেছিলেন ডারউইন, অবশ্য কিছু কিছু লোক এ-কথা স্বীকার করেছিলেন যে একটি নির্দিষ্ট সত্তা তৈরি করার চেয়ে নিজস্ব সহজাত বিবর্তনমূলক সম্ভাবনাসম্পন্ন কিছু তৈরি করাটা নিশ্চয়ই আরও বেশি মহৎ বা বড় কাজ।'

হঠাৎ চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠল সোফি।

'ওই যে দেখুন!' চেঁচিয়ে উঠল সে।

জানলার বাইরের দিকে আঙুল তুলে দেখাল সে। লেকের পাশে একটি পুরুষ আর একটি নারী হাত ধরাধরি করে হাঁটছে। একেবারে নগ্ন তারা।

'ওরা হচ্ছে অ্যাডাম আর ঈভ,' অ্যালবার্টো বললেন। 'ওরা-ও ধীরে ধীরে বাধ্য হয়েছে ছোট্ট রেড রাইডিংহুড আর এলিস ইন ওয়ান্ডারল্যান্ডের সঙ্গে নিজেদের ভাগ্যকে জড়াতে। সেজন্যই এখানে দেখা যাচ্ছে ওদের।'

ওরা কী করে তা দেখার জন্য জানালার কাছে চলে এলো সোফি, কিন্তু শিগ্‌গিরই গাছগুলোর ভেতরে হারিয়ে গেল তারা।

'তার কারণ কি এই যে জীব-জন্তু থেকেই মানুষের উদ্ভব হয়েছে বলে ডারউইন বিশ্বাস করতেন?'

'১৮৭১-এ প্রকাশিত হয় ডারউইনের *দ্য ডিসেন্ট অভ্ ম্যান*। এই বইটিতে তিনি মানুষ আর জীব-জন্তুর মধ্যে প্রবল সাদৃশ্যের দিকে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। প্রচার করেন এই তত্ত্ব যে মানুষ আর নরাকার বানর নিশ্চয়ই কোনো একসময় একই পূর্ব-পুরুষ থেকে উদ্ভূত হয়েছিল। এরই কাছাকাছি সময়ে, বিলুপ্ত এক ধরনের মানুষের ফসিলে পরিণত হওয়া খুলি প্রথমবারের মতো পাওয়া গেল, প্রথমে রক অভ্ জিব্রাল্টারে আর তার কিছুদিন পর জার্মানির নিয়াভারথালে। অবাক করা ব্যাপার হলো ১৮৫৯-এ ডারউইন যখন *দি অরিজিন অভ্ স্পিশিজ* প্রকাশ করেছিলেন তখন প্রতিবাদের যে-রকম ঢেউ উঠেছিল তার চেয়ে ১৮৭৯-এ কিন্তু প্রতিবাদ অনেক কম শোনা গেল। অথচ জীব-জন্তু থেকে মানুষের উদ্ভূত হওয়ার ব্যাপারটি কিন্তু প্রথম বইতেও প্রচ্ছন্নভাবে বলা ছিল। আর, আমি তো আগেই বলেছি, ১৮৮২-তে ডারউইন যখন মারা যান তখন বিজ্ঞানের একজন পথিকৃতের যথাযোগ্য মর্যাদায় তাঁকে সমাহিত করা হয়।'

'তো, শেষ পর্যন্ত তাহলে সম্মান এবং মর্যাদা পেয়েছিলেন তিনি?'

'হ্যাঁ, শেষ পর্যন্ত। কিন্তু তার আগে তাঁকে অবশ্য ইংল্যান্ডের সবচেয়ে বিপজ্জনক মানুষ বলেও বর্ণনা করা হয়েছিল।'

'বলেন কী!'

'আশা করা যাক ব্যাপারটা সত্যি নয়,' উচ্চবিত্ত শ্রেণীর এক মহিলা লিখছেন। 'তবে যদি সত্যি হয় তাহলে আশা করা যাক কথাটা সাধারণ মানুষ জানবে না।' বিশিষ্ট একজন বিজ্ঞানীও একই রকম মত প্রকাশ করলেন, 'একটা বিব্রতকর আবিষ্কার, এটা সম্পর্কে যত কম বলা যায় ততোই মঙ্গল।' '

'মানুষ যে উট পাখির আত্মীয় সেটিই তো প্রায় প্রমাণ হয়ে যাচ্ছে এই ঘটনায়।'

'ভালো বলেছ। তবে আমাদের পক্ষে এ-সব কথা এখন বলা খুব সহজ। অথচ তখন কিন্তু হঠাৎ করেই লোকজনকে বুক অভ্ জেনেসিস সম্পর্কে তাদের ধারণা পাল্টাতে বলা হলো। তরুণ লেখক জন রাসকিন ব্যাপারটাকে এভাবে উপস্থাপন করলেন 'শুধু যদি ভূ-তত্ত্ববিদরা আমাকে একা থাকতে দিতো। বাইবেলের প্রতিটি চরণের পরেই আমি তাদের হাতুড়ির আঘাতের শব্দ শুনতে পাই।'

'আর সেই হাতুড়ির বাড়ির শব্দের মানে ছিল ঈশ্বরের বাণীর ব্যাপারেই তাঁর সন্দেহ, তাই না?'

'খুব সম্ভব সেটিই বুঝিয়েছিলেন তিনি। কারণ শুধু যে সৃষ্টির আক্ষরিক ব্যাখ্যাই ভারসাম্যহীন হয়ে পড়েছিল তা নয়। ডারউইনের তত্ত্বের সারবস্তু ছিল এই যে পুরোপুরি এলোপাতাড়ি বৈচিত্র্য-ই শেষ পর্যন্ত মানুষ সৃষ্টি করেছিল। আর তাছাড়া, ডারউইন মানুষকে অস্তিত্বের জন্য লড়াইয়ের মতো অনুভূতিহীন একটা কিছুর সৃষ্টি বলে প্রতিপন্ন করেছিলেন।'

'এ-রকম এলোপাতাড়ি বৈচিত্র্যগুলোর উদ্ভব কীভাবে হলো সে-সম্পর্কে ডারউইন কিছু বলেছেন?'

'তত্ত্বটার সবচেয়ে দুর্বল জায়গায় হাত দিয়েছো তুমি। বংশগতি সম্পর্কে ডারউইনের ধারণা ছিল নেহাতই আবছা ধরনের। সংকর উৎপাদনের সময় একটা কিছু ঘটে। একজন বাবা আর একজন মা কখনো একেবারে তাঁদের মতো দুটো সন্তান পান না। সামান্য তফাৎ সব সময়ই থাকে। অন্য দিকে, এইভাবে আসলেই নতুন কিছু তৈরি করা কিন্তু বেশ কঠিন। তাছাড়া, কিছু কিছু উদ্ভিদ এবং প্রাণী রয়েছে যারা পরাগায়ন অথবা স্রেফ কোষ বিভাজনের মাধ্যমে বংশবৃদ্ধি করে। বিভিন্নতা বা বৈচিত্র্য কীভাবে ঘটে সে-ব্যাপারে ডারউইনের তত্ত্বকে প্রতিস্থাপিত করেছে তথাকথিত নব্য-ডারউইনবাদ।'

'সেটি আবার কী?'

'সমস্ত জীবন আর বংশবৃদ্ধিই মূলত কোষ বিভাজনের ব্যাপার। একটি কোষ যখন দুটি কোষে বিভক্ত হয় তখন ঠিক একই বংশগত উপাদান নিয়ে তৈরি হয় হুবহু একই রকমের দুটো কোষ। তার মানে, কোষ বিভাজন প্রক্রিয়ায় একটি কোষ নিজেরই প্রতিরূপ তৈরি করে।'

'আচ্ছা?'

'কিন্তু মাঝে মধ্যে এই প্রক্রিয়াতে ঘটে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অগুনতি ভুল। তাতে করে অনুরূপ কোষটি মূল কোষটির অবিকল প্রতিরূপ হতে পারে না। আধুনিক জীববিজ্ঞানের ভাষায় একে বলে *মিউটেশন* বা পরিব্যক্তি। হয় মিউটেশনগুলো পুরোপুরি অবান্তর আর নয়ত সেগুলো ব্যক্তি বিশেষের আচার-ব্যবহারের লক্ষণীয় পরিবর্তন ঘটাতে পারে। একেবারে ক্ষতিকরও হতে পারে তা আর তাছাড়া এই 'মিউট্যান্টগুলো' বড় বড় বংশধরদের মধ্যে থেকে ক্রমাগতভাবে বাদ পড়তে থাকবে। অনেক অসুখেরই কারণ আসলে মিউটেশন। তবে মাঝে মাঝে একটা মিউটেশন বিশেষ কোনো প্রজাতির বিশেষ একটি সদস্যকে ঠিক সেই বাড়তি ইতিবাচক বৈশিষ্ট্যটি

দান করতে পারে যা বেঁচে থাকার সংগ্রামে নিজের বৈশিষ্ট্যকে টিকিয়ে রাখার জন্য জরুরি।'

'এই যেমন অপেক্ষাকৃত বড় একটা গলা, তাই না?'

'জিরাফের গলা লম্বা কেন সে-সম্পর্কে লামার্কের ব্যাখ্যা ছিল এই যে জিরাফকে সব সময়ই ওপরের দিকে গলা বাড়াতে হয়েছে। কিন্তু ডারউইনের মতবাদ অনুযায়ী এ-ধরনের কোনো বৈশিষ্ট্য উত্তরাধিকার সূত্রে পরের প্রজন্ম পাবে না। ডারউইন বিশ্বাস করতেন যে জিরাফের লম্বা গলা একটা ভিন্নতা বা বৈচিত্র্যের ফল। নব্য-ডারউইনবাদ এই বিশ্বাসটির ত্রুটি দূর করল ঠিক ওই বিশেষ ভিন্নতার একটা পরিষ্কার কারণ দেখিয়ে দিয়ে।'

'মিউটেশন?'

'হ্যাঁ।'

'বংশগত উপাদানগুলোতে পুরোপুরি এলোপাতাড়ি কিছু পরিবর্তন জিরাফের কোনো এক পূর্বপুরুষকে গড়পড়তা গলার চেয়ে সামান্য লম্বা একটা গলা দিয়েছিল। খাদ্য যখন সীমিত তখন এটা একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়াতে পারে। যে-জিরাফ গাছের সবচেয়ে উঁচু অংশে পৌছতে পেরেছিল সেটিই সবচেয়ে ভালোভাবে টিকতে পেরেছিল। আমরা আরও কল্পনা করতে পারি কীভাবে এ-ধরনের 'আদিম জিরাফ' মাটি খুঁড়ে খাবার খুঁজে বের করবার ক্ষমতা অর্জন করেছিল। দীর্ঘদিন আগে বিলুপ্ত হয়ে গেছে এ-রকম একটি প্রাণী প্রজাতি লম্বা একটা সময়ের ব্যবধানে দুটো প্রজাতিতে পরিণত হতে পারে। প্রাকৃতিক নির্বাচন কীভাবে কাজ করতে পারে সে-ব্যাপারে আরও সাম্প্রতিক কিছু উদাহরণের দিকে আমরা নজর দিতে পারি।'

'ইয়েস প্লিজ।'

'ব্রিটেনে *পেপ্যারড্ মথ* নামে বিশেষ এক ধরনের প্রজাপতি আছে, রূপালি বার্চ গাছের গুঁড়ি খেয়ে জীবনধারণ করে এরা। অষ্টাদশ শতকে বেশির ভাগ পেপ্যারড্ মথেরই গায়ের রঙ ছিল রূপালি ধূসর। কারণ কী, আন্দাজ করতে পারো, সোফি?'

'যাতে করে ক্ষুধার্ত পাখিরা সহজে ওদের চিনতে না পারে।'

'কিন্তু মাঝে মাঝেই, হঠাৎ হঠাৎ ঘটে যাওয়া কিছু মিউটেশনের জন্য, অপেক্ষাকৃত কালো কিছু পেপ্যারড্ মথ জন্মাতো। সেই অপেক্ষাকৃত কালো প্রজাপতিগুলোর বরাতে কী ঘটেছিল বলতে পারো?'

'অন্যগুলোর তুলনায় সহজেই দেখা যেতো ওগুলোকে, ফলে আরও সহজে ওগুলোকে ছোঁ মেরে তুলে নিতো ক্ষুধার্ত পাখিগুলো।'

'হ্যাঁ, কারণ সেই পরিবেশে, যেখানে বার্চগাছের গুঁড়িগুলো ছিল রূপালি রঙের, অপেক্ষাকৃত কালো রঙটা সুবিধাজনক বৈশিষ্ট্য ছিল না। কাজেই সব সময় অপেক্ষাকৃত হালকা রঙের পেপ্যারড্ মথের সংখ্যাই বেশি থাকতো। কিন্তু তারপর হঠাৎ একটা ঘটনা ঘটল সেই পরিবেশে। বেশ কিছু জায়গায় রূপালি গুঁড়িগুলো কল-কারখানার কালি-ঝুলির কারণে কালো হয়ে যেতে থাকল। সেই পেপ্যারড্ মথগুলোর তখন কী হলো বলে মনে হয় তোমার?'

'অপেক্ষাকৃত কালোগুলোর পোয়া বারো হলো।'

'হ্যাঁ, কাজেই সংখ্যায় বাড়তে খুব বেশি সময় লাগল না এদের। ১৮৪৮ থেকে ১৯৪৮-এর মধ্যে, কিছু কিছু জায়গায়, কালো পেপ্যারড্ মথের অনুপাত ১ থেকে বেড়ে ৯৯-এ গিয়ে ঠেকল। পরিবেশ বদলে গিয়েছিল, ফলে হালকা রঙের হওয়াটা সুবিধাজনক ব্যাপার রইল না আর। তার উল্টোটাই হলো বরং। বিজিত সাদা প্রজাতিগুলো বার্চ গাছের গুঁড়ির ওপর এসে বসতে না বসতেই পাখিগুলোর কৃপায় উজাড় হয়ে গেল। কিন্তু এই সময় আবারও একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার ঘটল। কয়লার ব্যবহার হ্রাস আর কলকারখানায় আগের চেয়ে ভালো ফিল্টারিং সরঞ্জামের ব্যবহার তুলনামূলকভাবে পরিষ্কার পরিবেশ সৃষ্টি করল।'

কাজেই এবার বার্চগুলো আবার রূপালি হয়ে উঠল?'

'আর তাই পেপ্যারড্ মথগুলো তাদের রূপালি রঙে ফিরে যেতে শুরু করল। এটাকেই আমরা বলি *মানিয়ে নেয়া* (adaptation)। এটা একটা প্রাকৃতিক নিয়ম।'

'হ্যাঁ, বুঝতে পারছি।'

'কিন্তু মানুষ কীভাবে পরিবেশের ভেতর বাগড়া দেয় তারও ভূরি ভূরি উদাহরণ আছে।'

'যেমন?'

'এই যেমন, বিভিন্ন ধরনের কীটনাশক পদার্থ দিয়ে মানুষ নানান কীট-পতঙ্গ ধ্বংস করার চেষ্টা করেছে। প্রথম প্রথম এতে চমৎকার ফল পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু একটা মাঠে বা একটা আপেল-বাগানে তুমি যখন কীটনাশক পদার্থ স্প্রে করো তখন কিন্তু আসলে যে-সব কীট-পতঙ্গ তুমি ধ্বংস করতে চাইছো সেগুলোর ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র অর্থে পরিবেশ বিপর্যয় ঘটাও। নিরন্তর মিউটেশনের কারণে এমন এক ধরনের কীট-পতঙ্গের উদ্ভব হয় যার মধ্যে যে-কীটনাশক ব্যবহৃত হচ্ছে সেই কীটনাশক প্রতিরোধক একটা ক্ষমতা জন্মায়। এবার এই 'বিজেতারা' একটা স্বরাজ পেয়ে যায়, কাজেই বিশেষ কিছু কীট-পতঙ্গ প্রতিরোধ করা দিনে দিনে স্রেফ এই কারণে আরও বেশি কঠিন হয়ে পড়ে যে মানুষ সেগুলোকে ধ্বংস করে দিতে চেয়েছে। শেষ পর্যন্ত যারা টিকে থাকে তাদের মধ্যেই যে প্রতিরোধ ক্ষমতা সবচেয়ে বেশি থাকে সে-কথা বলাই বাহুল্য।'

'এটাতো রীতিমতো ভয়ের ব্যাপার।'

'ব্যাপারটার মধ্যে যে চিন্তার খোরাক আছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ব্যাকটেরিয়ার আকারে আমাদের শরীরে যে-সব পরজীবী আছে সেগুলোকেও আমরা ধ্বংস করার চেষ্টা করি।'

'পেনিসিলিন বা অন্য ধরনের নানান অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করি আমরা।'

'হ্যাঁ আর পেনিসিলিন-ও এইসব ক্ষুদে শয়তানগুলোর ক্ষেত্রে একটা পরিবেশ বিপর্যয়। সে যাই হোক, আমরা যখন পেনিসিলিন ব্যবহার করতে থাকি, তখন আসলে আমরা কিছু কিছু ব্যাকটেরিয়াকে পেনিসিলিন প্রতিরোধী করে ফেলি, ফলে এমন একদল ব্যাকটেরিয়ার জন্ম দিতে থাকি যেগুলোকে দমন করা আগেরগুলোর চেয়েও কঠিন। ফলে আমরা দেখি দিন দিন আগের চেয়ে শক্তিশালী অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করতে হচ্ছে আমাদের, যদ্দিন পর্যন্ত না...

'শেষ অব্দি ওরা হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে আসে আমাদের মুখের ভেতর থেকে?

আমাদের কি তাহলে ওগুলোকে গুলি করা উচিত?'

'সেটি অবশ্য একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে। কিন্তু এই ব্যাপারটা এখন পরিষ্কার যে আধুনিক ওষুধ-পত্র একটা ভীষণ উভয় সংকট তৈরি করেছে। সমস্যা কিন্তু এটা নয় যে বিশেষ একটি ব্যাকটেরিয়াম হঠাৎ খুবই ক্ষতিকারক হয়ে উঠেছে। অতীতে বহু শিশু মারা যেতো; নানান অসুখ বিসুখে মারা যেতো তারা। বাঁচতো খুবই অল্প। কিন্তু আধুনিক ওষুধ-পত্র এক অর্থে প্রাকৃতিক নির্বাচনকে মুলতবি রেখেছে। যে-জিনিসটা ব্যক্তি বিশেষকে কঠিন একটা রোগ থেকে বাঁচতে সাহায্য করছে, কালে একদিন সেটিই বিশেষ কিছু অসুখের ব্যাপারে গোটা মানব জাতির প্রতিরোধ ক্ষমতা কমিয়ে দিতে সাহায্য করতে পারে। যাকে বলে বংশগত স্বাস্থ্যবিধি সে-ব্যাপারে যদি আমরা কোনো মনোযোগই না দিই তাহলে একদিন হয়ত মানব জাতির অবক্ষয়ের মুখোমুখি হবো আমরা। মারাত্মক অসুখ প্রতিরোধ করার ব্যাপারে মানুষের বংশগত ক্ষমতা দুর্বল হয়ে পড়বে।'

'কী ভয়ঙ্কর ভবিষ্যৎ!'

'কিন্তু একজন প্রকৃত দার্শনিক 'ভয়ঙ্কর' কোনো কিছু দেখিয়ে দেয়া থেকে কোনোভাবেই নিজেকে বিরত থাকতে পারেন না, যদি তিনি সেটিকে সত্যি বলে মনে করেন। কাজেই এবার আরেকটা সার-সংক্ষেপ করা যাক।'

'ঠিক আছে।'

'এক হিসেবে তুমি বলতে পারো যে জীবন হচ্ছে বিরাট একটা লটারি যেখানে যে-নম্বরগুলো জিতেছে সেগুলোই কেবল দেখা যায়।'

'কী বলতে চান বলুন তো।'

'বেঁচে থাকার সংগ্রামে যারা হেরে গেছে তারা অদৃশ্য হয়ে গেছে। পৃথিবীর বুকের উদ্ভিদ এবং প্রাণী জগতের প্রতিটি প্রজাতির বিজেতা নম্বরগুলো নির্বাচন করতে লাখ লাখ বছর লেগে যায়। আর বিজিত নম্বরগুলো—ইয়ে, সেগুলো মাত্র একবারই দেখা দেয়। কাজেই প্রাণী এবং উদ্ভিদের যত প্রজাতি এখন টিকে আছে সেগুলোর মধ্যে এমন একটিও নেই যেটি জীবনের বিরাট লটারিতে বিজয়ী নম্বর নয়।'

'কারণ শ্রেষ্ঠই কেবল টিকতে পেরেছে।'

'হ্যা, ঘুরিয়ে বললে কথাটা সেটিই দাঁড়ায়। তো, এবার তুমি যদি দয়া করে ওই লোকটার, সেই জু-কীপারের দেয়া ছবিটা আমার কাছে এগিয়ে দাও...'

ছবিটা তাঁর হাতে দিল সোফি। সেটির এক পাশ জুড়ে আছে নোয়ার জাহাজটা। অন্য পাশে বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণীর একটা ট্রি ডায়াগ্রাম। এই দিকটাই সোফিকে এখন দেখাচ্ছেন অ্যালবার্টো।

'আমাদের ডারউইনবাদী নোয়া এই স্কেচটাও নিয়ে এসেছেন, যেখানে বিভিন্ন উদ্ভিদ ও প্রাণী প্রজাতির নানান বিভাগ দেখা যাচ্ছে। দেখতেই পাচ্ছ বিভিন্ন প্রজাতি কীভাবে বিভিন্ন দল, শ্রেণী এবং উপশ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে আছে।'

'হ্যা।'

'বানরদের নিয়ে মানুষ রয়েছে তথাকথিত প্রাইমেট শ্রেণীতে। প্রাইমেট হলো স্তন্যপায়ীরা আর সব স্তন্যপায়ী-ই মেরুদণ্ডী প্রাণীর অন্তর্ভুক্ত, যা কিনা আবার বহুকোষী

প্রাণীর দলভুক্ত।'

'প্রায় অ্যারিস্টটলের মতো এটা।'

'হ্যাঁ, তা ঠিক। কিন্তু স্কেচটা কেবল এখনকার বিভিন্ন প্রজাতির নানান ভাগ-ই বোঝাচ্ছে না। এটা বিবর্তনের ইতিহাসও বলছে খানিকটা। তুমি দেখতে পাবে পাখি একসময় সরীসৃপের কাছ থেকে ভাগ হয়ে গেছে, সরীসৃপ একসময় ভাগ হয়ে গেছে উভচরদের কাছ থেকে আর উভচরেরা ভাগ হয়ে গেছে মাছের কাছ থেকে।'

'হ্যাঁ, সেটি অবশ্য স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে।'

'যখনই কোনো প্রজাতি দুই ভাগ হয়ে যায় তখন তার কারণ হচ্ছে মিউটেশনের কারণে একটা নতুন প্রজাতির জন্ম হয়। এভাবেই যুগ যুগ ধরে বিভিন্ন শ্রেণী আর উপশ্রেণীর প্রাণীর উদ্ভব হয়েছে। সত্যি বলতে কি, বর্তমান দুনিয়ায় দশ লাখেরও বেশি প্রাণী প্রজাতি রয়েছে। আর এই দশ লাখ হচ্ছে এই পৃথিবীর বুকে কোনো না কোনো সময় বাস করে যাওয়া প্রজাতিগুলোর একটা ভগ্নাংশ মাত্র। উদাহরণ স্বরূপ, তুমি দেখবে, ট্রায়ালোবিটা নামের প্রাণীর দলটি পুরোপুরি বিলুপ্ত হয়ে গেছে।'

'আর একেবারে নিচের দিকে রয়েছে এককোষী প্রাণী।'

'এদের মধ্যে কিছু হয়ত দুই বিলিয়ন বছরেও বদলায়নি। তুমি আরও দেখতে পাবে যে এই এককোষী প্রাণীগুলো থেকে একটা লাইন চলে গেছে উদ্ভিদ রাজ্যের দিকে। কারণ, খুব সম্ভবত উদ্ভিদ এসেছে প্রাণীরূপী কোনো আদিম কোষ থেকে।'

'হ্যাঁ, তা দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু একটা ব্যাপার একেবারে হতবাক করে দিচ্ছে আমাকে।'

'কী সেটি?'

'এই আদিম কোষটা কোত্থেকে এলো? এ-প্রশ্নের কি কোনো উত্তর ছিল ডারউইনের কাছে?'

'আমি তো বলেইছি, বলিনি যে ডারউইন খুব সাবধানী লোক ছিলেন? কিন্তু সেই প্রশ্নের প্রসঙ্গে তিনি নিজে সেটিই প্রস্তাব করেছেন লোকে হয়ত যেটাকে বলবে যথার্থ অনুমান। তিনি লিখেছেন

> যদি (আর হ্যাঁ, কী বিশাল এক যদি!) আমরা ছোট্ট একটা উত্তপ্ত জলাশয়ের কথা চিন্তা করতে পারি যেখানে অ্যামোনিয়া আর ফসফরাসের সব ধরনের লবণ, আলো, উত্তাপ, বিদ্যুৎ এবং এ-রকম আরও কিছু উপস্থিত আর সেখানে যদি একটি প্রোটিন যৌগ রাসায়নিকভাবে তৈরি হওয়ার কথা থাকতো যা কিনা আরও অনেক বেশি জটিল পরিবর্তনের ভেতর দিয়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত...

'তাহলে কী হতো?'

'ডারউইন আসলে এখানে যে-ব্যাপারটি দার্শনিকভাবে বিচার করছিলেন তা হলো অজৈব পদার্থ বা বস্তু থেকে কীভাবে প্রথম জীবন্ত কোষ সৃষ্টি হয়ে থাকতে পারে সেটি। এবং আবারও তিনি একেবারে মোক্ষম জায়গাটিতেই হাত দিয়েছিলেন। এখনকার

বৈজ্ঞানিকেরা মনে করেন জীবনের আদিমতম রূপটি ঠিক সেই ধরনেরই 'ছোট্ট একটা উত্তপ্ত জলাশয়ের' মধ্যে উদ্ভূত হয়েছিল সে-রকমটি ডারউইন চিন্তা করেছিলেন।'

'বলে যান।'

'এটুকুতেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে তোমাকে, কারণ ডারউইনের কাছ থেকে বিদায় নেবো আমরা এখন। পৃথিবীতে প্রাণের উৎস সম্পর্কে একেবারে সাম্প্রতিক আবিষ্কারগুলোর কাছে চলে আসবো আমরা এখন সামনের দিকে লাফ দিয়ে।'

'আমার কিন্তু খানিকটা সন্দেহ আছে। জীবন কীভাবে শুরু হয়েছিল সেটি কি আসলেই কেউ *জানে?*'

'তা হয়ত জানে না, কিন্তু সেটি কীভাবে শুরু হয়ে *থাকতে পারে* সে-ব্যাপারে যে-রহস্য তা ক্রমেই খোলাসা হয়ে আসছে।'

'কীরকম?'

'প্রথমেই একটা বিষয় সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে নেয়া যাক—পৃথিবীতে উদ্ভিদ এবং প্রাণিজ সমস্ত প্রাণ-ই ঠিক একই বস্তু দিয়ে তৈরি। জীবনের বা প্রাণের সরলতম সংজ্ঞা হচ্ছে এটা এমন একটি বস্তু যা একটা পুষ্টিদায়ী দ্রবণে (nutrient solution) নিজেকে একেবারে একই রকম দুটো অংশে বিভক্ত করে ফেলতে পারে। এই প্রক্রিয়াটিকে যা নিয়ন্ত্রণ করে তাকে আমরা বলি ডিএনএ (DNA)। ডিএনএ বলতে আমরা ক্রোমোজম বা বংশগত কাঠামোকে বুঝাই যা কিনা সব জীবন্ত কোষেই পাওয়া যায়। আমরা অবশ্য ডিএনএ *অণু* কথাটিও ব্যবহার করি কারণ ডিএনএ আসলে একটা জটিল অণু বা বৃহৎ অণু। কিন্তু এরপরের প্রশ্ন হলো প্রথম অণুটার সৃষ্টি কী করে হলো।'

'হ্যাঁ?'

'৪.৬ বিলিয়ন বছর আগে যখন সৌরজগৎ সৃষ্টি হয়েছিল তখন পৃথিবী গঠিত হয়। এটার শুরুটা হয়েছিল একটা উজ্জ্বল পিণ্ড হিসেবে, যা ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা হয়ে পড়েছিল। আধুনিক বিজ্ঞান মনে করে, তিন থেকে চার বিলিয়ন বছর আগে ঠিক এখানেই প্রাণের সূত্রপাত ঘটেছিল।

'পুরোপুরি অসম্ভব শোনাচ্ছে ব্যাপারটা।'

'বাকিটা শোনার আগে ও-কথা বোলো না। প্রথম কথা হচ্ছে, আজকে যেমন দেখাচ্ছে তারচেয়ে একেবারে অন্য রকম ছিল আমাদের গ্রহটা। যেহেতু প্রাণের কোনো অস্তিত্ব ছিল না, বায়ুমণ্ডলে তাই কোনো অক্সিজেন ছিল না। উদ্ভিদের সালোক সংশ্লেষণের সাহায্যেই প্রথম তৈরি হয়েছিল মুক্ত অক্সিজেন। এবং, কোনো অক্সিজেন না-থাকার ব্যাপারটা কিন্তু বেশ গুরুত্বপূর্ণ। যে-বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেন রয়েছে সেখানে প্রাণ কোষ যা কিনা আবার ডিএনএ গঠন করতে পারে, তার উদ্ভব হওয়ার সম্ভাবনা কম।'

'কেন?'

'কারণ অক্সিজেন অত্যন্ত রিঅ্যাক্টিভ। ডিএনএ-র মতো জটিল অণু তৈরি হওয়ার অনেক আগেই ডিএনএ-র আণবিক কোষগুলো অক্সিডাইজড হয়ে যেতো।'

'বটে।'

'এভাবেই আমরা নিশ্চিতভাবে জানি যে এখন আর *নতুন* কোনো প্রাণের উদ্ভব

ঘটে না, এমনকি কোনো ব্যাকটেরিয়াম বা কোনো ভাইরাস হিসেবেও নয়। পৃথিবীতে যত প্রাণ রয়েছে তার সবগুলোর বয়স অবশ্যই একই সমান হবে। একটা হাতির বংশতালিকা ঠিক ততোটাই লম্বা যতটা লম্বা ক্ষুদ্রতম ব্যাকটেরিয়ামের বংশতালিকা। তুমি একরকম বলতেই পারো যে একটা হাতি বা একজন মানুষ আসলে এককোষী প্রাণীর একটি একক সঙ্গতিপূর্ণ উপনিবেশ। কারণ আমাদের শরীরের প্রতিটি কোষ একই বংশগত উপাদান বয়ে বেড়ায়। আমরা কে বা কী তার পুরো বর্ণনা প্রতিটি ক্ষুদ্র কোষের ভেতর লুকিয়ে রয়েছে।'

'এটা কিন্তু একটা অদ্ভুত ধারণা।'

'জীবনের অন্যতম বড় রহস্য হচ্ছে এই যে একটি বহুকোষী প্রাণীর কোষগুলো তাদের কাজকর্মে বিশিষ্ট হয়ে উঠতে পারে, যদিও সব কোষের ভেতরের বিভিন্ন বংশগত বৈশিষ্ট্যের সবগুলোই সক্রিয় অবস্থায় থাকে না। এই বৈশিষ্ট্যগুলোর বা জিন-এর কিছু 'সক্রিয়' হয়ে ওঠে, অন্যগুলো নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। একটি যকৃত কোষ কখনোই একটি স্নায়ু কোষ বা ত্বক কোষ যে-প্রোটিন তৈরি করে ঠিক সেই প্রোটিন তৈরি করে না। কিন্তু এই তিন ধরনের কোষেরই রয়েছে একই ডিএনএ অণু যার মধ্যে বিশেষ সেই প্রাণীর সমস্ত বর্ণনা পুরে দেয়া আছে।

'বায়ুমণ্ডলে যেহেতু কোনো অক্সিজেন ছিল না, পৃথিবীর চারপাশে তাই সুরক্ষামূলক কোনো ওজন স্তর-ও ছিল না। তার অর্থ, মহাজগৎ থেকে আসা বিকিরণ ঠেকানোর মতো ছিল না কিছুই। এই ব্যাপারটাও এ-কারণে গুরুত্বপূর্ণ যে এই বিকিরণ সম্ভবত প্রথম জটিল অণু গঠনের বেলাতে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছিল। পৃথিবীর বিভিন্ন রাসায়নিক বস্তুকে জটিল বিরাট অণুতে পরিণত হওয়ার জন্য একত্রিত হতে শুরু করার ক্ষেত্রে এ-ধরনের মহাজাগতিক বিকিরণই ছিল প্রকৃত শক্তি।'

'আচ্ছা।'

'ব্যাপারটা সংক্ষেপে বলছি আবার : সব প্রাণের মধ্যে যে-ধরনের জটিল অণু থাকে সেগুলো তৈরি হওয়ার আগে অন্তত দুটো শর্ত পূরণ হতে হবে পরিবেশে কোনো *অক্সিজেন* থাকবে না এবং *মহাজাগতিক বিকিরণ*-এর প্রবেশাধিকার থাকতেই হবে।'

'বুঝতে পারছি।'

'এই 'ছোট্ট, উত্তপ্ত জলাশয়' বা, আধুনিক বিজ্ঞানীরা যাকে প্রায়ই বলেন 'আদিম স্যুপ' সেখানে একবার জন্ম নিল ভীষণরকমের জটিল এক বিরাট অণু যেটার ছিল নিজেকে হুবহু একই রকম দুই অংশে বিভক্ত করার এক আশ্চর্য ক্ষমতা। আর তাই শুরু হলো দীর্ঘ বিবর্তন প্রক্রিয়া, সোফি। ব্যাপারটাকে খানিকটা সরলীকরণ করলে আমরা বলতে পারি যে আমরা এখন প্রথম বংশগত উপাদান, প্রথম ডিএনএ বা প্রথম জীবন্ত কোষটির কথা বলছি। নিজেকে সেটি বিভক্ত করেই চলল, তবে একেবারে প্রথম পর্যায় থেকেই কিন্তু ট্রান্সমিউটেশন ঘটে চলছিল। এর বহু যুগ পর এই এককোষী প্রাণীগুলোর একটি যুক্ত হলো আরও জটিল একটি বহুকোষী প্রাণীর সঙ্গে। এভাবে সালোকসংশ্লেষণও শুরু হলো আর এভাবেই বায়ুমণ্ডলে উপস্থিত হলো অক্সিজেন। এর ফল হলো দুটো প্রথমত, পরিবেশ এমন সব প্রাণীর বিবর্তনের অনুমতি দিল যারা ফুসফুসের সাহায্যে শ্বাস-প্রশ্বাসের কাজ চালাতে পারে। দ্বিতীয়ত, বায়ুমণ্ডল প্রাণকে

ক্ষতিকর মহাজাগতিক বিকিরণ থেকে রক্ষা করল। ব্যাপারটা খুবই আশ্চর্যের যে এই বিকিরণ যা কিনা প্রথম কোষ গঠনের ক্ষেত্রে সম্ভবত একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় 'স্ফুলিঙ্গ'-র কাজ করেছিল, সেটিই কিন্তু সব ধরনের প্রাণের জন্য ক্ষতিকারক।'

'কিন্তু বায়ুমণ্ডল নিশ্চয়ই রাতারাতি তৈরি হয়নি। একেবারে গোড়ার দিককার প্রাণগুলো টিকে থাকল কী করে?'

'জীবনের সৃষ্টি হয়েছিল আদিম সব 'সাগরে'-আদিম স্যুপ বলতে সেগুলোর কথাই বোঝাই আমরা। সেখানেই তা ক্ষতিকর রশ্মির হাত থেকে সুরক্ষিত অবস্থায় বাঁচতে পেরেছিল। অনেক দিন পর যখন মহাসমুদ্রের প্রাণ একটা বায়ুমণ্ডল সৃষ্টি করল, কেবল তখনই প্রথম উভচরেরা হামাগুড়ি দিয়ে উঠে এসেছিল ডাঙায়। এরপর যা ঘটল তা নিয়ে এরই মধ্যে আলাপ করেছি আমরা। আর এখন এইখানে বসে আছি দু'জনে, বনের মধ্যে একটা কুঁড়েঘরে, ফিরে তাকাচ্ছি এমন একটা প্রক্রিয়ার দিকে যা তিন থেকে চার বিলিয়ন বছর সময় নিয়েছে। আর আমাদের ভেতরেই এই দীর্ঘ প্রক্রিয়াটা শেষ পর্যন্ত সচেতন হয়ে উঠল নিজের সম্পর্কে।'

'এবং তারপরেও আপনি মনে করেন না যে এর সবই ঘটেছে নেহাত আকস্মিকভাবে?'

'সেকথা কখনো বলিনি আমি। এই বোর্ডের ছবিটা দেখিয়ে দিচ্ছে যে বিবর্তনের একটা লক্ষ্য ছিল। যুগ যুগ ধরে ক্রমেই আরও বেশি জটিল হয়ে ওঠা নার্ভ সিস্টেম আর বড় হয়ে ওঠা মস্তিষ্ক নিয়ে বিবর্তিত হয়েছে প্রাণীগুলো। ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি, ব্যাপারটা নেহাত আকস্মিক হতে পারে না। তোমার কী মনে হয়?'

'একেবারে হঠাৎ করে মানুষের চোখ তৈরি হতে পারে না। আপনার কি মনে হয় না যে আমরা যে আমাদের চারপাশের জগৎটা দেখতে পাচ্ছি তার একটা অর্থ আছে?'

'মজার ব্যাপার হলো চোখের বিকাশটা ডারউইনকেও একেবারে তাজ্জব করে দিয়েছিল। চোখের মতো এ-রকম সূক্ষ্ম এবং সংবেদনশীল একটা জিনিস পুরোপুরি প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছে এই ব্যাপারটা ডারউইন আসলে মেনে নিতে পারেননি।'

অ্যালবার্টোর মুখের দিকে তাকিয়ে বসে রইল সোফি। সে ভাবছে ব্যাপারটা কী অদ্ভুত যে এই মুহূর্তে বেঁচে আছে সে এবং সে মাত্র এই একবারের জন্যই বাঁচছে এবং আর কখনোই এই জীবনে ফিরে আসবে না। হঠাৎ সে বলে উঠল

> What matters our creative endless toil,
> When, at a snatch, oblivion ends the coil?

ভুরু কুঁচকে সোফির দিকে তাকালেন অ্যালবার্টো।

'ওভাবে বলতে হয় না, মেয়ে। ওগুলো শয়তানের কথা।'

'শয়তান?'

'বা মেফিস্টোফেলিস, গ্যেটের ফাউস্ট-এর। "*Was soll uns denn das ew'ge Schaffen! Geschaffenes zu nichts hinweg-zuraffen!*"

কিন্তু কথাগুলোর মানেটা ঠিক কী?'

'মারা যাওয়ার সময় ফাউস্ট নিজের জীবনের দিকে ফিরে তাকিয়ে বিজয়োল্লাসের সঙ্গে বলে ওঠেন :

Then to moment could I say:
Linger you now, you are so fair!
Now records of my earthly day
No flights of aeons can impair—
Foreknowledge comes, and fills me with such bliss,
I take my joy, my highest moments this.

দারুণ কাব্যিক তো।'

'কিন্তু এরপর শয়তানের পালা। ফাউস্ট মারা যেতেই সে বলে ওঠে

A foolish word, bygone.
How so then, gone?
Gone, to sheer Nothing, past with null made one!
What matters our creative endless toil,
When, at a snatch, oblivion ends the coil?
"It is bygone"—How shall this riddle run?
As good as if things never had begun,
Yet circle back, existence to possess:
I'd rather have Enternal Emptiness.

'এটা কিন্তু হতাশাভরা কথা হলো। প্রথম প্যাসেজটাই বরং বেশি পছন্দ হয়েছে আমার। যে-সব চিহ্ন তিনি রেখে যাবেন সে-সবের মধ্যে খানিকটা অর্থ দেখতে পেয়েছিলেন ফাউস্ট জীবনের একেবারে শেষ মুহূর্তে দাঁড়িয়েও।'

'আর, আমরা যে সর্বব্যাপী একটা কিছুর অংশ যেখানে প্রতিটি ক্ষুদ্র প্রাণেরই একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে সেই বিশাল ছবিটাতে, সেটি কি ডারউইনের তত্ত্বেরই একটা ফলস্বরূপ নয়? আমরাই হচ্ছি জীবন্ত গ্রহ, সোফি! আমরা হচ্ছি সেই বিরাট জাহাজ যা মহাবিশ্বে এক জ্বলন্ত সূর্যের চারদিকে ভেসে বেড়াচ্ছে। কিন্তু আমাদের প্রত্যেকেই আবার একটি জাহাজ যা জিন-এর কার্গো নিয়ে ভেসে চলেছে জীবনের ভেতর দিয়ে। এই কার্গো নিরাপদে আরেক পোতাশ্রয়ে নিয়ে যেতে পারলে তবেই আমাদের জীবন সার্থক। *টমাস হার্ডি* তাঁর কবিতা *'Transformations'*-এ ঠিক এই ভাবটি-ই ব্যক্ত করেছেন :

Portion of this yew
Is a man my grandsire knew
Bossomed here at its foot:

This branch may be his wife,
A ruddy human life
Now turned to a green shoot.

These grasses must be made
Of her who often prayed
Last century,for repose;
And the fair girl long ago
Whom I often tried to know
May be entering this rose.
So, they are not underground,
But as nerves and veins abound
In the growths of upper air,
And they feel the sun and rain,
And the energy again
That made then what they were!

'বাহ্, কী সুন্দর।'
'কিন্তু আর কোনো কথা নয়। আমি শুধু বলছি, পরের চ্যাপ্টার!'
'আহ্, বন্ধ করুন তো আপনার এ-সব আয়রনি!'
'আমি বলেছি, নতুন চ্যাপ্টার! আমার কথা শুনতে হবে!'

ফ্রয়েড

ছত্রিশ

...মেয়েটির মধ্যে যে ঘৃণ্য অহংভাবপূর্ণ আবেগের জন্ম নিয়েছিল...

বিশাল রিং বাইন্ডারটা নিয়ে বিছানা থেকে লাফ দিয়ে নেমে এলো হিল্ডা মোলার ন্যাগ। ধপাস করে ফেলল সেটি তার লেখার ডেস্কটার ওপর, জামা-কাপড় টেনে নিয়ে ঢুকে পড়ল গোসলখানায়। দুই মিনিট দাঁড়িয়ে থাকল ঝরনার নিচে. চটপট পোশাক পরে নিল, তারপর দৌড়ে নেমে এলো নিচতলায়।

'ব্রেকফাস্ট তৈরি, হিল্ডা!'

'আগে আমাকে নৌকো বাইতে হবে।'

'কিন্তু হিল্ডা...!'

দৌড়ে বাড়ির বাইরে বেরিয়ে বাগান পেরিয়ে ছোট্ট ডকটায় চলে এলো সে। নৌকোটার দড়িদড়া খুলে দিয়ে লাফ দিয়ে সেটিতে চড়ে বসল। তার মেজাজ শান্ত না হওয়া পর্যন্ত লেক জুড়ে ক্রুদ্ধ ছোট ছোট ঘাই মেরে নৌকো বেয়ে চলল সে।

'আমরাই হচ্ছি জীবন্ত গ্রহ, সোফি! আমরা হচ্ছি সেই বিরাট জাহাজ যা মহাবিশ্বে এক জ্বলন্ত সূর্যের চারদিকে ভেসে বেড়াচ্ছে। কিন্তু আমাদের প্রত্যেকেই আবার একটি জাহাজ যা জিন-এর কার্গো নিয়ে ভেসে চলেছে জীবনের ভেতর দিয়ে। এই কার্গো নিরাপদে আরেক পোতাশ্রয়ে নিয়ে যেতে পারলে তবেই আমাদের জীবন সার্থক...'

প্যাসেজটা ওর মুখস্ত হয়ে গেছে। তার জন্যেই লেখা হয়েছে ওটা। সোফির জন্য নয়, তার জন্য। রিং বাইন্ডারটার প্রতিটি শব্দ বাবা হিল্ডার জন্য লিখেছেন।

দাঁড় দুটোকে আটকে উঠিয়ে রাখে সে। পানির ওপর মৃদুমন্দভাবে দুলতে থাকে নৌকোটি, ছোট ছোট ঢেউগুলো আস্তে আস্তে চাপড় দিতে থাকে সেটির সামনের দিকে। লিলেস্যান্ডের উপসাগরে ছোট্ট নৌকোটি যেমন পানির ওপর ভেসে বেড়াচ্ছে ঠিক সে-রকম জীবনের ওপর সে একটি ছোট্ট বাদামের খোসা।

এই ছবির মধ্যে সোফি আর অ্যালবার্টো কোথায়? তাইতো, অ্যালবার্টো আর সোফি কোথায়?

'সে এটা অনুধাবন করতে পারল না যে তারা আসলে তার বাবার মস্তিষ্কে 'বিদ্যুৎচুম্বকীয় স্পন্দন' ছাড়া আর কিছুই নয়। সে অনুধাবন করতে পারল না আর মেনে তো নিতে পারলই না যে, তারা তার বাবার বহনযোগ্য টাইপরাইটারের রিবনের ছাপার কালি আর কাগজ ছাড়া কিছুই নয়। অবশ্য কেউ হয়ত এ-কথাও বলতে পারে

যে সে নিজে স্রেফ এক 'ছোট্ট উত্তপ্ত জলাশয়ে' হঠাৎ একদিন প্রাণ পেয়ে ওঠা প্রোটিন যৌগের একটা দলা ছাড়া কিছু নয়। কিন্তু সে আসলে সেটির চেয়েও বেশি কিছু। সে হচ্ছে হিল্ডা মোলার ন্যাগ।

তাকে স্বীকার করতেই হলো যে রিং বাইন্ডারটা একটা অসাধারণ উপহার আর তার বাবা তার ভেতরের *শাশ্বত* কিছু একটার মর্মস্থলে স্পর্শ করেছেন। কিন্তু সোফি আর অ্যালবার্টোর সঙ্গে তিনি যে-রকম ব্যবহার করছেন সেটি তার পছন্দ হয়নি।

বাবা বাড়ি ফিরে আসার আগেই তাঁকে সে একটা শিক্ষা দেবেই। হিল্ডার মনে হলো অ্যালবার্টো আর সোফি-র এই জিনিসটা পাওনা আছে তার কাছে। এরই মধ্যে কোপেনহগেনের কাস্ট্রাপ এয়ারপোর্টে তার বাবাকে কল্পনা করতে পারল সে। হিল্ডা দিব্যি দেখতে পেল পাগলের মতো ছুটোছুটি করছেন তিনি।

ফের নিজের সত্তায় ফিরে এলো হিল্ডা। নৌকো বেয়ে ডকে চলে এলো সে আবার এবং এবার সে চটপট কাজ সারতে ভুলল না। ব্রেকফাস্টের পর মায়ের সঙ্গে অনেকক্ষণ টেবিলে বসে রইল সে। ডিমটা নেহায়েত নগণ্য পরিমাণ বেশি নরম কিনা এ-রকম সাধারণ বিষয় নিয়ে কথা বলতে পেরে ভালো লাগলো তার।

সন্ধ্যার আগ পর্যন্ত আর ফের পড়া শুরু করল না সে। খুব বেশি পৃষ্ঠা বাকি নেই আর।

আবারও ঠক্ ঠক্ শব্দ শোনা গেল দরজায়।

'কানে হাত চাপা দেই, চলো,' অ্যালবার্টো বললেন, 'তাহলে হয়ত চলে যাবে ও।'

'না, আমি দেখতে চাই কে এলো।'

সোফির পেছন পেছন দরজার কাছে এসে দাঁড়ালেন অ্যালবার্টো।

নগ্ন একজন পুরুষ দরজায় দাঁড়িয়ে। খুবই আনুষ্ঠানিক একটা ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে সে, যদিও মাথার মুকুটটা ছাড়া তার শরীরে কুটোটা পর্যন্ত নেই।

'তো?' সে বলে উঠল, 'সম্রাটের নতুন পোশাক সম্পর্কে তোমরা ভালোমানুষেরা কী বলো?'

অ্যালবার্টো আর সোফির তো রীতিমতো হতভম্ব দশা। তাই দেখে নগ্ন মানুষটি খানিকটা আহত বোধ করল।

'কী ব্যাপার! কুর্নিশ করছো না যে তোমরা!' চেঁচিয়ে উঠল সে।

'তা ঠিক, করছি না,' অ্যালবার্টো বললেন। 'কিন্তু সম্রাট যে একেবারে ন্যাংটোপুটো।'

নগ্ন লোকটি তার আনুষ্ঠানিক ভঙ্গিটি বজায় রাখলো। অ্যালবার্টো ঝুঁকে পড়ে সোফির কানে ফিসফিসিয়ে বললেন

'লোকটা ভাবছে তার সঙ্গে আমরা তমিজের সঙ্গে ব্যবহার করবো।'

এইবার লোকটা ভ্রূকুটি করে উঠল

'এখানে আবার কোনো ধরনের সেন্সরশীপ আরোপ করা হচ্ছে বুঝি?' জিজ্ঞেস করল সে।

'দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে, হ্যাঁ,' অ্যালবার্টো বললেন। 'এখানে আমরা দু'জন খুবই সচেতন আর সব দিক থেকেই সুস্থ। কাজেই সম্রাটের এই লজ্জাকর অবস্থায় এই

বাড়ির চৌকাঠ ডিঙানো তাঁর জন্য বারণ।'

নগ্ন লোকটির হামবড়া ভাব সোফির কাছে এতোই অবাস্তব ঠেকল যে হাসিতে ফেটে পড়ল সে। যেন তার হাসিটা একটা পূর্বনির্ধারিত সংকেত, এমনিভাবে মাথায় মুকুটপরা লোকটি হঠাৎ করেই সচেতন হয়ে উঠল যে সে উলঙ্গ। দুই হাতে লজ্জাস্থান ঢেকে সবচেয়ে কাছের গাছের দঙ্গলের দিকে ছুট লাগাল সে, তারপর অদৃশ্য হয়ে গেল, সম্ভবত যোগ দিতে গেল সে অ্যাডাম আর ইভ্, নোয়া, ছোট্ট রেড রাইডিংহুড আর উইনি-দ্য-পুহ্-র সঙ্গে।

অ্যালবার্টো আর সোফি সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে হাসতে থাকলেন।

শেষ পর্যন্ত অ্যালবার্টো বলে উঠলেন, 'ভেতরে গেলে মন্দ হতো না। ফ্রয়েড আর তাঁর 'নির্জ্ঞান মনের তত্ত্ব' (theory of the unconscious) সম্পর্কে তোমাকে কিছু বলতে চাই আমি এখন।'

ফের জানালার পাশে গিয়ে বসলেন দু'জন। সোফি তার ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলে উঠল: 'আড়াইটা কিন্তু বেজে গেছে এর মধ্যে, গার্ডেন পার্টির অনেক কাজ বাকি আমার এখনো।'

'আমারও। *সিগমুন্ড ফ্রয়েড* (Sigmund Freud) সম্পর্কে দু'চারটে কথা বলবো শুধু।'

'তিনি কি দার্শনিক ছিলেন?'

'আমরা তাঁকে অন্তত পক্ষে সাংস্কৃতিক দার্শনিক তো বলতেই পারি। ফ্রয়েডের জন্ম ১৮৫৬ সালে, ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ে চিকিৎসা শাস্ত্র নিয়ে পড়াশোনা করেছিলেন তিনি। ভিয়েনায় তিনি তাঁর জীবনের অপেক্ষাকৃত বড় অংশটা এমন একসময় বাস করে গেছেন যখন শহরটির সাংস্কৃতিক জীবন বিকাশ লাভ করছিল। গোড়ার দিকে তিনি স্নায়ুতত্ত্ব সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ হয়ে ওঠেন। গত শতাব্দীর শেষের দিকে এবং আমাদের এই শতাব্দীর অনেকদিন ধরে তিনি তাঁর "অবচেতন মনোপ্রকৃতির সমীক্ষণ" (depth psychology) বা *মনোসমীক্ষণ* (psychoanalysis) তত্ত্ব দাঁড় করান।'

'আপনি নিশ্চয়ই এটা ব্যাখ্যা করবেন, তাই না?'

'মনোসমীক্ষণ হচ্ছে সাধারণভাবে মানবমনের একটি বর্ণনা এবং স্নায়বিক ও মানসিক অসুস্থতার চিকিৎসা (therapy)। ফ্রয়েড বা তাঁর কাজের সম্পূর্ণ চিত্র তোমার সামনে হাজির করার ইচ্ছে আমার নেই। তবে মানুষ কী তা বুঝতে গেলে ফ্রয়েডের 'নির্জ্ঞান মনের তত্ত্বটি' কাজে লাগবে।'

'আপনি আমার কৌতূহল বাড়িয়ে দিয়েছেন। বলে যান।'

'ফ্রয়েড মনে করতেন যে মানুষ আর তার চারপাশের মধ্যে একটা সার্বক্ষণিক দ্বন্দ্ব কাজ করে। নির্দিষ্ট করে বললে, এই দ্বন্দ্বটা তার নানান তাড়না (drives) ও প্রয়োজন আর সমাজের দাবির মধ্যে। এটা বললে বাড়াবাড়ি হবে না যে ফ্রয়েডই এই মানবিক তাড়নাগুলো আবিষ্কার করেছেন। আর সে-কারণেই উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে যে প্রকৃতিবাদী স্রোত বেশ প্রবল ছিল তার একজন গুরুত্বপূর্ণ মুখপাত্র বলে মনে করা হয় তাঁকে।

'মানবিক তাড়না বলতে কী বোঝাচ্ছেন আপনি?'

'আমাদের কাজ-কর্ম যে সব সময় প্রজ্ঞা দিয়ে নিয়ন্ত্রিত হয় তা কিন্তু নয়। অষ্টাদশ শতকের বুদ্ধিবাদীরা যেমনটা মনে করতেন, মানুষ কিন্তু আসলে ততোটা বুদ্ধিবাদী প্রাণী নয়। আমরা যা ভাবি, যা স্বপ্ন দেখি আর যা করি তার অনেকটাই নির্ধারণ করে অযৌক্তিক আবেগ বা প্রেরণা। এ-ধরনের অযৌক্তিক আবেগ বা প্রেরণা কিন্তু মৌলিক তাড়না বা প্রয়োজনের একটা প্রকাশ হতে পারে। এই ধরো, মানুষের যৌন তাড়না ঠিক শিশুর স্তন্যপানের মতোই একটি মৌলিক প্রবৃত্তি।'

'তাই?'

'এটা অবশ্য নতুন কোনো আবিষ্কার ছিল না। কিন্তু ফ্রয়েড দেখালেন যে এই মৌলিক প্রয়োজনগুলোর ওপর একটা ছদ্মাবরণ পড়তে পারে বা সেগুলোর উচ্চতম কোনো খাতে প্রবাহিত হতে পারে (sublimated), ফলে সেগুলো আমাদের কাজ-কর্মকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে যা আমরা টেরই পাই না। তিনি আরও দেখালেন যে একেবারে শিশুদের এক ধরনের যৌনতা রয়েছে। 'শিশুর যৌনতা' সম্পর্কে এই ইঙ্গিতের প্রতি ভিয়েনার মর্যাদাবান মধ্যবিত্ত শ্রেণী ঘৃণার সঙ্গে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছিল এবং ফ্রয়েড হয়ে উঠেছিলেন ভীষণ অজনপ্রিয়।'

'তাতে আমি অবাক হচ্ছি না।'

'যৌনতার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত সব কিছুই যখন নিষিদ্ধ ব্যাপার (taboo) হয়ে দাঁড়ায় তখন সেটিকে আমরা বলি ভিক্টোরিয়ানিজম। মনোচিকিৎসা (psychotherapy) চালানোর সময়ই শিশুদের যৌনতা সম্পর্কে ফ্রয়েড প্রথমবারের মতোন সচেতন হয়ে ওঠেন। কাজেই তাঁর দাবির একটা অভিজ্ঞতালব্ধ ভিত্তি ছিল। স্নায়বিক পীড়া (neurosis) অথবা মানসিক অসুখের কত অসংখ্য রকমফেরের উৎস যে শৈশবের নানান দ্বন্দ্ব-সংঘাত সেটিও দেখেছিলেন তিনি তখন। ধীরে ধীরে তিনি এমন একটি চিকিৎসার উদ্ভাবন করলেন যাকে আমরা বলতে পারি আত্মার প্রত্নতত্ত্ব।'

'তার মানে?'

'সাংস্কৃতিক ইতিহাসের স্তরের পর স্তর খুঁড়ে দূর অতীতের নিশানা খুঁজে ফেরেন একজন প্রত্নতত্ত্ববিদ। হয়ত অষ্টাদশ শতকের একটা ছুরি খুঁজে পেলেন তিনি। মাটির আরও গভীরে তিনি হয়ত পেয়ে যেতে পারেন চতুর্দশ শতকের একটা চিরুনি। আর তার-ও গভীরে হয়ত খ্রিস্ট পূর্বাব্দ পঞ্চম শতকের একটা শবাধার।'

'তো?'

'একইভাবে, মনোবিশ্লেষকও রোগীর সহায়তায় তার মনের গহীন ভেতর খুঁড়ে এমন কিছু অভিজ্ঞতার কথা তুলে আনতে পারেন যা সেই রোগীর শারীরিক অসুস্থতার জন্য দায়ী, তার কারণ ফ্রয়েডের মত অনুযায়ী, আমাদের সমস্ত অভিজ্ঞতার স্মৃতি আমরা আমাদের মনের গভীরে জমা করে রাখি।'

'বুঝতে পারছি।'

'বিশ্লেষক হয়ত এমন একটি অসুখী ঘটনা আবিষ্কার করতে পারেন যেটা রোগীটি বহু বছর ধরে গোপন রাখার চেষ্টা করেছেন কিন্তু তারপরেও সেটি চাপা পড়ে থেকেছে, কুরে কুরে খেয়েছে রোগীটির অন্তরাত্মা। একটি 'যন্ত্রণাদায়ক অভিজ্ঞতা'কে মনের সচেতন স্তরে নিয়ে এসে, অর্থাৎ বলতে গেলে সেটি রোগীর সামনে তুলে ধরে সেই

বিশ্লেষক রোগীটিকে 'সেটি ঝেড়ে ফেলতে' এবং আবার সুস্থ হয়ে উঠতে সাহায্য করতে পারেন।'

'কথাটা তো বেশ যৌক্তিকই শোনাচ্ছে।'

'অবশ্য আমি লাফ দিয়ে বড্ড বেশি সামনে চলে গেছি প্রথমে চলো মানুষের মন সম্পর্কে ফ্রয়েডের বর্ণনাটার দিকে নজর দেয়া যাক। কখনো সদ্যোজাত কোনো শিশুকে দেখেছো?'

'আমার এক কাজিন আছে, চার বছর বয়স ওর।'

'আমরা যখন পৃথিবীতে আসি তখন আমরা আমাদের শারীরিক এবং মানসিক চাহিদার কথা সরাসরি এবং নির্লজ্জভাবে প্রকাশ করি। দুধ না পেলে অথবা যখন আমাদের ডায়াপার ভিজে যায় তখন আমরা কেঁদে উঠি। শারীরিক সংস্পর্শ এবং দেহগত উষ্ণতা পাওয়ার ইচ্ছার কথাও আমরা সরাসরি প্রকাশ করি। আমাদের ভেতরকার এই 'ইন্দ্রিয় পরিতোষের নীতি'-কে (pleasure principle) ফ্রয়েড বলছেন ইড (id)। সদ্যোজাত শিশু হিসেবে আমরা এই ইড ছাড়া আর কিছুই না।'

'বলে যান।'

'এই ইড বা ইন্দ্রিয় পরিতোষের নীতিকে আমরা আমাদের পরিণত বয়সে টেনে নিয়ে যাই এবং সারা জীবন-ই তা বহন করি। কিন্তু ধীরে ধীরে আমরা আমাদের কামনাগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করতে এবং চারপাশের সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে নিতে শিখি। ইন্দ্রিয় পরিতোষের নীতিকে আমরা 'বাস্তবিক নীতি' (reality principle) অনুযায়ী নিয়ন্ত্রণ করতে শিখি। ফ্রয়েডের ভাষায়, আমাদের মধ্যে একটি অহং (ego) জন্ম নেয় যার মধ্যে এই নিয়ন্ত্রণকারী ক্ষমতা আছে। কোনো কিছু আমরা চাইলে বা আমাদের প্রয়োজন হলেও আমরা সেটি না পাওয়া পর্যন্ত স্রেফ শুয়ে শুয়ে সেটির জন্য চেঁচাতে পারি না।'

'তা তো বটেই।'

'আমরা হয়ত এমন কিছু চাইতে পারি যা বাইরের জগৎ অনুমোদন করবে না। সেক্ষেত্রে আমরা আমাদের ইচ্ছে বা কামনাগুলোকে হয়ত *দমিয়ে রাখতে* পারি। তার মানে আমরা সেগুলোকে *ঠেলে* সরিয়ে দিয়ে ব্যাপারটা ভুলে যেতে পারি।'

'আচ্ছা।'

'যাই হোক, ফ্রয়েড মানবমনের তৃতীয় একটি উপাদানের কথা বললেন এবং সেটি নিয়ে কাজ করলেন। একেবারে ছোটবেলা থেকেই প্রতিনিয়ত আমরা আমাদের বাবা-মা অথবা সমাজের কিছু নৈতিক দাবির সম্মুখীন। অন্যায় কোনো কিছু করলেই আমাদের বাবা-মা বলে ওঠেন, 'ওটা কোরো না!' বা 'অ্যাই দুষ্টু, এটা কিন্তু ভালো না!' বড় হওয়ার পরেও এ-সব নৈতিক দাবি ও বিচারের প্রতিধ্বনি আমাদের মধ্যে রয়ে যায়। মনে হয়, জগতের নৈতিক প্রত্যাশাগুলো যেন আমাদের অংশ হয়ে গেছে। ফ্রয়েড একে বলেছেন *অতি-অহম* (superego)।'

'এটা কি বিবেকের প্রতিশব্দ?'

'বিবেক অতি-অহমের একটা অংশ। ফ্রয়েড দাবি করেছেন যে অতি-অহম আমাদের বলে দেয় কখন আমাদের ইচ্ছেগুলো 'খারাপ' বা 'অসঙ্গত' হচ্ছে, বিশেষ

করে যৌন ইচ্ছেগুলোর ব্যাপারে। আর আগেই বলেছি ফ্রয়েড দাবি করছেন এ-সব 'অসঙ্গত ইচ্ছে' শৈশবের একটা প্রাথমিক স্তরেই নিজেদের অস্তিত্ব জাহির করে বসে।'

'কীভাবে?'

'এখন আমরা জানি যে শিশুরা তাদের জননেন্দ্রিয় ছুঁতে পছন্দ করে। যে কোনো বীচে গেলেই সেটি দেখতে পাবো আমরা। ফ্রয়েডের সময় এ-ধরনের ঘটনার ফল হতে পারতো সেই দুই বা তিন বছরের শিশুটির আঙুলের ওপর একটা চড় আর সেই সঙ্গে হয়ত মায়ের বকুনি 'দুষ্টু কোথাকার' বা 'ওটা কোরো না!' বা 'হাত সরাও ওখান থেকে!'

'কী অসুস্থ মানসিকতা!'

'যৌনাঙ্গ আর যৌনতার সঙ্গে সম্পর্কিত সবকিছু সম্পর্কে অপরাধবোধের শুরুটা ওখান থেকেই। এই অপরাধবোধটি যেহেতু অতি-অহমে থাকে, তাই অনেক লোকই—ফ্রয়েডের মতে বেশির ভাগ লোকই—যৌন বিষয়ে একটা অপরাধবোধে ভোগে সারাজীবন। সেই সঙ্গে ফ্রয়েড এটাও দেখিয়েছেন যে যৌন কামনা এবং প্রয়োজন মানুষের জন্য স্বাভাবিক এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। তো, এভাবেই, বুঝলে সোফি, কামনা আর অপরাধবোধের মধ্যকার আজীবন দ্বন্দ্বের একটি ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়ে যায়।'

'আপনার কি মনে হয় না যে ফ্রয়েডের সময় থেকে সেই দ্বন্দ্বটা অনেকটাই কমে এসেছে?'

'অবশ্যই। কিন্তু ফ্রয়েডের অনেক রোগী এতো প্রবলভাবে সেই দ্বন্দ্বের মুখোমুখি হয়েছিলেন যে তাদের মধ্যে ফ্রয়েডের ভাষায় *স্নায়বিক পীড়া* জন্ম নিয়েছিল। যেমন ধরো, তাঁর অনেক মহিলা রোগীর একজন গোপনে তাঁর ভগ্নীপতির প্রেমে পড়েছিলেন। একটা অসুখে বোনটি মারা যাওয়ার পর সেই মহিলা ভাবলেন: 'এবার আর আমাকে বিয়ে করতে তার কোনো বাধা নেই!' ফ্রয়েড বলছেন এই চিন্তাটির সঙ্গে মহিলার অতি-অহমের একটা মুখোমুখি সংঘর্ষ বাধার উপক্রম হলো এবং চিন্তাটি এমনই ভয়ঙ্কর ছিল যে মহিলা তাৎক্ষণিকভাবে সেটি দমন করলেন। অন্য কথায় বলতে গেলে চিন্তাটিকে মহিলা তাঁর নির্জ্ঞান মনের গভীরে চাপা দিয়ে রাখলেন। ফ্রয়েড লিখছেন 'তরুণী মেয়েটি অসুস্থ হয়ে পড়ল এবং তার মধ্যে ভয়াবহ মৃগীরোগজনিত উপসর্গ দেখা দিল। আমি যখন মেয়েটির চিকিৎসা শুরু করলাম তখন মনে হলো তার বোনের শয্যাপার্শ্বের দৃশ্যটি এবং মেয়েটির মধ্যে যে ঘৃণ্য অহংভাবপূর্ণ আবেগের জন্ম নিয়েছিল সে-কথা সে পুরোপুরি ভুলে গেছে। কিন্তু মনোবিশ্লেষণের সময় সে-কথা তার মনে পড়ল এবং অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ একটা দশায় সেই রোগসৃষ্টিকারী মুহূর্তটিকে সে মনের মধ্যে আবার ফিরিয়ে আনল এবং এই চিকিৎসার ফলে সেরে উঠল।'

'আত্মার প্রত্নতত্ত্ব বলতে আপনি কী বোঝাতে চেয়েছিলেন সেটি আরও ভালো করে বুঝতে পারছি এখন।'

'কাজেই মানুষের মনের একটা সাধারণ বর্ণনা এবার দিতে পারি আমরা। রোগীদের চিকিৎসায় বহু বছরের অভিজ্ঞতার পর ফ্রয়েড এই সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন যে চেতন মন (conscious) মানব মনের নেহাতই একটা ক্ষুদ্র অংশ। চেতন মন হচ্ছে সমুদ্র পৃষ্ঠের ওপর জেগে থাকা আইসবার্গের ডগাটুকুমাত্র। সমুদ্রপৃষ্ঠের নিচে বা

চেতনার ওপারে রয়েছে বা *নির্জ্ঞান মন* (subconscious ev unconscious)।'

'তার মানে নির্জ্ঞান মন হচ্ছে আমাদের ভেতর যা কিছু বিস্মৃত অবস্থায় রয়েছে এবং যা আমরা মনে করতে পারি না তাই, ঠিক না?'

'আমরা আমাদের সমস্ত অভিজ্ঞতাকেই সব সময় আমাদের মনের মধ্যে সচেতনভাবে উপস্থিত থাকতে দেখি না। কিন্তু যে-ধরনের জিনিসের কথা আমরা ভেবেছি বা যা কিছু আমাদের জীবনে ঘটেছে এবং 'মনে করার চেষ্টা করলে' যে-সব কথা আমরা মনে করতে পারি তাকে ফ্রয়েড বলেছেন অবচেতন (preconscious)। 'নির্জ্ঞান মন' কথাটা তিনি উঠিয়ে রেখেছেন সেইসব জিনিস বোঝাতে যেগুলোকে আমরা দমিয়ে রেখেছি। তার মানে সেই ধরনের জিনিস যেগুলো ভোলার জন্য আমরা এজন্য চেষ্টা করেছিলাম যে সেগুলো হয় 'অপ্রীতিকর', 'অসঙ্গত' অথবা 'নোংরা'। আমাদের যদি এমন কোনো ইচ্ছা বা ভাবনা থাকে যেগুলো চেতন মনের কাছে অসহনীয় বলে বোধ হয় তখন অতি-অহম সেগুলো নিচের তলায় পাঠিয়ে দেয়। বিদেয় হোক ওসব!'

'বুঝতে পেরেছি।'

'সমস্ত সুস্থ লোকের মধ্যেই এই মেকানিজমটি কাজ করে। কিন্তু অপ্রীতিকর বস্তু বা নিষিদ্ধ চিন্তাকে চেতনার কাছ থেকে দূরে রাখতে গিয়ে কিছু লোকের ওপর এমন প্রচণ্ড চাপ পড়ে যে তা মানসিক রোগের জন্ম দেয়। এভাবে কোনো কিছুকে চাপা দিলে তা নিজের চেষ্টায় আবার চেতনার মধ্যে প্রবেশ করার চেষ্টা করবে। কোনো কোনো লোকের পক্ষে এ-ধরনের আবেগকে চেতন মনের সমালোচনাপূর্ণ চোখের নিচে রাখাটা খুব কঠিন হয়ে পড়ে। ১৯০৯ সালে ফ্রয়েড যখন আমেরিকায় মনোসমীক্ষণ নিয়ে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন তখন একটি উদাহরণ দিয়েছিলেন কী করে এই দমন প্রক্রিয়া কাজ করে।'

'সেটি শোনার ইচ্ছে হচ্ছে আমার!'

'তিনি বলেছিলেন 'মনে করুন এই হলঘরে এই অডিয়েন্সের মধ্যে, যে-অডিয়েন্সের অনুকরণীয় নিস্তব্ধতা এবং মনোযোগের যথেষ্ট প্রশংসা করা আমার সাধ্যাতীত, সেখানে এমন একজন ব্যক্তি রয়েছেন যিনি একটা ঝামেলা পাকাচ্ছেন এবং তিনি তাঁর অবশিষ্ট হাসি, কথা এবং পা ঘষটানির সাহায্যে আমার কাজ থেকে আমার মনোযোগ সরিয়ে দিচ্ছেন। আমি বুঝিয়ে বললাম যে এই পরিস্থিতিতে আমি আমার বক্তৃতা চালিয়ে যেতে পারবো না, ফলে আপনাদের মধ্যে থেকে কয়েকজন শক্ত-সমর্থ লোক উঠে গিয়ে খানিকটা ধ্বস্তাধ্বস্তির পর সেই শান্তিবিঘ্নকারীকে হলঘর থেকে বের করে দিলেন। তার মানে, তাকে এখন দমন করা হলো এবং আমি আমার বক্তৃতা চালিয়ে যেতে পারলাম। কিন্তু ঝামেলাটা আবার যাতে না হয় সেজন্য যে-লোকটিকে এই মাত্র বের করে দেয়া হলো তিনি যাতে জোর করে আবার ঘরে ঢুকতে না পারেন তাই যে-সব ভদ্রলোক আমার ইঙ্গিত বুঝতে পেরে সে-অনুযায়ী কাজ করেছিলেন তাঁরা তাঁদের চেয়ার নিয়ে দরজায় গিয়ে বসলেন প্রতিরোধ হিসেবে, সেই দমন প্রক্রিয়াটি চালিয়ে যাওয়ার জন্য। তো, এবার যদি এই দুটো জায়গাকে আপনারা মন-এ স্থানান্তরিত করেন এবং এটাকে *চেতন মন* বলে বাইরেরটাকে *নির্জ্ঞান মন* (unconscious) বলেন তাহলেই মোটামুটি চলনসই একটা বর্ণনা পেয়ে যাচ্ছেন সেই দমন-প্রক্রিয়ার।'

'আমি একমত।'

'কিন্তু সোফি, সেই শান্তিবিঘ্নকারী তো বারবার চেষ্টা চালাচ্ছে আবার ভেতরে ঢোকার। অন্ততপক্ষে দমিয়ে রাখা চিন্তা-ভাবনা এবং তাড়নাগুলো তাই করে। নির্জ্ঞান মন থেকে উঠে আসার চেষ্টা করতে থাকা দমিয়ে রাখা চিন্তা-ভাবনাগুলোর নিরন্তর চাপের মধ্যে থাকি আমরা। সেই জন্যই আমরা এমন কিছু কাজ করে বসি যা আমরা করতে চাইনি। অবচেতন প্রতিক্রিয়াগুলো এভাবেই আমাদের অনুভূতি এবং কাজকর্মকে উদ্বুদ্ধ করে।'

'একটা উদাহরণ দিতে পারেন?'

'এই মেকানিজমের বেশ কয়েকটি নিয়ে কাজ করেছেন ফ্রয়েড। তার মধ্যে একটা হচ্ছে আমরা যাকে বলি *মুখ বা কলম ফসকে কিছু বলে বা লিখে ফেলা* (parapraxes)। অন্য কথায় বলতে গেলে বলতে হয়, একসময় আমরা যে-ব্যাপারটা চেপে রাখতে গিয়েছিলাম সেটিই আমরা আকস্মিকভাবে বলে বা করে ফেলি। উদাহরণ দিতে গিয়ে ফ্রয়েড এক দোকানের এক ফোরম্যানের কথা বলেছেন যে তার বসের উদ্দেশে একটা টোস্ট করতে চাইছিল। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে সেই বস লোকটা ছিল ভীষণ রকমের অজনপ্রিয়। সাদা কথায় বলতে গেলে বসটি ছিল লোকে যাকে বলে সোয়াইন (swine) বা শুয়োর।'

'তারপর?'

'তো, ফোরম্যান উঠে দাঁড়াল, উঁচু করে ধরল নিজের গ্লাসটা, তারপর বলে উঠল, 'হিয়ার ইজ টু দ্য সোয়াইন!'

'কী সাংঘাতিক!'

'তা আর বলতে। তবে লোকটা আসলে ঠিক তাই বলেছিল যা সে সত্যি মনে করে। অবশ্য সেটি সে বলতে চায়নি। আরেকটা উদাহরণ শুনতে চাও?'

'ইয়েস, প্লিজ।'

'একবার, এক বিশপের চা খেতে আসার কথা স্থানীয় একজন ধর্মযাজকের বাড়িতে; সেই ধর্মযাজকের আবার বেশ কিছু ছোট ছোট নম্র-ভদ্র মেয়ে নিয়ে একটা বিরাট পরিবার। এদিকে বিশপের নাকটা ছিল বেখাপ্পা রকমের বড় আকারের। ছোট্ট মেয়েগুলোকে পই পই করে বলে দেয়া হলো তারা যেন কোনো অবস্থাতেই বিশপের নাক নিয়ে কিছু না বলে, কারণ বাচ্চাদের মধ্যে অবদমনকারী মেকানিজম তখনও পুরোপুরি গড়ে না ওঠায় বড়দের সম্পর্কে অনেক সময় তারা মুখ ফসকে অনেক বেফাঁস কথা বলে বসে। যাই হোক, বিশপ এলেন, উল্লসিত কন্যারা প্রাণপণে নিজেদের সংযত করে রাখল তাঁর নাক নিয়ে কোনো মন্তব্য না করার জন্য। চেষ্টা করল যেন নাকটার দিকে নজরই না পড়ে তাদের, চেষ্টা করল ওটার কথা ভুলে যেতে। কিন্তু তারপরেও সারাক্ষণই ওটার কথা মনে পড়তে লাগল ওদের। তো, এমন সময় একজনকে বলা হলো চিনিটা এগিয়ে দিতে। বিশিষ্ট বিশপের দিকে তাকিয়ে মেয়েটি তখন বলে উঠল, 'আপনি কি আপনার নাকে চিনি নেন?'

'কী ভয়ঙ্কর!'

'আরেকটা যে-কাজ আমরা করতে পারি তা হলো যুক্তি প্রয়োগ করা

(rationalise)। তার মানে হচ্ছে আমরা যা করছি তার আসল কারণটা আমরা নিজেদের বা অন্যের কাছে বলছি না, তার কারণ সেই আসল কারণটা অগ্রহণযোগ্য।'

'যেমন?'

'তোমাকে আমি সম্মোহিত করে একটা জানালা খোলাতে পারি। তুমি সম্মোহিত অবস্থায় থাকাকালীন তোমাকে বললাম *যে* টেবিলের ওপর আমি আঙুল দিয়ে তুড়ি বাজাতে শুরু করলেই তুমি উঠে গিয়ে জানালা খুলে দেবে। আমি তুড়ি বাজাতে শুরু করলাম আর তুমি জানালা খুলে দিলে। পরে আমি তোমাকে যখন জিজ্ঞেস করলাম কেন তুমি জানালাটা খুললে তখন তুমি বলতে পারো যে বড্ড গরম পড়েছে সেজন্য। অথচ সেটি কিন্তু আসল কারণ নয়। তুমি যে আমার সম্মোহক আদেশ পালন করতে গিয়ে কাজটা করেছো সেটি তুমি স্বীকার করতে চাইছো না। তাই তুমি একটা যুক্তি দেখাচ্ছে।'

'হ্যাঁ, বুঝতে পারছি।'

'এ-ধরনের ব্যাপার আমরা কার্যত প্রতিদিনই দেখে থাকি।'

'আমার এই চার-বছর বয়সী কাজিনটা, আমার মনে হয় না যে ওর বেশি বন্ধু-বান্ধব আছে, তাই আমি বেড়াতে গেলে সব সময়ই খুশি হয় ছেলেটা। একদিন আমি তাকে বললাম তাড়াতাড়ি বাসায় ফিরে যেতে হবে আমাকে মা'র কাছে। আপনি জানেন ও কী বলল?'

'কী বলল?'

'বলল যে আমার মা একটা স্টুপিড!'

'হ্যাঁ, এটা আসলেই যুক্তি প্রয়োগের একটা ঘটনা। ছেলেটা আসলে ঠিক ও-কথা বলতে চায়নি। সে বলতে চেয়েছে যে তোমাকে যে চলে যেতে হবে এই ব্যাপারটা স্টুপিড। কিন্তু ছেলেটা এতোই লাজুক যে কথাটা বলতে পারছিল না। অন্য আরেকটা যে-কাজ করি আমরা তা হলো *অভিক্ষেপণ করা* (project)।'

'সেটি আবার কী?'

'আমরা যখন অভিক্ষেপণ করি তখন আমরা আমাদের নিজেদের যে-সব বৈশিষ্ট্য চেপে রাখতে চাইছি সেগুলো অন্যের ওপর আরোপ করি। যেমন ধরো, যে-লোক হাড় কেপ্পন সে-লোক অন্যদেরকেও কঞ্জুস হিসেবে বর্ণনা করবে। আর যে-লোক স্বীকার করতে চায় না যে সে সব সময় যৌনতা তাড়িত থাকে, দেখা যাবে সে-ই অন্য কারও যৌন আসক্তির ব্যাপারে সবার আগে তেড়ে উঠছে।'

'হুম!'

'ফ্রয়েড দাবি করলেন যে, আমাদের দৈনন্দিন জীবন এ-ধরনের নির্জ্ঞান (unconscious) মেকানিজমে পরিপূর্ণ। বিশেষ কোনো লোকের নাম ভুলে যাই আমরা, কথা বলার সময় বেখেয়ালে নিজেদের গায়ের জামা-কাপড় ধরে টানি অথবা ঘরের মধ্যে অহেতুক এটা-ওটা জিনিস এদিক-সেদিক সরাই। এছাড়াও, আমরা কথা বলতে গিয়ে শব্দ হাতড়ে বেড়াই, মুখ বা কলম ফসকে এমন কথা বলে বা লিখে ফেলি যা দেখে মনে হতে পারে সেগুলো পুরোপুরি নির্দোষ। ফ্রয়েডের বক্তব্য হচ্ছে, এ-সব ভুল ততোটা আকস্মিক বা নির্দোষ মোটেই নয় যতটা আমরা ভাবি। সত্যি বলতে কী, তালগোল পাকানো এ-সব কাজ অত্যন্ত গোপন কিছু কথা ফাঁস করে দিতে পারে।'

'এখন থেকে আমার সব কথা খুব সাবধানে খেয়াল করবো আমি।'

'তারপরেও তুমি তোমার অবচেতন তাড়না বা আবেগের কাছ থেকে পালাতে পারবে না মোক্ষম কৌশলটা হচ্ছে অপ্রীতিকর ব্যাপার-স্যাপার অবচেতনের মধ্যে চাপা দেয়ার ব্যাপারে খুব বেশি চেষ্টা না করা। ব্যাপারটা জলইঁদুরের বাসার মুখ বন্ধের চেষ্টা করার মতো। এ-ব্যাপারে তুমি নিশ্চিত থাকতে পারো যে ইঁদুরটা বাগানের অন্য কোনো না কোনো জায়গা ফুঁড়ে মাথাচাড়া দেবেই। চেতন আর অবচেতনের মধ্যকার দরজাটা খোলা রাখাটাই আসলে স্বাস্থ্যের জন্য ভালো খুব।'

'দরজাটা বন্ধ করে দিলে লোকে মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে, ঠিক?'

'হ্যাঁ। একজন স্নায়বিক পীড়াগ্রস্ত (neurotic) মানুষ তিনিই যিনি তার চেতনাজগৎ থেকে 'অপ্রীতিকর' জিনিসকে দূরে সরিয়ে রাখতে খুব বেশি শক্তি ব্যয় করেন। বিশেষ একটা অভিজ্ঞতাকে চাপা দিতে মরিয়া হয়ে চেষ্টা করেন তিনি বারবার। তারপরেও কিন্তু তিনি তার সেই গোপন যন্ত্রণার সূত্র খুঁজে পেতে ডাক্তারের সাহায্যের জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠতে পারেন।'

'ডাক্তার কাজটা কী করে করেন?'

'ফ্রয়েড একটা কৌশল আবিষ্কার করেছিলেন, যার নাম তিনি দিয়েছিলেন *অবাধ অনুষঙ্গ* (free association)। অন্য কথায় বলতে গেলে, রোগীকে তিনি আয়েস করে শুতে দিয়ে তার মনে যা আসে-তা সে যতই অপ্রাসঙ্গিক, আকস্মিক, অপ্রীতিকর বা অস্বস্তিকর শোনাক না কেন-স্রেফ তাই-ই বলতে দিতেন। উদ্দেশ্যটা হলো সেই যন্ত্রণাগুলোর ওপর যে 'ঢাকনা' পড়েছে বা 'নিয়ন্ত্রণ' আরোপিত হয়েছে সেটি ভেঙে ফেলা, তার কারণ এ-সব যন্ত্রণাই রোগীকে অস্থির করে তুলছে। সব সময়ই সক্রিয় আছে সেগুলো, যদিও ঠিক সচেতনভাবে নয়।'

'কোনো জিনিস যতই ভুলে থাকার চেষ্টা করুন না কেন ততোই সেটি অবচেতনভাবে আরও বেশি করে মনে পড়ে যায়, এটাই তো?'

'ঠিক তাই। আর সেই কারণেই অবচেতন থেকে আসা ইঙ্গিতগুলো সম্পর্কে সচেতন থাকাটা এত জরুরি। ফ্রয়েডের মত অনুযায়ী, নির্জ্ঞান মনগামী রাজপথ হচ্ছে আমাদের স্বপ্নগুলো। তাঁর প্রধান কাজ *দি ইন্টারপ্রিটেশন্স অভ্ ড্রিমস* এই বিষয়ের ওপরেই লেখা আর সেটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৯০০ সালে। তাতে তিনি দেখিয়েছেন যে আমাদের স্বপ্নগুলো আকস্মিক কোনো ব্যাপার নয়। স্বপ্নের মাধ্যমেই আমাদের চেতন মনের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করে আমাদের নির্জ্ঞান মন।'

'বলে যান।'

'রোগীদের নিয়ে বহু বছরের গবেষণার পর এবং অবশ্যই তাঁর নিজের স্বপ্নগুলো ব্যাখ্যা করে ফ্রয়েড এই দৃঢ় সিদ্ধান্তে পৌঁছান যে আমাদের সব স্বপ্নই ইচ্ছাপূরণ সংক্রান্ত। তিনি বললেন, শিশুদের মধ্যে তা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান। আইসক্রিম আর চেরি ফলের স্বপ্ন দেখে তারা। কিন্তু বড়দের বেলায়, পূরণ হতে চাওয়া ইচ্ছেগুলো থাকে ছদ্মবেশে। তার কারণ হলো, নিজেদেরকে আমরা যে-সব কাজ করতে দিতে চাই তার ওপর একটা সেন্সরশীপ এমনকি ঘুমিয়ে থাকার সময়ও চলতে থাকে। আর যদিও এই সেন্সরশিপ বা দমন প্রক্রিয়া আমাদের জাগ্রত অবস্থায় যতটা সক্রিয় থাকে তার চেয়ে

অনেক দুর্বল হয়ে পড়ে ঘুমের সময়, তারপরেও সেটি আমাদের স্বপ্নগুলোর মধ্যে সেই সব ইচ্ছেকে এমনভাবে বিকৃত করে ফেলে যে সেগুলোকে আমরা চিনতে পারি না।'

'সেজন্যই স্বপ্ন ব্যাখ্যা দেবার দরকার হয়।'

'ফ্রয়েড দেখিয়েছেন যে, সকালে উঠে আমরা যে-স্বপ্নটির কথা মনে করি সেই আসল স্বপ্ন আর স্বপ্নটার আসল অর্থের মধ্যকার পার্থক্যের কথা যেন আমরা অবশ্যই বিবেচনায় রাখি। সত্যিকারের স্বপ্নের ছবিটিকে, অর্থাৎ যে 'ফিল্ম' বা 'ভিডিও'-টি আমরা স্বপ্নে দেখি, সেটির নাম দিয়েছেন ফ্রয়েড *ব্যক্ত স্বপ্ন* (manifest dream)। স্বপ্নের এই 'আপাত' বিষয়বস্তু সব সময়ই সেটির উপাদান বা দৃশ্যপট সংগ্রহ করে আগের দিন থেকে। কিন্তু স্বপ্নটার মধ্যে গভীরতর একটা অর্থও থাকে, যেটা চেতনার কাছ থেকে লুকানো থাকে। ফ্রয়েড একে বলছেন *সুপ্ত স্বপ্ন চিন্তা* (latent dream thoughts) আর এই সব গুপ্ত চিন্তা, যে-সব নিয়েই আসলে স্বপ্নটি, সেগুলো দূর অতীত এই যেমন একেবারে আদি শৈশব থেকেও উৎসারিত হতে পারে।'

'তার মানে একটা স্বপ্নকে বুঝতে হলে আগে সেটিকে বিশ্লেষণ করতে হবে।'

'হ্যাঁ আর মানসিকভাবে অসুস্থ রোগীর বেলায় সে-কাজটা করতে হবে থেরাপিস্টের সঙ্গে। তবে ডাক্তার কিন্তু স্বপ্নটার ব্যাখ্যা করেন না। রোগীর সাহায্য নিয়েই কেবল কাজটা করা সম্ভব তার পক্ষে। এ-রকম পরিস্থিতিতে ডাক্তার স্রেফ এক সক্রেটিসীয় 'ধাত্রী'-র ভূমিকা পালন করেন, সেই ব্যাখ্যার কাজে সাহায্য করেন।'

'আচ্ছা।'

'সুপ্ত স্বপ্ন চিন্তাকে ব্যক্ত স্বপ্ন উপাদানে রূপান্তরিত করার সত্যিকারের প্রক্রিয়ার নাম দিয়েছিলেন ফ্রয়েড *স্বপ্নকৃতি* (dream work)। আমরা এটাকে বলতে পারি স্বপ্নটা যা নিয়ে তার ওপর আবরণ দেয়া বা সেটিকে সাংকেতিক রূপ দেয়া। স্বপ্নের ব্যাখ্যা দেয়ার সময় আমাদেরকে অবশ্যই এর উল্টো প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে যেতে হবে এবং স্বপ্নটার বিষয়বস্তুতে পৌঁছতে *উপাদান*-এর (motif) আবরণ ঘুচিয়ে ফেলতে হবে বা সেটিকে ডিকোড করতে হবে।'

'একটা উদাহরণ দিতে পারেন?'

'ফ্রয়েডের বইয়ে উদাহরণের কোনো কমতি নেই। তবে আমরা নিজেরাই সহজ এবং একান্তই ফ্রয়েডীয় একটা উদাহরণ তৈরি করে নিতে পারি। ধরা যাক, একটি যুবক স্বপ্ন দেখল তার এক তুতো বোন তাকে দুটো বেলুন উপহার দিয়েছে...'

'তো?'

'তো, তুমি নিজেই স্বপ্নটার ব্যাখ্যা দেয়ার চেষ্টা করো না।'

'হুম্...এখানে একটা ব্যক্ত স্বপ্ন আছে, ঠিক যেমনটি আপনি বলেছিলেন এক যুবক তার তুতো বোনের কাছ থেকে দুটো বেলুন পেল।'

'বলে যাও।'

'আপনি বলেছেন দৃশ্যপটটা আসে সব সময় আগের দিনটি থেকে। কাজেই আগের দিন সে নিশ্চয়ই মেলায় গিয়েছিল বা সে হয়ত বেলুনের ছবি দেখেছিল খবরের কাগজে।'

'সেটি অবশ্য সম্ভব। তবে তার কিন্তু 'বেলুন' শব্দটা দেখলেই চলে বা এমন কিছু যা তাকে বেলুনের কথা মনে করিয়ে দিয়েছিল।'

'কিন্তু স্বপ্নটা আসলে যা নিয়ে সেই সুপ্ত চিন্তাগুলো কী?'

'তুমিই বলো। তুমিই তো ব্যাখ্যা দেবে।'

'হয়ত সে স্রেফ কয়েকটা বেলুন চেয়েছিল।'

'না, এভাবে হবে না। তবে তুমি ঠিকই বলেছ যে স্বপ্ন হলো আসলে একটা ইচ্ছাপূরণ। কিন্তু কোনো যুবক এক জোড়া বেলুন খুব তীব্রভাবে চাইছে এমনটা খুব কমই ঘটে। আর চাইলেও সেটি নিয়ে স্বপ্ন দেখার দরকার পড়বে না তার।'

'আমার মনে হয় আমি বুঝতে পেরেছি আসলে সে তার সেই তুতো বোনকে চায় আর বেলুন দুটো হলো মেয়েটির দুই স্তন।'

'হ্যাঁ, এই ব্যাখ্যাটা অনেক বেশি যুক্তিসঙ্গত। আর, এটা আগে থেকেই ধরে নেয়া যায় যে যুবকটির ইচ্ছেটা তার জন্য অস্বস্তির একটা কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।'

'এক অর্থে তাহলে, আমাদের স্বপ্নগুলো অনেক ঘোরানো-প্যাঁচানো?'

'হ্যাঁ, ফ্রয়েড বিশ্বাস করতেন যে আমাদের স্বপ্ন হচ্ছে 'একটি অবদমিত ইচ্ছার ছদ্ম পরিপূর্ণতা লাভ'। তবে আমরা ঠিক কী অবদমিত করেছি সেটি ফ্রয়েড যখন ভিয়েনায় ডাক্তার ছিলেন সে-সময় থেকে যথেষ্ট পরিমাণ বদলে যেতে পারে। অবশ্য স্বপ্নের ছদ্মবেশী বিষয়বস্তু-র মেকানিজমটা একই রয়ে যেতে পারে।'

'হ্যাঁ, বুঝতে পারছি।'

'১৯২০-এর দশকে ফ্রয়েডের মনোসমীক্ষণ ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষ করে বিশেষ কিছু মনোরোগীর চিকিৎসার ক্ষেত্রে। শিল্প-সাহিত্যের জন্যও কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল তাঁর নির্জ্ঞান মনের তত্ত্ব।'

'শিল্পীরাও মানুষের নির্জ্ঞান মানবিক জীবন সম্পর্কে উৎসাহী হয়ে উঠেছিলেন বুঝি?'

'ঠিক তাই, অবশ্য ফ্রয়েডের মনোসমীক্ষণের কথা প্রচারিত হওয়ার আগেই, ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকের সাহিত্যে এই ব্যাপারটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। তার মানে স্রেফ এই যে বিশেষ সেই সময়ে ১৮৯০-এর দশকে, ফ্রয়েডের মনোসমীক্ষণের আবির্ভাব নেহাত কাকতালীয় ব্যাপার ছিল না।'

'তার মানে আপনি বলতে চান সেই সময়কার স্পিরিটের মধ্যেই ওটা ছিল?'

'অবদমন (repression), প্রতিরক্ষামূলক প্রক্রিয়া (defense mechanism) বা যুক্তি প্রয়োগ (rationalizing)-এর মতো ঘটনা তিনি আবিষ্কার করেছেন বলে ফ্রয়েড নিজে কখনো দাবি করেননি। এ-সব মানবীয় অভিজ্ঞতা তিনিই প্রথম মনোরোগবিদ্যায় প্রয়োগ করেছেন মাত্র। সাহিত্যিক উদাহরণ দিয়ে নিজের তত্ত্ব ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রেও ওস্তাদ ছিলেন তিনি। কিন্তু যেমনটি আমি আগেই বলেছি, ১৯২০-এর দশক থেকে ফ্রয়েডের মনোসমীক্ষণ শিল্প ও সাহিত্যের ওপর আরও প্রত্যক্ষ প্রভাব ফেলতে শুরু করে।'

'কোন অর্থে?'

'কবি এবং চিত্রকররা, বিশেষ করে পরাবাস্তবাদীরা অবচেতন মনের শক্তি ব্যাপারটা কাজে লাগাতে চেষ্টা করেছেন তাঁদের কাজে।'

'পরাবাস্তবাদীরা কারা?'

'পরাবাস্তব (suerrealism) শব্দটা এসেছে ফরাসি ভাষা থেকে এবং এর অর্থ

হচ্ছে অতি-বাস্তবতা (super realism)। ১৯২৪ সালে আঁদ্রে ব্রেতোঁ (André Breton) একটি পরাবাস্তববাদী ইশতেহার প্রকাশ করেন, তাতে তিনি দাবি করেন যে অবচেতন মন থেকেই শিল্পের জন্ম হওয়া উচিত। এভাবেই শিল্পী সম্ভাব্য সবচেয়ে স্বাধীন অনুপ্রেরণা লাভ করেন তাঁর স্বপ্নের প্রতিচ্ছবি থেকে এবং কঠোর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবেন একটি 'অতি-বাস্তবতা' অর্জনের দিকে, যেখানে স্বপ্ন এবং বাস্তবতার মধ্যে সীমারেখা মুছে গেছে। সচেতন মনের সেন্সরশীপ ভাঙা এবং শব্দ ও ছবিকে স্বাধীনভাবে কাজ করতে দেয়াটা একজন শিল্পীর জন্যও জরুরি হতে পারে।'

'সেটি বুঝতে পারছি।'

'এক অর্থে, ফ্রয়েড দেখিয়েছেন যে প্রত্যেকের মধ্যেই একজন শিল্পী রয়েছে। শত হলেও, একটি স্বপ্ন ছোট্ট একটি শিল্পকর্ম আর প্রতিদিনই নতুন নতুন স্বপ্ন দেখি আমরা। তাঁর রোগীদের স্বপ্নের ব্যাখ্যা দেয়ার জন্য ফ্রয়েডকে প্রায়ই প্রতীকের একটা নিবিড় দুর্বোধ্য ভাষার ভেতর দিয়ে পথ করে এগোতে হতো। একটা ছবি বা সাহিত্যিক কোনো রচনা আমরা যেভাবে ব্যাখ্যা করি সেভাবে নয়।'

'প্রত্যেক রাতেই কি আমরা স্বপ্ন দেখি?'

'সাম্প্রতিক গবেষণা বলছে যে আমরা আমাদের ঘুমের সময়ের বিশ শতাংশ সময় অর্থাৎ প্রতি রাতের এক থেকে দুই ঘণ্টা সময় ধরে স্বপ্ন দেখি। ঘুমের সময় যদি আমাদের বিরক্ত করা হয় তখন আমরা নার্ভাস এবং বিরক্ত হয়ে পড়ি। এর অর্থ স্রেফ এই যে প্রত্যেকেরই তার অস্তিত্বসূচক অবস্থার শৈল্পিক অভিব্যক্তি প্রকাশ করার সহজাত একটা প্রবৃত্তি আছে। শত হলেও, আমরা তো আমাদেরকে নিয়েই স্বপ্ন দেখি। আমরাই পরিচালক, আমরাই দৃশ্যপট রচনা করি এবং বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করি। যে-লোক বলে সে শিল্প বোঝে না সে আসলে নিজেকে ভালোভাবে চেনে না।'

'সেটি বুঝতে পারছি।'

'মানব মনের নানান বিস্ময় সম্পর্কে সমীহ্ জাগানো কিছু প্রমাণও ফ্রয়েড হাজির করেছেন। তাঁর রোগীদের নিয়ে কাজ করে তিনি এই ব্যাপারে নিশ্চিত হন যে আমরা যা দেখেছি, যে-সব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে গিয়েছি তার সবই আমরা আমাদের চেতনার গভীরে কোনো এক জায়গায় জমা করে রাখি। এবং এই অতীতস্মৃতির সবকিছুকেই আবার আলোতে নিয়ে আসা যায়। আমরা যখন কোনো কিছু মনে করতে গিয়ে ব্যর্থ হই আর তার একটু পরেই 'সেটি আমাদের জিভের ডগায় এসে পড়ে' এবং তারও খানিক পরে 'সেটি হঠাৎ করে মনে পড়ে যায়', তখন আমরা আসলে সেই বিষয়টার কথা বলি যা আমাদের নির্জ্ঞান মনে রয়ে গেছে আর হঠাৎ করেই আধ-খোলা দরজা দিয়ে সুড়ুৎ করে ঢুকে পড়েছে চেতনায়।'

'কিন্তু কখনো কখনো ব্যাপারটা বেশ সময় নেয়।'

'সব শিল্পী-ই এ-ব্যাপারে সচেতন। কিন্তু হঠাৎ করেই যেন সব দরজা আর দেরাজ হাট হয়ে খুলে যায়। সবকিছুই নিজে নিজে গড়িয়ে পড়তে থাকে আর আমরা পেয়ে যাই আমাদের দরকারি সব শব্দ, সব ছবি। এটা ঘটে তখন যখন আমরা নির্জ্ঞান মনের 'ঢাকনাটা তুলে ফেলি'। সোফি, এ-ব্যাপারে আমরা *অনুপ্রেরণা* (inspiration) বলতে পারি। মনে হয় যেন যা কিছু আমরা আঁকছি বা লিখছি তা যেন আসছে বাইরের

কোনো উৎস থেকে।'

'অনুভূতিটা নিশ্চয়ই খুব চমৎকার।'

'কিন্তু তোমার নিজেরও নিশ্চয়ই এ-রকম অভিজ্ঞতা হয়েছে। অতিক্রান্ত হয়ে পড়া বাচ্চাদের মধ্যেও অনুপ্রেরণা জিনিসটিকে কাজ করতে দেখবে তুমি প্রায়ই। মাঝে মাঝে তারা এতোই ক্লান্ত হয়ে পড়ে যে তাদেরকে দেখে মনে হয় তারা একেবারে পুরোপুরি জেগে আছে। হঠাৎ করেই একটা গল্প বলতে শুরু করে তারা, যেন যে-সব শব্দ বা কথা তারা এখনো শেখেনি সেগুলো কোথা থেকে পেয়ে যাচ্ছে তারা। আসলে অবশ্য সেগুলো তাদের জানা শব্দই; সেই শব্দ আর ধারণাগুলো তাদের চেতনায় 'সুপ্ত' অবস্থায় রয়েছে, কিন্তু এখন যখন সব সাবধানতা আর সেন্সরশীপ উধাও হয়ে গেছে, বেরিয়ে আসছে সেগুলো। কম-বেশি অসচেতন কোনো অভিব্যক্তিকে যুক্তি আর গভীর চিন্তা দিয়ে নিয়ন্ত্রিত হতে না দেয়াটাও একজন শিল্পীর জন্য গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। ব্যাপারটা বোঝানোর জন্য ছোট্ট একটা গল্প বলি?'

'নিশ্চয়ই।'

'গল্পটা কিন্তু খুবই সিরিয়াস আর করুণ।'

'ঠিক আছে।'

'কোনো এক সময় শত-পা-বিশিষ্ট একটা প্রাণী ছিল যে তার একশোটা পায়ের সবকটিই ব্যবহার করে দুর্দান্ত নাচ নাচতে পারতো। সে যখনই নাচতো, বনের সব প্রাণী এসে জড়ো হতো তার নাচ দেখার জন্য। আর যথারীতি তারা সবাই মুগ্ধ হয়ে যেতো তার সেই চমৎকার নাচ দেখে। অবশ্য একজন ছাড়া। একটা কচ্ছপ কিছুতেই সহ্য করতে পারতো না শতপদী সেই প্রাণীটির নাচ।'

'সেটি সম্ভবত হিংসার কারণে।'

'কী করে শতপদীটির নাচ বন্ধ করা যায় এই শুধু চিন্তা কচ্ছপটার। সে তো আর গিয়ে সোজা-সাপ্টা বলতে পারে না যে তার নাচ তার পছন্দ নয়। আর সে নিজে যে ওটার চেয়ে ভালো নাচে সে-কথাও তো সে বলতে পারে না, কারণ সেটি হবে নেহাতই সত্যের অপলাপ মাত্র। কাজেই শয়তানি একটা বুদ্ধি আঁটলো সে।'

'কী সেটি, শোনা যাক।'

'শতপদী প্রাণীটির কাছে একটা চিঠি লিখতে বসে গেল সে। 'হে অতুলনীয় শতপদী, তোমার দুর্দান্ত নাচের আমি একজন একনিষ্ঠ ভক্ত। নাচের সময় তুমি কীভাবে পা ফেল আমার তা জানতেই হবে। তুমি কি তোমার ২৮ নম্বর বাম পা ওঠানোর পর ৩৯ নম্বর ডান পা ওঠাও? নাকি তুমি তোমার ৪৪ নম্বর বাম পা ওঠানোর আগে ১৭ নম্বর ডান পা উঠিয়ে নাচ শুরু করো? রুদ্ধশ্বাস প্রত্যাশা নিয়ে তোমার উত্তরের অপেক্ষায় রইলাম। তোমার বিশ্বস্ত, কচ্ছপ।'

'কী নীচ!'

'চিঠিটা পড়ার পরই শতপদীটি ভাবতে বসে গেল নাচার সময় আসলেই সে কী করে তাই নিয়ে। কোন পা-টা আগে ওঠায় সে? এবং তারপর কোনটা? শেষ পর্যন্ত কী হলো বলো তো দেখি?'

'শতপদীটা নিশ্চয়ই আর কোনোদিন নাচতে পারল না, তাই না?'

'ঠিক তাই। কল্পনাকে যৌক্তিক চিন্তা-ভাবনা যখন গলা টিপে মারে তখন ঠিক এমনটাই ঘটে।'

'খুবই করুণ গল্পটা।'

'মুক্ত হতে' পারাটা একজন শিল্পীর জন্য গুরুত্বপূর্ণ। পরাবাস্তববাদীরা এটাকেই কাজে লাগাতে চেয়েছিলেন এমন একটা অবস্থায় নিজেদের ফেলে দিয়ে যখন সবকিছুই আপনা-আপনি ঘটে যাচ্ছে। তাঁদের সামনে সাদা একটা কাগজ থাকতো এবং কী লিখছেন সে-ব্যাপারে কোনো চিন্তা-ভাবনা না করেই লিখতে শুরু করতেন তাঁরা। এটাকে বলতেন তাঁরা *স্বয়ংক্রিয় লেখা* (automatic writing)। কথাটা এসেছে আসলে আধ্যাত্মবাদ (spiritualism) থেকে। সেখানে একজন মাধ্যম (medium) থাকেন যিনি বিশ্বাস করেন যে একটি বিদেহী আত্মা তাঁর কলমকে গাইড করছে। কিন্তু আমি ভেবেছিলাম এ-নিয়ে কালকে আলাপ করবো আমরা।'

'ঠিক আছে।'

'এক অর্থে, একজন পরাবাস্তববাদী শিল্পীও একজন মাধ্যম,অর্থাৎ একটা উপায় বা সংযোগ। তিনি তাঁর নিজের অবচেতনের মাধ্যম। তবে সমস্ত সৃজনশীল প্রক্রিয়ার মধ্যেই সম্ভবত নির্জ্ঞান মনের ব্যাপার আছে, কারণ, সৃজনশীলতা বলতে আসলে আমরা কী বোঝাই?'

'আমার কোনো ধারণা নেই। ব্যাপারটা কি কোনো কিছু সৃষ্টি করা নয়?'

'ভালোই বলেছো আর সেটি ঘটে কল্পনা ও যুক্তির মধ্যে একটা সূক্ষ্ম পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে। কিন্তু বেশিরভাগ সময়ই দেখা যায়, যুক্তি কল্পনার টুঁটি চেপে ধরে আর সেটি কিন্তু ভয়ঙ্কর একটা ব্যাপার, কারণ কল্পনা ছাড়া সত্যিকারের নতুন জিনিস কখনোই সৃষ্টি হবে না। আমার ধারণা, কল্পনা হচ্ছে একটা ডারউইনীয় পদ্ধতির মতো।'

'দুঃখিত, এটা ঠিক বুঝলাম না!'

'মানে, ডারউইনবাদ অনুযায়ী, প্রকৃতির মিউট্যান্টগুলো একটির পর একটি দেখা দিলেও তাদের মধ্যে অল্পকটিকেই কেবল ব্যবহার করা যায়। মাত্র অল্পকটিই বাঁচার অধিকার লাভ করে।'

'তো?'

'আমরা যখন কোনো অনুপ্রেরণা আর একরাশ নতুন ধারণা পাই তখনও ঠিক একই ব্যাপার ঘটে। চেতনার মধ্যে চিন্তা-মিউট্যান্টগুলো দেখা দিতে থাকে একের পর এক, অন্তত আমরা যদি নিজেদের ওপর বড্ড বেশি সেন্সরশীপ আরোপ না করি সেক্ষেত্রে। তো, এ-সব চিন্তার অল্পকটিকেই কেবল ব্যবহার করা চলে। এখানে যুক্তি আপনা আপনিই চলে আসে। এটারও কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা কাজ রয়েছে। দিনের সংগ্রহগুলো টেবিলের ওপর বিছিয়ে রাখার পর সেগুলো থেকে ঝাড়াই-বাছাই করতে যেন ভুলে না যাই আমরা।'

'তুলনাটা নেহাত মন্দ না।'

'একবার কল্পনা করে দেখো তো 'আমাদের মাথায় যা আসে' তার সবকিছুকেই যদি উচ্চারণ করতে দেয়া হয় তাহলে কী হবে! ডেস্কের দেরাজের ভেতর থেকে

আমাদের নোটপ্যাডগুলো লাফ দিয়ে বেরিয়ে আসার কথা তো বাদই দেয়া গেল। আকস্মিক আবেগের ভারে ডুবে যেতো গোটা জগৎ, কোনো ধরনের ঝাড়াই-বাছাইয়ের বালাই থাকতো না।'

'যুক্তিই তাহলে এ-সব আইডিয়ার ভেতর থেকে বেছে নেয়ার কাজটা করে?'

'হ্যাঁ, তোমারও কি তাই মনে হয় না? যে-জিনিসটা নতুন সেটি হয়ত কল্পনা-ই তৈরি করে কিন্তু আসল নির্বাচনের কাজটা কল্পনা করে না। কল্পনা 'সৃজন' (compose) করে না। শিল্পের প্রতিটি কাজই আসলে যা সেই সৃজনকর্মটি ঘটে কল্পনা আর যুক্তি বা মন আর চিন্তা-ভাবনার ভেতর একটা আশ্চর্য পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে, কারণ, সৃজনশীল প্রক্রিয়ার ভেতর দৈব-র (chance) একটা ভূমিকা সব সময়ই থাকবে। মেষ চরাতে হলে আগে তো সেগুলো তোমাকে ছেড়ে দিতে হবে।'

জানালার বাইরে তাকিয়ে একেবারে স্থির হয়ে বসে রইলেন অ্যালবার্টো। আর, তিনি যখন ওখানে বসে আছেন, সোফি হঠাৎ লেকের ধারে উজ্জ্বল বর্ণের কিছু ডিজনী চরিত্রের একটা জটলা লক্ষ করল।

'ওই যে গুফি,' বলে উঠল সোফি, 'আর ডোনাল্ড ডাক আর তার ভাগ্নেরা...দেখুন, অ্যালবার্টো। আছে মিকি মাউস আর...'

সোফির দিকে ঘুরে তাকালেন তিনি। 'হ্যাঁ, ব্যাপারটা বেশ করুণ, দুঃখের।

'তার মানে ?'

'আমাদেরকে এখানে মেজরের ভেড়ার পালের অসহায় শিকার বানানো হচ্ছে। অবশ্য, দোষটা আমার নিজের। অবাধ অনুষঙ্গের কথাটা আমিই তুলেছিলাম।'

'নিজেকে আপনার কোনোভাবেই দোষী সাব্যস্ত করার দরকার নেই...

'আমি আসলে আমাদের মতো দার্শনিকদের কাছে কল্পনার গুরুত্বের ব্যাপারে কিছু বলতে যাচ্ছিলাম। নতুন চিন্তা-ভাবনা করার জন্য নিজেদেরকে মুক্ত হতে দেয়ার মতো যথেষ্ট সাহসী আমাদেরকে হতেই হবে। তবে এই মুহূর্তে লোকটা একটু বাড়াবাড়ি করছে।'

'সে-নিয়ে চিন্তা করবেন না।'

'এক্ষুণি আমি অনুধ্যানের (reflection) গুরুত্বের কথা বলতে যাচ্ছিলাম, অথচ দেখো, আমাদের সামনে হাজির করা হলো এই ছেলেমানুষি মূর্খামি। নিজের কাজে নিজেরই লজ্জা হওয়া উচিত লোকটার।'

'আপনি বুঝি আয়রনিকভাবে বললেন কথাটা এখন।'

'আয়রনিক সে, আমি নই। তবে একটা ব্যাপারে স্বস্তিতে আছি আমি—আর সেটিই আমার পরিকল্পনার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ।'

'এবার কিন্তু আমি আসলেই সব তালগোল পাকিয়ে ফেলছি।'

'স্বপ্ন নিয়ে কথা বলেছি আমরা। সেটিতেও আয়রনির ছোঁয়া আছে খানিকটা। কারণ, মেজরের স্বপ্নের প্রতিচ্ছবি ছাড়া আমরা আর কী, বলো?'

'ওহ্।'

'কিন্তু তারপরেও, একটা জিনিস কিন্তু ভেবে দেখেনি সে।'

'কী সেটি?'

'হতে পারে সে তার স্বপ্ন সম্পর্কে অস্বস্তিকরভাবে সচেতন। আমরা যা বলি আর করি তার সবকিছু সম্পর্কেই সচেতন সে, ঠিক যেমন যে মানুষটি স্বপ্ন দেখছে সে স্বপ্নের 'ব্যক্ত স্বপ্নের' ব্যাপারটা মনে রাখে। সে-ই তার কলম দিয়ে এ-সব করছে। কিন্তু যদিও আমরা পরস্পরকে যা বলি তার সবকিছুই সে মনে রাখে, তারপরেও কিন্তু এখনো পুরোপুরি ঘুম ভাঙেনি তার।'

'কী বলতে চাইছেন?'

'সুপ্ত স্বপ্ন চিন্তাগুলোর কথা সে জানে না, সোফি। সে ভুলে যাচ্ছে যে এটাও একটা ছদ্ম স্বপ্ন।'

'আপনার কথাবার্তা বড্ডো অদ্ভুত শোনাচ্ছে।'

'মেজর তাই মনে করছে। তার কারণ, সে তার নিজের স্বপ্নের ভাষা বুঝতে পারছে না। সেজন্য আমাদের কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। এতে করে যৎকিঞ্চিত স্বাধীনতা পাচ্ছি আমরা, বুঝলে। আর এই স্বাধীনতাটুকু নিয়েই শিগগিরই আমরা তার ঘোলাটে সচেতনতার বাইরে জোর করে বেরিয়ে আসবো, গরমকালে জলইঁদুর রোদের মধ্যে যেমন তিড়িং বিড়িং করে লাফায় ঠিক সে-রকম করে।'

'আপনার কি মনে হয় কাজটা আমরা করতে পারবো?'

'পারতেই হবে আমাদের। দু'-এক দিনের মধ্যেই তোমার সামনে নতুন একটা দিগন্ত খুলে দেবো আমি। তখন মেজর আর জানবে না জলইঁদুরগুলো কোথায় রয়েছে বা এরপর কোথায় মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে তারা।'

'কিন্তু হলামই না হয় আমরা স্রেফ স্বপ্নছবি, তারপরেও আমি আমার মায়ের মেয়ে। পাঁচটা বেজে গেছে। ক্যাপ্টেনের বাঁকে আমার বাড়িতে গিয়ে গার্ডেন পার্টির প্রস্তুতি নিতে হবে আমাকে।'

'হুম...বাড়ি ফেরার পথে আমার একটা ছোট্ট উপকার করতে পারবে?'

'কী?'

'বাড়তি খানিকটা মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা কোরো। চেষ্টা কোরো পুরো পথটা মেজর যাতে তোমার দিকেই নজর রাখে কেবল। বাড়ি পৌঁছে তার কথা চিন্তা করার চেষ্টা কোরো। তখন সে-ও তোমার কথা ভাববে।'

'তাতে লাভ?'

'তাহলে আমি আমার গোপন পরিকল্পনাটা নিয়ে নির্বিঘ্নে কাজ করতে পারবো। মেজরের অবচেতন মনে ডুব দিতে যাচ্ছি আমি। ফের আমাদের দেখা হওয়ার আগ পর্যন্ত সেখানেই থাকবো আমি।'

আমাদের নিজেদের কাল

...মানুষ মুক্ত হওয়ার শাস্তিপ্রাপ্ত...

অ্যালার্ম ঘড়িতে রাত ১১টা বেজে ৫৫ মিনিট। সিলিংয়ের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে শুয়ে আছে হিল্ডা। সে তার অনুষঙ্গগুলোকে স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়াতে দিল। প্রতিবার চিন্তার একটা মালা গাঁথা শেষ হলে পর সে নিজেকে জিজ্ঞেস করার চেষ্টা করল কেন এমনটা হলো।

সে কি তাহলে কিছু একটা দমন করার চেষ্টা করছে?

শুধু যদি সব ধরনের সেন্সরশীপ সে একপাশে সরিয়ে রাখতে পারতো, তাহলে হয়ত সুড়ুৎ করে চলে যেতে পারতো সে একটা দিবাস্বপ্নের ভেতর। ব্যাপারটা একটু ভূতুড়ে, ভাবল সে।

যতোই সে শরীরটা শিথিল করে নিয়ে নিজেকে এলোপাতাড়ি চিন্তা-ভাবনার হাতে ছেড়ে দিল ততোই তার মনে হলো সে যেন বনের ধারে লেকের ছোট্ট কেবিনটার মধ্যে রয়েছে।

অ্যালবার্টো কী ফন্দি আঁটতে পারে? অবশ্য এ-কথা ঠিক যে আসলে হিল্ডার বাবাই ফন্দি আঁটছেন যে অ্যালবার্টো কিছু একটার ফন্দি আঁটছে। অ্যালবার্টো কী করবে তা কি তিনি এরই মধ্যে জেনে গিয়েছিলেন? সম্ভবত তিনি নিজেকে বাড়তি স্বাধীনতা দেয়ার চেষ্টা করছিলেন যাতে শেষে যাই ঘটুক সেটি তার জন্য বিস্ময় হয়ে দেখা দেয়।

খুব বেশি পৃষ্ঠা আর বাকি নেই এখন। শেষ পৃষ্ঠায় একটি উঁকি মেরে দেখে নেবে নাকি সে? না, সেটি চুরির শামিল হয়ে যাবে। আর তাছাড়া, হিল্ডা এ-ব্যাপারে নিশ্চিত যে শেষ পৃষ্ঠায় কী ঘটবে তা আগে থেকে ঠিক করে রাখা হয়নি মোটেও।

চিন্তাটা কেমন অদ্ভুত না? রিং বাইন্ডারটা ঠিক এখানেই আছে আর তার বাবাও সম্ভবত বাড়তি কিছু যোগ করার জন্য সময়মতো চলে আসবে না এখানে। অন্তত অ্যালবার্টো নিজে কিছু করার আগ পর্যন্ত নয়। একটা বিস্ময়...

অবশ্য বিস্ময় হিল্ডার নিজের কাছেও মজুদ আছে অল্প কিছুর। তার বাবা তাকে নিয়ন্ত্রণ করেননি। কিন্তু নিজের নিয়ন্ত্রণেও কি সে রয়েছে পুরোপুরি?

চেতনা কী? এটাই কি মহাবিশ্বের সবচেয়ে বড় ধাঁধা নয়? স্মৃতি কী? আমরা যা দেখেছি, যে-সব অভিজ্ঞতা আমাদের হয়েছে সে-সব আমাদের 'মনে থাকে' কী করে?

কোন ধরনের মেকানিজম রাতের পর রাত দুর্দান্ত সব স্বপ্ন তৈরি করায় আমাদের

দিয়ে?

একটু পরপর চোখ বন্ধ করল সে। তারপর আবার চোখ মেলে ফের তাকিয়ে রইল সিলিংয়ের দিকে। একসময় ভুলে গেল সে চোখ মেলার কথা।

ঘুমিয়ে পড়ল সে।

একটা গাঙচিলের কর্কশ ডাক তার ঘুম ভাঙাতে বিছানা ছেড়ে নেমে এলো হিল্ডা। বরাবরের মতো ঘর পেরিয়ে জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়াল সে, তাকিয়ে রইল উপসাগরটার দিকে। গ্রীষ্মে-শীতে, এটা একটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে তার।

সে যখন ওখানে দাঁড়িয়ে আছে হঠাৎ তার মনে হলো তার মাথার ভেতর একরাশ আলোর বিস্ফোরণ ঘটছে। কী স্বপ্ন দেখেছে সেটি মনে পড়ে গেল তার। কিন্তু সেটির সুস্পষ্ট রং আর আকৃতির কারণে সেটিকে তার আর দশটা সাধারণ স্বপ্ন থেকে আলাদা করে মনে হলো...

সে স্বপ্ন দেখেছে যে তার বাবা লেবানন থেকে বাড়ি ফিরেছেন আর এই গোটা স্বপ্নটাই ডকের ওপর সোনার তৈরি যিশুর ক্রুশবিদ্ধমূর্তি পাওয়ার যে-স্বপ্ন সোফি দেখেছিল সেটিরই একটা সম্প্রসারণ।

একদম সোফির স্বপ্নটার মতোই ডকের কিনারায় বসে ছিল হিল্ডা। হঠাৎ করেই সে শুনতে পেল অত্যন্ত নরম একটা গলায় কে যেন ফিসফিস করে বলছে, 'আমার নাম সোফি'। যেখানে ছিল সেখানেই বসে রইল হিল্ডা, একেবারে স্থির হয়ে, কথাটা কোত্থেকে আসছে সেটি বোঝার জন্য। চলতেই থাকল ব্যাপারটা, শোনা যায় কি যায় না এমন একটা খসখস শব্দ, যেন একটা পোকা কথা বলছে তার সঙ্গে, 'তুমি নিশ্চয়ই অন্ধ আর কালা'। ঠিক সেই মুহূর্তে তার বাবা জাতিসংঘের ইউনিফর্ম পরে বাগানে ঢুকলেন। 'হিল্ডা'! চেঁচিয়ে ডেকে উঠলেন তিনি। এক ছুটে তার কাছে গিয়ে বাবার গলা জড়িয়ে ধরল হিল্ডা। তখনই শেষ হয়ে গেল স্বপ্নটা।

আরনাল্ফ ওভারল্যান্ড-এর (Arnulf Overland) একটা কবিতার কয়েকটা চরণ মনে পড়ে গেল তার।

অদ্ভুত এক স্বপ্ন দেখে আর যেন
আমার সঙ্গে বহু দূরের এক অন্তঃসলিলা জলধারার
মতো কথা-বলা একটা কণ্ঠস্বর শুনে এক রাতে জেগে উঠে
আমি শুধালাম কী চাও তুমি আমার কাছে?

তার মা যখন ঘরে ঢুকলেন তখনো সে জানলার কাছে দাঁড়িয়ে।

'কী রে! জেগে গেছিস এরই মধ্যে?'

'ঠিক জানি না...'

'বরাবরের মতো চারটার দিকে বাড়ি ফিরব।'

'ঠিক আছে, মা।'

'ছুটির দিনটা ভালো কাটুক তোর, মা।'

'তোমার-ও যেন দিনটা ভালো কাটে, মা।'

সদর দরজাটা মা সশব্দে বন্ধ করে দিয়েছেন শুনতে পেয়ে রিং বাইন্ডারটা নিয়ে সুড়ুৎ করে আবার বিছানায় গিয়ে উঠল সে।

'মেজরের অবচেতন মনে ডুব দিতে যাচ্ছি আমি। ফের আমাদের দেখা হওয়ার আগ পর্যন্ত ওখানেই থাকবো আমি।'

ওখানেই, হ্যাঁ। ফের পড়তে শুরু করলো হিল্ডা। সে অনুভব করতে পারল তার ডান হাতের তর্জনীর নিচে মাত্র অল্প কটি পৃষ্ঠা বাকি আছে আর।

সোফি যখন মেজরের কেবিন থেকে বেরিয়ে এলো তখনো পানির ধারে কয়েকটা ডিজনী চরিত্র নজরে পড়ল তার, কিন্তু তাদের দিকে সে এগিয়ে যেতেই সেগুলো যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেল।

নৌকো চালানোর সময় ভেংচি কাটতে লাগল সে, তারপর সেটি অপর পাড়ে নলখাগড়ার ভেতর টেনে তুলে রেখে দুই হাত চারদিকে ছুঁড়তে লাগল। কেবিনে যাতে অ্যালবার্টো নির্বিঘ্নে থাকতে পারেন সেজন্য মেজরের মনোযোগ কাড়তে মরিয়া হয়ে কাজ করে যাচ্ছিল সোফি।

কখনো এক পায়ে লাফিয়ে, কখনো থেমে থেমে, নাচতে নাচতে পথ চলতে লাগল সোফি। কলের পুতুলের মতো হাঁটার চেষ্টা করল সে। মেজরের মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্য গান গাইতেও শুরু করে দিল সে। একসময় সে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল, ভাবতে লাগল অ্যালবার্টোর ফন্দিটা কী হতে পারে। খানিক পর একটা গাছ বেয়ে উঠতে শুরু করল সে।

যতটুকু পারল ততটুকু উঁচুতে উঠে এলো সোফি। যখন প্রায় আগায় পৌঁছে গেছে, তখন সে বুঝতে পারল নিচে নামতে পারছে না সে। আরেকবার চেষ্টা করার আগে একটু অপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিল সে। কিন্তু এই সময়টা স্রেফ চুপচাপ বসে থাকতে পারল না সে। তাহলে তো তার দিকে নজর রেখে ক্লান্ত হয়ে গিয়ে অ্যালবার্টো কী করছেন সেদিকে মনোযোগ দিয়ে ফেলবে মেজর।

হাত দুটো নাড়তে লাগল সোফি, বার কয়েক চেষ্টা চালাল মোরগের মতো ডাকার তারপর শেষ পর্যন্ত ইউড্‌ল[২৭] (yodle) গাইতে শুরু করল সে। সোফি তার পনেরো বছরের জীবনে এই প্রথমবারের মতো ইউড্‌ল গাইল। সবকিছু বিবেচনা করে ফলাফলটা বেশ সন্তুষ্ট করল তাকে।

আবারও চেষ্টা করল সে নিচে নামার, কিন্তু আসলেই সে আটকে গেছে। হঠাৎ বিশাল একটা হাঁসি এসে বসলো সোফি যে-ডাল আঁকড়ে ঝুলে আছে সেটির ওপর। সদ্য একদল ডিজনী চরিত্র দেখার পর সোফি মোটেই অবাক হলো না যখন সে দেখল হাঁসিটা কথা বলে উঠল।

'আমার নাম মর্টেন,' হাঁসিটা বলল। 'আসলে আমি পোষা হাঁসি। কিন্তু বিশেষ এই উপলক্ষে আমি সেই লেবানন থেকে উড়ে এসেছি বুনো হাঁসের সঙ্গে। তোমাকে দেখে

২৭. ঐতিহ্যবাহী সুইস ঢঙে, বারে বারে স্বর স্বাভাবিক থেকে একেবারে উঁচুতে তুলে গাওয়া বিশেষ এক ধরনের গান। অনুবাদক।

মনে হচ্ছে এই গাছ থেকে নামার জন্য খানিকটা সাহায্য দরকার তোমার।'

'তুমি তো পিচ্চি, আমাকে সাহায্য করবে কী?'

'তুমি কিন্তু হুট করে সিদ্ধান্তে পৌছতে যাচ্ছ, ইয়াং লেডি। তুমিই বরং বড্ড বেশি বড়।'

'একই কথা হলো, তাই না?'

'তোমাকে জানাতে ইচ্ছে করছে যে ঠিক তোমার বয়সী এক চাষী ছেলেকে গোটা সুইডেনের ওপর দিয়ে বয়ে বেড়িয়েছি আমি। তার নাম ছিল নিল্‌স হোলগারসন।'

'আমার বয়স পনেরো।'

'নিল্‌সের ছিল চৌদ্দ। এক বছরের কম-বেশিতে ফ্রেইটের ক্ষেত্রে তেমন কোনো ইতর বিশেষ হয় না।'

'ওকে তুললে কী করে তুমি?'

'ছোট্ট একটা থাপ্পড় মেরেছিলাম ওকে, ও অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল। জ্ঞান হওয়ার পর বুড়ো আঙুলের চেয়ে ছোট্ট হয়ে গিয়েছিল ও।'

'তাহলে তুমি বোধকরি আমাকেও ছোট্ট একটা থাপ্পড় মারতে পারো, কারণ আমি তো আর চিরকাল ওপরে বসে থাকতে পারি না। তাছাড়া শনিবার আবার একটা দার্শনিক গার্ডেন পার্টি দিচ্ছি আমি।'

'মজার তো। আন্দাজ করছি, এটা তাহলে একটা দর্শনের বই। নিল্‌স্ হোলগারসনকে নিয়ে আমি যখন সুইডেনের ওপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছিলাম তখন আমরা ভার্মল্যান্ডের মার্বাকায় নেমেছিলাম, সেখানে এক বৃদ্ধা মহিলার সঙ্গে দেখা হয়েছিল নিলস্-এর, যিনি স্কুলের বাচ্চাদের জন্য সুইডেনের ওপর একটা বই লেখার পরিকল্পনা করছিলেন। তিনি বলেছিলেন বইটাকে একই সঙ্গে নির্দেশনামূলক আর সত্যি হতে হবে। নিল্‌সের অ্যাডভেঞ্চারের কথা শুনে তিনি ঠিক করেছিলেন হাঁসের পিঠে বসে নিল্‌স্ যে-সব জিনিস দেখেছিল সে-সব নিয়ে একটা বই লিখবেন তিনি।'

'খুব অদ্ভুত তো।'

'সত্যি কথা বলতে কী, ব্যাপারটা খানিকটা আয়রনিকই ছিল বটে, তার কারণ তার আগেই আমরা ওই বইটাতে ছিলাম।'

হঠাৎ সোফির মনে হলো কী যেন থাপ্পড় বসালো তার গালে আর পর মুহূর্তেই একটা বুড়ো আঙুলের চেয়েও ছোট হয়ে গেল সে। গাছটা হয়ে গেল গোটা একটা বনের মতো আর হাঁসিটা হয়ে গেল একটা ঘোড়ার মতোই বিরাট।

'এসো, তাহলে,' বলে উঠল হাঁসিটা।

ডালটা ধরে হেঁটে গিয়ে হাঁসিটার পিঠে চড়ে বসল সোফি। ওটার পালকগুলো যদিও নরম, কিন্তু সে এতো ছোট হয়ে পড়ায় সেগুলো এখন তাকে সুড়সুড়ি দেয়ার বদলে খোঁচা দিতে লাগল।

সে আরাম করে বসতেই উড়াল দিল হাঁসিটা। গাছগাছালির মাথার ওপর দিয়ে উড়ে চলল তারা। নিচে লেক আর মেজরের কেবিনটার দিকে তাকাল সোফি। ভেতরে বসে আছেন অ্যালবার্টো, আঁটছেন তাঁর ক্রূর ফন্দি।

বার বার ডানা ঝাপটাতে ঝাপটাতে হাঁসিটা বলল, "ছোট্ট একটা সাইটসিয়িং

ট্যুর-ই যথেষ্ট হবে আজকের জন্যে" ।

এই কথা বলেই, সোফি খানিক আগেই যে-গাছটাতে চড়তে শুরু করেছিল সেটির গোড়ায় নামার জন্য প্রস্তুতি নিল সেটি । হাঁসিটা মাটি ছুঁতেই নিচে গড়িয়ে পড়ল সোফি । লতাগুল্মের ভেতর বার কয়েক ওলট-পালট খাওয়ার পর উঠে বসল সে । অবাক হয়ে সে দেখল নিজের আগের আকার ফিরে পেয়েছে সে ।

হেলে দুলে তার চারপাশে বার কয়েক হেঁটে বেড়াল হাঁসিটা ।

'তোমার সাহায্যের জন্য অনেক ধন্যবাদ,' সোফি বলল ।

'নেহাতই সামান্য ব্যাপার ওটা । তুমি বললে না এটা একটা দর্শনের বই?'

'না, কথাটা তুমি বলেছ ।'

'ওই একই হলো । ব্যাপারটা যদি আমার হাতে থাকতো তাহলে নিল্‌স্ হোলগারসনকে আমি যেভাবে সুইডেনের ভেতর দিয়ে উড়িয়ে নিয়ে গেছি তোমাকেও দর্শনের ইতিহাসের ভেতর দিয়ে উড়িয়ে নিয়ে যেতাম । মিলেটাস আর এথেন্স, জেরুজালেম আর আলেকজান্দ্রিয়া, রোম আর ফ্লোরেন্স, লন্ডন আর প্যারিস, জেনা আর হাইডেলবার্গ, বার্লিন আর কোপেনহেগেনের ওপর দিয়ে উড়ে বেড়াতে পারতাম আমরা ।'

'ধন্যবাদ, এটুকুই যথেষ্ট ।'

'অবশ্য, খুব আয়রনিক একটা হাঁসির পক্ষেও শতাব্দীর পর শতাব্দীর ভেতর দিয়ে উড়ে বেড়ানো বড্ড ওজনদার একটা ব্যাপার হতো । সুইডিশ প্রদেশগুলো পাড়ি দেয়াই বরং অনেক সহজ হতো ।'

এই কথা বলে হাঁসিটা কয়েক পা দৌড়ে, ডানা ঝাপটে শূন্যে উড়ে চলে ।

ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল সোফি; কিন্তু একটু পর গুহা থেকে হামাগুড়ি দিয়ে বাগানে চলে এসে সে ভাবল তার এইসব চিত্ত-বিক্ষেপ ঘটানো কাজ-কর্মে অ্যালবার্টোর যথেষ্ট খুশি হওয়ার কথা । গত এক ঘণ্টায় মেজর নিশ্চয়ই খুব বেশি কিছু চিন্তা করতে পারেনি অ্যালবার্টোকে নিয়ে । যদি পেরে থাকে সেক্ষেত্রে তাকে খুবই প্রবল দুই বিরুদ্ধ-সত্তা বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের অধিকারী হতে হয়েছে ।

সোফি সবে সদর দরজার কাছে গিয়ে পৌঁছেছে এমন সময় তার মা কাজ থেকে বাড়ি ফিরলেন । তাতে করে লম্বা একটা গাছ থেকে পোষা একটা হাঁসি তাকে কী করে উদ্ধার করল সে গল্প মাকে বলা থেকে বেঁচে গেল সে ।

ডিনারের পর গার্ডেন পার্টির জন্য সব কিছু ঠিকঠাক করতে শুরু করল তারা দু'জন । চিলেকোঠা থেকে চার মিটার লম্বা একটা টেবিল-টপ আর অস্থায়ী পায়া নামিয়ে বাগানে নিয়ে গেল তারা ।

ফলের গাছগুলোর নিচে লম্বা টেবিলটা বসাবে বলে আগেই ঠিক করে রেখেছিল ওরা । শেষ যে-বার অস্থায়ী পায়ার ওপর বসানো টেবিলটা ব্যবহার করা হয়েছিল সেটি ছিল সোফির বাবা-মায়ের বিয়ের দশম বার্ষিকী । মাত্র আট বছর বয়স তখন সোফির, কিন্তু ওদের সমস্ত বন্ধু-বান্ধব আর আত্মীয়-স্বজনের অংশ নেয়া বিশাল পার্টিটার কথা দিব্যি মনে পড়ে সোফির ।

আবহাওয়ার পূর্বাভাস যারপরনাই ভালো । সোফির জন্মদিনের আগের দিনের

সেই ভয়ঙ্কর ঝড়-জলের পর থেকে এক ফোঁটা বৃষ্টিও হয়নি। তারপরেও টেবিল বসানো আর সাজসজ্জার আসল কাজটা শনিবার সকালের জন্য রেখে দেয়ারই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল তারা।

'পরে সেদিন সন্ধ্যায় ভিন্ন দুই ধরনের রুটি বেক্ করল ওরা। চিকেন আর সালাদ সার্ভ করা হবে। আর সোডা। তার ক্লাসের কয়েকটা ছেলে বিয়ার নিয়ে আসবে শুনে সোফি চিন্তিত। সে যদি একটা জিনিসকেও ভয় করে থাকে তা হলো সমস্যা।

সোফি যখন বিছানায় যাচ্ছে তখন তার মা আরও একবার জানতে চাইলেন অ্যালবার্টো পার্টিতে আসছেন কিনা।

'আলবৎ আসবেন। উনি এমনকি একটা ফিলসফিকাল ট্রিক দেখাবেন বলেও প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।'

'ফিলসফিকাল ট্রিক? সেটি আবার কী ধরনের ট্রিক ?'

'কোনো ধারণা নেই...উনি জাদুকর হলে নিশ্চয়ই জাদুর ট্রিক দেখাতেন। হয়ত একটা টুপির ভেতর থেকে বের করে আনতেন সাদা একটা খোরগোশ... ।'

'কী , আবার?'

'কিন্তু তিনি যেহেতু দার্শনিক তাই তার বদলে তিনি একটা ফিলসফিকাল ট্রিক দেখাবেন। শত হলেও, এটা একটা ফিলসফিকাল গার্ডেন পার্টি। তুমিও কি কিছু করার কথা ভাবছো?'

'সত্যি বলতে কী, ভাবছি।'

'বক্তৃতা জাতীয় কিছু?'

'সেটি বলছি না। গুড নাইট, সোফি!'

পরদিন বেশ সকালে সোফিকে ঘুম থেকে ডেকে তুললেন তার মা, কাজে যাওয়ার আগে তাকে বিদায় জানাতে এসেছিলেন তিনি। গার্ডেন পার্টির জন্য শেষ মুহূর্তের কিছু কেনাকাটার একটা তালিকা ধরিয়ে দিলেন তিনি সোফির হাতে।

তার মা বাড়ি থেকে বেরুতেই বেজে উঠল ফোনটা। অ্যালবার্টোর ফোন। নিশ্চয়ই তিনি জানতে পেরেছেন ঠিক কখন সোফি বাসায় একলা থাকবে।

'আপনার গোপন ব্যাপার-স্যাপার-এর কী অবস্থা?'

'শ্‌শ্‌ ! একটা কথাও নয়। লোকটাকে এ-নিয়ে চিন্তা পর্যন্ত করতে দিও না।'

'আমার মনে হয় গতকাল আমি ওর মনোযোগ ধরে রাখতে পেরেছিলাম।'

'গুড।'

'দর্শন কোর্স কি শেষ ?'

'সেজন্যই ফোন করলাম তোমাকে। এরই মধ্যে আমরা আমাদের শতাব্দীতে চলে এসেছি। এখন থেকে নিজেকে নিজেই চালাতে পারা উচিত তোমার। ভিত্তিটাই ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু তারপরেও, আমাদের নিজেদের কাল সম্পর্কে ছোট্ট একটা আলোচনার জন্য বসতেই হবে আমাদের।'

'কিন্তু আমাকে তো শহরে যেতেই হবে...

'দ্যাট্‌স এক্সেলেন্ট। আমি বলেছিলাম আমাদের নিজেদের কাল নিয়ে কথা বলার ছিল আমাদের।'

'তাই?'

'মানে বলতে চাইছি, সেজন্যই শহরে দেখা করাটা সবচেয়ে কাজের হবে।'

'আমি কি আপনার ওখানে যাবো।'

'না, না, এখানে না। সবকিছু ওলট-পালট হয়ে আছে। লুকোনো মাইক্রোফোন খুঁজে মরছি আমি।'

'আহা!'

'মেইন স্কোয়্যারে সদ্য একটা ক্যাফে খোলা হয়েছে। ক্যাফে পিয়ের। চেনো তুমি ওটা?'

'হ্যাঁ। কখন যাবো ওখানে?'

'বারোটার সময় দেখা করি আমরা?'

'ঠিক আছে। বাই!'

বারোটা বাজার মিনিট কয়েক পরে ক্যাফে পিয়ের-এ ঢুকল সোফি। ছোট ছোট গোলটেবিল আর কালো চেয়ার, ডিসপেন্সারে উল্টো করে রাখা ভার্মুথ বোতল আর স্যান্ডউইচ নিয়ে নতুন নতুন যে-সব কেতাদুরস্ত জায়গা তৈরি হয়েছে এটা তারই একটা।

ঘরটা ছোট এবং প্রথমেই সোফির যেটা নজরে পড়ল তা হচ্ছে অ্যালবার্টো ওখানে নেই। গোলটেবিলগুলোতে অনেকেই বসে আছে, কিন্তু সোফি কেবল দেখল যে তাদের মধ্যে অ্যালবার্টো নেই।

একা একা ক্যাফেতে যাওয়ার অভ্যেস নেই সোফির। সে কি স্রেফ উল্টে ঘুরে চলে যাবে, পরে এসে দেখবে উনি এসেছেন কিনা?

মার্বেল পাথরের বার-এ গিয়ে এক কাপ লেবু চা-র অর্ডার দিল সে, তারপর বসে পড়ল ফাঁকা একটা টেবিলে। দরজার দিকে তাকিয়ে রইল সে। সারাক্ষণই লোকজন আসছে যাচ্ছে, কিন্তু এখনো অ্যালবার্টোর দেখা নেই।

একটা খবরের কাগজও যদি থাকত তার কাছে।

খানিকটা সময় যেতে চারদিকে তাকাতে শুরু করল সোফি। জবাবে কয়েকটা চকিত দৃষ্টি ফেরত পেল সে। মুহূর্তের জন্য নিজেকে একজন তরুণী নারী বলে মনে হলো সোফির। বয়স মাত্র পনেরো তার, কিন্তু সতেরো হিসেবেও বেশ চালিয়ে দেয়া যেতে পারে তাকে-নিদেন পক্ষে সাড়ে ষোল।

বেঁচে থাকা নিয়ে এই লোকগুলো সবাই কী মনে করে ভাবল সোফি। তাদের দেখে মনে হচ্ছে স্রেফ এসে পড়েছে তারা এখানে, যেন নেহাত দৈব বলে এখানে এসে বসে পড়েছে তারা। কথার তুবড়ি ফোটাচ্ছে সবাই, হাত-পা-শরীর নাচাচ্ছে বেজায় রকম, কিন্তু দেখে মনে হচ্ছে না যে তেমন গুরুত্বপূর্ণ কোনো ব্যাপারে কথা বলছে তারা।

হঠাৎ করেই কিয়েের্কেগার্ডের কথা মনে পড়ে গেল তার, যিনি বলেছিলেন একটা ভিড়কে সবচেয়ে বেশি বৈশিষ্ট্য দান করে সেটির অসল বকবকানি। এই লোকগুলো কি সবাই ভোগী স্তরে আছে? নাকি এমন কিছু আছে যা অস্তিত্বগতভাবে তাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ?

সোফিকে লেখা চিঠিগুলোর গোড়ার দিকের একটায় শিশু আর দার্শনিকের মধ্যে মিলের কথা বলেছিলেন অ্যালবার্টো। সোফি আবারও উপলব্ধি করল যে বড় হওয়ার ব্যাপারে একটা ভয় আছে তার। মহাবিশ্বের টপ হ্যাটের ভেতর থেকে বের করে আনা সাদা খরগোশটার রোমের ভেতর হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকে পড়ার পরিণতিটা যদি তারও হয়!

দরজার ওপর নজর ছিল তার। হঠাৎ-ই ভেতরে ঢুকলেন অ্যালবার্টো। যদিও এখন মধ্যগ্রীষ্ম কিন্তু একটা কালো বেরে আর হেরিংবোন টুইডের ধূসর, নিতম্ব-অব্দি পৌঁছানো একটা কোট পরে আছেন তিনি। ত্বরিত পায়ে সোফির কাছে চলে এলেন তিনি। লোকজনের মধ্যে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে অদ্ভুত একটা অনুভূতি হলো সোফির।

'সোয়া বারোটা বাজে এখন।'

'এটাকে বলে কোনো ঘন্টার অ্যাকাডেমিক কোয়ার্টার। একটা স্ন্যাক নেবে?'

বসে পড়লেন তিনি, তাকালেন সোফির চোখের দিকে। শ্রাগ করল সোফি।

'নিশ্চয়ই। এই...একটা স্যান্ডউইচ।'

উঠে কাউন্টারে গেলেন অ্যালবার্টো। শিগ্গিরই এক কাপ কফি আর দুটো স্যান্ডউইচ সঙ্গে চিজ আর হ্যাম নিয়ে ফিরে এলেন তিনি।

'খুব দামি বুঝি?'

'সামান্য ব্যাপার, সোফি।'

'দেরি করার কোনো কারণ দেখাতে পারেন আপনি?'

'না। কাজটা ইচ্ছে করেই করেছি আমি। কেন সেটি একটু পরেই বলছি।'

তাঁর বিরাট স্যান্ডউইচটার বার কয়েক কামড় বসালেন তিনি। তারপর বললেন 'এবার আমাদের শতাব্দী নিয়ে কথা বলা যাক।'

'দর্শনগতভাবে কৌতূহলকর কিছু ঘটেছে?'

'অনেক...নানান ধরনের আন্দোলনের খই ফুটছে চারদিকে। খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা দিক দিয়ে শুরু করবো আমি আর সেটি হলো অস্তিত্ববাদ (existentialism)। অগুনতি যে-সব দার্শনিক স্রোতধারা মানুষের অস্তিত্বগত অবস্থা থেকে যাত্রা শুরু করেছে সেগুলোরই দলবদ্ধ নাম এটা। সাধারণভাবে আমরা বিংশ শতাব্দীর অস্তিত্ববাদীদের কথাই বলে থাকি। এ-সব অস্তিত্ববাদী দার্শনিক বা অস্তিত্ববাদীর অনেকেই শুধু যে কিয়ের্কেগার্ডের ওপর ভিত্তি করেই তাঁদের ধ্যান-ধারণাগুলো তৈরি করেছিলেন তা নয়, করেছিলেন হেগেল আর মার্কসের ওপর ভিত্তি করেও।'

'আচ্ছা।'

'বিংশ শতাব্দীর ওপর যে আরেকজন দার্শনিক প্রবল প্রভাব বিস্তার করেছিলেন তিনি জার্মান *ফ্রিডরিখ নিট্শে* (Friedrich Nietzsche)। জন্ম ১৮৪৪ সালে, মৃত্যু ১৯০০-তে। তিনিও হেগেলের দর্শন এবং জার্মান 'হিস্টরিসিজম'-এর বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছিলেন। ইতিহাস বিষয়ে যৎসামান্য আগ্রহ আর যাকে তিনি বলেছিলেন খ্রিস্টীয় 'দাস নৈতিকতা'-এই দুইয়ের পাল্টা ব্যবস্থা হিসেবে খোদ জীবনকেই দাঁড় করিয়েছিলেন তিনি। 'সমস্ত মূল্যবোধেরই পুনর্মূল্যায়ন' করতে চেয়েছিলেন তিনি, যাতে করে সবচেয়ে শক্তিমানের জীবনীশক্তিকে দুর্বল কেউ ক্ষতিগ্রস্ত

না করতে পারে। নিট্‌শের বক্তব্য অনুযায়ী, খ্রিস্টধর্ম আর সনাতন দর্শন, দুই-ই বাস্তব জগতের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, তাকিয়ে আছে 'স্বর্গ' বা 'ভাবজগতের' দিকে। তবে এতোদিন যেটাকে বাস্তব জগৎ বলে মনে করা হয়েছে সেটি ছিল আসলে একটা ছদ্ম জগৎ। তিনি বলতেন, 'জগতের প্রতি সৎ হও। তাদের কথায় কান দিও না যারা তোমাদের অতিপ্রাকৃত প্রত্যাশার লোভ দেখায়।"

'তো?'

'কিয়ের্কেগার্ড আর নিট্‌শে দু'জনই যাঁকে প্রভাবিত করেছিলেন তিনি হলেন জার্মান অস্তিত্ববাদী দার্শনিক *মার্টিন হাইডেগার* (Martin Heideggar)। তবে আমরা মনোযোগ দিতে যাচ্ছি ফরাসি অস্তিত্ববাদী *জাঁ-পল সার্ত্রে*-র (Jean-Paul Sartre) ওপর। তাঁর জন্ম ১৯০৫ সালে, মৃত্যু ১৯৮০-তে। অস্তিত্ববাদীদের মধ্যে তিনিই ছিলেন সবচেয়ে উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা, অন্তত বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর কাছে। বিশেষ করে চল্লিশের দশকে যুদ্ধের পরপরই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল তাঁর অস্তিত্ববাদ। পরবর্তীতে তিনি ফ্রান্সের মার্কসবাদী আন্দোলনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়েছিলেন, তবে কখনোই কোনো দলের সদস্য হননি।'

'সেজন্যই কি আমরা একটা ফরাসি ক্যাফেতে দেখা করেছি?'

'স্বীকার করছি, ব্যাপারটা ঠিক আকস্মিক নয়। সার্ত্রে জীবনের অনেকটা সময় বিভিন্ন ক্যাফেতে অতিবাহিত করেছিলেন। তাঁর আজীবনের সঙ্গী সিমন দ্য বুভোয়ার (Simon de Beauvoir) সঙ্গেও একটা ক্যাফেতেই প্রথম দেখা হয়েছিল তাঁর। তিনিও ছিলেন একজন অস্তিত্ববাদী দার্শনিক।'

'নারী দার্শনিক?'

'ঠিক বলেছ।'

'ব্যাপারটা কী স্বস্তিদায়ক, তাই না, যে মানব জাতি শেষ পর্যন্ত সভ্য হচ্ছে!'

'তারপরেও কিন্তু অনেক সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে আমাদের সময়ে।'

'অস্তিত্ববাদ নিয়ে কথা বলতে চেয়েছিলেন আপনি।'

'সার্ত্রে বলেছিলেন, 'অস্তিত্ববাদ হলো মানবতাবাদ'। কথাটা দিয়ে তিনি বোঝাতে চেয়েছিলেন যে অস্তিত্ববাদীরা খোদ মানবতা থেকেই যাত্রা শুরু করেন, অন্য কিছু থেকে নয়। আমি হয়ত এটুকু যোগ করতে পারি যে, যে-মানবতার কথা তিনি বলছিলেন সেটি রেনেসাঁ-র সময়কার যে-মানবতাবাদের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়েছিল তারচেয়ে অনেক হতাশাজনক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছিল মানুষের অবস্থা সম্পর্কে।'

'কেন?'

"কিয়ের্কেগার্ড এবং এই শতাব্দীর[২৮] অস্তিত্ববাদী দার্শনিকদের মধ্যে কয়েকজন ছিলেন খ্রিস্টান। কিন্তু সার্ত্রের আনুগত্যটা ছিল আমরা যাকে বলতে পারি নাস্তিকতামূলক অস্তিত্ববাদ তার প্রতি। তাঁর দর্শনকে দেখা যেতে পারে যখন 'ঈশ্বর মৃত' সেই অবস্থায় মানুষের অবস্থার এক নিষ্ঠুর বিশ্লেষণ হিসেবে। 'ঈশ্বর মৃত', এই কথাটা অবশ্য

---

২৮. বিংশ শতাব্দীর কথা বলা হচ্ছে। আমরা এখন আছি একবিংশ শতাব্দীতে—অনুবাদক।

বলেছিলেন নিটশে।'

'বলে যান।'

'কিয়ের্কেগার্ডের মতো সার্ত্রের দর্শনের-ও মূল কথা হচ্ছে 'অস্তিত্ব'। কিন্তু অস্তিত্ব আর বেঁচে থাকা ঠিক এক নয়। উদ্ভিদ এবং প্রাণীও বেঁচে থাকে, তাদেরও অস্তিত্ব আছে, কিন্তু তার মানে কী সেটি নিয়ে চিন্তা করতে হয় না তাদের। মানুষই হলো একমাত্র প্রাণী যে তার নিজের অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন। সার্ত্রে বলেছেন একটি বস্তুগত জিনিস স্রেফ 'স্বীয় প্রকৃতিগত' (in itself), অন্যদিকে মানুষ 'নিজের জন্য' (for itself)। মানব সত্তা আর বস্তু সত্তা তাই এক নয়।'

'এ-ব্যাপারে তো দ্বিমত করা যায় না।'

'সার্ত্রে বলেছেন মানুষের অস্তিত্ব তার অন্য আর সব কিছুর চেয়ে অগ্রাধিকার পাবে। আমি যে অস্তিত্বশীল এই বিষয়টি *আমি* যা তার আগে গুরুত্ব পাবে। "অস্তিত্বের অধিকার, নির্যাসের (essence) আগে"।'

'এটা কিন্তু বড্ড জটিল কথা।'

'নির্যাস বলতে আমরা বুঝি সেই সব জিনিস যা দিয়ে কোনোকিছু তৈরি— কোনোকিছুর প্রকৃতি বা সত্তা। কিন্তু সার্ত্রের মতে মানুষের এ-ধরনের কোনো সহজাত 'প্রকৃতি' নেই। মানুষকে তাই অবশ্যই নিজেকে তৈরি করে নিতে হবে। তাকে অবশ্যই তার নিজস্ব প্রকৃতি বা 'নির্যাস' তৈরি করে নিতে হবে, কারণ সেটি আগে থেকেই নির্ধারিত হয়ে নেই।'

'আমার মনে হয় আমি বুঝতে পারছি আপনি কী বোঝাতে চাইছেন।'

'দর্শনের গোটা ইতিহাস জুড়ে দার্শনিকেরা আবিষ্কার করতে চেয়েছেন মানুষ কী বা মানব প্রকৃতি কী। কিন্তু সার্ত্রে বিশ্বাস করতেন যে মানুষের এ-ধরনের কোনো শাশ্বত প্রকৃতি নেই যার ওপর ভরসা করা যেতে পারে। কাজেই সাধারণভাবে জীবনের মানে খোঁজার চেষ্টা অর্থহীন। উপস্থিতমত উদ্ভাবন করার শাস্তিপ্রাপ্ত আমরা। আমরা যেন সেইসব অভিনেতার মতো যাদেরকে মঞ্চে টেনে নিয়ে আসা হয়েছে অথচ তারা তাদের সংলাপ মুখস্ত করেনি, তাদের কাছে কোনো চিত্রনাট্য নেই বা ফিসফিসিয়ে মঞ্চ নির্দেশনা জানিয়ে দেয়ার মতো প্রম্পটারও নেই। কীভাবে বাঁচতে হবে সে-সিদ্ধান্ত অবশ্যই আমাদেরকেই নিতে হবে।'

'আসলে সেটিই সত্যি। লোকে যদি বাইবেল বা কোনো দর্শনের বই দেখতে পারতো কী করে বাঁচতে হবে তা বের করার জন্য সেটি খুবই প্র্যাকটিকাল হতো।'

'ঠিকই বুঝতে পেরেছো তুমি। সার্ত্রে বলেছেন যে মানুষ যখন উপলব্ধি করে যে সে বেঁচে আছে, একদিন সে মারা যাবে—এবং আঁকড়ে ধরার মতো কোনো কোনো অর্থ নেই—তখন সে উদ্বেগ (angst) বোধ করে। তুমি হয়ত মনে করতে পারবে যে অস্তিত্বশীল অবস্থায় থাকা একজন মানুষের যে-বর্ণনা কিয়ের্কেগার্ড দিয়েছিলেন তারও বৈশিষ্ট্য সেই উদ্বেগ, ভয়ের একটা অনুভূতি।'

'হ্যাঁ।'

'সার্ত্রে বলেছেন যে, অর্থহীন একটা জগতে মানুষ বিচ্ছিন্ন বোধ করে। মানুষের 'বিচ্ছিন্নতা'-র বর্ণনা দেয়ার সময় তিনি কিন্তু হেগেল এবং মার্কসের মূল চিন্তারই

প্রতিধ্বনি করছেন। জগতে মানুষের বিচ্ছিন্নতাবোধ হতাশা, একঘেয়েমি, বিবমিষা আর অবাস্তবতার একটা অনুভূতি তৈরি করে।'

'বিষণ্ন বোধ করা বা সবকিছুই খুব একঘেয়ে এ-রকম একটা অনুভূতি হওয়া খুবই স্বাভাবিক।'

'হ্যাঁ, তাই। সার্ত্রে আসলে বিংশ শতাব্দীর নগরবাসীর বর্ণনা দিচ্ছিলেন। তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে যে রেনেসাঁ-র সময়কার মানবতাবাদীরা প্রায় জয়োল্লাসের সঙ্গে মানুষের মুক্তি এবং স্বাধীনতার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন সবার? মানুষের স্বাধীনতাকে সার্ত্রে একটা অভিশাপ হিসেবে দেখেছেন। তিনি বলেছেন, 'মানুষ মুক্ত হওয়ার সাজাপ্রাপ্ত'। 'সাজাপ্রাপ্ত তার কারণ সে নিজেকে তৈরি করেনি, কিন্তু তারপরেও মুক্ত। কারণ এ-জগতে একবার চলে আসার পরে সে তার প্রতিটি কৃতকর্মের জন্য দায়ী।'

'কিন্তু মুক্ত মানুষ হিসেবে আমাদেরকে সৃষ্টি করতে তো বলিনি আমরা।'

'সার্ত্রে ঠিক এটাই বলতে চেয়েছেন। তারপরেও আমরা মুক্ত মানুষ এবং এই স্বাধীনতা আমাদেরকে সারা জীবন ধরেই অনবরত বেছে নেবার শাস্তি দিয়েছে। এমন কোনো শাশ্বত মূল্যবোধ নেই বা রীতি নেই যা আমরা আঁকড়ে ধরে থাকতে পারি, যা আমাদের পছন্দকে বেশি অর্থবহ করে। কারণ আমরা যা করি তার জন্য আমরাই পুরোপুরি দায়ী। সার্ত্রে এই কথাটির ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন যে মানুষ যেন কখনো তার কৃতকর্মের দায়-দায়িত্ব অস্বীকার না করে। ওদিকে আবার আমরা এই অজুহাতেও আমাদের বেছে নেবার দায়-দায়িত্ব অস্বীকার করতে পারি না যে আমাদেরকে কাজে 'যেতেই হচ্ছে' বা কীভাবে আমরা জীবন যাপন করবো সে-ব্যাপারে আমাদেরকে 'অবশ্যই' কিছু মধ্যবিত্তসুলভ প্রত্যাশা অনুযায়ী কাজ করতে হবে। এভাবে যারা অজ্ঞাত পরিচয় জনসাধারণের দলে ঢুকে পড়ে তারা নিজেদের কাছ থেকে পালিয়ে আত্মপ্রবঞ্চনার মধ্যে আশ্রয় নিয়ে কখনোই নৈর্ব্যক্তিক একটা দঙ্গলের সদস্য হওয়া ছাড়া অন্য কিছু হতে পারবে না। অন্য দিকে, আমাদের স্বাধীনতা আমাদেরকে বাধ্য করে আমাদের নিজেদেরকে কাজে লাগিয়ে কিছু একটা সৃষ্টি করতে, 'বিশুদ্ধভাবে' বা 'সত্যিকার অর্থে' বাঁচতে।'

'হ্যাঁ, বুঝতে পারছি।'

'আমাদের নৈতিক পছন্দের বেলাতেও কিন্তু কথাটা কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। 'মানব প্রকৃতি' বা 'মানবিক দুর্বলতা' বা সে-রকম কোনো কিছুর ওপরও আমরা দোষ চাপাতে পারি না। প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ প্রায়ই শুয়োরের মতো ব্যবহার করার পর দোষ চাপায় 'বুড়ো আদমের' ওপর। কিন্তু 'বুড়ো আদম' বলে কেউ নেই। উনি স্রেফ একটা চরিত্র মাত্র, আমাদের কৃতকর্মের দায়-দায়িত্ব এড়াতে যাকে আমরা আঁকড়ে ধরি।'

'তবে মানুষকে কিসের জন্য দোষ দেয়া যেতে পারে তার একটা সীমা কিন্তু থাকা দরকার।'

'সার্ত্রে যদিও দাবি করেছেন যে জীবনের কোনো সহজাত অর্থ নেই, তাই বলে তিনি কিন্তু বলেননি যে কোনো কিছুরই কোনো অর্থ নেই। আমরা যাকে বলি *নাস্তিত্ববাদী* (nihilist), তিনি কিন্তু তা ছিলেন না।'

'সেটি কী?'

'নাস্তিত্ববাদী তিনি যিনি মনে করেন কোনো কিছুরই কোনো অর্থ নেই এবং সবকিছুই বৈধ। সার্ত্রে মনে করতেন যে জীবনের অর্থ থাকতেই হবে। এটা একটা একান্তই প্রয়োজনীয় বিষয়। কিন্তু আমাদের জীবনে এই অর্থ তৈরি করতে হবে আমাদের নিজেদেরকেই। অস্তিত্বশীল থাকার অর্থ তোমার নিজের জীবনকে নিজেই তৈরি করা।'

'কথাটা একটু খুলে বলবেন?'

'সার্ত্রে প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন যে কোনো কিছু প্রত্যক্ষ করার আগ পর্যন্ত চেতনার নিজস্ব কোনো মানে বা অস্তিত্ব নেই। কারণ চেতনা সবসময়ই কোনো না কোনো কিছু সম্পর্কে সচেতন। আর এই 'কোনো কিছু' যেমন আমাদের নিজেদের কাছ থেকে আসে, তেমনি তা আসে আমাদের পরিপার্শ্ব থেকে। আমাদের জন্য কোন জিনিসটি গুরুত্বপূর্ণ সেটি নির্বাচন করার মধ্য দিয়ে আমরা যা প্রত্যক্ষ করি সে-বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে আমাদের নিজেদের খানিকটা সহায়ক ভূমিকা রয়েছে।'

'একটা উদাহরণ দিতে পারবেন?'

'একই কামরায় দু'জন মানুষ থাকতে পারেন, তারপরেও দু'জনেই একেবারে ভিন্নভাবে দেখতে পারেন সেটিকে। তার কারণ আমাদের পরিপার্শ্ব প্রত্যক্ষ করার সময় আমরা আমাদের নিজস্ব মানে বা আমাদের নিজস্ব স্বার্থ তাতে যোগ করি। একজন গর্ভবতী মহিলা হয়ত মনে করতে পারেন যে তিনি যেদিকেই তাকান সেদিকেই গর্ভবতী মহিলাদের দেখতে পান। তার অর্থ এই নয় যে আগে কোনো গর্ভবতী মহিলা ছিলেন না, কিন্তু এখন যেহেতু তিনি নিজে গর্ভবতী জগৎটাকে তিনি ভিন্ন চোখ দিয়ে দেখছেন। জেল পালানো আসামি হয়ত চারদিকেই পুলিশ দেখতে পায়...'

'হুম্, বুঝতে পারছি।'

'ঘরের জিনিসগুলোকে আমরা যেভাবে প্রত্যক্ষ করি সেটিকে প্রভাবিত করে আমাদের নিজেদের জীবন। কোনো কিছুর প্রতি আমার কোনো আগ্রহ না থাকলে সেটি আমার নজরে পড়ে না। কাজেই এখন হয়ত আমি খুলে বলতে পারি কেন আজ দেরি হয়েছে আমার।'

'কাজটা ইচ্ছাকৃত, ঠিক?'

'আগে বলো এখানে এসেই কী দেখতে পেয়েছিলে তুমি?'

'প্রথমেই যেটা দেখলাম তা হলো আপনি নেই।'

'ব্যাপারটা অদ্ভুত না যে প্রথম যে-জিনিসটা তুমি লক্ষ করলে সেটি হলো একটা কিছুর অনুপস্থিতি?'

'হতে পারে, কিন্তু আপনার সঙ্গেই দেখা হওয়ার কথা ছিল আমার।'

'আমাদের কাছে যা অপ্রাসঙ্গিক তা আমরা কী করে 'নিশ্চিহ্ন' করে দিই তা দেখাতে ঠিক এ-ধরনেরই একটি ক্যাফে ভিজিটের সাহায্যে নিয়েছেন সার্ত্রে।'

'স্রেফ এই ব্যাপারটা দেখাবার জন্যই আপনি দেরি করে এসেছেন আজ?'

'হ্যাঁ, সার্ত্রের দর্শনের এই মূল বিষয়টি তুমি যাতে বুঝতে পারো সেজন্য। একটা এক্সারসাইজ বলতে পারো একে।'

'বেরিয়ে যান এখান থেকে!'

'তুমি যদি প্রেমে পড়তে আর বসে থাকতে কখন তোমার ভালোবাসার মানুষটি তোমাকে ফোন করবে তাহলে হয়ত তুমি 'শুনতে পেতে' যে সারা সন্ধ্যা সে তোমাকে ফোন করেনি। ঠিক হলো ট্রেনে দেখা করবে তুমি তার সঙ্গে; অগুনতি মানুষ প্ল্যাটফর্মে ঘোরাফেরা করছে, কিন্তু তাকে তুমি দেখতে পাচ্ছো না কোথাও। তারা সবাই তোমার কাছে উটকো ঝামেলাস্বরূপ, অপ্রয়োজনীয়। এমনকি তাদেরকে তোমার বিরক্তিকর বা অপ্রীতিকরও মনে হতে পারে। শুধু যে-জিনিসটা তোমার নজরে পড়ছে তা হলো সে এখানে নেই।'

'কী মন খারাপ করা ব্যাপার।'

'সিমন দ্য বুভোয়া অস্তিত্ববাদকে নারীবাদে প্রয়োগ করার চেষ্টা করেছিলেন। তার আগেই সার্ত্রে বলেছিলেন যে মানুষের কোনো মৌল 'প্রকৃতি' নেই যার ওপর ভরসা করা যেতে পারে। আমরা নিজেদেরকে সৃষ্টি করি।'

'তাই?'

'নারী-পুরুষকে আমরা যেভাবে দেখি তার বেলাতেও কিন্তু কথাটা প্রযোজ্য। কোনো মৌলিক 'নারী প্রকৃতি'-র অস্তিত্ব অস্বীকার করেছিলেন সিমন দ্য বুভোয়া। যেমন ধরো, দাবি করা হয়ে থাকে যে পুরুষ হচ্ছে 'সব কিছু অতিক্রম করে যাওয়া' বা অর্জনকারী স্বভাবের। কাজেই বাইরের দিকেই অর্থ আর নির্দেশনা খুঁজবে সে। বলা হয়ে থাকে নারীর দর্শন এর বিপরীত। সে 'অন্তর্বাসী', যার মানে সে যেখানে আছে সেখানেই থাকতে চায়। কাজেই সে তার পরিবারের পরিচর্যা করবে। পরিবেশের এবং আরও সাদামাঠা জিনিসের যত্ন নেবে। ইদানীং আমরা হয়ত বলতে পারি যে নারীরা 'নারীজাতির মূল্যবোধ' নিয়ে পুরুষদের চেয়ে বেশি চিন্তিত।'

'তিনি কি সত্যিই সে-কথা বিশ্বাস করতেন?'

'আমার কথা শুনছিলে না তুমি। সিমন দ্য বুভোয়া আসলে এ-ধরনের কোনো 'নারী প্রকৃতি' বা 'পুরুষ প্রকৃতি'-র অস্তিত্বে বিশ্বাস করতেন না। উল্টো তিনি বিশ্বাস করতেন যে নারী এবং পুরুষকে অবশ্যই নিজেদেরকে তাদের ভেতরে জন্ম নেয়া এ-ধরনের প্রেজুডিস বা আদর্শ (ideal) থেকে মুক্ত করতে হবে।'

'আমি একমত।'

'১৯৪৯ সালে প্রকাশিত তাঁর প্রধান কাজটির নাম *দ্য সেকেন্ড সেক্স*।'

'কী বোঝাতে চেয়েছিলেন তিনি কথাটা দিয়ে?'

'নারীদের কথা বলছিলেন তিনি। আমাদের সংস্কৃতিতে নারীদেরকে দ্বিতীয় লিঙ্গ হিসেবে দেখা হয়ে থাকে। পুরুষেরা এমন আচরণ করে যেন তারাই হচ্ছে উদ্দেশ্য আর নারীদের ব্যবহার করে তারা তাদের বিধেয় হিসেবে, ফলে নারীদের বঞ্চিত করে তারা নারীদের নিজেদের জীবনের দায়-দায়িত্ব নেয়া থেকে।'

'তার মানে তিনি বলতে চেয়েছিলেন আমরা নারীরা ঠিক ততোটাই মুক্ত আর স্বাধীন যতটা আমাদের ইচ্ছা?'

'হ্যাঁ। এভাবেও বলতে পারো তুমি। চল্লিশের দশক থেকে বর্তমান সময়কার সাহিত্য, বিশেষ করে নাটকের ওপরও, একটা বিশাল প্রভাব ফেলেছে অস্তিত্ববাদ।

সার্ত্রে নিজে নাটক ও উপন্যাস দুই-ই লিখেছেন। অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ লেখকেরা হলেন ফরাসি *আলবেয়ার কামু* (Albert Camus), আইরিশ *স্যামুয়েল বেকেট* (Samuel Beckett), রুমানিয়ার *ইউজিন আয়োনেস্কো* (Eugene Ionesco) আর পোল্যান্ডের *উইটোল্ড গমব্রোউইচ* (Witold Gombrowicz)। তাঁদের এবং অন্য আরও অনেক আধুনিক লেখকের রচনার বৈশিষ্ট্যমূলক শৈলীকেই আমরা *অবাস্তববাদ* (absurdism) বলি। কথাটা বিশেষভাবে বলা হয়ে থাকে 'থিয়েটার অভ্ দ্য অ্যাবসার্ড'-এর ক্ষেত্রে।'

'ও।'

'অ্যাবসার্ড' বলতে কী বোঝায় জানো?'

'এমন কিছু যা অর্থহীন বা অযৌক্তিক, তাই না?'

'ঠিক তাই। থিয়েটার অভ্ দ্য অ্যাবসার্ড বাস্তবধর্মী থিয়েটারের একটার প্রতিতুলনা হিসেবে দেখা দিল। এর উদ্দেশ্য ছিল জীবনে অর্থময়তার অভাবটা দেখানো যাতে করে দর্শক দ্বিমত পোষণ করতে পারে। অর্থহীনতার চর্চা করা কিন্তু এর উদ্দেশ্য ছিল না। বরং তার উল্টোটাই। গৎবাঁধা দৈনন্দিন জীবনের উদ্ভটত্ব দেখিয়ে দিয়ে, সবার সামনে উন্মুক্ত করে দিয়ে দর্শকদের বাধ্য করা হলো তাদের নিজেদের জন্য আরও বেশি সত্য এবং আরও অপরিহার্য একটা জীবনের সন্ধান করতে।'

'ব্যাপারটা বেশ ইন্টারেস্টিং শোনাচ্ছে।'

'থিয়েটার অভ্ দ্য অ্যাবসার্ড প্রায়ই এমন কিছু অবস্থার ছবি তুলে ধরে যা নিতান্তই তুচ্ছ। কাজেই এটাকে বলা যেতে পারে এক ধরনের 'অতিবাস্তবতা' (hyperrealism)। মানুষ যেমন ঠিক তেমনভাবেই তুলে ধরা হয় তাকে। কিন্তু পুরোপুরি সাধারণ একটা বাড়িতে পুরোপুরি সাধারণ এক সকালে গোসলখানায় যা ঘটে ঠিক তাই যদি তুমি মঞ্চে দেখাও, দর্শকরা হাসবে। তাদের এই হাসিকে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে নিজেদেরকে হাস্যাস্পদ হিসেবে দেখতে পাওয়ার বিরুদ্ধে একটা ডিফেন্স মেকানিজম বা প্রতিরোধমূলক কাজ হিসেবে।'

'হ্যাঁ, ঠিক তাই।'

'অ্যাবসার্ড থিয়েটারের কিছু পরাবাস্তববাদী বৈশিষ্ট্য-ও থাকতে পারে। এর চরিত্ররা প্রায়ই নিজেদের আবিষ্কার করে অত্যন্ত অবাস্তব এবং স্বপ্নসদৃশ পরিস্থিতিতে। সেটিকে যখন তারা বিস্মিত না হয়ে মেনে নেয় তখন দর্শক-ই অবাক হয় চরিত্রগুলোর এই বিস্ময়হীনতা দেখে। *চার্লি চ্যাপলিন* (Charlie Chaplin) তাঁর নির্বাক ছবিগুলোতে এভাবেই কাজ করেছিলেন। চ্যাপলিন যে তাঁর জীবনে ঘটা উদ্ভট সব ব্যাপার নিরুচ্চারে মেনে নিচ্ছেন এই ব্যাপারটিই ছিল এসব নির্বাক চলচ্চিত্রের কমিক উপাদান। এতে করে দর্শকরা বাধ্য হতো তাদের জীবনে আরও খাঁটি আরও সত্য কিছু খুঁজে বের করার জন্য নিজেদের দিকে ফিরে তাকাতে।'

'মানুষ যে কত কিছু বিনা প্রতিবাদে মেনে নেয় তা সত্যিই আশ্চর্যের।'

'মাঝে মাঝে এমন একটা অনুভূতি হওয়া সঙ্গত যে এই অবস্থা থেকে আমাকে পালাতেই হবে যদিও কোথায় সে-ব্যাপারে কোনো ধারণাই নেই আমার।'

'বাড়িতে আগুন লাগলে আপনাকে স্রেফ সেখান থেকে বেরিয়ে যেতে হবে, এর পর কোথায় থাকবেন সেটি জানা না থাকলেও।'

'ঠিক। আরেক কাপ চা খাবে? বা একটা কোক?'

'ঠিক আছে। কিন্তু আমি তারপরেও মনে করি দেরি করে আপনি বালখিল্য একটা কাজ করেছেন।'

'সেটি মানতে আমার কোনো আপত্তি নেই।'

এক কাপ এস্প্রেসো আর একটা কোক নিয়ে ফিরে এলেন অ্যালবার্টো। এরই মধ্যে এই ক্যাফের পরিবেশটা ভালো লাগতে শুরু করেছে সোফির। সে আরও ভাবতে শুরু করেছে যে অন্য টেবিলগুলোর কথাবার্তাও সে যতটা ভেবেছিল ততটা তুচ্ছ হয়ত না-ও হতে পারে।

কোকের বোতলটা বেশ সশব্দেই টেবিলের ওপর রাখলেন অ্যালবার্টো। অন্যান্য টেবিলে বসে থাকা অনেকেই চমকে মুখ তুলে তাকালেন।

'তো, এই সঙ্গে পথের শেষ প্রান্তে চলে এলাম আমরা,' বললেন তিনি।

'তার মানে আপনি বলতে চাইছেন সার্ত্রে আর অস্তিত্ববাদের সঙ্গেই দর্শনের ইতিহাস শেষ হয়ে যাচ্ছে?'

'না, সে-কথা বললে বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে। সারা পৃথিবী জুড়ে অসংখ্য লোকের কাছে অস্তিত্ববাদী দর্শনের একটা মৌলিক গুরুত্ব রয়েছে। আমরা দেখেছি এর শেকড় প্রোথিত রয়েছে ইতিহাসের অনেক পেছনে, কিয়ের্কেগার্ড হয়ে সক্রেটিস পর্যন্ত। তাছাড়া অন্য যে-সব দার্শনিক স্রোতধারার কথা আমরা আলোচনা করেছি সেগুলোরও একটা বিকাশ আর পুনর্জন্মলাভের ঘটনা দেখতে পাই আমরা বিংশ শতাব্দীতে।'

'যেমন?'

'যেমন, এ-ধরনের একটি স্রোতধারা হচ্ছে *নিও-টমিজম* (Neo-Thomism), তার মানে সেই সব ধারণা টমাস অ্যাকুইনাসের চিন্তাধারার অনুসারী। আরেকটি হচ্ছে *বিশ্লেষণাত্মক দর্শন* (analytical philosophy) বা *যৌক্তিক অভিজ্ঞতাবাদ* (logical empiricism) যার শেকড় চলে গেছে হিউম আর ব্রিটিশ অভিজ্ঞতাবাদ পর্যন্ত, এমনকি অ্যারিস্টটলের যুক্তিবিদ্যা অব্দি। এছাড়াও বিংশ শতাব্দীকে স্বাভাবিকভাবেই আরও প্রভাবিত করেছে আমরা যাকে বলতে পারি *নব্য-মার্কসবাদ* (Neo-Marxism), সেটির নানান ধরনের গুণতি প্রবণতাসহ। আর এরই মধ্যে আমরা কথা বলেছি *নব্য-ডারউইনবাদ* (Neo-Darwinism) এবং *মনোসমীক্ষণ*-এর গুরুত্ব নিয়েও।'

'হ্যাঁ।'

'আমরা কেবল শেষ আরেকটা স্রোতধারা নিয়ে আলাপ করবো, যার নাম *বস্তুবাদ* (materialism) এবং এটারও ঐতিহাসিক ভিত্তি রয়েছে। বর্তমান কালের বিজ্ঞানের একটা বড় অংশেরই মূল খুঁজে পাওয়া যাবে প্রাক-সক্রেটিস দার্শনিকদের প্রচেষ্টার মধ্যে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে সব বস্তু যে অবিভাজ্য 'মৌলিক কণা' দিয়ে তৈরি তার অনুসন্ধানের কথা। 'বস্তু' কী সে-সম্পর্কে সন্তোষজনক কোনো ব্যাখ্যা আজ পর্যন্ত কেউ দিতে পারেনি। নিউক্লিয়ার ফিজিক্স আর বায়োকেমিস্ট্রির মতো আধুনিক বিজ্ঞান এই সমস্যাটি নিয়ে এমনই মশগুল হয়ে আছে যে বেশকিছু মানুষের জীবনের দর্শনের এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা অংশ।'

'নতুন আর পুরনো মিলিয়ে সব গোল পাকিয়ে গেছে...

'হ্যাঁ। ঠিক যে-সব প্রশ্ন দিয়ে আমরা আমাদের কোর্স শুরু করেছিলাম সেগুলোর উত্তর আজও অজানা রয়ে গেছে। সার্ত্রের এই মন্তব্যটি গুরুত্বপূর্ণ যে অস্তিত্ববাদী প্রশ্নগুলোর উত্তর চূড়ান্তভাবে দেয়া যায় না। সংজ্ঞাগত দিক দিয়ে, একটি দার্শনিক প্রশ্ন হচ্ছে এমন একটা জিনিস যা প্রতিটি প্রজন্ম, এমনকি প্রতিটি ব্যক্তিকে বারবার জিজ্ঞেস করতে হয়।'

'বিষণ্ন একটা চিন্তা।'

'ঠিক জানি না আমি একমত কিনা। এ-কথা নিশ্চিত করেই বলা যায় যে এ-ধরনের প্রশ্ন করেই আমরা জানতে পারি যে আমরা বেঁচে আছি। আর তাছাড়া, সব সময়ই দেখা গেছে যে মানুষ যখন পরম প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজেছে তখনই তারা অন্য অনেক সমস্যার স্পষ্ট এবং চূড়ান্ত সমাধান আবিষ্কার করেছে। বিজ্ঞান, গবেষণা আর প্রযুক্তি, সবই আমাদের দার্শনিক চিন্তা-ভাবনারই বাই-প্রোডাক্ট। জীবন সম্পর্কে আমাদের বিস্ময়ই কি শেষ পর্যন্ত মানুষকে চাঁদে নিয়ে যায়নি?'

'হ্যাঁ, তা ঠিক।'

'নীল আর্মস্ট্রং (Neil Armstrong) চাঁদে পা দিয়ে বলেছিলেন 'ব্যক্তির জন্য একটি ছোট্ট পদক্ষেপ, মানবজাতির জন্য একটি বিরাট লাফ'। প্রথম মানুষ হিসেবে চাঁদে পা রাখার অনুভূতিরই সংক্ষিপ্ত প্রকাশ ঘটিয়েছিলেন তিনি এই কথাগুলো দিয়ে, নিজের সঙ্গে জড়িয়ে নিয়েছিলেন তাঁর আগে পৃথিবীতে বাস করে যাওয়া সমস্ত মানুষকে। নিশ্চয়ই এ শুধু তাঁর কৃতিত্ব ছিল না।'

'আমাদের নিজেদের কালে আমাদেরকেও একেবারে নতুন কিছু সমস্যার মুখোমুখি হতে হবে। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুতর হচ্ছে পরিবেশ সংক্রান্ত সমস্যা। কাজেই বিংশ শতাব্দীতে দর্শনের একটি কেন্দ্রীয় অভিমুখ হচ্ছে *পরিবেশ-দর্শন* (ecophilosophy) বা সেটির অন্যতম স্থপতি নরওয়েজীয় দার্শনিক আর্নে নেসের (Arne Naess) ভাষায় *ইকোসফি* (ecosophy)। পশ্চিমা বিশ্বের অনেক পরিবেশ-দার্শনিকই এই বলে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন যে সার্বিকভাবে পাশ্চাত্য সভ্যতা মূলত ভুল পথে এগোচ্ছে, আমাদের গ্রহটার সহ্যসীমার সঙ্গে একটা মুখোমুখি সংঘর্ষের দিকে ছুটে যাচ্ছে। দূষণ এবং পরিবেশ ধ্বংসের সুস্পষ্ট ফলাফল যতদূর পৌঁছেছে তার চেয়েও গভীরে গিয়ে পরিস্থিতিটা বুঝতে চেয়েছেন তারা। তারা দাবি করছেন যে পশ্চিমা চিন্তা-ভাবনায় মৌলিক কিছু গলদ রয়েছে।'

'আমার মনে হয় ঠিকই বলেছেন তারা।'

'যেমন ধরো, মানুষই 'সবার ওপরে', যেন আমরাই প্রকৃতির প্রভু, বিবর্তনবাদের এই ধারণাটির ব্যাপারেই প্রশ্ন তুলেছে পরিবেশ-দর্শন। গোটা এই সজীব গ্রহটির জন্য এ-ধরনের চিন্তা-ভাবনা অত্যন্ত মারাত্মক হতে পারে।'

'এ-নিয়ে চিন্তা করলে পাগল হয়ে যাই আমি।'

'এই ধারণাটার সমালোচনা করতে গিয়ে অনেক পরিবেশ-দার্শনিকই অন্য সংস্কৃতি যেমন ভারত-সংস্কৃতির চিন্তা-ভাবনা ও ধারণার দিকে তাকিয়েছেন। যে-সব জিনিস আমরা হারিয়ে ফেলেছি সেগুলো ফিরে পাবার জন্য তারা তথাকথিত আদিম জনগোষ্ঠী বা 'আদিবাসী জনগোষ্ঠী' যেমন আদিবাসী আমেরিকানদের চিন্তাধারা ও

রীতিনীতিও অধ্যয়ন করেছেন।

'সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বৈজ্ঞানিক মহলে এ-কথা বলা হয়েছে যে আমাদের বৈজ্ঞানিক চিন্তার ধরন-ধারণ একটা 'দৃষ্টান্ত বদল'-এর (paradigm shift) মুখোমুখি হচ্ছে। তার মানে বিজ্ঞানীরা যেভাবে চিন্তা-ভাবনা করে থাকেন সেই ধরনটাতে একটা মৌলিক পরিবর্তন ঘটেছে। অনেক ক্ষেত্রেই এতে করে ফল হয়েছে। সম্পূর্ণবাদ[২৯] (holism) আর একটা নতুন জীবনধারার কথা প্রচার করা অসংখ্য তথাকথিত 'বিকল্প আন্দোলন' আমরা দেখেছি।'

'গ্রেট।'

'সে যাই হোক, একটা বিষয়ের সঙ্গে যখন অনেক মানুষ জড়িত থাকে তখন ভালো মন্দের ফারাক নির্ণয় করাটা একান্ত জরুরি হয়ে দাঁড়ায়। কেউ কেউ দাবি করছেন একটা নতুন যুগে প্রবেশ করছি আমরা। কিন্তু তাই বলে নতুন সবকিছুই যে ভালো তা নয়, আবার পুরনো সবকিছুই ছুঁড়ে ফেলা উচিত নয়। তোমাকে এই দর্শন কোর্সটা উপহার দেয়ার কারণগুলোর মধ্যে এটা একটা কারণ। ঐতিহাসিক পটভূমিটার কথা জানা থাকল তোমার, এবার তুমি নিজেই নিজের পথ খুঁজে নিতে পারবে জীবনে।'

'ধন্যবাদ।'

'আমার মনে হয় "নতুন যুগ'-এর নামে যা চলছে তার বেশির ভাগই যে ধোঁকাবাজি তুমি তা বুঝতে পারবে। এমনকি তথাকথিত 'নব্য-ধর্ম', 'নব্য-গূঢ়তাবাদ' (Neo Occultism) এবং সব ধরনের আধুনিক কুসংস্কার সাম্প্রতিক দশকগুলোতে পশ্চিমা জগৎকে প্রভাবিত করেছে। ব্যাপারটা একটা ইন্ডাস্ট্রিতে পরিণত হয়েছে। খ্রিস্টধর্মের ক্ষীয়মাণ সমর্থনের পিছু পিছু দর্শনের বাজারে ব্যাঙের ছাতার মতো কিছু বিকল্প প্রস্তাব গজিয়ে গেছে।'

'কোন ধরনের প্রস্তাব?'

'তালিকাটা এতোই লম্বা যে শুরু করার সাহস পাচ্ছি না। আর তাছাড়া, কারও পক্ষে তার নিজের সময়ের বর্ণনা দেয়া সহজ নয়। কিন্তু সে যাই হোক, শহরের ভেতর দিয়ে একটু হেঁটে এলে কেমন হয়? তোমাকে একটা জিনিস দেখাতে চাই।'

'বেশি সময় নেই আমার হাতে। কালকের গার্ডেন পার্টির কথা ভুলে যাননি আশা করি?'

'না। তখনই তো চমৎকার একটা ব্যাপার ঘটছে। প্রথমে হিল্ডার দর্শন কোর্সটার ইতি টানতে হবে। মেজর কিন্তু তার বেশি কিছু ভাবেনি, বুঝলে। কাজেই আমাদের ওপর তার খবরদারির খানিকটা সুযোগ হারাবে সে।'

আবারও কোকের বোতলটা তুললেন তিনি—এখন খালি সেটি—তারপর সশব্দে নামিয়ে আনলেন সেটি টেবিলের ওপর।

রাস্তায় বেরিয়ে এলেন তাঁরা, সেখানে কর্মোদ্যমে ভরা ইঁদুরের মতো ছুটোছুটি করছে লোকজন। সোফি ভাবতে লাগল অ্যালবার্টো তাকে কী দেখাতে চান।

বড় একটা দোকানের পাশ দিয়ে হেঁটে গেল তারা; যোগাযোগ প্রযুক্তির সবকিছু

---

২৯. কোনো কিছুর সম্পূর্ণ অংশ সেটার খণ্ডাংশের চেয়ে ভালো, এই দার্শনিক মতবাদ—অনুবাদক।

বিক্রি হচ্ছে সেখানে-টেলিভিশন, ভিসিআর এবং স্যাটেলাইট ডিশ থেকে মোবাইল ফোন কম্পিউটার আর ফ্যাক্স মেশিন সব।

উইন্ডো ডিসপ্লেটার দিকে আঙুল তুলে দেখিয়ে অ্যালবার্টো বললেন

'ওই যে, ওখানেই বিংশ শতাব্দীকে পেয়ে যাবে তুমি, সোফি। বলতে গেলে রেনেসাঁ-র সময়েই পৃথিবীটা বিস্ফোরিত হতে শুরু করে। আবিষ্কারের জন্য বড় বড় সব অভিযান দিয়ে শুরু করে ইউরোপিয়রা সারা দুনিয়া চুঁড়ে বেড়াতে আরম্ভ করেছিল। আজ ঘটনাটা তার ঠিক উল্টো। এটাকে আমরা বলতে পারি একটা উল্টো ধরনের বিস্ফোরণ।'

'কোন অর্থে?'

'এই অর্থে যে দুনিয়াটা বিশাল একটা কমিউনিকেশন নেটওয়ার্কের ভেতর সংকুচিত হয়ে পড়ছে। এই কিছু দিন আগেও দার্শনিকদেরকে গাড়ি চেপে দিনের পর দিন ভ্রমণ করতে হতো দুনিয়াটাকে নিয়ে তত্ত্ব-তালাশ করতে বা অন্য দার্শনিকদের সঙ্গে দেখা করতে। আর আজকে আমরা গ্রহটার যে-কোনো জায়গায় বসে মানব অভিজ্ঞতার সবটুকুই পেয়ে যেতে পারি কম্পিউটার স্ক্রিনের ওপর।'

'এটা একটা ফ্যান্টাস্টিক চিন্তা। খানিকটা ভীতিকরও বটে।'

'কথা হচ্ছে ইতিহাস কি শেষ হয়ে যাচ্ছে নাকি তার বদলে আমরা পুরোপুরি নতুন একটা যুগের দোরগোড়ায় এসে পৌঁছেছি। আমরা এখন আর স্রেফ একটা শহরের নাগরিক বা একটা দেশের-নাগরিক নই। আমরা এখন বাস করছি একটা প্ল্যানেটারি সভ্যতায়।'

'তা ঠিক।'

'গত তিরিশ-চল্লিশ বছরে, বিশেষ করে যোগাযোগের ক্ষেত্রে যে নাটকীয় উন্নতি হয়েছে তা গোটা ইতিহাসের সমস্ত উন্নতির চাইতে ঢের বেশি। আর তারপরেও আমরা সম্ভবত কেবল শুরুটাই প্রত্যক্ষ করেছি... ।'

'আপনি কি এটাই দেখাতে চেয়েছিলেন আমাকে?'

'না, সেটি আছে ওই গির্জাটার অন্য দিকে।'

ওরা যখন ওখান থেকে চলে যাবে সেই সময়ই একটা টিভির পর্দায় জাতিসংঘের কিছু সৈন্যের ছবি ভেসে উঠল।'

'দেখুন!' বলে উঠল সোফি।

জাতিসংঘের একজন সৈন্যের ওপর জুম করল ক্যামেরাটা। প্রায় অ্যালবার্টোর মতোই কালো দাড়ি তার। হঠাৎ একটা কার্ড তুলে ধরল সে, তাতে লেখা 'শিগগিরই ফিরে আসছি, হিল্ডা।' তারপর হাত নেড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল সে।

'হাতুড়ে কোথাকার!' অ্যালবার্টো বলে উঠল।

'সেই মেজর নাকি?'

'প্রশ্নটার জবাবও দেবো না আমি।'

পার্ক পেরিয়ে গির্জাটার সামনে চলে এলো তারা, তারপর উঠল আরেকটা মেইন স্ট্রিটে। অ্যালবার্টোকে খানিকটা বিরক্ত দেখাচ্ছে। শহরের সবচেয়ে বড় বইয়ের দোকান লিব্রিসের সামনে গিয়ে দাঁড়াল তারা।

'চলো, ভেতরে যাই,' অ্যালবার্টো বললেন। ভেতরে গিয়ে সবচেয়ে দীর্ঘ দেয়ালটার দিকে আঙুল তাক করলেন তিনি। তিনটে ভাগে ভাগ করা সেটি, 'নতুন যুগ' 'বিকল্প জীবনধারা' আর 'মরমীবাদ'।

প্রত্যেকটা বইয়ের নামই আকর্ষণীয়; *মৃত্যুর পরে জীবন? স্পিরিটিজম-এর রহস্য, টারট, ইউএফও সংক্রান্ত ঘটনা, উপশম, দেবতাদের প্রত্যাবর্তন, আগেও আপনি এখানে ছিলেন, জ্যোতিষবিদ্যা কী?* শয়ে শয়ে বই। শেলফগুলোর নিচে আরও অনেক বই ডাঁই করে রাখা।

'এটা বিংশ শতাব্দী, সোফি। এ হচ্ছে আমাদের কালের মন্দির।'

'এসবের কোনো কিছুতেই আপনি বিশ্বাস করেন না, তাই না?'

'এ-সবের বেশিরভাগই ধোঁকাবাজি। কিন্তু পর্নোগ্রাফির মতোই বিকোয় এ-সব। এ-সবের অনেকটাই এক ধরনের পর্নোগ্রাফি। তরুণরা এখানে এসে যা তাদের সবচেয়ে বেশি আকর্ষণ করে তাই কিনে নিয়ে যায়। কিন্তু সত্যিকারের দর্শন আর এই সব বইয়ের মধ্যে পার্থক্যটা কমবেশি সত্যিকারের ভালোবাসা আর পর্নোগ্রাফির মধ্যকার পার্থক্যের মতোই।'

'আপনি কি একটু রূঢ় হয়ে যাচ্ছেন না?'

'চলো পার্কে গিয়ে বসি খানিকক্ষণ।'

দোকানটা থেকে বেরিয়ে গির্জার সামনে খালি একটা বেঞ্চি পেল ওরা। গাছের নিচে সদর্পে ঘুরে বেড়াচ্ছে কিছু কবুতর, তাদের মাঝে বেমানান কিছু অতি উৎসাহী চড়ুই লাফিয়ে বেড়াচ্ছে।

'একে বলে ইএসপি বা প্যারাসাইকোলজি,' অ্যালবার্টো বললেন। 'অথবা টেলিপ্যাথি, ক্লেয়ারভয়েন্স আর সাইকোকাইনেটিকস। একে বলে স্পিরিটিজম, অ্যাস্ট্রলজি আর ইউফোলজি।'

'কিন্তু সত্যি করে বলুন তো, আপনি কি আসলেই মনে করেন এগুলো সবই ধোঁকাবাজি?'

'অবশ্যই একজন সত্যিকারের দার্শনিকের পক্ষে এ-কথা বলা খুব উচিত হবে না যে এগুলো সবই খারাপ। তবে এ-কথা বলতে আমার আপত্তি নেই যে এই সমস্ত বিষয় সম্ভবত এমন একটা রাজ্যের একটা বিস্তারিত মানচিত্র নির্দেশ করে যে-রাজ্যের অস্তিত্বই নেই। তাছাড়া এখানে এমন কিছু 'কল্পনার তৈরি মিথ্যে জিনিস' রয়েছে হিউম যেগুলোকে হয়ত আগুনের ভেতর ছুঁড়ে ফেলতেন। এ-সব বইয়ের অনেকগুলোর মধ্যেই সত্যিকারের অভিজ্ঞতার ছিটেফোঁটাও নেই।'

'তা, এ-ধরনের বিষয়ের ওপর এমন অবিশ্বাস্য সংখ্যায় বই বেরোয় কেন?'

'এ-ধরনের বই প্রকাশ করা একটা বড় বাণিজ্যিক উদ্যোগ। বেশিরভাগ লোক এ-সবই চায়।'

'কেন বলুন তো?'

'তারা নিশ্চয়ই প্রতিদিনকার শুষ্ক একঘেয়েমি কাটানোর জন্য খানিকটা গুপ্তরহস্যমূলক, খানিকটা ভিন্ন কিছু চায়। কিন্তু ব্যাপারটা তেলে মাথায় তেল দেয়ার মতোই।'

'তার মানে?'

'এই যে আমরা এখানে একটা চমৎকার অভিযানে ঘুরে বেড়াচ্ছি। সৃষ্টির একটা কাজ একেবারে আমাদের চোখের সামনে বিকাশ লাভ করছে। একেবারে প্রকাশ্য দিবালোকে, সোফি। দারুণ না ব্যাপারটা!'

'আমারও তো তাই মনে হয়।'

'তাহলে ভবিষ্যদ্বক্তার তাঁবুতে বা পণ্ডিতদের পেছন আঙিনায় ঢুঁ মারার দরকারটা কী আমাদের?'

'আপনি কি বলতে চাইছেন এ-সব বই যারা লেখে তারা সব শঠ আর মিথ্যেবাদী?'

'না, আমি তা বলছি না। কিন্তু এখানেও আমরা একটা ডারউইনীয় পদ্ধতির কথা বলছি।'

'ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলতে হচ্ছে আপনাকে।'

'একটা দিনে নানান ধরনের কত সব ঘটনা ঘটতে পারে সে-কথা চিন্তা করো। অবশ্য তুমি তোমার জীবনের একটা দিনের কথাও ভাবতে পারো। যা দেখো যা ঘটে সে-সবের কথা চিন্তা করো।'

'হ্যাঁ?'

'মাঝে মধ্যেই অদ্ভুত একটা কাকতালীয় ব্যাপার ঘটে। হয়ত একটা দোকানে গিয়ে ২৮ ক্রাউন দিয়ে কিছু কিনলে তুমি। সেদিনই পরে জোয়ানা এসে তুমি ওর কাছে যে ২৮ ক্রাউন পেতে তাই দিয়ে দিল। দু'জনেই ঠিক করলে সিনেমা দেখতে যাবে— আর গিয়ে দেখলে তোমার সিট নম্বর ২৮।'

'হ্যাঁ, অদ্ভুত একটা কাকতালীয় ব্যাপার হবে সেটি।'

'কাকতালীয় ব্যাপার যে হবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এখন কথা হচ্ছে, লোকে এই ধরনের কাকতালীয় ঘটনার কথা সংগ্রহ করে। যখন কোটি কোটি লোকের জীবন থেকে নেয়া এ-ধরনের অভিজ্ঞতা বইয়ে সংকলিত হয় তখন ব্যাপারটা খাঁটি ডেটার মতোই দেখায়। আর এর সংখ্যা সব সময়ই বাড়তে থাকে। কিন্তু এবারও আমরা এমন একটা লটারির কথা বলছি যেখানে কেবল সেইসব নম্বরই দৃশ্যমান যেগুলো জয়ী হয়েছে।'

'কিন্তু প্রতিনিয়তই এ-ধরনের অভিজ্ঞতা অর্জন করছে এ-রকম ক্লেয়ারভয়্যান্ট আর মিডিয়াম-ও তো রয়েছে, তাই না?'

'তা আছে; আর আমরা যদি শঠগুলোর কথা বাদ দিই তাহলে এ-সব তথাকথিত রহস্যময় অভিজ্ঞতার অন্য আরেকটি ব্যাখ্যা পাই আমরা।'

'আর সেটি হচ্ছে?'

'তোমার মনে আছে ফ্রয়েডের নির্জ্ঞান মনের তত্ত্বের কথা আলাপ করেছিলাম আমরা...'

'অবশ্যই।'

'ফ্রয়েড দেখিয়েছিলেন যে প্রায়ই আমরা আমাদের নিজেদের নির্জ্ঞান মনের 'মিডিয়াম' হিসেবে কাজ করতে পারি। হঠাৎ আমরা হয়ত দেখলাম আমরা কিছু চিন্তা

করছি বা কোনো কাজ করছি। কেন করছি সেটি না জেনেই। এর কারণ হলো আমাদের মধ্যে এমন সব অভিজ্ঞতা, চিন্তা-ভাবনা আর স্মৃতি রয়েছে যা-র সম্পর্কে আমরা সচেতন নই।'

'তো?'

'মানুষ মাঝে মধ্যে ঘুমের মধ্যে কথা বলে বা হাঁটাহাঁটি করে। এটাকে আমরা একটা 'মানসিক স্বয়ংক্রিয়তা' (mental automatism) বলি। আর সম্মোহিত অবস্থায় লোকে এমন সব কথা বলতে পারে এমন সব কাজ করতে পারে 'যা তাদের করার কথা নয়'। পরাবাস্তববাদীদের কথা-ও খেয়াল রেখো যারা তথাকথিত 'স্বয়ংক্রিয় লেখা' লিখতে চেয়েছিলেন। তাঁরা স্রেফ তাদের নিজেদের নির্জ্ঞান মনের মিডিয়াম হিসেবে কাজ করতে চেয়েছিলেন।'

'মনে আছে।'

'এই শতাব্দীতে মাঝে মধ্যেই আমরা যাকে বলি 'আধ্যাত্মবাদী পুনর্জন্ম' সেটি ঘটেছে। তার পেছনে এই আইডিয়াটা কাজ করেছে যে একটি মিডিয়াম একটি মৃত ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে পারে। হয় মৃতের গলায় কথা বলে, নয় স্বয়ংক্রিয় লেখা ব্যবহার করে মিডিয়াম এমন একজনের কাছ থেকে একটা বার্তা পেতো যিনি হয়ত পাঁচ বা পঞ্চাশ বা কয়েকশো বছর আগে জীবিত ছিলেন। মৃত্যুর পরে জীবন আছে বা আমরা আসলে বহু জীবন যাপন করি, এই দুটোর যে কোনোটির প্রমাণ হিসেবে ব্যাপারটাকে গ্রহণ করা হয়েছে।'

'হ্যাঁ, আমি জানি।'

'আমি বলছি না যে সব মিডিয়ামই ভুয়া ছিল। তাদের কেউ কেউ নিশ্চয়ই সরল বিশ্বাসী ছিল। তারা ছিল আসলেই মিডিয়াম, তবে তারা ছিল স্রেফ তাদের নিজেদের নির্জ্ঞান মনের মিডিয়াম। ভাব-সমাধিতে (trance) থাকা অনেক মিডিয়ামকেই খুব ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করে দেখা গেছে তারা এমন কিছু জ্ঞান এবং শক্তির অধিকারী যা তারা কীভাবে অর্জন করল সে-কথা তারা নিজেরা বা অন্য কেউ বলতে পারে না। একবার এক মহিলা হিব্রু ভাষায় সংবাদ আদান-প্রদান করলেন, অথচ ভাষাটি তিনি আদৌ জানতেন না। কাজেই নিশ্চয়ই অন্য কোনো জন্মে জীবন কাটিয়ে গিয়েছিলেন তিনি অথবা কোনো মৃত আত্মার সঙ্গে যোগাযোগ ঘটেছিল তাঁর।'

'আসলে কোনটা বলে মনে হয় আপনার।'

'দেখা গেল তিনি যখন ছোট ছিলেন তখন তাঁর এক ইহুদি আয়া ছিল।'

'ও।'

'হতাশ হলে? ঘটনাটা স্রেফ এটাই প্রমাণ করে কিছু মানুষ তাদের নির্জ্ঞান মনে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে রাখার কী অবিশ্বাস্য ক্ষমতা রাখে।'

'বুঝতে পারছি আপনি কী বলতে চাইছেন।'

'ফ্রয়েডের নির্জ্ঞান মনের তত্ত্ব দিয়ে দৈনন্দিন জীবনের প্রচুর অদ্ভুত ঘটনা ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। হঠাৎ করেই আমি এমন এক বন্ধুর কাছ থেকে একটা টেলিফোন কল পেতে পারি যার সঙ্গে বহু বছর ধরে আমার কোনো যোগাযোগ নেই এবং একটু আগেই তার টেলিফোন নম্বর খুঁজতে শুরু করেছিলাম আমি।'

'আমার গায়ে কাঁটা দিচ্ছে।'

'কিন্তু এর ব্যাখ্যাটা এ-রকম হতে পারে যে দু'জনেই আমরা একটু আগে এমন একটা পুরনো গান রেডিওতে শুনেছি যেটা আমরা শুনেছিলাম শেষ যে-বার আমরা একসঙ্গে ছিলাম তখন। ব্যাপারটা হচ্ছে যে অন্তরালের সম্পর্কটার ব্যাপারে আমরা সচেতন নই।'

'কাজেই এটা হয় ধোঁকাবাজি অথবা সেই বিজয়ী নম্বরের ব্যাপার আর নয় নির্জ্ঞান মন। ঠিক?'

'ইয়ে, সে যাই হোক, শোভন মাত্রার সংশয়বাদ নিয়ে এ-সব বইয়ের কাছে ভেড়াটাই বেশি স্বাস্থ্যকর। আর কেউ যদি দার্শনিক হয় তা হলে তো কথাই নেই। ইংল্যান্ডে সংশয়বাদীদের একটা সমিতি আছে। বহু বছর আগে তারা ঘোষণা করেছিল যে, প্রথম যে-লোক অতিপ্রাকৃত কোনো ঘটনার সামান্যতম প্রমাণও দিতে পারবে তাকে বিশাল অংকের পুরস্কার দেয়া হবে। বড় কোনো অলৌকিক ঘটনা নয়, টেলিপ্যাথির ছোট্ট একটা ঘটনা হলেও চলবে। আজ পর্যন্ত কেউই সে-রকম কোনো দাবি নিয়ে এগিয়ে আসেনি।'

'হুম্।'

'অন্য দিকে, এমন অনেক কিছু রয়েছে যা আমরা মানুষেরা বুঝতে পারি না। হয়ত প্রকৃতির নিয়ম-কানুনও বুঝতে পারি না। গত শতাব্দীতে অনেক লোকই মনে করত ম্যাগনেটিজম এবং ইলেক্ট্রিসিটির মতো ব্যাপারগুলো এক ধরনের জাদু। বাজি ধরে বলতে পারি আমার নিজের দাদির মাকে আমি টিভি বা কম্পিউটারের কথা বললে ওঁর চোখ ছানাবড়া হয়ে যেতো।'

'তার মানে অতি প্রাকৃত কোনো কিছুতে আপনি বিশ্বাস করেন না।'

'এ-নিয়ে এরই মধ্যে কথা বলেছি আমরা। এমনকি 'অতিপ্রাকৃত' কথাটাও কিন্তু অদ্ভুত। না, আমার ধারণা, একটিমাত্র প্রকৃতিতেই বিশ্বাস করি আমি। কিন্তু অন্যদিকে সেটিও রীতিমতো আশ্চর্যের।'

'কিন্তু আপনি যে-সব বই এইমাত্র আমাকে দেখালেন সেগুলোতে লেখা রহস্যময় ব্যাপারগুলো?'

'সত্যিকারের সব দার্শনিকেরই উচিত চোখ খোলা রাখা। সাদা কাক যদিও কখনো দেখিনে আমরা কিন্তু তাই বলে সেটি খোঁজা কখনো বন্ধ করা উচিত হবে না। এবং একদিন এমনকি আমার মতো এক সংশয়বাদীও হয়ত এমন একটা ব্যাপার বিশ্বাস করতে বাধ্য হতে পারে যা আমি আগে কখনো বিশ্বাস করতাম না। এই সম্ভাবনার দরজা যদি আমি খোলা না রাখতাম তাহলে আমি হতাম গোঁড়াপন্থী, সত্যিকারের দার্শনিক নয়।'

কোনো কথা না বলে বেঞ্চিতে বসে রইলেন অ্যালবার্টো আর সোফি। কবুতরগুলো গলা বাড়িয়ে বকম বকম করে যাচ্ছে, মাঝে মাঝেই চমকে উঠছে বাইসাইকেল বা হঠাৎ কোনো চলাচলের শব্দে।

শেষ পর্যন্ত সোফি বলে উঠল, 'আমাকে বাড়ি যেতে হবে, পার্টির যোগাড়-যন্তর করতে হবে।'

'তবে বিদায় নেবার আগে একটা সাদা কাক দেখাবো তোমাকে। তুমি দেখবে, যতটা দূরে বলে মনে করি আমরা তারচেয়ে কাছেই রয়েছে ওটা।'

অ্যালবার্টো উঠে দাঁড়িয়ে ফের বইয়ের দোকানটায় নিয়ে গেলেন সোফিকে। এইবার তারা অতিপ্রাকৃত ব্যাপার-স্যাপারের ওপর লেখা সবগুলো বইয়ের পাশ দিয়ে হেঁটে দোকানের একেবারে শেষ মাথায় হালকা-পাতলা একটা শেলফের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। শেলফের ওপরে খুব ছোট্ট একটা কার্ড ঝুলছে। তাতে লেখা 'দর্শন'।

বিশেষ একটা বইয়ের দিকে আঙুল তুলে দেখালেন অ্যালবার্টো, সেটির নামটা পড়ে মুখ হাঁ হয়ে গেল সোফির '*সোফির জগৎ*'।

'তুমি কি চাও বইটা তোমাকে কিনে দিই আমি?'

'অতটা সাহস আমার হবে বলে মনে হয় না।'

খানিক পর এক হাতে বইটা অন্যটায় গার্ডেন পার্টির জিনিসপত্র ভরা ছোট্ট একটা ব্যাগ নিয়ে বাড়ির পথে রওনা হয়ে গেল সে।

গার্ডেন পার্টি

...একটা সাদা কাক...

একেবারে অবশ-বিবশ হয়ে বিছানায় বসে রইল হিল্ডা। সে অনুভব করল ভারি রিং বাইন্ডার ধরা হাত দুটো কাঁপছে তার।

প্রায় এগারোটা বাজে। দু'ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে পড়ছিল সে। মাঝে মাঝেই লেখা থেকে চোখ তুলে জোরে হেসে উঠছিল সে। কিন্তু সেই সঙ্গে মাঝে মাঝে হেসে একপাশে গড়িয়ে পড়েছে, মুখ হাঁ করেও থেকেছে। বাড়িতে সে একা থাকাতে ভালোই হয়েছে।

আর, গত দুই ঘণ্টায় কত কিছুর ভেতর দিয়েই না গেছে সে! ব্যাপারটা শুরু হয়েছিল কেবিন থেকে বনের মধ্য দিয়ে বাড়ি যাওয়ার পথে সোফি যে মেজরের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করছিল তাই দিয়ে। শেষ পর্যন্ত একটা গাছে বসেছিল সে আর তাকে রক্ষা করেছিল লেবানন থেকে এক গার্ডিয়ান অ্যাঞ্জেলের মতো এসে হাজির হওয়া হাঁসি মর্টেন।

ঘটনাটা যদিও অনেক অনেক দিন আগের তারপরেও হিল্ডা কখনোই ভুলতে পারেনি তার বাবা যে তাকে *দ্য ওয়ান্ডারফুল অ্যাডভেঞ্চার্স অভ্ নিল্স্* বইটা পড়ে শুনিয়েছিলেন। এরপর বেশ কয়েক বছর পর্যন্ত তার আর তার বাবার মধ্যে বইটার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত একটা ভাষা চালু ছিল। এবার উনি সেই পুরনো হাঁসিটাকে আবার বের করে এনেছেন।

তো, এরপর একটা ক্যাফেতে প্রথমবারের মতো একা যাওয়ার অভিজ্ঞতা হয় সোফির। হিল্ডা বিশেষভাবে অবাক হয়েছিল সার্ত্রে আর অস্তিত্ববাদ সম্পর্কে অ্যালবার্টোর কথা শুনে। আরেকটু হলেই উনি তাকে কনভার্ট করে ফেলেছিলেন— যদিও রিং বাইন্ডারে তিনি এর আগেও অনেকবারই তা করেছেন।

একবার, প্রায় বছর খানেক আগে, জ্যোতিষবিদ্যার ওপর একটা বই কিনেছিল সে। আরেকবার এক সেট টারট কার্ড নিয়ে বাড়ি ফিরেছিল সে। আরেকবার অধ্যাত্মবাদের ওপর একটা বই নিয়ে। প্রতিবারই 'কুসংস্কার' আর হিল্ডার 'বিচার-বিবেচনা বোধ' নিয়ে লেকচার ঝেড়েছেন তার বাবা, তবে শেষ আঘাতটার জন্য তিনি এতোদিন অপেক্ষা করে ছিলেন। তার প্রতিটি আঘাত একেবারে সঠিক জায়গায় গিয়ে লেগেছে। স্পষ্টতই, এ-ধরনের জিনিসের বিরুদ্ধে একটা সামগ্রিক সতর্কবাণী ছাড়া তো

তাঁর মেয়েকে বেড়ে উঠতে দেয়া যায় না। পুরোপুরি নিশ্চিত হওয়ার জন্য একটা রেডিও স্টোরের টিভি পর্দা থেকে তিনি হাত নেড়েছেন তার উদ্দেশে। নিজেকে এই কষ্টটা দেয়ার কোনো দরকার ছিল না তার...

সোফিকে নিয়েই সবচেয়ে বেশি ভাবল সে। সোফি—কে তুমি? কোত্থেকে এলে তুমি? কেন তুমি আমার জীবনে এলে?

শেষে সোফিকে একটা বই দেয়া হয়েছে তার নিজের সম্পর্কে। হিল্ডার হাতে এখন যে বইটা রয়েছে ওটা কি সেই একই বই? এটা তো নেহাতই একটা রিং বাইন্ডার। কিন্তু তারপরেও, নিজের সম্পর্কে লেখা একটা বইয়ে একজন কী করে তার নিজের সম্পর্কে লেখা একটা বই পায়? সোফি যদি সেই বইটা পড়তে শুরু করে, তখন?

কী ঘটবে এখন? কী ঘটতে *পারত* এখন? তার রিং বাইন্ডারে অল্পকটি পৃষ্ঠা বাকি আছে মাত্র।

শহর থেকে বাড়ি ফেরার পথে বাসেই সোফির দেখা হয়ে গেল তার মায়ের সঙ্গে। এই যাহ্! সোফির হাতের বইটা দেখে ফেললে মা কী ভাববেন?

পার্টির জন্য কেনা সমস্ত স্ট্রিমার আর বেলুন ভর্তি ব্যাগটার ভেতর বইটা চালান করে দেয়ার চেষ্টা করল সোফি, কিন্তু পুরোপুরি পেরে উঠল না।

'হাই সোফি! একই বাস ধরেছি আমরা! কী দারুণ।'

'হাই মা!'

'বই কিনেছিস বুঝি?'

'না, ঠিক তা না।'

'*সোফির জগৎ*... কী অদ্ভুত।'

সোফি জানত মা'র কাছে মিথ্যে বলার সামান্যতম সুযোগও পাবে না সে।

'অ্যালবার্টো দিয়েছেন ওটা।'

'তা বেশ বুঝতে পারছি। আগেই বলেছি এই লোকটার সঙ্গে দেখা হওয়ার আশায় আছি আমি। দেখি বইটা।'

'অন্তত বাড়ি পৌঁছানো পর্যন্ত সবুর করা যায় না? বইটা *আমার*, মা।'

'আলবৎ তোর বই। আমি শুধু প্রথম পৃষ্ঠাটায় একটু নজর বুলাতে চাই। ঠিক আছে?...'স্কুল থেকে বাসায় ফিরছে সোফি অ্যামুন্ডসেন। প্রথমে, খানিকটা পথ, জোয়ানার সঙ্গে হাঁটছিল সে। রোবট নিয়ে কথা বলছিল ওরা...'

'সত্যি সত্যি এ-কথা লেখা আছে ওখানে?'

'হ্যাঁ, *আছে* সোফি। অ্যালবার্ট ন্যাগ বলে একজন লিখেছে বইটা। নিশ্চয়ই নতুন লেখক। ভালো কথা, তোর অ্যালবার্টোর নাম যেন কী।'

'নক্স।'

'সম্ভবত দেখা যাবে যে এই অসাধারণ লোকটি তোর সম্পর্কে গোটা একটা বই লিখে ফেলেছে, সোফি। এটাকে বলে ছদ্মনাম ব্যবহার করা।'

'ইনি তিনি নন, মা। বাদ দাও না। যাই বলো, তুমি কিন্তু কিচ্ছু বোঝো না।'

'তা ঠিক, আমারও মনে হয় আমি কিছু বুঝি না। কাল গার্ডেন পার্টি, তারপর সবকিছু আবার ঠিক হয়ে যাবে।'

'অ্যালবার্ট ন্যাগ বাস করে পুরোপুরি এক ভিন্ন বাস্তবতায়। সেজন্যই এই বইটা একটা সাদা কাক।'

'এ-সব কিন্তু তোর আসলেই বন্ধ করতে হবে! আগে ওটা সাদা খরগোশ ছিল না?'

'তুমি-ই বন্ধ করো এ-সব!'

ক্রোভার ক্রোজের শেষ মাথার স্টপে পৌঁছানোর আগ পর্যন্ত এই অব্দি-ই কথা হলো দু'জনের। সোজা একটা মিছিলের মধ্যে গিয়ে পড়ল তারা।

'মাই গড!' হেলেন অ্যামুন্ডসেন বিরক্ত হয়ে বলে উঠলেন। 'আমি তো ভেবেছিলাম অন্তত এই এলাকায় রাস্তার রাজনীতির হাত থেকে রেহাই পাবো আমরা।'

মিছিলে বড়জোর দশ থেকে বারো জন লোক হবে। তাদের ব্যানারে লেখা

মেজর আসতে আর দেরি নেই
মিডসামারের মজার মজার খাবার অবশ্যই
জাতিসংঘের শক্তি বাড়ুক

মায়ের জন্য সত্যিই দুঃখ হলো সোফির।

সে বলল, 'কিছু মনে কোরো না।'

'কিন্তু এটাতো একটা অদ্ভুত মিছিল দেখছি, সোফি। সত্যি-ই একদম উদ্ভট।'

'নেহাতই সামান্য ব্যাপার।'

'দুনিয়াটা সব সময় আগের চেয়ে তাড়াতাড়ি পাল্টে যায়। সত্যি বলতে কী, আমি একটুও অবাক হইনি।'

'যা-ই বলো, তুমি যে অবাক হওনি সেজন্যই অবাক হওয়া উচিত তোমার।'

'মোটেই না। ওরা কিন্তু হিংস্র ছিল না, কী তাই না? আমি শুধু ভাবছি ওরা আমাদের রোজবেডগুলো মাড়িয়ে দিল কিনা। বাগানে মিছিল করার নিশ্চয়ই কোনো দরকার নেই? চল, তাড়াতাড়ি বাড়ি গিয়ে দেখি।'

'এটা একটা দার্শনিক মিছিল, মা। আসল দার্শনিকেরা রোজবেড মাড়ান না।'

'আমি বলছি তোকে আসল কথাটা। আসল দার্শনিকে আর বিশ্বাস নেই আমার। সবকিছুই এখন নকল।'

বিকেল আর সন্ধ্যেটা প্রস্তুতির কাজেই ব্যয় করল দু'জনে। সকালেও তা অব্যাহত রাখলো টেবিল বসানো আর সাজানোতে। জোয়ানা এলো ওদের সঙ্গে হাত লাগাতে।

'সব্বোনাশ হয়েছে!' বলে উঠল সে, 'মা আর বাবা-ও আসছে। দোষটা কিন্তু তোর সোফি!'

অতিথিরা আসার আধ ঘণ্টা আগেই সবকিছু তৈরি হয়ে গেল। স্টিকার আর জাপানি লণ্ঠনে গাছগুলো সাজানো হয়েছে। বাগানের গেট, পথের ধার ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকা সব গাছ আর বাড়ির সামনের অংশে বেলুন ঝোলানো হয়েছে। বিকেলের প্রায়

পুরোটা সময় জুড়েই সোফি আর জোয়ানা মিলে ফুলিয়েছে ওগুলো।

চিকেন, স্যালাড আর বাড়ির তৈরি বিভিন্ন ধরনের ব্রেড দিয়ে সাজানো হয়েছে টেবিলগুলো। কিচেনে রয়েছে কিশমিশ দেয়া বনরুটি, লেয়ার কেক, ডেনিশ প্যাস্ট্রি আর চকোলেট কেক। কিন্তু গোড়া থেকেই টেবিলের একেবারে মাঝখানে আসরের মধ্যমণির জায়গাটা রাখা আছে অ্যামন্ড-পেস্ট রিংয়ের একটা পিরামিড আকৃতির বার্থ ডে কেকটার জন্য। কেকটার ওপর কনপার্মেশন[৩০]-এর ড্রেস পরা একটি মেয়ের ছোট্ট এক মূর্তি। সোফির মা তাকে এই বলে নিশ্চিত করেছে ওটা একটা কনফার্ম না-করা পনেরো বছর বয়সী মেয়ের-ও মূর্তি হতে পারে, তবে সোফি নিশ্চিত যে তার মা যে ওটা ওখানে বসিয়েছেন সেটি এই জন্য যে সোফি তাঁকে বলেছিল যে সে কনফার্মড হতে চায় কিনা তা যে নিজেই জানে না। মনে হয় তার মা ভেবেছেন যে কেকটাই কনফার্মেশনের প্রতিনিধিত্ব করছে।

পার্টি শুরু হওয়ার আগের আধ ঘন্টায় তিনি বেশ কয়েকবার বললেন, 'কোনো খরচই কিন্তু বাদ রাখিনি।'

অতিথিরা আসতে শুরু করল। প্রথমে এলো সোফির ক্লাসের তিনটি মেয়ে, সামার শার্ট, লং কার্ডিগান, লং স্কার্ট পরে, চোখে মেক-আপের সামান্য ছোঁয়া। খানিক পর হেঁটে গেট পার হয়ে জেরেমি আর ডেভিড এলো, লাজুক লাজুক ভাব আর ছেলেসুলভ ঔদ্ধত্যের মিশেল তাদের মধ্যে।

'হ্যাপি বার্থ ডে।'

'তুই এখন এডাল্ট-ও বটে।'

সোফি খেয়াল করল জোয়ানা আর জেরেমি এরই মধ্যে ইঙ্গিতপূর্ণভাবে চোখাচোখি করতে শুরু করে দিয়েছে। বাতাসের মধ্যেই কী যেন রয়েছে। সময়টা মিডসামার ঈভ্।

প্রত্যেকেই জন্মদিনের উপহার নিয়ে এসেছে আর এটা যেহেতু একটা দার্শনিক গার্ডেন পার্টি তাই অতিথিদের মধ্যে অনেকেই চেষ্টা করেছে দর্শন কী তা বার করতে। তাদের সবাই দার্শনিক গোছের কিছু একটা লিখেছে। একটা ডায়েরি আর তালা ছাড়াও একটা দর্শন অভিধানও পেয়েছে সোফি। সেটির প্রচ্ছদের ওপর লেখা 'আমার ব্যক্তিগত দার্শনিক চিন্তা-ভাবনা'। অতিথিরা এসে পৌছাতে লম্বা ডাঁটিঅলা ওয়াইন গ্লাসে তাদের আপেলের রস পরিবেশন করা হলো। পরিবেশনের কাজটা করলেন সোফির মা।

'স্বাগতম...তা এই নবীন যুবকের নাম কী? আগে কখনো আমাদের দেখা হয়েছে বলে তো মনে হয় না।...তুমি এসেছো, খুব খুশি হয়েছি, সেসিলি...'

তরুণতর অতিথিরা সবাই এসে পৌছানোর পর ওয়াইন গ্লাস হাতে নিয়ে তারা যখন গাছগুলোর নিচে পায়চারী করে বেড়াচ্ছে, সাদা একটা মার্সিডিজে চেপে বাগানের গেটে উদয় হলেন জোয়ানার বাবা-মা। দামি একটা ধূসর স্যুট পরা আর্থনীতিক উপদেষ্টা ভদ্রলোক পরিপাটিভাবে সুসজ্জিত। তাঁর স্ত্রী পরেছেন টকটকে লাল চুমকি

---

৩০. খ্রিস্টীয় গির্জায় পূর্ণ দীক্ষার অনুষ্ঠানবিশেষ—অনুবাদক।

বসানো লাল প্যান্টস স্যুট। সোফি নিশ্চিত মহিলা ও-রকম পোশাক পরানো কোনো বার্বি ডল দোকান থেকে কিনেছিলেন, তারপর কোনো দর্জিকে দিয়ে পোশাকটা নিজের মাপমতো বানিয়ে নিয়েছেন। অবশ্য আরেকটা সম্ভাবনাও আছে; হয়ত অর্থনীতিক উপদেষ্টাই পুতুলটা কিনে এক জাদুকরকে দিয়েছিলেন সেটিকে একটা জলজ্যান্ত নারীতে রূপান্তরিত করে দেয়ার জন্য। কিন্তু এই সম্ভাবনাটা অবাস্তব,কাজেই সোফি, সেটি খারিজ করে দিল।

মার্সিডিজ থেকে বেরিয়ে হেঁটে বাগানে ঢুকলেন তাঁরা, সেখানে কমবয়সী অতিথিরা অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে তাঁদের দিকে। অর্থনীতিক উপদেষ্টা লম্বা, সরু একটা প্যাকেট উপহার দিলেন ইঙ্গেব্রিগস্টেন পরিবারের পক্ষ থেকে। যখন দেখা গেল সত্যিই সেটি—হ্যাঁ আর কী-একটা বার্বি ডল, তখন প্রবল প্রচেষ্টায় স্বাভাবিক থাকার চেষ্টা করল সোফি। কিন্তু সে-রকম কোনো প্রয়াসই দেখা গেল না জোয়ানার মধ্যে

'তোমার কি মাথা খারাপ? সোফি পুতুল খেলে না!'

পোশাকের সমস্ত চুমকি ঝমঝমিয়ে বাজিয়ে তড়িঘড়ি ছুটে এলেন মিসেস ইঙ্গেব্রিগস্টেন। কিন্তু এটা তো *স্রেফ সাজিয়ে রাখার* জন্য, বুঝলি না।'

'ইয়ে, সত্যিই অনেক অনেক ধন্যবাদ,' ব্যাপারটা হালকা করতে চাইল সোফি। 'এবার আমি একটা কালেকশন গড়ে তোলার কাজ শুরু করতে পারি।'

টেবিলের দিকে এগোতে শুরু করল লোকজন ধীরে ধীরে।

'আমরা এখন কেবল অ্যালবার্টোর জন্য অপেক্ষা করছি,' খানিকটা চপল স্বরে সোফির মা বললেন তাকে, বলে তিনি তাঁর ক্রমেই বেড়ে ওঠা উৎকণ্ঠা লুকোতে চাইলেন। বিশেষ অতিথি সম্পর্কে নানান গুজব অন্যান্য অতিথির মধ্যে ইতিমধ্যেই ছড়িয়ে পড়েছে।

'তিনি কথা দিয়েছিলেন আসবেন, অতএব তিনি আসবেন।'

'কিন্তু উনি না আসা পর্যন্ত তো অন্য গেস্টদের বসতে দিতে পারি না আমরা, তাই না?'

'আলবৎ পারি। চলো কাজ শুরু করি।'

লম্বা টেবিল বরাবর লোকজনকে বসাতে শুরু করলেন হেলেন অ্যামুন্ডসেন। একটা ব্যাপার তিনি খেয়াল রাখলেন যাতে খালি চেয়ারটা তাঁর নিজের আর সোফির চেয়ারের মাঝখানে থাকে। টুকটাক কথা বললেন তিনি সুন্দর আবহাওয়াটা আর সোফি যে এখন বড় হয়ে গেছে তাই নিয়ে।

তাঁরা আধ ঘণ্টা ধরে টেবিলে বসে আছেন এমন সময় কালো, ছাগলে-দাড়ি শোভিত আর বেরে-পরা মধ্যবয়স্ক এক লোক ক্রোভার ক্রোজ ধরে হেঁটে বাগানের গেটটা পেরিয়ে ভেতরে ঢুকলেন। পনোরোটা গোলাপ দিয়ে তৈরি একটা ফুলের তোড়া তাঁর হাতে।

'অ্যালবার্টো!'

টেবিল ছেড়ে ছুটে গেল সোফি তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে। দু'হাতে তাঁর গলা জড়িয়ে ধরল সে, তারপর ফুলের তোড়াটা নিল তাঁর কাছ থেকে। এই সাদর অভ্যর্থনার জবাবে তিনি তাঁর জ্যাকেটের পকেটে হাত ঢুকিয়ে গোটা কয়েক চীনা আতশবাজি বের

করে এনে তাতে আগুন ধরিয়ে উঠোনে ছুঁড়ে দিলেন। টেবিলের দিকে এগোতে এগোতে একটা স্পার্কলার জ্বালিয়ে অ্যামন্ড পিরামিডের চুড়োয় বসিয়ে দিলেন সেটিকে। এরপর তিনি এগিয়ে গিয়ে সোফি আর তার মায়ের মধ্যখানের ফাঁকা জায়গাটায় গিয়ে দাঁড়ালেন।

'এখানে আসতে পেরে খুব খুশি হয়েছি আমি,' বললেন তিনি।

অতিথিরা হতভম্ব একেবারে। মিসেস ইঙ্গেব্রিগস্টেন অর্থপূর্ণভাবে তাকালেন একবার তাঁর স্বামীর দিকে। অবশ্য মানুষটি শেষ অব্দি আসাতে সোফির মা এতোটাই স্বস্তি পেলেন যে তিনি লোকটার যে কোনো অপরাধই ক্ষমা করে দিতেন। সোফি নিজে অবশ্য হাসি চাপবার চেষ্টা করে যাচ্ছিল।

হেলেন অ্যামুন্ডসেন তাঁর গ্লাসে টোকা দিয়ে বলে উঠলেন

'এই ফিলসফিকাল গার্ডেন পার্টিতে আসুন আমরা অ্যালবার্টো নক্সকেও স্বাগত জানাই। উনি কিন্তু আমার নতুন বয়ফ্রেন্ড নন, কারণ আমার স্বামী যদিও প্রায়ই অনেক দূরে সমুদ্রে থাকেন, আপাতত আমার নতুন কোনো বয়ফ্রেন্ড নেই। সে যাই হোক, এই আশ্চর্য মানুষটি সোফির নতুন দর্শন শিক্ষক। আতশবাজি ফোটানো ছাড়াও অনেক গুণের অধিকারী তিনি। এই যেমন, তিনি টপহ্যাটের ভেতর থেকে একটা জ্যান্ত খরগোশ বের করে আনতে পারেন। নাকি সাদা কাক, সোফি?'

'অনেক ধন্যবাদ,' বলে বসে পড়লেন অ্যালবার্টো।

'চিয়ার্স!' বলে উঠল সোফি; তখন অতিথিরা তাঁদের গ্লাস উঁচু করে ধরলেন এবং অ্যালবার্টোর স্বাস্থ্য পান করলেন।

চিকেন আর সালাদ নিয়ে বেশ খানিকটা সময় কাটলো তাঁদের। হঠাৎ জোয়ানা উঠে দাঁড়িয়ে দৃঢ় পায়ে হেঁটে গেল জেরেমির দিকে, তারপর তার ঠোঁটে একটা সশব্দ চুমু খেল। জেরেমি সেটির প্রত্যুত্তর দিতে গিয়ে তাকে ভালো করে জড়িয়ে ধরতে টেবিলের ওপর জোয়ানাকে চিৎ করে ফেলল।

'ইয়ে, আমি কোনোদিন...' মিসেস ইঙ্গেব্রিগস্টেন বলে উঠলেন।

মিসেস অ্যামুন্ডসেন শুধু বললেন, 'বাচ্চারা, টেবিলের ওপর নয়।'

'কেন?' তাঁর দিকে ঘুরে জিজ্ঞেস করলেন অ্যালবার্টো।

'এটা তো বড় অদ্ভুত প্রশ্ন।'

'একজন প্রকৃত দার্শনিকের পক্ষে প্রশ্ন করাটা কখনোই অসঙ্গত নয়।'

কখনো চুমো খায়নি এ-রকম গোটা কতেক ছেলে মুরগির হাড়গোড় ছুঁড়ে ফেলতে লাগল ছাদের ওপর। এবারো মৃদু একটা মন্তব্যই বেরোলো শুধু সোফির মায়ের মুখ থেকে :

'ও-রকম কোরো না। গাটারে হাড়গোড় ফেললে বড্ড বিশ্রি অবস্থার সৃষ্টি হয়।'

'দুঃখিত,' একটা ছেলে বলল, তারপর তারা বাগানের বেড়ার ওধারে ছুঁড়ে ফেলতে লাগল হাড়গোড়গুলো।

'আমার মনে হয় এবার প্লেটগুলো সরিয়ে নিয়ে কেক সার্ভ করা যেতে পারে,' অবশেষে বললেন মিসেস অ্যামুন্ডসেন। 'সোফি আর জোয়ানা, আমাকে একটু সাহায্য করবি?'

রান্নাঘরে যাওয়ার পথে ছোট্ট একটা আলাপ সেরে নেবার ফুরসৎ পাওয়া গেল।

'ওকে চুমো খেলি কেন রে তুই,' সোফি শুধোল জোয়ানাকে।

'আমি বসে বসে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলাম, চুমো খাওয়ার লোভটা সামলাতে পারিনি। ও এতো কিউট !'

'কেমন লাগল রে!'

'যেমনটা ভেবেছিলাম সে-রকম নয়, কিন্তু...'

'এই প্রথমবার, তাই না?'

'কিন্তু শেষবার নয়।'

শিগগিরই কফি আর কেক চলে এলো টেবিলে। অ্যালবার্টো তাঁর আতশবাজিগুলোর কিছু ছেলেদের মধ্যে বিলোতে শুরু করেছেন এমন সময় সোফির মা নিজের কফির কাপে টোকা দিয়ে বলে উঠলেন

'আমি লম্বা বক্তৃতা করবো না, কিন্তু কথা হচ্ছে আমার শুধু এই একটি মেয়েই আছে আর, ঠিক এক হপ্তা একদিন আগে সে পনেরোয় পা দিয়েছে। দেখতেই পাচ্ছেন আমরা খরচের বেলায় কোনো কার্পণ্য করিনি। বার্থডে কেকটার ওপর চব্বিশটা অ্যামন্ড রিং রয়েছে। যারা আগে আসবে তারা দুটো নিতে পারবে, কারণ আমরা শুরু করবো সবচেয়ে ওপর থেকে এবং যতোই নিচে যাওয়া যাবে রিংগুলো ততোই বড় হতে থাকবে। জীবনের বেলাতেও একই ব্যাপার দেখা যায়। সোফি যখন ছোট ছিল তখন সে ছোট ছোট রিং-এর ভেতর লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে বেড়াত। কিন্তু দিন যতোই গড়াতে লাগল, রিংগুলোও ততোই বড় হতে লাগল। এখন রিংটা একেবারে সেই ওল্ড টাউন থেকে এখান পর্যন্ত, এতো বড়। আর তাছাড়া ওর বাবা যেহেতু সমুদ্রে সমুদ্রেই থাকেন সারা বছর, দুনিয়ার সব জায়গায় ফোন করে সোফি। সোফি, তোর ১৫শ জন্মদিনে আমরা তোকে শুভেচ্ছা জানাই!'

'দারুণ!' মিসেস ইঙ্গেব্রিগস্টেন উচ্ছ্বসিতভাবে বলে উঠলেন। সোফি ঠিক বুঝতে পারল না তার মা, না বক্তৃতাটা, বার্থডে কেক নাকি সোফির কথা বলছেন মহিলা।

'হাততালি দিয়ে উঠলেন অতিথিরা এবং একটি ছেলে নাশপাতি গাছের ওপর একটা আতশবাজি ছুঁড়ল। জোয়ানা টেবিল ছেড়ে গিয়ে জেরেমিকে তার চেয়ার থেকে টান দিয়ে উঠিয়ে ফেলল। ঘাসের ওপর শুয়ে পড়ল দু'জন, তারপর চুমো খেতে শুরু করল একে অন্যকে। খানিক পর লাল-কিশমিশ ঝোপের ভেতর ঢুকে পড়ল তারা গড়িয়ে।

'এখন মেয়েরাই ইনিশিয়েটিভ নেয়,' জনাব ইঙ্গেব্রিগস্টেন বলে উঠলেন। এই কথা বলে তিনি উঠে গিয়ে লাল-কিশমিশ ঝোপের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাছে থেকে দেখতে থাকলেন ব্যাপারটা। বাকি অতিথিরাও তাঁকে অনুসরণ করলেন। কেবল সোফি আর অ্যালবার্টো বসে রইলেন টেবিলে। অন্য অতিথিরা এবার জোয়ানা আর জেরেমিকে ঘিরে দাঁড়াল অর্ধবৃত্তাকারে।

'ওদেরকে থামানো যাবে না,' মিসেস ইঙ্গেব্রিগস্টেন বলে উঠলেন, তাঁর গলায় ঈষৎ গর্বের ছোঁয়া।

'উঁহু, এক প্রজন্ম আরেক প্রজন্মকে ফলো করে,' তাঁর স্বামী বললেন। চারদিকে

তাকালেন তিনি, তাঁর সযত্নে বাছাই করা কথাগুলোর জন্য তারিফের প্রত্যাশায়। কিন্তু যখন মাত্র দুয়েক জনের নীরব মাথা ওঠা-নামা ছাড়া আর কোনো প্রতিক্রিয়া পাওয়া গেল না তখন তিনি যোগ করলেন: 'কিছুই আর করার নেই।'

দূর থেকে সোফি দেখতে পেল জেরেমি জোয়ানার শার্টের বোতাম খোলার চেষ্টা করছে, ঘাস লেগে শার্টটাতে সবুজ দাগ পড়ে গেছে। জোয়ানা জেরেমির বেল্ট নিয়ে টানাটানি করছে।'

'দেখো, ঠাণ্ডা লাগিয়ো না!' বলে উঠলেন মিসেস ইঙ্গেব্রিগস্টেন।

হতাশভাবে অ্যালবার্টোর দিকে তাকালো সোফি।

'আমি যতটা ভেবেছিলাম তারচেয়ে তাড়াতাড়ি ঘটে যাচ্ছে ব্যাপারটা,' অ্যালবার্টো বললেন। 'যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সরে পড়তে হবে আমাদের এখান থেকে। তার আগে ছোট্ট একটা বক্তৃতা দিতে হবে আমাকে শুধু।'

জোরে হাততালি দিয়ে উঠল সোফি।

'দয়া করে সবাই ফিরে এসে বসবেন আবার? অ্যালবার্টো কিছু কথা বলবেন।'

জোয়ানা আর জেরেমি ছাড়া সবাই আবার ফিরে এলেন যার যার জায়গায়।

'আপনি কি সত্যি সত্যিই বক্তৃতা দেবেন?' হেলেন অ্যামুণ্ডসেন জিজ্ঞেস করলেন। 'কী দারুণ!'

'ধন্যবাদ।'

'আর, আমি জানি আপনি হাঁটতেও পছন্দ করেন। শরীর ঠিক রাখার জন্য কাজটা খুব জরুরি। তাছাড়া, সঙ্গে একটা কুকুর থাকলে তো কথাই নেই। হার্মেস, তাই না নামটা ওটার?'

উঠে দাঁড়ালেন অ্যালবার্টো। 'প্রিয় সোফি,' শুরু করলেন তিনি। 'এটা যেহেতু, একটা ফিলসফিকাল গার্ডেন পার্টি, আমি তাই দার্শনিক বক্তৃতা করব।'

তুমুল হর্ষধ্বনি আর হাততালি দিয়ে স্বাগত জানানো হলো কথাটাকে।

'এই হইহট্টগোল ভরা পরিবেশে এক দাগ যুক্তি হয়ত ততোটা খাপছাড়া বলে মনে হবে না। তবে যা-ই ঘটুক না কেন, সোফিকে তার ১৫শ জন্মদিনে শুভেচ্ছা জানাতে যেন ভুল না হয় আমাদের।'

বাক্যটা তিনি শেষ করতে পেরেছেন কি পারেননি এমনি সময় এগিয়ে আসতে থাকা একটা স্পোর্টস প্লেনের গুনগুন আওয়াজ শোনা গেল। নিচু হয়ে বাগানের ওপর দিয়ে উড়ে গেল সেটি। সেটির পেছনে লম্বা লেজের মতো একটি ব্যানার ঝুলছে, তাতে লেখা 'শুভ ১৫শ জন্মদিন।'

আর তাই দেখে আবার হর্ষধ্বনি আর হাততালি, এমনকি আগের চেয়েও জোরে।

'ওই যে, দেখতে পাচ্ছেন?' আনন্দে চেঁচিয়ে উঠলেন মিসেস অ্যামুণ্ডসেন। 'এই মানুষটি আতশবাজি ফোটানো ছাড়াও অনেক কাজ করতে পারেন।'

'ধন্যবাদ। এটা নেহাতই মামুলি ব্যাপার। গত কয়েক হপ্তায় সোফি আর আমি বড়সড় একটা দার্শনিক অনুসন্ধান চালিয়েছি। এখন আমরা সেটির ফলাফল প্রকাশ করব। আমাদের অস্তিত্বের নিগূঢ়তম রহস্য প্রকাশ করব আমরা।'

ছোট্ট জমায়েতটা এখন এমন-ই শান্ত হয়ে গেছে যে পাখির কিচিরমিচির আর

লাল-কিশমিশ ঝোপ থেকে আসা চাপা দুয়েকটা শব্দ ছাড়া অন্য কোনো আওয়াজ শোনা যাচ্ছে না।

'বলে যান,' সোফি বলল।

'প্রথমদিককার গ্রিক দার্শনিকদের থেকে শুরু করে বর্তমান সময় পর্যন্ত একটা খরো ফিলসফিকাল স্টাডির পর আমরা আবিষ্কার করেছি যে এই মুহূর্তে জাতিসংঘের একজন পর্যবেক্ষক হিসেবে লেবাননে কর্মরত এক মেজরের মনের ভেতর জীবনযাপন করছি আমরা। লিলেস্যান্ডে বাসরত তার কন্যার জন্য আমাদেরকে নিয়ে একটা বই-ও লিখেছে সে। মেয়েটির নাম হিল্ডা মোলার ন্যাগ। সোফি আর সে একই দিনে পনেরোয় পড়েছে। ১৫ জুন সকালবেলা সে যখন ঘুম থেকে ওঠে তখন তার বেডসাইড টেবিলটার ওপর পড়ে ছিল বইটা। ঠিকভাবে বললে, বইটা ছিল একটা রিং বাইন্ডারের ধরনে। এমনকি আমরা যখন কথা বলছি তখনো সে রিং বাইন্ডারের শেষ ক'টি পৃষ্ঠার ছোঁয়া পাচ্ছে তার তর্জনীর নিচে।'

উৎকণ্ঠার একটা অনুভূতি ছড়িয়ে পড়তে শুরু করল টেবিল জুড়ে।

'কাজেই আমাদের অস্তিত্ব হিল্ডা মোলার ন্যাগের জন্মদিনের একটা চিত্তবিনোদনমূলক ব্যাপার ছাড়া একটু বেশিও নয়, কমও নয়। মেজরের কন্যার দর্শন শিক্ষার একটা কাঠামো হিসেবে আমাদের সবাইকে আবিষ্কার করা হয়েছে। তার অর্থ উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, গেটে দাঁড়িয়ে থাকা মর্সিডিজটার এক পয়সাও দাম নেই। নেহাতই একটা মামুলি জিনিস ওটা। সাদা যে-মার্সিডিজটা শুধু ঘুরেই বেড়াচ্ছে হতভাগা এক মেজরের মাথার মধ্যে সেটির চেয়ে বেশি দাম নয় ওটার। সে-বেচারা এই মাত্র একটা পাম ট্রির নিচে বসে পড়ল সর্দিগর্মির হাত থেকে বাঁচতে। লেবাননে দিনের বেলা বড্ড গরম, বন্ধুরা।'

'যত্তসব আবর্জনা!' চেঁচিয়ে উঠলেন অর্থনীতিক উপদেষ্টা। 'একেবারে নির্জলা অর্থহীন ব্যাপার।'

'আপনারা অবশ্যই আপনাদের মন্তব্য জানাতে পারেন,' বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে বলে চললেন অ্যালবার্টো, 'তবে সত্যি কথাটা হলো এই গার্ডেন পার্টিটাই একেবারে নির্জলা অর্থহীন ব্যাপার। এই পুরো পার্টিটাতে যুক্তির একমাত্র নিদর্শন হচ্ছে এই বক্তৃতা।'

এই কথা শুনে অর্থনীতিক উপদেষ্টা দাঁড়িয়ে পড়ে বলে উঠলেন

'এই তো, আমরা আমাদের সাধ্যমতো চেষ্টা করছি একটা কারবার চালাতে আর সব ধরনের ঝুঁকির বিরুদ্ধে যাতে ইন্স্যুরেন্স কাভারেজ পাওয়া যায় তার ব্যবস্থা করতে। সেই সময় এসে হাজির হলেন এই সবজান্তা যিনি কিনা এ-সব বিনাশ করতে চাইছেন তাঁর 'দার্শনিক' সব অভিযোগ তুলে।'

মাথা নেড়ে সায় দিলেন অ্যালবার্টো।

'এ-ধরনের দার্শনিক অন্তর্দৃষ্টি কাভার দেয়ার মতো কোনো ইন্স্যুরেন্স আসলেই নেই, জনাব। তবে আপনি সম্ভবত জানেন যে ইন্স্যুরেন্স ওসব-ও কাভার করে না।'

'এটা কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ নয়।'

'না, এটা একটা অস্তিত্বগত দুর্যোগ। উদাহরণস্বরূপ, স্রেফ একবার কিশমিশ

ঝোপের নিচে তাকান, তাহলেই বুঝতে পারবেন আমি কী বলতে চাইছি। আপনার গোটা জীবনের পতন বন্ধক রেখে আপনি নিজের ইন্স্যুরেন্স করতে পারেন না। তেমনি, অস্তগামী সূর্যকে বন্ধক রেখেও আপনি নিজের ইন্স্যুরেন্স করতে পারেন না।'

'আমাদের কি এ-সব সহ্য করতে হবে?' স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন জোয়ানার বাবা।

মাথা নাড়লেন জোয়ানার মা, সোফির মা-ও তাই করলেন।

'কী লজ্জা,' বললেন তিনি, 'তা-ও আবার আমরা এমন অঢেল খরচ করার পর।'

তরুণ অতিথিরা তাকিয়েই রয়েছে অ্যালবার্টোর দিকে। চশমা পরা, কোঁকড়া চুলের একটি ছেলে বলে উঠল, 'আমরা আরও শুনতে চাই।'

'ধন্যবাদ, তবে বেশি কিছু আর বলার নেই। কেউ যখন উপলব্ধি করে যে সে অন্য কোনো মানুষের নিদ্রালু চেতনায় একটা স্বপ্নপ্রতিচ্ছবি, তখন, আমার মতে, চুপ হয়ে যাওয়াই সবচেয়ে বিচক্ষণের লক্ষণ। অবশ্য আমি এই সুপারিশ করে শেষ করতে পারি যে দর্শনের ইতিহাসের ওপর একটা ছোট্ট কোর্স করো তোমরা। পূর্ব প্রজন্মের মূল্যবোধ সম্পর্কে ক্রিটিকাল হওয়াটা জরুরি। সোফিকে আমি যদি কিছু শেখাতে চেষ্টা করে থাকি তা ঠিক এই, ক্রিটিকালি চিন্তা করা। হেগেল একে বলতেন নেতিবাচকভাবে চিন্তা করা।'

আর্থনীতিক উপদেষ্টা তখনো দাঁড়িয়ে রয়েছেন, টেবিলের ওপর ড্রাম বাজিয়ে চলেছেন আঙুলগুলো দিয়ে।

'স্কুল, গির্জা আর আমরা নিজেরা তরুণ-প্রজন্মের ভেতর যে-সব সুস্থ মূল্যবোধ সঞ্চারিত করতে চাইছি সেগুলো সব নষ্ট করে দেবার চেষ্টা করছে এই গণ্ডগোলসৃষ্টিকারী লোকটি। অথচ ভবিষ্যৎ বলতে কারও সামনে যদি কিছু থাকে তো এই তরুণ প্রজন্মেরই আছে আর আমরা যা গড়ে তুলেছি তার সবই একদিন উত্তরাধিকারসূত্রে পাবে তারা। এই জমায়েত থেকে এই লোকটাকে এক্ষুণি বের করে দেয়া না হলে আমি আমাদের উকিলকে ডাকবো। ব্যাপারটা কীভাবে সামলাতে হবে সেটি তিনি জানবেন।'

'এই ব্যাপারটা আপনি সামলালেন কি না সামলালেন তাতে কিছু আসে যায় না, যেহেতু আপনি ছায়া ছাড়া কিছুই নন। সে যাই হোক, সোফি আর আমি একটু পরই পার্টিটা থেকে বিদায় নিচ্ছি কারণ আমাদের জন্য দর্শন কোর্সটা পুরোপুরি তাত্ত্বিক নয়। এটার একটা ব্যবহারিক দিকও রয়েছে। সময় হলেই আমরা আমাদের গায়েব করার কাজটা করবো। এভাবেই মেজরের চেতনা থেকে চুপিচুপি সরে পড়তে যাচ্ছি আমরা।'

হেলেন অ্যামুন্ডসেন তাঁর কন্যার হাতটা আঁকড়ে ধরলেন।

'তুই নিশ্চয়ই আমাকে ছেড়ে যাবি না, সোফি?'

সোফি তার মাকে জড়িয়ে ধরল। মুখ তুলে অ্যালবার্টোর দিকে তাকাল সে।

'মা এতো মন খারাপ করেছে...'

'উঁহু, ব্যাপারটা স্রেফ হাস্যকর। যা শিখেছো তা ভুলে যেয়ো না। ঠিক এ-ধরনের অর্থহীন ব্যাপার থেকেই নিজেদেরকে মুক্ত করতে হবে আমাদের। তোমার মা একজন রমণীয় আর সদয় মহিলা, ঠিক সেই ছোট্ট রেড রাইডিংহুডের মতো, যে কিনা সেদিন

আমার বাড়িতে এসেছিল তার দাদির জন্য এক ঝুড়িভর্তি খাবার নিয়ে। খানিক আগেই যে-প্লেনটা উড়ে গেল সেটির যতটা জ্বালানি দরকার ছিল তার শুভেচ্ছামূলক কসরত দেখানোর জন্যে, তোমার মার মন তারচেয়ে বেশি খারাপ নয়।'

'আমার মনে হয় আপনি কী বলতে চাইছেন তা আমি বুঝতে পারছি,' সোফি বলল। ঘুরে দাঁড়াল তার মা'র দিকে। 'সেজন্যই উনি যা বলেন তা করতে হবে আমাকে, মা। তোমাকে একদিন আমার ছেড়ে যেতেই হোতো।'

'তোকে মিস করবো আমি,' তার মা বললেন। 'তবে এর ওপরে যদি কোনো স্বর্গ থেকে থাকে তাহলে তোকে স্রেফ উড়াল দিতে হবে। কথা দিচ্ছি ঠিকমতো গোবিন্দর দেখাশোনা করব আমি। দিনে কটি লেটুস পাতা খায় ওটা, একটা না দুটো?'

অ্যালবার্টো হাত রাখলো তাঁর কাঁধে।

'আপনি অথবা এখানকার কেউই আমাদেরকে স্রেফ এই কারণে মিস করবেন না যে আপনাদের কোনো অস্তিত্ব নেই। ছায়া ছাড়া আপনারা আর কিছুই নন।'

'এরচেয়ে অপমানের কথা কখনো শুনিনি আমি,' ফেটে পড়লেন মিসেস ইঙ্গেব্রিগস্টেন। তাঁর স্বামী ওপর-নিচে মাথা নাড়লেন।

'আর কিছু না হোক, চরিত্রহানির কারণেই ওর বিরুদ্ধে মামলা করতে পারবো আমরা। আমি নিশ্চিত লোকটা কম্যুনিস্ট। যে-সব জিনিসকে আমরা মূল্যবান বলে মনে করি সে-সব থেকে আমাদেরকে বঞ্চিত করতে চায় সে। লোকটা একটা স্কাউন্ড্রেল।'

এর পরেই অ্যালবার্টো আর আর্থনীতিক উপদেষ্টা দু'জনেই বসে পড়লেন। দ্বিতীয় জনের মুখ রাগে লাল। এবার জোয়ানা আর জেরেমি-ও এসে টেবিলে বসল। তাদের জামাকাপড় নোংরা, কোঁচকানো সোনালি চুলে কাদামাটি লেগে শক্ত হয়ে আছে।

'মা, আমার বাচ্চা হবে,' জোয়ানা ঘোষণা করল।

'ঠিক আছে, তবে তার আগে বাড়ি যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে তোকে।'

তার স্বামীও সঙ্গে সঙ্গে সমর্থন জানালেন। 'ওকে স্রেফ ধৈর্য ধরতে হবে,' বললেন তিনি। 'আর আজকে যদি নাম রাখতে হয় তাহলে সেটি ওকেই ব্যবস্থা করতে হবে।'

গম্ভীরভাবে সোফির দিকে তাকালেন অ্যালবার্টো।

'সময় হয়ে গেছে।'

'যাওয়ার আগে আর খানিকটা কফি এনে দিয়ে যা অন্তত আমাদের জন্য,' সোফির মা বললেন।

'অবশ্যই মা, এক্ষুণি আনছি।'

টেবিল থেকে থার্মোসটা নিল সোফি। আরও কফি বানাতে হলো তাকে। কফি হতে হতে পাখিগুলো আর গোল্ডফিশটাকে খাওয়াল সে। বাথরুমেও গেল সে, একটা লেটুস পাতা বের করে রাখল গোবিন্দর জন্য। বিড়ালটাকে কোথাও দেখতে পেল না সে, তবে বিড়ালের খাবারের একটা বড়সড় ক্যান খুলে একটা গামলায় সব ঢেলে সিঁড়ির ওপর রেখে দিল সেটি। অনুভব করল চোখ ঠেলে পানি বেরিয়ে আসছে তার।

সে যখন কফি নিয়ে ফিরে এলো, গার্ডেন পার্টিটাকে তখন এক তরুণীর দার্শনিক উৎসবের চেয়ে বাচ্চাদের পার্টি বলেই মনে হচ্ছিল বেশি। বেশ কয়েকটা সোডার বোতল উল্টে পড়ে আছে টেবিলের ওপর, টেবিলক্লথ জুড়ে চকলেট কেক লেগে আছে,

কিশমিশ দেয়া বনরুটির ডিশ উল্টে পড়ে আছে লনের মধ্যে। সোফি এসে পৌঁছুতেই একটা ছেলে লেয়ার কেকটার ওপর একটা পটকা রাখল, পুরো টেবিল আর সমস্ত অতিথির ওপর ফাটল সেটি। সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হলো মিসেস ইঙ্গেব্রিগস্টেনের লাল প্যান্টস স্যুটটা। অদ্ভুত ব্যাপার হলো তিনি আর বাকি প্রত্যেকেই একেবারে শান্তভাবে গ্রহণ করলো ব্যাপারটাকে। চকলেট কেকের বড়সড় একটা টুকরো তুলে নিয়ে সেটি জেরেমির সারা মুখে মাখিয়ে দিল জোয়ানা, তারপর আবার সেটি চেটে খাবার জন্য এগিয়ে গেল।

অন্য সবার থেকে খানিকটা দূরে গ্লাইডারে বসে ছিলেন সোফির মা আর অ্যালবার্টো। সোফির উদ্দেশে হাত নাড়লেন তাঁরা।

'তাহলে শেষ পর্যন্ত তোমার গোপনীয় আলাপ হলো,' বলল সোফি।

'আর তুই কিন্তু একেবারে ঠিক,' তার মা বললেন, তাকে বেশ গর্বিত লাগছে এখন। 'অ্যালবার্টো খুবই পরোপকারী মানুষ। তার সমর্থ হাতে তোকে তুলে দিলাম আমি।'

দু'জনের মাঝখানে গিয়ে বসল সোফি।

দুটো ছেলে কী করে যেন ছাদে উঠে পড়েছে। একটা মেয়ে চুলের কাঁটা দিয়ে সব কটি বেলুন ফুটো করতে লেগে পড়েছে ঘুরে ঘুরে। এমন সময় অনাহূত এক অতিথি মোটর সাইকেল চেপে এক ক্রেট বিয়ার আর ক্যারিয়ারে বাঁধা অ্যাকোয়াভিটের বোতল নিয়ে হাজির হলো। অতিথিবৎসল ক'টি প্রাণ তাকে স্বাগত জানিয়ে ভেতরে নিয়ে এলো।

তাই দেখে আর্থনীতিক উপদেষ্টা টেবিল ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন, হাততালি দিয়ে তিনি বলে উঠলেন :

'একটা খেলা খেলতে চান আপনারা?'

বিয়ারের একটা বোতল পাকড়াও করলেন তিনি, পুরোটাই চালান করে দিলেন পেটে, তারপর খালি বোতলটা রাখলেন লনের মধ্যখানে। তারপর টেবিলের কাছে গিয়ে বার্থ ডে কেকটার শেষ পাঁচটা রিং নিয়ে এলেন। অতিথিদের দেখালেন কী করে রিংগুলোকে এমনভাবে ফেলতে হবে যাতে সেগুলো বোতলটার গলা দিয়ে গলে যায়।

'মরণ যন্ত্রণা,' অ্যালবার্টো বললেন। 'মেজর সবকিছুর ইতি টেনে দেবার আর হিল্ডা রিং বাইন্ডারটা বন্ধ করার আগেই সরে পড়া উচিত আমাদের।'

'মা, এগুলো সব একাই পরিষ্কার করতে হবে তোমাকে।'

'সেটি কোনো ব্যাপার নয়, মা। এটা তোর জন্য কোনো জীবনই ছিল না। অ্যালবার্টো যদি এরচেয়ে ভালো একটা জীবন দিতে পারে তোকে তাহলে আমার চেয়ে সুখী আর কেউ হবে না। তুই বলেছিলি না, একটা সাদা ঘোড়া আছে ওর?'

বাগানের দিকে নজর ফেরাল সোফি। চেনাই যাচ্ছে না জায়গাটাকে। বোতল, মুরগির হাড়গোড়, বনরুটি আর বেলুন পদদলিত হয়ে আছে ঘাসে।

'একসময় এটাই ছিল আমার ছোট্ট নন্দনকানন,' সোফি বলল।

'আর এখন তুমি সেখান থেকে বিতাড়িত হচ্ছো,' অ্যালবার্টো বললেন।

সাদা মার্সিডিজটায় বসে আছে একটা ছেলে। ইঞ্জিনটা চালু করল সে আর অমনি

গাড়িটা বাগানের গেটটা গুঁড়িয়ে দিয়ে নুড়ি-বিছানো পথ ধরে বাগানের ভেতর ঢুকে পড়ল।

সোফি অনুভব করল শক্ত হাতে তার বাহু আঁকড়ে ধরে গুহাটার ভেতর টেনে নেয়া হলো তাকে। এরপরই অ্যালবার্টোর গলা শুনতে পেল সে :

'নাউ!'

ঠিক সেই মুহূর্তেই একটা আপেল গাছের গায়ে গিয়ে ধাক্কা খেল সাদা মার্সিডিজটা। কাঁচা ফলের বৃষ্টি ঝরল হুডটার ওপর।

'এটা কিন্তু বড্ড বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে!' আর্থনীতিক উপদেষ্টা তেড়ে ফুড়ে উঠলেন। 'উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দাবি করছি আমি।'

তাঁর স্ত্রী-ও তাঁর পূর্ণ সমর্থন ব্যক্ত করলেন।

'এটা সেই হতচ্ছাড়া স্কাউন্ড্রেলটার দোষ! কোথায় সে?'

'ওরা শূন্যে মিলিয়ে গেছে,' হেলেন অ্যামুন্ডসেন বলে উঠলেন, তাঁর গলায় যেন খানিকটা গর্বের ছোঁয়া।

শরীরটা টানটান করে লম্বা টেবিলটার কাছে হেঁটে গিয়ে দার্শনিক গার্ডেন পার্টির ভগ্নাবশেষটুকু পরিষ্কার করতে লেগে পড়লেন তিনি।

'আরও কফি খাবে কেউ?'

কা উ ন্টা র প য়ে ন্ট

৩৩

...দুই বা ততোধিক সুরের মিশ্রণ...

বিছানায় উঠে বসল হিল্ডা। সোফি আর অ্যালবার্টোর গল্পের ওখানেই শেষ। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আসলে কী ঘটেছিল?

শেষ চ্যাপ্টারটা তার বাবা কেন লিখলেন? সোফির জগতের ওপর তাঁর ক্ষমতা প্রদর্শন করার জন্য?

গভীর চিন্তামগ্ন অবস্থাতেই গোসল সেরে কাপড়চোপড় পরে নিল সে। তাড়াতাড়ি সকালের নাশতা সেরে বাগানে হেঁটে বেড়াল কিছুক্ষণ, তারপর বসল গিয়ে গ্লাইডারে।

অ্যালবার্টোর সঙ্গে সে একমত যে গার্ডেন পার্টিতে ঘটা একমাত্র বিচক্ষণ ব্যাপার ছিল তাঁর বক্তৃতাটা। তার বাবা নিশ্চয়ই এটা মনে করেননি যে হিল্ডার জগৎটা সোফির গার্ডেন পার্টির মতোই কোলাহলপূর্ণ? বা শেষ পর্যন্ত তার জগৎটাও উবে যাবে?

তারপর আবার সোফি আর অ্যালবার্টোর ব্যাপারটাও আছে। সেই গোপন পরিকল্পনাটার কী হলো?

গল্পটা চালিয়ে যাওয়ার ভার কি স্বয়ং হিল্ডার উপরই? নাকি ওরা আসলেই সেটি থেকে সরে পড়ার ব্যবস্থা করতে পেরেছে?

তাছাড়া, ওরা কোথায় এখন?

হঠাৎ করেই একটা চিন্তা মাথায় এলো তার। অ্যালবার্টো আর সোফি যদি সত্যি সত্যিই গল্পটা থেকে সরে পড়ে থাকে তাহলে রিং বাইন্ডারে সে-সম্পর্কে আর কিছু লেখা থাকবে না। ওখানে যা কিছু আছে দুর্ভাগ্যবশত তার সবকিছুই তার বাবার কাছে একেবারে পরিষ্কার।

তাহলে কি এমন কিছু আছে যা সরাসরি বলা হয়নি? সে-ব্যাপারে কিন্তু যথেষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে। হিল্ডা উপলব্ধি করল পুরো কাহিনীটা তাকে আরও দুয়েকবার পড়তে হবে।

সাদা মার্সিডিজটা বাগানের ভেতর ঢুকে পড়তেই অ্যালবার্টো সোফিকে টেনে নিয়ে গুহার মধ্যে ঢুকলেন। তারপর তারা মেজরের কেবিনের উদ্দেশে বনের ভেতর দিয়ে ছুট দিলেন।

'জলদি!' চেঁচিয়ে উঠলেন অ্যালবার্টো। 'ও আমাদের খোঁজ করার আগেই ঘটতে হবে ব্যাপারটা।'

'আমরা কি এখন মেজরের নাগালের বাইরে?'

'আমরা সীমান্ত অঞ্চলে রয়েছি।'

নৌকা বেয়ে পানি পেরিয়ে দৌড়ে কেবিনে গিয়ে ঢুকল ওরা। মেঝেতে একটা চোরা দরজা খুললেন অ্যালবার্টো। ঠেলে সোফিকে নিচে সেলারে পাঠালেন তিনি। এরপর সবকিছু অন্ধকার হয়ে গেল।

পরের দিনগুলোতে হিল্ডা তার পরিকল্পনাটা নিয়ে ব্যস্ত রইল। বেশ কয়েকটা চিঠি পাঠাল সে কোপেনহেগেনে, অ্যানি ড্যামসডালের কাছে, বার দুয়েক তাকে ফোন করল সে। বন্ধু এবং পরিচিতদের সাহায্য নিল সে, সেই সঙ্গে স্কুলে তার ক্লাসের অর্ধেক ছেলেমেয়েকে নিযুক্ত করল নানান কাজে।

এরই ফাঁকে *সোফির জগৎ* পড়ল সে। একবার পড়েই রেখে দেয়ার মতো কোনো কাহিনী এটা নয়। সোফি আর অ্যালবার্টো গার্ডেন পার্টি থেকে চলে যাওয়ার পরে তাদের কী হলো সে-সম্পর্কে সারাক্ষণই নিত্য নতুন চিন্তা আসছে তার মাথায়।

২৩ জুন শনিবার ন'টার দিকে চমকে জেগে উঠল সে ঘুম থেকে। সে জানে তার বাবা এরই মধ্যে লেবাননের ক্যাম্প ত্যাগ করেছেন। এবার শুধু অপেক্ষার পালা। তাঁর দিনের শেষ অংশটা একেবারে খুঁটিনাটিসহ পরিকল্পনা করা।

সকালে পরে সে তার মায়ের সঙ্গে মিডসামার ঈভের প্রস্তুতি নিল। হিল্ডা না ভেবে পারল না সোফি আর তার মা কী করে তাদের মিডসামার ঈভের আয়োজন করতে পারে। কিন্তু সেটি তো এমন একটি ব্যাপার যা তারা *করে ফেলেছে*। ব্যাপারটা শেষ, চুকেবুকে গেছে। কিন্তু আসলেই কি তাই? ওরা কি এই মুহূর্তে ঘুরে ঘুরে সব জায়গা সাজিয়ে বেড়াচ্ছে?

সোফি আর অ্যালবার্টো একটা লনে এসে বসল, সেটির সামনে কুৎসিতদর্শন বাতাস নির্গমন পথ আর বাইরের দিকে ভেন্টিলেশন ক্যানেলসহ দুটো দালান। একটা দালানের ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো তরুণ একটা জুটি। ছেলেটির হাতে বাদামি রঙের ব্রিফকেস আর মেয়েটির কাঁধ থেকে ঝুলছে লাল একটি হ্যান্ডব্যাগ। পেছন থেকে, সরু একটা রাস্তা ধরে একটা গাড়ি এগিয়ে এলো।

'কী হলো? সোফি শুধালো।

'পেরেছি আমরা!'

'কিন্তু কোথায় আমরা?'

'এটা হচ্ছে অসলো।'

'আপনি ঠিক জানেন?'

'ঠিক জানি। এই দালান দুটোর একটির নাম শ্যাতো নিউফ, মানে 'নতুন প্রাসাদ।' লোকে সঙ্গীত নিয়ে পড়াশোনা করে ওখানে। অন্যটা কনগ্রিগেশন ফ্যাকাল্টি। থিওলজির স্কুল। পাহাড়ের আরও ওপরে বিজ্ঞান নিয়ে পড়ে লোকে আর একেবারে চুড়োয় সাহিত্য আর দর্শন।'

'আমরা কি হিল্ডার বই আর মেজরের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে এসেছি?'

'হ্যাঁ, দুটোরই বাইরে। আমাদের আর কখনো খুঁজে পাবে না সে এখানে।'

'কিন্তু বনের ভেতর দিয়ে দৌড়ানোর সময় কোথায় ছিলাম আমরা?'

'অর্থনীতিক উপদেষ্টার গাড়িটা আপেল গাছের গায়ে আছড়ে ফেলার কাজে মেজর যখন ব্যস্ত সেই অবসরে গুহার ভেতর লুকিয়ে পড়েছি আমরা। তখন ছিলাম আমরা ভ্রূণ-এর স্তরে। একই সঙ্গে পুরনো আর নতুন যুগের ছিলাম আমরা। কিন্তু ওখানে আমাদের লুকানোর ব্যাপারটা সম্ভবত মেজর কল্পনা করতে পারেনি।'

'কেন?'

'আমাদেরকে এতো সহজে পার পেয়ে যেতে দিতে চায়নি সে। ব্যাপারটা ছিল যেন স্বপ্নের মতো। অবশ্য এই সম্ভাবনাটা থেকেই যাচ্ছে যে সে নিজেই ব্যস্ত ছিল এ-সব নিয়ে।'

'কী বলতে চান?'

'সাদা মার্সিডিজটা সে-ই চালু করেছিল। আমাদের হারিয়ে ফেলার জন্য সে হয়ত নিজেকে পুরোপুরি ব্যস্ত রেখেছিল। যে-সব ঘটনা ঘটছিল তাতে হয়ত সে একেবারে ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে পড়েছিল...'

তরুণ জুটিটা এর মধ্যে মাত্র কয়েক গজের মধ্যে এসে পড়েছে। নিজের চেয়ে এতো বেশি বয়সী একটি লোকের সঙ্গে ঘাসের ওপর বসে থাকায় খানিকটা অস্বস্তি বোধ করল সোফি। তাছাড়া, সে চাইছিল অ্যালবার্টো যা বলছেন তা কাউকে দিয়ে নিশ্চিত করাতে।

সে উঠে দাঁড়িয়ে ওদের কাছে গেল।

'কিছু মনে করবেন না, এই রাস্তাটার নামটা দয়া করে বলবেন?'

কিন্তু ওরা তাকে কোনোরকম গ্রাহ্যই করল না।

সোফি এতোটাই বিরক্ত হলো যে সে আবারও জিজ্ঞেস করল তাদের

'কারও প্রশ্নের জবাব দেয়াটাই তো রীতি, তাই না?'

তরুণ লোকটি তার সঙ্গীকে কী যেন বোঝাতে ব্যস্ত

'কন্ট্রাপান্টাল ফর্মটা দুটো মাত্রায় কাজ করে, আনুভূমিকভাবে বা সাঙ্গীতিকভাবে আর উল্লম্বভাবে বা ঐকতানিকভাবে। সব সময়েই দুই বা ততোধিক সুর একসঙ্গে বাজবে...'

'বাধা দেয়ার জন্য দুঃখিত, কিন্তু...'

'সুরগুলো এমনভাবে যুক্ত হয় যে সেগুলোর স্বরূপ যথাসম্ভব বেরিয়ে আসে, একটার বিপরীতে অন্যটি কেমন শোনাচ্ছে সেটির অপেক্ষা না করেই। তবে সুরগুলোকে অবশ্যই সমন্বিত হতে হবে। আসলে এটা হচ্ছে একটা নোটের বিপরীতে বা পিঠে আরেকটা নোট।'

'কী অভদ্র! ওরা বধিরও নয় অন্ধও নয়।' তৃতীয়বারের মতো চেষ্টা করল সোফি, সামনে গিয়ে ওদের পথ আটকে দিয়ে।

স্রেফ একপাশে সরিয়ে দেয়া হলো তাকে।

ছুটে গেল সোফি অ্যালবার্টোর কাছে।

'আমার কথা শুনতে পাচ্ছে না ওরা!' একরাশ হতাশা নিয়ে বলল সে আর ঠিক

তখনই হিল্ডা আর তার ক্রুশবিদ্ধ যিশুমূর্তিকে নিয়ে দেখা নিজের স্বপ্নের কথা মনে পড়ে গেল তার।

'এই মূল্যটুকু আমাদের দিতেই হবে। যদিও আমরা একটা বই থেকে চুপিচুপি বেরিয়ে গেছি, তাই বলে সেটির লেখকের সমান মর্যাদা আমরা দাবি করতে পারি না। তবে আমরা কিন্তু সত্যিই এখানে আছি। সেই ফিলসফিকাল গার্ডেন পার্টি থেকে চলে আসার সময় আমাদের বয়স যত ছিল তারচেয়ে এক দিনও বয়স বাড়বে না আমাদের এখন থেকে।'

'তার মানে কি এই যে আমাদের চারপাশের মানুষজনের সঙ্গে আর কখনো সত্যিকার অর্থে কোনো সম্পর্ক থাকবে না আমাদের?'

'সত্যিকারের একজন দার্শনিক কখনোই 'আর কখনোই না' বলেন না। ক'টা বাজে?'

'আটটা।'

'ক্যাপ্টেনের বাঁক ছেড়ে যখন চলে আসি তখনকার সময়ই এটা; ঠিকই আছে।'

'আজই তো হিল্ডার বাবা লেবানন থেকে ফিরছে।'

'সেজন্যই তাড়াতাড়ি করতে হবে আমাদের।'

'কেন-কী বলতে চাইছেন?'

'মেজর বিয়ার্কলেতে তার বাড়িতে ফিরে এলে কী হবে তা জানতে ইচ্ছে করছে না তোমার?'

'স্বভাবতই, কিন্তু...'

'এসো তাহলে?'

শহরের দিকে হাঁটতে শুরু করল দু'জন। মেলা লোকজন তাদের পাশ কাটিয়ে গেল কিন্তু তারা সবাই ঠিক এমনভাবে হেঁটে গেল যেন সোফি আর অ্যালবার্টো অদৃশ্য।

সারা রাস্তায় কার্বসাইডে গাড়ি পার্ক করা। হুড খোলা ছোট্ট একটা লাল কনভার্টিবলের সামনে এসে দাঁড়ালেন অ্যালবার্টো।

'এটাতেই চলবে,' বললেন তিনি। 'তবে গাড়িটা যে *আমাদেরই* সে-ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে নিতে হবে।'

'কী বলছেন বুঝতে পারছি না।'

'তাহলে খুলে বলাই ভালো। সাধারণ কোনো গাড়ি, যেটার মালিক এই শহরের কেউ। স্রেফ সে-রকম একটা নিলেই কিন্তু চলবে না আমাদের। চালক ছাড়া একটা গাড়ি চলতে দেখলে কী ঘটবে বলে মনে করো তুমি? আর তাছাড়া আমরা হয়ত সেটি চালুও করতে পারবো না।'

'তাহলে এই কনভার্টিবলটা কেন?'

'মনে হয় পুরনো কোনো মুভিতে আমি দেখেছি এটা।'

'দেখুন, আমি দুঃখিত, কিন্তু এ-সব রহস্যময় মন্তব্য শুনে শুনে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি আমি।'

'এটা একটা মেক-বিলিভ গাড়ি, সোফি। ঠিক আমাদের মতো। লোকে শুধু একটা খালি জায়গা দেখতে পাচ্ছে এখানে। যাত্রা শুরু করার আগে এই ব্যাপারটাই নিশ্চিত

করতে হবে।'

গাড়ির পাশে দাঁড়িয়ে অপেক্ষায় রইলেন তারা। খানিক পর সাইডওয়াক ধরে সাইকেল চালিয়ে এলো একটি ছেলে। হঠাৎ করেই ঘুরে সাইকেলটা সে সোজা লাল গাড়িটার ভেতর দিয়ে চালিয়ে রাস্তায় নেমে গেল।

'এই যে, দেখলে? গাড়িটা আমাদের!'

যাত্রী আসনের দরজাটা মেলে ধরলেন অ্যালবার্টো।

'বি মাই গেস্ট!' বললেন তিনি। সোফি ঢুকে পড়ল।

চালকের আসনে গিয়ে বসলেন অ্যালবার্টো। চাবিটা ইগনিশনেই ছিল, সেটি ঘোরালেন তিনি, চালু হয়ে গেল ইঞ্জিন।

লাইসেকার, স্যান্ডভিকা, ড্রামেন পেরিয়ে শহরের বাইরে দক্ষিণ দিকে ছুটে চললেন তারা, এগোলেন লিলেস্যান্ডের দিকে। চলতে চলতে ক্রমেই বেশি করে মিডসামার বনফায়ার দেখতে পাচ্ছিলেন তাঁরা, বিশেষ করে ড্রামেন পেরনোর পর।

'এখন মিডসামার, সোফি। দেখো, দারুণ না?'

'সেটি ছাড়াও, এ-রকম একটি খোলা গাড়িতে চড়াতে চমৎকার একটা টাটকা বাতাস গায়ে লাগছে। আচ্ছা, আসলেই কি কেউ দেখতে পাচ্ছে না আমাদের?'

'শুধু আমাদের মতো লোকজন ছাড়া। অবশ্য সে-রকম কারও সঙ্গে দেখা হয়েও যেতে পারে আমাদের। ক'টা বাজে?'

'সাড়ে আটটা।'

'শর্টকাট দুয়েকটা পথ ধরতে হবে আমাদের। এই ট্রেইলারের পেছন পেছন গেলে চলবে না।'

বাঁক নিয়ে বিরাট একটা গমের ক্ষেতের ভেতর ঢুকে পড়লেন তাঁরা। পেছন ফিরে তাকিয়ে সোফি দেখল সমান হয়ে নুয়ে পড়া ডাঁটিগুলোর চওড়া একটা পথরেখা পেছনে ফেলে যাচ্ছে তারা।

'কাল সবাই বলবে ক্ষেতের ওপর দিয়ে হাওয়ার একটা ঝাপটা বয়ে গেছে,' অ্যালবার্টো বললেন।

কোপেনহেগেনের বাইরে অবস্থিত কাস্ট্রাপ এয়ারপোর্টে এইমাত্র নামলেন মেজর অ্যালবার্টো ন্যাগ। ২৩ জুন শনিবার, সাড়ে চারটায়। দিনটা আজ এমনিতেই বেশ দীর্ঘ ছিল। শেষ ল্যাপের আগের এই ল্যাপটা ছিল রোম থেকে প্লেনে।

জাতিসংঘের ইউনিফর্ম পরেই পাসপোর্ট কন্ট্রোল পেরোলেন তিনি। পোশাকটা পরতে গর্ব বোধ করেন তিনি। শুধু নিজের আর তাঁর দেশেরই প্রতিনিধিত্ব করেন না তিনি। অ্যালবার্ট ন্যাগ প্রতিনিধিত্ব করেন এক আন্তর্জাতিক আইনগত পদ্ধতির-এক শতাব্দী বয়সী একটি ঐতিহ্যের, যে-ঐতিহ্য আজ ছড়িয়ে পড়েছে গোটা এই গ্রহটা জুড়ে।

কেবল একটা ফ্লাইট ব্যাগ সঙ্গে তাঁর। রোম থেকেই তাঁর বাকি ব্যাগেজ চেক করিয়ে এনেছেন তিনি। এখন শুধু তাঁর লাল পাসপোর্টটা উঁচু করে ধরলেই হবে।

'ডিক্লেয়ার করার মতো কিছু নেই।'

ক্রিস্টিয়ানস্যান্ডের উদ্দেশে তাঁর প্লেন যাত্রা করার আগে প্রায় তিন ঘণ্টা অপেক্ষা

করতে হচ্ছে মেজর অ্যালবার্ট ন্যাগকে। পরিবারের সদস্যদের জন্য কিছু উপহার কেনা যাবে এই সময়টাতে। অবশ্য দুই হপ্তা আগেই তিনি তাঁর জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান উপহারটা পাঠিয়ে দিয়েছেন হিল্ডাকে। জন্মদিনের দিন সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই সে যাতে ওটা দেখতে পায় সেজন্য মেজরের স্ত্রী মারিট সেটি হিল্ডার বেডসাইড টেবিলের ওপর রেখে দিয়েছিলেন। গভীর রাতে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানানোর পর থেকে হিল্ডার সঙ্গে আর কোনো কথা হয়নি তাঁর।

গোটা দুয়েক নরওয়েজীয় খবরের কাগজ কিনে বারে একটা ফাঁকা টেবিল বেছে নিয়ে কফির অর্ডার দিলেন অ্যালবার্ট। শিরোনামগুলোর ওপর তিনি নজর বোলাতে পেরেছেন কি পারেননি এমন সময় লাউডস্পিকারে দেয়া একটা ঘোষণা কানে গেল তাঁর: 'অ্যালবার্ট ন্যাগের জন্য একটি ব্যক্তিগত টেলিফোন। অ্যালবার্ট ন্যাগকে এসএএস তথ্যকেন্দ্রে যোগাযোগ করতে বলা হচ্ছে।'

কী হলো আবার? শিরদাঁড়া বেয়ে ঠাণ্ডা শিশিরে একটা স্রোত বয়ে গেল তাঁর। নিশ্চয়ই লেবাননে ফিরে যাওয়ার আদেশ আসেনি তাঁর। বাড়িতে কোনো সমস্যা হলো?

দ্রুত এসএএস তথ্যকেন্দ্রে পৌঁছে গেলেন তিনি।

'আমি অ্যালবার্ট ন্যাগ।'

'আপনার জন্য একটি মেসেজ আছে। জরুরি মেসেজ।'

সেই মুহূর্তেই খামটা খুললেন তিনি। ভেতরে আরও ছোট একটা খাম। তাতে ঠিকানা লেখা মেজর অ্যালবার্ট ন্যাগ, প্রযত্নে এসএএস তথ্যকেন্দ্র, কাস্ট্রাপ বিমানবন্দর, কোপেনহেগেন।

নার্ভাসভাবে ছোট্ট খামটা খুললেন অ্যালবার্ট। তাতে ছোট্ট একটা চিরকুট

প্রিয় বাবা, লেবানন থেকে বাড়ি ফিরে আসা উপলক্ষে শুভেচ্ছা। বুঝতেই পারো তোমার বাড়ি পৌঁছানো পর্যন্ত তর সইছে না আমার। লাউডস্পিকারে ঘোষণা দিয়ে তোমাকে মেসেজ দেয়ার জন্য আমাকে ক্ষমা করো। তবে ওটাই ছিল সবচেয়ে সহজ পদ্ধতি।

পুনশ্চ দুর্ভাগ্যক্রমে, চুরি যাওয়া এবং বিধ্বস্ত একটা মার্সিডিজের ব্যাপারে ক্ষতিপূরণ চেয়ে আর্থনীতিক উপদেষ্টা ইঙ্গেব্রিগস্টেনের কাছ থেকে একটা চিঠি এসেছে।

পুনঃ পুনশ্চ : তুমি যখন এখানে পৌঁছবে আমি হয়ত তখন বাগানে বসে থাকবো। তবে তার আগেও হয়ত তোমার সঙ্গে যোগাযোগ হবে আমার।

পুনঃ পুনঃ পুনশ্চ : বাগানে বেশিক্ষণ বসে থাকতে ভয় করে আমার। এ-সব জায়গায় মাটির ভেতর দেবে যাওয়াটা খুব সহজ। হিল্ডার ভালোবাসা নিও, তোমার বাড়ি আসা উদযাপনের প্রস্তুতির জন্য প্রচুর সময় পেয়েছে সে।

মেজর অ্যালবার্ট ন্যাগের প্রথম প্রতিক্রিয়াটা হলো এই যে তিনি মুচকি হাসলেন। কিন্তু তাকে নিয়ে কেউ এভাবে খেলুক এ-ব্যাপারটা তার বিশেষ পছন্দ হলো না। নিজের জীবনের দায়িত্ব নিজের ওপর নেয়াটাই বরাবরের পছন্দ তাঁর। কিন্তু এখন

লিলেস্যান্ডের এই ছোট্ট বদমেজাজী মেয়েটি কাস্ট্রাপ এয়ারপোর্টে তাঁর গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করছে! কী করে এসবের ব্যবস্থা করল সে?

খামটা বুক পকেটে রেখে ছোট্ট শপিং মলটার দিকে ধীর পায়ে হাঁটতে শুরু করলেন তিনি। ডেনিশ তৈরি-খাবারের ছোট একটা দোকানে তিনি ঢুকতে যাবেন প্রায় এই সময়ে দোকানের জানলায় টেপ দিয়ে লাগানো একটা ছোট খাম দেখতে পেলেন তিনি। মোটা একটা মার্কার পেন দিয়ে 'মেজর ন্যাগ' লেখা সেটিতে। অ্যালবার্ট সেটি নামিয়ে নিয়ে খুললেন

ব্যক্তিগত মেসেজ। যার জন্য : মেজর অ্যালবার্ট ন্যাগ, প্রযত্নে, ডেনিশ ফুড, কাস্ট্রাপ, কোপেনহেগেন। প্রিয় বাবা, প্লিজ বড়সড় একটা ডেনিশ সাল্যামি কিনে এনো, দু'পাউন্ডের হলে ভালো হয়। আর, একটা কনিয়াক সসেজ সম্ভবত মা'র অপছন্দ হবে না। পুনশ্চঃ ডেনিশ ক্যাভিয়ারও খারাপ না। ভালোবাসা নিও, হিল্ডা।

ঘুরে দাঁড়ালেন অ্যালবার্ট। হিল্ডা এখানে নেই, তাই নয় কি? নাকি মারিট ওকে নিয়ে কোপেনহেগেন বেড়াতে এসেছে, যাতে সে এখানে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে পারে? হাতের লেখাটা তো হিল্ডার...

হঠাৎ করেই জাতিসংঘের পর্যবেক্ষকের মনে হলো তাকে চোখে চোখে রাখা হচ্ছে। মনে হচ্ছে দূর থেকে তাঁর প্রতিটি কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণ করছে কেউ। একটি শিশুর হাতের পুতুল বলে মনে হলো তাঁর নিজেকে।

দোকানে ঢুকে দুই পাউন্ডের একটা সাল্যামি, একটা কনিয়াক সসেজ আর তিন জার ডেনিশ ক্যাভিয়ার কিনলেন তিনি। এরপর আবার দোকানগুলোর সারি ধরে হাঁটতে লাগলেন তিনি। হিল্ডার জন্য একটা সত্যিকারের উপহার কিনবেন বলে ঠিক করেছেন তিনি। একটা ক্যালকুলেটর হলে কেমন হয়? অথবা একটা ছোট্ট রেডিও-হ্যাঁ, তাই কিনবেন তিনি।

বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি বিক্রি করে এ-রকম একটা দোকানে পৌঁছে তিনি দেখলেন সেটির জানলাতেও ছোট্ট একটা খাম আঁটা আছে টেপ দিয়ে। এটাতে ঠিকানা লেখা : মেজর অ্যালবার্ট ন্যাগ, প্রযত্নে, কাস্ট্রাপের সবচেয়ে মজার দোকান। ভেতরে আছে নিচের লেখাটা

প্রিয় বাবা, সোফি তার জন্মদিন উপলক্ষে তার অতি উদার বাবার কাছ থেকে যে কম্বাইন্ড মিনি-টিভি আর এফএম রেডিও পেয়েছে সেজন্য সে তার শুভেচ্ছা আর ধন্যবাদ জানাচ্ছে। জিনিসটা অসাধারণ, আবার নেহাত মামুলিও বটে। অবশ্য আমাকে স্বীকার করতেই হবে যে এ-সব মামুলি ব্যাপারের প্রতি সোফির মতো আমিও দুর্বল। পুনশ্চ তুমি যদি এখনো এখানে পৌঁছে না থাকো তাহলে ডেনিশ ফুড স্টোর আর মদ ও তামাক বিক্রি হয় যেখানে সেই বড় ট্যাক্স ফ্রি দোকান দুটোতে পরবর্তী নির্দেশ দেয়া

আছে। পুনঃ পুনশ্চ আমার জন্মদিন উপলক্ষে কিছু টাকা পেয়েছি আমি, কাজেই মিনি-টিভিতে ৩৫০ ক্রাউন দান করতে পারি আমি। হিল্ডার ভালোবাসা নিও। এরই মধ্যে সে টার্কিটা স্টাফড্ করেছে আর ওয়াল্ডর্ফ সালাদ তৈরি করে ফেলেছে।

একটা মিনি-টিভির দাম ৯৮৫ ডেনিশ ক্রাউন। কন্যার খামখেয়ালি কৌশলের কারণে একবার এদিক আরেকবার সেদিক দৌড়তে বাধ্য হয়ে অ্যালবার্ট ন্যাগের যে মানসিক অবস্থা সেই তুলনায় অবশ্য দামটা নেহাতই মামুলি ব্যাপার। হিল্ডা কি এখানে আছে—না নেই?

এরপর থেকে যে-কোন জায়গায় গিয়েই প্রতিনিয়ত সতর্ক রইলেন তিনি। নিজেকে তাঁর একজন সিক্রেট এজেন্ট আর একটা নাচের পুতুলের সংমিশ্রণ বলে মনে হলো। মৌলিক মানবাধিকার থেকে কি বঞ্চিত করা হচ্ছে না তাঁকে?

শুল্ক মুক্ত দোকানটাতেও যাওয়ার তাড়া অনুভব করলেন তিনি। তাঁর নাম লেখা নতুন একটা খাম ঝুলছে সেখানে। তাঁকে কার্সর করে গোটা এয়ারপোর্টটাই একটা কম্পিউটার গেম হয়ে উঠছে। মেসেজটা পড়লেন তিনি

মেজর ন্যাগ, প্রযত্নে কাসট্রাপের শুল্কমুক্ত দোকান। এখান থেকে আমার যা দরকার তা হলো এক ব্যাগ গামড্রপ আর কিছু মার্জিপান (marzipan) বার। মনে রেখো, নরওয়েতে কিন্তু এগুলোর দাম খুব বেশি। বাড়ি ফেরার সময় সারাটা পথ পঞ্চেন্দ্রিয় অবশ্যই সজাগ রাখবে কিন্তু। জরুরি কোনো মেসেজ মিস হোক সেটি নিশ্চয়ই চাও না তুমি, তাই না? ভালোবাসা নিও, তোমার একান্তই শিক্ষানুরাগী কন্যা, হিল্ডা।

হতাশ ভঙ্গিতে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন অ্যালবার্ট, অবশ্য দোকানে গিয়ে ফরমায়েশ মতো কেনাকাটা তিনি ঠিকই করলেন। তিনটে প্লাস্টিক ক্যারিয়ার আর তাঁর ফ্লাইট ব্যাগটা নিয়ে ২৮নং গেটের দিকে এগোলেন তিনি তাঁর ফ্লাইটের জন্য অপেক্ষা করতে। আর যদি কোনো মেসেজ থেকে থাকে তাহলে সেগুলোকে ওখানেই অপেক্ষা করতে হবে।

অবশ্য ২৮নং গেটে আরেকটা সাদা খাম নজরে পড়ল তার, একটা পিলারের সঙ্গে টেপ দিয়ে আটকানো সেটি। 'প্রতি, মেজর ন্যাগ, প্রযত্নে ২৮ নং গেট; কাসট্রাপ বিমানবন্দর।' এটাও হিল্ডারই লেখা; তবে গেট নম্বরটা মনে হলো অন্য কেউ লিখেছে। অবশ্য সেটি বিচার করা সহজ নয় তার কারণ ওটার সঙ্গে তুলনা করার মতো অন্য কোন লেখা নেই। কেবল বড় হাতের অক্ষর আর সংখ্যা। খামটা নামিয়ে নিলেন তিনি। সেটিতে শুধু লেখা 'আর বেশি দেরি নেই।'

দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে একটা চেয়ারে বসে পড়লেন তিনি। শপিং ব্যাগগুলো হাঁটুর ওপরই রাখলেন তিনি। তো, এভাবেই শক্ত হয়ে বসে রইলেন মেজর, চোখের দৃষ্টি একেবারে সামনে, যেন এই প্রথমবারের মতো একা একা ভ্রমণে বেরিয়েছে একটি

ছোট্ট শিশু। হিল্ডা যদি এখানে থেকে থাকে তাহলে তাঁকে প্রথমে আবিষ্কার করার তৃপ্তিটা যে সে পাচ্ছে না তা নিশ্চিত;

যে যাত্রীই আসছে তার দিকেই উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে তাকাতে থাকলেন তিনি। কিছুক্ষণের জন্য নিজেকে তাঁর কড়া নজরদারিতে থাকা এক রাষ্ট্রদ্রোহী বলে মনে হলো। শেষ পর্যন্ত যাত্রীদেরকে যখন প্লেনে চড়ার অনুমতি দেয়া হলো, স্বস্তির একটা নিঃশ্বাস ফেললেন তিনি। সবার শেষে প্লেনে চড়লেন তিনি। তাঁর বোর্ডিং পাসটা হস্তান্তর করার আগে চেক-ইন ডেস্কের সঙ্গে টেপ দিয়ে আটকানো আরও একটা সাদা খাম পেলেন তিনি।

ব্রেভিক অতিক্রম করলেন সোফি আর অ্যালবার্টো, তার খানিক পর ক্রাগেরো-র শেষ সীমানা।

'আপনি কিন্তু ভীষণ জোরে চালাচ্ছেন,' সোফি বলল।

'প্রায় ন'টা বাজে। শিগগিরই কিয়েভিকে ল্যান্ড করবে সে। তবে দ্রুতবেগে গাড়ি চালাবার জন্য কেউ আমাদের থামতে বলবে না।'

'ধরুন যদি আরেকটা গাড়ির সঙ্গে সংঘর্ষ হয় আমাদের?'

'সেটি যদি সাধারণ কোনো গাড়ি হয় তাহলে কিছুই হবে না। তবে সেটি যদি আমাদেরটার মতোই একটা হয়...'

'তাহলে কী হবে?'

'সেক্ষেত্রে আমাদেরকে সাবধান হতে হবে। খেয়াল করোনি, ব্যাট মোবিলকে পাশ কাটিয়ে গেলাম আমরা?'

'না।'

'ভেস্টফোল্ডের উত্তরে কোথাও পার্ক করা ছিল ওটা।'

'এই ট্যুরিস্ট বাসটাকে পাস কাটানো সহজ হবে না। রাস্তার দুই পাশেই ঘন জঙ্গল।'

'তাতে কিছু আসে যায় না সোফি। এই কথাটা মাথায় ঢুকছে না তোমার?'

এই বলে বনের ভেতর গাড়ি ঘোরালেন তিনি, তারপর সোজা চালাতে লাগলেন গাছগুলোর ভেতর দিয়ে।

স্বস্তির একটা নিঃশ্বাস ফেলল সোফি।

'আপনি ভয় পাইয়ে দিয়েছিলেন আমাকে।'

'ইটের দেয়ালের ভেতর দিয়ে চালিয়ে দিলেও কিছু টের পাবো না আমরা।'

'তার অর্থ স্রেফ এই যে আমাদের চারপাশের তুলনায় আমরা বাতাসের তৈরি স্পিরিট।'

'না, না, এবার কিন্তু তুমি ঘোড়ার আগে গাড়ি জুতছ। আমাদের চারপাশের বাস্তবতাটাই বরং আমাদের কাছে বায়বীয় অ্যাডভেঞ্চার বলে মনে হচ্ছে।'

'বুঝলাম না।'

'তাহলে মন দিয়ে শোনো বহুল প্রচারিত একটু ভুল ধারণা আছে যে স্পিরিট হচ্ছে বাষ্পের চেয়েও বেশি 'বায়বীয়' একটা জিনিস। বরং স্পিরিট-ই বরফের চেয়েও কঠিন।'

'সে-রকম তো কখনো মনে হয়নি আমার কাছে।'

'এবার একটা গল্প শোনাবো তোমাকে। একসময় একটা লোক ছিল যে পরীর অস্তিত্বে বিশ্বাস করতো না। একদিন সে যখন বাইরে বনের মধ্যে কাজ করছিল তখন একটা পরী তার কাছে আসে।'

'তারপর?'

'দু'জনে তারা একসঙ্গে হাঁটল কিছুক্ষণ। তারপর লোকটা পরীটির দিকে তাকিয়ে বলল, 'ঠিক আছে, এবার আমি স্বীকার করলাম পরী আছে। কিন্তু তুমি আমাদের মতো বাস্তবে বসবাস করো না।' 'কী বলতে চাও তুমি?' পরী জিজ্ঞেস করল। লোকটা তখন জবাব দিল, 'আমরা যখন বড় পাথরটার কাছে পৌঁছলাম তখন ওটার পাশ দিয়ে ঘরে যেতে হয়েছিল আমাকে। কিন্তু খেয়াল করেছি তুমি ওটার ভেতর দিয়ে ভেসে চলে এলে। আর যখন আমরা পথের ওপর পড়ে থাকা বিশাল কাঠের গুঁড়িটার কাছে পৌঁছুলাম তখন আমাকে ওটা বেয়ে ওপরে উঠে অন্য ধারে যেতে হলেও তুমি স্রেফ ওটার ভেতর দিয়ে হেঁটে গিয়েছিলে।' পরীটি খুব অবাক হলো। সে বলল 'কিন্তু সেই সঙ্গে কি তুমি এটা খেয়াল করোনি যে জলাভূমির ভেতর দিয়ে চলে যাওয়া একটা পথ ধরে হেঁটে গিয়েছিলাম আমি? আমরা দু'জনেই কুয়াশার ভেতর দিয়ে হেঁটে গিয়েছিলাম। তার কারণ হলো আমরা সেই কুয়াশার চেয়েও কঠিন।'

'বাহ্।'

'আমাদের বেলাতেও ব্যাপারটা তাই, সোফি। ইস্পাতের দরজার ভেতর দিয়েও ঢুকে যেতে পারে স্পিরিট। স্পিরিটকে ভাঙতে পারে এমন কোনো ট্যাংক বা বোমারু বিমান নেই।'

'সেটি একটি স্বস্তির কথা।'

'শিগগিরই রিসঅর অতিক্রম করবো আমরা। মেজরের কেবিন থেকে বেরনোর পর এক ঘণ্টা হয়ে গেছে। এখন সত্যি সত্যিই এক কাপ কফির সদ্ব্যবহার করতে পারি আমি।'

ওঁরা যখন ফিয়ান পৌঁছলেন, সনডেলেড-এর ঠিক আগে, রাস্তার বাম পাশে একটা ক্যাফেটেরিয়া পেরিয়ে এলেন ওরা। ওটার নাম সিন্ডেরেলা। অ্যালবার্টো গাড়িটা ঘুরিয়ে ফেলে ক্যাফেটেরিয়ার সামনে ঘাসের ওপর দাঁড় করালেন সেটি।

ভেতরে গিয়ে কুলার থেকে কোকের একটা বোতল নেয়ার চেষ্টা করল সোফি, কিন্তু বোতলটা তুলতে পারল না সে। মনে হলো আটকে গেছে ওটা। ওদিকে গাড়িতে পাওয়া কাগজের একটা কাপে কফি ঢালার চেষ্টা করছিলেন অ্যালবার্টো আরও ভেতরের কাউন্টারে গিয়ে। কেবল একটা লিভারে চাপ দিলেই কাজটা হওয়ার কথা, কিন্তু তিনি তাঁর সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করেও নিচে নামাতে পারলেন না সেটিকে।

তাতে তাঁর এমনই রোখ চেপে গেল যে ক্যাফেটেরিয়ার খদ্দেরদের দিকে ফিরলেন তিনি সাহায্যের জন্য। কেউ-ই তাঁর আহ্বানে সাড়া না দেয়ায় এতো জোরে চেঁচিয়ে উঠলেন তিনি যে দু'হাতে কান ঢাকতে হলো সোফিকে 'কফি চাই আমি!'

শিগগিরই রাগটা উবে গেল তার, হাসতে হাসতে সামনের দিকে বাঁকা হয়ে গেলেন তিনি। এক বৃদ্ধা মহিলা তাঁর চেয়ার ছেড়ে উঠে এগিয়ে এলেন ওদের দিকে।

তাঁর পরনে একটা ঝলমলে লাল স্কার্ট, বরফ নীল কার্ডিগান আর মাথায় পেঁচানো সাদা একটা রুমাল। ছোট্ট সেই ক্যাফেটেরিয়ার অন্য যে-কোনো কিছুর চেয়ে তাঁকে বেশি স্পষ্ট আর বাস্তব বলে মনে হচ্ছে।

অ্যালবার্টোর কাছে গিয়ে তিনি বললেন, 'ওরেব্বাপ, কী চেঁচাতেই না তুমি পারো, বাছা!'

'মাফ করবেন।'

'কফি খেতে চাও বলছিলে না?'

'হ্যাঁ, কিন্তু...'

'কাছেই ছোট্ট একটা দোকান আছে আমাদের।'

সেই মহিলাকে অনুসরণ করে ক্যাফেটেরিয়া থেকে বেরিয়ে সেটির পেছনের একটা রাস্তা ধরে হাঁটতে লাগলেন তাঁরা। হাঁটতে হাঁটতে বৃদ্ধা জিজ্ঞেস করলেন, 'এখানে নতুন বুঝি তোমরা?'

'সেটি স্বীকার করাটাই ভালো,' অ্যালবার্টো জবাব দিলেন।

'ঠিক। অনন্তে স্বাগত জানাই তাহলে তোমাদের , বাছারা।'

'কিন্তু আপনার পরিচয়?'

'আমি গ্রিম ভাইদের একটা রূপকথা থেকে বেরিয়ে আসা একজন। সে প্রায় দুশো বছর আগের কথা। তা, তোমরা কোত্থেকে আসছ?'

'দর্শনের ওপর লেখা একটা বই থেকে। আমি হচ্ছি দর্শনের শিক্ষক আর এ আমার ছাত্রী সোফি?'

'হি, হি ! এটা তো দেখছি একটা নতুন বই।'

বৃক্ষরাজির ভেতর দিয়ে হেঁটে ছোট্ট একটা ফাঁকা জায়গায় এসে পড়লেন তাঁরা। বেশ কিছু চমৎকার দেখতে বাদামি কটেজ রয়েছে সেখানে। কটেজগুলোর মাঝে একটা আঙিনায় বড় সড় একটা মিডসামার বনফায়ার জ্বলছে। সেই বনফায়ারটাকে ঘিরে নাচছে বহুবর্ণ কিছু চরিত্রের একটা দঙ্গল। তাদের অনেককেই চিনতে পারলো সোফি। স্নো হোয়াইট আর বামনদের কয়েকজন রয়েছে সেখানে, রয়েছে মেরি পপিনস আর শার্লক হোমস, পিটার প্যান আর পিপি লংস্টকিংস, লিটল রেড রাইডিংহুড আর সিন্ডেরেলা। এ-ছাড়াও, নামহীন কিছু পরিচিত চরিত্র-ও জড়ো হয়েছে বনফায়ারের চারপাশে-বেঁটে বামন ভূত-প্রেত, জ্বীন আর পরী, ডাইনি বুড়ি আর দৈত্য দানো। সত্যিকারের একটা জলজ্যান্ত ট্রল[৩১]-ও দেখতে পেল সোফি।

'কী ভীষণ শোরগোল !' বলে উঠলেন অ্যালবার্টো।

'তার কারণ এখন মিডসামার,' বৃদ্ধ মহিলা ব্যাখ্যা করলেন। 'ভালবর্গস ঈভের পর এতো বড়ো জমায়েত আর পাইনি আমরা। সেটি অবশ্য হয়েছিল আমরা জার্মানিতে থাকার সময়। অল্প ক'দিনের জন্য এখানে বেড়াতে এসেছি মাত্র। তা, কফি চাইছিলে না তুমি?'

'জ্বী। দয়া করে যদি...'

---

৩১. স্ক্যান্ডিনেভিয় রূপকথার এক বিশেষ ধরনের ভূত—অনুবাদক।

এতোক্ষণে সোফি খেয়াল করল যে সব ক'টা দালান জিঞ্জারব্রেড আর চিনি-বরফের আস্তর দিয়ে তৈরি। চরিত্রগুলোর অনেকেই একেবারে সরাসরি বাড়িগুলোর সামনের অংশটায় কামড় বসিয়ে দিয়েছে। একজন রুটিঅলা ঘুরে ঘুরে ক্ষতিগ্রস্ত অংশগুলো সঙ্গে সঙ্গে সারিয়ে দিচ্ছে। এক কোনায় ছোট্ট একটা কামড় বসালো সোফি। এর আগে এতো মিষ্টি আর এতো ভালো কোনো জিনিস সে খায়নি বলে মনে হলো তার।

একটু পরেই এক কাপ কফি নিয়ে হাজির হলেন বৃদ্ধা।

'সত্যিই অনেক ধন্যবাদ আপনাকে।'

'তা অতিথিরা এই কফির দাম দিচ্ছো কীভাবে?'

'দাম দেবো?'

'আমরা সাধারণত কোনো গল্প বলে দাম চুকোই। কফির জন্য একটা ওল্ড ওয়াইভ'স টেল হলেই চলবে।'

'আমরা মানবতার গোটা অবিশ্বাস্য কাহিনীটাই বলতে পারতাম,' অ্যালবার্টো বললেন, 'কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে একটু তাড়া আছে আমাদের। ফিরে এসে অন্য একদিন দামটা দিই?'

'অবশ্যই। তা, তোমাদের তাড়াটা কীসের?'

অ্যালবার্টো তাঁদের যাত্রার উদ্দেশ্য বর্ণনা করলেন, তাই শুনে বৃদ্ধা মহিলা মন্তব্য করলেন: 'তাহলে তো বলতেই হচ্ছে যে তোমরা নেহাতই অর্বাচনীয় এখনো, কাজেই, তোমরা বরং তাড়াতাড়ি করো, তোমাদের মানব জন্মদাতার সঙ্গে যে নাড়ির বাঁধনে তোমরা বাঁধা আছো সেটি ছিঁড়ে ফেলো। ওদের জগতের আর দরকার নেই আমাদের। আমাদের বাস অদৃশ্য মানুষের জগতে।'

তাড়াতাড়ি করে সিন্ডেরেলা ক্যাফেটেরিয়া এবং লাল কনভার্টিবলের কাছে ফিরে এলেন অ্যালবার্টো আর সোফি। গাড়িটার একেবারে পাশেই ব্যস্ত এক মা তার ছোট্ট ছেলেটাকে হিসি করতে সাহায্য করছেন।

তীরবেগে ছুটে আর শর্ট কাট পথ ধরে শিগ্‌গিরই লিলেস্যান্ডে পৌঁছে গেলেন তাঁরা।

কোপেনহেগেন থেকে আসা এসকে ৮৭৬ যথাসময়ে রাত ৯টা ৩৫-এ কিয়েভিক বিমানবন্দরে অবতরণ করল। প্লেনটা যখন কোপেনহেগেনে রানওয়েতে নিয়ে আসা হয়েছিল তখন চেক-ইন ডেস্ক থেকে ঝুলতে থাকা খামটা খুলেছিলেন মেজর। ভেতরের চিরকুটটায় লেখা ছিল

> প্রতি, মেজর ন্যাগ, যখন তিনি ১৯৯০ সালের মিডসামার ঈভ্‌-এ কাসট্রাপ বিমানবন্দরে তাঁর বোর্ডিং পাস হস্তান্তর করছেন। প্রিয় বাবা, তুমি হয়ত ভেবেছিলে আমি কোপেনহেগেনে উদয় হবো। কিন্তু তোমার চলাফেরার ওপর আমার নিয়ন্ত্রণটা তার থেকেও আরও অনেক বেশি উদ্ভাবনী ক্ষমতাসম্পন্ন। বাবা, তুমি যেখানেই গিয়েছো আমি তোমাকে দেখতে পেয়েছি। আসল কথাটা হচ্ছে, খুবই বিখ্যাত একটা জিপসি পরিবারে বেড়াতে গিয়েছিলাম আমি যে-পরিবারটি অনেক অনেক দিন আগে দাদী-র

মায়ের কাছে জাদুঘর একটা পেতলের আয়না বিক্রি করেছিল। একটা ক্রিস্টাল বল-ও জোগাড় করেছি আমি। ঠিক এই মুহূর্তে আমি দেখতে পাচ্ছি তুমি এই মাত্র তোমার সীটে বসলে। সিট বেল্ট বাঁধার আর 'সিট বেল্ট বাঁধুন' লেখা সাইন নিভে যাওয়ার আগ পর্যন্ত তোমার আসনের পেছনটা উঁচু করে রাখার কথাটা ভুলো না যেন। প্লেনটা শূন্যে উড়াল দেয়ার পর আসনের পেছনটা নিচু করে দিয়ে তুমি বিশ্রাম নিতে পারো, সেটি রীতিমতো পাওনা হয়েছে তোমার। বাড়ি পৌঁছেও বিশ্রাম নেয়া দরকার হবে তোমার। লিলেস্যান্ডের আবহাওয়া একদম নিখুঁত এখন, তবে তাপমাত্রাটা লেবাননের চেয়ে কয়েক ডিগ্রি কম। তোমার নিজের দস্যি মেয়ে, আয়নার রানী আর আয়রনির সবচেয়ে বড় হেফাজতকারী।

অ্যালবার্টো ঠিক বুঝতে পারলেন না তিনি কি ক্রুদ্ধ নাকি স্রেফ ক্লান্ত এবং পরাস্ত। তারপরেই হাসতে শুরু করলেন তিনি। এতো জোরে জোরে হাসতে লাগলেন তিনি যে তার সহযাত্রীরা ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়ে রইলো তাঁর দিকে। এরপরেই উড়াল দিল প্লেনটা।

ঢিল মেরে এখন পাটকেল খেয়েছেন তিনি। অবশ্য বিশেষ একটা তফাৎ আছে। তার ঢিলটা লেগেছিল প্রথম এবং প্রধানত সোফি আর অ্যালবার্টোর গায়ে। আর তারা তো—ইয়ে, তারা তো নেহাতই কাল্পনিক মানুষ।

হিল্ডার পরামর্শমতো কাজ করলেন তিনি। আসনের পেছনটা নিচু করে দিয়ে চোখ বন্ধ করলেন। পাসপোর্ট কন্ট্রোল পার হয়ে কিয়েভিক বিমানবন্দরের অ্যারাইভাল হল-এ দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করার আগে পর্যন্ত পুরোপুরি সজাগ হলেন না তিনি। সেখানে একটা মিছিল তাঁকে স্বাগত জানানোর জন্য অপেক্ষা করছিল।

প্রায় হিল্ডার বয়সী আট থেকে দশজন কিশোর-কিশোরী। তারা সবাই 'বাড়িতে তোমাকে স্বাগত জানাই, বাবা'—'হিল্ডা বাগানে অপেক্ষা করছে'—'আয়রনি বহাল তবিয়তে টিকে আছে' লেখা সাইন উঁচু করে ধরে আছে।

সবচেয়ে বাজে ব্যাপার হলো হুট করে একটা ট্যাক্সিতে চড়ে বসতে পারছেন না তিনি, তাঁর ব্যাগেজের জন্য অপেক্ষা করতে হচ্ছে তাঁকে। এই অবসরে হিল্ডার ক্লাসমেটরা তাকে ঘিরে ধরেছে, তাঁকে বাধ্য করছে সাইনগুলো বারবার পড়ার জন্য। একসময় মেয়েদের মধ্যে একজন এসে তাঁকে এক তোড়া গোলাপ দিতে তিনি একেবারে গলে গেলেন। তিনি তাঁর শপিং ব্যাগগুলোর একটার মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে মিছিলকারী প্রত্যেককে একটা করে মার্জিপান বার উপহার দিলেন। হিল্ডার জন্য আর মাত্র দুটো বাকি থাকল। তিনি যখন তাঁর ব্যাগেজ ফিরে পেলেন এক তরুণ সামনে এগিয়ে এসে জানাল সে আয়নার রানীর আজ্ঞাবহ, তাকে বলা আছে সে যেন মেজরকে গাড়ি চালিয়ে বিয়ার্কলেতে নিয়ে যায়। অন্য মিছিলকারীরা ছত্রভঙ্গ হয়ে মিশে গেল ভিড়ের মধ্যে।

ই-১৮তে বেরিয়ে এলেন তারা। যে-সব সেতু আর টানেল ওঁরা পার হলেন সেগুলোর প্রতিটি 'বাড়িতে স্বাগতম!' 'টার্কি প্রস্তুত!' 'আমি তোমাকে দেখতে পাচ্ছি,

বাবা' এ-সব লেখা ব্যাপারে যোড়া।

বিয়ার্কলের গেটের বাইরে তাঁকে যখন নামিয়ে নেয়া হলো স্বস্তির একটা নিঃশ্বাস ফেললেন অ্যালবার্টো ন্যাগ, তার ড্রাইভারকে ধন্যবাদসহ একশো ক্রাউনের একটা নোট আর কার্লসবার্গ এলিফ্যান্ট বিয়ারের তিনটে ক্যান দিলেন।

বাড়ির বাইরে তাঁর স্ত্রী অপেক্ষা করছিলেন তাঁর জন্য। একটা দীর্ঘ আলিঙ্গনের পর তিনি শুধোলেন : 'ও কোথায়?'

'ডকে বসে আছে, অ্যালবার্টো।'

হোটেল নর্গে-র বাইরে লিলেস্যান্ডের স্কোয়ারে লাল কনভার্টিবলটা থামালেন অ্যালবার্টো আর সোফি। সোয়া দশটা বাজে। বাহিরে আর্কিপেলাগোতে বড় সড় একটা বনফায়ার দেখতে পেলেন তাঁরা।

'বিয়ার্কলে কী করে খুঁজে পাবো আমরা?' জিজ্ঞেস করল সোফি।

'রীতিমতো খুঁজে পেতে বের করতে হবে ওটাকে। মেজরের কেবিনের সেই পেইন্টিংটার কথা মনে আছে নিশ্চয়ই তোমার।'

'তাড়াতাড়ি করতে হবে আমাদের। সে পৌঁছানোর আগেই ওখানে যেতে চাই আমি।'

মেইন রোডগুলো ধরে, তারপর পাহাড়ি ঢিবি আর ঢালগুলোর ওপর দিয়ে চলতে লাগল ওদের গাড়ি। একটা দরকারি সূত্র হচ্ছে বিয়ার্কলের পাশে পানি রয়েছে।

আচমকা চেঁচিয়ে উঠল সোফি। 'ওই যে বাড়িটা! পেয়ে গেছি আমরা।'

'আমার বিশ্বাস ঠিকই বলেছ তুমি, কিন্তু এতো জোরে চেঁচিও না।'

'কেন? কেউ তো শুনতে পাচ্ছে না আমাদের কথা।'

'মাউ ডিয়ার সোফি, দর্শনের একটা গোটা কোর্সের পরে এখনো তুমি হুট করে সিদ্ধান্তে পৌঁছে যাচ্ছো দেখে খুবই হতাশ হলাম আমি।'

'ঠিকই বলছেন, কিন্তু...'

'নিশ্চয়ই তুমি এ-কথা বিশ্বাস করো না যে জায়গাটায় ট্রল, পিক্সি, বনপরী বা ভালো পরীরা একেবারেই নেই?'

'বুঝেছি, আমাকে মাফ করবেন।'

গেটের ভেতর দিয়ে ঢুকে নুড়ি বিছানো পথ ধরে বাড়িটার কাছে চলে এলো তারা। লনে, গ্লাইডারের পাশে গাড়িটা পার্ক করলেন অ্যালবার্টো। বাগানেই খানিকটা দূরে একটা টেবিলে তিন জনের বসার ব্যবস্থা করা আছে।

'দেখতে পাচ্ছি আমি ওকে,' ফিসফিসিয়ে বলল সোফি। 'ডকের ওপর বসে আছে হিল্ডা, ঠিক যেমন স্বপ্নে দেখেছিলাম।'

'বাগানটা যে দেখতে কতটা ক্লোভার ক্লোজে তোমার নিজের বাগানটার মতো, সেটি খেয়াল করেছো?'

'করেছি, মিল আছে। গ্লাইডার-টাইডার আর সবকিছুই এক। আমি একটু ওর কাছে যাই?'

'কেন নয়? আমি এখানে আছি।'

ছুটে ডকে নেমে গেল সোফি। আরেকটু হলেই হোঁচট খেয়ে হিল্ডার গায়ের ওপর পড়ত সে। যাই হোক, শেষে ভদ্রভাবে তার পাশে গিয়ে বসল সে।

যে-লাইনটার সাহায্যে রো-বোটটার গতিবৃদ্ধি করা হয় সেটি নিয়ে আনমনে খেলা করছে হিল্ডা। তাঁর বাম হাতে এক টুকরো কাগজ। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে সে অপেক্ষা করছে। বেশ কয়েকবার সে তার ঘড়ির দিকে তাকাল।

সোফির মনে হলো হিল্ডা বেশ সুন্দরী। উজ্জ্বলবর্ণ, কোঁকড়া তার চুল, চোখদুটো সবুজ। হলুদ একটা গ্রীষ্মকালীন পোশাক তার পরনে। জোয়ানার সঙ্গে বেশ মিল আছে তার।

কাজ হবে না জেনেও তার সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করল সোফি।

'হিল্ডা, আমি সোফি!'

শুনতে পেয়েছে সে-রকম কোনো লক্ষণ নেই হিল্ডার মধ্যে।

সোফি হিল্ডার হাঁটুর ওপর চড়ে তার কানের কাছে চিৎকার করার চেষ্টা করল।

'তুমি শুনতে পাচ্ছো আমার কথা, হিল্ডা? নাকি তুমি কানে শোনো না, চোখেও দেখো না?'

হিল্ডার চোখটা আগের চেয়ে খানিকটা বেশি প্রসারিত হলো কি? কিছু একটা সে শুনতে পেয়েছে—তা সে যতই আবছাভাবে হোক না কেন—সে-রকম একটা হালকা ভাব ফুটে উঠল যেন তার মধ্যে?

ঘুরে তাকাল সে চারদিকে। তারপর ঝট করে মাথা ঘুরিয়ে সরাসরি সোফির চোখের দিকে তাকাল। ঠিক ভালো করে তাকাল না সে তার দিকে। তার দৃষ্টি যেন সোফির দৃষ্টি ভেদ করে গেল একেবারে।

'এতো জোরে না, সোফি।' ওপরে গাড়ির ভেতর থেকে বলে উঠলেন অ্যালবার্টো। 'বাগানটা মারমেইডে ভরে উঠুক তা চাই না।'

স্থির হয়ে বসে আছে এখন সোফি। স্রেফ হিল্ডার কাছাকাছি থাকতে পেরেই ভালো লাগছে তার। এমন সময় একজন পুরুষের গম্ভীর কণ্ঠ শুনতে পেলো সে 'হিল্ডা।'

সেই মেজর, পরনে ইউনিফর্ম, মাথায় নীল বেরে টুপি। বাগানের একেবারে ওপরের অংশে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি।

লাফ দিয়ে উঠে ছুটে গেল হিল্ডা তাঁর কাছে। গ্লাইডার আর লাল কনভার্টিবলের মাঝামাঝি জায়গায় মিলিত হলো দু'জন। মেজর তাকে শূন্যে তুলে ঘোরাতে লাগলেন নিজের চারদিকে।

* * *

ডকে বসে বাবার জন্য অপেক্ষা করছে হিল্ডা। কাস্ট্রাপে তিনি নামার পর প্রতি পনেরো মিনিট অন্তর তাঁর কথা মনে করেছে সে, কল্পনা করার চেষ্টা করেছে এই মুহূর্তে তিনি কোথায়, ব্যাপারটাকে তিনি কীভাবে নিচ্ছেন। বাবার কথা মনে করার প্রতিটি সময় টুকে নিয়েছে সে এক টুকরো কাগজে, নিজের সঙ্গেই রেখেছে সেটি সারাটা দিন।

আচ্ছা, বাবা যদি এ-সব দেখেশুনে রেগে যান? কিন্তু তিনি নিশ্চয়ই এটা আশা করতে পারেন না যে তিনি হিল্ডার জন্য একটা রহস্যোপন্যাস লিখবেন অথচ তারপরও সবকিছুই আগের মতো থেকে যাবে?

আবারও নিজের ঘড়ির দিকে তাকালো সে। সোয়া দশটা বাজে এখন, যে-কোনো সময়ে পৌঁছে যাবেন বাবা।

কিন্তু ওটা কী? তার মনে হলো কোনো কিছুর হালকা একটা নিঃশ্বাসের শব্দ শুনলো সে, সোফিকে নিয়ে দেখা সেই স্বপ্নের মতো অবিকল।

দ্রুত চারদিকে তাকাল সে। সে নিশ্চিত, কিছু একটা আছে এখানে, কিন্তু কী?

হতে পারে নেহাতই গ্রীষ্মের রাত এটা।

কয়েক মুহূর্তের জন্য তার মনে হলো কী যেন শুনলো সে।

'হিল্ডা!'

এবার অন্যদিকে ঘুরল সে। বাবা! বাগানের একেবারে ওপরের অংশে দাঁড়িয়ে তিনি।

লাফ দিয়ে উঠে ছুটে গেল সে তাঁর দিকে। গ্লাইডারের কাছে মিলিত হলো দু'জন। তিনি শূন্যে তুলে নিলেন তাকে, তারপর তাকে ঘোরাতে লাগলেন নিজের চারপাশে।

কাঁদছে হিল্ডা, তার বাবাকেও চেপে রাখতে হলো অশ্রু।

'তুই তো দেখছি রীতিমতো বড়ো হয়ে গেছিস, হিল্ডা!'

'আর তুমি রাইটার হয়ে গেছো, রিয়েল রাইটার।'

চোখের জল মুছে নিল হিল্ডা।

'শোধবোধ, ঠিক আছে?' জিজ্ঞেস করল সে।

'ঠিক আছে, শোধবোধ।'

টেবিল সামনে নিয়ে বসলেন দু'জন। প্রথমেই, কাস্ট্রাপে আর বাড়ি ফেরার পথে কী কী ঘটেছিল তার একটা পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা শোনাতে হলো হিল্ডাকে। দু'জনেই তখন হাসিতে ফেটে পড়লেন।

'ক্যাফেটেরিয়ার খামটা দেখোনি তুমি?'

'একটু বসে কিছু যে খাবো তার সময় ছিল না। দস্যি কোথাকার। এখন আমার রাক্ষসের মতো খিদে পেয়েছে।'

'বেচারা বাবা।'

'টার্কির কথাটা তাহলে পুরোটা গুল, তাই না?'

'অবশ্যই না। সব তৈরি করে রেখেছি আমি। পরিবেশনের দায়িত্বটা মা'র।'

দু'জনে এরপর রিং বাইন্ডারটাকে নিয়ে পড়ল। সোফি আর অ্যালবার্টোর গল্পটা এ-মাথা থেকে ও-মাথা পর্যন্ত শেষ করল, আগা থেকে গোড়া, গোড়া থেকে আগা পর্যন্ত।

মা টার্কি আর ওয়াল্ডর্ফ সালাদ, রোজ ওয়াইন আর হিল্ডার ঘরে-তৈরি রুটি নিয়ে এলেন।

হিল্ডার বাবা প্লেটো সম্পর্কে কী যেন বলছিলেন এমন সময় হঠাৎ তাঁকে বাধা দিল সে: 'শ্‌শ্‌শ!'

'কী ব্যাপার?'

'তুমি শুনতে পাওনি? চিঁ চিঁ একটা শব্দ হলো?'

'না তো।'

'আমি নিশ্চিত একটা শব্দ শুনেছি আমি। মনে হয় মেঠো ইঁদুর-টিঁদুর হবে।'

তার মা আরেক বোতল ওয়াইন আনতে গেলে তার বাবা বললেন, 'তবে দর্শন কোর্স কিন্তু শেষ হয়নি এখনো।'

'হয়নি বুঝি?'

'আজ রাতে আমি মহাবিশ্ব সম্পর্কে কিছু কথা বলব তোকে।'

সবাই খাওয়া শুরু করার আগে তিনি তাঁর স্ত্রীকে বললেন,'হিল্ডার এখন আর আমার হাঁটুর ওপর বসার বয়স নেই। কিন্তু তোমার আছে।'

এই বলে কোমরের কাছে ধরে মারিটকে তিনি তাঁর কোলের ওপর বসিয়ে নিলেন। কিছু মুখে দেয়ার অবসরই পেলেন না হিল্ডার মা বেশ কিছুক্ষণ।

'ভাবো দেখি, কিছু দিন পরেই চল্লিশে পড়বে তোমরা...'

লাফ দিয়ে উঠে হিল্ডা যখন তার বাবার কাছে ছুট দিল, সোফি অনুভব করল তার চোখ পানিতে ভরে উঠছে। কোনোদিনই হিল্ডার কাছে পৌঁছাতে পারবে না সে...

হিল্ডাকে রক্ত-মাংসের একজন সত্যিকার মানুষ হিসেবে তৈরি করা হয়েছে বলে তার ওপর ঈর্ষা হলো সোফির।

হিল্ডা আর মেজর টেবিলে বসতে অ্যালবার্টো গাড়ির হর্ন বাজালেন।

মুখ তুলে তাকাল সোফি। হিল্ডাও ঠিক তাই করল না?

দৌড়ে অ্যালবার্টোর কাছে এসে লাফ দিয়ে তার পাশের সিটটায় বসে পড়ল সে।

'খানিকক্ষণ বসে দেখবো আমরা কী ঘটে,' অ্যালবার্টো বললেন।

মাথা ঝাঁকাল সোফি।

'তুমি কাঁদছ?'

আবারও ওপর নিচ মাথা নাড়ল সোফি।

'কেন?'

'ওর কী ভাগ্য, সত্যিকারের একজন মানুষ ও। এখন ও বড় হবে, সত্যিকারের একজন নারী হবে। আমি ঠিক জানি, সত্যিকারের বাচ্চাকাচ্চাও হবে ওর...'

'নাতি-নাতনিও হবে, সোফি। তবে সব জিনিসেরই দুটো দিক আছে। আর ঠিক সেটিই তোমাকে শেখাতে চেয়েছিলাম আমি এই কোর্সটার গোড়ার দিকে।'

'কী বলতে চান?'

'হিল্ডা ভাগ্যবান, স্বীকার করছি। কিন্তু যে জীবনের স্বাদ পেয়েছে তাকে মৃত্যুরও স্বাদ পেতে হবে, কারণ মৃত্যুই জীবনের নিয়তি।'

'কিন্তু তারপরেও, সত্যিকার অর্থে কখনোই না বাঁচার চেয়ে একটা জীবন থাকা কি বেশি ভালো না?'

হিল্ডার মতো জীবনযাপন আমরা করতে পারবো না-অথবা, সেই অর্থে মেজরের মতো; অন্য দিকে, আমাদের মৃত্যু নেই। বনের মধ্যে সেই বৃদ্ধা মহিলা কী বলেছিলেন মনে নেই তোমার? আমরা হচ্ছি অদৃশ্য। তিনি বলেছিলেন তাঁর বয়স দুশো বছর। আর তাদের মিডসামার পার্টিতে আমি এমন কিছু প্রাণীকেও দেখেছি যাদের বয়স তিন

হাজার বছরেরও বেশি...'

'সম্ভবত হিল্ডার যে-ব্যাপারটা আমি সবচেয়ে হিংসা করি তা হচ্ছে...ওর পারিবারিক জীবনটা।'

'কিন্তু তোমার নিজেরও তো একটা পরিবার আছে। তাছাড়াও একটা বিড়াল আছে, দুটো পাখি আছে, আছে একটা কচ্ছপ।'

'কিন্তু সেসব তো আমরা পেছনে ফেলে এসেছি, তাই না?'

'মোটেই না। মেজরই কেবল পেছনে ফেলে এসেছে সেটিকে। সে তার বইয়ের শেষ শব্দটা লিখে ফেলেছে, মাই ডিয়ার। সে আর কক্ষণো খুঁজে পাবে না আমাদের।'

'তার মানে কি এই যে আমরা ফিরে যেতে পারবো?'

'সে আমাদের যখন ইচ্ছে তখনই। কিন্তু বনের ভেতর সিন্ডেরেলা ক্যাফেটেরিয়ার পেছনে আমরা নতুন বন্ধুও পাবো অনেক।'

ন্যাগ পরিবার তাদের ভোজন পর্ব শুরু করেছে। মুহূর্তের জন্য সোফি এই ভেবে ভয় পেল যে ক্লোভার গার্ডেন পার্টির মতো করে না শেষ হয় খাওয়া দাওয়ার পার্টটা। একটা সময় মনে হলো মেজর বুঝি মারিটকে টেবিলের ওপর শুইয়ে দিতে চাইলেন। কিন্তু না, তার বদলে তিনি তাঁকে নিজের হাঁটুর ওপর টেনে নিলেন।

পরিবারটা যেখানে বসে খাচ্ছে সেখান থেকে বেশ খানিকটা দূরে পার্ক করা হয়েছে গাড়িটা। মাঝে মধ্যে শোনা যাচ্ছে তাদের কথাবার্তা। সোফি আর অ্যালবার্টো বাগানের দিকে তাকিয়ে রইলেন। গার্ডেন পার্টির সব খুঁটিনাটি আর দুঃখজনক পরিসমাপ্তিটা নিয়ে চিন্তা করার যথেষ্ট সময় আছে তাঁদের হাতে।

পরিবারটা টেবিল ছাড়তে ছাড়তে মাঝরাত হয়ে গেল প্রায়। হিল্ডা আর মেজর হালকা পায়ে গ্লাইডারের দিকে এগোতে থাকল। সাদা-রঙা বাড়িটার কাছে মারিট হেঁটে আসতে তারা হাত নাড়ল তার উদ্দেশে।

'মা, তুমি বরং শুয়ে পড়ো। আমাদের এখনো অনেক কথা বাকি।'

বিগ ব্যাং

...আমরাও নক্ষত্রচূর্ণ...

গ্লাইডারে বাবার পাশে আরাম করে বসল হিল্ডা। প্রায় মাঝরাত এখন। উপসাগরটার দিকে তাকিয়ে আছে দু'জনে। দুয়েকটা তারা হালকাভাবে মিটমিট করছে উজ্জ্বল আকাশে। ডকের নিচে শান্ত ঢেউগুলো এসে পড়ছে পাথরের ওপর।

হিল্ডার বাবাই নীরবতা ভাঙলেন।

'এটা ভাবলে অদ্ভুত লাগে যে মহাবিশ্বের ক্ষুদে একটা গ্রহে বাস করি আমরা।'

'হ্যাঁ...'

'সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে চলা বেশক'টি গ্রহের একটি হচ্ছে এই পৃথিবী। সম্ভবত পৃথিবীই একমাত্র গ্রহ যেখানে প্রাণ আছে।'

'গোটা মহাবিশ্বেই সম্ভবত একমাত্র তাই না?'

'সেটি অসম্ভব নয়। কিন্তু এটাও সম্ভব যে মহাবিশ্ব প্রাণে পরিপূর্ণ। মহাবিশ্ব এতো বড় যে কল্পনাও করা যায় না। একটি বস্তু থেকে আরেকটি বস্তু এতো দূরে যে আলোক-মিনিট আর আলোক-বর্ষ দিয়ে মাপা হয় এই দূরত্ব।'

আলোক-মিনিট আর আলোক-বর্ষ আসলে কী?

'এক মিনিটে আলো যতটুকু দূরত্ব অতিক্রম করে সেটিই আলোক-মিনিট। এবং সেটি কিন্তু নেহাত কম নয়, তার কারণ শূন্যের ভেতর দিয়ে আলো সেকেন্ডে ৩০০,০০০ কিলোমিটার গতিতে ছোটে। তার মানে, এক আলোক-মিনিট হলো ৩০০,০০০-র ৬০ গুণ অর্থাৎ ১ কোটি ৮০ লাখ কিলোমিটার। এক আলোক-বর্ষ হলো প্রায় ১০,০০০ কোটি কিলোমিটার।'

'সূর্য কত দূরে?'

'আট আলোক-মিনিটের চেয়ে সামান্য বেশি দূরে। জুন মাসের গরম কোনো দিনে যে-সূর্যরশ্মি এসে আমাদের মুখটিকে উত্তপ্ত করে তোলে তা মহাশূন্যের ভেতর দিয়ে আট মিনিট ধরে ছোটার পর তবেই আমাদের কাছে পৌঁছায়।'

'আমাদের সৌর জগতের সবচেয়ে দূরের গ্রহ প্লুটো রয়েছে আমাদের কাছ থেকে প্রায় পাঁচ আলোক-ঘণ্টা দূরে। একজন জ্যোতির্বিদ যখন তার দূরবীণের ভেতর দিয়ে প্লুটোর দিকে তাকান তখন কিন্তু তিনি আসলে সময়ের দিক থেকে পাঁচ ঘণ্টা পেছনে তাকান। আমরা এভাবেও বলতে পারি যে প্লুটোর ছবি এখানে আসতে পাঁচ ঘণ্টা সময়

লাগে।'

'ব্যাপারটা ভিজ্যুয়ালাইজ করা কঠিন, তবে মনে হয় আমি বুঝতে পারছি।'

'তা বেশ। তবে কথা কী জানিস, আমরা এই পৃথিবীর বাসিন্দারা কিন্তু আমাদের পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে সবে মাত্র পরিচিত হতে শুরু করেছি। আমাদের সূর্যটা ছায়াপথ (Milky Way) নামে পরিচিত গ্যালাক্সির ৪০০ বিলিয়ন তারার একটা। এই গ্যালাক্সিটা দেখতে একটা বিশাল চাকতির মতো আর আমাদের সূর্যটা রয়েছে সেটির ইস্ক্রুপের মতো পেঁচালো বেশকিছু বাহুর একটিতে। পরিষ্কার শীতের রাতে আকাশের দিকে তাকালে তারার একটা চওড়া ফিতা দেখতে পাই আমরা। তার কারণ তখন আমরা আসলে গ্যালাক্সিটার কেন্দ্রের দিকে তাকাই।'

'আমার মনে হয় সেজন্যই সুইডিশ ভাষায় ছায়াপথটাকে 'শীতের সড়ক' বলে।'

'ছায়াপথে যে-তারাটা আমাদের সবচেয়ে কাছের পড়শী সেটি রয়েছে চার আলোক-বর্ষ দূরে। হয়ত দূরের ওই দ্বীপটা থেকেও ব্যাপারটা এ-রকম। কল্পনা কর যে ঠিক এই মুহূর্তে এক নক্ষত্র পর্যবেক্ষক বিয়ার্কলের দিকে তাক করা একটা শক্তিশালী দূরবীণ চোখে লাগিয়ে বসে আছে-তো, সেই লোকটি ঠিক চার বছর আগের বিয়ার্কলে-কে দেখতে পাবে। হয়ত যে দেখবে এগারো বছর বয়সী একটি মেয়ে গ্লাইডারে বসে পা দোলাচ্ছে।'

'অবিশ্বাস্য।'

'অথচ এটা কিন্তু বললাম সবচেয়ে কাছের তারাটার কথা। পুরো গ্যালাক্সিটা-সেটিকে নীহারিকা-ও (nebula) বলে-৯০,০০০ আলোক-বর্ষ চওড়া। অন্যভাবে বললে, গ্যালাক্সির এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে আলো ছুটে যেতে ৯০,০০০ বছর লাগে। ছায়াপথের যে-তারাটা আমাদের সূর্য থেকে ৫০,০০০ আলোক-বর্ষ দূরে সেটির দিকে যখন আমরা তাকাই তখন আমরা আসলে ৫০,০০০ বছর পেছন দিকে তাকাই।'

'আমার ছোট্ট মাথার পক্ষে আইডিয়াটা বড্ড ভারি।'

'তো, মহাশূন্যের দিকে তাকানোর একটাই অর্থ আর তা হলো সময়ের দিকে পেছন ফিরে তাকানো। মহাবিশ্বটা ঠিক এই মুহূর্তে কীরকম সেটি আমরা কখনোই জানতে পারি না। আমরা কেবল জানতে পারি তখন সেটি কেমন ছিল। হাজার হাজার আলোক-বর্ষ দূরের তারার দিকে যখন আমরা মুখ তুলে তাকাই তখন আসলে আমরা মহাশূন্যের ইতিহাসে হাজার হাজার বছর পেছনে চলে যাই।'

'রীতিমতো ধারণার অতীত একটা ব্যাপার এটা।'

'তবে আমরা যা দেখি তার সবই আলোক তরঙ্গ হিসেবে চোখের সঙ্গে মিলিত হয়। আর এই আলোক তরঙ্গগুলো মহাশূন্যের ভেতর দিয়ে ছোটার সময় কিছু সময় নেয়। বজ্রকে দিয়ে একটা তুলনা দেখাতে পারি আমরা এটার সঙ্গে। বাজ পড়ার আওয়াজ শোনার আগেই বিজলীর চমক নজরে পড়ে আমাদের। তার কারণ, শব্দতরঙ্গের গতি আলোক তরঙ্গের গতির চেয়ে কম। যখন আমি বজ্রের আওয়াজ শুনি তখন আমি এমন একটা জিনিসের আওয়াজ শুনি যেটা খানিকক্ষণ আগে ঘটে গেছে। তারার বেলাতেও ব্যাপারটা একই। যখন আমি হাজার হাজার আলোক-বর্ষ দূরের কোনো তারার দিকে তাকাই তখন আমি এমন একটা ঘটনার 'গুরু গুরু' মেঘের গর্জন

'দেখতে' পাই যেটা ঘটেছিল সময়ের হিসেবে হাজার হাজার বছর আগে।'

'হ্যাঁ, বুঝতে পারছি।'

'কিন্তু এতোক্ষণ আমরা কেবল আমাদের নিজেদের গ্যালাক্সি নিয়েই কথা বলেছি। জ্যোতির্বিদরা বলেন মহাবিশ্বে এ-ধরনের প্রায় একশো বিলিয়ন গ্যালাক্সি রয়েছে আর এ-সব গ্যালাক্সির প্রতিটিতে রয়েছে প্রায় একশো বিলিয়ন তারা। ছায়াপথের সবচেয়ে কাছের গ্যালাক্সিকে আমরা বলি অ্যান্ড্রোমিডা নেবুলা। আমাদের গ্যালাক্সি থেকে ওটা ২০ লাখ আলোকবর্ষ দূরে রয়েছে। তার মানে, সেই গ্যালাক্সি থেকে আমাদের কাছে আলো এসে পৌঁছাতে বিশ লাখ বছর লাগে। কাজেই, আকাশের অনেক উঁচুতে যখন আমরা অ্যান্ড্রোমিডা গ্যালাক্সিটাকে দেখি তখন আমরা ২০ লাখ বছর পেছনের দিকে তাকিয়ে থাকি। এই নীহারিকায় যদি কোনো চতুর নক্ষত্র পর্যবেক্ষক থেকে থাকে-আমি এমনকি কল্পনাও করতে পারি যে ঠিক এই মুহূর্তে সে পৃথিবীর দিকে তার দুরবিন তাক করে বসে আছে—তাহলে কিন্তু সে আমাদের দেখতে পাবে না। বরাত ভালো হলে সে দেখবে চ্যাপ্টা মুখো নিয়ান্ডারথালদের।'

'আশ্চর্য ব্যাপার তো।'

'সবচেয়ে দূরের যে-সব গ্যালাক্সির কথা বর্তমানে আমাদের জানা আছে সেগুলো রয়েছে দশ *বিলিয়ন* আলোক-বর্ষ দূরে। এ-সব গ্যালাক্সি থেকে যখন আমরা সংকেত পাই তখন আমরা আসলে মহাবিশ্বের ইতিহাসে দশ বিলিয়ন বছর পিছিয়ে যাই। আমাদের নিজেদের সৌর জগতের যা বয়স, এইসময়টা তার প্রায় দ্বিগুণ।'

'তোমার কথা শুনে মাথা ঝিম ঝিম করছে আমার।'

'সময়ের দিক থেকে এতো পেছনের দিকে তাকানোর ব্যাপারটা হৃদয়ঙ্গম করা যদিও যথেষ্ট কঠিন, তারপরেও জ্যোতির্বিদরা কিন্তু আমাদের বিশ্বচিত্রের জন্য আরও অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আবিষ্কার করেছেন।'

'কী সেটি?'

'দৃশ্যত কোনো গ্যালাক্সি-ই কিন্তু সেটি যেখানে রয়েছে সেখানে থাকে না। মহাবিশ্বের সমস্ত গ্যালাক্সি প্রচণ্ড গতিতে পরস্পরের কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। আমাদের কাছ থেকে সেগুলো যত দূরে ততোই দ্রুত সরে যাচ্ছে সেগুলো। তার মানে হচ্ছে গ্যালাক্সিগুলোর মধ্যকার দূরত্ব সারাক্ষণ-ই বেড়ে চলেছে।'

'ব্যাপারটা কল্পনা করার চেষ্টা করছি।'

'একটা বেলুনের গায়ে তুই যদি কিছু কালো চিহ্ন এঁকে দিস তাহলে বেলুনটা ফোলানোর সময় চিহ্নগুলো একে অপরের কাছ থেকে দূরে সরে যাবে। মহাবিশ্বের গ্যালাক্সিগুলোর ক্ষেত্রেও ঠিক একই ব্যাপার ঘটছে। আমরা বলি, মহাবিশ্ব প্রসারিত হচ্ছে।'

'তার কারণ কী?'

'বেশিরভাগ জ্যোতির্বিদই এ-ব্যাপারে একমত যে প্রসারণশীল মহাবিশ্বের মাত্র একটাই ব্যাখ্যা আছে; ১৫ বিলিয়ন বছর আগে একবার মহাবিশ্বের সমস্ত জিনিস তুলনামূলকভাবে ছোট্ট একটা জায়গাতে জড়ো হয়েছিল। সেটির ঘনত্ব এতোই বেশি ছিল যে মহাকর্ষের কারণে তা ভয়ঙ্কর উত্তপ্ত হয়ে উঠে। শেষ পর্যন্ত তা এতোই গরম

আর এতো ঘনসন্নিবদ্ধ হয়ে ওঠে যে সেটি বিস্ফোরিত হয়। এই বিস্ফোরণকে আমরা বলি 'বিগ ব্যাং' (Big Bang)।'

'কথাটা চিন্তা করতেই গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠছে আমার।'

'বিগ ব্যাং-এর কারণে মহাবিশ্বের সমস্ত বস্তু চারদিকে ছিটকে পড়ে এবং ধীরে ধীরে তা ঠাণ্ডা হলে সেগুলো থেকেই তৈরি হয় তারা, গ্যালাক্সি, চাঁদ আর গ্রহগুলো...'

'কিন্তু তুমি যে বলছিলে মহাবিশ্ব এখনো প্রসারিত হচ্ছে?'

'হ্যাঁ বলেছি আর বিলিয়ন বিলিয়ন বছর আগের সেই বিস্ফোরণটার কারণেই এটা প্রসারিত হচ্ছে। মহাবিশ্বের কোনো সময় নিরপেক্ষ ভূগোল নেই। মহাবিশ্ব একটা ঘটনা। মহাবিশ্ব একটা বিস্ফোরণ। গ্যালাক্সিগুলো মহাবিশ্বের ভেতর দিয়ে প্রবল গতিতে পরস্পরের কাছ থেকে দূরে ছুটে যাচ্ছে।'

'কাজটা কি ওগুলো অন্তহীনভাবেই করে যাবে?'

'সে-রকম একটা সম্ভাবনা রয়েছে। তবে আরেকটাও আছে। তোর হয়ত মনে আছে যে অ্যালবার্টো আর সোফি দুটো শক্তির কথা বলেছিল যে-শক্তির কারণে গ্রহগুলো সূর্যকে অনবরত প্রদক্ষিণ করে যায়।'

'সেই শক্তি দুটো হচ্ছে মহাকর্ষ আর জড়তা, তাই না?'

'ঠিক এবং একই ব্যাপার গ্যালাক্সিগুলোর বেলাতেও প্রযোজ্য। কারণ মহাবিশ্ব প্রতিনিয়ত প্রসারিত হয়ে চলেছে ঠিকই, কিন্তু মহাকর্ষ বলও কাজ করছে অন্য দিকে। এবং কয়েক বিলিয়ন বছর পর একদিন সেই বিশাল বিস্ফোরণের শক্তিটা দুর্বল হয়ে পড়তে শুরু করলে মহাকর্ষ সম্ভবত গ্রহ নক্ষত্রগুলোকে আবার একসঙ্গে বেঁধে ফেলবে। তখন আমরা পাবো একটা উল্টো বিস্ফোরণ, একটা তথাকথিত সঙ্কোচন। কিন্তু মহাজাগতিক বস্তুগুলোর মধ্যে দূরত্ব এতোই বেশি যে ব্যাপারটা ঘটবে স্লো মোশনে চালানো একটা চলচ্চিত্রের মতো। একটা বেলুন থেকে বাতাস ছেড়ে দিলে যা ঘটে তার সঙ্গে হয়ত ব্যাপারটাকে তুলনা করতে পারিস তুই।'

'সবগুলো গ্যালাক্সি কি আবার আঁটোসাঁটো একটা নিউক্লিয়াসের মধ্যে জড়ো হয়ে পড়বে?'

'হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছিস। কিন্তু তারপর কী হবে?'

'তারপর আরেকটা বিগ ব্যাং হবে আর 'মহাবিশ্বটা আবার প্রসারিত হতে শুরু করবে। কারণ একই প্রাকৃতিক নিয়মগুলোইতো বহাল রয়েছে। তো, এরপর আবার নতুন নতুন তারা আর গ্যালাক্সির জন্ম হবে।'

'তোর চিন্তাশক্তির প্রশংসা করতে হয়। জ্যোতির্বিদরা মনে করেন মহাবিশ্বের ভবিষ্যতের সম্ভাব্য দুটো চিত্র রয়েছে। হয় মহাবিশ্ব অন্তহীনভাবে প্রসারিত হতে থাকবে আর তাতে করে গ্যালাক্সিগুলো দূর থেকে দূরে সরে যেতে থাকবে, নয়ত মহাবিশ্ব আবার সংকুচিত হতে শুরু করবে। মহাবিশ্ব কত ভারি আর বিশাল সেটির ওপরই নির্ভর করবে কী ঘটবে। আর ঠিক এই ব্যাপারটি জানারই কোনো উপায় খুঁজে পাননি এখন পর্যন্ত জ্যোতির্বিদরা।'

'কিন্তু মহাবিশ্ব *যদি* এতোই বড় হয়ে থাকে যে সেটি আবার সংকুচিত হতে শুরু করবে তাহলে হয়ত আগেও বহুবার এটার সম্প্রসারণ আর সংকোচন ঘটেছে।'

'সে-রকম সিদ্ধান্তে পৌঁছানোটাই সবচেয়ে স্বাভাবিক। কিন্তু এই বিষয়ে এসে তত্ত্বটা বিভক্ত হয়ে গেছে। এমনও হতে পারে যে মহাবিশ্বের প্রসারণটা এমন একটা ব্যাপার যা কেবল একবারই ঘটবে। কিন্তু সেটি যদি একেবার অন্তহীনভাবে প্রসারিত হতে থাকে তাহলে সবকিছু কোত্থেকে শুরু হয়েছিল সে-প্রশ্নটা আরও বড় হয়ে দেখা দেয়।'

'ঠিকই তো, কোত্থেকে এলো এটা, মানে সেই সমস্ত জিনিস যা হঠাৎ করে বিস্ফোরিত হলো?'

'একজন খ্রিস্টানের পক্ষে বিগ ব্যাং-কে সৃষ্টির আসল মুহূর্ত হিসেবে দেখাটাই স্বাভাবিক, বাইবেল আমাদের বলে যে ঈশ্বর বলেছিলেন 'লেট দেয়ার বি লাইট!' তোর হয়ত আরও মনে আছে যে অ্যালবার্টো খ্রিস্টধর্মের ইতিহাস সম্পর্কে আলোচনা করার সময় খ্রিস্টধর্মের 'একরৈখিক' দৃষ্টিভঙ্গির কথা বলেছিল। সৃষ্টির খ্রিস্টীয় বিশ্বাসের দৃষ্টিকোণ থেকে এটাই কল্পনা করে নেয়া ভালো যে মহাবিশ্ব কেবল প্রসারিত হয়েই চলেছে।'

'তাই?'

'প্রাচ্য ইতিহাসকে দেখে 'আবর্তনশীল' দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। অন্য কথায়, ইতিহাস অন্তহীনভাবে আবর্তিত হতে থাকে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ভারতে একটা প্রাচীন তত্ত্ব আছে যে জগৎ অনবরত কুণ্ডলী পাকাচ্ছে এবং আবার সেই জটমুক্ত হচ্ছে আর এভাবেই ভারতীয়দের ভাষায় ব্রাহ্মণের দিন আর ব্রাহ্মণের রাত্রি হচ্ছে পালাক্রমে। এ-কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে এই ধারণাটি সবচেয়ে ভালোভাবে খাপ খায় এক শাশ্বত আবর্তনশীল প্রক্রিয়ায় প্রসারিত ও সংকুচিত এবং আবার প্রসারিত হওয়া মহাবিশ্বের ধারণার সঙ্গেই। মনে মনে আমি একটা বিশাল মহাজাগতিক হৃৎপিণ্ডের কথা ভাবি যেটা স্পন্দিত হয়েই চলেছে, হয়েই চলেছে...'

'আমার মনে হয়, দুটো তত্ত্বই একই রকম অভাবনীয় আর একই রকম এক্সাইটিং।'

'এবং এদের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে শাশ্বত সম্পর্কে সেই বিশাল প্যারাডক্সের, যেটার কথা সোফি তার বাগানে বসে ভেবেছিল একবার মহাবিশ্ব হয় সব সময়ই ছিল আর নয়ত সেটি হঠাৎ করেই এসে হাজির হয়েছে শূন্য থেকে...'

'উহ্!'

নিজের কপালে একটা চাপড় বসালো হিল্ডা হাত দিয়ে।

'কী হলো?'

'মনে হলো, কোনো পোকা এইমাত্র কামড় দিলো।'

'সম্ভবত সক্রেটিস তোকে খোঁচা মেরে জীবন সম্পর্কে সচেতন করতে চাইছিলেন।'

লাল কনভার্টিবলে বসে সোফি আর অ্যালবার্টো মহাবিশ্ব সম্পর্কে হিল্ডাকে বলা মেজরের কথা শুনছিল।

খানিক পর অ্যালবার্টো জিজ্ঞেস করলেন, 'খেয়াল করেছো, আমাদের ভূমিকা পুরোপুরি উল্টে গেছে?'

'কোন অর্থে?'

'আগে ওরাই আমাদের কথা শুনেছে এবং আমরা ওদেরকে দেখতে পেতাম না। এখন আমরা ওদের কথা শুনছি, কিন্তু ওরা আমাদের দেখতে পাচ্ছে না।'

'শুধু তাই নয়।'

'কীসের কথা বলছো?'

'আমরা যখন শুরু করি তখন অন্য বাস্তবতা সম্পর্কে জানতাম না আমরা, জানতাম না যে হিল্ডা আর মেজরের অস্তিত্ব রয়েছে। এখন ওরা আমাদের বাস্তবতার কথা জানে না।'

'প্রতিশোধ বড় মধুর।'

'তবে মেজর আমাদের জগতে নাক গলাতে পারতো।'

'আমরাও যে ওদের জগতে নাক গলাবো সে-আশাটা এখনো ছাড়িনি আমি।'

'কিন্তু তুমি জানো সেটি অসম্ভব। সিন্ডেরেলায় কী হয়েছিল মনে নেই? সেই বোতলটা ছাড়াবার চেষ্টা করছিলে তুমি, দেখেছি আমি।'

সোফি কথা বলল না। মেজর বিগ ব্যাং-এর কথা বলছেন, সোফি বাগানের সেদিকটায় তাকিয়ে আছে। কথাটার মধ্যে এমন একটা কিছু আছে যা তার মনে একটা চিন্তার সূত্রপাত ঘটালো।

গাড়িটার ভেতর হাতড়ে কী যেন খুঁজতে লাগল সে।

'কী করছো?' অ্যালবার্টো শুধোলেন।

'কিছু না।'

গ্লাভ কম্পার্টমেন্ট খুলে একটা রেঞ্চ পেয়ে গেল সে। সেটি শক্ত করে ধরে লাফ দিয়ে বেরিয়ে এলো সে গাড়ির ভেতর থেকে। গ্লাইডারটার কাছে গিয়ে হাজির হলো সে, দাঁড়ালো গিয়ে একেবারে হিল্ডা আর তার বাবার সামনে। প্রথমে সে হিল্ডার দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করল, কিন্তু বৃথাই। শেষে সে রেঞ্চটা মাথার ওপর তুলে সাঁই করে নামিয়ে আনলো হিল্ডার কপাল বরাবর।

'উহ্!' আর্তনাদ করে উঠল হিল্ডা।

এরপর সোফি মেজরের কপালে আঘাত করল, কিন্তু তাঁর মধ্যে কোনো প্রতিক্রিয়াই দেখা গেল না।

'কী হলো?' তিনি জিজ্ঞেস করলেন।

'মনে হলো কোনো পোকা কামড় দিলো এইমাত্র।'

'সম্ভবত সক্রেটিস তোকে খোঁচা মেরে জীবন সম্পর্কে সচেতন করতে চাইছিলেন।'

ঘাসের ওপর শুয়ে পড়ল সোফি, ঠেলতে চেষ্টা করল গ্লাইডারটাকে। কিন্তু স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সেটি। নাকি এক মিলিমিটার খানেক নড়াতে পারল সে ওটাকে?

'হিম ঠাণ্ডা একটা বাতাস আসছে,' হিল্ডা বলল।

'না তো, বাতাসটা তো খুবই মোলায়েম।'

'না, শুধু তাই না। কিছু একটা আছে এর মধ্যে।'

'তা সেটি কী হতে পারে বলে মনে হয় তোর?'

'অ্যালবার্টো আর তার গোপন পরিকল্পনা মনে আছে তোমার?'

'কী করে ভুলি!'

'ওরা স্রেফ গায়েব হয়ে গিয়েছিল গার্ডেন পার্টি থেকে। যেন একেবারে বাতাসে

মিলিয়ে গিয়েছিল ওরা...'

'...একেবারে বাতাসে।'

'গল্পটাতো শেষ করতে হতো কোথাও। ওটা তো স্রেফ আমি যা লিখেছিলাম তাই।'

'তা ঠিক, হ্যাঁ, কিন্তু তার পরে যা ঘটেছিল তা নয়। ধরো যদি ওরা এখানে থেকে থাকে...'

'তুই কি সত্যিই তাই বিশ্বাস করিস?'

'আমি সেটি টের পাচ্ছি, বাবা।'

সোফি দৌড়ে ফিরে গেল গাড়িটার কাছে।

'ইম্প্রেসিভ,' রেঞ্চটা শক্ত করে আঁকড়ে ধরে গাড়িটায় সোফি উঠে বসতে অসন্তুষ্টির সুরে অ্যালবার্টো বললেন। 'অসাধারণ প্রতিভাধর তুমি, সোফি। স্রেফ বসে বসে দেখো, কী হয়।'

মেজর হিল্ডাকে আলিঙ্গন করলেন।

'ঢেউয়ের রহস্যময় খেলাটা শুনতে পাচ্ছো তুমি?'

'হ্যাঁ। কাল কিন্তু নৌকোটা পানিতে নামাতেই হবে।'

'কিন্তু তুমি কি বাতাসের অদ্ভুত ফিসফিসানি শুনতে পাচ্ছো? দেখো, পপলার গাছের পাতাগুলো কীভাবে কাঁপছে?'

'গ্রহটা সজীব, তুই তো জানিস...'

'তুমি লিখেছিলে কিছু কথা প্রচ্ছন্নভাবে আছে।'

'লিখেছিলাম বুঝি?'

'আমার মনে হয় এই বাগানেও প্রচ্ছন্নভাবে কিছু আছে।'

'প্রকৃতি রহস্যে ভরা। কিন্তু আমরা কথা বলছিলাম আকাশের তারাদের নিয়ে।'

'শিগ্‌গিরই পানিতেও তারা দেখা যাবে।'

'তা ঠিক। যখন তুই ছোট ছিলি তখন অনুপ্রভা (phosphorescence) সম্পর্কে ঠিক এই কথাই বলতি। এক হিসেবে ঠিকই বলতি তুই। একটা তারার ভেতর যে-সব জিনিস এক সময় মিলেমিশে গিয়েছিল, অনুপ্রভা আর অন্য সব অরগ্যানিজম সে-সব জিনিস দিয়েই তৈরি।'

'আমরাও?'

'হ্যাঁ, আমরাও নক্ষত্রচূর্ণ।'

'কথাটা সুন্দর তো।'

'রেডিও টেলিস্কোপ যখন বিলিয়ন আলোক-বর্ষ দূর থেকে আসা আলোকরশ্মির খোঁজ পাবে তখন বিগ ব্যাং-এর পরে মহাবিশ্ব দেখতে কেমন ছিল তার একটা চিত্র পাওয়া যাবে। আকাশে আমরা যা দেখি তার সবই হাজার হাজার লাখ লাখ বছর আগের মহাজাগতিক জীবাশ্ম। জ্যোতিষী কেবল যে-কাজটা করতে পারে তা হলো অতীত সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা।'

'কারণ নক্ষত্রপুঞ্জগুলোর আলো আমাদের কাছে পৌঁছবার অনেক আগেই সেগুলো

পরস্পরের কাছ থেকে দূরে চলে গেছে। ঠিক?'

'এমনকি দুই হাজার বছর আগেও নক্ষত্রপুঞ্জগুলোকে এখনকার চেয়ে যথেষ্ট অন্যরকম দেখাতো।'

'সেটি তো জানতাম না।'

'পরিষ্কার রাত হলে মহাবিশ্বের বহু মিলিয়ন এমনকি বহু বিলিয়ন পুরনো ইতিহাসের দিকে ফিরে তাকাতে পারি আমরা। কাজেই, এক অর্থে আমরা আমাদের বাড়িতে যাচ্ছি।'

'বুঝতে পারছি না কী বলতে চাও।'

'তোর আর আমার শুরুও বিগ ব্যাং থেকে, কারণ মহাবিশ্বের সমস্ত জিনিসই একটি অরগ্যানিক সত্তা। আদিম এক যুগে একবার সমস্ত বস্তু এমন একটা অসম্ভব রকমের বিশাল পিণ্ড-র মতো হয়ে একসঙ্গে জড়ো হয়েছিল যে একটা পিনের মাথার ওজনই ছিল বেশ কয়েক বিলিয়ন টন। এই 'আদিম পরমাণু'-টি বিস্ফোরিত হলো প্রচণ্ড মহাকর্ষের কারণে। ব্যাপারটা ছিল এমন যেন কিছু একটা একেবারে নেই হয়ে গেল। যখন আমরা আকাশের দিকে তাকাই তখন আমরা আমাদের নিজেদের দিকেই ফিরে তাকানোর চেষ্টা করি।'

'কী অসাধারণভাবে বলা হলো কথাটা।'

'মহাবিশ্বের সমস্ত তারা আর গ্যালাক্সি একই জিনিস দিয়ে তৈরি। সেটির খানিকটা এক সঙ্গে জড়ো হয়েছে, কিছু এখানে, কিছু ওখানে। এক গ্যালাক্সি থেকে আরেক গ্যালাক্সির দূরত্ব বহু বিলিয়ন আলোক-বর্ষ হতে পারে। কিন্তু তাদের সবারই উৎস এক। সব তারা আর সব গ্রহই একই পরিবারের সদস্য।'

'হ্যাঁ, বুঝতে পারছি।'

'কিন্তু এই জাগতিক বস্তুটা কী? বহু বিলিয়ন বছর আগে যে-জিনিসটা বিস্ফোরিত হলো সেটি কী ছিল? কোত্থেকে এলো সেটি?'

'এটা একটা বড় প্রশ্ন।'

'এমন একটা প্রশ্ন যার সঙ্গে আমরা সবাই গভীরভাবে জড়িত। কারণ আমরা নিজেরাও সেই জিনিস দিয়ে তৈরি। বহু বিলিয়ন বছর আগে যে-আগুন জ্বালানো হয়েছিল, আমরা সেই বিশাল আগুনেরই একটা স্ফুলিঙ্গ।'

'এটাও কিন্তু একটা সুন্দর কথা।'

'অবশ্য, এ-সব ব্যাপার বা কথাবার্তার গুরুত্বকে যেন আমরা অতিরঞ্জিত করে না ফেলি। হাতের মধ্যে স্রেফ একটা পাথর ধরাটাই যথেষ্ট। কমলার আকারের সেই পাথরটা দিয়েও যদি মহাবিশ্ব তৈরি হতো, তাহলেও সেটি একই রকম অচিন্ত্যনীয় এবং অবোধ্য থেকে যেতো। প্রশ্নটা একই রকমের দুর্জ্ঞেয় থেকে যেতো : পাথরটা কোত্থেকে এসেছিল?'

হঠাৎ করে লাল কনভার্টিবলের মধ্যে দাঁড়িয়ে পড়ল সোফি। আঙুল তুলে দেখাল উপসাগরটার দিকে।

'নৌকোটা একবার চেষ্টা করে দেখতে চাই,' বলল সে।

'ওটা বাঁধা আছে। তাছাড়া, আমরা দাঁড়গুলো তুলতে পারবো না।'

'চেষ্টা করে দেখি? শত হলেও, এখন মিডসামার ঈভ্।'

'অন্তত পানি পর্যন্ত যাওয়া যেতে পারে।'

গাড়ি থেকে লাফিয়ে নেমে বাগানের ভেতর দিয়ে ছুটল দু'জন।

ধাতব একটা আংটার সঙ্গে শক্ত করে বাঁধা দড়িটা খোলার চেষ্টা করল দু'জন। কিন্তু একটা প্রান্তও তুলতে পারল না তারা।

'মনে হচ্ছে পেরেক দিয়ে গাঁথা,' অ্যালবার্টো বললেন।

'অনেক সময় আছে আমাদের হাতে।'

'সত্যিকারের দার্শনিক কখনো হাল ছেড়ে দেন না। আমরা যদি শুধু...এটাকে ঢিলে করে দিতে পারি...'

'আকাশে এখন আরও বেশি তারা,' হিল্ডা।

'হ্যাঁ, গ্রীষ্মের রাত এখন সবচেয়ে অন্ধকার।'

'তবে শীতকালেই কিন্তু ওগুলো বেশি জ্বল জ্বল করে। লেবাননে চলে যাওয়ার আগের রাতটার কথা মনে পড়ে তোমার? সেদিন ছিল নববর্ষের প্রথম দিন।'

'সেদিনই তোর জন্য দর্শনের একটা বই লেখার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম আমি। ক্রিস্টিয়ানস্যান্ডের একটা বড় বইয়ের দোকান আর লাইব্রেরিতেও গিয়েছিলাম আমি। কিন্তু কিশোর-কিশোরীদের উপযোগী কিছুই ছিল না ওদের কাছে।'

'ব্যাপারটা যেন এ-রকম যে সাদা খরগোশের মিহি লোমগুলোর একেবারে ডগায় বসে আছি আমরা।'

'বহু আলোক-বর্ষ দূরে রাতের বেলা কেউ বসে আছে কিনা ভাবছি।'

'নৌকোটা নিজে নিজেই বাঁধন-আলগা হয়ে গেছে!'

'তাই তো!'

'বুঝতে পারছি না আমি ব্যাপারটা। নিচে গিয়ে নিজে দেখে এসেছিলাম আমি তুমি এখানে আসার আগে।'

'তাই?'

'সোফি যে অ্যালবার্টোর নৌকোটা ধার করেছিল, সেই ঘটনার কথা মনে পড়ে যাচ্ছে আমার। তোমার মনে আছে কীভাবে লেকের মধ্যে এলোমেলোভাবে ভাসছিল ওটা?'

'আমি বাজি ধরে বলতে পারি এবারও সে-ই কাজটা করেছে।'

'যাও, আরও ঠাট্টা করো আমাকে নিয়ে। সারা সন্ধ্যা জুড়েই আমার মনে হয়েছে কেউ রয়েছে এখানে।'

'আমাদের একজনকে সাঁতার কেটে যেতে হবে ওটার কাছে।'

'আমরা দু'জনেই যাবো, বাবা।'

নির্ঘণ্ট

ফ

ব

য

র

ল

শ

স

হ